

# মিথাইলা শোলখড

প্রশান্ত দন

প্রথম  
খণ্ড



প্রথম পূর্ণাঙ্গ বঙ্গালবাস

॥ स. आलथड • अभाउ फन • ॥

ভবানীনাথ

কৌশল

শ্রী শ্রী

বহুভাষা

কল্যাণকর  
মহাভারত

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা  
মহাভারত

চৈতন্যচন্দ্রিকা

মহাভারত

কালীকামা

মহাভারত

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা  
মহাভারত

মহাভারত

কালীকামা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কালীকামা

কালীকামা

কালীকামা

কালীকামা

কালীকামা

কালীকামা



দারাতল

জামালপুর

জামালপুর

জামালপুর

জামালপুর

জামালপুর

জামালপুর

জামালপুর

জামালপুর

জামালপুর

জামালপুর

জামালপুর

জামালপুর

জামালপুর

জামালপুর

# মিথাইল শোলখড

**প্রশান্ত দন**

চার খণ্ডে সম্পূর্ণ উপন্যাস

প্রথম  
খণ্ড



'বাবুগা' প্রকাশন  
মস্কো

মূল রুশ থেকে অনুবাদ : আবুল সোম

**М. Шолохов**  
**Тихий Дон**  
**Книга 1**  
**На языке бенгали**

**Mikhail Sholokhov**  
**Quiet Flows the Don**  
**Book One**  
**In Bengali**

© বাংলা অনুবাদ ● 'বাদুয়া' প্রকাশন ● মস্কো ● ১৯৯০

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

ISBN 5-05-002693-0

ISBN 5-05-002694-9

## সূচী

বিপ্লব ও মানুষের কথা . . . . .	৭
অনুবাদের নিবেদন . . . . .	১৮

### প্রথম অংশ

প্রথম পর্ব . . . . .	৩১
দ্বিতীয় পর্ব . . . . .	১৬২
তৃতীয় পর্ব . . . . .	৩১৮

## বিপ্লব ও মানুষের কথা

কয়েক বছর আগে সাহিত্য প্রকাশন সংস্থা মহল একটি স্মরণীয় বার্ষিকী পালন করেছিল: শোলখভের 'প্রশান্ত দন' উপন্যাসের অর্ধ শতবার্ষিকী। পূর্ণতা জর্জনের বয়স, এমন এক বয়স যখন পেছনে পড়ে থাকে অতিক্রান্ত অনেক পথ।

তখনকার কালের জ্যেষ্ঠ সোভিয়েত লেখক, বিখ্যাত 'লৌহধারা' উপন্যাসের রচয়িতা আলেক্সান্দর সেরাফিমোভিচ সেই সময়, আজ থেকে ষাট বছর আগে যখন শোলখভের এই উপন্যাস সম্পর্কে তাঁর নিজের অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন তখন কি তাঁর পক্ষে জানা সম্ভব ছিল যে তিনি অনেকটা দিব্যদৃষ্টায় পরিণত হয়েছেন? রাশিয়ার গহনতম অঞ্চল দন-উপকূলবর্তী সুদূর ভিগশেনস্কায় পল্টী থেকে তরুণ লেখকের পাঠানো পাণ্ডুলিপি তখন তিনি সবে পাঠ করেছেন। পাণ্ডুলিপিটি এসেছিল 'অক্টোবর' সাময়িক পত্রিকার দপ্তরে। সেরাফিমোভিচ ছিলেন পত্রিকার সম্পাদক। এরও দু'বছর আগে শোলখভের প্রথম গল্পের বইয়ের কৃত্তিকাতেই সেরাফিমোভিচ তরুণ প্রতিভার শিল্পবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তাঁর সূচিস্তিত মত প্রকাশ করেন। নতুন বছর ১৯২৮ সাল থেকে উপন্যাসটির প্রকাশ শুরু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। এর আগে প্রবীণ লেখক আরি বারবিউস, মার্টিন অ্যান্ডারসন নোভে, বোন্না ইল্লি প্রমুখ কয়েকজন বিদেশী লেখককে আমন্ত্রণ জানানো। টাইপ-করা পাণ্ডুলিপির এক বিশাল ফাইল তাক থেকে নামিয়ে হাতে তুলে ধরে অনেকটা সাড়বরেই তিনি ঘোষণা করলেন:

'প্রিয় বন্ধুরা! অনুরোধ করছি, নামটি মনে রাখবেন - 'প্রশান্ত দন'। আর মনে রাখবেন লেখকের নাম - মিখাইল শোলখভ। . . . এবারে শুনুন, আমি আপনাদের বলে রাখছি: অচিরেই সারা রাশিয়ায় পরিচিত হবে এই নাম, আর দু'-তিন বছরের মধ্যে - সারা পৃথিবীতে। . . .'

ঠিক তাই ঘটেছিল। ১৯২৮ সালের শেষে 'প্রশান্ত দন'-এর প্রথম খণ্ড 'অক্টোবর' পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পরই 'রমান-গাজেতা' নামে উপন্যাস-পত্রিকায়



যে বিপুল সংখ্যক মুদ্রণে প্রকাশিত হল তখনকার দিনে তা ছিল অজুতপূর্ব। তারপর গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হল ‘প্রলেভারীয়া সাহিত্যের নবসৃষ্টি’ গ্রন্থমালা পর্যায়ে। দেশের প্রায় সমস্ত পত্রপত্রিকায় এই বইয়ের উপর মতামত প্রকাশিত হল (লক্ষ করার বিষয় এই যে মতামত যারা প্রকাশ করেন তাঁদের মধ্যে পেশাদার সমালোচক ছাড়াও বহু সংখ্যক ‘সাধারণ পাঠক’ ছিলেন। অমিক, গ্রন্থাগারিক, গ্রামীণ সংবাদ-দাতা-সকলেই পঠিত বই সম্পর্কে তাঁদের উপলব্ধি ব্যক্ত করেন)। দু’বছর যেতে না যেতেই ফরাসীদেশে, জার্মানি, সুইডেন, স্পেন, চেকোস্লোভাকিয়া ও ইতালিতে ‘প্রশান্ত দন’-এর প্রথম খণ্ডের অনুবাদ বেরিয়ে গেল; অষ্ট্রিয়ায় আর ফরাসী ভাষাভাষী উপনিবেশগুলিতে, পরে জাপান, ইংলণ্ড, চীন, পোল্যান্ড আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও তার আবির্ভাব ঘটল।

এ বই প্রথম যখন প্রকাশিত হয় মিখাইল শোলখভের বয়স তখন মাত্র তেইশ চলাছে। কিন্তু এই বয়সেই তাঁর কর্মজীবনের যে অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে তা একজনদের পক্ষে যথেষ্ট বেশি বললেও অত্যুক্তি হবে না। স্বল্পশিক্ষিত কৃষকদের ‘স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন, মালগুদামের কাছারিতে কেরানির কাজ করেছেন, রাজমিস্ত্রি আর মুটের কাজের অভিজ্ঞতাও তাঁর আছে। ভাবী লেখকের জীবনে সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা হল খাদ্য সরবরাহ বাহিনীতে তাঁর কর্মজীবন। এই কাজে তিনি যোগ দেন কিশোর বয়সে। তখন তাঁর বয়স পনেরো। দূর্ভিক্ষপীড়িত রাশিয়ার জন্য জোতদারদের কাছ থেকে ফসল উদ্ধার করা-এই ছিল তাঁর কাজ।

১৯১৮-২০ সালে ইউক্রেনে অরাজকতাসৃষ্টিকারী যে-সমস্ত প্রতিবিপ্লবী গুণ্ডাদল ছিল তাদের অন্যতম দলপতি স্বয়ং নেস্তর মাখ্নো শোলখভকে জেদা করার জন্য ডেকেছিল। শুধু ‘অল্প বয়স’ বলেই খাদ্য সরবরাহ বাহিনীর কিশোর কর্মীটি সে যাত্রায় বেঁচে যায়। এই ঘটনা এবং ফোমিনের গুণ্ডাদলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘটনা-কোনটাই শোলখভ বিস্মৃত হন নি। পরবর্তীকালে আমরা দেখতে পাই শোলখভ তাঁর উপন্যাসের গ্রিগোরি মেলেখভকে এই গুণ্ডাদলের মধ্যে টেনে এনেছেন। এসব ঘটনা বিস্মৃত হওয়া শু দুয়ের কথা বরং তরুণ লেখককে অনুপ্রাণিত করে তোলে, যে-ঘটনাপ্রবাহের তিনি সাক্ষী ছিলেন তার গভীরে, ঘটনা ও নিয়তির মূল অনুসন্ধানে, ধারানুসরণে তাকে আকৃষ্ট করে। ‘দনের গল্প’ আর ‘নীলাভ স্তেপভূমি’ নামে সঙ্কলনদুটি যখন প্রকাশিত হয় তখনই ট্রাজিক ও মহিমাবিশিষ্ট জনধুগের ‘প্রশান্ত দন’-এর চরিত্রাবলী পরিণতি পেতে থাকে, কাগজে-কলমে বুপায়িত হতে থাকে।

১৯২৮ সালে ‘প্রশান্ত দন’-এর প্রথম খণ্ডের প্রকাশ সমস্ত নবীন সোভিয়েত সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। ‘প্রশান্ত দন’ পাঠ করার পর গ্রন্থের রচয়িতা সম্পর্কে মাস্ত্রিম গোর্কি বলেন: ‘দনের টানে, কসাক জীবনযাত্রা

আর প্রকৃতির টানে আকুল হয়ে একজন কসাকের মতো তিনি লেখেন।...

জন্মস্থানকে ভালোবাসা, মোটের উপর তার সঙ্গে সক্রিয় সম্পর্ক, নিজেকে তার সন্তান বলে ডাকা - শোলখভের এই উপলব্ধি প্রভূত ফলাদায়ী হয়ে দেখা দেয়। কসাকদের প্রদেশটিই এখন অনেক সময় প্রশান্ত দন নামে অভিহিত হয়ে থাকে।

শোলখভের এই উপন্যাস থেকেই দন অঞ্চল সত্যিকারের অর্থে বিশ্বসাহিত্যের সামনে উদ্ঘাটিত হয়। গোগলের নামের সঙ্গে যেমন নীপার, ইয়েসেনিনের নামের সঙ্গে যেমন রিয়াজান অঞ্চল, গোর্কির নামের সঙ্গে যেমন ভোল্গা, শোলখভের নামের সঙ্গেও তেমনি দন ওস্ত্রোভাত ভাবে জড়িত হয়ে আছে।

কিন্তু এমন এক সময় ছিল - এমনকি সোভিয়েত শাসনকক্ষমতার প্রথম দিককার প্রসঙ্গেও বলা যেতে পারে - যখন দনের নাম, দন-কসাক সম্প্রদায়ের উল্লেখমাত্র পাঠক সমাজের মনে চরম ভীতি ও অস্বস্তির উদ্বেক করত।

লোকে কসাকদের সম্পর্কে কী জানত? সেই পঞ্চদশ শতাব্দীতেই যারা নিজেদের স্বাধীনতার অধিকার প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছিল, রাশিয়ার ভূমিদাসব্যবস্থার বীভৎস বাস্তব অবস্থার মধ্যেও যারা অসাধ্য সাধন করতে পেরেছিল একদিকে সেই দুর্ধ্ব স্বাধীনতাপ্রেমীদের বংশটি, স্ত্রেশান রাজিন আর ইয়েমেলিয়ান পুগাচিওভের পতাকাভলে সমবেত বিদ্রোহী, পলাতক দাসের দল। আবার অন্য দিকে 'কসাক' শব্দটিই ভীতিকর, এক ধরনের গালমন্দ। কসাক হল তারা যারা জ্বরের আমলে ছাত্রদের মিছিলের ওপর বেত মারত, মে দিবসের শোভাযাত্রাকারীদের ছত্রভঙ্গ করত, যারা রক্তশয্যায় ভাসিয়ে দিয়েছিল ১৯০৫ সালের গণবিপ্লবকে।

কিন্তু এই কসাকরাই না আবার সেই কিবেদস্তীসুলভ এক নম্বর ঘোড়সওয়ার ফৌজ, নবীন সোভিয়েত রাষ্ট্রের গৌরব, তার রক্ষাধূর্ণ! এক নম্বর ঘোড়সওয়ার ফৌজের কমান্ডার বুদ্ধিগমি নিজে একজন কসাক - কসাক-গ্রাম কোজিউরিনের লোক।... তাহলে কারা এই কসাক? কী তাদের আসল পরিচয়?

সেই প্রশ্নেরই উত্তর আছে শোলখভের উপন্যাসে। শোলখভ পাঠককে কসাকদের বসতবাড়ির পুরনো বাসিন্দা করেছেন, বাড়ির লোকজনের সঙ্গে তাকে একাধারে বসিয়েছেন, মাঠে নিয়ে গিয়ে তাকে দিয়ে খড় গাদা করিয়েছেন, মাছ ধরিয়েছেন তাকে দিয়ে, তাকে নিয়ে গেছেন মাজাইয়ের জায়গায়। হাইবুট পরা বর্ষাধারী ঘোড়সওয়ার - এটাই কসাকের একমাত্র মূর্তি নয়; তার পায়েও কীচা চামড়ার জুতো থাকে, সেও দু'হাতে দাঁড় বায়, বাচ্চা কোলে নেয়, বেড়ার ধারে প্রেমিকার সঙ্গে প্রেমালাপ করে।... শোলখভ কঠিন ও পরম্পরাবিরোধী এক জীবনের কাহিনী বলেছেন। তিনি এমন সব চরিত্র সৃষ্টি করেছেন যারা একাধারে আন্তরিক অথচ বুদ্ধ, যাদের আত্মসম্মান বোধ আছে, অথচ অনেক ব্যাপারে

সম্প্রদায়ের প্রচলিত সংস্কারের বাঁধনে হাত-পা বাঁধা এরা হল খেটে-খাওয়া মানুষ। খেটে-খাওয়া মানুষের এক সমাজ যে সমাজ অন্য যে-কোন শ্রেণীভিত্তিক সমাজের মতোই তার অভ্যন্তরীণ সামাজিক স্তরভেদ ও শ্রেণীবিরোধের মধ্যে আবদ্ধ এবং প্রবল ঐতিহাসিক বিকাশ ও পূর্ণতালাভের জন্য উন্মূখ।

ইতিহাসবিদ, রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রবিদ দার্শনিক ও সমাজবিজ্ঞানী সকলের কাছেই 'প্রশান্ত দন'-এর মূল্য অপরিমিত। তা সত্ত্বেও আব সব মতের চেয়েও এখানে যা বেশি মূল্যবান তা হল এক বড় শিল্পীর হাতে মানুষের আঁখাব রহস্য উদ্ঘাটন কসাকদের স্বভাব-চরিত্র ও তাদের জীবনীশক্তি সম্পর্কে এবং শূণ্য সমষ্টিগত ভাবে নয়। একক ভাবে এই সব মানুষের প্রত্যেকের আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে জ্ঞান থাকলে তবেই আমরা বুঝতে পারি কেমন করে একই পরিবারে পিওতর মেনেলখভ আর জিগোরি মেনেলখভের মতো কিংবা কোরশুনভদের ঘরে - মিতকার মতো জল্লাদ আর নাতালিয়ার মতো নির্মল-হৃদয় - এত ভিন্নধর্মী মানুষ বড় হয়ে উঠতে পারে, কেন একদল কসাক বুদিওল্লির সঙ্গে যায়, আরেক দল ভেড়ে দেনিকিনদের সঙ্গে।

'প্রশান্ত দন' অসাধারণ বিশ্বাসযোগ্য উপায়ে শিল্পের ভাষায় রাশিয়ায় সমাজতাত্ত্বিক বিপ্লবের বিজয়ের কাহিনী পরিবেশন করেছে

সংরূপের বিচারে প্রশান্ত দন' অনেক সময় নৌকিক মহাগাথা নামে অভিহিত হয়ে থাকে। রচনাটির সব কিছু এই উচ্চতা থেকে দেখা ও বোঝার চেষ্টা করা দরকার। উপন্যাসের প্রথম খণ্ড সম্পর্কেও এই কথা প্রযোজ্য। সেখানকার ঘটনা 'স্থানীয়', 'আঞ্চলিক লক্ষণাক্রান্ত'। বিপ্লবের আগের ১৯১৭ সালেরও অনেক আগের ঘটনা এই খণ্ডের প্রধান উপজীব্য - লেখকের মনোযোগের বিষয়।

ভোর হয়ে এসেছে। এখনও পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে কসাক গাঁয়ের ছেলে গ্রিশকা মেনেলখভ স্বচ্ছন্দ ভাবে তার একটা হাত ঘুরে এসে একপাশে পড়ল গ্রিশকা তার এই কাঁচা বয়সে যেমন স্বপ্ন দেখা উচিত তেমনি স্বপ্ন দেখছে।

এবারে কোন তাড়াহুড়ো না করে ধীরেসূহে তাকে নিরীক্ষণ করা যেতে পারে তার একটা নিজস্ব সৌন্দর্য আছে। সামনে চুলের ঝুটি। বাঁকা নাক, গালের হাড় উঁচু ফলকের মতো বেরিয়ে আছে, রোদে পোড়া টনটন চামড়ার ওপর গোলাপী আভা। এই মুহূর্তে, এখনও সে কেমন কচি, কেমন সোচ্চার, জীবনের নিত্যকার সমস্ত আনন্দের সামনে কেমন দরাজ তাতারখি গ্রামের এই ছেলোট

দিনগুলো তার কাটে বেশ নিশ্চিন্তে, ভাবনাকিন্তাহীন, যেন আপনা-আপনি গাঁয়ের ছেলেছোকরারা ঘোড়দৌড়ের খেলায় মেতে উঠেছে কে কার চেয়ে বেশি ঘোড়াকে চেতিয়ে দিয়ে জোরে ছোটতে পারে - অর্মনি গ্রিশকাও এসে জুটল

সেখানে ঘোড়া নিয়ে আহোমপ্রমোদের ব্যাপারে তার দাবুণ উৎসাহ এলো জ্বলাভূমিতে ঘাস কাটার সময় অমনি চটপট লেগে গেল কাজে। বেশ লাগে তার - মেয়েদের বঙবেরঙের পোশাকী ঘাগরায় ঝলমলে জ্বলামাঠ, দূরের পাহাড়ের আড়ালে অন্তর্গামী সূর্যের কিরণ, তার কুহেলীঘেরা পৈখম চোখে নেশা ধরায় জ্বিঞ্চকার চলার সঙ্গে সঙ্গে মৃদু সরসর প্রবাহ উঠছে, ঘাসের ওপর কান্তে পড়ছে সুরেলা আওয়াজ ক'বে

খুব একটা মনোযোগ দিয়ে না দেখলে, আপাত দৃষ্টিতে উপন্যাসের এই পরিচ্ছেদগুলি যেন 'এখনও আসল বিষয়ে আসে নি' এ যেন দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অমনি কতকগুলো স্কেচ, দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাটো নানা ঘটনা। নিজস্ব স্বভাবের এক কুর্তিবাজ ছেলের অতি সাধারণ হাসিঠাট্টা শুনতে পাই অনুভব করতে পারি খালি পায়ের তলায় শিশিরের ঠাণ্ডা ছৌঁওয়া সবই যেন অত্যন্ত সহজ সরল। এমনকি আত্মনিয়ন্ত্রণের সঙ্গে গ্রিগোরির যে ঘটনা ঘটল তার ফলে এখন পর্যন্ত এমন কিছু ঘটে নি যাতে শাস্ত্র নিন্দয়ক দিনগুলি নাড়া খেতে পারে - সামাজিক দৃষ্টিতে এমনই সাদাসিধে, বৈচিত্র্যহীন সেই জীবনের প্রবাহ।

অধ্যক্ষ ইতিমধ্যে জনগণ সমাজ অব বাক্সিমানুষ সম্পর্কে কাহিনী শুরু হয়ে গেছে দেখতে দেখতে গড়ে উঠতে শুরু করেছে কসাকদের নৈতিক ধ্যানধারণার জগতের এক বিশাল ছবি বলতে গেলে, প্রথম সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের প্রাক্কালে, মহাবিশ্বের পদধ্বনি বহন আসন্ন হয়ে উঠেছে সেই মুহূর্তে সামগ্রিক ভাবে রাশিয়ার জনজীবন কেমন ছিল তারই একটা ছবি

উপন্যাসের নায়কের জীবনের সামাজিক তাৎপর্যমূলক ঘটনাবলী এবং তার নিত্যজীবী ব্যক্তিগত ও অন্তরঙ্গ জীবন গুতপ্রাপ্ত ভাবে পবন্যবের সঙ্গে জড়িত এ যেন উত্তাল জীবনের এক অবিভাজ্য ধারা গ্রিগোরি মেলেখভের সামাজিক আচার-আচরণে তার সমাজজীবনে তখনকার দিনের কসাকসম্প্রদায়ের বিশিষ্টতাসূচক অনেক কিছু আছে। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও তার জীবনে যা ঘটেছিল অন্য কোথাও তার মিল খুঁজে পাওয়া ভার। মেলেখভের যা জীবন তার যা চরিত্র অন্য কারও মধ্যে কখনই তার পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে না এই চরিত্রের মধ্যে যে অন্যদের তুলনায় সর্বদা জ্বিগুণ এমনকি তিনগুণ পরস্পরবিরোধিতা দেখতে পাওয়া যায় অন্ততপক্ষে সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলেও বটে! সঙ্ঘর্ষগ্রহণের ব্যাপারে বিশেষ স্পর্ধার পরিচয় দিয়ে এবং আত্মমর্যাদারক্ষায় আশ্চর্য সাহস দেখিয়ে যে ব্যক্তি ভাতাবৃষ্টি গ্রামের ইতিহাসে দীর্ঘকালের জন্য স্থান করে নিয়েছে 'তুর্ক' ও 'পাহাড়ী' নামে সেই প্রকোফি মেলেখভের পৌত্র হওয়া গ্রিগোরির সম্পূর্ণ সাজে

অন্য দিকে মনে হয় গ্রিগোরি ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অপূর্ব প্রেমের উপাখ্যান বুঝি

সমাজ-সংসার থেকে, সামাজিক ভাবে পূর্বনির্দিষ্ট সমস্ত কিছু থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন কিন্তু একবার ভেবে দেখি না আমরা এই উপাখ্যানও কি তার নিজস্ব ধারায় দৈনন্দিন সামাজিক জীবনযাত্রা ও গৃহযুদ্ধের ঘটনাবলীর উপর নির্ভরশীল নয়? মেলেখভের রাজনৈতিক ভাষ্যের বিপুল উত্থানপতনের সঙ্গে মোটের ওপর জীবনের সত্য পথানুসন্ধানের জন্য তাকে যে ভীষণ যত্নগা সহ্য কবতে হয়েছিল তার সঙ্গে জড়িত নয়?

অবধারিত ভাবে যা দাঁড়াচ্ছে তা হল এই যে আপাত দৃষ্টিতে বাইরের সমস্ত রকম প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত বলে মনে হলেও বিপ্লবী বাস্তবতা শুধু মেলেখভের অন্তরঙ্গ জীবন কেন তার সমগ্র ভাগ্যকেই নিজস্ব রাঙে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে রাঙিয়ে তোলে উপন্যাসে বিপুল আকর্ষণের অর্থও স্কেত্রটি পূর্বাপর এতটুকু শিথিল হয় না।

ছয় শ'টিরও বেশি চরিত্র আছে 'প্রশান্ত দন' উপন্যাসে জনসাধারণের ভেতর থেকে উঠে আসা এই যে মানুষটি বিপ্লবের মধ্যে নিজের স্থান খুঁজতে গিয়ে পদে পদে যত্নগা ভোগ করেছে তার জটিল রূপটিকে আরও গভীর ভাবে বোঝার জন্য আরও ভালোমতো তার মূল্যায়নের জন্য এর সবগুলিরই প্রয়োজন গ্রিগোরি মেলেখভ এদের প্রত্যেকের সঙ্গে কোন না কোন ভাবে জড়িত এমনকি উত্তাল ঘটনাবর্তের মধ্যে যাদের সঙ্গে তার কন্ঠিনকালে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ হয় নি, তাদের সঙ্গেও

'প্রশান্ত দন' হল এক বিশাল এপিক আখ্যান। লোকজনের মধ্যে এই যে কমিউনিস্ট এরা কারা? কেনই বা বেশির ভাগ কসাকের মন বলশেভিকদের দিকে টানে? এই প্রশ্ন, যে প্রশ্ন কোন এক সময় গ্রিগোরি মেলেখভ নিজেকে সেই সঙ্গে দুনিয়াসুদ্ধ সকলকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'প্রশান্ত দন' নিরন্তর তা আমাদের মনে নাড়া দেয় বুনটুকের মতো মানুষ অথবা জিখাচিওভের মতো নির্ভীক কমিসারের সঙ্গে দেখা হতে উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় আকুল, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে গ্রিগোরি যখন তাদের দিকে তাকায় তখন যেন 'প্রশান্ত দন'-এর বলশেভিকদের সম্পর্কে আমাদের পাঠকবর্গের জ্ঞানে আরও বেশি গভীরতা সঞ্চারিত হয়। শোলখভ সেই মানুষগুলিকে আমাদের দেখার সুযোগ করে দেন অন্য আরও এক দৃষ্টিতে মেলেখভদের মতো লোকের দৃষ্টিতে, যখন লোকে চোখের সামনে যাকে দেখতে পাচ্ছে সে যে তার প্রতিপক্ষ তার শত্রু এ কথা নিশ্চিত ভাবে জেনেও অন্যের পৌরুষকে অন্য এক বিশ্বাসের শক্তিকে নিজেরই অজ্ঞানতে মনে মনে তারিফ না করে পারে না

'প্রশান্ত দন'-এর আরও যে ছয় শ'টি চরিত্র আছে একমাত্র তাদের সকলের

(সর্বোপরি বনুচক কিংবা মিশা কশেভয়ের মতো চরিত্রের) ভাগ্যের পটভূমিকাতেই গ্রিগোরি মেলেকভের নিজের জীবনের ইতিহাস অর্থাৎ সত্যিকারের অসুখ এই চরিত্রটির ওপর যে গভীর তাৎপর্য রচয়িতা আরোপ করেছেন শেষ পর্যন্ত তা অনুধাবন করা সম্ভব

বিপ্লবের সঙ্গে একজন মানুষের সম্পর্ক যত জটিল আর পরস্পরবিরোধীই হোক না কেন, বিপ্লবের প্রক্রিয়া যে এতটুকু দয়ামায়া না দেখিয়ে কী ভাবে তাকে আটপুটে জড়িয়ে কেলে, 'প্রশান্ত দন' তারই বিবরণ

ইতিপূর্বে যে সমস্ত বিষয় ও বিরোধ সামাজিক ও নিছক দৈনন্দিন সমস্যা সমালোচকের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে, যত দিন যাচ্ছে শোলখভের উপন্যাস পাঠকসমাজের সামনে সেগুলির ভেতর থেকে যেন নতুন করে নানা বাজনা শব্দে শব্দে উন্মোচন করছে। সেই ১৯২৮ সাল থেকে শুরু করে 'প্রশান্ত দন'-কে কেন্দ্র করে যে ব্যাপক সৃজনী আলোচনা চলছে আজও তার যে কোন বিরাম নেই তা অহেতুক নয় সেই একই রচনা কিন্তু আলোচনার মধ্য দিয়ে যে সমস্ত প্রশ্ন উঠছে একেক দশকে তা একেক রকম শোনায়

কারণও কারণও মতে, 'প্রশান্ত দন' উপন্যাসে কিছুর ভাবে বিপ্লব ও গৃহযুদ্ধকালে শ্রেণীশক্তির সর্বাত্মক বিন্যাস প্রদর্শিত হয়েছে, সর্বোপরি যে-কোন গণবিপ্লবের জীবাশ্ম যুগ্মতগুলি অবধারিত ভাবে যাদের সঙ্গে জড়িত সেই মাঝারি কৃষকসম্প্রদায় এখানে কী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল লেখক সে প্রশ্নে উত্তর দিয়েছেন উপন্যাসটির সামাজিক গঠনপ্রকৃতি ও ঘটনাবিন্যাসের মধ্যে এ ধরনের ভাষ্যের মূল ধুঁজে পাওয়া আদৌ কঠিন নয় উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীদের শ্রেণী-সম্প্রদায়গত 'বিভাজন' সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষ এক দিকে আছে গোলাম, খ্রিস্টোনিয়া প্রোখর জিকভ আর কশেভয়ের মতো দীনদরিদ্র কসাকরা অন্যদিকে মোখভ, কোবশুনভ ও লিস্তনিৎস্কির মতো গ্রামের শোষণকারী পরভূবীরা, যারা নিজের হাতে কুটোটি ভাঙতে জানে না, এ দুয়ের মাঝখানে আছে মেলেকভরা তাদের মধ্যেই মাঝারি কৃষক সম্প্রদায়ের সামাজিক ও নৈতিক চরিত্র সবচেয়ে ভাবব্যঞ্জক রূপ পরিগ্রহ করেছে

কেউ কেউ আবার সমাজবিজ্ঞানের ধারা অনুসরণে অন্যায়সে উপন্যাসটির মধ্যে এমন সমস্ত উপকরণের সন্ধান পেয়ে যান যার ফলে তাঁরা এই সিদ্ধান্ত করে বসেন যে বিপ্লবে যোগদানকারী পৃথক কিছু লোক ছাড়াও বিপুল সংখ্যক জনসাধারণ জনগণের একটা বেশ কড় অংশ যে না জেনেশুনে ঐতিহাসিক বিপ্লবের মধ্যে পড়তে পারে, ভিওশেনকারার বিদ্রোহের বেলায় যেমন ঘটেছিল, তেমনি তাদের নিজস্বদেরই স্বার্থ-বিরোধী অন্যায়-অনুচিত কাজে লিপ্ত হতে পারে, বিশেষ ভাবে এটাই দেখানো ছিল শোলখভের উদ্দেশ্য।

আমার মতে, শোলখভেব রচনার মধ্যে যে ভাষাটি রীতিমতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যা দৃঢ় প্রত্যয়জনক, প্রশান্ত দর্শন এর ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা হল বিপ্লবের মধ্যে তৃতীয় কোন পন্থা যে সম্ভব এই অলীক চিন্তাকে দূর করা। সত্যিই ত গ্রিগোরি মেলেখভ কোন পরিত্যাগ করল লালকৌজীদের শিবির যদিও তার বিরোধী সত্তা মনেপ্রাণে ঘৃণা করত খেটে-না-খাওয়া পরজীবীদের, স্বৈতরক্ষীদের? স্বার্থপর তাকে আদৌ বলা চলে না, ছেটিখাটো ব্যক্তি-মালিকও সে নয়, বরং তার উলটোটাই বলা যায় - নিজের প্রাণের মায়া না করে অগ্নিকুণ্ডের মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে গ্রিগোরি তার দেশের জনগণের কিসে ভালো হতে পারে সেই পথ খুঁজে পেতে চায়, তাদেরই জন্য সহ্য করে এত কষ্ট, এত যন্ত্রণা, যাব উজ্জ্বল বর্ণনা এই উপন্যাসের পাতায় পাতায় লেখক রেখে গেছেন।

তা সত্ত্বেও গ্রিগোরি মেলেখভের দূর্ভাগ্য এই যে জনগণ বলতে যা বোঝায় একমাত্র কসাক সম্প্রদায়ের মধ্যে তাব বৃণ সে প্রত্যক্ষ কবে থাকে, দনের বাইরে যে জনগণ আছে তাকে দেখার বা বোঝার ক্ষমতা তার নেই, তার খারণায় ওখানে আছে 'বাসেয়া' আছে কিছু 'চাষাভূষা' লোকজন না সেই বিশাল 'বাসেয়ার' বিরুদ্ধে সম্মুখে লিপ্ত হওয়ার কোন স্পৃহা তার নেই, কসাক সম্প্রদায়ের জন্য তার যে পবিত্রতা সেটা অতি সহজ সরল স্বৈতরক্ষীরা লালকৌজীদের সঙ্গে লড়াই করে মরুক, আমরা বিপ্লবের মধ্য দিয়ে এমন একটা পথের সন্ধান পাব যা হবে ওদের দুয়ের থেকে আলাদা। মহাবিপ্লবের সঙ্কীর্ণে এ ধরনের দর্শন মানুষকে যে কোথায় নিয়ে যেতে পারে উপন্যাসের নায়ক এবং তার সঙ্গে যারা জড়িত ছিল তাদের অনেকেরই জীবনৈতিহাস সে কথা আমাদের বলে।

যে কোন বিপ্লবের সময় যে কোন সামাজিক ঘটনার আবর্তের মধ্যে চিরকালই এমন কিছু লোক দেখতে পাওয়া যায় যারা রাজনৈতিক নিরপেক্ষতার এই আপাত নির্দোষ আইডিয়া দিয়ে নিজেকে ঠকানোর চেষ্টা করে। কিন্তু এই প্রয়াস কত লোককেই না সর্বনাশের শেষপ্রান্তে নিয়ে গেছে, কত লোককেই না কত বড় বড় বিপদ আর অবিধ্বাসা দুঃখকষ্টের মুখে ঠেলে দিয়েছে দুই বিরোধী শক্তির মধ্যে যখন লড়াই চলছে তখন মধ্যবর্তী ব্যবস্থা অবলম্বন করা এবং ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ আলো-অন্ধকার, বিপ্লব-প্রতিবিপ্লব, প্রগতিশীল মতাদর্শ আর প্রতিক্রিয়াশীল মতাদর্শের মাঝখানে তৃতীয় পন্থার অনুসন্ধান করা এ যে কী মারাত্মক, তা দেখানো হয়েছে 'প্রশান্ত দর্শন' উপন্যাসে। এই অর্থে শোলখভেব বিখ্যাত উপন্যাসটির বহু চরিত্র-বিশিষ্টের সঙ্গে অতি সঙ্গত কারণেই আরও একটি যোগ করা যেতে পারে। সামাজিক-রাজনৈতিক বোধ মানুষের, তথা বিপুলসংখ্যক জনসাধারণের মনভূমিকে কী ভাবে অধিকার করে এবং তা এই বোধ জীবন্ত মানুষের কাছে,

বিশেষ এক পরিবারের কাছে, এই কসাক গ্রামের কাছে কী তাৎপর্য বহন করে জানতে পারে তাই নিয়ে এ রচনা। গ্রিগোরি মেলেকভের তিস্ত জীবন যারা তার চাক্ষুশ খিরে ছিল তাদের প্রায় সকলের সর্বনাশ এই হল বিপ্লবের মধ্যে 'তৃতীয় পন্থার' অনুসন্ধান করতে যাওয়ার প্রকৃত মূল্য। সেই সঙ্গে নতুন কমিউনিস্ট ধর্মিয়াদের ওপর দুনিয়ার বৃষ্টির সাধন সম্পর্কে লেনিনের যে ধারণা তারই মহিমা কীর্তিত হয়েছে 'প্রশান্ত দন' উপন্যাসে।

বলাই বাহুল্য 'প্রশান্ত দন' এর এই ভাষাটিও সম্ভাব্য অনেক ভাষার মধ্যে একটি যাত্রা - উপন্যাসের সমগ্র তাৎপর্য ধারণে অস্বীকার্য তার ক্ষমতা নেই। ভাষা যতই হোক না কেন আকাদেমিশিয়ান মিখাইল বরিসভিচ ত্রাপচেনকোর মন্তব্যটি সব সময় আমাদের মনে রাখতে হবে। তাঁর মতে, শোলখভের শিল্পের যথার্থ আরতি এখানেই যে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলিতে তিনি বিশ্বয়কর গভীরতা সম্ভার করতে পেরেছেন, সার্বিক মানবিক তাৎপর্যমণ্ডিত সারমর্ম দিয়ে তাদের পরিপূর্ণ করে তুলেছেন আঞ্চলিক ও ঐতিহাসিক এবং যা অপরিবর্তনীয় ভাবে বিভিন্ন দেশ ও জাতির মানুষের মনে ঔৎসুক্য জাগিয়ে তুলতে পারে এ দুয়ের সম্পর্ক এবং একটি থেকে আরেকটিতে উদ্ভবণ এই হল শোলখভের শিল্পসৃষ্টির সাধারণীকরণ ও তার বিপুল তাৎপর্য প্রদর্শনের অর্থ

'প্রশান্ত দন' উপন্যাসে আছে সুনির্দিষ্ট এক ইতিহাসের সুবিশাল চিত্র - আমাদের দৃষ্টির সামনে ফুটেছে অগ্নিগর্ভ বিপ্লবের ঝঞ্ঝা, অক্টোবরের পেত্রোগ্রাদ ও গালিচ এলাকার পরিখা থেকে শুরু করে দনপারের গ্রাম আর কুবানের স্তম্ভভূমি বিপ্লবের অন্যতম জয়বাহ রণাঙ্গনে পরিণত এক বিস্তৃত ক্ষেত্র জুড়ে ঘটনা প্রসারিত হয়ে চলেছে আরভন যত বড়ই হোক না কেন লেখকের দৃষ্টির সম্মুখে যেই পড়েছে তাদের প্রায় কেউই এবং তাদের আকস্মিক ভাগ্যপরিবর্তন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা, রীতিনীতি আচার ব্যবহার কোনটাই তাঁর আশ্চর্য গভীর ও সুস্থ মনোযোগ থেকে বাদ পড়ে নি

বিশেষত উল্লেখ কবতে হয় শোলখভের মনস্তাত্ত্বিক অন্তর্দৃষ্টি নায়ক-নায়িকার মানসজগতে, তাদের অন্তরের গভীরে প্রবেশ করার মতো শিল্পনৈপুণ্য পাঠক নিজের অজ্ঞানতেই নায়কের উপলব্ধির শরিক হয়ে পড়ে, তার দৃষ্টিতে পরিপার্শ্বের জগৎ দেখতে থাকে

মানবজাতির জীবনে এবং একক ভাবে প্রতিটি মানুষের ভাগ্যনির্ধারণে কোন জিনিসটি শোলখভকে সবচেয়ে বেশি আশ্রিত করে তা ভালোমতো বুঝতে গেলে কোম এক সময় ফরাসী সাহিত্যিকদের সঙ্গে আলোচনাপ্রসঙ্গে তিনি যে কথাগুলো বলেছিলেন সেগুলো আমাদের সাহায্য করবে 'যে-মানুষ সামাজিক ও জাতীয়



মহাপ্রলয়ের বিপুল আবর্তে জড়িয়ে পড়েছে আমি তাতে আগ্রহী আমার মনে হয় এই সব মুহুর্তে মানুষের চরিত্র কেলসিত রূপ পায়।

বস্তুত উপন্যাসের ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে শোলখভের পাত্রপাত্রীর ভাগ্যচক্রের মধ্যে ভীষণ ভাবে পীড়াদায়ক সময় সময় এই বিরাট সামাজিক মহাপ্রলয়ের সঙ্গে জড়িত নাটকীয়তার অভূতপূর্ব ঘনীভূত রূপ প্রত্যক্ষ করে আমরা বিস্মিত না হয়ে পারি না। সমগ্র জাতির ও দেশের ইতিহাসের কতকগুলি চরম নাটকীয় মুহুর্তের উপর উপন্যাসটির দৃষ্টি। সেই সঙ্গে সামগ্রিক ভাবে শোলখভের রচনাটি এক পরম আশার উজ্জ্বল আলোর শিখারী, নৈতিক সূত্রতা ও সবলতা এবং পায়ের তলার নির্ভরযোগ্য মাটি বলে গ্রহণ করা যেতে পারে তাকে।

কিন্তু শোলখভের নিজের ব্যাখ্যা মেনে নিয়ে যদি বলতে হয় যে ঐতিহাসিক মহাপ্রলয়ের মধ্যে নিষ্কিপ্ত, পরীক্ষিত মানুষ তাঁর কাছে বড় কথা, তাহলে অপেক্ষাকৃত পবিত্র কালে তিনি আরেকটি যে স্বীকারোক্তি করেছিলেন অনুব্রূণ বৈশিষ্ট্য নিরূপণ কি তার বিরুদ্ধে যায় না? লেখক যে বলেছিলেন যে 'প্রশান্ত দল' উপন্যাসের প্রধান চরিত্রের মধ্যে 'মানুষের আকর্ষণীয়তা' দেখানোই ছিল তাঁর সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য এর অর্থ তাহলে কী? সেই মানুষ নাকি গ্লিগোরি মেলেখভ জীবনে যার আশাভঙ্গ হয়েছে, যে পৃথিবীজন্মের পরিবার সুভঙ্গ থেকে দেহে মনে বিনষ্ট হয়ে ফিরে এসেছে সাতপুরুষের ভিটেমাটিতে, যার গভীর ও ভয়ঙ্কর চেহারা দেখে নিজের ছেলেটা পর্যন্ত ভয়ে জড়সড়। এখানে 'আকর্ষণীয়তার' কী আছে?

তবু বলব এই যে বিভিন্ন লক্ষ্য পরিণামে এদের সবগুলি আসলে একই জায়গায় এসে মিলে পৃথিবীতে মানুষ সম্পর্কে শোলখভের যে ধারণা তার একটা অখণ্ড রূপ গড়ে তোলে। এ হল সেই মানববোধ যার মধ্যে নিহিত আছে উপন্যাসটির আর সমস্ত ভাষা ও বাগ্ধান এটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে 'প্রশান্ত দল' উপন্যাসের পাতায় পাতায় হযত শোনা যেতে পারে চরম মর্মস্পর্শী ও অন্তরতম মর্মবাণীটি মানুষের কথা মনে রেখো মনে রেখো সর্বদা, সর্বকালের জন্য পৃথিবী জুড়ে যদি কোন প্রবল সামাজিক আলোড়ন ও ওলটপালট দেখা যায়, তাহলেও। গ্লিগোরি ও আন্ট্রিনিয়া পদতিওলকভ ও বুনচুক ইলিনিচনা ও দারিয়া মেলেখভের চরিত্র যে-শিল্পী ঐক্যেছেন এরই ওপর তিনি জোর দিয়েছেন কিন্তু মানুষের বিপদের সময় তার প্রতি সমবেদনা একমাত্র এতেই শোলখভ সম্পূর্ণ তৃপ্ত নন মানুষের দুঃখকে বুঝতে পাবা, তাকে সূক্ষ্ম ভাবে উপলব্ধি করতে পারা এটাই সব নয় না, লেখকের যেটা বাসনা তা হল তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি যেন উৎসাহ-উদ্দীপনা জাগিয়ে তোলে মানুষের বিপদের সময় তাকে সক্রিয় ভাবে

সাহায্য করার জন্য সাড়া জাগায় শোলখড শুমু মানুষকেই যুগের কষ্টপাথরে  
বিচার করেন নি যুগকেও বিচার করেছেন মানুষের কষ্টপাথরে।

নোবেল পুরস্কার কমিটির সংবিধান অনুযায়ী পুরস্কার বিজয়ীকে জীবন ও  
শিল্প সম্পর্কে, শিল্পীকর্তব্য সম্পর্কে তাঁর ধ্যানধারণা সংক্ষিপ্ত আকারে ব্যক্ত করে  
একটি ভাষণ দিতে হয় সেই ভাষণে শোলখড তাঁর নিজের সম্পর্কে বলেছিলেন  
'আমার ইচ্ছা, আমার লেখা যেন মানুষকে ভালো হতে শুদ্ধচিত্ত হতে সাহায্য  
করে, মানবপ্রেম, মানবজাতির প্রগতি ও মানবতার আদর্শের জন্য সক্রিয় সংগ্রামের  
বাসনা জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করে '

একজন শিল্পী ও মানবতাবাদী হিসেবে 'প্রশান্ত দন' এর রচয়িতাকে বোঝার  
পক্ষে এটাই বোধহয় সর্বপ্রধান বস্তু,

ড ডিভিনড

## অনুবাদকের নিবেদন

চল্লিশের দশক থেকে শুরু করে শোলখন্ডের এই যুগান্তকারী উপন্যাসেব একাধিক অনুবাদ বাংলায় হয়েছে। কোনটি সংক্ষিপ্ত কোনটি বা অপেক্ষাকৃত পূর্ণতর। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ কোনটিই নয়। বর্তমান অনুবাদে আমরা এতদিনের সেই অভাব পূরণে সচেষ্ট। দ্বিতীয়াত এটি সরাসরি বুশ থেকে বাংলা অনুবাদের প্রথম প্রয়াসও বটে।

ইংরেজি অনুবাদে উপন্যাসটির প্রথম দুই খণ্ডের নাম ছিল 'এও কোয়ায়েট ফ্লোজ দি ডন' পরবর্তী দুই খণ্ডের 'দি ডন ফ্লোজ হোম টু দি সি' বাংলা অনুবাদগুলিতেও নামকরণের সেই ধারা এত দিন পর্যন্ত বজায় ছিল। কিন্তু বর্তমান অনুবাদে মূল্যের অনুসরণে চারটি খণ্ডেরই নাম রাখা হল 'প্রশান্ত দন'। নামটি শোলখন্ড নিয়েছিলেন এক প্রাচীন কসাকগীতি থেকে উপন্যাসের সূচনায় তা থেকে উদ্ধৃতিও আছে। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য 'দন' কোন নদী নয় - 'দন' একটি নদের নাম। কসাক নীতিতে তাকে 'পিতা' বলে সম্বোধন করা হয়েছে ('আমাদের পিতা দন বালমল অনাথ শিশুব ভিড়ে '। দন পৌরুষের প্রতীক শৌর্য ও প্রশান্তির প্রতীক। প্রশান্ত দনের প্রশস্ত বক্ষে যে ঝঙ্কারিষ্ক অকাশের প্রতিফলন ঘটেছিল তারই চিত্র আছে শোলখন্ডের এই উপন্যাসে। সে চিত্র বাশিয়ায় ইতিহাসের এমন এক পর্বের চিত্র যখন মানুষ তার ভাগ্যেব সন্ধানে মানুষের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে, যখন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে ভালো আর মন্দ সুন্দর আর অসুন্দরের সীমারেখা। তাবই স্রোত আমাদের টেনে নিয়ে যায় সেই সুদূর তটভূমিতে যেখানে বিপ্লবের অপূর্ব উন্মাদনায় উত্তাল হয়ে উঠেছিল বুশ জনমানস।

বাদের কেন্দ্র করে শোলখন্ডের এই ঐতিহাসিক উপন্যাস সেই কসাকদের চরিত্র বুঝতে গেলে কসাক জনগোষ্ঠীর উদ্ভবের ঐতিহাসিক পরিস্থিতি এবং তাদের সহজাত ধর্ম সম্পর্কে কিছু জানা দরকার।

'কসাক' বা 'কোসাক' তুর্কী ভাষার শব্দ। রাশিয়ায় চতুর্দশ শতাব্দীতেই এর

উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় সঙ্গীর্ণ অর্থে 'কসাক' বলতে বোঝাত স্বাধীন ক্ষেত মজুর, ব্যাপকতর অর্থে - নিজের পরিবেশের বন্ধন ছিন্ন করে বেরিয়ে আসা যে-কোন স্বাধীন মুক্ত মানুষ। তৎকালীন রুশ দেশের উপকণ্ঠবর্তী অঞ্চলগুলিতে যে-সমস্ত স্বাধীন মানুষ বসবাস করত পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে তাবাই 'কসাক' নামে অভিহিত হতে থাকে মধ্য ও উত্তর-পূর্ব এশিয়া থেকে তাতাররা এসে যখন রাশিয়ার ছড়িয়ে পড়ে বিশৃঙ্খল ভাবে দেশের বিভিন্ন অংশ জয় করতে থাকে এবং এই ভাবে জয় করতে করতে ইউরোপীয় রাশিয়ার একটি বৃহৎ অংশে নিজস্বের আধিপত্য বিস্তার করে সেই সময় দন অঞ্চলে বসবাসকারী স্বাধীন জনগোষ্ঠী ছাড়া আর কোথাও কেউ তাদের গতিরোধ করতে সক্ষম হয় নি একমাত্র তারাই নিজস্বের স্বাধীন সত্তা বজায় রাখতে পেরেছিল তাই তাতাররাও এসেই বলত স্বাধীন জনসমষ্টি - 'কসাক'।

সেই সময় দনের স্তপভূমি ছিল জনবসতিহীন এলাকা - বন্য প্রান্তর। যাবতীয়দের হামলা থেকে নিরস্তুর আত্মরক্ষা করার একান্ত প্রয়োজন দেখা দেওয়ায় কসাকরা একটি গোষ্ঠীতে সম্মিলিত হল তারা নিজস্বের নেতা (আতামান) নির্বাচন করল গড়ে তুলল এক ধরনের আধা সামরিক জীবনযাত্রা। পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়াংশে দনের নিম্ন ও মধ্য অববাহিকায় কসাক জনগোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটল। এই ভাবে গোষ্ঠীমতর ও সুনিখ্যাত কসাক ফৌজের দন কসাকদের পূর্বপুরুষদের আবির্ভাব ঘটল। দন কসাক জনগোষ্ঠীই ইতিহাস পাঁচ শ' বছরের পুরনো গৌরবমণ্ডিত, নাটকীয় ও ট্রাজিক ঘটনায় পরিপূর্ণ সেই ইতিহাসের উজ্জ্বল প্রতিকলন ঘটেছে বিভিন্ন লোককথায় তার বর্ণনা আছে সাহিত্যে, তা নিয়ে বহু বৈজ্ঞানিক গবেষণাও হয়েছে।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে শুরু করে সপ্তদশ শতাব্দীর সূচনা পর্যন্ত নীপারের নিম্ন অববাহিকা, দন ও ভোলগার তীরে বসতিস্থাপনকারী কসাক জনগোষ্ঠী রাশিয়ার কেন্দ্রীয় সরকার বা প্রতিবেশী সামন্তরাজাদের শাসনাধীন ছিল না কৃষাধীদের অধীনে বেগাব খাটা তাদের দুর্বিবহ অত্যাচার ও সামন্ততান্ত্রিক শোষণ - এসবের হাত থেকে উদ্ধারলাভের আশায় যে-সমস্ত মানুষ দেশের উপকণ্ঠবর্তী অঞ্চলগুলিতে স্বাধীন জীবনের সন্ধান করে, যারা পলাতক ভূমিদাস, ধুখাত তাদের নিয়েই গড়ে উঠতে থাকে কসাক জনবসতি। তাদের স্বাধীনতাপ্রিয় মনোভাব ও যাবতীয় বাধ্যবাধকতার প্রতি সহজাত বিরূপতা থেকে কসাক জেলাগুলিতে গড়ে উঠল এক মৌলিক সংগঠন - এই সমাজে সামরিক ও অসামরিক সেভারা গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত হত, এখানে ধরাবাঁধা কোন কেন্দ্রীয় শাসন থাকত না দনের তীরে দন-কসাক, নীপার তীরে নীপার-কসাক, উত্তর

ককেশাসে গ্রেনেন-কসাক এবং উরালে ও সাইবেরিয়ায় অন্যান্য কসাকগোষ্ঠী রাশিয়ার উপকণ্ঠবর্তী অঞ্চলগুলিতে, কোথানে যেখানে এ ধরনের জনসম্প্রদায় গড়ে উঠেছে, সেখানেই দেখা দিয়েছে এ ধরনের সমাজবাবস্থা। নীপার-কসাকদের জীবনযাত্রার বর্ণনা পাওয়া যাবে গোণালের বিখ্যাত 'তারাস বুলবা' উপন্যাসে।

গোড়ার দিকে সব কসাকই সমান বলে গণ্য হত। কিন্তু কালক্রমে খাস কসাকদের মধ্যেও দুটি শ্রেণী সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল সামাজিক বৈষম্য অতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল তাদের মধ্যে। দেখতে দেখতে ধনী 'গৃহস্থ' কসাকরা তাদেরই ভাই-বন্ধু দরিদ্র কসাক জনসাধারণের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে শুরু করল। 'গৃহস্থ' কসাকদের এই সামাজিক স্তর বিশেষ ভারী ছিল দনের ভাটি এলাকায় 'প্রশান্ত দন' উপন্যাসের একাধিক স্থলে দনের উজান এলাকার ও ভাটি এলাকার কসাকদের মধ্যে যে প্রভেদ আছে তার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধের ডামাডোলে কেন্দ্রীয় সরকারের অপ্রতৃত অবস্থার সুযোগ নিয়ে উচ্চশ্রেণীর 'গৃহস্থ' কসাকরা চাইল স্বাধীন কসাক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু নিম্ন বা সাধারণ শ্রেণীর কসাকরা তার বিরোধিতা করল। তারা তাদের তিক্ত অভিজ্ঞতাব মধ্য দিয়ে বুঝতে পেরেছিল সামগ্রিক ভাবে দেশের মুক্তি ভিন্ন তাদের মুক্তি সম্ভব নয়। তাই এক দিকে যুদ্ধের পরিবেশ এবং অন্যদিকে দেশের অভ্যন্তরে ব্যাপক বিপ্লবের তোড়জোড় এই দুই বিপরীতমুখী প্রত্যয়ের আবারে কসাকসম্প্রদায় দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ল। এক শ্রেণীর প্রচেষ্টা জারের রাজত্ব কায়েম করা নয়ত স্বাধীন কসাক রাজ্য প্রতিষ্ঠা। কিন্তু আরেক শ্রেণী যেমন জারকে চায় না তেমনি স্বাধীন কসাকরাজ্যও চায় না। তারা চায় বৃহৎ রাশিয়ার মধ্যে নিজেদের উপযুক্ত স্থান। এরা বিপ্লবী বলশেভিকবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ল। তারই ফলে কসাক ভূমিতে ছড়িয়ে পড়ল গৃহযুদ্ধের দাবানল। এই গৃহযুদ্ধের চিত্র আছে শোলখভের উপন্যাসে।

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাশিয়ায় যে সমস্ত কৃষক অভ্যুত্থান ও কৃষক যুদ্ধ সংঘটিত হয় তাতে দন-কসাকদের অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সময়কার কৃষক বিদ্রোহের দুই নেতা স্তেপান রাজিন ও কস্মাতি বুল্যাজিন ছিলেন দন-কসাক বংশোদ্ভূত। কসাক বিদ্রোহের দুঃসাহসিক কীর্তিকলাপ দন কসাকদের স্মৃতিতে চিহ্ন জাগরুক থাকে, তাদের লোকগীতি, কিংবদন্তী ও উপকথায় বৃণায়িত হয়ে বিশেষ শতাব্দী পর্বন্ত বংশপরম্পরায় তাদের জনমানসে সঞ্চারিত হতে থাকে 'প্রশান্ত দন' উপন্যাসে এরকম বহু লোকগীতিব উল্লেখ আছে। সেগুলির কয়েকটি বহু প্রাচীন, কয়েক শতাব্দীর পুরনো।

এক সময় কিন্তু জার সরকার কসাক জনবসতিগুলিকে নিজের প্রভাবাধীনে নিয়ে এসেছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে কসাক জনগোষ্ঠী এক বিশেষ ধরনের একাধারে

সামরিক বেতনভোগী ও কৃষিকর্মী, সামাজিক শ্রেণীতে পরিণত হতে থাকে তারা নিম্নমিত পর্যায়ের বাধ্যতামূলক সামরিক চাকরীর অন্তর্ভুক্ত হতে লাগল, তার বদলে নির্দিষ্ট বেতন, খাদ্যদ্রব্য, অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি পেতে লাগল। আদিত্যে এই যোদ্ধাশ্রেণীর প্রধান কর্তব্য ছিল দেশের সীমান্ত রক্ষা করা। পরে ধীরে ধীরে নানা রকম আইনকানুন বিধিনিষেধের চাপও এসে পড়তে লাগল তাদের ওপর তাদের ব্যয়স্বত্বাশ্রয়ের অধিকার খর্ব হতে থাকে এখন তাদের নিজেদের নির্বাচিত আত্মাশ্রয়ের বদলে জারের নিযুক্ত কসাক-সর্দারই তাদের শাসন করতে লাগল। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে কসাকরা বৃশ সাম্রাজ্যের বিশেষ সুবিধাভোগী যোদ্ধাশ্রেণীতে পরিণত হল।

কসাকরা, বিশেষত দন-কসাকরা ব্যাপকভাবে সাধারণ চাষী হলেও প্রাচীনতম এবং সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কসাক যৌদ্ধ শিখরে অন্যান্য বর্ণের চাষী ও মজুরদের চেয়ে নিজেদের বড় বলে মনে করত। কসাকদের এই শ্রেণীগত অহঙ্কার কসাক ভূমিতে থেকেও যারা কসাক মর্যাদার অধিকারী হয় নি সেই সব 'বহিরাগত চাষী', প্রতিবেশী খারকভ ও ইয়েকাতেরিনোভ্লাড প্রদেশ থেকে আগত ইউক্রেনীয় 'খোটিন' আর বৃহত্তর রাশিয়ার বৃশ 'চাষাভূষণ'দের প্রতি কসাকদের অবজ্ঞা এমনকি প্রবল ভূমির বিশদ ও বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হয়েছে প্রলাভ দন' উপন্যাসে।

উপন্যাসের ঘটনাস্থল অনেক সময় কুবানে স্থানান্তরিত হয়েছে, তাই কুবানের কসাকদের সম্পর্কেও দু'একটি কথা উল্লেখ করতে হয়। এরা দুটো শ্রেণীতে বিভক্ত এক দল দন-কসাকদের বংশধর 'লাইনের কসাক' নামে পরিচিত ১৭৭৭-১৭৮১ সালে দন-কসাকদের এই দলটি তাদের বসতি উঠিয়ে কুবান নদীতীরের প্রতিরক্ষালাইনে বসবাস করতে থাকে, তাইতে তাদের এই নাম অন্য দলটি 'কৃষ্ণসাগরীয়' নামে পরিচিত এরা নীপার-কসাকদের বংশধর নীপার কসাকদের সেনাবাহিনী উঠে যাবার পর অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে শেষে তারা এখানে এসে বসবাস করতে থাকে। বিপ্লবের সময় পর্যন্ত 'কৃষ্ণসাগরীয়দের' মধ্যে কিছু কিছু ইউক্রেনীয় নীতিনীতি ও আচার-আচরণ বজায় ছিল দন অঞ্চলের কুবান কুবানে কসাক আর স্থানীয় অ-কসাক সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক বিভেদ অনেক বেশি তীব্র ছিল কুবান কসাক সেনাপ্রদেশের রাজধানী ইয়েকাতেরিনোভ্লাড (বর্তমানে টাঙ্গোদার) ১৭৯৪ সালে 'কৃষ্ণসাগরীয়রা' প্রতিষ্ঠা করে

জারের প্রতি 'আনুগত্যের' পুরস্কারস্বরূপ কসাকরা যে সমস্ত সুযোগসুবিধা ভোগ করত নীতিভিত্তিক বৃশ কৃষক সম্প্রদায়ের আর ফাঁদও ভাগে তা জুটত না। এমনকি কসাক ভূমিতে বসবাসকারী অ-কসাকরাও তার অধিকারী বলে গণ্য হত না। কসাকমাত্র নানা রকম সরকারী কর থেকে অব্যাহতি পেত, ৭০ একর পর্যন্ত জমি

ভোগের চিরস্থায়ী স্বপ্ন পেত অপর পক্ষে বহু বাধাবাধকতাও তার ছিল বিশেষ আকার ও মানের নিজস্ব ঘোড়া, নিজস্ব তরবারি, সাজসরঞ্জাম ও উদ্দি নিয়ে তাকে সেনাবাহিনীর কাজে যোগ দিতে যেতে হত (বাড়ি ছাড়ার পর এই ব্যাপারে গ্রিগোরির যে সমস্যা দেখা দিয়েছিল প্রসঙ্গত তা স্বরণ করা যেতে পারে)। যে কোন কসাককে ১৮ থেকে ৩৬ বছর বয়স পর্যন্ত সেনাবাহিনীতে চাকরি করতে হত এই মেয়াদ আবার কতকগুলি পর্বে বিভক্ত ছিল (উপন্যাসের পাদটীকা দ্রঃ) প্রথম বছর তাকে শিবিরে তালিম নিতে হত, তার পর শুরু হত পুরোদস্তুর ফৌজের চাকরীর বিভিন্ন পর্যায় কসাক বাহিনীতে ঘোড়সওয়ার ইউনিট ছাড়া পদাতিক সৈন্যও থাকত চারটি টুপ নিয়ে হত কসাক ঘোড়সওয়ারবন্দের একটা স্কোয়াড্রন, প্রতিটি টুপ ছিল দুটি অংশে বিভক্ত, পেরো আর গ্রিগোরি তাদের সামরিক কর্মজীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে টুপ, স্কোয়াড্রন ও রেজিমেন্ট (চার অথবা পাঁচটা স্কোয়াড্রনের সমষ্টি, পরিচালনা করেছে একটি কসাক-ব্রিগেডে থাকত দুটো থেকে তিনটে রেজিমেন্ট)।

কসাকদের নিয়ে রাশিয়ার অনেকেই একাধিক কাহিনী রচনা করেছেন। শোলখভের অনেক আগে গোগল লিখেছেন ‘তারাস বুলবা’ তলস্তয় লিখেছেন ‘কসাক’ কিন্তু শোলখভ কসাকদের নিয়ে সাহিত্য রচনা করে যেমন অমরত্ব অর্জন করেছেন অতটা সাফল্য লাভ আর কেউই করেন নি এমনকি তলস্তয়ও নন

১৯১২ সালের মে মাস থেকে ১৯২২ সালের মার্চ মাস-মোট এই দশ বছর সময়সীমায় মধ্যে উপন্যাসের ঘটনাবলী সংঘটিত সাধারণ ভাবে ইতিহাসের বিচারে নিতান্তই অল্প সময় কিন্তু রাশিয়ার ইতিহাসে এই দশটি বছর বিপুল তাৎপর্যপূর্ণ বহু ঘটনাসঙ্কুল ১৯১২-১৯১৪ সালে শ্রমিক আন্দোলনের জোয়ার, ভবিষ্যৎ বিশ্বের অগ্রদূতরূপে নানা জায়গায় বড় বড় ধর্মঘট, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, তার ফলে ইউরোপের, বিশেষত জারের রাশিয়ার ভিত্তে ভাঙনসৃষ্টি, ১৯১৭ সালের মার্চ মাসে স্বৈরতন্ত্রের উৎখাত বলশেভিকদের সংগ্রাম, অক্টোবর মহাবিশ্লব, রিগা থেকে কামচাতকা পর্যন্ত বিশাল দেশের সর্বব্যাপী অভূতপূর্ব এক গৃহযুদ্ধের লেলিহান শিখা বিস্তার, বিদেশী হস্তক্ষেপ সোভিয়েত রাশিয়াকে ঋণবিহীন করার প্রয়াস, হস্তক্ষেপকারীদের শোচনীয় পরাজয় সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিজয় ও নবজীবন গঠনের সূচনা লেনিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত সরকারের কার্যকলাপ এত ঘটনাবহুল, নাটকীয়তায় পরিপূর্ণ আর কোন দশক মানবজাতির ইতিহাসে কখনও আসে নি

ইতিহাসের এক পরম সজ্জিলয়ে সমগ্র জাতিমানসের আলোড়নের পটভূমিকায় লেখক তাঁর জ্ঞানস্থানের মানুষদের কঠিন ভাগ্যবিপর্যয় ও উত্থান-পতনের কাহিনী বিবৃত করেছেন, সেই কাহিনীর আলোকে প্রকাশ করেছেন মানুষের চিরস্থান

আত্মজিজ্ঞাসা, মানবচরিত্রের শাস্ত্র রূপ উপন্যাসটি এক দিক থেকে যেন কসাক জীবনের জ্ঞানকোষ কবাকদের রীতিনীতি, সামাজিক আচাৰ-আচরণ, তাদের গীতি, শাস্ত্রের সময় তাদের জীবনযাত্রা, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তাদের যোগদান, ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লব সম্পর্কে তাদের প্রতিক্রিয়া এবং পরবর্তী ঘটনাবলী এতে স্থান পেয়েছে।

উপন্যাসে উল্লিখিত সমস্ত শহর, জেলা, পল্লী এবং অঞ্চল সম্পূর্ণ বাস্তব একটিও লেখকের স্বকপোলকল্পিত নয়। উপন্যাসে যে ভিওশেনস্কায়া জেলা সদরের উল্লেখ আছে তারই অঙ্কুশপাতী এক পল্লীতে শোলখভের জন্ম। উপন্যাসের নায়ক-নায়িকারা কাল্পনিক হলেও তাদের অনেকেরই আদর্শ কোন না কোন বাস্তব চরিত্র, বহু বাস্তব ঘটনা তাদের জীবনকে প্রামাণিক করে তুলেছে। কর্নিলভ, কালোদিন, ক্রাসনোভ, ক্রিমভ, দেনিকিন, ফিটসবেলাউরভ ও লুকোমস্কির মতো ঐতিহাসিক চরিত্র ও তাদের কার্যকলাপের বস্তুনিষ্ঠ উল্লেখ আছে। পদতিওলকভ, ক্রিডশলিকভ, স্তাভেনকো, লাগুতিন এবং আরও অনেক বিপ্লবী চরিত্রও এখানে স্বনামে উল্লিখিত।

উপন্যাসের সূচনা পর্ব থেকে ১৯১৮ সালের পয়লা ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহ মূলের অনুসরণে পুরনো বৃশ পঞ্জিকা অনুযায়ী উল্লেখ করা হয়েছে। (১৯১৮ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারী থেকে রাশিয়ায় নতুন পঞ্জিকা গৃহীত হয়। লেখক যেখান থেকে নতুন পঞ্জিকার অনুসরণ করেছেন পাদটীকার তার উল্লেখ আছে।) পাঠকদের কথা মনে রেখে অনুবাদটিকে সঠিক করা হয়েছে। গ্রন্থের পাঠকগণুলি আশা করি বহু ঘটনা ও বিষয়ের উপর আলোকপাত করবে। উপন্যাসের বিশালতা, অনভ্যস্ত বৃশ নাম ও পাত্রপাত্রীর ভিড়ে পাঠক যাতে বিশেষত্ব হয়ে না পড়েন সেই দিকে লক্ষ্য রেখে সূচনায় পাত্রপাত্রী পরিচয় সংযোজিত হয়েছে। বৃশ নাম ও শব্দের বানানে মোটামুটি বৈজ্ঞানিক নিয়ম মেনে চলার চেষ্টা করা হয়েছে। হুবহু প্রতিবর্ণীকরণ সর্বত্র সম্ভব হয় নি।

বে-কোন বৃশ লেখকের মতো শোলখভও ক্ষেত্রবিশেষে পাত্রপাত্রীদের মূল নামের অপভ্রংশ রূপ ব্যবহার করেছেন। এগুলি সচরাচর ডাকনাম। পাঠক যাতে এবংবিধ প্রয়োগের তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে আমরা মূলের সে সমস্ত প্রয়োগ যত দূর সম্ভব বক্ষা করেছি। 'গ্রিশ্কা' হল গ্রিগোরির সংক্ষিপ্ত রূপ, 'গ্রিশা' তার আরও একটি রূপ - তবে তুলনায় বেশি আদরার্থক। 'মিশ্কা' 'গ্রিখাইল'-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। শোলখভ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মিখাইল কশেভয়কে 'মিশ্কা' বলে বর্ণনা করেছেন। 'দুনিয়াশ্কা' বা 'দুনিয়াশা' ইয়োভনোকিয়ার সংক্ষিপ্ত রূপ। মেলেখভদের ছোট মেয়ে অনেক সময় 'দুনিয়া' নামেও উল্লিখিত। গ্রিগোরির বা তার নামের মধ্যভাগ অর্থাৎ পিতৃনাম 'ইলিনিচনা' নামে পরিচিত গ্রিগোরির মার আসল নাম ডাসিলিসা ইলিনিচনা। কিন্তু উপন্যাসের প্রায় সর্বত্র সে তার



নামের মধ্যভাগ অর্থাৎ পিতৃনাম ইলিনিচনা নামে পরিচিত। দেশগ্রামে বর্ষিয়সীরা এই ভাবে সচরাচর পিতৃনামেই সম্বোধিত - অবশ্য আনুষ্ঠানিক কথাবার্তার সময় মধ্যবয়স্ক লোকজন অনেক সময় তাদের প্রথম নামের সঙ্গে পিতৃনাম যোগ করেও উল্লিখিত হতে পারে গ্রিগোরির বাবার বেলায় শোলখভ এই রূপটি রক্ষা করেছেন উপন্যাসে বরাবর পাণ্ডুলেই প্রকোফিয়েভিচ বলে তার উল্লেখ দেখা যায়।

মূলে যেখানে স্থানীয় উপভাষার প্রয়োগ আছে অনুবাদেও আমরা সেই রীতি অনুসরণ করেছি বিভিন্ন উদ্ধৃতি, সংবাদপত্র ও ঘোষণাপত্রের ভাষায় সাধুবীতির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে 'আতামান' ক্লাসীয় স্থানীয় দু' একটা শব্দ ব্যবহার করতে হয়েছে। তবে অধিকাংশ স্থলে স্থানীয় পরিভাষা বর্জন করে কাছাকাছি পরিচিত বাংলা শব্দ ব্যবহার করেছি, অনেক সময় উপযুক্ত বাংলা পরিভাষার অভাবে ব্যাখ্যানেরও আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছে মূল উদ্দেশ্য ভাষার স্বাভাবিকতা বজায় রাখা

'সোভিয়েত' শব্দটির প্রসঙ্গে এখানে বলে রাখা ভালো। 'সোভিয়েত' কথার অর্থ পরিষদ বিপ্লবের আগে যে-সমস্ত সোভিয়েত ছিল সেগুলির ক্ষেত্রে অনুবাদ পরিষদ করা হয়েছে অন্যত্র সোভিয়েত-ই রাখা হয়েছে কমরেড (বুশ ভাষায় 'তভারিচ্') সম্বোধনের প্রয়োগ নিয়েও সন্দেহ জাগতে পারে এখানে মনে রাখতে হবে গৃহযুদ্ধের সময় কসাক কৌজীদের মধ্যেও এর চল হয়েছিল।

উপন্যাসে নিসর্গবর্ণনার অনেক অংশ আমাদের পাঠকদের কাছে সুবোধ্য ঠেকতে পারে বিশেষত শীতের বর্ণনা রাশিয়ার এই শীতের সঙ্গে আমাদের পরিচয় নেই বরফের বা তুষারের, তুষারপাতের এবং তুষারাবৃত প্রকৃতির যে কত বিভিন্ন রূপ হতে পারে সে ধারণা আমাদের অনেকেরই নেই অথচ উপন্যাসের বিভিন্ন স্থানে তার বিস্তারিত বর্ণনা আছে। শীতকালে অনেক সময় নদ নদী জমে বরফ হয়ে যায় উপন্যাসে বরফের ওপর দিয়ে পায়ে হেঁটে বা স্নেজে করে দল পার হওয়ার একাধিক প্রসঙ্গ আছে এখানে ঋতু পর্যায়ও অন্য রকম ঋতু মূলত চারটি শীত (ডিসেম্বর, জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী), বসন্ত (মার্চ, এপ্রিল, মে), গ্রীষ্ম (জুন, জুলাই, আগস্ট) ও শরৎ (সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর) তাও আবার শরতের শেষ ভাগ এবং বসন্তের প্রথম ভাগও অনেকখানি শীতের কবলস্থ তখনও বরফ পড়ে। বসন্তের প্রথম পর্বে শীতের বরফ গলতে থাকে, তখন চতুর্দিকে জলের প্রাবল, নদ-নদীতে বানের উচ্ছ্বাস এ যেন আমাদের বর্ষার বান এই সময়টা তাই এখানে চাষবাসের সময় গ্রীষ্মের শেষে বা শরতের প্রথমে ফসল ঘরে তোলা হয় বুশ দেশের শরৎকালের সঙ্গে আমাদের শরৎকালের বিশেষ কোন মিল নেই যদিও এখানে শরৎকালকে সোনালি শরৎ বলা হয়, তবে সে

আমাদের শরতের সোনাখলা বোদ আর সোনালি আকাশের জন্য নয় সোনালি পাতা ঝরার জন্য। শরৎকাল পাতা ঝরার কাল। দু’-এক পশলা বর্ষণ অবশ্য এখানেও শরৎকালে হয় কিছু তাতে থাকে হিমের পূর্বাভাস। ‘Late autumn’ কে ববং অনেকটা হেমন্ত বলে ধরা যেতে পারে

ক্ষেত্রবিশেষে সন্ধ্যার বর্ণনাগুলি অস্বাভাবিক দীর্ঘ মনে হতে পারে এসব অঞ্চলে গ্রীষ্মকালের পশ্চিমাকাশে গোখলির বেশ যে কত দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে তা আমরা যাবতীয়ই আনতে পারি না।

অনুবাদপ্রসঙ্গে আরও একটি তথ্য উল্লেখযোগ্য। শোলখভ নিজে একাধিকবার তাঁর এই উপন্যাসের পরিমার্জন ও পরিবর্তন সাধন করেছেন। একটি সংস্করণে তিনি উপন্যাসের অপেক্ষাকৃত প্রকৃতিধর্মী দৃশ্যগুলিকে বর্জন করেছিলেন এবং ভাষার প্রকৃতিনিষ্ঠ বর্ণনাপেও অনেকটা ঘসামাজ্য করে উঠিয়ে দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে উপন্যাসটিকে তিনি প্রায় তার আদিরূপে ফিরিয়ে আনেন। তবে ১৯১৬ সালে ফ্রাঙ্ক বুনচুক আর তার সঙ্গী-অফিসারদের মধ্যে তর্কবিতর্কেব একটা অংশ অথবা বুনচুক ও আদার খনিষ্ঠ জীবনযাত্রার নাস্তিদীর্ঘ অধ্যায় (উপন্যাসের প্রায় ছয় পৃষ্ঠাব্যাপী), প্রতিবিপ্লবীদের এলাকার ভিতর দিয়ে যাবার পরিকল্পনা নেওয়ার সময় পদতিওলকভের প্রণয়িনী জিনা প্রসঙ্গে ক্রিডশলিকভের কটুক্তি ও পদতিওলকভের সঙ্গে তাই নিয়ে ক্রিডশলিকভের ছোটখাটো বচসা এবং লিড্তনিংকির ভূতা ভেনইয়ামিনের প্রভুকর্ডুক চর্বিত খাদ গ্রহণের অভ্যাস এই ধরনের কয়েকটি বর্ণনা শোলখভ আর পুনঃস্থাপন করেন নি। বর্তমান বাংলা অনুবাদে সে সবই সন্নিবিষ্ট হয়েছে

## উপন্যাসের চরিত্র-পরিচয়

### মেলেক্‌থ জঁ পরিবার

পাণ্ডুলেই প্রকোফিয়েভিচ মেলেক্‌থ জঁনৈক কসাক  
ভাসিলিসা ইলিনিচনা। পাণ্ডুলেইয়েব স্ত্রী।  
'পেত্রো'। ভালো নাম পিওত্‌র পাণ্ডুলেয়েভিচ মেলেক্‌থ পাণ্ডুলেই  
মেলেক্‌থের বড় ছেলে  
'গ্রিশা' বা 'গ্রিশ্কা'। ভালো নাম গ্রিগোরি পাণ্ডুলেয়েভিচ মেলেক্‌থ।  
পাণ্ডুলেই মেলেক্‌থের ছোট ছেলে।  
'দুনিয়া' 'দুনিয়াশা' বা 'দুনিয়াশ্কা' ভালো নাম ইয়েভদোকিয়া  
পাণ্ডুলেয়েভনা মেলেক্‌থ পাণ্ডুলেই মেলেক্‌থের মেয়ে  
'দাশা' বা 'দাশ্কা' ভালো নাম দারিয়া পেত্রোর স্ত্রী।

### আন্তাখভ পরিবার

স্তেপান আন্তাখভ জঁনৈক কসাক  
আগ্নিনিয়া। স্তেপানের স্ত্রী

### কোরশুনভ পরিবার

গ্রিশ্কা কোরশুনভ জঁনৈক বৃদ্ধ কসাক  
মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ কোবশুনভ গ্রিশ্কার ছেলে।  
মারিয়া লুকিনিচনা মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচের স্ত্রী  
দমিত্ৰি কোরশুনভ ডাকনাম 'মিত্ৰিয়া' বা 'মিত্কা'। মিরোন গ্রিগো-  
রিয়েভিচের ছেলে  
নাতালিয়া মিরোনভনা। ডাকনাম 'নাতাশা' মিরোনের মেয়ে  
মারিশ্কা ও গ্রিশ্কা (ভালো নাম 'আগ্রিপিনা', নাতালিয়ার ছোট  
দুই বোন

## মোখড পরিবার

সেগেই প্রাতেনভিচ মোখড। জনৈক বাবসায়ী ও কারখানা-মালিক  
ইয়েলিজাভেভা মোখডা। ডাকনাম 'লিজা' মোখডের মেয়ে  
ভলাদিমির। মোখডের ছেলে।

আগ্না লিজা ও ভলাদিমিরের বিমাতা

## লিন্তনিৎকি :

নিকলাই আলেস্কেয়েভিচ। জনৈক জমিদার ও অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল।  
ইয়েভ্গেনি নিকলায়েভিচ নিকলাই লিন্তনিৎকির ছেলে। আর্মি-  
অফিসার।

## ভাতারস্কি গ্রামের অন্যান্য লোকজন

মিখাইল কশেভয়। ডাকনাম 'মিশা' বা 'মিশকা' গ্রিগোরির বন্ধু।  
মাসুত্কা বা 'মাশা' কশেভায়া মিশার বোন।

ভোবিন ব্রিসানফ। ডাকনাম 'ব্রিস্তান' বা 'ব্রিস্তোনিয়া'। জনৈক কসাক  
তিন শামিল আলেস্কেই, মার্টিন, প্রোখর তিনজন কসাক ভাই।  
গ্রামের কুখ্যাত দুর্বৃত্ত।

ইভান আলেস্কেয়েভিচ কতলিয়ারোভ, গোলাম ও দাভিদকা মোখডের  
কাবখানার তিনজন কর্মী

আনিকেই বা আনিকুশকা। মেলেখভদের জনৈক প্রতিবেশী  
প্রোখর জিকভ। গ্রিগোরির রেজিমেন্টের বন্ধু।

ইয়োসিফ দাভিদভিচ স্টকমান জনৈক নবাগত ও বিপ্লবী।

## জর্জেট :

গারানজা। জনৈক ইউক্রেনীয় সৈনিক

ইলিয়া বুনচুক ১৯১৪ সালের জনৈক স্বৈচ্ছাসেবী সৈনিক পর-  
বর্তীকালে অফিসার ও বিপ্লবী

মেজর কালমিকোভ বুনচুকের রেজিমেন্টের জনৈক অফিসার।  
পরবর্তীকালে কর্নিলভ বড়যন্ত্রে যোগ দেয়।

আগ্না পগুদকো। বুনচুকের মেশিনগান-স্কোয়াডের জনৈক সৈনিক ও  
বিপ্লবী

উরিউপিন 'ইটিওয়ালা' গ্রিগোরির টুপের জনৈক কসাক

চুবোভ, মের্কুলাভ ও আডাশ্চিকভ। কসাক রেজিমেন্টের লেফটেনাণ্ট  
ইজ্জভারিন ও কাল্মিকোভ। কসাক রেজিমেন্টের মেজর  
আলেক্সেয়েভ ও কর্নিলভ জারের জেনারেল।

## বিপ্লবী চরিত্র

ফিওদর পদতিওলকভ। দন-সামরিক-বিপ্লবী কমিটির সভাপতি  
মিখাইল ত্রিডশ্চিকভ। কমিটির সম্পাদক  
ইভান লাগুতিন জনৈক কসাক উক্ত কমিটির সদস্য।  
গোলুবেভ। দন বিপ্লবী বাহিনীর ক্যাপ্টেন ও সংগঠক  
ইয়াকভ ইয়েফিমভিচ ফেয়িন। জনৈক ফেরারী সৈনিক বিদ্রোহে  
যোগ দেয়



মোদের সাধের গরীয়সী ভূমি নয় তো লাঙলে চষা  
 ঘোড়াদের খর চবে যায় হাল সে ভূমির বুক চিরে।  
 সাধের সে ভূমে ফসলের বীজ ছড়ানো কসাক-শিরে,  
 প্রশান্ত দন লড়েছে ভূষণ পতিহারী যুবতীরে,  
 আমাদের পিতা দন থলথল অনাথ শিশুর ভিড়ে,  
 কত বাপ-মার নয়নের জলে  
 অপবুণ এই প্রশান্ত দনে ঢেউ খেলে ধীরে ধীরে।

ওগো পিতা ভূমি, ওগো প্রশান্ত দন।  
 প্রশান্ত ভূমি, তবু কেন এত জল ঘোলা করে বও ?  
 'প্রশান্ত আমি দন, কেন তবু জল ঘোলা করে বই ?  
 প্রশান্ত যম তলদেশ হতে হিমেদ ফস্তু বহে,  
 প্রশান্ত সোর বৃকের মাঝারে সাদা মাছ ঘাই মারে।

প্রাচীন কসাক গীতি

## প্রথম পর্ব

### এক

গ্রামের একেবারে শেষপ্রান্তে মেলেখভদের খামার-বাড়ি। গোয়ালের ফটক খুললেই উত্তরে দন সবুজ ছাতা-পড়া খড়িপাথরের গগুশৈলের মাঝখানে হাত চল্লিশেক খাড়া ঢালু জমি তারপবেই নদীর পার মুক্তের মতো রাশীকৃত ঝিনুকের খোলা, তরসের চূষনতাড়নায় কানা-ভাঙা ছাই রঙা নুড়িপাথর আর তারপর দনের ইশাত-নীল তরঙ্গরাশি বাতাসের আন্দোলনে উচ্ছ্বসিত পূর্বে, ডালপালার বেড়ায় ঘেরা মাড়াইয়ের উঠোন ছাড়িয়ে চলে গেছে হেট্‌মান-সড়ক\* সোমরাজগুপ্তের ঘূসর আডা পখিপার্শ্বে ঘূসর-বাদামী রঙের চোটাল পাতাগুয়াল শক্ত ধাঁচের পাছ ঘোড়ার খুবে মাড়ানো, রাস্তা যেখানে দু'মুখে চলে গেছে তার মোড়ে একটা ছোটখাটো ভজনালয় তারও পরে চঞ্চল মরীচিকায় ছাওয়া স্তম্ভের প্রান্তর, পশ্চিমে এক সার খড়িমাটির পাহাড় পশ্চিমে বাস্তাটা বারোয়ারি-তলার ভেতর দিয়ে উধাও হয়ে গেছে নদীকূলবর্তী এক বিস্তীর্ণ তৃণপ্রান্তবে

তুর্কীদের বিরুদ্ধে শেষ অভিযানের অব্যবহিত আগের অভিযানের সময় কসাক একেবারে মেলেখভ গ্রামে ফিরে আসে। তুরক দেশ থেকে সে সঙ্গে করে আনে মনুন বৌ আপাদমস্তক শালে জড়ানো ছোটখাটো চেহাবাব একটি মেরেমানুষ খোঁট মুখ পুঁকিয়ে থাকত। কদাচিৎ তাব ব্যাকুল বন্য চোখদুটি দেখা যেত তার নামের ব্রেশমী শাল সুদূরের অজানা বাসে ভুরভুর করত শালের রামধনু-রঙা মন্বা চাষী মেয়েদের ঈর্ষার উদ্বেক করত বন্দিনী তুর্কী মেয়েটা একোফির আত্মীয়স্বজনদের এড়িয়ে চলতে লাগল কিছু দিনের মধ্যেই বুড়ো মেলেখভ ছেলের ভাগ বুঝিয়ে দিয়ে তাকে আলাদা কবে দিল কিন্তু অপমানের জ্বালা সে

---

\* পোল ভাবার শব্দ 'হেট্‌মান' জার্মান 'হাউস্টমান' মূল অর্থ 'প্রধান' কন্যাগুপ্ত ষা সামরিক শাসনকর্তা বলতে যা বোঝায় ইউক্রেনে কসাক সেনাপ্রধান ও আঞ্চলিক শাসনকর্তা। অনুঃ



কোন দিন তুলতে পারে নি, তাই ছেলের বাড়িতে জীবনে আর সে পা-ই দিল না।

প্রকোফি দেখতে দেখতে নিজের বসবাসের ব্যবস্থা করে নিল। ছুতোর-মিস্ত্রিবা গাছের ঝুড়ি কেটে ঘর তুলে দিল, নিজের হাতে সে গোয়ালের উঠানের বেড়া বাঁধল। শরৎকাল নাগাদ সে তার নতমুখী ভিনদেশী বৌকে এনে তুলল তার নতুন সংসারে। ঘর-সংসারের যাবতীয় জিনিস-বোঝাই গোবুর গাড়ির পেছন পেছন বৌকে নিয়ে যখন সে পায়ে হেঁটে গ্রামের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিল তখন গোটা গাঁ ভেঙে ছেলেবুড়ো সবাই তাদের দেখাব জন্য রাস্তার ভিড় করে এসে দাঁড়াল। কসাকরা দাড়ির আড়ালে মুখ টিপে হাসল। মেয়েরা এ ওকে ডাকাডাকি করে মস্তব্য শোনাতে লাগল। এক পাল কসাক ছেলেপুলে পিছন পিছন প্রকোফিকে টিটকিরি দিতে দিতে চলল। দেখলেই বোঝা যায় বহু দিন তাদের গায়ে জল পড়ে নি। কিন্তু প্রকোফির তাতে কোন শ্রুক্ষেপ নেই, তার গায়ের লম্বা কসাক-কোর্তার বোতাম খোলা। তামাটে হাতের মুঠোয় বৌয়ের পলকা হাতের কবজি চেপে ধরে কাপাস-সাদা ঝুটিওয়ালা মাথাটা উদ্ধত ভঙ্গিতে উঁচিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে সে - যেন একজন চাষা হেঁটে চলেছে সদ্য-হালচষা জমির ওপর দিয়ে। শুধু তার গালের হাড়ের নীচ দিকে একটা টিবি জেগে উঠে নড়াচড়া করছে, আর তার যে পাথুরে ভুবুজোড়া কোন সময় নড়াচড়া করে না সে দুটোর মাঝখানে জমে উঠেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

তারপর থেকে কদাচিৎ তাকে গ্রামের ভেতর দেখা যেত, এমনকি ময়দানে পঞ্চায়েতের সভায়ও সে দেখা দিত না। সবার থেকে আলাদা হয়ে দনের ধারে নির্জনে নিজের বাড়িতে সে বাস করত। গ্রামে লোকের মুখে মুখে তার সম্পর্কে অদ্ভুত অদ্ভুত গালগল্প রটে গিয়েছিল। যে সব রাখাল-ছেলে মাঠেঘাটে বাছুর চরিয়ে বেড়াত তারা নাকি দেখেছে সজেবেলায় যখন দিনের আলো নিভে আসে তখন প্রকোফি তার বৌকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে তাতার টিলায় চলে যায়। সেখানে টিলার মাথায় শত শত বছরের বড়-বাদলে ঝরে যাওয়া একটা সচ্ছিন্ন পাথরের দিকে বৌকে পিঠি করে বসিয়ে রেখে সে তার পাশে এসে বসে। তারপর দু'জনে মিলে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকে স্তম্ভ-প্রান্তরের দিকে। অমনি করেই তারা তাকিয়ে থাকে, যতক্ষণ না গোবুলির আলো নিভে যায়, তারপর প্রকোফি বৌকে নিজের মোটা বনাত কাপড়ের জাবুন-কোর্তায় জড়িয়ে কোলে করে বাড়ি বয়ে নিয়ে আসে। এ ধরনের অদ্ভুত আচরণের মাধ্যমণ্ড খুঁজে না পেয়ে গ্রামের লোকজন জল্পনায় মেতে উঠেছিল। মেয়ে-বৌদের সমস্ত কাজ মাধ্যম উঠল। নানা রকম গালগল্প চলত প্রকোফির বৌকে নিয়ে। একদল জোর গলায় বলত যে অমন রূপ এর আগে কেউ কখনও দেখে নি, কেউ আবার বলত

একবারে উলটো কথা। একবার মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে ডাকসাইটে মাভরা নামে এক স্বামী-সঙ্গছাড়া সেপাই-গিঁগি সাজা চাইবার অছিলায় প্রকোফির বাড়িতে থানা দিতে গোটা বাপারটার ফয়সালা হয়ে গেল প্রকোফি সাজা আনতে ডল-কুঠুরিতে ঢুকেছে, মাভরাও সেই কৌকে দেখে নিল প্রকোফির তুর্কী বোটারে অমন হতকুচ্ছিত আর দুটি হয় না।

কিছুক্ষণ বাদে মাভরাকে দেখা গেল একটা ছোট্ট গলির মধ্যে উত্তেজনার তার মুখ লাল হয়ে গেছে, মাথার ওড়না খসে পড়েছে এক পাশে - এক দঙ্গল মেয়ের সামনে দাঁড়িয়ে সে বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছে

‘আচ্ছা বল দেখি ওর মধ্যে লোকটা কী এমন খুঁজে পেল? যদি মেয়েমানুষ হত তাহলেও না হয় বুঝতাম, তা নয় ত না আছে পাজা না আছে পেট। লজ্জার কথা কী আর বলব। আমাদের ঝুঁড়িগুলো গায়ে-গতরে ওর চেয়ে বেশি মনে হয় ওর কাকালটাই বুঝি খসিয়ে নেওয়া যায় - ঠিক বোলতার মতো কালো চোখদুটো ইয়া বড় বড়, সেই চোখ মেলে যখন এদিক ওদিক চায় না, তখন মনে হয় যেন শয়তানে যা মারছে - হা ভগবান আমার ত মনে হয় বিয়োবারও সময় হয়ে এসেছে মাগীর মাইরি বলছি।’

‘বিয়োবার সময় হয়ে গেছে! বলিস কী মেয়েরা হাঁ হয়ে গেল

‘আমি ত আর কচি খুকীটি নই। নিজেই তিন তিনটেকে মানুষ করেছে।’

‘আচ্ছা, মুখখানা কেমন রে?’

‘মুখখানা? হলদে। চোখদুটো ম্যাডমেডে। বিদেশ বিভূয়ের জীবন ত আর তেমন মধুর নয়। আর হ্যাঁ, আরও বলি মেয়েরা, মাগী পরে বেড়ায় প্রকোফির সালোয়ার

‘বলিস কী।’ মেয়েরা সবাই সমস্বরে বলে উঠল ভয়ে-আতঙ্কে ওদের সকলের দমবন্ধ হওয়ার উপক্রম

‘নিজের চোখে দেখেছি সালোয়ার পরে ঘুরতে তবে দু’পাশে লাল ভেরা নেই। হয়ত প্রকোফির আটপৌরে সালোয়ারটা বাগিয়েছে গারে তার একটা লম্বা খুলের কমিজ, কমিজের তলায় সালোয়ার, সেটা আবার মোজার ভেতরে গোঁজা দেখেই ত আমার রক্ত হিম।’

কানে কানে গ্রামে চাওড় হয়ে গেল যে প্রকোফির বোটা একটা ডাইনি। আন্তাখভের ব্যাটার বৌ (আন্তাখভরাও থাকত গ্রামের এক গ্রাম্বে প্রকোফির পাশের বাড়িতে) দিবি গলে বলল যে উইটসনটাইড\* পরবের দ্বিতীয় দিনে

\* ইন্টার পার্বের পরবর্তী সপ্তম রবিবার থেকে এই খ্রীষ্টীয় পার্বের শুরূ এক সপ্তাহ ধরে চলে অনুঃ

ভোরের আলো ফোটার আগে সে স্পষ্ট দেখেছে প্রকোফির বৌ এলোচুলে, মাথায় কাপড় না দিয়ে, খালি পায়ে আস্তাখভদের গোয়ালে একটা গোরু দুইছে এর পর থেকে গোরুটার বাঁচ শুকিয়ে গেল, শুকোতে শুকোতে একটা কচি ছেলের হাতের মুঠোর সমান হয়ে গেল। দুখ দেওয়া বন্ধ করে দিল। কিছু দিন পরেই টেঁসে গেল।

সে বছর গোরু-বাছুরের পালে এক অভাবনীয় মড়ক দেখা দিল। দনের মুখের বালির চরের ওপর যে খোঁয়াড় ছিল সেখানে প্রতিদিন গোরু-বাছুরের মড়া জমে উঠতে লাগল। দেখতে দেখতে সে মড়ক ঘোড়াদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ল। কয়েকটা গ্রাম নিয়ে ঘোড়া চরাবার জন্য যে বিশেষ জায়গা ছিল সেখানে ঘোড়ার পাল ক্ষীণ হয়ে আসতে লাগল। আর তখনি অলিতে-গলিতে ছড়িয়ে পড়ল এক অলঙ্ঘন্য গুজব।

গ্রাম পঞ্চায়েতের সভা বসার পর সেখান থেকে কসাকরা এসে চড়াও হল প্রকোফির বাড়িতে। গৃহকর্তা দেউড়িতে বেরিয়ে এসে নীচু হয়ে সকলকে নমস্কার জানাল।

‘তারপর মাতব্বর মশাইরা কী মনে করে আপনাদের শুভাগমন?’

বোবার মতো স্তব্ধ জনতা কোন কথা না বলে দেউড়ির দিকে এগোতে লাগল।

ওদের মধ্যে এক বুড়ো একটু-আধটু টেনেছিল। শেষকালে সে-ই কথা বলল সে-ই প্রথম চৈঁচিয়ে উঠল।

‘তোমার ডাইনিটাকে বার করে আমাদের হাতে তুলে দে। আমরা ওর বিচার করব।’

প্রকোফি ছুটে বাড়ির ভেতরে যেতে গেল, কিন্তু লোকে দৌড়ে, বার-বারান্দায় দরজার কাছে তাকে ধরে আটকে দিল। দশাসই চেষ্টারার এক গোলন্দাজ বাইরের সকলে যাকে জাঁদবেল বলে ডাকে প্রকোফির মাথাটা দেয়ালে ঠুকে দিয়ে বলল, ‘চৈঁচিও না, টু শব্দটি নয়। ওতে কোন লাভ হবে না। বাপখন আমরা তোমাকে স্পর্শ করব না, কিন্তু তোমার মাগীটাকে ধৈঁতালে মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে যাব। গোরু-ঘোড়া ছাড়া গোটা গ্রামটা মরতে দেওয়ার চেয়ে ওকে শেষ করে দেওয়াই ভালো। টু শব্দটি করেছে কি তোমার মাথা ঠুকে দেয়াল ধসিয়ে ছাড়বে।’

‘কুন্তিটাকে টেনে বার করে আন উঠোনে।’ দেউড়ির দিক থেকে গর্জন উঠল।

প্রকোফিরই রেজিমেণ্টের একটা লোক এক হাতে তুর্কী মেয়েটার চুলের মুঠি চেপে ধরে, অন্য হাতে তার চিংকাররত মুখের হাঁ চাপা দিয়ে ঊর্ধ্বদ্বায়ে তাকে বার-বারান্দায় ওপর দিয়ে টেনে হিচড়ে বাইরে এনে জনতার পায়ের কাছে ছুঁড়ে ফেলে দিল। মস্ত কণ্ঠের গর্জন ভেদ করে শোনা গেল একটা তীক্ষ্ণ আতর্জন।

জনা ছয়েক কসাককে ধাক্কা মেরে হাট্টিয়ে দিয়ে প্রকোফি হুড়মুড় করে খাস ভেতরের বড় ঘরে ঢুকে পড়ল। ঘরের দেয়াল থেকে খুলে নিল একটা তলোয়ার।

কসাকরা খাড়াখাকি করে দুন্দাড় বারান্দা ছেড়ে বাইরে ছুটল। চকচকে তলোয়াবখানা মাথার ওপর বাঁই বাঁই করে ঘোরাতে ঘোরাতে প্রকোফিও বারান্দা ছেড়ে ছুটে নেমে এলো। জনতা শিউরে উঠল। উঠানে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল।

বিরট বশু নিয়ে গোলন্দাজ জাঁদরেলের পক্ষে ছোট্ট অত সহজ ছিল না তাই গোলাঘরের পাশেই প্রকোফি পৌঁছন থেকে তার নাখাল ধরে ফেন্সল আড়াআড়ি এক কোণে বাঁ কাঁধ থেকে তার কোমর পর্যন্ত চিরে ফেলে দিল। কসাকরা বেড়ার কক্কি-ধুটি উপড়ে হাতে তুলে নিচ্ছিল, কিন্তু এখন বেগতিক দেখে তারা মাড়াইয়ের জায়গা পেরিয়ে ছুড়িয়ে পড়ল স্তোপের ভেতরে।

আধঘণ্টা পরে জনতা যথেষ্ট সাহস সঞ্চয় করে ফের এগিয়ে গেল প্রকোফির বাড়ির উঠানের দিকে। ওদের মধ্যে দু'জন লোক সস্ত্রি-সুলুক জানার জন্য পা টিপে টিপে বার-বারদস্য গিয়ে উঠেছিল। রান্নাঘরের চৌকাঠের কাছটা রক্তে ভেসে যাচ্ছে, সেখানে মাথাটা বিদঘুটে ভাবে পৌঁছন হেলিয়ে পড়ে আছে প্রকোফির ঘোঁ। যন্ত্রণায় কাতর হয়ে সে দাঁত ঘিচোচ্ছে, দাঁতের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে কামড়ে ক্ষতবিক্ষত তার জিতটা। প্রকোফি মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে স্থির দৃষ্টি মেলে ভেড়ার চামড়ায় জড়াচ্ছে একটা মাংসপিণ্ড - টাটা করে কাঁদছে অসময়ে ভূমিষ্ট এক শিশু।

\* \* \*

প্রকোফির বৌ সেই দিনই সম্ম্যাবেলায় মারা গেল। অসময়ে ভূমিষ্ট শিশুটির ওপর প্রকোফির বুড়ি মার মারা হতে সেই তার ভার নিল। গরম-করা তুষের গুড়োয় ছুড়িয়ে রেখে ঘোড়ার দুধ খাইয়ে মাসখানেক বাদে যখন নিশ্চিন্ত হওয়া গেল যে ময়লারঙের, তুর্কীছাঁদের বাচ্চাটা বেঁচে যাবে, তখন গির্জায় নিয়ে গিয়ে খ্রীষ্টধর্ম অনুযায়ী তার নামকরণ করা হল। ঠাকুঁদার নামে তার নাম রাখা হল। পাশ্বেলেই সন্তান কারাদণ্ডের মেয়াদ শেষ করে বারো বছর পরে প্রকোফি বাড়ি ফিরল। কটা রঙের ছাঁটা দাড়ি, সেই দাড়িতে পাক ধরায় আর সাধারণ বুশ পোশাকে তাকে আদৌ কসাকের মতো দেখাচ্ছিল না মনে হচ্ছিল সে যেন ওদের সমাজের বাইরের কোন লোক ফিরে এসে সে ছেলের ডাব নিল। লেদহাল্লির কাজে লেগে গেল।

বড় হতে পাশ্বেলেইয়ের গায়ের রঙ হল ঘোর তামাটে, তার স্বভাব হয়ে উঠল দুর্দান্ত। মুখের আদলে আর দেহের নমনীয় গড়নে সে হল তার মায়ের মতো।

প্রকোফি ছেলের বিয়ে দিল। তাদেরই এক পড়শী কসাকের মেয়ের সঙ্গে

সেই থেকে তুর্কী-বস্ত্রের মিশাল চলতে লাগল কসাক-বস্ত্রের সঙ্গে এমন করে গ্রামে দেখা দিল বাঁকা-নাক, বনা ধাঁচের সুন্দর চেহারার মেলেখভ কসাক পরিবার লোকে যাদের নাম দিয়েছিল ‘তুর্কী’

বাপকে কবর দিয়ে আসার পর পাগ্গেলেই রীতিমতো জড়িয়ে পড়ল ঘরসংসারের কাজে নতুন করে ঘর ছাওয়ালা, খামার-বাড়ির সঙ্গে আরও বিঘাখানেক মেঠো জমি বাড়িয়ে নিল, নতুন চালানঘর তুলল আর তুলল টিনের ছাদ দেওয়া গোলাবাড়ি বাড়ির মালিকের মর্জি-অনুযায়ী ফেলে দেওয়া টুকরো-টাকরা থেকে একজোড়া টিনের মোরগ বানিয়ে ঘরামি গোলাবাড়ির ছাদের ওপর সে দুটোকে বসিয়ে দিল। মোরগদুটোর ভয়-ভাবনাহীন নিশ্চিন্ত চেহারা মেলেখভদেব খামার-বাড়ি আলো করে তুলল আশ্চর্য্যভূষ্টি ও সমৃদ্ধির ছাপ ফেলল তার ওপর

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাগ্গেলেই প্রকোফিয়েভিচ গাঁট্টাগোটা ধরনের হয়ে পড়তে লাগল, প্রস্বে বেড়ে গেল, সামান্য কঁজো হয়ে গেল, তবু তাকে দেখাত বলিষ্ঠ গড়নের বুড়োর মতো শরীরের হাড় তার শূন্যে রোগা গোছের পা খোঁড়া (যৌবনকালে রাজকীয় সৈন্য পরিদর্শনের সময় ঘোড়দৌড়ে পড়ে গিয়ে বাঁ পা ভাঙে), বাঁ কানে পরে আধখানা চাঁদের মতো বুপোর মাকড়ি। বুড়ো বয়স পর্যন্ত দাঁড়কাকের মতো কালো কুচকুচে চুল আর দাড়ির রঙ যেমনকার তেমনই হয়ে গেল। বেগে গেলে তার মাথার ঠিক থাকে না, তারই ফলে তার অমন মোটাসোটা বোঁটা যে এক কালে সুন্দরী ছিল, নিঃসন্দেহে বুড়িয়ে গেছে অসময়ে - এখন তার সুন্দর মুখখানা আগাগোড়া ছেয়ে গেছে বলিরেখার সুন্দ্র জালে

বড় ছেলে পেত্রো তার বিয়ে হয়ে গেছে দেখতে সে অনেকটা তার মায়ের মতো - ছোটখাটো গড়নের বড়ি-বসানো নাক, গমের মতো উজ্জ্বল রঙের একবাশ উদ্দাম চুল, খয়েরি রঙের চোখ। ছোট ভাই গ্রিগোরি কিছু দেখতে হয়েছে তার বাপের মতো মাথায় পেত্রোর চেয়ে আধ হাতখানেক লম্বা অথচ বয়সে তার চেয়ে ছয় বছরের ছোট বাপের মতোই বাজপাবির ঠোঁটের আকারের বাঁকা নাক, সেই রকমই ঈষৎ তেবছা কোটরে উত্তেজিত দুই পটলচেরা চোখের জ্বলজ্বলে নীলাভ তারা ঠিক তেমনি গোলাপী আভা; ধরা বাদামী রঙের টানটান চামড়ায় ঢাকা উঁচু উঁচু গালের হাড় বাপের মতোই গ্রিগোরিও কোলকঁজো এমন কি তাদের দু’জনের হাসিতেও মিল কেমন যেন একটা কন্য ভাব।

বাপের বড় আদরের মেয়ে কিশোরী দুনিয়াশ্কা, লম্বা লম্বা হাতদুটো বড় বড় চোখজোড়া, পেত্রোর বৌ দারিয়া আর তার কচি ছেলে গোটা মেলেখভ পরিবার বলতে হল এই।

ভোরের ছাই ছাই আকাশে এখানে ওখানে মিটিমিটি করছে দু' একটি তারা। মেঘের আড়াল থেকে হাওয়া বইছে দনের বৃকে যেন পেছনের দু'পায়ে ভর দিয়ে চলছে কুয়াসা, খড়ি-পাহাড়ের ঢালুর গায়ে আন্তরকণ বিছিয়ে দিয়ে ধূসরবর্ণের কণাবিহীন সাপের মতো বৃকে হেঁটে নেমে গেছে গিরিখাতের ভেতরে দনের বাঁ দীর, যেখানে নদী বেকে গেছে, বালুতট পেছনের জলা নলখাগড়ার দুর্ভেদ্য কাড়, শিশির ভেজা বনভূমি দাঁউ দাঁউ করছে ভোরের আলোর শীতল মোহম্পর্শে নিগন্তরালে সূর্য তখনও তার ক্রান্তি জেড়ে ওঠে নি

মেলেখভদের বাড়িতে সবার আগে ঘুম ভাঙল পাঙ্কলেই প্রকোফিয়েভিচের চোখে চোখে জুশচিকের নকশাকাটা জামার কলারে বোতাম আঁটতে আঁটতে নেউড়িতে বেরিয়ে এলো সে ঘাসে ঢাকা উঠানের গায়ে বুপোলী শিশির জমেছে। গোবু-বাছুরগুলোকে সে রান্নায় ছেড়ে দিল দারিয়া সেমিজ পরেই তার পাশ দিয়ে ছুটে গেল গোবু দুইতে। তার খালি পায়ের সাদা পেশিতে ছিটকে পড়তে লাগল দুখাল শিশির, চলার পথে মাড়িয়ে যাওয়া ঘাসের ওপর পড়ল ধোঁয়া-ধোঁয়া পায়ের ছাপ

পাঙ্কলেই প্রকোফিয়েভিচ একবার তাকিয়ে দেখল দারিয়ার পায়ের চাপে নুয়ে পড়া ঘাসগুলো আবার মাথা তুলছে, তারপর সে এসে ঢুকল ভেতরের ঘরে।

হাট-করা জানলার চৌকাঠের ওপর পাশের বাগানের একটা চেরি-গাছ ঝরিয়ে দিয়েছে মৃতপাতুর গোলাপী আভার ফুলের পাপড়ি গ্রিগোরি তার একটা হাত পিছনে ছড়িয়ে দিয়ে উপুড় হয়ে ঘুমোচ্ছিল

'মাছ ধরতে যাবি রে গ্রিশ্কা?'

'আঁ কী বলছ?' বিছানা থেকে একটা পা ঝুলিয়ে দিয়ে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল গ্রিগোরি।

'চল রে নৌকো নিয়ে বেরিয়ে পড়া যাক। ভোর না হওয়া পর্যন্ত বসে বসে মাছ ধরব '

গ্রিগোরি ফৌস করে একটা নিশ্বাস ছেড়ে আলনা থেকে আটপৌরে সালোয়ারটা টেনে নিয়ে পড়ে ফেলল সালোয়ারের পায় সাধা মোজার তলায় গুঁজল জুতোর পেছন দিকটা উলটে ভেতরে ঢুকে যাওয়ায় সেটাকে টেনে সমান করতে করতে অনেকক্ষণ ধরে জুতো পরল

'যা কি চার সেদ্ধ করে রেখেছে?' বাবার পেছন পেছন বারান্দায় বেরিয়ে আসতে আসতে ডাঙা-ডাঙা গলায় গ্রিগোরি জিজ্ঞেস করল।

‘হ্যাঁ রেখেছে নৌকোর গিয়ে ঘোস গে যা। আমি একবুনি আসছি।’

ভাশে সৈদ্ধ সুগন্ধী রাইয়ের দানাগুলোকে একটা মাটির কলসীর ভেতরে ঢালল বুড়ো ষ্ঠেকু দানা বাইরে পড়েছিল সৈগুলো বেশ সম্ময়ীর মতো ঝুঁটে ঝুঁটে হাতের চেষ্টায় তুলে নিল, তারপর বাঁ পায়ে ডর দিয়ে খৌড়াতে খৌড়াতে গড়ানে ঢাল বয়ে নদীর দিকে চলল। গ্রিগোরি গুটিসুটি মেরে নৌকোর ওপব বসে ছিল

‘কোন দিকে চালাব?’

‘কালো খাতের দিকে সৈদিন যেখানে আমরা মাছ ধরেছিলাম সেই জায়গাটার একবার চেষ্টা করে দেখব।’

পেছন দিয়ে মাটি ঘসটে নৌকোটা জলে এসে পড়ল, পাড় থেকে ছিটকে বেবিয়ে গেল। স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে চলল তাকে। স্রোতের বেগে নৌকো ঝাঁকুনি খেতে লাগল, যেন কাত হয়ে উলটে পড়তে চায়। গ্রিগোরি নৌকো বাইল না, হাল ধরে বসে রইল

‘বাইহিস না যে।’

‘আগে মাঝ-নদীতে গিয়ে পড়ি।’

প্রবল স্রোত কেটে নৌকো ছুটল বাঁ পাড়ের দিকে। গ্রাম থেকে মোরগের ডাক জলের শব্দে চাপা পড়ে ক্ষীণ হয়ে তাদের কাছে ভেসে আসছিল। নদীর অনেকটা উঁচু দিয়ে চলে গেছে এবড়ো-খেবড়ো শক্ত পাথুরে মাটির কালো খাত যেন পাহাড়ের ঢল থেকে ঝসিয়ে নেওয়া হয়েছে একটা চাণ্ডড়। তারই গায়ে পাশ ঘসটে নৌকো একটা গহ্বরে এসে ভিড়ল। পাড় থেকে প্রায় দশ গজ দূরে জলের ভেতর থেকে মাথা উঁচিয়ে রয়েছে একটা ডুবন্ত এলম গাছের দুমড়ানো ডালপালা। তার চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে ধূসর বাদামী রঙের উদ্ভাস ফেনিল জলবাশি

‘ছিপের সুতো খোল, আমি টোপ ফেলছি,’ বাপ ফিসফিস করে গ্রিগোরিকে এই কথা বলে খোঁয়া ওঠা কলসীর মুখে হাত পুরে দিল।

নিখুঁত ভঙ্গিতে জলের ওপব শব্দ করে ছড়িয়ে পড়ল দানাগুলো, যেন কেউ চাপা গলায় ফিসফিস করে বলল, স-স-স। গ্রিগোরি বঁড়শির মাথায় টসটসে ফোলা কিছু দানা ঠোঁথে মুচকি হাসল।

‘ধরা পড়, ধরা পড়। বুড়োখাড়ি ছানাপোনা য়েবানকার যত মাছ ধরা পড়

ছিপের সুতো পাক খেয়ে জলে পড়েই তারের মতো টানটান হয়ে গেল, তারপর ফের ঢিল পড়ল তাতে, বঁড়শীর সঙ্গে বাঁধা সীসের ডেলাটা প্রায় জলের তলায় এসে ঠেকল। গ্রিগোরি ছিপের গোড়া পায়ে চেপে বেখে নড়াচড়া যতদূর সম্ভব বন্ধ করে দিয়ে তামাকের থলি হাতডাল

‘আজ কোন সুবিধে হবে না বাবা। চাঁদ ডুবছে।’

‘মেশলাই এনেছিস?’

‘হ্যাঁ।’

‘একটু আগুন দে।’

বুড়ো তামাক টানতে টানতে সূর্যের দিকে তাকাল। একটা ডুবন্ত গাছের গুঁড়ির ওপাশে কোথায় যেন সূর্যটা আটকে গেছে।

‘সুই-কাতলা কিন্তু কখন কোন সময় বঁড়শী গেলে বলা যায় না। কখন কখন চাঁদ ডোবার সময়ও গেলে।’

‘বোকাই যাচ্ছে কোন চুনোপুটি ঠোকব মারছে,’ গ্রিগোরি দীর্ঘশ্বাস ফেলল ওহা কথা বলছে, এমন সময় নৌকোর পাশে জল ধপাস করে চলকে উঠল। ঠিক যেন লালচে তামার ঢালাই করা হাত তিনেক লম্বা একটা মৃগেল তার চওড়া বাঁকা লোজা দিয়ে জলে দু’দুবাব ঘাই মেরে আর্তনাদ করে শূন্য লাফিয়ে উঠল অজস্র জলের দানা দানা ছাঁট ছড়িয়ে পড়ল নৌকোর ভেতরে

‘এই বার সবুর কর।’ পাশ্বেলেই প্রকেফিয়েভিচ জামাব হাতায় ভিজ়ে দাড়ি মুছল

ডুবন্ত এলম গাছের রিক্ত ডালপালার হাতাব কাছে একই সঙ্গে লাফিয়ে উঠল দুটো মৃগেল। তৃতীয়টা, একটু ছোট। শূন্য পাক খেয়ে প্রাণপণ শক্তিতে খাড়া-পাহাড়ের কাছে বারবার ঘাই মারতে লাগল

. . .

গ্রিগোরি অধৈর্য হয়ে পাকানো সিগারেটের ভেজা প্রান্তটা চিবোতে লাগল অদৃশ্যল সূর্যটা ওক গাছের ওপরে অর্ধেক পথ উঠে গেছে। পাশ্বেলেই প্রকেফিয়েভিচ ঘতটা চার এনেছিল তার সবটুকু খরচ করে ফেলে এখন মুখ বেজার করে চোঁট ঝুটকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে ছিপের স্থিৰ ডগাটার দিকে।

সিগারেটের অবশিষ্ট টুকরোটা থুথু করে ফেলে দিয়ে গ্রিগোরি ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে লক্ষ করতে লাগল দ্রুত ভেসে যাওয়া টুকরোটা। ভালো করে মূমোতে না দিয়ে সাত সকালে ঘুম ভাঙানোর জন্য সে মনে মনে বাপকে শাপ-শাপান্ত করছিল খালি পেটে তামাকের ধোঁয়া টানায় শুমোরের পোড়া লোমের ঘড়ো উৎকট গন্ধে মুখের ভেতরটা ভরে উঠেছে গ্রিগোরি নীচু হয়ে অঁজলা করে জল নিতে যাবে এমন সময় জলের ওপর আধ হাতখানেক উঁচিয়ে থাকা ছিপের ডগা আলগা ভাবে দুলে উঠল, ধীরে ধীরে তলিয়ে যেতে লাগল।

‘মার একখানা ঘা।’ জোরে নিশ্বাস ফেলল বুড়ো

গ্রিগোরি চমকে উঠে ছিপ চেপে ধরল কিন্তু ছিপের ডগাটা ততক্ষণে দ্রুত



অদৃশ্য হয়ে যেতে লাগল জলের ভেতরে হাতের মুঠোয় ধরা ছিপটা একটা পাতের মতো বৈকে গেল। যেন এক বিপুল শক্তি লিকলিকে শক্ত উইলো-বেতের তৈরি ছিপটাকে ঘাড় ধরে হিডহিড করে নীচে টেনে নিয়ে চলেছে

‘ধর, ধরে রাখ নৌকো পাড় থেকে ধাক্কা মেবে সবিয়ে দিতে দিতে বুড়ো আত্নানাদ করে উঠল

গ্রিগোরি ছিপ টেনে তোলার আশ্রয় চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। শূন্যে কিছু একটা হেঁড়ার মতো চটস শব্দ করে ছিপের মোটা সুতোটা ছিঁড়ে গেল গ্রিগোরি টাল সামলাতে না পেরে প্রায় চিত হয়ে পড়ে গেল

‘ধর্মের ষাঁড় আর কাকে বলে,’ ঝড়শীতে বৃথা টোপ গাঁথার চেষ্টা করতে করতে বিড়বিড় করে বলল পাস্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ

উদ্বেজনাভরে মান হাসি হেসে গ্রিগোরি নতুন সুতো লাগিয়ে ছিপ ফেলল ঝড়শির সঙ্গে বাঁধা সীসের ডেলাটা তলা স্পর্শ কবতে না করতে ছিপের ডগা বৈকে গেল

‘ওই যে শয়তানটা ’ মাছটা হটফট করতে করতে গভীর স্রোতের দিকে চলে যাওয়ায় অনেক কষ্টে তাকে তলা থেকে টেনে তুলতে তুলতে অশ্রুট স্বরে গজগজ করে বলল গ্রিগোরি

ছিপের সুতো পেছনে সবজোটে গড়ানে ঢেউয়ের ঢল মেলিয়ে সাঁ সাঁ করে জল কেটে চলল পাস্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ কাঠের খুঁটির মতো মোটা আঙুলগুলো দিয়ে সঁউতির হাতল চেপে ধরল

‘গটাকে একটা পাক খাইয়ে জলের ওপরে নিয়ে আর শক্ত করে ধরে রাখ, নয়ত সুতো কেটে দু’আধলা করে ফেলবে’

‘করলেই হল আর কি!’

একটা বড় হলদেটে-লাল মুগেল জলের ওপর ভেসে উঠল, জল আছড়ে ফেনা তুলল, তাবপর তার চওড়া গোছের ভৌতা মাথাটা গৌজ করে ফেন সড়াক করে গভীর জলে ডুব মারল।

‘বড় জোর চাপ দিচ্ছে, হাতটা যেন অসাড় হয়ে আসছে। না, তা হবে না। তোর মজাটা দেখাচ্ছি’

‘ধরে রাখ গ্রিশকা’

‘ধরেই ত আছি’

‘দেখিস নৌকোর তলায় যেন গিয়ে না সঁধোয় খেয়াল রাখবি কিছু’

মাছটা এখন কাত হয়ে পড়ে ছিল। গ্রিগোরি এবারে দম নিয়ে গটাকে খেলিয়ে নৌকোর কাছে নিয়ে এলো। বুড়ো সঁউতি নিয়ে ঝুঁকে পড়ার উপক্রম

করছিল আরেকটু হলোই সে ওটা দিয়ে এক যা বসিয়ে দেয় কিন্তু মাছটা তার শের শক্তি সম্বল করে আবার ডুব মাঝল গভীর জলে

‘মাথাটা টেনে তোল! বাতাস গিলে একটু ঠাণ্ডা হয়ে নিক।’

অবসন্ন মাছটাকে আরও একবার খেলিয়ে নৌকোর কাছে টেনে আনল গ্রিগোরি। বিরাট হাঁ করে মুখ খুলে খাবি খেতে খেতে মাছটা মুখ খুবড়ে নৌকোর খলখলে গায়ে গুতো খুলে তার কমলা-সোনালি পাখনা নাড়িয়ে ঝলমল করতে লাগল

‘বাটার জারিজুরি কুরিয়েছে’ মাছটাকে সৈঁচুনি দিয়ে তুলতে তুলতে পাশ্বেলেই প্রকোফিয়েভিচ গাঁকগাঁক করে বলল

আরও আধঘণ্টাটাক তারা বসে রইল। মৃগেলের হটফটানি শেষ হয়ে এলো

‘ছিপ গুটো রে গ্রিশ্কা মনে হয় আজকের মতো এই শেষটাই আমাদের হাতে ধরা পড়েছে আর অপেক্ষা করে কাজ নেই।’

ওরা জ্বিনিসপত্র গুছিয়ে নিল গ্রিগোরি পার থেকে নৌকো ঠেলে ছাড়িয়ে মিল দেখতে দেখতে তারা অর্ধেক পথ পেরিয়ে গেল। বাপের মুখ দেখে গ্রিগোরির মনে হল সে খেন কিছু বলতে চায় কিন্তু বুড়ো নীরবে বসে রইল, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল পাহাড়ের নীচে ছড়ানো ছিটানো গ্রামের ঘর-বাড়ি।

‘তোকে যা বলি গ্রিগোরি শোন’ পায়ের নীচেকার বস্তার সিট আঙুল দিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে ইতস্তত করে সে শুরু করল ‘আমি লক্ষ করছি, জাপ্তিনিয়া আন্তাখভার সঙ্গে তোর যেন’

গ্রিগোরির চোখমুখ লাল টকটকে হয়ে উঠল, সে মুখ ঘুরিয়ে নিল তার জামার কলারটা ব্রোমে-পোডা পেশল ঘাড়ে কেটে বসে গেল, সেখানে ফুটে উঠল একটা সাদা ডোরা।

‘দেখিস কিন্তু হৌড়া,’ এবারে বেশ ক্রুদ্ধ হয়ে কর্কশস্বরেই বলে চলল বুড়ো ‘আমি তোর সঙ্গে অমনি অমনি বকর বকর করছি বলে মনে করিস নে স্ত্রোপান হল গিয়ে আমাদের পড়শী, তার বৌকে নিয়ে অমন নষ্টামি বরদাস্ত কর্তা যায় না যা তা কাণ্ড হয়ে যেতে পারে। তাই আগেভাগে সাবধান করে দিছি ফেব যদি দেখি ত চাবকে লাল করে দেব।’

পাশ্বেলেই প্রকোফিয়েভিচ গিটপাকানো মুঠোব মধ্যে আঙুলগুলো মোচড়াতে লাগল, কুলোকুলো চোখদুটো কঁচকে তাকিয়ে দেখল ছেলের মুখ রক্তশূন্য হয়ে আসছে

‘যত সব বাজে কথা’ জলের ভেতর থেকে যেন বুড়বুড়ি তুলে চাপা গলায় এই কথা বলে সে সোজা বাপের নীলচে রঙের নাকের খাঁজের ওপব চোখ রাখল।

‘চোপ রও’

‘লোকে কী না বলে

চূপ কর শূন্যের বাচ্চা !'

গ্রিগোবি দাঁড়ের ওপর দেহের ভাব ফেলল নৌকো লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে লাগল নৌকোর পেছনে খাড়া খেয়ে পাকিয়ে পাকিয়ে জল নাচতে লাগল কলকল শব্দে ।

দু'জনেই চূপ ঘাটের কাছাকাছি আসতে বাপ মনে করিয়ে দিল

'সেবিস ভুলে যাস নে যেন, নইলে আজ থেকে তোর সমস্ত লীলাখেলা ঘুচিয়ে দেব । বাড়ি থেকে এক পা বাইরে বেরুতে পারবি নে মনে থাকে যেন '

গ্রিগোরি চূপ করে রইল নৌকো ঘাটে লাগাতে লাগাতে সে জিজ্ঞেস করল

'মাছটা কি বাড়ির মেয়েদের দিয়ে দেব ?'

'বাপারীদের কাছে নিয়ে গিয়ে বেচে দে, বুড়ো একটু নরম হয়ে বলল 'তামাকের টাকটা হয়ে যাবে।'

চৌটি কামড়াতে কামড়াতে গ্রিগোরি বাপের পেছন পেছন চলল । ফুঙ্ক চোখের দৃষ্টিতে বাপের মাথার খাড়া পেছনটা পারলে যেন চিবিয়ে খেয়ে ফেলে । মনে মনে সে বলল, 'দেখি কেমন ক্ষমতা তোমার আছে, বাবা ধবেই রাখ আব বৈধেই রাখ আজ রাতে লীলাখেলা করতে বেরোছি - সেবি কেমন খ্যামতা তোমার ।'

মুগেলমাছটার আঁশের গারে শুকনো হয়ে বালি লেশে ছিল বাড়ি এসে গ্রিগোরি সযত্নে বালি ধুয়ে ফেলল তারপর শুকনো গোছের একটা শক্ত লতা মাছের দুই কানকোর ভেতর দিয়ে সুতোর মতো করে গলিয়ে দিল

বাড়ির গেটের কাছে বহুদিনের পুরনো বন্ধু, তারই সমবয়সী মিত্কা কোরশুনভেব সঙ্গে আচমকা মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল । মিত্কা তার কান্ধকাজ-করা বেল্টের লেজটা নিয়ে খেলা করতে করতে চলেছে । খুদে খুদে কেটরের ভেতর থেকে চকচক করছে তার গোল গোল হলদেটে বেহায়া চোখদুটো চোখের তারা বেড়ালের মতো কেমন যেন খাড়া খাড়া তার ফলে মিত্কার চোখের দৃষ্টিও চঞ্চল ধরা-ছোঁয়ার বাইরে

'মাছ নিয়ে চললি কোথায় ?'

'আজই ধরলাম বাপারীদের কাছে নিয়ে যাচ্ছি '

'মোশভদের কাছে বুঝি ?'

'ঠিকই ধরেছিস ।'

মিত্কা এক পলক দেখে মাছটার ওজন আন্দাজ করে নিল

'সাত সের মতন হবে '

'সাত সাত । মাপে দেখেছি ।'

'আমাকে সঙ্গে নে । দরাদরির কাজটা করে দেব '

‘বেশ ত চল না।’

‘আমার বখরাটার তাহলে কী হবে?’

‘সে আমরা ঠিক করে নেব খন। ও নিয়ে এখন বকবক করে সময় নষ্ট করতে হবে না।’

ভোরের উপাসনা ভাঙার পর লোকজন রাস্তায় ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। শামিল ডাকনামে সকলের কাছে পরিচিত তিন ভাই রাস্তা দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে পাশাপাশি চলেছে

মাকরানো বড় ভাই নুলো আলেক্সেই। উদ্বিগ্ন অঁচিসাঁট কলারটা সোজা কবে রেখেছে তার শিরা ওঠা ঘাড়টাকে। তার পাতলা কোঁকড়ানো চুচালো দাড়ি এক লিকে কাত হয়ে উদ্ভত ভঙ্গিতে উঁচিয়ে আছে। বাঁ চোখটা অস্থির ভাবে পিটপিট করছে অনেককাল আগে চাঁদমারিতে গুলি ছোঁড়া অভ্যাস করার সময় আলেক্সেইয়ের রাইফেল তার হাতেই ফেটে গিয়েছিল, বাইফেলের বাঁটের একটা ভাঙা টুকরো ছিটকে এসে তার একটা গাল বিকৃত করে দেয়। সেই থেকে কারণে অকারণে তার বাঁ চোখটা নাচে নীল রঙের কাটা দাগটা গালে ফালা কেটে মিলিয়ে গেছে কুঞ্চিত কেশনামের আড়ালে বাঁ হাত কনুই থেকে উড়ে গেছে কিন্তু তাহলে কী হবে, এক হাতেই আলেক্সেই দিবা সিগারেট পাকায় - পাকায় একেবারে নিবৃত্ত। বুকের ফুলো টিবিব গায়ে তামাকের ধলে চেপে ধরে যতটা কাগজের টুকরো দরকার দাঁত দিয়ে ছিড়ে নেয়, গোল করে পাকায়। তামাক চেঁছে ঢালে আর এমন ভাবে আঙুল চালিয়ে সিগারেট পাকায় যে কী করেছে বোঝার উপায় থাকে না চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে দেখা যাবে আলেক্সেই সিগারেট পাকিয়ে চোখ পিটপিট করতে করতে দাঁতের ফাঁকে চিবুচ্ছে ছালানোর জন্য আগুন চাইছে

নুলো হলেও গ্রামের মধ্যে ঘুসোঘুসিতে সে মহা ওস্তাদ। হাতের মুঠোটা অবশ্য উল্লেখ করার মতো কিছু নয় অতি সাধারণ আকারে একটা ছাঁচি কুমড়োর সমান কিন্তু একবার জমি চাষ করতে গিয়ে হালের বলদের ওপর সে চটে ঘাষ - হাতের কাছে চাবুক না থাকায় হাতের মুঠো দিয়েই ওটার মাথায় একটা ছুঁসি ঝেড়ে দিল কলদটা চষা জমির ওপর মুখ খুবড়ে পড়ে গেল তার কান দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ল। তাকে সারিয়ে তুলতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল খনা দুই ভাই মার্তিন আর প্রোখরেরও অক্ষরে অক্ষরে মিল আলেক্সেইয়ের সঙ্গে। তারই মতো বৈটেখাটো, চওড়ায় যেন একেকটা ওকগাই - কেবল দু'জন্যার দুটো করে হাত এই যা তফাত

খিগোরি নমস্কার জানাল শামিলদের। কিন্তু মিত্রকা বটু করে এমন ভাবে মাথা ঘুরিয়ে নিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে গেল যে মনে হল তার ঘাড়টাই কুখি মট

করে উঠল। পিঠে পরব\* উপলক্ষে দল বেঁধে ঘুসোঘুসির সময় আলেঞ্জেরই শামিল মিত্কার কচি দাঁতগুলোব ওপর এতটুকু মায়া-মমতা না দেখিয়ে হাত ঘুরিয়ে তাকে এক প্রচণ্ড ঘুসি মারে। সেই ঘুসি খেয়ে লোহাব নাল-বাঁথানো জুতোর ঘায়ে ক্ষতবিক্ষত নীলচে রঙের জন্মাট বরফের ওপর থুতু ফেলার সঙ্গে সঙ্গে মিত্কার দুটো কশের দাঁতও পড়ে যায়

ওদের কাছাকাছি চলে আসার পর আলেঞ্জেরই পর পর বাব পাঁচেক চোখ মিটমিট করল।

‘তোমাব এই কুদোটাকে বেচবে আমাদের কাছে?’

‘কিনলে বেচব বৈ কি।’

‘কত দাম?’

‘এক জোড়া বলদ, তার সঙ্গে একটা বউ ফাউ’

আলেঞ্জেরই চোখ কঁচকে কাটা গুঁড়ির মতো নুলো হাতটা দোলাল

‘বাহবা! বেড়ে বলেছ ওঃ-হো-হো, একটা বউ ফাউ! বলি,

ছানাপোনাসুদ্ধ নিবি ত?’

‘বংশবৃদ্ধির জন্যে তোদের গৈবু-ভেড়ার খামারে রেখে দে নইলে শামিলরা নিবংশ হয়ে যেতে পারে, খ্রিগোরি দাঁত বার করে বলল

গির্জার বেড়ার সামনে বারোয়ারিতলায় লোকজনের ভিড় জমে উঠেছে। ভিড়ের মধ্যে গির্জার মুরব্বি একটা হাঁস মাথার ওপর উঁচু করে তুলে সমানে টেঁচিয়ে চলেছে, এক আখলা দাম উঠেছে। ‘চলে যাচ্ছে, চলে যাচ্ছে’ আর কেউ এর চেয়ে বেশি দর দিচ্ছেন?’

হাঁসটা এদিক ওদিক ঘাড় ঘোরাতে ঘোরাতে কুলজ্বলে পুতির মতো একটা চোখ পিটপিট করতে করতে অবজ্ঞাভরে তাকাচ্ছিল।

পাশের আরেক দল লোকের ভিড়ের মাঝখানে ক্রস-মেডেলে বুকভর্তি এক সাদাচুল বুড়ো হাত নেড়ে কী ফেন বলছে।

‘আমাদের গ্রিশাকা দাদু তুর্কী যুদ্ধের গপপো জুড়েছে,’ মিত্কা চোখ ঠেরে বলল ‘চল যাই, শূনি গে কী বলছে’

‘শুনতে গেলে মগেলটা পচে ফুলে উঠবে, গন্ধ ছাড়বে

‘ফুললে ত আমাদেরই লাভ - ওজনে বাড়বে।’

---

\* গ্রাণ্ড জাতির লোকদের মধ্যে সপ্তাহব্যাপী প্রচলিত বসন্তকালীন ধর্মীয় উৎসব খ্রীষ্টপূর্ব আমলে উদ্ভূত এই উৎসব নীত বিমার ও বসন্ত রবণের প্রতীক রূপে গ্রহণ করা যেতে পারে কেব্রুয়ারীর শেষে ও মার্চের শুরুর উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে অনুঃ

বারোয়ারিতলায় দমকলের ঢালায় নীচে আগুন নেভানোর জলের কিছু পিপে আর গাড়ির কিছু ভাঙাচোরা যোয়াল রোদে ভাজা ভাজা হচ্ছিল। এই জায়গাটার ওপাশেই মাথা উঁচু করে আছে মোখভদের বাড়ির সবুজ-রঙা ছাদ। চালাটির পাল নিয়ে বড় বড় পা ফেলে যেতে যেতে খ্রিগোরি নাক চেপে ধরল। মাটিতে থুতু ফেলল। বেলটের বকলস দীতে চেপে ধরে সালোয়াবের বোতাম অটিতে অটিতে জলের পিপেগুলোর আডাল থেকে বেরিয়ে এলো এক বুড়ো।

‘কজ্ঞ তাজা দেখছি?’ মিতকা খৌঁচা দিয়ে বলল।

বুড়ো ততক্ষণে শেষ বোতামটা লাগিয়ে ফেলেছে, এবারে মুখ থেকে বকলসটা ধার করে নিয়ে বলল

‘তোমার ভাত্তে কী ব্যা?’

‘নাক দিয়ে ঘসটে দিতে হয়।’ আব দাড়ি দিয়ে। ‘হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার ওই দাড়ি দিয়ে তোমার বুড়ি যাতে এক হপ্তা ধরে ঘাসমেজ্ঞেও তোমাকে সাক্ষসুত্ত্ব করে তুলতে না পারে।’

‘তবে রে হারামজাদা তোমার ঘসটানো আমি বার করছি।’ খৌঁচা খেয়ে বুড়ো ঝুসতে ঝুসতে বলল

মিতকা ধমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, সে তার বেডাল-চোখ কৌচকালো যেন সূর্য তায় চোখে লাগছে

‘ইস্, কোথাকার লাটের বাঁট এলেন রে।’ ভাগ বলছি শুরোরের বাচ্চা পেছনে লাগতে এয়েছিস? এই বেলট দিয়ে আয়সা ঝাড়ব না।’

খ্রিগোরি মুখ টিপে হাসতে হাসতে মোখভদের বাড়ির দেউড়ির দিকে এগিয়ে গেল। বুনো আঙুরের ঘন লতার নজ্জার মধ্যে রেলিঙ ঢাকা পড়ে গেছে। দেউড়িতে পড়েছে জাফরিকাটা অলস ছায়া

‘ল্যাখ মিত্রি, একদল লোক কেমন আরামে দিন কাটায়।’

‘দয়জ্ঞার হাতল যে হাতল তাও আবার গিল্টি করা,’ বারান্দায় ঢুকবার দরজাটা খুলে সামান্য ফাঁক করে নাক দিয়ে একটা অব্যস্ত চাপা আওয়াজ করে মিত্কা বলল, ‘আমাদের ওই বুড়ো দাদুটাকে এখানে পাঠাতে পারিলে হত

‘কে ওখানে?’ ওপাশের বারান্দা থেকে কে যেন হৈকে উঠল।

সন্ধ্যাে জড়সড় হয়ে খ্রিগোরি আগে গিয়ে ঢুকল। মাছের লেজ বঙকরা মেথের তক্তার ওপর দিয়ে ঝেঁটিয়ে গেল।

‘কাকে চাই?’

বেতের বোন। মুলুনি-চেয়ারে বসে আছে একটা মেয়ে। তার হাতে এক থালা

ষ্ট্রবেরি টমটসে গোলাপী ঠোঁটের ফাঁকে চেপে ধরে আছে একটা ষ্ট্রবেরি ঠোঁটজোড়া দেখাচ্ছে ছোট্ট একটা হুংপিণ্ডের মতো ঘাড় কাত করে মেয়েটা আগন্তুক দু'জনকে নিরীক্ষণ করতে লাগল

গ্রিগোরিকে উদ্ভাষ কন্সার জন্য আগ বাড়িয়ে এলো মিত্কা। সে গলা খাঁকারি দিল  
'মাছ কিনবেন ?'

'মাছ ? আচ্ছা, এবুনি বলছি '

চেয়ারটায় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে সে উঠে পড়ল মোজা-ছাড়া খালি পায়ে সুতোর কাজ করা চটিজোড়া গলিয়ে ফট ফট করে সে চলে গেল। সূর্যের আলো তার সাদা পোশাক ভেদ করে বলসে উঠল পুরুট্ট পায়ের আবছা সীমারেখা আব অন্তর্বাসের ঢেউ খেলানো চওড়া লেসটা দেবতে পেল মিত্কা যেটা তাকে অবাক করল তা হল খালিপায়ের মাংসপেশীর অমন ধবধবে সাদা রঙ ঠিক যেন সাটিন। গোল গোল গোড়ালির কাছের চামড়াই যা একটু দুধে-হলদে

গ্রিগোরিকে কনুইয়ের ঠেলা দিল মিত্কা

'দ্যাখ দ্যাখ গ্রিশকা, কী পোশাক আঁ।' যেন কাচ এ ফৌড ও ফৌড সব দেখা যায় '

মেয়েটা বারান্দার দবজা দিয়ে বেবিয়ে এসে আস্তে করে চেয়ারে বসল, তারপর বলল

'রান্নাথরে চলে যান '

গ্রিগোরি পা টিপে টিপে বাড়ির ভেতরে এগিয়ে গেল। মিত্কা এক পা উঠিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে মিটমিটে চোখে দেখতে লাগল মেয়েটির সিঁথির সাদা রেখা সোনালি অর্ধচন্দ্রাকারে তার মাথার চুলকে দু'ভাগে ভাগ করেছে মেয়েটি দুটুমিভরা চঞ্চল চোখের দৃষ্টিতে তাকে ঝুটিয়ে ঝুটিয়ে দেখতে লাগল

'আপনি কি এই গাঁয়েরই লোক ?'

'হ্যাঁ, এইখানকার।'

'কাদের বাড়ির ?'

'কোকশুনডদের।'

'আপনার নামটা কী ?'

'মিত্রি।'

মেয়েটি তার নিজের পায়ের গোলাপী রঙের আঁশের মতো নখ মন দিয়ে নিরীক্ষণ করে দেখল, তারপর সচকিত ভঙ্গিতে পাদুটো গুটিয়ে নিল।

'আপনাদের মধ্যে কে ধরেছে মাছটা ?'

'আমার বন্ধু গ্রিগোরি।'

‘আপনি মাছ ধরেন?’

‘হ্যাঁ, ইচ্ছে হলেই ধরি’

‘বড়শি দিয়ে ধরেন?’

‘হ্যাঁ, বড়শি দিয়েও ধরি

‘আমারও একটু মাছ ধরতে ইচ্ছে কবে, খানিক চূপ করে থেকে মেয়েটি বলল

‘জা বেশ ত, ইচ্ছে হয় ত চলুনই না, একদিন যাওয়া যাবে।’

‘কী ভাবে সেটা করা যায়?’ না, না, বলুন না সত্যিই?’

‘আপনাকে খুব ভোরে উঠতে হবে।’

‘সে আমি উঠব ‘খন আমাকে জাগিয়ে দিলেই হল।’

‘জাগানো ত যায় কিন্তু আপনার বাবা?’

‘আমার বাবা আবার কি?’

মিত্কা হাসল।

‘চোর বলে ভাবতে পারেন কুকুর লেলিয়ে দিতে পারেন’

‘কী যা তা বলছেন আমি কোণের ঘরে একা ঘুমোই। ওই যে জানলাটা’ আঙুল দিয়ে সে দেখিয়ে দিল ‘আমাকে যদি ডাকতে আসেন তাহলে আমার জানলার টোকা দেবেন আমি উঠে পড়ব।’

রাগ্নাঘর থেকে ভেসে আসছে গ্রিগোরির সলজ্জ গলা আর বীধুনির ঘন দরদরে গলার টুকরো টুকরো আওয়াজ। মিত্কা চূপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার কসাক-বেল্টের ঘসা বুপোয় আঙুল বুলাতে লাগল

‘আপনি বিয়ে করেছেন?’ সলজ্জ হাসিতে ওকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস কবল মেয়েটি

‘কেন? তাতে কী দরকার?’

‘অমনি জিজ্ঞেস করলাম জানতে ইচ্ছে হল, তাই।’

‘না. বিয়ে করি নি

মিত্কা হঠাৎ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। এদিকে ইট-হাউস থেকে আনা ষ্ট্রবেরিগুলো মেঝের ওপর ছড়িয়ে পড়ে যেতে তারই একটা ছোট ডাল দিয়ে সেগুলো নাড়াচাড়া করে খেলতে খেলতে, মুখে কৌতুকের হাসি খেলিয়ে মেয়েটি এগিয়ে করে বসল

‘আজ্ঞা মিতিয়া, মেয়েরা আপনাকে ভালোবাসে?’

‘কেউ কেউ বাসে. কেউ কেউ বাসে না’

‘আজ্ঞা বলুন ত, আপনার চোখদুটো অমন বেড়ালের মতো কেন?’

‘বেড়ালের মতো?’ মিত্কা একেবারে অপ্রস্তুত

‘হ্যাঁ অবিকল বেড়ালের মতো।’



‘মা’ব কাছ থেকে পেয়েছি হয়ত। এতে আমার কোন হাত নেই  
‘আচ্ছা, আপনাকে বিয়ে দেয় না কেন, মিতিয়া?’

মুহূর্তের বিমূঢ়তা কাটিয়ে উঠল মিত্কা। মেয়েটির কথার প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপটুকু  
ধরতে পেরে তার সবজেরটে চোখে ঝিলিক খেলে গেল।

‘বউটি এখনও ডাগর হয় নি।

মেয়েটি অবাক হয়ে ভুবুদুটো নাচাল তার চোখেমুখে রক্তোজ্জ্বল খেলে গেল,  
সে উঠে পড়ল

রাস্তা থেকে দেউড়িতে কার যেন উঠে আসার পদশব্দ পাওয়া গেল

উচ্ছ্বসিত হাসি-চাপতে গিয়ে মেয়েটি যে ভাবে ছোট্ট ক’রে হাসল, তাতে  
মিত্কা যেন বিদ্রুটির চাবুক খেল খোদ বাড়ির কর্তা সেগেই প্রাতোনিচিচ মোখভ  
তার বিশাল বপুখনা নিয়ে ছাগচর্মের প্রশস্ত ভারী বুটজুতো পায়ে মৃদু মসমস  
আওয়াজ তুলে ভারিকি চালে মিত্কার পাশ দিয়ে চলে গেল মিত্কা সঙ্গে সঙ্গে  
সরে মাঁড়াল।

‘কাকে চাই? আমাকে?’ চলতে চলতে ঘাড় না ফিরিয়েই সে জিজ্ঞেস করল

‘মাছ এনেছে বাবা’

গ্রিগোরি বেরিয়ে এলো খালি হাতে।

## তিন

সৈনিক সঙ্ঘাতকোলা বেড়ানোর পর গ্রিগোরি যখন বাড়ি ফিরল তখন প্রথম  
মোরগ ডেকে গেছে বারান্দা থেকে ধক করে তার নাকে এসে লাগল গাঁজিয়ে  
ওঠা ঝাঁঝালো ‘হপ’ লতা আর বুনো সুগন্ধী লতার শুকনো মশলা-মশলা গন্ধ

গ্রিগোরি পা টিপে টিপে বাইরের ঘরে ঢুকল। জামাকাপড় ছাড়ল, দু’পাশে  
লাল ডোরা-কাটা পোশাকী সালোয়ারটা সজ্জপণে ঝুলিয়ে রাখল তারপর ক্রুশ করে  
শুয়ে পড়ল মেঝের ওপর এসে পড়েছে ঘুম-ঘুম সোনালি জোছনা ক্রুশচিহ্ন  
আকারে কাটাকাটি জানলার জাকজি। ঘরের এক কোনায় নক্সা কাটা তোয়ালের  
আড়ালে গোটা কয়েক রূপোর বিগ্রহ নিস্ত্রভ দীপ্তি দিচ্ছে বিজ্ঞানাব ওপর যে  
খোলানো তাকটা আছে তার চারধারে উত্তেজিত মাছদের দীর্ঘ একটানা ভনভনানি।

গ্রিগোরি প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছিল, কিন্তু দাদার বাচ্চাটা হঠাৎ রান্নাঘরে ফেঁদে উঠল

তেল-না-দেওয়া গাড়ি চাকার মতো দোলনাটা কাঁচকাঁচ আওয়াজ তুলল।  
ঘুমজড়ানো কণ্ঠে দরিয়া বিড়বিড় করে বলল, স-স-স লক্ষ্মীছাড়া ছেলে ঘুমো

কলছি তোর জ্বালায় না আছে ঘুম, না আছে সোয়াস্তি ।’ এরপর গুলগুন কবে গান ধরল

‘ছু-মস্তর কাঁপিওয়ালা  
কোন মলুকে ছিলি ?  
‘ছিলেম ঘোড়া আগলে পড়ে ।’  
শেষকালে কী আগলানি ?  
‘জিন লাগানো মস্ত ঘোড়া,  
সোনার ঝালর মোড়া ’

দোলনার ঘুম পাড়ানি একটানা কাঁচকৌঁচ আওয়াজের তালে তালে তুলতে  
তুলতে খিগোরির মনে পড়ে গেল ‘তাই ত, কাল দাদা পেত্রো চলে যাবে  
কগাম্পে দরিয়া থাকবে বাচ্চটাকে নিয়ে তাহলে দাদাকে বাদ দিয়েই ঘাস  
কাটতে হবে দেখছি ।’

গরম বালিশটার নীচে সে মাথা ঝুজল, কিন্তু তাতেও নিস্তার নেই কানের  
স্তব্ধতায় ঝরে ঝরে পড়তে লাগল সেই গান

‘সেই ঘোড়া তের কোথায় গেল ?’  
‘দুয়ারে আছে বাঁধা ’  
‘দুয়ার কোথায়, বল না ওরে ?’  
‘গেছে বানের তোড়ে ’

একটা পরিত্রাছি হেঁসাড়নিতে আচমকা খিগোরির ঘুম ভেঙে গেল, আওয়াজ  
শুনে বুঝল ওটা পেত্রোর পলটনের ঘোড়া, ঘুমে হাতের আঙুলগুলো জড়িয়ে  
আসছে, জামার বোতাম লাগাতে সময় লাগছে গানের তরঙ্গাঘাতে আচ্ছন্ন হয়ে  
সে আবার প্রায় ঢুলে পড়ল ।

‘কোথায় গেল রাজহাঁসেরা ?’  
‘উড়ে গেল কানের বনে ।’  
‘কোথায় গেল কামের বন ?’  
‘মেয়েরা সব উপড়ে নিজ ।’  
‘মেয়েরা সব কোথায় গেল ?’  
‘বিয়ে হয়ে চলে গেল ’  
‘কসাকরা সব কোথায় গেল ?’  
‘ওরা সবাই যুদ্ধে গেল

ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্নের মতো হাতড়াতে হাতড়াতে গ্রিগোরি আস্তাবলের দিকে চলল ঘোড়াটাকে বার করে গলির ভেতরে নিয়ে এলো একটা হাফডসার জাল কোথা থেকে উড়ে এসে মুখে সুড়সুড়ি দিতে হঠাৎ তার চটকা ভেঙে গেল।

দনের ওপর দিয়ে তেরছা হয়ে চলে গেছে জ্যোৎজ্যালোকে মিলমিলে পথরেখা। সে পথরেখার ওপর দিয়ে কেউ কোনদিন যায় নি। দনের বৃকে কুয়াশা জমেছে, তারও ওপরে, আকাশের বৃকে মূঠি মূঠি তারার ফসল ছড়ানো। পেছন পেছন ঘোড়াটা ঝুঁশয়ার হয়ে পা ফেলে ফেলে চলে। জলের দিকে বিদ্রী় রকমের একটা ঢল নেমে গেছে ওপার থেকে শোনা যাচ্ছে পাতিহাঁসের পাঁকপ্যাঁক ডাক। পাড়ের কাছাকাছি কাদাজলের ওপর দিয়ে চুনোপুঁটি মাছের সন্ধানে খলবল করতে করতে ধপাস করে ঝাই মারল একটা বোয়ালমাছ।

গ্রিগোরি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল জলের ধারে। পাড় থেকে কেমন যেন একটা স্বাদহীন ভ্যাপসা পাচা গন্ধ উঠছে ঘোড়ার মুখ থেকে ছোট এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। এক মধুর শূন্যতায় গ্রিগোরির মন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল বেশ ভালো লাগছে, কোন ভাবনাচিন্তা নেই ফেরার পথে তাকিয়ে দেখল পূব আকাশে সূর্য উঠছে, সেখান থেকে মিলিয়ে গেছে আধা-অন্ধকারের নীলিয়া।

আস্তাবলের কাছাকাছি এসে মা'র সামনাসামনি পড়ে গেল

'কে রে? গ্রিশকা নাকি?'

'তাছাড়া আবার কে?'

ঘোড়াটাকে জল খাইয়েছিস?'

'হ্যাঁ, অনিচ্ছাভরে উত্তর দিল গ্রিগোরি

গ্রিগোরির মা কৌচড ভরে জ্বালানির ঘুটে নিয়ে পেছনে হেলে পড়ে লোলচর্ম খালি পায়ে তড়বড় করে ভেতরে চলে গেল।

'একবার গিয়ে আস্তাবডদের তুলে দিয়ে এলে ত পারতিস। স্তেপান বলেছিল সেও নাকি আমাদের পেত্রোর সঙ্গে যাবে'

হিমেল হাওয়া একটা ককা স্প্রিংয়ের মতো বসে চাপা কাঁপুনি ধরিয়ে দিল গ্রিগোরির শরীরে। গা শিবশিব করে উঠল কাঁটা দিয়ে উঠল গায়ে। তিনটে ধাপ পেরিয়ে দুদাড় করে গিয়ে আস্তাবডদের বাড়ির সদর দরজার সামনের টপচপে পাটাতনটায় গিয়ে উঠল দরজায় আগল দেওয়া ছিল না। রান্নাঘরের মেঝেতে কবল বিছিয়ে তার ওপর ঘুমোচ্ছে স্তেপান, স্তেপানের বাহুমূলের ওপর মাথা রেখেছে ওর বৌ

অন্ধকার পাতলা হয়ে এসেছে। তারই মধ্য দিয়ে গ্রিগোরি দেখতে পেল

আগ্নিনিয়ার গায়ের জামাটা হাঁটুর ওপরে দলা পাকিয়ে উঠে আছে, বাচের মতো সাদা পাদুটো নির্লজ্জের মতো ছড়ানো মুহূর্তের জন্য তাকিয়ে দেখল গ্রিগোরি সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করল তার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আসছে, মাথার ভেতরে লোহা পেটানোর কনকন আওয়াজ হচ্ছে, মাথা যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে।

চোবের মতো তার চোখজোড়া ঘুরঘুর করতে লাগল 'অদ্ভুত বিকৃত ভাঙা ভাঙা গলায় সে হাঁক দিল, 'এই কে আছে ? উঠে পড়।'

ঘুম ভেঙে খড়মড়িয়ে উঠল আগ্নিনিয়া।

'কে ? কে ? কে ওখানে ?' দ্রুত হাতড়ে জামাটা টেনেটুনে ঠিক করতে লাগল পায়ের সঙ্গে বেধে গেল তার নখ বাহু বালিশের ওপর রয়ে গেল ঘুমের মধ্যে গড়িয়ে পড়া লালার ছোট্ট একটা দাগ। ভোরের দিকে মেয়েদেব ঘুমটা গাঢ় হয়

• 'আমি, আমি মা জাগিয়ে দিতে বলল, তাই এলাম •

এই একুনি উঠছি আমরা। আমাদের এখানে কি আর কারও ঢোকার উপায় আছে নীলমাছির যন্ত্রণায় মেঝেতে ঘুমুতে হয়। স্তেপান, এই স্তেপান, উঠে পড়, শুনছ ?'

আগ্নিনিয়ার গলায় স্বরে গ্রিগোরি বুঝতে পারল যে সে অস্বস্তি বোধ করছে, তাই গ্রিগোরি আর কালবিলম্ব না করে দ্রুত প্রস্থান করল

• • •

গ্রাম থেকে জনা তিরিশেক কসাক চলেছে মে মাসের শিক্ষাশিবিরে। জন্মায়েতের জরগা ঠিক হয়েছে পল্টন-ময়দান সাতটা বাজার আগেই তেরপনের ছাঁউনিসুত পাড়ি নিয়ে, মেটা কান্সিস-কাপড়ের জামা গায়ে, ঘোড়ায় চড়ে, পায়ে হেঁটে, সাজসরঞ্জাম পরে কসাকরা আসতে লাগল পল্টন-ময়দানের দিকে

বাড়ির দেউড়িতে পেত্রো দ্রুত হাতে একটা ছেঁড়া লাগাম সেলাই করছিল পাশ্বেলেই প্রকোফিয়েভিচ পেত্রোর ঘোড়াটার পাশে পায়চারি করতে করতে গামলায় ওট ঢেলে দিচ্ছিল, আর থেকে থেকে হাঁকডাক করে বলছিল, 'হ্যাঁ রে দুনিয়াশকা লেডো বিকুটগুলো প্যাক করে দিয়েছিস ত ? আর চর্বির টুকরো ? ঠিকমতো নুন লাগিয়েছিস ত ওতে ?'

দুনিয়াশকাকে আগাগোড়া একটা গোলাপি কুঁড়ির মতো দেখাচ্ছে একটা পাখির মতো সে উঠোনময় চক্র দিয়ে বেড়াচ্ছে একবার হেঁসেলের দিকে যাচ্ছে, আরেকবার যাচ্ছে ঘরের দিকে। বাপের চিংকার-চোঁচামেটিতে সে হাসছে, ওদিকে কিশেব কোন আমল না দিয়ে বলছে, 'আপনি আপনার নিজের কাজ করুন ত

গিয়ে বাবা। ভাইয়ের জিনিসপত্র আমি এমন ভাবে বাঁধাছাঁদা করে গুছিয়ে দেব যে চেরকাসক অবধি যেতে এতটুকু ওলটাতে না।’

‘কী হল, খাওয়া হয় নি এখনও?’ চামড়া-সেলাইয়ের সুতোটা খুঁত দিয়ে ভেজাতে ভেজাতে ঘোড়াটার দিকে মাথা নাড়িয়ে প্রশ্ন করল শেত্রো

‘চিবুচ্ছে,’ হাতের বসবসে চোটো দিয়ে জিনের তলাকার কাপড়টা পরখ করে দেখতে দেখতে ভাবিকি চালে বুড়ো উত্তর দিল। অমনিতে ব্যাপারটা তুচ্ছ বলে মনে হলে কী হবে - কোন কিছুর ছোট একটা কথা বা ঘাসের একটা ছোট্ট কুটো জিনের তলাকার কাপড়ের সঙ্গে লেগে থাকলে আর দেখতে হবে না একবারের যাত্রাতেই ঘসা লেগে ঘোড়ার পিঠ রক্তাক্তি হয়ে যাবে।

খাওয়া হয়ে গেলে ওকে জল খাওয়াতে হবে বাবা

‘গ্রিগোরি মনে নিয়ে যাবে। এই গ্রিগোরি ঘোড়াটাকে নিয়ে যা।’

কপালে সাদা তারা, তেজী টানটান শরীর দন অঞ্চলের বিশাল ঘোড়াটা টপকিয়ে চলল গ্রিগোরি ওকে গেটের বাইরে নিয়ে এলো। দুই কাঁধের মাঝখানের ঝুটির ওপর আলতো করে বাঁ হাতটা রেখে সে লাফিয়ে উঠে বসল পিঠে। তারপরই ঝট করে একটা পাক খেয়ে স্বচ্ছন্দ দুলকি চালে বেবিয়ে গেল জায়গা থেকে চলার কাছটায় আসার পর গ্রিগোরি রাশ টানার চেষ্টা করল, কিন্তু ঘোড়াটা পায়ের পা বেধে যাওয়াতে হুড়হুড় করে পাহাড়ের উতরাই বয়ে নামতে লাগল। শরীর পেছনের দিকে হেলিয়ে ঘোড়ার পিঠে প্রায় শূন্যে পড়ে নামতে নামতে গ্রিগোরি দেখতে পেল বালতি বাঁকে ঝুলিয়ে একটি মেয়ে পাহাড়ের নীচের দিকে নামছে। গ্রিগোরি এক পাক খেয়ে ঠুঁড়িপথটা থেকে একপাশে সরে গেল। তারপরই পেছনে প্রচণ্ড ধুলির ঝড় উড়িয়ে হুড়মুড় করে গিয়ে পড়ল জলে

পাহাড়ের ঢাল বেয়ে দুলতে দুলতে নামছিল আন্সিনিয়া। খানিক দূর আগে থাকতেই সে গলা চড়িয়ে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল

‘কাপা! শয়তান কোথাকার আর একটু হলেই ঘোড়ার নীচে চাপা পড়তাম দাঁড়াও না মজা দেখাচ্ছি, তোমার বাপকে বলে দিচ্ছি কেমন ঘোড়া ছোটোও তুমি।’

‘আরে পড়শী অমন চোপা কর কেন? স্বামীকে ত কাপ্পে পাঠিয়ে দিচ্ছ, এখন আমি তোমার খেত খামারের কাজে লাগলেও লাগতে পারি।’

‘চলোয় যা তোকে আমার ভারি দরকার পড়েছে।’

‘রোসো, ঘাস কাটার সময়টা আসুক না তখন সাধাসাধি করবে।’ গ্রিগোরি হাসল

আন্সিনিয়া সীকোর ওপর থেকেই নিপুল হাতে বাঁকের একটা বালতিতে জল ভরল। পরনের ঘাঘরাটা বাতাসে ফুলে উঠতে দুই হাঁটুর মাঝখানে চেপে ধরে সে গ্রিগোরির দিকে তাকাল

‘তোমার স্বেপান তাহলে চলল?’ গ্রিগোরি প্রশ্ন করল

‘তোমাব তাতে কী?’

‘কী মেয়ে রে বাবা জিজ্ঞেস করতেও দোষ নাকি?’

‘চলল তাতে কী হল, শূনি?’

‘তাহলে তোমার এখন বিরহদশা চলবে?’

‘তা ত চলবেই’

ঘোড়াটা জল থেকে মুখ তুলল মুখ থেকে গড়ানো জল ফোঁস ফোঁস করে টানতে লাগল দনের ওপারের দিকে তাকিয়ে সামনের একটা পা জলে আহুড়াল। আক্সিনিয়া অন্য বালতিটা ভরল, তারপর বাঁকটা কাঁধের ওপর তুলে লঘু ভঙ্গিতে দুলতে দুলতে চড়াই বয়ে উঠতে লাগল। গ্রিগোরিও ঘোড়া চালিয়ে মিল তার শেছন পেছন বাতাসে আক্সিনিয়ার ঘাঘরা এলোমেলো হয়ে উড়ছে, তার পোড়া জামাটে ঘাড়ের ওপরকার ছোট ছোট ফুরফুরে চেউখেলানো চুলগুলো নিয়ে খেলা করছে বাতাস শক্ত করে বাঁধা চুলের খোঁপার ওপর ঝলমল করছে রঙবেরঙের রেশমী সুতোব কাজ করা একটা ফিতে ঘাঘরার নীচে গৌজা গোলাপী রঙের জামাটা এতটুকু কোঁচকায় নি সুন্দর ডাবে তার খাড়া মসৃণ পিঠ ও ঢলঢল কাঁধদুটোকে ঘিরে রেখেছে পাহাড়ের ওপরে উঠতে গিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকতে হচ্ছে আক্সিনিয়াকে, তাহিতে জামার নীচ থেকে স্পষ্ট ফুটে উঠছে তার লম্বা শিরদাঁড়ি। গ্রিগোরি দৃষ্টি দিয়ে তার প্রতিটি চলনভঙ্গি অনুসরণ করতে করতে দেখতে পেল জামাব গায়ে দুই বগলের নীচে ফিকে হয়ে আসা ধূসর রঙের গোল গোল দুটো ঘামে-ভেজা দাগ তার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল আক্সিনিয়ার সঙ্গে ফের কথাবার্তা শুরু করে

‘স্বামীর জন্যে তোমার মন কেমন কেমন করবে তাই না?’

আক্সিনিয়া চলতে চলতেই ঘাড় ফিরিয়ে মৃদু হাসল

‘নয়ত কী? বিয়ে কর না?’ হাঁপাতে হাঁপাতে কথার মাঝখানে দম নিয়ে সে বলল ‘বিয়ে কর না আগে, তারপর বুঝতে পারবে প্রাণবঁধুর জন্যে মন কেমন করে কিনা।’

ঘোড়াটাকে ঠেলা দিয়ে তড়িয়ে আক্সিনিয়ার পাশাপাশি নিয়ে এলো গ্রিগোরি তার চোখে চোখে তাকাল

‘কোন কোন মেয়েমানুষ কিন্তু স্বামীকে বিদেয় দিয়ে বেশ খুশিই হয়। আমাদের দরিয়া পেত্রোকে ছাড়া ঠিক মতোতে শুরু করে।’

আক্সিনিয়া নাকের পাটা ফুলিয়ে জোরে নিশ্বাস নিল, মাথার চুল ঠিক করে নিয়ে বলল

‘স্বামী ত আর চৌড়াসাপ নয় রক্ত ঠিক চুষে খায় তোমার বিয়েটা আমরা  
কবে দিচ্ছি, শুনি’

‘জানি নে বাবার কী মত মনে হয় পলটনের বেগার শেষে হলে।’

‘তোমার বয়স এখনও কম, বিয়ে কোরো না’

‘কেন? ও কথা কলছ কেন?’

‘হাড় কালি হওয়াই সার’ বলে সে ভূভঙ্গি করে তাকাল চাপা ঠোঁটে মৃদু  
হাসল। এই প্রথম ত্রিগোবির লক্ষ করল ওর ঠোঁটদুটো নির্লজ্জ লালসাতুর, ফুলো-  
ফুলো।

মোড়ার কেশর গোছা করে আঙুলে জড়াতে জড়াতে সে বলল, ‘বিয়ে করার  
ইচ্ছে নেই কেউ একজন অমনিতেই ভালোবাসবে আমাকে।’

‘আচ্ছা নজর পড়েছে বুঝি কারও ওপর?’

‘আমার নজর পড়তে যাবে কেন? স্তেপানকে আগে বিদেয় দিয়ে  
এসো, তারপর’

‘আমার সঙ্গে ফটিনটি করতে এসো নি বলছি!’

‘কেন, মারবে নাকি?’

‘স্তেপানকে বলে দেব, তাহলেই টেব পাবে’

তোমার স্তেপানের আমি

‘দেখো বীষশুবুধ, চোখের জ্বলে যেন শেষ না হয়’

‘ভয় দেখিও না অক্সিনিয়া।’

আমি তোমাকে ভয় দেখাচ্ছি নে। যে ছুঁড়ির সঙ্গে তুমি তোমার যা খুশি  
তাই কর গে ওরা তোমার হাতমুখ মোছার বুঝলে নকশা তুলতে হয় তুলুক,  
আমার দিকে নজর দিতে এসো নি বাপু’

নজর দেব, আত্রও বেশি করে দেব।

‘বেশ দাও তাহলে নজর।’

অক্সিনিয়া আপসেব হাসি হাসল পথ ছেড়ে দিয়ে ঘোড়াটাকে ঘুরে যাওয়ার  
চেষ্টা করল ত্রিগোবির ঘোড়া পাশে ঘুরিয়ে এনে সান্তা আটকে দিল।

‘ছাড় বলছি ত্রিশকা!’

‘ছাড়ব না’

‘অমন আহাম্মুকি করো না স্বামীকে গোছগাছ করে দেবার জন্যে যেতে হবে।’

ত্রিগোবির মৃদু হেসে খোঁচা মেরে ঘোড়াকে ঝেপিয়ে দিল ঘোড়াটা পা ফেলে  
এগিয়ে গিয়ে অক্সিনিয়াকে খাতের গায়ে ঝেঁতে ধরল

‘ছাড় শরতান! ওই বে লোকজন রয়েছে দেখলে সবাই ভাববে কী?’

চারশাশে ভীতসমস্ত দৃষ্টি হেনে ভুবু কঁচকে আক্লিনিয়া চলে গেল একবার শিঙ ফিরেও তাকাল না।

দেউড়িতে দাঁড়িয়ে পেরো তখন বিদায় নিচ্ছে বাড়ির লোকজনের কাছ থেকে গ্রিগোরি ঘোড়ার নিচে জিন চাপাল। একহাত কোমরে বাঁধা তলোয়ারের ওপরে রেখে পেরো দ্রুত পায়ে সিঁড়ি বয়ে নেমে এলো। গ্রিগোরির হাত থেকে লাগ্যম তুলে নিল।

ঘোড়া গন্ধ শূঁকে পথ চিনতে পেরে অস্থির ভাবে পা বাড়াল। মুখের ভেতরে বলগার কড়া নাড়াচাড়া করার ফলে তার মুখ দিয়ে ফেনা উঠতে লাগল। একটা পা রেকাবে গলিয়ে দিয়ে, ঘোড়ার জিনের মাথাটা এক হাতে চেপে ধরে পেরো তার বাপকে বলল, 'লোম-ওঠা বলদগুলোকে খাটিয়ে মেরো না বাবা শরৎকালটা আসুক - বেচে দেওয়া যাবে। গ্রিগোরির জন্যে একটা ঘোড়া কিনতে হবে আমাদের আর দেখো, স্তোপের ঘাসও যেন বেচে দিও না মাঠে কেমন ঘাস হবে তা ত তোমার নিজেরই জানা আছে।'

'আচ্ছা, ডগবান মঙ্গল কবুন তোরা মঙ্গল হোক তোরা, ক্রুশচিহ্ন আঁকতে আঁকতে বুড়ো বলল।

পেরো তার অভ্যস্ত ভঙ্গিতে বিশাল ক্ষীত বগুটাকে জিনের ওপর হুঁড়ে দিল বেলটের ভেতরে গৌজা জামার পেছনের ভাঁজগুলো ঠিকঠাক করে নিল। ঘোড়া এগিয়ে গেল স্টকের দিকে ঘোড়ার পা ফেলার তালে তালে দুলতে লাগল তলোয়ারখানা। সূর্যের আলোয় সামান্য ঝকমক করে উঠল তার হাতলটা।

দারিয়া বাচ্চা কোলে করে পেছন পেছন চলল। মা উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে জামার হাতায় চোখ মুছছে তার নাকটা লাল হয়ে উঠেছে - বুকের সামনের বোলানো কাপড়ের খুঁটে মুছেছে।

'ও দামা, পিঠেগুলো! পিঠেগুলো ফেলে গেলে যে আলুর পিঠে।'

ছাগলছানার মতো তিড়িং বিড়িং করে লাফাতে লাফাতে দুনিয়াশকা ছুটল গেটের দিকে।

'অমন চিল্লাচিল্লি করছিস কেন রে হাঁদা।' একটু বিরক্তির সঙ্গে তার ওপর ঝাঁঝিয়ে উঠল গ্রিগোরি।

'পিঠেগুলো যে পড়ে রইল।' খিড়কির দরজার গায়ে হেলান দিয়ে ডুকরে কঁদে উঠল দুনিয়াশকা। তার তেল-চকচকে তপ্ত গাল বয়ে চোখের জল ঝরে পড়তে লাগল গায়ের আটশোরে ব্লাউজটার ওপর।

হাতের চেটো দিয়ে চোখ আঁড়াল করে দারিয়া দেখতে পেল সামনে একটা খুলোর পর্দার আড়ালে তখনও উডছে স্বামীর গায়ে সাদা জামাটা। গেটের পাশের



একটা ঝুটি পুটে আলগামতন হয়ে গেছে পাশ্বেলেই প্রকোফিষেভিচ সেটা নাজ দিয়ে গ্রিগোরির দিকে তাকাল

‘গেটটায় হাত লাগা এটা মেরামত করা দরকার। বরং কোনায় একটা নতুন ঝুটিই পুতে দে তারপর একটু ভেবে যেন কোন একটা সংবাদ জানাচ্ছে এই ভাবে জানাল, ‘পেত্রো চলে গেল’

ডালের বেড়াব ফাঁক দিয়ে গ্রিগোরি দেখতে পেল স্তেপান যাত্রার তোড়জোড় করছে সবুজ রঙের পশমী ঘাঘরায় বেশ সাজগোজ করেছে আঙ্গিনিয়া। স্তেপানের ঘোড়াটাকে সে বাইরে নিয়ে এলো স্তেপান হেসে ওকে যেন কী বলল ধীরেন্দ্রে কর্তাসুলভ ভঙ্গিতে বৌকে চুম্বা খেল তার কাঁধে সেই যে হাত রেখেছিল সেটা অনেকক্ষণ আর সরালই না রোদে পুড়ে আর খাটাখাটনির ফলে কালো বাঁহি তার হাতটা আঙ্গিনিয়ার সাদা ব্লাউজের ওপর এক টুকরো পোড়া কয়লার মতো দেখাচ্ছে গ্রিগোরির দিকে পিছন দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল স্তেপান বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছিল তার কামানো সুন্দর টানটান খাড়টা সামান্য গড়ানে চওড়া কাঁধজোড়া আর যখন সে বৌয়ের দিকে ঝুঁকে পড়ছিল চোখে পড়ছিল তার লালচে কটা বঙের চুম্বানো গোঁফের প্রান্ত

আঙ্গিনিয়া কেন জানি খিলখিল করে হাসতে হাসতে ঘড় নেড়ে কোন একটা ব্যাপারে অসম্মতি জানাল, আবারো বেকাবে উঠতে তার ভারে কুচকুচে কালো রঙের বিশাল ঘোড়াটা সামান্য টলে উঠল। ঘোড়ার পায়ের গতি বাড়িয়ে দিয়ে স্তেপান ফটকের বাইরে চলে এলো। জিনের ওপর সে গ্যাঁট হয়ে বসে আছে। আঙ্গিনিয়া রেকাব ধরে পাশাপাশি চলছে প্রভুভক্ত কুকুরের মতো সোহাগে গদগদ, সতুষ্য নয়নে স্বামীর আপাদমস্তক চোখ বুলাচ্ছে, মুখের দিকে চেয়ে আছে

এই ভাবে পাশাপাশি চলতে চলতে তারা পড়শীদের বাড়ি পেরিয়ে গেল, গেটের ওপাশে আড়াল হয়ে গেল

গ্রিগোরি অনেকক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে তাদের অনুসরণ করল।

## চার

সন্ধ্যার দিকে ঝড়বৃষ্টির উপক্রম দেখা দিল। গ্রামের মাথার ওপর জমাট বেঁধে উঠল ধূসর-বাদামী মেঘপুঞ্জ বাতাসের ঝাপটায় আলুথালু হয়ে দন চুড়োর আকারে টেউ ঘন ঘন আছড়ে ফেলতে লাগল পাড়ে। তীরের জলমগ্ন মাঠের ওপারে বৃষ্টিবিহীন বিদ্যুতের চমকে আকাশ বলদে উঠছে, থেকে থেকে মেঘের গুরু গুরু গর্জনে মাটি যেন পিষে যাচ্ছে। ঝড়ের মেঘের নীচে জানা ছড়িয়ে পাক

খাচ্ছে একটা চিল কাকেরা কা-কা রবে তাব পিছু নিয়েছে। ঠাণ্ডা বাতাস ছাড়তে ছাড়তে ঘন মেঘ পশ্চিম দিক থেকে বরাবর ছুটে চলল দসের বুকের ওপর দিয়ে কুলের জল্যমাঠের ওধারে আকাশ হয়ে উঠেছে ভয়ঙ্কর কালিঢালা, স্তব্ধ প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে আছে স্তম্ভভূমি। গ্রামের ভেতরে ঝপাঝপ শব্দে বাড়িঘরের জানলার খড়খড়ি বন্ধ হচ্ছে, সাক্ষ্য উপাসনা শেষে বুড়িরা ক্রুশচিহ্ন আঁকতে আঁকতে তড়িঘড়ি বাড়িমুখো ছুটেছে পলটন-ময়দানের মাথাব ওপর ধুলোর ধূসর কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠেছে, দোল খাচ্ছে দেখতে দেখতে বসন্তের নিদারুণ দহনে জর্জরিত ধরণীর বুকে বীজের মতো টুপটাপ এসে পড়তে লাগল বৃষ্টির প্রথম ফোঁটাগুলো

দুনিয়াশকা বিনুনি দোলাতে দোলাতে সাঁ করে উঠোন পেরিয়ে ছুটে গেল, ঝপ করে মুরগীর ঘরের ঝাঁপ বন্ধ কবে দিল তারপর উঠোনের মাঝখানে এসে দাঁড়াল। বাধার সামনে থমকে দাঁড়ানো ঘোড়ার মতো তার নাকের দু'পাশ ফুলে উঠল। রাস্তায় তিডিংবিডিং লাফলাফি শব্দ করে দিয়েছে বাচ্চারা। পাশের বাড়ির জ্যাট বছরের ছেলে মিশকা তার ঝাপের কানাওয়ালা ঢাউস টুপি মাথায় দিয়েছে টুপিটা বেজায় বড় হওয়ায় তার মাথায় ঢলঢল করে পাক খাচ্ছে, চোখের ওপর এসে পড়ছে। এক পায়ে উবু হয়ে বসে ঘুরপাক বেতে বেতে তারস্বরে চৈচাচ্ছে

আয় বৃষ্টি আয় রে ঝোপে,  
দল বেঁধে ঝাই ঝোপে,  
হেই ভগবান পায়ে পড়ি  
যিশুর কাছে মানত করি।

দুনিয়াশকা জীবন দুষ্টিতে দেখতে লাগল মিশকা কিন্তু হয়ে অসংখ্য ফুসকুড়ি-ছাওয়া খালি পাদুটো মাটিতে ঠুকছে। তারও ইচ্ছে হচ্ছিল বৃষ্টির জলে অমনি করে নেচে চুল ভিজিয়ে নেয় তাহলে তার চুল আরও ঘন আরও কোঁকড়ানো হবে, ইচ্ছে হচ্ছিল কাঁটাঝোপের ভেতরে হুমড়ি খেয়ে পড়ার ঝুঁকি নিয়েও মিশকার বন্ধুর মতো রাস্তার ধারের ধুলোবালির মধ্যে হাতে ভর দিয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু জানলা দিয়ে মা তাকিয়ে রয়েছে, রাগে তার চোঁটদুটো নড়তে দেখা যাচ্ছে। দীর্ঘশ্বাস কেলে বাড়ির ভেতরে ছুটে গেল দুনিয়াশকা বড় বড় ফোঁটায় ঘন হয়ে বৃষ্টি নামছে ঠিক যেন বাড়ির ছাদের ওপরই ফেটে পড়ল একটা বাক্স, তার শব্দগুলো টুকরো টুকরো হয়ে গড়িয়ে চলে গেল দনের ওপাড়ে

ঘর্মাক্ত গ্রিশকা আর তাব বাপ পাশের ঘর থেকে টেনে বার করেছে একটা গোটানো বেড়াডাল

‘টোনা সূতো আর জালের ছুঁচ নিয়ে আর, ষটপট’ দুনিয়াশকাকে চোঁচিয়ে বলল শ্রিগোবিন্দ

রান্নাঘরে আলো জ্বালানো হল জাল মেরামত করতে বসল দারিয়া বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে দোলাতে দোলাতে গজগজ করে চলল বুড়ি।

‘তোমারও বাপু বলি বুড়ো, চিবটা কাল যত রাজ্যের উদ্ভৃষ্টি কোথায় এখন ঘুমোবে, তা না তেলের দাম দিনকে দিন বাড়ছে আর উর্নি তেল পোড়াচ্ছেন এখন আবার কিসের মাছ ধরা? কোল চুলোয় টানছে তোমাদেব, শূনি? শেষকালে ডুবে-টুবে মরবে, উঠোনে যা তাম্বব চলেছে। ওঃ দেখ দেখ কেমন জিলিক দিচ্ছে। হে প্রভু বিশ্ব, হে স্বর্গের দেব-জননী’

মুহূর্তের জন্য চোখ ধাঁধিয়ে গেল উজ্জ্বল নীল আলোয়, রান্নাঘরের ভেতরটা হয়ে উঠল স্তব্ধ। শূণ্য শোনা গেল জানলার খড়খড়ির গায়ে বৃষ্টির ঝাপটার শব্দ। তারপরেই কড়কড় করে পড়ল বাজ দুনিয়াশকা তীক্ষ্ণ আর্দ্রনাদ তুলে জালের মধ্যে মুখ গুঁজল দারিয়া জানলা-দরজাগুলোর দিকে তাকিয়ে ছোট ছোট ক্রুশচিহ্ন করতে লাগল বেড়ালটা বুড়ির পায়ের সঙ্গে গা ঘসে আদর কাড়ার চেষ্টা করছিল বুড়ি আতঙ্কিত চোখে তার দিকে তাকাল

‘ওরে দুনিয়া তাজা রে এটাকে। এই অপয়া হে মেরীমাতা, হে স্বর্গের রানী, আমার সব পাপ ক্ষমা কর মা ওরে দুনিয়া, বেড়ালটাকে একুনি উঠোনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আর হুস গেলি তুই শন্নতানের বাহন তবে রে’

শ্রিগোবিন্দ হাত থেকে জালটা পড়ে গেল, নিঃশব্দ হাসিব দমকে সে কৈপে কৈপে উঠতে লাগল

‘তোদের অত কাঁচরম্যাচরটা কিসের? চোপ বলছি’ পাঙ্কলেই প্রাকোফিয়েভিচ ধমক দিল। ‘চটপট রিফু করে ফেল দেখি মেয়েরা! এই সেদিনও বলেছিলাম জালটা একবার দেখে রাখ।’

‘এখন আবার কী মাছ ধরবে?’ বুড়ি আমতা আমতা করে বলল

‘আঃ যা বোঝো না তাই নিয়ে কথা বলতে এসো না চূপ করে থাক। নদীর ঠিক ধার ঘেঁসে অল্প জলে স্টেলেট মাছ ধরব। মাছগুলো ঝড়ের ভয়ে এখন ঝেঁটিয়ে পাড়ের দিকে চলেছে। জল হয়ত এতক্ষণে ঘোলাই হয়ে গেল। ওরে দুনিয়া, দৌড়ে বাইরে গিয়ে একবার শোনার চেষ্টা কর ত খাতের মধ্যে জলের স্রোত খেলাছে কিনা’

অনিচ্ছাসত্ত্বেও দুনিয়াশকা এক পাশে কাত হয়ে এগিয়ে গেল দরজার দিকে

‘তোমাদের সঙ্গে জলকাদা ঠেলতে কে যাবে শূনি? দারিয়ার যাওয়া চলবে না, ওর বুকে ঠাণ্ডা জমে যেতে পারে।’ বুড়ি কিছুতেই সম্মে না

‘আমি আর গ্রিগরি ত আছিই অন্য জালটাব জনো না হয় আন্নিয়াকে  
আর আরও একজন মেয়েকে ডেকে নেব

দুনিয়াশ্কা ছুটেতে ছুটেতে এসে ভেতরে ঢুকল। সে হাঁপাচ্ছে তাব চোখের  
পান্নবের ওপর ফোঁটা ফোঁটা কৃষ্টির জল টলমল করছে কালো মাটির সোঁদা গন্ধ  
উঠছে তার গা থেকে

‘ধাতের ভেতরে স্রোত গর্জাচ্ছে ওঃ কী গর্জন!’

‘ঘাবি আমাদের সঙ্গে জলকান ঠেলতে?’

‘আর কে যাবে?’

‘আরও দু’একটা মেয়েকে ডেকে নেব।’

‘যাব।’

‘বেশ! তাহলে মোটা বনাত কাপড়ের কোর্তাটা গায়ে ফেলে একছুটে চলে  
যা আন্নিয়ির কাছে ও যদি যেতে রাজি থাকে তা হলে বলবি মালাশ্কা  
মলোডাকেও যেন ডেকে নেয়।’

‘সে মেয়ে ঠাণ্ডা জমার নয়’ গ্রিগোরি মুচকি হেসে বলল ‘গায়ে যা চর্বি!  
একটা আঙ্গ নাদুস নাদুস শূয়োয়ের সমান।’

‘কিছু শুকনো খড় নিলে পারতিস রে গ্রিগরি,’ মা পরামর্শ দিল ‘বুকের  
কাছটার রেখে দে নইলে বুকের ভেতরে ঠাণ্ডা বসে যাবে।’

‘যা দিকি গ্রিগোরি, চট করে বানিকটা খড় নিয়ে আয় তোর মা ঠিকই বলেছে।’

শিগগিরই মেয়েদের নিয়ে ফিবে এলো দুনিয়াশ্কা আন্নিয়ির গায়ে একটা  
হেঁড়াখোঁড়া জ্যাকেট কোমরে বেল্টের জায়গায় দড়ি বাঁধা নীচে পরেছে একটা  
নীল ঘাঘরা এই পোশাকে তাকে আরও ছোটখাটো, আরও রোগা দেখাচ্ছে  
দারিয়ার সঙ্গে ঠাট্টাতামাসা করতে করতে সে মাথা থেকে গুড়নাটা খুলে খোঁপা  
আরও শক্ত করে বেঁধে নিল, তারপর মাথা পেছনে হেলিয়ে গুড়না দিয়ে ঢাকতে  
ঢাকতে নিবৃত্তাপ দৃষ্টিতে গ্রিগোরির দিকে তাকাল। স্কুলারী মালাশ্কা চৌকাটের  
সামনে মোজা বাঁধতে বাঁধতে সর্দি বসা ভাঙা ভাঙা গলায় বলল

‘বস্তাগুলো নেওয়া হয়েছে ত? ভগবানের দিকি, আজ ঝপাঝপ মাছ ধরব।’

সকলে বেরিয়ে এলো উঠানে ভিজ জবজবে মাটির ওপর মুখল  
ধারে কৃষ্টি পড়ছে খানায় খন্দে জমা জল ফেনিয়ে উপচে পড়ে গড়িয়ে চলেছে দনের  
দিকে।

গ্রিগোরি চলেছে আগে আগে একটা অকারণ খুশি-খুশি ভাবে যেন সে  
উজ্জ্বলিত।

‘দেখো বাবা এখানে আবার একটা খানা আছে।’

‘উঃ কী অন্ধকার!’

‘আমাকে ধরে থাকিস বে আন্নিউশা। আমবা একসঙ্গেই গাভডায় পড়ব, ভাঙা গলায় বিলখিল করে হেসে বলল মালাশ্কা

‘দ্যাখ্ গ্রিগোরি, মাইদামিকডসের ঘাট যেন মনে হচ্ছে?’

‘হ্যাঁ বাবা, তাই।’

‘এইখেন থেকেই শুরু করা যাক আছাড়ি-পিছাড়ি বাতাসেব আওয়াজ্বেব ওপর গলা চড়িয়ে পাত্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ হাঁক পাড়ল

‘শুনতে পাচ্ছি না খুড়ো,’ মালাশ্কা কর্কশ গলায় চৈচাল।

‘নেমে পড়, ভগবানের নাম করে নেমে পড়! আমি বেশি জলে নামছি শুনহিস তেরা, বেশি জলে নামছি আমি। ওরে ওরে হারামজাদী মালাশ্কা, কানে কানো নাকি? কোথায় টেনে নিয়ে চললি? আমি বেশি জলের দিক থেকে এগোচ্ছি গ্রিগোরি, গ্রিশ্কা আন্নিনিয়া পাডের দিক থেকে টানুক’

দনের হু হু গর্জন বাতাসে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে তির্যক বারিধারার চামর জলের তলার মাটিতে পা টিপে টিপে গ্রিগোরি নেমে গেল কোমর-জলে একটা আঠাল ঠাণ্ডা স্রোত বুক পর্যন্ত উঠে এসে জ্বলপুটাকে যেন লোহার পাতে অষ্টপুটে জড়িয়ে ফেলল ঢেউগুলো যেন চাবুকের মতো আছড়ে পড়ছে চোখমুখে চোখদুটো সে শক্ত করে বুজ রেখেছে বেডাজালটা গোল হয়ে ফুলে উঠেছে, টেনে নিয়ে যাচ্ছে গভীর জলে। গ্রিগোরির উলের মোজা পরা পা জলের তলার বালিতে হড়কে যাচ্ছে। জালটা হাত থেকে ফসকে যাচ্ছে ক্রমশই গভীরতা বাড়ছে একটা খৌদলমতন জায়গায় পা পড়তেই হড়কে গেল এক টানে স্রোত তাকে নিয়ে এলো মাকদরিয়ায় যেন শুষে টেনে নিয়ে যেতে চায় নীচে ডান হাতে প্রাণপণে জল কেটে গ্রিগোরি পাবের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করে। গভীর কালো জলের কলকল ঘূর্ণি আঁজ তাকে যেমন ভয় পাইয়ে দিয়েছে তেমন ভয় এর আগে আর কখনও সে পায় নি। শেষকালে পায়ের নীচে হড়হড়ে মাটি পেয়ে সে উল্লসিত হয়ে উঠল। কী একটা মাছ যেন তার হাঁটুতে ঘাই গেল

‘ঘুরে আরও বেশি জলে চলে যা!’ মিশমিশে কালো অন্ধকার ভেদ করে কোথা থেকে যেন ভেসে এল বাবার কণ্ঠস্বর

বেডাজালটা কাত হয়ে আবার নিয়ে পড়ল গভীর জলে ফের জলের তোড়ে পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেল এবারে গ্রিগোরি মাথা পিছনে হেলিয়ে মুখ দিয়ে জল কুলি করতে করতে সাঁতরাতে লাগল।

‘আন্নিনিয়া, ঠিক আছে ত?’

‘এখন পর্যন্ত আছি’

‘বুট কি খামল?’

‘গুড়িবুট্টি ধোমে গেছে, কিন্তু বড় বড় ফোঁটা একুনি শূন্য হ’ল বলে’

‘অত চোঁচিও না, বাবা শুনতে পেলো আর আস্ত রাখবে না।’

‘বাপকে তাহলে ডরাও?’

কিছুক্ষণ দৃষ্টিতে চুপচাপ জল যেন আঠাল ময়দার তাল প্রতি পদে জড়িয়ে ধরছে।

‘গ্রিশা, একটা শেকড়সুন্ধ গাছের গুড়ি পারের কাছে ডুবে আছে। আমাদের ঘুরে যেতে হবে’

একটা প্রচণ্ড ধাক্কায় গ্রিগোরি দূরে ছিটকে পড়ল। দড়াম আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে পড়ল জল। মনে হল খাদের গা থেকে যেন একটা পাথরের চাঙড়া জলে খসে পড়ল

‘আ-আ-আ’ পারের কাছে কোথায় যেন আর্দ্রনাদ করে উঠল অক্সিনিয়া দাবুণ ভয় পেয়ে জল থেকে মাথা তুলে গ্রিগোরি আওয়াজ লক্ষ করে নীতার কাটিতে লাগল

‘অক্সিনিয়া’

শুধু বাতাস আর চঞ্চল জলরাশির কলকল আওয়াজ

‘অক্সিনিয়া গ্রিগোরি চোঁচাল ভয়ে সে হিম হয়ে গেল

এ-ই গ্রি-গো-রি। দূর থেকে ভেসে এলো বাপের চাপা কণ্ঠস্বর

গ্রিগোরি এলোপাতাড়ি হাত ছুঁড়তে থাকে পারের নীচে চটচটে কী যেন ঠেকতে হাতে চেপে ধরল। জাল।

‘গ্রিশা, কোথায় তুমি?’ কান্নায় ডরা অক্সিনিয়ার গলা

‘তখন সাড়া দিলে না যে বড়?’ চার হাত পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে পারে উঠে আসতে আসতে রাগে গাঁকগাঁক করে বলল গ্রিগোরি।

জালটা জড়িয়ে দলা পাকিয়ে গেছে উঁচু হয়ে বসে কীপতে কীপতে ওরা জালের জট ছাড়াতে লাগল। হেঁড়া মেঘের ফাঁক থেকে বেরিয়ে এসেছে চাঁদ তীরের কাছের জলামাঠের ওপার থেকে ভেসে আসছে মেঘের চাপা গুরু গুরু আওয়াজ জল জমে মাটি চকচক করছে আকাশ ব্যুষ্টিতে ধোয়া-মোছা হয়ে গিয়ে এখন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, স্বচ্ছ

জালের জট ছাড়াতে ছাড়াতে গ্রিগোরি অক্সিনিয়ার মুখ লক্ষ করে দেখল মুখ তার খড়ির মতো সাদা ফেঁকাসে কিন্তু তার রক্তিম ক্ষুরিত ঠোঁটে তখনও হাসি লেগে আছে

হাঁপাতে হাঁপাতে দম নিয়ে আক্সিনিয়া বলল 'এক ধাক্কা পায়ের গায়ে আছড়ে পড়ে যেতে আমার আর মাথার ঠিক ছিল না। ভয়ে মরে যাই আর কি। আমি ডাবলাম তুমি বুঝি ডুবেই গেলো।

ওদের হাতে হাত লেগে গেল আক্সিনিয়া তার নিজের হাতটা গ্রিগোরির জামার হাতার মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে চেষ্টা করল।

তোমার জামার হাতার ভেতরে কী সুন্দর গরম ' করুণ সুরে আক্সিনিয়া বলল এদিকে আমি ঠাণ্ডায় জমে গেলাম সর্বান্তে ছুঁচ ফুটছে

'এই যে হতভাগা বোয়ালের পো কোথা দিয়ে জাল ছিড়ে সটকান দিয়েছে।'

গ্রিগোরি জাল সরিয়ে তার মাঝখানে দু'হাত সমান আড়াআড়ি একটা হেঁড়া জায়গা দেখাল

বালিয়াড়ি দিয়ে কে যেন ছুটেছে ছুটেছে আসছে গ্রিগোরি চিনল দুনিয়াশকাকে।  
দূর থেকেই সে তাকে চোঁচিয়ে বলল

'সুজো কি তোব কাছে?'

'হ্যাঁ, এই যে।'

দুনিয়াশকা হাঁপাতে হাঁপাতে সামনে ছুটে এলো

'তোমরা এখানে বসে আছ কেন? জলের ধারের যে জায়গাটায় আমরা আছি বাবা তোমাদের একুনি ওখানে যেতে বলল আমরা ওখানে এক বস্তা স্টালোট মাছ ধরেছি।' দুনিয়াশকার কণ্ঠস্বরে বিজয়োলাস গোপন রইল না

আক্সিনিয়া দাঁতে দাঁত ঠকঠক করতে করতে জালের ফুটো সেলাই করে ফেলল তারপর শরীরটাকে গরম করার জন্য গুরা দু'জনেই জোর কদমে ছুটল বালিয়াড়ির দিকে।

ভুবন্ত মানুষের মতো ফুলে ওঠা, জলে ভিজে কাটা-ফাটা আঙুলগুলো দিয়ে সিগারেট পাকাজিল পাঙ্কলেই প্রকোফিয়েভিচ। ঘুরে এক পাক নেচে সে বড়াই করে বলল

'প্রথম বারে ধরেছি আটটা। পনের বারে ' বলতে বলতে একটা হাঁপ ছেড়ে সিগারেটটা ধরিয়ে বস্তার গারে লাথি মেরে দেখাল।

আক্সিনিয়া কৌতূহলভরে ভেতরে উঁকি মারল বস্তার ভেতর থেকে আছাড়ি-পিছাড়ির আওয়াজ হচ্ছে - স্টালোট মাছের জান বড় কড়া তখনও ভেতরে খলবল করছে।

'তোরা কোথায় ছিলি?'

একটা বোয়াল মাছ জাল ছিড়ে দিয়েছে '

‘মেরামত করেছিস ?’

‘কোন রকমে ছেঁড়া সুতোগুলো জুড়ে দিয়েছি ’

‘আচ্ছা, এবারে একবার হাটুজলে নামব আমরা, তারপর বাড়ি নেমে পড়  
কি রে গ্রিগরি। এমন গুম মেরে বইলি যে?’

গ্রিগোরি অসাড়ে পাদুটো ফেলে জল ঠেলে চলল। অগ্নিনিয়া এমন কাঁপছিল  
যে জালের এ প্রান্ত থেকেও গ্রিগোরি তার কাঁপুনি টের পাচ্ছিল

‘নাড়িও না’

‘নাড়াতে না পারলে ত খুশিই হতাম কিন্তু আমার দম আটকে আসছে যে।’

‘তা হলে শোনো উঠে পড়া যাক চুলায় যাক মাছ।’

ঠিক সেই মুহূর্তে বেড়াজালের ওপর দিয়ে টুপ করে লাফিয়ে উঠল বড়সড়  
একটা মৃগল। পায়ের গতি বাড়িয়ে দিয়ে গ্রিগোরি চটপট জালের বেড় দিয়ে  
ফেনল, জালের খুঁট ধরে টান মারল। অগ্নিনিয়া কুঁজো হয়ে কুঁকে পড়ে পাড়ের  
দিকে ছুটল বালির ওপর সরসর আওয়াজ করে জল শেছনে সরে গেল, মাছটা  
ছটকট করতে লাগল

‘পায়ের কাছাকাছি জলার ওপর দিয়ে যাব ?’

‘বনের ভেতর দিয়ে তাড়াতাড়ি হবে এই, তোমাদের আর কতক্ষণ লাগবে?’

‘তোরা এগিয়ে যা আমরা নাগাল ধবছি জালটা একটু খোয়া পাকলা করে  
নিই।’

অগ্নিনিয়া ভুবু কুঁচকে ঘাঘরাটা চিপে নিল মাছের বস্তাটা এক টানে কাঁধের  
ওপর তুলে নিয়ে প্রায় উর্ধ্ব্বাসে ছুটল বালিয়াড়ির ওপর দিয়ে। গ্রিগোরি জাল  
বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল ‘শ’ দূরেক গজ চলার পর অগ্নিনিয়া কাতরাতে শুরু করল

‘আমার আর জোরবল নেই। পায় সাড় পাচ্ছি না।’

‘এই যে এখানে একটা পুরনো খড়ের গাদা দেখছি। ভেতরে ঢুকে গা গরম  
করে নেবে নাকি?’

‘মন্দ হয় না নইলে বাড়ি আর পৌঁছুতে হবে না এখানেই মাঝা পড়ব’

গ্রিগোরি খড়ের গাদার মাথাটা কাত করে মুচড়ে ফেলে দিয়ে ভেতরে একটা  
খোঁড়ল তৈরি করে নিল বহুদিন পড়ে থাকা খড়ের জ্যাপসা গরম গজ্জ ভক  
করে নাকে এসে লাগল।

‘একেবারে ভেতবে গিয়ে ঢুকে পড় এখানটায় উনুনের মতো গরম’

অগ্নিনিয়া বস্তাটা ফেলে দিয়ে গলা পর্যন্ত শরীর খড়ের ভেতরে ডুবিয়ে দিল।

‘ওঃ কী চমৎকার’

ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে গ্রিগোরি গিয়ে পাশে শুয়ে পড়ল অগ্নিনিয়ার ভিজে



চুল থেকে একটা মৃদু উদ্ভেলক গন্ধ উঠতে লাগল। অগ্নিনিয়া মাথা পেছনে হেলিয়ে শূয়ে ছিল। আধ খোলা মুখে সে সমান ভালে নিশ্বাস নিয়ে চলছিল।

‘তোমার চুলে ধুতরো ফুলের গন্ধ জান ত? সেই যে সাদা বড়ের গিগোরি তার ওপর ঝুঁকে পড়ে ফিসফিস করে বলল।

অগ্নিনিয়া কোন কথা বলল না। কুয়াশাঘন, দূরান্তগামী দৃষ্টি তার নিবদ্ধ হয়ে আছে কয়ে যাওয়া ম্লান চাঁদের ফালিটার দিকে

গিগোরি পকেট থেকে হাতখানা বার করে হঠাৎ অগ্নিনিয়ার মাথাটা কাছে টেনে নিল ঝটকা মেয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে অগ্নিনিয়া উঠে নীড়াল।

‘ছাড়ো বনছি।’

‘চুপ।’

‘ছাড়ো, নইলে চৈচাব।’

‘দাঁড়াও অগ্নিনিয়া।’

‘পান্তেলেই বুড়ো বুড়ো গো।’

‘কী হল পথ হারিয়েছিস নাকি তোরা?’ বুব কাছেই একটা কাঁটাঝোপের ভেতর থেকে সাড়া দিল পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ

গিগোরি দাঁতে দাঁত চেপে বড়ের গাদা থেকে লাফিয়ে নীচে নামল।

‘কী বাপার অমন চৈচাচ্ছিস কেন? পথ হারিয়েছিস বুঝি?’ এগিয়ে আসতে আসতে বুড়ো আবার জিস্কেস করল

অগ্নিনিয়ার মাথার ওড়না পেছনে সরে গিয়েছিল বড়ের গাদার পাশে নীড়িয়ে সে ওড়নাটা ঠিক করে নিচ্ছিল। তার মাথার ওপর তখন গরম ভাপ উঠছে।

‘নাঃ পথ ঠিক হারাই নি। তবে মনে হচ্ছিল যেন জমে যাচ্ছি।’

‘ধুন্তোর মোয়ে।’ ওই ত ওখানে একটা বড়ের গাদা আছে গা গরম করে নে না।’

অগ্নিনিয়া মুচকি হেসে নীচু হয়ে বস্তুটাব দিকে হাত বাড়াল।

## পাঁচ

বিশ ক্রোশ মতো দূরে সের্হাকভ গ্রাম। সেইখানে শিক্ষাশিবির পেছো মেলেবভ আর স্তোপান আন্তাখভ চলেছে একই ঘোড়ার গাড়িতে। তাদের সঙ্গে আছে গ্রামের আরও তিনজন কসাক ফেদোত বদভস্কোভ অল্পবয়সী, অনেকটা

কালমিকদের মতো দেখতে, মুখে বসন্তের দাগ, আতামান\*-গার্ড-রেজিমেন্টের দ্বিতীয় দফার রিজার্ভ-মলভুক্ত\*\* ব্রিসানফ তোকিন, সকলের কাছে ব্রিস্তোনিয়া নামে যার পরিচয়, আর গোলন্দাজ ইভান তোমিলিন। তোমিলিন যাচ্ছে পের্সিয়া-নভকায। পথে দানাপানি দেওয়ার জন্যে প্রথমবারের বিরতির পর ব্রিস্তোনিয়ার সাড়ে তিন হাত ঘোড়া\*\*\* আর স্ত্রোপানের কালো ঘোড়াটাকে গাড়িতে জোতা হল বাকি তিনটে ঘোড়া পিঠে জিন বীধা অবস্থাতেই পেছন পেছন চলল। আতামান-গার্ডরেজিমেন্টের বেশির ভাগ কসাকের মতোই মাথামোটা গোছের, মশাসই চেহারা ব্রিস্তোনিয়ার সেই গাড়ি চালাচ্ছিল বিশাল পিঠটাকে নুইয়ে চাকার মতো করে গাড়ির ছইয়ের ভেতরকাব আলো আড়াল দিয়ে সে বসে ছিল থেকে থেকে গভীর খাদের গলয় গমগম করে হাঁক ছেড়ে ঘোড়াগুলোকে সে ভড়কে দিচ্ছিল টানটান করে নতুন তেরপলে ছাওয়া ছইয়ের ভেতরে শূয়ে শূয়ে তামাক টানছিল পেত্রো মেলেকভ স্ত্রোপান আর গোলন্দাজ তোমিলিন ঘোড়োত বদভক্সোভ পেছন পেছন হেঁটে যাচ্ছিল কালমিকদের ধরনের বাঁকা বাঁকা

\* আতামান - জারের আমলের রাশিয়ার কসাকদের সর্বস্তরের নির্বাচিত নেতা বা সর্দাররাই এই আখ্যায় অভিহিত হত দন-কসাক আর্মির পরিচালনায় থাকত আর্মি আতামান, স্তানিংসা বা কসাক জেলা সদরের নেতৃত্ব দিত স্তানিংসা আতামান অর্থাৎ জেলা সদরের সর্দারেরা। আবার যে-কোন কসাকদল কোন অভিযানে নামার আগে তার বিশেষ আতামান বা অভিযানকালীন নেতা নির্বাচন করত। ব্যাপক অর্থে 'আতামান' হল নেতা বা সর্দার এই স্বকম সর্দার ছাড়া ছোট সর্দারও ছিল ১৭২৩ সালে দন কসাকরা যখন চূড়ান্ত ভাবে তাদের স্বাধীনতা হারাল তখন থেকে সমস্ত কসাক সেনাবাহিনীর 'আতামান' আখ্যায় নামক হতে লাগল বংশপরম্পরায় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত উত্তরাধিকারীদের ওপর। আসলে অবশ্য নির্বাচিত আতামান বা নেতারাই সেনাবাহিনী পরিচালনা করত এরাই ছিল ছোটসর্দার বা সহনেতা অনূঃ

\*\* দন-সেনাবাহিনীর নিয়ম অনুযায়ী ২০ বছর পূর্ণ হলেই যে-কোন পুরুষকে সাময়িক চাকরিকে ঢুকতে হত তাকে কাজ করতে হত ১৮ বছর এই ১৮ বছরের মধ্যে কতকগুলো পর্যায়বিভাগ ছিল প্রথম বছর অর্থাৎ প্রকৃতি পর্যায়' কাটত শিক্ষাদিবিরে অন্তঃপর চার বছরের জন্য সক্রিয় চাকরি পরের পর্যায় ৮ বছর তখন নিবিরের জমায়েতগুলোতে তার নিয়মিত ডাক পড়ত। কিছু কিছু বিশেষ সুযোগসুবিধা সে পেত এই পর্যায়টিকেই চার বছর করে দুটো দফায় ভাগ করা হত শেষে আরও পাঁচটা বছর তার নাম রিজার্ভ তালিকাভুক্ত থাকত ৪০ বছর বয়সে চাকরি থেকে অবসর পেত - অনূঃ

\*\*\* সাড়ে তিন হাত উঁচু জারের সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে হলে কসাকদের সঙ্গে নিয়ে আসতে হত নিজস্ব ঘোড়া সে ঘোড়াও আবার উঁচুতে অস্ত্র তিন হাত হওয়া চাই। অনূঃ

পাদুটো ধুলোজরা পাথে বিধিয়ে বিধিয়ে চলতে তার বিশেষ কোন অসুবিধে হচ্ছিল বলে মনে হয় না।

সরির আগে আগে চলেছে ব্রিস্টোনিয়ার গাড়ি তার পেছন পেছন চলেছে আরও সাত-আটটা গাড়ি। সেগুলোর সঙ্গে আবার জিন-কাগানো ও জিন-ছাড়া কতকগুলো ঘোড়া।

রাস্তার মাথার ওপর পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে হো-হো হসির ফোয়ারা। চিংকার-চৈচামেচি, অলস-মধুর কর্ণের গান, ঘোড়ার নাক-ঝাঁড়ার আওয়াজ, ঘোড়ার পিঠে ঝোলানো খালি রেকাবের ঝনঝন।

পেত্রোর মাথার নীচে লেড়ো বিস্কুটের থলে পেত্রো শূয়ে শূয়ে তার ইয়া লম্বা হলদে গৌফের ডগা পাকাচ্ছে

‘স্তেপান’

‘কী?’

‘আয়, এই যে পল্টনে যাচ্ছি এর জন্য একটা গান গাওয়া যাক কী বলিস?’

‘বজ্র গরম। গলা-টলা সব শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠেছে।’

‘কাছেপিঠে গ্রামের মধ্যে কোন সরাইখানা নেই। তার জন্যে বসে থেকে লাভ নেই।’

‘বেশ তাহলে শুরু কর। কিন্তু তুই যে গানে তেমন সরেস নোস্। হাঁ গায় বটে তোদের গ্রিশ্কা গলা ত নয় যেন খাঁটি বুপোর তারে বীধ। নাচগানেরে হুল্লোড়ে আমরা ওর সঙ্গে গাইতাম বটে - কিন্তু একেবারে হেঁড়ে গলায়।’

স্তেপান মাথা পেছনে হেলিয়ে গলা বীকারি দিল। তারপর চাপা গমগমে গলায় ধরল

আকাশতরা আহা মধুর আলো,

সে কোন্ ভায়ে উদয় আজি হল

তোমিলিন মেয়েদের ভজিতে গালে হাত ঠেকিয়ে কনুণ নাকী সুরে ধুয়ো ধরল গৌফের ফাঁকে মুচকি হেসে শেত্রো তাকিয়ে দেখল প্রশস্তবক গোলন্দাজের কপালের রংের গিটগুলো প্রাণপণ গানের চেষ্টায় নীল হয়ে উঠছে।

কন্যে আমার যোবতী তাই হায়

বিলম্বিতে জল আনিতে যায়

ব্রিস্টোনিয়ার দিকে মাথা দিয়ে স্তেপান শূয়ে ছিল। কনুইয়ে ভর দিয়ে পাশ ফিরল সে, তার টানটান সুন্দর যাড়টা গোলাপী হয়ে উঠেছে

‘কই হে ধর, ব্রিস্টোনিয়া!’

মনের কথা বুঝে কোন এক ছোঁড়া  
রসের নাগর ছুটায় সাথের ঘোড়া

স্তম্ভপান চোখ বড় বড় করে হাসি হাসি মুখে ফিরে তাকাল পেত্রোর দিকে  
মুখের ফাঁক থেকে গোঁফ বার করে গলা মেলাল পেত্রো এলোমেলো গজগজে  
বাড়ি ভাঙি বিশাল চোয়ালের ফাঁক দিয়ে খ্রিস্তোনিয়ার কণ্ঠ গর্জন করে উঠল,  
কাঁপিয়ে তুলল গাড়ির তেরপলের ঢকনাটা।

জিন কষায়ে রাজা ঘোড়ায় চড়ে  
খাইল নাগর সেই যোবতীর তরে

খ্রিস্তোনিয়া তার ইয়া বড় খালি পায়ের গোড়ালি কাত করে রেখে অপেক্ষা  
করতে থাকে কখন স্তম্ভপান ফের শুরু করে। এদিকে স্তম্ভপান চোখ বন্ধ করে,  
ঘর্মাক্ত মুখ ছামায় রেখে স্নিগ্ধকণ্ঠে গান গেয়ে চলল কখনও গলা নামিয়ে মৃদুকণ্ঠে,  
কখনও বা বনবন আওয়াজ তুলে

পথ ছাড় গো যাব জলের ঘাটে,  
ডিয়াস লাগি ঘোড়ার ছাতি ফাটে।

আবার একটা গমগমে ঘণ্টার আওয়াজের মতো চতুর্দিক কাঁপিয়ে ফেটে  
পড়ল খ্রিস্তোনিয়ার কণ্ঠস্বর আশেপাশের গাড়িগুলোর লোকজনও সেই গানের  
সঙ্গে মেলাল তাদের কণ্ঠ গাড়ির ঢাকার লোহার বেড়গুলো ধাক্কা খেয়ে ঠুনঠুন  
আওয়াজ তুলছে, ধুলোয় ঘোড়াগুলো হাঁচছে বন্যার জলের মতো প্রবল হ্রোতে  
পথের ওপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে গানের সুর স্তম্ভপানের একটা শুকিয়ে  
ওঠা পুকুরের রোসে পোড়া বাদামী রঙের শরবনের মাথার ওপর থেকে সাদা  
জানা মেলে উড়ে গেল একটা টিটিভ পাখি পাখিটা ডাক ছাড়তে ছাড়তে উড়ে  
গেল একটা নাবাল উপত্যকার দিকে। পারা'রঙের খুদে চোখ মেলে দেখতে লাগল  
তেরপল ঢাকা সারি সারি গাড়ি চলেছে, ঘোড়ার খুরে খুরে পাকিয়ে পাকিয়ে  
উঠছে ভারী ধুলোর মেঘ, রাজার ধার দিয়ে ধুলোমাখা সাদা জামা গায়ে লম্বা  
লম্বা পা ফেলে হেঁটে চলেছে লোকজন পাখিটা নীচু উপত্যকার ভেতরে চলে  
গেল, কালো বুকে ভর দিয়ে আছড়ে গিয়ে পড়ল জীবজন্তুদের পায়ে মাড়ানো  
শুকনো ঘাস-পাতার ওপর এখন আর সে দেখতে পাচ্ছে না পথের দৃশ্য পথে  
তখনও গাড়িগুলো চলেছে ঘর্মাক্ত আওয়াজ তুলে তখনও জিন-লাগানো ঘর্মাক্ত

ঘোড়াগুলো অনিচ্ছাভরে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছে, শুধু ধূলিধূসরিত জামা গায়ে কসাকরা তাদের নিজেরদের গাড়ি ছেড়ে দ্রুত পায়ে ছুটেছে সামনের গাড়িটার দিকে তার চারপাশে জড় হয়ে হাসির হব্বা তুলছে।

স্ত্রোপান সোজা হয়ে উঠে পঁড়াল গাড়ির ভেতরে এক হাতে সে ধরে আছে গাড়ির তেরশলের ছই, আরেক হাতে তাল নিয়ে চলেছে। গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দ্রুত ভেসে চলল তার গান

আমার পাশে বসিস নে রে,  
আমার পাশে বসিস নে।  
বলবে লোকে তুই আমারে  
বাসিস ভালো  
বাসিস ভালো  
আমার কাছে আনাগোনা  
করিস ঘন ঘন  
করিস ঘন ঘন

বেশ কিছু হেঁড়ে গলা গানের কথাগুলো পড়তে না পড়তে লুফে নিয়ে গ্রচণ্ড শব্দে পথের ধারের ধুলোর ওপর ফাটিয়ে দেয়

বংশ আমার সামান্য নয়,  
সামান্য নয় মোটে -  
রাজাকানের বংশ আমার,  
বংশ রাজাকানের  
নাগর আমার রাজার কুমার,  
মজ্ঞ মানুষ বটে

ফেলোত বদভন্দ্যোস্ত শিস দিতে লাগল। ঘোড়াগুলো বসে পড়ার ডক্কিতে নীচ হয়ে দড়িদড়া ছিড়ে বেরোনের চেষ্টা করল শোত্রো ছইয়ের ভেতর থেকে শরীর বার করে দিয়ে হাসতে হাসতে টুপি দোলাতে লাগল স্ত্রোপান কৌতুকভরে কঁধ নাচাতে লাগল চোখ ধাঁধানো বীকা হাসিতে সে ডগমগ পথের ওপর চলেছে একটা ধুলোর পাহাড়। স্ত্রিস্তোনিয়ার মাথাব চুল আলুথালু, ঘামে সে ভিজ়ে উঠেছে, গায়ে তার বেলট খোলা ইয়া লম্বা জামা। সে উবু হয়ে বসে চলতে চলতে চরকির মতো ঘুরপাক খেয়ে ভুরু ঝুঁচকে, হাঁকডাক তুলে একটা কসাক নাচ জুড়ে দিল রাজার ধূসর ব্রেস্মী ধুলোর ওপর পড়তে লাগল তার ইয়া ইয়া খালি পায়ের দৈত্যাকার ছাপ

হলুদ রঙের একটা উজ্জাদ বাগির ঢিবি সামনের দিকটা বেরিয়ে আছে ড্রিটেকপালের মতো। তারই ধারে এসে তারা থামল রাতের মতো।

পশ্চিম দিক থেকে ধেয়ে আসছে ঝড়ের কালো মেঘ তার কালো ডানা থেকে টুইরে টুইরে পড়ছে বৃষ্টির ফোঁটা ঘোড়াগুলোকে একটা পুকুর থেকে জল খাওয়ানো হল বিষম বেতসের ঝড় বাতাসে ঘাড় গুঁজে ঝুঁকে পড়ে আছে বাঁধের ওপরে বন্ধ পানায় ঢাকা জলের বুকে ছোট ছোট ঢেউয়ের দাগগুলো যেন রিক্ত, অবসন্ন সেখানে বিদ্যুতের ছায়া ঝলমল করে একেবেঁকে চলেছে বাতাস কুঠাডরে বৃষ্টির ফোঁটা ছড়াচ্ছে, যেন ধরিত্রীর প্রসারিত কালো হাতের ওপর ঢেলে দিচ্ছে জ্বিকার দান।

ঘোড়াগুলোর পা হেঁদে চরতে দেওয়া হল তিনজন লোককে পাহারায় রেখে দেওয়া হল। বাকিরা আগুন ছেলে গাড়ির জোয়ালের আগায় হাঁড়ি ঝুলিয়ে মিল

রামার তার পডল জিন্সেনিয়ার ওপর হাঁড়ির ভেতরে হাতা ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে সে এক গল্প বলে চলল। তাকে ঘিরে বসে ছিল কসাকরা।

‘ঢিবিটি বেশ উঁচু হবে অনেকটা এই এটির মতো আর কি বাপকে আমি বললাম - সদগতি হোক তাঁর আত্মার ‘আচ্ছা, আমরা যে কিছু না বলে কয়ে, মানে, কারও কোন কুকুম ছাড়াই ঢিবিটা খোঁড়াঝুঁড়ি শুরু করে দিলাম এর জন্যে আত্মমান আমাদের ওপর একটোটি নেবে না ত?’

‘এখানে কিসের অমন গুল মরিছে ওটা?’ ঘোড়ার কাছ থেকে ফিরে এসে কথাগুলো শুনতে পেয়ে জিঞ্জিস করল স্তেপান

‘বলছিলাম আমার আর আমার বাপের ভগবান তাঁর আত্মাকে শান্তিতে রাখুন গুপ্তধন খোঁজার গল্প’

‘কোথায় তোমরা সেই গুপ্তধন খোঁজাঝুঁজি করছিলে শুনি?’

‘সে হল গিয়ে ভাই ফেতিস খাতের ওই ওপারে। জায়গাটা অবশ্য বললে তুই চিনতে পারবি মের্কুলড ঢিবি’

‘বটে, বটে তারপর?’ স্তেপান উবু হয়ে বসে পডল একটা ফলস্ত কাঠকয়লায় টুকরো হাতের চেটোর ওপর রাখল, তারপর সেটাকে হাতের ওপর এদিক ওদিক গড়াতে গড়াতে অনেকক্ষণ ধরে চোঁট দিয়ে হুসহুস আওয়াজ করে টানতে টানতে সিগারেট ধরাল

‘হ্যাঁ তা হল কি শোনো বাপ আমার বলল, ‘আয় খ্রিস্তান মের্কুলড ঢিবিটা ঝুঁড়ি’ ঠাকুরদার কাছ থেকে শুনেনি ওখানে গুপ্তধন পৌঁতা আছে। আর গুপ্তধন

হল গিয়ে এমন জিনিস যে যার তার হাতে পড়ে না। বাপ তাই ভগবানের কাছে মানত করল, 'ওই গুপ্তধন যদি পাইয়ে দাও তাহলে, হে ভগবান, চমৎকার একটা গির্জা বানিয়ে দেব।' যাই হোক, আমরা ত মনে মনে এই রকম ঠিক করে চললাম ওখানে জায়গাটা কারও একার নয় বারোয়ারি তাই বাথা একমাত্র যার দিক থেকে আসতে পারে সে হল আতামান। আমরা যখন এসে পৌঁছলাম তখন রাত হয়-হয় যতক্ষণ না রাতের অন্ধকার নামে ততক্ষণ অপেক্ষা করে রইলাম। ঘোড়াটাকে ত অবিশিষ্টই ছেঁদে রেখে দিয়েছি। আমরা দু'জনায় কোদাল নিয়ে চুড়োর উঠে গেলাম সোজা চুড়োর ধার থেকে ঝুঁড়তে লেগে গেলাম। হাত তিনেক গর্ত ঝুঁড়ে ফেললাম। মাটি একেবারে খাঁটি পাথরে, এত কালের মাটি ত শুকিয়ে পাথর হয়ে গেছে। আমি গলদশর্ম হয়ে উঠলাম বাপ কেবলই বিভবিড় করে ভগবানের নামে মানত করে যেতে লাগল এদিকে আমার, ভাই, তোমরা বিশ্রাম কর আর না-ই কর, পেটের ভেতরটা তীব্র ভাবে মোচড় দিয়ে উঠল গরমকাল, ছানই ত তোমরা, খাঁটিটা আমাদের কী হতে পারে ঘোল আর কভাস\*। এ পাশ থেকে ও পাশে আমার পেটের ভেতরে যা হাঁচড় পাঁচড়টা শুরু হল আমি ত চোখেমুখে অন্ধকার দেখতে লাগলাম গ্রাণ যায় যায় বাপ আমার - তাঁর আশ্রয় শান্তি হোক - ধমকে উঠল 'আরে বুৎ, তুই যে একটা যা-তা দেখছি রে ব্রিস্তান আমি এদিকে ভগবানের নাম করছি, আর তুই ব্যাটাচ্ছেলে কিনা খাবার পেটে রাখতে পারিস নে। বমির গন্ধে যে দম আটকে আসছে' বলল 'উঠে আয় বলছি গর্ত থেকে, মইলে কোদালের ঘায়ে মাথা কঁক করে দেব ব্যাটাচ্ছেলে তুই যা শুরু করেছিল তাতে গুপ্তধন মাটির আরও ভেতরে গিয়ে সঁধোতে পারে।' আমি টিকির পায়েব তলায় শূয়ে পড়ে পেটের যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলাম। শূলবেদনা যাকে বলে এদিকে আমার বাপ - অক্ষয় স্বর্গবাস হোক তার লোকটা ছিল ইয়া তাগড়াই। একাই সে লেগে গেল ঝুঁড়তে। ঝুঁড়তে ঝুঁড়তে পাওয়া গেল একটা পাথরের চাঙড়। আমাকে ডাকতে আমি এসে ত শাবলের একটা চাউ দিয়ে চাঙড়টা তুলে ফেললাম বিশ্বাস কর ভাইসব, সেদিন ছিল জোছনা রাত, চাঙড়ের নীচে না এমন চকচক করে উঠল

'এই বারে কিন্তু তুই গুল দিচ্ছিস ব্রিস্তোনিয়া।' শেরো আর সহ্য করতে পারল না মুচকি হেসে সে গৌফের ডগা পাকাতে লাগল

'কী বললি, গুল দিচ্ছি? যা যা নিজের চরকায় তেল দে গো।' ব্রিস্তোনিয়া তার ইয়া চণ্ডা সালায়ার কোমরের দিকে টেনে উঠিয়ে ঠিক করতে করতে

\* রাইয়ের বুটি ভিজিয়ে তৈরি এক রকমের পানীয়। গ্রীষ্মকালে শরীর ঠাণ্ডা রাখে অনুঃ

জোতাদের দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল, না, গুল হতে যাবে কেন? ভগবানের  
দ্বিবি সত্য।

‘তা যাক গে, শেষটা কী হল বলই না ছাই।’

‘হ্যাঁ যে কথা বলছিলাম, তাইসব চকচক করে উঠল। তাকিয়ে দেখি কি  
পাখুরে কয়লা। অমন কয়লা ওখানে বোধহয় মন বিশেষ হবে। তা হল কি,  
বাপ বললে, ‘ভেতরে ঢুকে যা শিক্তান, খোঁড়’ ঢুকে পড়লাম। সেই জঞ্জাল খুঁড়ে  
খুঁড়ে ফেলছি ত ফেলছিই এই করতে করতে ভোর হয়ে এলো। সকাল হতেই  
তাকতে দেখি কি মকেল ঠিক হাঙ্গির।’

‘কে? কার কথা বলছিস?’ তোমিগিন কৌতূহল প্রকাশ করল ঘোড়া ঢাকার  
একটা চাদরের ওপর সে শুয়ে ছিল।

‘আবার কে? আমাদের আত্মান গো। যাচ্ছিল তার ঘোড়ার গাড়ি চেপে।  
‘কার হুকুমে করেছ? হান-তেন আমরা আর কী বলি? -চুপ। সে অবিশি  
তখুনি আমাদের হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল সদরে। গত বছরের আগের  
বছর কামেন্দ্রায়ার আদালত থেকে সমন এসেছিল কিন্তু বাপ আমার কেমন  
করে যেন ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরেছিল তাই তার আগেই মারা গেল আমরা  
তাই নিষে পাঠালাম যে সে আর বেঁচে নেই।’

আগুনের ওপর ঝোলানো হাঁড়িতে জাউ সেদ্ধ হচ্ছিল। খ্রিস্টোনিয়া আগুটা  
থেকে ধূমায়মান জাউয়ের হাঁড়িটা খুলে নিয়ে হাতা-চামচের খোঁজে চলে গেল  
গাড়ির দিকে।

‘তারপর? কী করল তার বাপ? নির্জ্ঞে বানিয়ে দেবে বলে যে মানত  
করেছিল তাহলে কি বানালই না?’ হাতা-চামচ নিয়ে খ্রিস্টোনিয়া ফিরে আসার  
সঙ্গে সঙ্গে স্তোপান জিজ্ঞেস করল।

‘আচ্ছা বৃদ্ধ ত, তুই, স্তোপা। কয়লা দিয়ে কী ছাই বানাবে বল দিকি?’

‘কিন্তু মানত যখন করেছিল তখন বানাতেই হয়।’

‘কয়লা নিয়ে ত আর কোন কথা হয় নি, হ্যাঁ গুপ্তখন যদি পাওয়া যেত তবে

হাসির দমকে আগুনের লিখা পর্বস্ত কৈপে উঠল খ্রিস্টোনিয়া তার সাদামাঠা  
ধরনের মাথাটা হাঁড়ির ওপর থেকে তুলে তাকাল ব্যাপারটা কী বুঝতে না  
শেরে ভারী গলায় প্রচণ্ড গাঁক গাঁক আওয়াজ তুলে বাকি সকলের কণ্ঠস্বর ডুবিয়ে দিল।

## সাত

স্তোপানের সঙ্গে অগ্নিনিয়ার যখন বিয়ে হয় তখন অগ্নিনিয়ার বয়স সত্তেরো  
মনের অপর প্রান্তে শূকনো বালিভরা গ্রাম দুরোভক। সেইখানে তার বাপের বাড়ি।



বিয়ের বছরখানেক আগে শরৎকালে গ্রাম থেকে আড়াই ক্রোশখানেক দূরে স্তেপে সে জমি চাষ করতে গিয়েছিল তার বাপের সঙ্গে। রাতের বেলায় তার পঞ্চাশ বছরের বুড়ো বাপ ঘোড়া ছাঁদার দড়িতে তার হাত বেঁধে ধরল তাকে।

‘টু শব্দটি যদি করিস, খুন করে ফেলব। যদি চুপ করে থাকিস তাহলে মখমলের জামা আর গোড়ালি-আঁটা গাম্বুট এনে দেব তোকে মনে থাকে যেন, খুন করে ফেলব, যদি ’ বাপ তাকে শাসাল

সেই রাতে একমাত্র ছিরভিন্ন সেমিজ্জেই আক্সিনিয়া গ্রামে তাদের বাড়িতে ছুটে এসেছিল মার পায়ের ওপর আছড়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্দতে কান্দতে সব কথা সে বলেছিল তাকে। দাদা অত্যাশঙ্কিত একজন সৈনিক। সবে সেনাবাহিনীর চাকরি থেকে ফিরেছে এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে মা আর দাদা গাড়িতে ঘোড়া জুতল, আক্সিনিয়াকে সঙ্গে নিয়ে গাড়ি ছুটিয়ে চলে এলো বাপ যেখানে ছিল সেই জায়গায়। আড়াই ক্রোশ পথ দাদা এমন ভাবে ঘোড়া ছুটিয়েছিল যে ওগুলোব নাভিস্থাস ওঠাব মতো অবস্থা ক্ষেতের ঢালার কাছে পাওয়া গেল বাপকে। গায়ের কোর্তাটা মাটিতে বিছিয়ে সে তখন মাতাল হয়ে ওটার ওপর অঘোরে ঘুমোচ্ছে, পাশে গড়াগড়ি যাচ্ছে খালি ডোমকার বোতল আক্সিনিয়ার চোখের সামনে দাদা গাড়ির হুড়কোটা খসিয়ে নিল। লাথি মেরে বাপকে ঘুম থেকে টেনে তুলল, সংক্ষেপে দু’একটা কী যেন কথা জিজ্ঞাস করল তাকে, তারপর লোহা বঁধানো হুড়কোটা দিয়ে বুড়োর দুই চোখের মাঝখানটায় দড়াম করে বসিয়ে দিল এক ঘা। মা আর ছেলে দু’জনে মিলে তাকে থকা দেড়েক ধরে পিটোল। অমন শাস্তিষ্ট বুড়ি মা ক্ষিপ্ত হয়ে অজ্ঞান স্বামীর চুলের মুঠো ধরে টেনে ছিঁড়ে লাগল দাদা তার পা চালিয়ে যাচ্ছিল। আক্সিনিয়া মাথা ঢেকে গাড়ির নীচে শুয়ে ঠকঠক করে কাঁপছিল, তার মুখ দিয়ে বা বেরোচ্ছিল না ভোরের আলো ফোটার আগে আগে বুড়োকে ওরা বাড়ি নিয়ে এলো। সে কবুণ ধরে কাতরাতে লাগল তার চোখদুটো সামনের ঘরে ধরে ঘুরে যুঁজে বেড়াতে লাগল আক্সিনিয়াকে আক্সিনিয়া তখন লুকিয়ে ছিল একটি কোনায়। বুড়োর হেঁড়া কান থেকে বালিশের ওপর গড়িয়ে পড়ছিল রক্ত সন্ধানাগাদ সে মারা গেল। বাইরের লোকের কাছে বলা হল মাতাল অবস্থায় গোবুর গাড়ি থেকে পড়ে মারা গেছে।

এর এক বছর বাদে একটা চমৎকার সাজানো ঘোড়ার গাড়ি চড়ে আক্সিনিয়ার বিয়ের সস্বদ্ধ নিয়ে লোকজন এলো। লম্বা চেহারা সূক্ষ্ম গড়নের স্তেপানকে আর তার শত্রু-সবল ঘাড় দেখে কনের পছন্দ হল। সামনের হেমস্তে বিয়ে হবে বলে কথা পাকা হয়ে গেল। সেই দিনটি এলো সময়টা শীতের আগে আগে,

হিমেল হালকা তুষারস্তর ভাঙার মৃদু মচমচে আওয়াজে বৃষ্টির রেশ ছড়িয়ে পড়ছে এর পর থেকে আস্তাখভদেব বাড়িতে নতুন গিমি পদে আক্সিনিয়ার অধিষ্ঠান বিয়ের হৈচৈ আমোদ-উৎসবের পরদিনই ঢাঙা চেহারার বুড়ি শাশুড়ী খুব ভোরে আক্সিনিয়াকে ডেকে তুলে দিল কী একটা কঠিন মেয়েলি ব্যামোতে যেন ভুগে ভুগে বুড়ি অষ্টাবক্র হয়ে গেছে আক্সিনিয়াকে রান্নাঘরে নিয়ে এসে উদ্দেশ্যহীন ভাবে হাঁড়িকুড়ি ধরার সাঁড়াশী-বেড়িগুলো এধারে ওধারে সরাতে সরাতে শেধকালে বলল

‘এখন যা বলি শোনো গো বৌমা মোহাগে গদগদ হয়ে শুয়ে বসে দিন কাটাবে এর জন্যে আমরা তোমাকে ঘরে আনি নি যাও দেখি, গোবুটা দোয়াও গিয়ে, তারপরে উনুনে রান্নাবান্না চড়াও গে। আমি বুড়ি হয়েছি, গায়ে বল পাই নে। ঘরসংসারের ভার তোমাকেই তুলে নিতে হবে নিজের হাতে এসবই এখন তোমার ’

সেই দিনই দম্প্তরমতো বিচার বিবেচনা করে স্ত্রোপান তার নতুন বৌকে গোলাঘরে ধরে বেধডক পেটোল। মারল পেটে, বুকে আর পিঠে এমন ভাবে হিসেব করে মারল যাতে মারের দাগ লোকেব চোখে না পড়ে। তখন থেকে সে বাইরে বাইরে ছৌক-ছৌক করে ঘুরে বেড়াতে লাগল। পাড়ার নই চরিত্রের যে-সব বৌয়ের স্বামী বাইরে আছে তাদের সঙ্গে ব্যক্তিচার শুরু ক’বে দিল প্রায় রোজ রাতে সে বাড়ির বাইরে চলে যেত আক্সিনিয়াকে গোলাঘরে কিংবা সামনের ঘরে তালাবন্ধ করে রেখে

বছর দেড়েক কোন ছেলেপুলে না হওয়ায় সে তার পুরুষদের অবমাননার জন্য আক্সিনিয়াকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারল না পরে সে শান্ত হয়ে এলো। কিন্তু ব্রহ্ম-ভালোবাসার ব্যাপারে তার কেমন যেন কুষ্ঠা ছিল আগের মতো সে কালেডমে বাড়িতে রাত কাটাতে লাগল

বহু গোবু-বাছুরের বিশাল গেরস্থালি নিয়ে আক্সিনিয়াকে হিমশিম খেতে হত। স্ত্রোপান কাজেকর্মে আলসে মাথার সামনের চুলের ঝুটি বেশ পল্লিপাটি করে আঁচড়ে সে বন্ধুবান্ধবদের বাড়ি টহল দিতে বেরোত - সেখানে গিয়ে তামাক খেত, তাস পিঁত, গায়ের এটা-ওটা নানা ঘটনা নিয়ে গালগল্প করত এদিকে আক্সিনিয়াকে গোবু-ঘোড়ার খেঁয়াড় পরিষ্কার করতে হত। আবার ঘরসংসারও সেখতে হত তাকেই। শাশুড়ীর কাছ থেকে তেমন একটা সাহায্য পাওয়া যেত না ব্যস্তসমস্ত হয়ে একটু আধটু ঘুরেই থপ করে বিছানায় গিয়ে পড়ত। বিবর্ণ পাণ্ডুব ঠোঁট সুতোর মতো পাতলা করে টেনে যন্ত্রণার অঙ্কিৎ হয়ে হিংস্র উন্মত্ত দৃষ্টিতে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে থাকত। গুটিসুটি মেরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে কাতরাত

এই সব মুহূর্তে তার কুৎসিত ধরনের বড় বড় কালো আঁচিলভরা মুখটা দরদর করে ঘামতে থাকত। চোখদুটো অঙ্গ অঙ্গ করে জলে ভরে উঠত, কখন কখন বিস্মু বিস্মু জলও গড়িয়ে পড়ত তার গাল বয়ে আগ্নিনিয়া কাজকর্ম ফেলে এক কোণে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থেকে আতঙ্ক আর কবুগার দৃষ্টিতে শাশুড়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত

দেড়বছর পরে বুড়ি মারা গেল সকালবেলায় আগ্নিনিয়ার প্রসববেদনা শুরু হল দুপুরের দিকে, বাচ্চার জন্ম হওয়ার ঘণ্টাখানেক আগে তার শাশুড়ী চলতে চলতে পুরনো আন্তঃবলের দরজার সামনে মুখ ধুবড়ে পড়ে মারা গেল। মাতাল স্ত্রোপান যেন প্রসূতির কাছে না আসে এই বলে তাকে সাবধান করে দেওয়ার জন্য দাই যখন ছুটে ঘর থেকে বেরোচ্ছে এমন সময় সে দেখতে পেল আগ্নিনিয়ার শাশুড়ী বুকের কাছে হাঁটু ঠেকিয়ে গুটিসুটি মেরে মাটিতে পড়ে আছে

বাচ্চা হওয়ার পর স্বামীর ওপর আগ্নিনিয়ার টান দেখা গেল কিন্তু তার মধ্যে কোন ভালোবাসার অনুভূতি ছিল না, যা ছিল তা হল মেয়েলি ধরনের তিস্ত মমতা আর নেহাৎই একটা অভ্যাস এক বছর হতে না হতেই বাচ্চাটা মারা গেল। আবার শুরু হয়ে গেল সেই পুরনো জীবন। তাই গ্রিশ্কা মেলেখত যখন আগ্নিনিয়ার আসা-যাওয়ার পথ আটকে তার সঙ্গে ফটিনাষ্টী করতে লাগল তখন সে আতঙ্কিত হয়ে লক্ষ করল যে ওই কালোচুল দরদমাখা তরুণটির দিকে সে যেন আকৃষ্ট হয়ে পড়ছে গ্রিশ্কা একটা জেদের ভাব নিয়ে তার পেছনে লেগে রইল, সেই ভালোবাসার মধ্যে ছিল অসীম ধৈর্য আর প্রতীক্ষার পরিচয় ওর এই জেদটাই আতঙ্কিত করে তুলত আগ্নিনিয়াকে। আগ্নিনিয়া বুঝতে পারল স্ত্রোপানকে গ্রিশ্কা ভয় পায় না, ভেতরে ভেতরে অনুভব করল অত সহজে তার কাছ থেকে পিছু হটার পাত্র সে নয় কিন্তু মুশকিল হচ্ছে সচেতন ভাবে এটা না চাইলেও, প্রাণপণ শক্তিতে বোকার চেষ্টা করা সত্ত্বেও সে অনুভব করতে লাগল যে ছুটিছাটা পালপার্বণের দিনে ত বটেই এমন কি অমনি সময়ও নিপুণ ভাবে সাজগোজ করতে লেগেছে। আরও ঘন ঘন গ্রিশ্কার চোখে পড়ার প্রবল ইচ্ছে তার হলেও মনকে সে নানা ভাবে চোখ ঠারত গ্রিশ্কার ঘন আবেগভরা উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টি যখন তাকে আদরের স্পর্শ দিয়ে বেত তখন তার ভালো লাগত ভেতরে ভেতরে একটা উষ্ণ আমেজ অনুভব করত সে একে একে দিন ভোরবেলা ঘুম ভেঙে উঠে গোরু দুইতে গিয়ে তার মুখে হাসি ফুটে ওঠে। কেন? কিসের জন্য? তখনও সে সচেতন ভাবে উপলব্ধি করতে পারে না অকারণেই যেন তার মনে পড়ে যায় 'আজ আনন্দের একটা কিছু আছে কী হতে পারে সেটা? গ্রিগোরি গ্রিশা। তার সমস্ত সত্তা আচ্ছন্ন হয়ে যেত এই

নতুন উপলব্ধিতে সে ভীতচকিত হয়ে উঠত মনে মনে সে সন্তর্ক হয়ে পড়ত, তার ভাবনাচিন্তাগুলো যেন মাঠ মাসের দনের ফাটলধরা বরফের ওপর দিয়ে পথ হারিয়ে চলতে থাকে

স্টেপানকে শিক্ষাবিদে বিদায় দিয়ে আসার পর আন্নিয়া ঠিক করল গ্রিফকার সঙ্গে যতটা সম্ভব কম দেখা করবে। সেদিনকার সেই মাছ ধরার ঘটনার পর থেকে তার এই সিদ্ধান্ত আরও দৃঢ় হয়ে উঠল

আ

টিনিটি পরবের দুদিন আগে থাকতে গ্রামের ঘাস-জমি ভাগাভাগি হয়ে গেল। ভাগ করার সময় পাশ্বেলেই প্রকোফিয়েভিচ উপস্থিত ছিল সেখান থেকে সে ফিরল দুপুরের খাবার সময়। ঝুঁকতে ঝুঁকতে পায়ের জুতোজোড়া খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিল অতিরিক্ত হাঁটাইটিতে পাদুটো ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল মৌজ করে পা চুলকোতে চুলকোতে শেষকালে সে বলল, 'আমাদের ভাগে পড়েছে লাল দরীর কাছে জমিটা ওখানকার ঘাস তেমন একটা সুবিধের নয়, ওপরের দিকটা বনের কাছে গিয়ে ঠেকছে জায়গায় জায়গায় একেবারে নাড়া লম্বা লম্বা আগাছাও আছে'

'কবে থেকে কাঁটেতে শুরু করব তাহলে?' গ্রিগোরি জিজ্ঞেস করল।

'পরবের পর থেকে'

'তোমরা কি দারিয়াকে নেবে নাকি?' বুড়ি ভুরু কৌচকাল

পাশ্বেলেই প্রকোফিয়েভিচ হাত নেড়ে এমন একটা ভঙ্গি করল যার অর্থ হয় - আর দিক করো না ত বাপু!

'দরকার হলে নেব দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা কর দিকি। এমন হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন?'

বুড়ি ঘটান করে উনুনের দরজা খুলে ভেতর থেকে গরম করা বাঁধাকপির কোল বার করে আনল। খেতে বসে পাশ্বেলেই প্রকোফিয়েভিচ অনেকক্ষণ ধরে ভাগ-বাঁটোয়ারার ব্যস্ততা আর জোড়ার কসাক সদস্যের কথা বলে যেতে লাগল, বলল, ব্যাটা গোটা দলটাকেই প্রায় ঠকিয়ে ছেড়েছে

'লোকটা গত বছরও এই রকম চালাকি খাটিয়েছিল,' ওদের কথার মাঝখানে দারিয়া বলল, 'জমি ভাগাভাগি হওয়ার সময় বদলাবদলি করার জন্যে মালাশকা মলোভাকে কত রকমের ওস্‌দানিই না দিয়েছিল'

'ও কি আর আজকের বদমাশ?' খাবার চিবুতে চিবুতে বলল পাশ্বেলেই প্রকোফিয়েভিচ

‘আচ্ছা বাবা আঁকশি দিয়ে টেনে টেনে গাদা করার কাজ কে করবে?’ ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল দুনিয়াশকা।

‘তুই তাহলে আঁকিস কী করতে?’

‘একা পেরে উঠব না বাবা।’

‘আমরা আত্মনিরা আত্মস্বত্বকে ডেকে নেব স্ত্রোপান যাবার সময় ওর অংশের ঘাস কাটিতে বলে গেছে। ওর অনুরোধটা ত বাধতে হবে।’

পর দিন সকালে একটা সাদা-পা টগবগে ঘোড়ার পিঠে জিন কষিয়ে তাতে চেপে মেলেক্সডমের বাড়ির সামনে এসে হাজির হল মিত্কা কোয়শুনভ গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ছিল গ্রামের মাথার ওপর ঝুলছিল কুয়াসার পর্দা মিত্কা জিনের ওপর বসেই নীচ হয়ে গেট খুলে বাড়ির উঠানে এসে ঢুকল দেউড়ি থেকেই বুড়ি ইলিনিচনা ওকে দেখে যাক্সার দিয়ে উঠল।

‘তুই এখানে কী করতে এসেছিস রে দাঙ্গাবাজ?’ বুড়িব কণ্ঠে স্পষ্টই বিরক্তি স্বরে পড়ছিল এই ডানপিটে ঝগড়াটি মিতকাটাকে দু’চক্ষে দেখতে পারে না বুড়ি।

‘বলি তোমার দরকারটা কি তাতে বুড়ি?’ ব্রেলিং-এর সঙ্গে ঘোড়াটা বাঁধতে বাঁধতে অবাক হয়ে পালটা প্রশ্ন করল মিতকা। ‘আমি এসেছি গ্রিশকার কাছে। কোথায় সে?’

‘চালাব নীচে ঘুমোচ্ছে বলি বাহত ধরেছে নাকি তোকে? পায়ে হাঁটতে পারিস নে বুড়ি?’

‘তুমি বাপু মাসি যেখানেই সুযোগ পাও নাক গলাও।’ মিতকা চটে গেল। সুন্দর কাজ-করা চাবুকটা নাচাতে নাচাতে, চকচকে পালিশ-করা বুটের পায়ার ওপর ঘা মেরে ফটাফট আওয়াজ করতে করতে হেলেদুলে সে চালার দিকে চলল গ্রিগোরির খোঁজে।

সামনের দিকের চাকা-খোলা একটা গাড়ি - তারই ভেতরে ঘুমোচ্ছিল গ্রিগোরি। মিতকা যেন তাক করছে এমনি ভঙ্গিতে বাঁ চোখ কঁচকে গ্রিগোরির ওপর চাবুক হাঁকড়াল।

‘এই ব্যাটা চাষা, ওঠ।’

মিতকার কাছে সবচেয়ে বড় গালাগাল হল চাষা শব্দটি। গ্রিগোরি তড়াক করে লাফিয়ে উঠল।

‘কী রে কী ব্যাপার?’

‘অনেক ঘুম হয়েছে আর নয়।’

‘দ্যাখ মিত্রি, ভাঁড়ামি রাখ আমি কিন্তু রেগে যাব।’

‘উঠে পড়, কাজ আছে।’

‘কী ব্যাপার বল ত?’

মিত্কা গাড়ির একপাশে বসে পড়ল চাবুকের কাঠি দিয়ে বুটজুতোর গায়ের শুকনো কাদা ঘসে ঘসে তুলতে তুলতে সে বলল

‘আমায় বেইজিং করেছে রে গ্রিগরি।’

‘তাই নাকি? কে?’

‘সে আর তোকে কী বলবে’ মিত্কা বেশ খানিকটা গালাগাল করার পর বলল, ‘আসলে ও বলে শু কথ্য নয়, লেফটেন্যান্ট\* বলেই না স্লোকটার অত জাঁক।’

রাগে গরগর করতে করতে দাঁতে দাঁত চেপেই তাড়াতাড়ি কথাগুলো ছুড়ে দিল সে, তার পাদুটো ঠকঠক করে কাঁপছিল গ্রিগোরি উঠে বসল

‘কোন লেফটেন্যান্ট?’

গ্রিগোরির জামার আঙ্গিন চেপে ধরে এবারে গলাব দ্বয় নামিয়ে মিত্কা বলল, চটপট ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে জলামাঠে ছুটে চলে আয় ব্যাটাকে আজ আমি সেবে নেব। আমি ওকে বলেওছি, ‘আসবেন হুজুর, কার কত স্যামতা দেখা বাবে।’ আমার কথা শুনে বলে কি, ‘তোমার যত সান্সোশাক আছে সবাইকে নিয়ে আয় তোদের সব ক’টার ওপরে আমি টেকা মারব সেট পিটার্সবুর্গে অফিসারদের দৌড়ে প্রাইজ পেয়েছিল আমার ঘোড়ার মা।’ ওর ঘোড়াই হোক আর ঘোড়ার মা-ই হোক ষোড়াই পরোয়া করি আমি। নিকুটি করেছি ওদের মোট কথা। আমার ঘোড়ার ওপর আমি ওকে টেকা মারতে কিছুতেই দেব না।’

গ্রিগোরি তড়িঘড়ি জামাকাপড় গায়ে ঢাপাল মিত্কা তার পেছন পেছন হুলস্থূল করতে লাগল রাগে তোতলাতে তোতলাতে সে বলতে লাগল

‘এই লেফটেন্যান্টটা বেড়াতে এসেছে মোখভ ব্যাপারীর বাড়িতে দাঁড়া দাঁড়া ওর নামটা যেন কী? লিভুনিথস্কি হবে মনে হচ্ছে। বেশ ভাল-ভারিস্কি চেহারা, চোখে চশমা। তা পর গে না তুই তবে ও চশমায় কোন কাজ হবে না - আমার ষোড়াকে আমি হারাতে দিচ্ছি নে।’

পাল ধরানোর জন্য একটা বড়ি ঘুড়ী রাখা ছিল মিত্কার কথা শুনে গ্রিগোরি

\* জারের সেনাবাহিনীভুক্ত অফিসারদের পদগুলি ছিল নিম্নলিখিত পর্যায়ে বিভক্ত  
১) সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট (অঝারোহী বাহিনী ও কসাক বাহিনীতে কর্ণেট), ২) লেফটেন্যান্ট  
৩) জুনিয়র ক্যাপ্টেন (অঝারোহী বাহিনীতে জুনিয়র কোম্পানি-ক্যাপ্টেন, কসাক বাহিনীতে সাব-অলটার্ন), ৪) ক্যাপ্টেন (অঝারোহী বাহিনীতে কোম্পানি-ক্যাপ্টেন কসাক বাহিনীতে মেজর), ৫) লেফটেন্যান্ট কর্নেল (কসাক বাহিনীতে কসাক-সেনাপতি), ৬) কর্নেল, প্রথম চারটি পদ ছিল স্কিড অফিসার পর্যায়ভুক্ত শেষের দুটি - স্টাক অফিসার পর্যায়ভুক্ত অনুঃ

মুচকি হেসে সেটার পিঠে জিন চাপাল। বাবার চোখে যাতে না পড়ে যায় সেইজন্য মাড়ইয়ের উঠানের গেট দিয়ে তারা বেরিয়ে এলো ত্তেপে তারপর চলল পাহাড়ের নীচের জলা-মাঠের দিকে ঘোড়াগুলো পায়ের খুরে ছপাত ছপাত শব্দে কাদা ছেনে পথ চলছে জলা-মাঠের মধ্যে একটা শুকনো ঝরা পপলার গাছের সামনে ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল কিছু ঘোড়সওয়ার একটা সুন্দর তেজী মাদী ঘোড়ার পিঠে লেফটেন্যান্ট লিন্ডনিথ্রি। আর থামের জন্য সাতক হেলে - তারাও ঘোড়ায় চেপে

‘কোথা থেকে দৌড় শুরু হবে?’ পাশনে চশমাটা ঠিক করে নিয়ে মিত্কার দিকে ফিরে লেফটেন্যান্ট জিজ্ঞেস করল মিত্কার টগবগে ঘোড়াটার বুকের শব্দ পেশীগুলোর তারিফ না করে সে পারল না

‘পপলার গাছটা থেকে জার দিঘি পর্যন্ত।’

‘জার দিঘিটা কোথায়?’ লেফটেন্যান্ট এমন ভাবে চোখ কৌঁচকাল যেন চোখে কম দেখাতে পাচ্ছে

‘ওই যে ওই ওখানে জুজুর, বনের ধারে’

ঘোড়াগুলোকে পাশাপাশি সর বৈধে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল লেফটেন্যান্ট মাথার ওপর চাবুক তুলল। তার কাঁধের কাঁধ-পাট ফুলে টিবি হয়ে উঠল

‘যেই ‘তিন’ বলব অমনি ছাড়বে। ঠিক আছে? এক, দুই তিন।’

জিনের কাঠামোর ওপর ঝুঁকে পড়ে, টুপি হাতে চেপে ধরে নক্ষত্রবেগে প্রথম বেরিয়ে গেল লেফটেন্যান্ট। এক মুহূর্তের জন্য সে বাকি সকলের আগে রয়ে গেল। মিত্কা ভেবাচেকা বেয়ে ফেকালে মুখে রেকাবে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল গ্রিগোরির মনে হল মাথার ওপর উঠিয়েও চাবুকটা ঘোড়ার পাহায় হাঁকড়াতে মিত্কা যেন বড় বেশি দেরি করে ফেলেছে

পপলার গাছ থেকে জার দিঘি ত্রেনশখানেক হবে মাঝামাঝি যাওয়ার পর মিত্কার ঘোড়াটা তীব্রের মতো ছুটে গিয়ে ধরে ফেলল লেফটেন্যান্টের ঘোড়াকে। গ্রিগোরি তেমন একটা গরজ করে চলাচ্ছিল না গোড়া থেকেই পিছিয়ে ছিল। হালকা চালে ঘোড়া চালিয়ে চলতে চলতে সে কৌতূহলভরে লক্ষ করতে লাগল ঘোড়সওয়ারদের ভাঙাচোকা সারিটা তার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে

জার দিঘির কাছে বালিয়াড়ি বসন্তকালের জলোচ্ছ্বাসে বাহিত হয়ে ধীরে ধীরে জমে উঠেছে। উটের পিঠের মতো দেখতে তার হলুদ রঙের কঁজটা ছেয়ে গেছে ছুঁচাল পাতাওয়ালা এক ধরনের বুনো শিয়ালের ঝোপে গ্রিগোরি দেখতে পেল মিত্কা আর লেফটেন্যান্ট দুজনে একসঙ্গে লাফিয়ে বালিয়াড়ির ওপর উঠে গিয়ে গড়িয়ে ওপাশে চলে গেল, ওদের পেছন পেছন এক এক করে চলল

বাঁকি ঘোড়সওয়াররা। সে যখন দিঘির কাছে এলো ততক্ষণে ঘর্মাক্ত ঘোড়াগুলো মজল বৈধে দাঁড়িয়ে পড়েছে, ঘোড়সওয়াররা ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে ঘিরে দাঁড়িয়েছে লেফটেন্যান্টকে মিতকা চাপা উল্লাসে বলমল করছে তার প্রতিটি অঙ্গভঙ্গিতে ফুটে উঠছে বিজয়ের চিহ্ন। লোকে যেমন আশা করেছিল লেফটেন্যান্টের হাবভাবে কিন্তু তার উলটোটাই দেখতে পেল গ্রিগোরি - লোকটা এতটুকু অপ্রতিভ হয় নি, একটা গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে সে দিঘি সিগারেট টানছে ঘোড়াটা যেন তার সবে নেয়ে উঠেছে। কড়ে আঙুল তুলে সেটাকে দেখিয়ে সে বলল, 'পঞ্চাশ ক্রোলখানেক ছুটিয়েছি ওটাকে। সবে কাল স্টেশন থেকে এসেছি। ও যদি একটু তাজা থাকত তাহলে আর দেখতে হত না। আমাকে ছাড়িয়ে যেতে পারতে না হে কোরশুনড।'

'তা হতি পারে,' উদারতা দেখিয়ে মিতকা বলল।

সবার শেষে ঘোড়ায় চড়ে আসছিল মুখে মেচেতার দাগ ধরা একটা ছেলে ঈর্ষার সুরে সে বলল

'ওর ঘোড়ার চেয়ে তাড়াতাড়ি ছুটতে পারে এমন ঘোড়া আমাদের এই সারা ভল্যাটে আর একটাও নেই '

এতক্ষণ যে উত্তেজনার মধ্যে কাটাতে হয়েছিল তার ফলে মিতকার হাত তখনও কাঁপছে। কাঁপা কাঁপা হাতে ঘোড়ার ঘাড়ে মৃদু চাপড় মেরে কাঠহাসি হেসে গ্রিগোরির দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'বেড়ে ঘোড়া '

ওরা দু'জনে অন্যদের থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে রাস্তা ছেড়ে পাহাড়ের নীচ দিয়ে চলাতে লাগল লেফটেন্যান্ট অনেকটা নিম্প্রহ ভাবে ওদের কাছ থেকে বিদায় নিল। টুপির নীচে আঙুল ঝুঁইয়ে মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল।

ওরা যখন বাড়ির গলির কাছাকাছি চলে এসেছে এমন সময় গ্রিগোরি দেখতে পেল আন্নিয়া পা ফেলে তাদেরই দিকে এগিয়ে আসছে। একটা শূকনো ডালের ছিলকে ছাড়াতে ছাড়াতে সে আসছিল। গ্রিশকাকে দেখতে পেয়ে মাথা আরও নীচু করল।

'অত নজরা কেন? আমরা কি ন্যাংটো হয়ে চলেছি নাকি?' চোঁচিয়ে এই কথা বলেই মিতকা চোখ টিপে গান ধরল 'আজ্ঞা আমার ফলটি রাজা টুকটুকে, সোয়াদ তোমার ভিতকুটে '

গ্রিগোরি সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে আন্নিয়ার পাশ দিয়ে প্রায় চলে যাচ্ছিল ঘোড়াটা শান্তশিষ্ট ভাবেই পথ চলছিল কিন্তু গ্রিগোরি আচমকা চাবুক মেরে তাকে উত্তেজিত করে তুলতেই পেছনের দু'পায়ে ভর দিয়ে বসে পড়ল পা বেড়ে আন্নিয়াব গায়ে কাদা ছিটিয়ে দিল।



‘উঃ আচ্ছা বদমাশ ত !’

উত্তেজিত ঘোড়াটাকে ঝট করে ঘুরিয়ে আগ্নিনিয়ার ঘাড়ের ওপর এনে ফেলে  
গ্রিগোরি জিজ্ঞেস করল

‘দেখতেই পাও না যে।’

‘তুমি তার যুগ্ম নও।’

‘অত গুমর কিসের? সেই জনোই ত কাদা ছিটিয়ে দিলাম।’

‘ছাড় বলছি!’ ঘোড়ার মুখের কাছে হাত নেড়ে আগ্নিনিয়া চোঁচিয়ে বলল  
‘তোমার ঘোড়া দিয়ে আমাকে পিষে ফেলার মতলবে আছ নাকি তুমি?’

‘এটা ঘোড়া নয় ঘুড়ী।’

‘ওই একই হল, পথ ছাড় দেখি।’

‘আহা অত চটছ কেন গো আগ্নিউতকা? সেদিনকার সেই জলম্যাঠের  
ব্যাপারে নাকি?’

গ্রিগোরি তার চোখের দিকে তাকাল। আগ্নিনিয়া কী যেন বলতে গেল, কিন্তু  
তার কালো চোখের এক কোণে হঠাৎ এক বিন্দু জল টলমল করে উঠল। তার  
ঠোঁটদুটো করুণ ভাবে কৈশে উঠল খরখর করে কাঁপতে কাঁপতে চোক গিলে  
সে ফিসফিসিয়ে বলল

‘আমাকে রেহাই দাও গ্রিগোরি      আমি চটি নি      আমি আমি      ’  
এই বলে সে চলে গেল।

গ্রিগোরি অবাক হয়ে গেল মিত্রকাকে এসে ধরল ফটকের কাছে

‘আজ সন্দের আড্ডায় আসছিস ত?’ মিত্রকা ওকে জিজ্ঞেস করল।

‘না।’

‘সে কী? কেন? রাত কাটানোর ডাক পেলি নাকি?’

গ্রিগোরি কোন জবাব না দিয়ে হাতের চোঁটে দিয়ে কপাল ঘসল

নয়

ট্রিনিটি পরবেব অবশিষ্ট বলতে গ্রামের ঘরে ঘরে যেটুকু রয়ে গেল তা হল  
মেকের ওপর ছড়ানো শুকনো সুগন্ধী লতা পায়ের মাদানো পাতার গুঁড়ো আর  
ফটক ও দেউড়ির পাশে সাজানোর জন্য ওক ও আশগাছের যে সমস্ত ডালপালা  
কেটে পুঁতে দেওয়া হয়েছিল সেগুলোর কৌচকানো মান সবুজ পাতা।

ট্রিনিটির পর থেকেই শুরু হয়ে গেল ঘাস কাটা সেই সকাল থেকে মেয়েদের  
জমকাল ঘাঘরায় গায়ের সামনে ঝোলানো উড়নির উজ্জ্বল কাজ করা নগ্নার আর

মাথাৰ ওড়নার বিচিত্র রঙে ঝলমল করতে লাগল জলামাঠ। গোটা গ্রামের সকলে একসঙ্গে বেরিয়ে পড়েছে ঘাস কাটার কাজে ঘেসেডা আর ঘাস যারা আঁচড়ে জড় করে তারা সবাই এমন ভাবে সেজে এসেছে, যেন বছরের কোন এক বিশেষ পর্ব পড়েছে আবহমানকাল থেকে এই রকম চলে আসছে। দন থেকে গুরু করে দূরের সেই অলডার গাছের ঝাড় পর্যন্ত ঘাস-জমি কান্তের আঘাতে উজ্জাদ হয়ে গিয়ে কাঁপছে, ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলছে।

মেলেক্‌ভরা একটু দেরি করে ফেলেছিল। তারা যখন এলো ততক্ষণে গ্রামের গ্রাম অর্ধেক লোক মাঠে নেমে পড়েছে

‘ঘুম ভাঙতে দেরি হয় খুশি পাশ্বেলেই প্রকোফিচ ঘর্মাক্ত ঘেসেডার দল কলরব করে উঠল

‘আমার সোষ নয়, মেয়েদের ব্যাপার ত জানই’ কাষ্টহাসি হেসে এই কথা বলে বুড়ো কাঁচা চামড়ার বোনা একটা চাবুক হাঁকড়ে বলদগুলোকে তাড়া দিল

‘কেমন আছ গো স্যাঙাত? দেরি করে ফেলেছ ভাই, ধেরি করে ফেলেছ’ সোলার টুপি পরা একজন ঢ্যাঙা কসাক পথের ধারে কান্তেতে শান দিতে দিতে মাথা নাড়িয়ে বলল,

‘ঘাস কি শুকিয়ে যাবে নাকি?’

‘জোর কদমে বলদ হাঁকিয়ে যদি যাও ত সময়মতো শৌছতে পারলে, নইলে শুকিয়েও যেতে পারে বৈকি তোমার ভাগটা কোথায় পড়েছে?’

‘লাল মরীর কাছে।’

‘তাহলে তোমার ওই খুড়খুড়েগুলোকে হাঁকাও, নইলে আজ আর ওখানে যেতে হচ্ছে না।’

গাড়ির পেছনে রোদ থেকে বাঁচানোর জন্য চাদরে আগাগোড়া মুখ ঢেকে বসে আছে অজিনিয়া চোখের জন্য একটা সবু ফোকর রেখে দিয়েছে তার ভেতর দিয়ে সে কঠিন উদাসীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ত্রিগোরির দিকে ত্রিগোরি বসে আছে তার উল্টো দিকে। দারিয়াও বেশ সাজগোজ করেছে, তারও মুখ ঢাকা। গাড়ির দুটো খাঁজের মাঝখানে পা ঝুলিয়ে সে বসেছে নীল নীল শিরা বার করা লম্বাটে মাই বার করে কোলের আঘঘুমন্ত বাচ্চাটাকে সে মাই দিচ্ছে। দুনিয়াশকা গাড়ির এক ধারে বসে তিড়িৎবিড়িৎ করছে, ঘাসজমি আর রাস্তায় যে-সমস্ত লোকের দেখা মিলছে সব কিছু ঝুটিয়ে ঝুটিয়ে দেখতে দেখতে তার চোখ উপছে পড়ছে খুশিতে। রোদের ছোঁয়ায় পোড়া-পোড়া, খুশিমাখা তার মুখটা আর নাকের খাঁজের কাছে রোদের তাপে হলদেটে ছোপগুলো মেখে মনে হচ্ছিল সে যেন বকতে চায় ‘আমার খুশি-খুশি লাগছে, আমার বেশ ভালো লাগছে এই

জানো যে আকাশে এক ফোঁটা মেঘ না থাকায় নীলের ঘোর-লাগা এই দিনটিও আনন্দোচ্ছল, সুন্দর, আর আমার মনেও লেগেছে সেই নীলের প্রশান্তি ও শূচিদ্বিগ্ধ স্পর্শ। আমার আনন্দ হচ্ছে - এর চেয়ে বেশি আর আমার কী চাই। পাঙ্ডেলেই প্রকোফিয়েভিচের টুপি নীচ দিয়ে গলগল করে ঘাম গড়িয়ে নামছে। সে তার মোটা সূতির জামার আশ্তিনটা হাতের চোটের ওপর টেনে নিয়ে তাই দিয়ে ঘাম মুছেছে। তার ঝুঁকে পড়া পিঠের সঙ্গে ঘন হয়ে লেপটে আছে গায়ের জামাটা। জামার ওপর ফুটে উঠেছে ভিজে কালো কালো দাগ। সাদা পৈঞ্জা মেঘ ভেদ করে সূর্য উঁকি মারল। দনের ওপাড়ের দূর বুশোলাী পাহাড়ে পাহাড়ে, স্তম্ভপ জলামাঠ আর গ্রামের ওপব ছড়িয়ে দিল তেরছা হয়ে পড়া ঘোঁরাটে কিরণের একটা পাখা।

বেজার গরম পড়ে গেল বাতাসের টানে অলস মধুর গতিতে ভেসে চলেছে খণ্ড খণ্ড মেঘ। পাঙ্ডেলেই প্রকোফিয়েভিচের বলদগুলো যে অত আস্তে আস্তে গাড়ি টানতে টানতে পথ চলেছে তাদেরও ছাড়িয়ে বেতে পারছে না সেই মেঘ। পাঙ্ডেলেই প্রকোফিয়েভিচের নিজেরও চাবুক তুলতে যেন হাত আব উঠছে না। অতি কষ্টে চাবুক তুলে শূন্য দোলাতে দোলাতে সে যেন দোমনা হয়ে ভাবছে অস্থিচর্মসর বলদগুলোর পিঠে মারবে কি মারবে না। বলদগুলোও এটা স্পষ্ট বুঝতে পেরে পারের গতি তেমন আর বাড়াচ্ছে না, দাঁড়ার মতো পা একটা একটা করে ফেলে লেজ দোলাতে দোলাতে আগের মতোই বীর গতিতে হাতড়ে হাতড়ে পথ চলেছে তাদের মাথার ওপর গোল হয়ে ঘুরছে কমলারঙের আভা ধরা একটা ছাই-ছাই সোনালী ডাঁধ।

গ্রামের মাড়াই-উঠোনগুলোর কাছে যেখানে ঘাসজমির ঘাস কাটা হয়ে গেছে সে জায়গায় চকচক করছে হালকা সবুজের কতকগুলো চাপড়া। যেখানে যেখানে ঘাস এখনও কাটা হয় নি সেখানে গাঢ় রঙের চকচকে রেশমী ঘাস মৃদুমন্দ বায়ুপ্রবাহে সরসরু করছে।

‘ওই যে আমাদের ভাগের জমিটা, হাতের চাবুকটা নেড়ে পাঙ্ডেলেই প্রকোফিয়েভিচ বলল।

‘বনের দিক থেকে শুরু করব নাকি?’ গ্রিগোরি জিজ্ঞেস করল।

‘ইচ্ছে করলে এই কিনারা থেকেই শুরু করা যায়। এখানে আমি কোদাল দিয়ে কেটে আমাদের অংশটা চিহ্ন দিয়ে রেখেছি।’

গ্রিগোরি গাড়ির ব্যায়াল খুলে অস্থির বলদদুটোকে ছেড়ে দিল জমির কিনারায় কোদাল দিয়ে কেটে জমির সীমানাচিহ্ন হিসেবে যে গৌজ ধুতে গিয়েছিল বুড়ো সেটার খোঁজে চলল। তার কানের মাকড়িটা চকচক করে উঠল।

একটু পরে হাত নেড়ে চৈচিয়ে সে বলল

‘কান্নে ধর সব।’

খ্রিগোরি ঘাস মাড়াতে মাড়াতে এগিয়ে চলল। গাড়ির জায়গাটা থেকে তার চলার পথে পেছনে ঘাসের ওপর সে ফেলে গেল একটা ঢেউ খেলানো দাগ। দূরে ষষ্ঠামিনারের সাদা চুড়োটা দেখা যাচ্ছিল সেই দিকে তাকিয়ে ক্রুশটিক্ একে উগ্গবানের নাম করে কান্ডে তুলে নিল পাশ্বেলেই প্রকোকিয়েতিচ তার বাঁকা নাকটা চকচক করে উঠল যেন সদ্য পালিশ করা হয়েছে। তার তামাটে রঙের গালের বসা জায়গাগুলোতে জমে উঠছে বিন্দু বিন্দু ঘাম সে যদু হাসল, সঙ্গে সঙ্গে তার কালো কুচকুচে দাড়ির ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে পড়ল অসংখ্য সাদা দাঁতের ঘন সারি বলিরেখা আঁকা ঘাড়টা ডাইনে ঘুরিয়ে সে কান্ডে চালিয়ে দিল ছিন্ন ঘাসের একটা হাত পাঁচেক পরিমাণ অর্থবৃত্ত তার পায়ের কাছে পড়ে রইল।

আধখোলা চোখে কান্ডে দিয়ে ঝপাঝপ ঘাস কাটতে কাটতে খ্রিগোরি চলল তার পিছু পিছু সামনে রামধনুর ছটা মেলে ঝলমল করছিল মেরেদের পোশাকের সামনের ঝালরগুলো কিন্তু খ্রিগোরির চোখ ঝুঁজে বোড়াতে লাগল কেবল একটিকে সাদা রঙের যার পাড়গুলো মুড়ি দিয়ে সেলাই করা। আন্নিনিয়ার দিকে ফিরে তাকাতে তাকাতে ফের সে বাপের সঙ্গে ভাল রেখে কান্ডে চালাতে লাগল

আন্নিনিয়ার চিন্তা থেকে সে নিজেকে কিছুতেই ছাড়িয়ে নিতে পারছে না আধখোলা চোখে সে মনে মনে কল্পনা করতে লাগল যেন শুকে চুমো খাচ্ছে, যত রাজ্যের দুরন্ত উজ্জ্বলভরা, দরদমাখা কথা সে তাকে বলছে কোথা থেকে যেন সেগুলো হুড়হুড় করে তার জিভের ভগায় এসে যাচ্ছে তারপর সেই চিন্তা কেড়ে ফেলে সে আবার চলল পা ফেলে ফেলে এক, দুই, তিন গুনতে গুনতে স্বত্বিতে তেলে উঠল টুকরো টুকরো দৃশ্য ভিজ়ে ঝড়ের গাদার নীচে বসে আছে ওরা একটা খোঁড়লের ভেতরে ডাকছে একটা ঝিঝি পোকা। জলামাঠের ওপরে চাঁদ উঠেছে আর কোপ থেকে একটা জেবার ভেতরে এমনি ভাবেই বেশ খানিকক্ষণ বাদে বাদে এক, দুই, তিন করে টুপটাপ করে পড়ছে জলের ফোঁটা। কী মধুর অঃ, কী মধুর

ক্ষেতের চাচার কাছে একটা হাসির হররা উঠল। ফিরে তাকাতে খ্রিগোরি দেখতে পেল গাড়ির নীচে দারিয়া শূয়ে আছে, আর আন্নিনিয়া তার ওপর ঝুঁকে পড়ে কী যেন বলছে দারিয়া ওর কথা শুনে হাত নাড়ল, তাতে দু’জনেই আবার ঝিলঝিল করে হেসে উঠল। দুনিয়াশ্কা গাড়ির সামনে বলদ জুতবার ডাণ্ডটার ওপর বসে সবু গলায় গান গাইছে

‘ওই ঝোপটা অবধি যাই, তারপর কান্ডেটা শানাব,’ খ্রিগোরি মনে মনে

ভাবল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করল কান্টেটা নরম কাদা-কাদা কিসের ওপর দিয়ে যেন চলে গেল। জিনিসটা কী দেখার জন্য গ্রিগোরি ঝুঁকে পড়ল। একটা ছোট্ট বুনা হাঁসের বাচ্চা তার পায়ের কাছে ঘাসের মধ্যে টি টি করতে করতে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছুটে পালাল। যেখানে ওদের বাসা ছিল সেই খোদলটার কাছে পড়ে ছিল আরেকটা কান্টের টানে সেটা দু' আধলা হয়ে গেছে। বাকিগুলো কিচমিচ করতে করতে ঘাসের মধ্যে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়ল। গ্রিগোরি ছিন্নভিন্ন হাঁসের বাচ্চাটাকে তুলে করতলে রাখল। হলদে ছাঁটের বানামী রঙের ছানাটা মাত্র কয়েক দিন আগে ডিম ফুটে বেরিয়েছিল। তার ফুরফুরে শরীরটার ভেতরে তখনও প্রাণের উষ্ণতা পাওয়া যাচ্ছিল। তার হাঁকরা চেপটা ঠোঁটের ফাঁকে লেগে ছিল গোলাপী আভার রঙের বুদ্ধ। পুঁতির মতো খুদে চোখ যেন চাকুরীভরে সামান্য বোজা। পাদুটো তখনও গরম, থরথর করে অল্প অল্প কাঁপছে।

অকস্মাৎ একটা তীব্র মমতায় আচ্ছন্ন হয়ে হাতের তেলোয় রাখা নিষ্প্রাণ মাংসপিণ্ডটার নিকে চেয়ে রইল গ্রিগোরি

‘কী পেন্সি রে, দাদাতাই?’

কাটা ঘাসের রাস্তা ধরে নাচতে নাচতে ছুটে এলো দুনিয়াশকা। তার বুকের ওপর দুলতে লাগল ছোট ছোট পাক দিয়ে বোনা তার ছোট্ট দুটি বিনুনি। গ্রিগোরি ভুবু ঝুঁচকে হাঁসের বাচ্চাটা হাত থেকে ফেলে দিল। বিরক্ত হয়ে ঝপাং করে ঘাসের মধ্যে কান্টে চালিয়ে দিল।

দুপুরের খাওয়া সকলে তাড়াতাড়ি করে সেরে নিল। চর্বির টুকরো আর কসাকদের কাছে যা সর্বক্ষণ মজুত থাকে ঘোল বাড়ি থেকে ধলেন্য করে আনা হয়েছিল। খাবার বলতে এ-ই সব।

‘বাড়ি গিয়ে আর কাজ নেই,’ খেতে খেতে পাঙ্কলেই প্রকোফিয়েভিচ বলল। ‘বলদদুটোকে জঙ্গলে ছেড়ে দে চড়ে বেড়াক গে। কাল রোদে শিশির শুকানোর আগেই আমরা কাটা শেষ করে ফেলব।’

দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পর মেয়েরা কাটা-ঘাস টেনে টেনে জড় করতে লাগল। কাটা-ঘাস এখন নেতিয়ে গিয়ে শুকোচ্ছে। তার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে এমন একটা ভারী গন্ধ যে তাতে মাথা ঘুরতে থাকে।

ওরা যখন ঘাস কাটা থামাল ততক্ষণে অঁধার হয়ে এসেছে। বাকি যে কাটা-ঘাসের সারিগুলো পড়ে ছিল আগ্নিনিয়া বিদা দিয়ে সৈগুগো আঁচড়ে নিল। তারপর সে ক্ষেতের চালায় ভেতরে গেল জাউ রাখতে। সারাটা দিন সে গ্রিগোরিকে নিয়ে জ্বালাধরা ব্যঙ্গবিদ্রূপ করেছে, গ্রিগোরির দিকে তীব্র ঘৃণাভরা দৃষ্টিতে তাকিয়েছে যেন বড় রকমের কোন এক অপমানকে মন থেকে কিছুতেই বোড়ে

ফেলতে না পেরে সেই অপমানের প্রতিশোধ নিতে চলেছে সে খ্রিগোরি বিশ্বাস, তেমন বেন নিতেজ। বলদদুটোকে সে জল খাওয়ানোর জন্য তাকিয়ে নিয়ে গেল দনের দিকে বাপ সর্বক্ষণ ওর আর আক্সিনিয়ার গতিবিধির ওপর নজর রাখল। অগ্রসর দৃষ্টিতে খ্রিগোরির দিকে তাকিয়ে সে বলল, রাতের খাওয়াদাওয়া সেরে যাবি বলদ পাহারা দিতে। দেখিস ঘাসে যেন মুখ না দেয়। আমার জিবুন-কোর্তাটা নে।

দারিয়া গাড়ির নীচে বাচ্চাটাকে শুষিয়ে দিয়ে দুনিয়াশ্কার সঙ্গে বনে চলল কাঠকুটোর খোঁজে

জলামাঠের মাথার ওপর দুর্গম দুর্লভ্য কালো আকাশের বুকে ভেসে চলেছে প্রতিপদের পাখুর চাঁদ জ্বালানো অগ্নিকুণ্ডের মাথার ওপর তুবারঝড়ের মতো ঝিরিঝিরি উডছে রাত-শোকর দল অগ্নিকুণ্ডের ধারে একটা মোটা চামর বিছিয়ে তারই ওপর রাতের খাবারের আয়োজন করা হয়েছে ধুমায়মান হাঁড়িতে টগবগ করে জাউ ফুটছে দারিয়া তার সায়ার ঝুটে চামচগুলো মুছে খ্রিগোরিকে চোঁচিয়ে

‘খেতে এসো!’

খ্রিগোরি অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে এসে আগুনের দিকে এগিয়ে গেল। জিবুন-কোর্তাটা তার কাঁধের ওপর ছড়ানো

‘কী গো? অমন গুম ঘেরে রয়েছে যে?’ দারিয়া মুখ টিপে হাসল

‘বাঁটি হবে মনে হচ্ছে, কোমরটা ব্যথায় টনটন করছে, খ্রিগোরি ঠাট্টা করে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করল।

‘আসলে বলদ পাহারা দিতে চায় না আর কি সত্যি বলছি!’ দুনিয়াশ্কা দামার পালটিতে বসে পড়ে হাসতে হাসতে বলল, তার সঙ্গে গল্প করার চেষ্টা করল, কিছু কথাবার্তা তেমন জমল না

পান্তেলেই প্রকোষিয়েভিচ তেড়েফুঁড়ে হাপুস হুপুস করে জাউ খেতে লাগল, আধসেজ জনারগুলো দাঁতের ফাঁকে কটরমটর করে চিবুতে লাগল, আক্সিনিয়া চোখ না তুলে বেয়ে চলল দারিয়ার হাসিঠাট্টায় তেমন একটা উৎসাহ না দেখিয়ে নদু হাসল তার গালদুটো তপ্ত হয়ে উঠেছে, অবজিকর একটা গোলাপী আভায জলেপুড়ে যাচ্ছে।

খ্রিগোরিই প্রথম খাওয়া সেরে উঠল উঠে চলে গেল বলদদুটোর কাছে

‘দেখিস, বলদগুলো যেন অন্যের ঘাসের কোন ক্ষতি না করে’ ওর পেছন পেছন চোঁচিয়ে কথাগুলো বলতে গিয়ে খানিকটা জাউ বুড়ের গলায় আটকে গেল অনেকক্ষণ ধরে সে খক খক করে কাশতে লাগল।

দুনিয়াশ্কার গাল ফুলে উঠল, সে ফুলে ফুলে হাসতে লাগল আগুন নিভে

নিড়ু হয়ে জ্বলছে। অগ্নিকুণ্ডের চারপাশে যারা বসে আছে, থিকি থিকি শুকনো ডালপালার পোড়া পাতা থেকে একটা মিষ্টি মধুর গন্ধ তাদের সকলকে যেন আচ্ছন্ন করে ফেলছে

\* \* \*

মাঝরাতে গ্রিগোরি চুপে চুপে ক্ষেত্রের চালার দিকে এগিয়ে এলো। চালাটার হাত পাঁচেক দূরে এসে সে দাঁড়াল পাশেলেই প্রকোক্ষিয়েতিত গাড়ির ভেতরে শুয়ে আছে। বিচিত্র সুরে নাক ডাকছে সঙ্কেবেলাকার জ্বালানো আগুন নেড়ানো হয় নি ছাইয়ের গাদার ভেতর থেকে ময়ূরের সোনালি চোখের মতো উঁকি মারছে সেই আগুন।

গাড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বেরিয়ে এলো আপাদমস্তক ঢাকা একটা খুসর মূর্তি। মূর্তিটা আঁকাবাঁকা গতিতে ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো গ্রিগোরির দিকে হাত দুয়েক দূরে থাকতে ধমকে দাঁড়িয়ে পড়ল আক্সিনিয়া হ্যাঁ, আক্সিনিয়াই বটে গ্রিগোরির বুকের ভেতরটায় গুরুগুরু শব্দে ঢাক পিটোতে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে ঢাকের আওয়াজের মতোই যেন আবার কাঁপা প্রতিধ্বনিও তুলল গ্রিগোরি নীচু হয়ে গাড়ি মেঝে এগিয়ে গেল কোর্তার খারটা ঝটকা মেঝে পেছনে সরিয়ে দিয়ে বুক চোপে ধরল উদগ্র কামনার শিখায় লেলিহান, আত্মসমর্পিত শরীরটিকে আক্সিনিয়ার হাঁটুদুটো ভেঙে পড়ছিল, তার সর্বত্র ধরধর করে কাঁপছিল, দাঁতে দাঁত লেগে ঠকঠক আওয়াজ উঠছিল। গ্রিগোরি এক ঝটকা টানে তাকে পীড়াকোলা করে তুলে নিল ঠিক যেমন করে কোন ভেড়াকে মারার পর নেকড়ে তাকে নিজের পিঠে তুলে নেয় তারপর বোতাম-খোলা কোর্তার কোনায় পা লেগে হোঁচট খেতে খেতে হাঁপাতে সে ছুটতে লাগল

‘ও, গ্রিগো! ওগো, তোমার বাবা গো’

‘চুপ’

গ্রিগোরির হাত থেকে নিজেই ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে লাগল আক্সিনিয়া। কোর্তার ভেড়ার লোমের টকটক গন্ধে তার দম বন্ধ হয়ে আসছিল একটা আক্ষেপের তিক্ততায় তার গলা বৃক্ষে আসছিল আক্সিনিয়া এবারে নীচু গলায় আত্মনাদ করে বলে উঠল

‘হাড়! এখন আর কী? আমি নিজেই যাবি।’

তার কষ্টম্বর প্রায় চিংকারের মতো শোনাল

নারীর প্রেম যখন বিলম্বে আসে তখন তা গাঢ় নীল রক্তিম টিউলিপ ফুল হয়ে প্রকাশ পায় না, ফুটে ওঠে পথের ধারের মাতাল করা খুতরা ফুল হয়ে।

ঘাস কাটার ঘটনার পর থেকে আশ্রিনিয়ার যেন নবজন্ম হল। কেউ যেন তার মুখে চিহ্ন ঐকে দিল, ছাঁকা দিয়ে পুড়িয়ে ছাপ ঐকে দিল চিরদিনের জন্য তাকে দেখলে গাঁয়ের মেয়ে-বৌরা যে ভাবে দাঁত বার করে তাতে গায়ে ছালা ধরে যায়, ও চলে গেলে পেছন থেকে তারা মাথা কাঁকায় অল্পবয়সী মেয়েরা হিংসেয় ছলেপুড়ে মরে। ও কিন্তু পরম আনন্দে কলঙ্কের বোঝাভরা মাথাটা গর্বভরে উঁচু করে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

দেখতে দেখতে গ্রামিকার সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারটা সকলেই জানতে পারল প্রথম প্রথম কানায়ুসা চলল - কেউ বিশ্বাস করল, কেউ বা করল না কিন্তু পরে এক দিন যখন গ্রামের রাখাল খাঁদানাক কুজকা ভোরবেলার অস্তগামী চাঁদের স্নান আলোয় হাওয়াগুলোর কাছে নীচু কসলক্ষেতের মধ্যে ওদের দু'জনকে শূয়ে থাকতে দেখল সে দিন থেকে গুজব ছড়িয়ে পড়ল পারের ওপর ডেঙে পড়া ঘোলাজলের ঢেউয়ের মতো।

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচের কানেও একথা পৌঁছল এক রবিবারে তাকে যেতে হয়েছিল মোখজদের দোকানে। দোকানের মুখে এত লোক যে সে ভিড় ঠেলে এগোয় সাধ্য কার পান্তেলেই ভেতরে ঢুকতেই গেলে লোকজন সরে রাস্তা করে দিল - এমনকি মনে হল যেন হাসলও ঠেলে ঠেলে ত সে দোকানের কাপড় বিক্রির গদির সামনে এসে দাঁড়াল দোকানের মালিক সেগেই প্রাতোনভিচ নিজে তার মালের তদারক করতে এগিয়ে এলো।

‘তোমাকে যেন অনেক দিন দেখি না প্রকোফিচ? কী ব্যাপার?’

‘কাজের কি আর শেষ আছে গেরহাজি সামলানোই দায়’

‘কী কথাই না বললে! অমন ছেলেরা থাকতে কিনা সামলানো দায় বলছ।’

‘হুঃ, ছেলেরা পেরো ত গেছে পলটনে। এখন আমি আর গ্রিশকা এই দু'জনে মিলেই কোনমতে চালাচ্ছি।’

সেগেই প্রাতোনভিচ তার কড়া লাল দাড়ি দু'ভাগে ভাগ করে নিল, যে-সমস্ত কসাক সামনে ডিড় করে দাঁড়িয়েছিল অর্থব্যঞ্জক দৃষ্টিতে আড়চোখে তাদের দিকে তাকাল।

‘তা হ্যাঁ বাপু, অমন চেপেচুপে থাকার কী মানে হয় বল ত?’

‘কিসের? কী ব্যাপারে?’



‘কী ব্যাপারে আবার ? ছেলের বিয়ে দেবার মতলব করছে, অথচ নিজে মুখে কিছু বলছে না।’

‘কোন ছেলের ?’

‘কেন, তোমার খ্রিগোবিন্দ তার ত বিয়ে হয় নি।’

‘ওকে বিয়ে দেবার কথা এখনও ভাবি নি।’

‘কিন্তু আমি ত শুনলাম স্ত্রীপান আন্তাখন্ডের আন্নিনিয়াকে নাকি ছেলের বৌ করে ঘরে তুলছে।’

‘সে কি কথা ? আমি ঘরে তুলছি ? ওর স্বামী বেঁচে থাকতে ঠাট্টা করছ বলে যেন মনে হচ্ছে প্রাতোনিচ ? তাই না ?’

‘ঠাট্টা করতে যাব কেন ? লোকের মুখে শুনছি।’

পান্ত্লেই প্রকোকিয়েভিচ মোকানের গদির ওপর মেলে ধরা কাপড়ের থানটা হাত দিয়ে ঘসে ঘসে সমান করল, তারপর হঠাৎই ঘুরে দাঁড়িয়ে খৌড়াতে খৌড়াতে বেরোবার দরজার দিকে চলল মোকো রওনা দিল বাড়ির দিকে বাঁড়ের মতো মাথা ঘোঁজ করে, শিরা-ওঠা আঙুলগুলো একটা গোছার মতো করে মুঠো পাকিয়ে যে ভাবে হনহন করে সে চলল তাতে তার খৌড়ানো আরও বেশি করে চোখে পড়ছিল আন্তাখন্ডের উঠোনের পাশ দিয়ে যাবার সময় বেড়ার ফাঁক দিয়ে একবার উঁকি মেরে দেখল আন্নিনিয়া একটা খালি বালতি নিয়ে নিতম্ব মোলাতে দোলাতে ঘরের দিকে চলেছে। বেশ সাজগোজ করেছে, তাকে আরও কমবরসী দেখাচ্ছে।

‘এই দাঁড়া দেখি একটু।’

পান্ত্লেই প্রকোকিয়েভিচ একটা মূর্তিমান শয়তানের মতো হুডমুড করে গোট খুলে ভেতরে ঢুকে পড়ল আন্নিনিয়া দাঁড়িয়ে পড়ে তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। দু’জনে ঘরের ভেতরে ঢুকল মাটির মেঝে চমৎকার ঝাঁট মেওয়া, দিবা ঝকঝক তকতক করছে, তার ওপর লালচে বালি ছড়ানো। সামনের কোণটায় একটা বেঞ্চের ওপর চুল্লীর ভেতর থেকে সদা বাব করা কিছু পিঠে ভেতরের ঘর থেকে তেঁসে আসছে বহুদিনের পড়ে থাকা বাসী কাপড়চোপড়ের ভ্যাপসা গন্ধ, আর কেন যেন, মিষ্টি আপেলের গন্ধ।

সাদা-কালো রঙের বিচিত্র ফুটি-ফুটি একটা হেঁড়ে-মাথা তুলো বেড়াল আদর কাড়ার মতলবে পান্ত্লেই প্রকোকিয়েভিচের পায়ের কাছে এগিয়ে এসেছিল। বেড়ালটা পিঠ বেকিয়ে বন্ধুত্বের ভাব দেখিয়ে তার জুতোর গায়ে সামান্য গুতো দিল পান্ত্লেই প্রকোকিয়েভিচ পা ঝাড়া দিয়ে সেটাকে বেকির গায়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল আন্নিনিয়ার ভূরুর ওপর চোখ রেখে সে চিংকার করে উঠল, ‘এসব কী

হচ্ছে শূনি? স্বামী বাড়ি ছেড়ে যেতে না যেতেই ছেনালিপপা শুরু করে দিয়েছিল। এর জন্যে আমি শিশুকার খুন বরিয়ে ছাড়ব, আর তোর স্তেপানকে লিখে জানাব। জানুক ও খানকি মাগী কোথাকার। চড় চাপড়টা একটু কমই বেয়েছিস দেখছি। আজ থেকে আমার বাড়ির ত্রি-সীমানা মাড়াবি নে। জ্বাটলি করে বেড়ানো হচ্ছে এক ছোকরার সঙ্গে, এমিক স্তেপান যখন আসবে তখন আমার যে ।

আগ্নিনিয়া চোখদুটো কঁচকে শুনে গেল। তারপর হঠাৎ নির্লজ্জের মতো ঘাঘরার কিনারাটা ধরে ঝাড়া দিল। মেয়েদের ঘাঘরার একটা বিশেষ গন্ধ ভুক করে নাকে এসে লাগল। তারপর বুক উঁচিয়ে, শরীব বঁকিয়ে দাঁত বিচিয়ে তেড়ে এলো পাশ্বেলেই প্রকোফিয়েভিচের দিকে।

‘তুমি কি আমার স্বশুর নাকি? আ? বলি, স্বশুর? তুমি কি আমায় শেখাতে এয়েছ। শেখাতে হয় তোমার ওই পাছা-হাটাকে গিয়ে শেখাও গে। নিজের ঘরে গিয়ে খবদারি কর গে। ওরে শয়তানের খাড়ি। ঠ্যাঙ খোঁড়া, টুটো, আমি কি তোকে খোঁড়াই গেরাহি করি। ভাগ দেখি এখন থেকে আমাকে ভয় দেখাবে ভবেছ।’

‘দাঁড়া হারামজাদী ।’

‘কিসের আবার দাঁড়া, ভালোয় ভালোয় পা বাড়া। যেখান থেকে এয়েছ সেখেনেই ফিরে যাও। আর তোমার শিশুকাকে আমার যদি তেমন ইচ্ছে হয় হাড়মাস চিবিয়ে গিলে ফেলব। কাবও কাছে কোন জবাবদিহি করতে যাব নি। এই যে নাও, কাঁচকলা খাও। আচ্ছা, হলই না হয় শিশুকা আমার ভালোবাসার মানুষ তাতে কী হল? আমাব ওপর মরধর করবে নাকি? সোয়ামিকে লিখে জানাবে? যাও যাও, মন চায় ত লেখ গিয়ে খোদ সর্দারকে কিছু শিশুকা আমার। আমার আমার। আমি ওকে দখল করেছি, ও আমার দখলেই থাকবে ।’

পাশ্বেলেই প্রকোফিয়েভিচ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। আগ্নিনিয়া বুক ঠেকিয়ে তাকে ঠেলা মারল। অটসটি জামার ভেতরে আগ্নিনিয়াব বুক জ্বলে-পড়া পাখির মতো ধুকধুক করতে লাগল, কালো চোখের আগুনের লিখায় সে তাকে দগ্ধ করতে লাগল, তার ওপর এমন সমস্ত বাকাবাণ বর্ষণ করে গেল যোগসৌর একটা আরেকটার চেয়ে আরও ভয়াবহ, আরও নির্লজ্জ। পাশ্বেলেই প্রকোফিয়েভিচের ডুবুজোড়া কঁপে উঠল, দরজার দিকে পিছু হটতে লাগল সে লাঠিগাছটা সে ঘরের এক কোনারে রেখে দিয়েছিল হাতড়ে মেটা তুলে নিল, তারপর হতাশ ভঙ্গিতে হাত নেড়ে পাছা দিয়ে ঠেলে দরজা খুলল আগ্নিনিয়া ঠেলে তাকে

বারান্দা থেকে হাট্টিয়ে দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে, ক্ষিপ্ত হয়ে চোঁচাতে লাগল

‘আমার এই পোড়ার জীবনে, সারা জীবনে ওর জন্যে আমার যে ভালোবাসা  
করও সাধি নেই তা কেড়ে নেয়।’ তা সে আমাকে মার কাট, খুন কর - যা-ই  
কর না কেন! শিশু! আমার! ও আমার!’

পান্ত্লেই প্রকোফিয়েভিচ দাড়ির ফাঁকে অশ্রুটে কী যেন বিড়বিড় করতে  
করতে ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে বাড়িব দিকে চলে গেল।

সামনের ঘরেই শিশুকার সেবা পেল কোন রকম বাঁকাব্যয় না করে হাতের  
লাঠিগাছা তুলে পিঠের ওপর বসিয়ে দিল এক ঘা। মার খেয়ে বৌকে গিয়ে  
গ্রিগোরি তার বাপের হাত ধরে কুলে পড়ল।

‘কী করেছি বাবা? মরছ বে?’

‘তুই যে কাজ করেছিস তার জন্যে, শূয়োরের বাচ্চা!’

‘কী করেছি আমি?’

‘পড়শীর সঙ্গে ত্যাঁদভামি বাপের মুখে চুনকালি মেয়েমানুষের পেছনে ছৌঁক  
ছৌঁক করে বেড়ানো কুস্তা কোণাকার!’ লাঠিগাছা ছাড়িয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে  
গ্রিগোরিকে ঘরের মধ্যে টেনে হিচড়ে নিয়ে বেড়াতে বেড়াতে পান্ত্লেই প্রকোফিয়েভিচ  
চৌঁচিয়ে গলা ফাটল

‘মারধর করতে আমি দেব না। চাপা গলার ফুঁসে উঠল গ্রিগোরি দাঁতে  
দাঁত চেপে বাপের হাত থেকে হৈচকা টান মেরে লাঠি ছিনিয়ে নিল। হাঁটুর ওপর  
রোবে মট করে ডেঙে ফেলল।

পান্ত্লেই প্রকোফিয়েভিচ শব্দ কবে মুঠো পাকিয়ে ছেলের ঘাড়ে এক বন্দা  
কষিয়ে দিল।

পঞ্চায়েতে সকলের সামনে তাকে আমি চোঁড়াব। ব্যাটা হারামজাদা  
শয়তানের ঝাড়। আরও এক ঘা বসানোর উদ্দেশ্যে তিড়িংবিড়িং করে পা ছুঁড়তে  
ছুঁড়তে সে বলল ‘হাবা মেয়ে মারখুশ্কার সঙ্গে তোর বিয়ে দেব। আমি তোকে  
খাসী বানিয়ে ছাড়ব! বজ্জাত!’

হৈ চৈ শূনে গ্রিগোরি মা ছুটে এলো।

‘প্রকোফিচ. প্রকোফিচ একটু ঠাণ্ডা হও দাঁড়াও।’

কিন্তু বুড়ার তখন কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেয়ে গেছে। বৌকে এক ঘা বসিয়ে  
দিতে ছাড়ল না, সেলাইয়ের কলসূদ্ধ টেবিলটা উলটে ফেলে দিল, আশ মিটিয়ে  
গায়ের ঝাল খাড়ার পর ছুটে চলে গেল উঠোনে গ্রিগোরির গায়ের জামাটা  
ধ্বস্তাধ্বস্তিতে ফলা ফলা হয়ে গিয়েছিল সেটা সে গা থেকে ছেড়ে ফেলার  
অবকাশ পেল না বিকট শব্দ করে দরজা হাঁ হয়ে খুলে গেল - খড়ো মেঘের

মূর্তি নিয়ে চৌকাটের ওপর ফের দর্শন মিল পাড়লেই প্রকৌফিয়েভিচ

‘এই শূয়োরের বাচ্চাটার বিয়ে দিতে হয়’ ঘোড়ার মতো সে মেঝেতে পা  
ঠেকল ত্রিগোরির পেশল পিঠের দিকে হিরদাটিতে তাকাল ‘বিয়ে দেবই কালই  
বেরোব সম্বন্ধ দেখতে। ছেলের জনো মুখ হাসানো বেঁচে থেকে কিনা এও  
সইতে হবে।’

‘আচ্ছা আচ্ছা, জামাটা ত পরতে দাও, বিয়ে দেবার সময় পরে পাবে।’

‘বিয়ে দেব, ঠিক দেব হাবা মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেব।’ এই বলে দড়ান  
করে দরজা বন্ধ করে সে বেরিয়ে গেল। তার পদশব্দ ঝঁটঝঁট করে বারান্দার  
ধাপ বয়ে নেমে শেষকালে মিলিয়ে গেল

### এগার

সেত্ৰাকিত গাঁ ছাড়িয়ে স্তেপের বুকে তেরপলের ছই দেয়া সারি সারি গাড়ি  
আশ্চর্য ভূত গতিতে গড়ে উঠেছে একটা স্বকলকে তকতকে ছোট শহর। সাদাবস্তুর  
ছাদ, সোজা সোজা রাস্তা, মাঝখানে ছোট একটা পল্টনের মাঠ সাদ্বী টহল  
মিছে সেখানে

শিবিরের জীবনযাত্রা শুরু হয়ে গেছে-মে মাসে সচরাচর যেমন হয়ে  
থাকে অন্যান্য বছরের মতো সেই একই, একঘোরে জীবন মাঠে চরতে দেওয়া  
ঘোড়াগুলোকে পাহারা দেওয়ার ভার যে কসাকদের ওপর থাকে সকালবেলায়  
ভারা সেগুলোকে তড়িয়ে নিয়ে যায় ছুটিনিতে। তারপর শুরু হয়ে যায় ঘোড়াগুলোকে  
দলিাই মলাই, জিন-কষা, নাম-ডাকা, সার বৈধে দাঁড়ানো। শিবিরের ভারপ্রাপ্ত স্টাফ  
অফিসার গলাবাক্স লেক্টোনার্ট-কর্ণেল পপোভ গলা চড়িয়ে হাঁক ডাক চৈচামেটি  
করে, তবুও কসাকদের শেখানোর ভার বেই সার্জেন্টদের ওপরে আছে, তারা  
তালিম দেওয়ার সময় গলা ফাটিয়ে ওদের নানা রকম নির্দেশ দিয়ে যায় টিলার  
ওপারে আক্রমণের জন্য সবাই জড় হয় কায়দা করে ‘শত্রুপক্ষকে’ ঘেরাও করে  
ফেলে, তার পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যায়। ছররা বন্দুক দিয়ে চাঁদমারি অভ্যাস করা  
হয় একটু কমবয়সী কসাকরা সোৎসাহে তলোয়ার চালিয়ে এ ওর সঙ্গে শক্তি  
পরীক্ষা করে। যারা বয়সে একটু বড়, তারা সুযোগ পেলেই ফাঁকি মারে

একে গরম, তার ওপরে ভোদকা লোকের গলা স্বাভাবিক ডাবেই ভেঙে  
যাচ্ছে। এদিকে ছই-ঢাকা গাড়ির লম্বা লম্বা সারির মাথার ওপর দিয়ে ঢেউ  
খেলিয়ে বয়ে চলেছে সুগন্ধী বাতাস, দূর থেকে ভেসে আসছে মেঠো ইঁদুরের

কিচিরমিচির, জনবসতি ছাড়িয়ে, চূপকাম করা ঘরবাড়ির সীমানা ছাড়িয়ে দূরে লোকজনকে টেনে নিয়ে চলেছে স্তম্ভভূমি।

শিবির ছাড়ার এক সপ্তাহ আগে গোলন্দাজ ইভানের আপন ভাই আন্দ্রেই তোমিলিনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল তার বৌ। সঙ্গে নিয়ে এসেছিল বাড়িতে তৈরি কিছু খাদ্য পিঠে, এটা-ওটা নানা খাবার আর গ্রামের এক রাশ খবর।

পরের দিনই খুব সকালে সে চলে গেল কসাকদের কাছ থেকে বাড়ির লোক আর নিকট আশ্চর্যজনদের জন্য সে নিয়ে গেল শুভেচ্ছা আর নানা নির্দেশ। শূণ্য স্তম্ভপান আস্তাখভই তার মারফত কোন বার্তা পাঠাল না আগের দিন সে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। ভোদকা টেনে সুস্থ হওয়ার চেষ্টা করছিল। তাই তোমিলিনের বৌ কেন, বিশ্বসংসারের কিছুই তাকিয়ে দেখার মতো ক্ষমতা তার ছিল না। তালিমে সে গেল না তার অনুরোধে ডাক্তারের একজন সহকারী রক্তমোক্ষনের জন্য ডজনখানেক জ্বৌক বুক লাগিয়ে দিল একমাত্র ফতুয়া গায়ে স্তম্ভপান তার গাড়ির চাকার ধারে বসে রইল চাকার তেল লেগে তার সাদা চাকনাওয়ালা টুপিটা নোংরা হয়ে যেতে লাগল। নীচের চৌঁটিটা ফুলিয়ে সে দেখতে লাগল বুকের বিশাল শ্বেত অর্ধগোলকদুটো থেকে চুষে চুষে জ্বৌকগুলো কালো রক্তে কেমন ফুলে টোপা টোপা হয়ে উঠছে।

পাশে দাঁড়িয়ে ছিল রেজিমেন্টের ডাক্তারের সহকারী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে সিগারেট টানছিল, বিরল দাঁতের সারির ফাঁক দিয়ে চেপে চেপে তামাকের ধোঁয়া বার করছিল।

‘ভালো বোধ হচ্ছে কি?’

‘বুকের কাছ থেকে খিচছে ভেতরটা অনেক হালকা হালকা মনে হচ্ছে।’

‘জ্বৌকই হল মোক্ষম ওষুধ।’

এমন সময় তার কাছে এলো তোমিলিন। চোখ টিপল।

‘স্তম্ভপান, তোকে একটা কথা বনার ছিল।’

‘বলে ফেল।’

‘আমার সঙ্গে একটু আর তাহলে।’

স্তম্ভপান কঁকাতে কঁকাতে উঠে তোমিলিনের সঙ্গে দূরে সবে এলো।

‘আজ্ঞা এবারে বল।’

‘আমার বৌ এসেছিল। আজই চলে গেল।’

‘হুম্’

‘তোমার বৌকে নিয়ে গায়ে কথা উঠেছে।’

‘কী কথা?’

‘তোকে যা বলছে সেগুলো ভালো কিছু নয়।’

‘কী বলছে?’

‘গ্রিশকা মেলেবড়ের সঙ্গে নাকি ফটিনাষ্ট্রি করে বেরাচ্ছে একেবারে খোলাখুলি।’

স্তেপানের মুখ ফেকাশে হয়ে গেল। বুক থেকে জ্যৌকগুলোকে টেনে তুলে ফেলে পায়ে মড়াতে লাগল। শেষটাকে পায়ে পিবে মেরে ফেলার পর জামার কলারের বোতাম আঁকান, পরক্ষণেই কোন এক কারণে কে জানে, সে যেন ভয় পেয়ে গিয়ে ফের বোতাম খুলে ফেলল। তার সাদা ফেকাশে ঠোঁটদুটো চকল হয়ে উঠল, থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে ছেয়ে গেল একটা আনাড়ি হাসিতে, শেষকালে কঁকড়ে একটা নীলমতন দলা পাকিয়ে যাওয়ার উপক্রম হল। তোমিলিনের মনে হল স্তেপান যেন শক্ত কঠিন কোন জিনিস দাঁতে চিবুচ্ছে, কোনমতে বাগে আনতে পারছে না ধীরে ধীরে মুখের স্বাভাবিক রঙ ফিরে এলো। দাঁতে কামড়ে ভেতরে টেনে ধরা ঠোঁটজোড়া পৃথরের মতো কঠিন, নিশ্চল হয়ে গেল। স্তেপান মাথার টুপি খুলে নিল, টুপির সাদা খোলার ওপর লেগে থাকা চাকার তেলকালি জামার আঙ্গিন দিয়ে ঘসে মাখামাখি করে ফেলল। তারপর কনঝনে গলায় বলল, ‘খবরটার জন্যে ধন্যবাদ।’

‘তোকে ঠুনিয়ার করে দেবার জন্যে বললাম। আমাকে ক্ষমা করবি।

কথা হল কিনা, এই হল গে ব্যাডির হালচাল।’

তোমিলিন অনুকম্পাভরে নিজের পরনের প্যান্টের একটা পায়াব ওপর চাপড় মেরে তার জিন-না-জাদানো খোড়াটার দিকে এগিরে গেল। শিবির তখন বহুকণ্ঠের কোলাহলে মুখরিত। কসাকরা তুলোয়ার চালানোর তালিম থেকে ফিরে এসেছে স্তেপান মুহূর্তের জন্যে ধমকে দাঁড়িয়ে বেশ মনোযোগ দিয়ে কঠিন দৃষ্টিতে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল টুপির ওপরকার কালো দাগ। আধা হেঁতলানো মুমূর্ষু একটা জ্যৌক তার বুটজুতো বয়ে ওপরে উঠতে লাগল।

বারো

শিবির থেকে কসাকদের ঘরে ফেরার আর সন্তাহ দেড়েক বাকি।

আগ্নিনিয়া তার বিলম্বিত তিস্ত প্রেমের উদ্ভাদনায় আচ্ছন্ন বাপের শাসানি সম্বোধে গ্রিগোরি গোপনে রাতের বেলায় তার কাছে চলে আসে। ভোরের দিকে বাড়ি ফিরে যায়।

শক্তির অসাধা ছুটলে ঘোড়ার যেমন অবস্থা হয় দু'সপ্তাহের মধ্যে গ্রিগোরিও শক্তি হারিয়ে হয়ে পড়েছে তেমনি দুর্বল অবসর্য বিনিত্র রাত কাটানোর ফলে তার হাড়-উঁচু গালের বাদামী চামড়ার ওপর লেগেছে নীল ছোপ, তার চোখের বসে যাওয়া কোটরের ভেতর থেকে এখন জেগে থাকে শূকনো কালো দুটি চোখের ক্লান্ত দৃষ্টি

আগ্নিনিয়া মুখ না ঢেকেই চলাফেরা করে তার চোখের তলার গভীর গর্ভদুটোতে ঘনিয়ে আসছে শোকের কালো ছায়া ফোলা-ফোলা, সামান্য ওলটানো কান্নাতুর দুই ঠোঁটে ঝরে পড়েছে অস্থির উদ্ধত হাসি

তাদের দু'জনের এই উদ্ব্যস্ত মিলন এতই অদ্ভুত ও প্রকাশ্য ছিল, লোকজনের সামনে কোন বিবেকের বালাই না রেখে, কোন আড়াল না রেখে একই নির্লজ্জ আগুনের শিখায় এমন উদ্বাদনায় তারা পুড়তে লাগল পড়শীদের চোখের সামনে দিনে দিনে তাদের চোখমুখ এত শীর্ণ ও কালো হয়ে উঠতে লাগল যে এখন তাদের দৈর্ঘ্যে লোকেই কেন যেন লজ্জা পেতে থাকে, তাদের দিকে মুখ তুলে চাইতে পারে না

গ্রিগোরির বক্তৃৎকবরা, যারা আগে আগ্নিনিয়ার সঙ্গে তার সম্পর্ক নিয়ে হাসিঠাট্টা করত এখন তারা গ্রিগোরির সঙ্গে দেখা হলে চুপ করে যায়, তার সংসর্গে অস্বস্তি ও কুণ্ঠা বোধ করে মেয়েরা মনে মনে আগ্নিনিয়াকে হিংসে করলেও মুখে তাকে ধিক্কার দেয়, স্তম্ভপানের আগমনের সম্ভাবনায় তাদের হিংস্র উদ্ভাস আর ধরে না, উদগ্র কৌতূহলেব আড়নায় ছটকট করতে থাকে তারা কী হতে পারে এই ভেবে ভেবে তাদের জল্পনা-কল্পনার আর শেষ নেই।

গ্রিগোরি যদি অনুপস্থিত সৈনিকের বধু আগ্নিনিয়ার কাছে যাতায়াত করা সত্ত্বেও লোকের কাছ থেকে অদ্ভুত লুকোনোর ভান করত অনুপস্থিত সৈনিকের বধু আগ্নিনিয়া যদি খানিকটা গোপনীয়তা বজায় রেখেও গ্রিগোরির সঙ্গে বসবাস করত এবং সেই সঙ্গে অন্যদেরও এড়িয়ে না চলত, তাহলে এই সম্পর্ক কারও কাছে এতটুকু অদ্ভুত বা দৃষ্টিকটু ঠেকত না গ্রামে কথা উঠত বটে তবে শেষকালে কথা থেমেও যেত। কিন্তু ওরা দু'জনে যে প্রায় প্রকাশ্যেই একসঙ্গে বাস করছে ওরা যেন কোন এক বিরাট বন্ধনে বাঁধা পড়ে গেছে। এ বন্ধন সাময়িক বলে মনে হয় না, আর সেই কারণে গ্রামের লোকজনের বিবেচনায় এটা অপরাধজনক, নীতিবিগর্হিত। তারা তাই বিষভরা বিদ্রোহ নিয়ে অপেক্ষা করে রইল কবে স্তম্ভপান আসবে, এসে এই গটিছড়া খুলবে

ভেতরের ঘরে খাটের মাথাব ওপর একটা দড়ি টাঙানো দড়িতে গাঁথে রাখা হয়েছে কতকগুলো সাদা আর কালো রঙের খালি সুতোর কাটিম শোভাবর্ণনের

জন্য বুলিয়ে রাখা হয়েছে ওগুলোর ওপর মাছেরা রাত কাটায়, এখান থেকেই ছাদ পর্যন্ত জাল বুনেছে মাকড়সা। আক্সিনিয়ার শীতল নগ্ন বায়ুর ওপর মাথা রেখে শুয়ে আছে গ্রিগোরি, শূন্যে শূন্যে ছাদের দিকে তাকিয়ে দেখছে কাটিমের মালাটা। অন্য হাতের আঙুল দিয়ে আক্সিনিয়া গ্রিগোরির পিছনে হেলানো মাথার ঢেউ খেলানো চুলে বিলি কাটিছে ঘোড়ার চুলের মতো কর্কশ গ্রিগোরির চুল আক্সিনিয়ার হাতের আঙুলগুলো কাজ করে করে ধরথরে হয়ে গেছে, সদ্য-দোয়া সোবুর দুধের গন্ধ বেরোচ্ছে তার আঙুল থেকে। গ্রিগোরি মাথা ঘোরাতে তার নাক আক্সিনিয়ার বগলে লেগে গেল সঙ্গে সঙ্গে মোয়েলি ঘামের একটা উগ্র মিষ্টি মিষ্টি কাঁখাল মাতাল-করা গন্ধ নাকে এসে লাগল।

চার কোণে খোদাই করা মাথাওয়ালা রঙ-করা কাঠের পালঙ্ক ছাড়াও ভেতরের ঘরে দরজার কাছাকাছি রাখা আছে লোহা-বাঁধানো একটা সিঁদুক। তার ভেতরে আছে আক্সিনিয়ার পাওয়া যত রকমের যৌতুক আর ভালো ভালো সাজগোজ সামনের কোণে একটা টেবিল - অয়েলক্রথ দিয়ে ঢাকা অয়েলক্রথের ওপর ছাপা রয়েছে জেনারেল ব্রোবেলেভের ছবি জেনারেলের সম্মানে তাঁর সামনে খালি দেয়া কতকগুলো ধ্বজা নোয়ানো তিনি টগবগ কবে ঘোড়ায় চড়ে সে দিকে খেয়ে চলেছেন ওখানেই আবার দুটো চেয়ার, চেয়ারের ওপরে কয়েকটা বিগ্গহ। তাদের মাথার পেছনে শক্তা চটকমার কাগজ কেটে তৈরি জ্যোতি। এক পাশে দেয়ালের গায়ে ঝাছি বসার দাগে কলঙ্কিত গোটা কয়েক ফোটা একটাতে একদল কসাক - মাথার সামনের দিকে ইয়া ইয়া ঝুটি চিতানো বুকের ওপর ঘড়ির চেন, খাপ-খোলা তলোয়ার স্তোপান যখন সক্রিয় পলটনের চাকরীতে ছিল সেই সময়কার ছবি তার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে। হাঙ্গাবে স্তোপানের একটা উদ্দি বুলছে। অথচ রাখা জ্ঞানলার ফাঁক দিয়ে চোখ বড় বড় করে চাঁদ উঁকি মারছে, সন্দেহভরে উদ্দির ওপরকার সার্জেন্টের কাঁধ পাটির দুটো সাদা ফিতে হাতড়ে বেড়াচ্ছে।

আক্সিনিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে গ্রিগোরির নাকের খাঁজের একটু ওপরে তার দুই ভুরু মাঝখানে চুমু খেল

‘গ্রিশা, ওগো’

‘কী হল তোমার?’

‘আর মাস্তুর নয়টা দিন

খুব একটা কম নয়।’

‘কিন্তু আমি তারপর কী করব, গ্রিশা?’

‘আমি তার কী জানি?’

আক্সিনিয়া দীর্ঘনিশ্বাস চেপে রাখল আবার সে গ্রিশার সামনের চুলের ঝুটির



জট ছাড়াতে থাকে, তার ওপর হাত বুলাতে থাকে

‘স্তেপান আমাকে খুন করে ফেলাবে’ কথাটা সে এমন ভাবে বলল যে সেটা প্রঙ্গসূচকও হতে পারে, আবার কোন দৃঢ় উক্তিও হতে পারে

গ্রিগোরি চূপ করে রইল তার ঘুম শেষেছে। তার চোখের পাতা যেন আটকে আসছে অতি কষ্টে চোখের পাতা খুলে তাকাত্তে সে দেখতে পেল তারই চোখের ওপর সোজা খেলে যাচ্ছে আগ্নিনিয়ার নীলচে কালো দুটি চোখের ঝিলিক

‘ও ফিরে এসে তুমি আমাকে নিশ্চয় ছেড়ে দেবে ? তাই না ? ভয় পাবে ?’

‘আমি ওকে ভয় করতে যাব কেন ? তুমি ওর বৌ ভয় পেতে গেলে তোমারই পাবার কথা।’

যতক্ষণ তোমার সঙ্গে আছি ততক্ষণ ভয় পাই নে। কিন্তু দিনের বেলায় যখন আমি এই নিয়ে ভাবি তখন ভয়ে বুক কাঁপে আমার

গ্রিগোরি হাই তুলল মাথাটা আরেক পাশে কাত করে বলল

‘স্তেপান আসবে সেটা কোন ব্যাপার নয় কিন্তু ব্যাপার হল কী জান আমার বাপ আমাব বিয়ে দেবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে’

গ্রিগোরি হাসল সে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু অনুভব করল তার মাথার নীচে আগ্নিনিয়ার হাতটা হঠাৎ যেন নৈতিয়ে পড়ল, সেবে গেল বালিশের তেতরে, একটু কাঁপুনি তুলে মুহূর্তের মধ্যে আবার শব্দ হয়ে উঠল আগের অবস্থায় ফিরে এলো

‘কার সঙ্গে সম্বন্ধ করছে ?’ চাপা গলায় আগ্নিনিয়া জিজ্ঞেস করল।

‘যাবার ভোড়জোর করছে আর কি মা বলছিল, বোধহয় কোরশুনভদের কাছে যাচ্ছে, ওদের মেয়ে নাতালিয়ার সঙ্গে সম্বন্ধের কথা ভাবছে’

‘নাতালিয়া নাতালিয়া সুন্দরী মেয়ে’ যাকে বলে পরমা সুন্দরী। তাহলে আর কি, বিয়ে কর। সে দিন ওকে গির্জের মেঝেয় কী সাজ।

আগ্নিনিয়া মুত বলল গেল, কিন্তু তার নিশ্চাপ, বণ্ণীন কথাগুলো কেমন যেন ছাড়া-ছাড়া শ্রোতার কানে ঝয় না

‘ওর বুপ ধুয়ে কি আমি জল খাব ? পারলে আমি তোমাকেই বিয়ে করি।’

আগ্নিনিয়া ঝট করে গ্রিগোরির মাথার নীচ থেকে হাতটা টেনে সরিয়ে নিল শুনেনা চোখে তাকিয়ে রইল জানলার দিকে। বাইরে রাতের হালদে হিম-হিম ভাব ঢালাঘরের গাড ছায়া পড়েছে মাটিতে কিম্বা পোকায় ডেকে চলেছে মনের ধারে কোঁচ ডাকছে ভেতরের ঘরের একমাত্র জানলাটা দিয়ে ভেসে আসছে সেই গাউর, বিষণ্ণ আওয়াজ।

‘খিশা!’

‘কী? কিছু ভেবে দেখলে?’

গ্রিগোরির বুক আমব গ্রহণে অনিচ্ছুক হাতদুটো আঙ্গিনিয়া ঝপ করে ধরে চোপে ধরল নিজের বুক, মড়ার মতো ঠাণ্ডা দুই গালে, তারপর চিৎকার করে উঠল আর্তস্বরে

‘কেন তুমি মরতে আমার সঙ্গে মজলে? এখন আমি কী করব? খিশকা আমার বুকটা তুমি ভেঙে দিয়ে গেলে গো! আমার সব গেল স্ত্রোপান আসবে কী জবাব দেব আমি? আমার হয়ে কে দাঁড়াবে?’

গ্রিগোবি চূপ করে রইল। আঙ্গিনিয়া শোকার্ত দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল তার সুন্দর কোমল খাড়া নাক, গভীর ছায়াফালো চোখ আর নির্বাক ঠোঁটের দিকে হঠাৎ ভেঙে পড়ল তার সমস্ত সংঘামের বাঁধ গ্রিগোরির মুখে, ঘাড়ে, হাতে, তাব বুকের কর্কশ কালো কৌকড়া লোমে আঙ্গিনিয়া চুমু খেতে লাগল পাগলের মতো। মাথাখানে থেমে যখন সে দম নিচ্ছিল সেই সময় গ্রিগোরি অনুভব করল তার সারা শরীর খবথর করে কাঁপছে। হাঁপাতে হাঁপাতে ফিসফিস করে আঙ্গিনিয়া বঙ্গল, ‘খিশা, প্রাণ আমার সোনা আমার চল, আমরা কোথাও পালিয়ে যাই ওগো প্রাণের ধন আমার। চলো সব ছেড়েছুড়ে পলাই। স্বামীকে ছাড়ব, সব ছাড়ব শুধু তুমি যদি আমার সঙ্গে থাক দূরে খনি এলাকার কোথাও চলে যাব। আমি তোমাকে ভালোবাসব, এত ভালোবাসব পারামনভদের খনিতে আমার আপন কাকা দারোগ্যানের কাজ করে সে আমাদের সাহায্য করবে খিশা কেবল মুখ ফুটে একটিবার বল’

গ্রিগোরি তার বাঁ চোখের ওপরকার ভুরু নাচিয়ে কোনায় তুলে ডাবতে লাগল তারপর আচমকা তার জ্বলন্ত অ-কুশী চোখদুটি মেলল সে চোখে হাসি - চোখখাঁধানো বিদ্রুপের হাসি

‘বোকা, আঙ্গিনিয়া তুমি একটা বোকা! আজ্ঞেবাজে বকে চলেছ শোনার মতো কিছুই নেই ওর মধ্যে। খেতখামারি, ঘরবাড়ি ছেড়ে কোথায় যাব আমি বল ত? তাছাড়া এই বছর আমাকে ফৌজে যেতে হবে যে না, না ও চলবে না। জমিজমা ছেড়ে আমি এক পাও নড়ছি নে এখানে এই স্ত্রোপ রয়েছে, নিশ্বাস নেবার মতো জায়গা রয়েছে। কিন্তু ওখানে? গত বছর শীতকালে বাবার সঙ্গে আমি ইস্তিফানে গিয়েছিলাম আমি ত ডাবলাম মারাই গেলাম বুদ্ধি রেলের ইঞ্জিনগুলো গর্জন করেছে, পোড়া কয়লার ধোঁয়ায় বাতাস সেখানে ভায়ী হয়ে উঠেছে লোকে কী করে বাস করে জানি নে। হয়ত ওদের অভ্যাস হয়ে গেছে এই কয়লার ধোঁয়া গ্রিগোরি খুতু ফেলল তারপর আবার বলল, ‘না

না, গী ছেড়ে আমি কোথাও যাবি নে।’

জানলার বাইরে অন্ধকার ঘন হয়ে আসছে। একটা ছোট মেঘখণ্ড উড়ে এসে চাঁদটাকে ঢেকে দিয়েছে। বাইরের উঠানে হুসনে রক্তের ঘে হিমেল আভাটা ছড়িয়ে ছিল সেটা দেখতে দেখতে কিকে হয়ে আসছে, লম্বা লম্বা টনা ছায়াগুলো মুছে যাচ্ছে বেড়ার ওপাশে আবছা আবছা কালো রঙের গুলো গন্ত বছরের কাটা শুকনো ডালপালা নাকি বেড়ার গা-ঘেসে-দাঁড়ানো বহু পুরনো কিছু আগাছা এখন আর বোঝার উপায় রইল না।

ঘরের ভেতরেও গাঢ় হয়ে নামতে থাকে অন্ধকার জানলার ধারে স্তেশানের ঝোলানো কসাক উসির ওপরকার সার্জেন্টের পদমর্যাদাব্যঞ্জক সেই কাঁধটিদুটো তাদের ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে কেনেছে। আগ্নিনিয়ার কাঁধদুটো ধরধর করে কাঁপতে লাগল। দুই করতলে মাথা চেপে বালিশে মুখ ধুঞ্জে সে নিঃশব্দে গুমরে গুমরে উঠতে লাগল - ধূসর নিশ্চিন্ত অন্ধকারের মধ্যে এসবের কিছুই খ্রিস্টোপরিচয় চোখে পড়ল না।

## চোখ

সেই যে সেদিন তোমিলিনের বৌ শিবিরে দেখা করতে এসেছিল তারপর থেকে স্তেশানের চোখমুখ শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল তার ভুবুজোড়া চোখের ওপর কুলে পড়ল, কপালের ওপর তেরছা হয়ে পড়ল একটা গভীর বৃক্ষ খাঁজ ইয়ার-বন্ধুদের সঙ্গে এখন সে কদাচিৎ কথাবার্তা বলে, ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে চটে ওঠে, ঝগড়া বাধায়। নেহাৎই অকারণে সার্জেন্ট-মজুর প্রশ্নাকোভকে গালাগাল দিয়ে বসল। পেত্রো মেলেখভের দিকে প্রায় চোখ মেলে তাকায় না আগে ওদের মধ্যে বন্ধুত্বের যে বন্ধন ছিল তা ছিন্ন হল। সওয়ার-পিঠে ঘোড়ার মতো রাগের বোঝা নিয়ে স্তেশান ফেন টগবগিয়ে পাছাড় বয়ে নামতে থাকে। বাড়ি ফেরার সময় দেখা গেল পুরনো দুই বন্ধু দু'জনার পরম শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শেষের দিকে ওদের দু'জনের মধ্যে যে অনিদিষ্ট ধরনের শত্রুতাপূর্ণ মনোভাব গড়ে উঠেছিল তাতে স্বতাক্রান্তি দেওয়ার পাশ্বে একটি ঘটনাই যথেষ্ট ছিল আগের মতোই পাঁচজনের দল বোধে তারা শিবির থেকে গ্রামে ফিরে চলছিল গাড়িতে জোতা হয়েছিল পেত্রো আর স্তেশানের ঘোড়া। খ্রিস্টোনিয়া চলছিল তার নিজের ঘোড়ার পিঠে চড়ে আশ্রয়ই তোমিলিন ছাড়া কাঁপছিল তাই সে ওডারকোট মুড়ি দিয়ে শূন্যে রইল ছইয়ের ভেতবে কেদোত বদভস্তোভ গাড়ি চালানোর

ব্যাপারে তেমন গা না করায় পেত্রোকেই সে ভার নিতে হল। স্ত্রোপান পথের ধারের কাঁটাঝোপের লাল টকটকে মাথাগুলো চাবুকের ঘায়ে সপাং সপাং করে মাটিতে ফেলতে ফেলতে গাড়ির পাশে পাশে হেঁটে চলছিল। বৃষ্টি পড়তে লাগল। ঘন কালো কাদামাটি আলকাতরার মতো গাড়ির চাকার সঙ্গে জড়িয়ে যেতে লাগল। কালো মৈদাময় আকাশের গায়ে শরভের ঝিৎ ঝিৎ নীল আভা দেখা যাচ্ছে। দেখতে দেখতে রাত নেমে এলো। যত দূর দৃষ্টি যায় গ্রামের আলোর কোন চিহ্ন নেই। পেত্রো ঘোড়াদুটোর পিঠে যথেষ্ট চাবুক কষাতে লাগল। ঠিক এই সময় অন্ধকারের ভেতর থেকে চোঁচিয়ে উঠল স্ত্রোপান।

‘এই, কী হচ্ছে? নিছের ঘোড়ার ওপর ত বেশ মরদ, আর আমার ঘোড়ার পিঠে ত দেখছি সমানে চাবুক হাঁকড়াচ্ছিস।’

‘একবার চোখ মেলে তাকিয়ে দ্যাখ না। যারটা টানছে না সেটাকেই তাড়া দিচ্ছি।’

‘তোকে জুতে দিলে মজাটা টের পেতিস। তুর্কীরা ত টানার জন্যেই আছে।’

পেত্রো লাগাম ছেড়ে দিল।

‘কী চাই তোর বল্ দেবি?’

‘বসে থাক, উঠে কাজ নেই।’

‘তাহলে আর কথা না বাড়িয়ে চুপ করে থাক।’

‘তুই ওর পেছনে লাগতে এসেছিস কেন?’ স্ত্রোপানের দিকে এগিয়ে এসে গাঁক গাঁক করে বলল জিস্তোনিয়া।

স্ত্রোপান কোন কথা বলল না। অন্ধকারে তার মুখ দেখা গেল না। আধঘন্টার বেশি সময় ধরে চুপচাপ চলল। চাকার নীচে কাদা প্যাচপ্যাচ করছে। ক্রমশঃ করে বৃষ্টি যেন চালুনি দিয়ে ছাঁকা হয়ে গাড়ির ভেতরপল ঢাকা ছইয়ের ওপর পড়ছে, একটা তম্বাঘোর আবেশের সৃষ্টি করছে। পেত্রো লাগাম ছেড়ে দিয়ে তামাক খসল। নতুন করে আবার ঝগড়া বাধলে কী কী গাল দিয়ে স্ত্রোপানকে অপমান করবে, মনে মনে ঠিক করে নিতে লাগল। রাগে ওর সর্বাঙ্গ জ্বলছিল। এই ইতর স্ত্রোপানটার ওপর গায়ের ঝাল ঝাড়ার জন্য, ওকে হাস্যসম্পন্ন করে তোলায় জন্য সে উসখুস করতে করতে লাগল।

‘সরে যা। গাড়ির ভেতরে ঢুকতে দে,’ এই বলে পেত্রোকে মৃদু ঠেলা মেরে গাড়ির পাদানিতে লাফিয়ে উঠল স্ত্রোপান।

তখনই আচমকা ঝাঁকুনি খেয়ে গাড়ি থেমে গেল। কাদার মধ্যে পা হড়কে গিয়ে ঘোড়াদুটো পা টানটানি করতে লাগল, ওদের নালের নীচ থেকে ফুলকি ঠিকরে পড়ল। ঘোড়ার সঙ্গে গাড়ি জোতার ডাঙাটা হ্যাঁচকা টান খেয়ে দড়াম করে আওয়াজ তুলল।

‘সামাল, সামাল!’ চিৎকার করে পেত্রো গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ল।

‘কী বাপার? কী হল?’ স্তেপান যাবড়ে গেল।

খ্রিস্তোনিয়া তার ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে এলো।

‘ভেঙেটেঙে গেল নাকি, অ্যা?’

‘আগুন ছাল, আগুন’

‘কার কাছে দেশলাই আছে?’

‘দেশলাই ছুঁড়ে দে রে স্তেপান!’

সামনের ঘোড়াটা ছটফট করতে করতে নাক ঝাড়তে লাগল। কে যেন কস ক’রে দেশলাই জ্বালাল। কমলারঙের আলোর একটা বৃত্ত জ্বলে উঠল পরক্ষণেই আবার অন্ধকার। পেত্রো কাঁপা কাঁপা আঙুলে পড়ে-যাওয়া ঘোড়াটার পিঠ হাতড়াল লাগাম ধরে টান মারল।

‘হেই, ওহ্’

ঘোড়াটা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাত হয়ে পড়ে গেল, গাড়ির মাকের ডাণ্ডটা মচমচ করে উঠল স্তেপান ছুটে এসে এক গোছা কাঠি একসঙ্গে মুঠো ক’রে জ্বালাল। তার ঘোড়াটা পড়ে আছে মাথা পেছন দিকে হেলিয়ে সামনের একটা পা হাঁটু পর্যন্ত ঢুকে গেছে ইঁদুরের গর্তের ভেতরে।

খ্রিস্তোনিয়া ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠল তাড়াতাড়ি বাঁধন আলগা করে দিল

‘ওর পাটা টেনে তোল’

‘পেত্রোর ঘোড়াটা জোয়াল থেকে খুলে ফেল আরে, চটপট কর!’

‘অ্যাই দাঁড়া, দাঁড়া বলছি হারামজাদা! হট, হট!’

‘বাটা বদমাশ চাঁট মারছে সরে দাঁড়া’

স্তেপানের ঘোড়াকে কষ্টেস্টেই খাড়া করা হল। আপাদমস্তক কাদায় মাখামাখি হয়ে পেত্রো লাগাম ধরে ঘোড়াটাকে টেনে বাঞ্চল খ্রিস্তোনিয়া কাদার মধ্যে হাঁটু গেড়ে বসে সামনের নিশ্চল তোলা পাটা হাতড়ে দেখতে লাগল

‘ভেঙে গেছে বলেই মনে হচ্ছে,’ হেঁড়ে গলায় সে বলল।

ফেদোত বদভঙ্কোভ ঘোড়ার ধরতর কম্পমান পিঠের ওপর চাপড় মারল

‘চালিয়ে দেখ দেখি, যায় কিনা?’

পেত্রো ঘোড়ার মুখের সামনের বাঁধন ধরে টান দিল ঘোড়া সামনের কাঁ পা মাটিতে না ফেলে চিহিহি করে চৌচিয়ে লাফ দিল তোমিলিন তার গায়ের ওড়ারকোটের হাতার ভেতর দিয়ে হাত গলিয়ে বার করল, সবসঙ্গে সামনের মাটিতে পা ঠুকল।

‘আমরা আটকে পড়লাম!’ এঃ ঘোড়াটাব দফারফা হয়ে গেল।

স্তোপান একজন ধরে চুপ করে ছিল। ঠিক যেন এই কথাটিরই জন্য অপেক্ষা করছিল সে। খ্রিস্টোনিয়াকে এক ধাক্কা সরিয়ে দিয়ে সে পেত্রোর দিকে ধেয়ে গেল। পেত্রোর মাথা সে তাক করেছিল কিছু লক্ষ্যব্রষ্ট হল ঘুসিটা গিয়ে পড়ল তার কাঁধে ওবা দু'জনে জড়াজড়ি করে গিয়ে পড়ল কাদার মধ্যে। দু'জনের কারণে একজনের গায়ের জামা পড়পড় করে ছিড়ে গেল স্তোপান পেত্রোকে মাটিতে ফেলে দিয়ে তার মাথাটা হাঁটু দিয়ে চেপে ধরল, ঘুসির পর ঘুসি চালাতে লাগল তার ওপর খ্রিস্টোনিয়া গালিগালাজ বর্ষণ করতে করতে ওদের তুলে ছাড়িয়ে দিল।

‘কিসের জন্য?’ থুথু করে রক্ত ফেলতে ফেলতে চিৎকার করে বলল পেত্রো।

‘ঠিক করে গাড়ি চালা ব্যাটা, বদমাশ।’ রাস্তার বাইরে যাবি না।’

এক ঝটকায় খ্রিস্টোনিয়ার হাত ছাড়িয়ে নিল পেত্রো।

‘হয়েছে হয়েছে। আমার সঙ্গে ইয়াকি।’ এক হাতে ওকে গাড়ির গায়ে চেপে ধরে সে গর্জন করে উঠল।

পেত্রোর ঘোড়ার জুঁটি হিশেবে গাড়িতে জোতা হল ফেনোড বদভ্‌স্কোভের ঘোড়া। ঘোড়াটা ঝাটো কিছু বেশ শক্ত সমর্থ।

‘আমারটার ওপর চাপ।’ স্তোপানকে হুকুম দিয়ে খ্রিস্টোনিয়া নিজে গিয়ে উঠল পেত্রোর কাছে, ছইয়ের ভেতরে।

গ্রিনভস্কেই গ্রামে যখন তাবা এসে পৌঁছল তখন মাঝরাত এসে থামল গ্রামের শেষ বাড়িটার সামনে খ্রিস্টোনিয়া চলল রাতের আশ্রয় চাইতে। একটা কুকুর তার ওভারকোটের কিনারা কামড়ে ধরল সেদিকে মনোযোগ না দিয়ে হেঁচড়ে হেঁচড়ে জালিলার কাছে এগিয়ে গিয়ে ঝড়ঝড়ি তুলে নখ দিয়ে সে জানলার শার্মিতে আঁচড় কাটল ‘বাড়িতে কেউ আছে?’

কেবল দৃষ্টির টপটাপ আর কুকুরের একটানা ক্রুদ্ধ গর্জন

‘কেউ আছে? আছে কি কোন ভালোমানুষকে পো? যে-ই হোন খ্রীষ্টের দোহাই, রাত কাটানোর জায়গা মিন আমাদের। অ্যাঁ কী বলছেন? আমরা ছাউনি থেকে ফিরছি কতজন? পাঁচজন আচ্ছা, খ্রীষ্টের দয়া হোক। ওহে চলে এসো সব।’ এবারে ঝটকের দিকে মুখ ফিরিয়ে সে হীক দিল।

বাড়ির উঠানের মাঝখানে শুরোরের জাব দেওয়ার একটা গামলা পড়ে ছিল ঘোড়াগুলোকে উঠানে এনে তুলতে গিয়ে সেটার গায়ে হৌচট খেয়ে ফেনোড খিঁচি দিয়ে উঠল ঘোড়াগুলোকে ওরা চালার নীচে রাখল তেমিলিন দাঁতে দাঁত ঠকঠক করতে করতে ঘরের ভেতরে গিয়ে ঢুকল গাড়ির ভেতরে রইল পেত্রো আর খ্রিস্টোনিয়া

ভোরে যাত্রার উদ্যোগ শুরু হল। ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো স্ত্রোপান। তার পেছন পেছন খুঁটখুঁট করে হাঁটিতে হাঁটিতে এলো ছোটখাটো চেহারা এক গুণ্ডুড়ে কুঁজো বুড়ি ঘোড়া জুততে জুততে বুড়ির ওপর দরদ দেখিয়ে স্ত্রিস্তোনিয়া বলল

‘ওঃ ঠানদি, পিঠটা তোমার কী বেকেই না গোর্ছে’ গির্জের পেয়াম ঠোকার পক্ষে বোধহয় বেশ সুবিধের তাই না? একটু ঝুকলে কি অমনি মেঝের নাগাল পেয়ে গেলো’

‘বাছা আমার, যার যেমন কাজ। আমার পক্ষে প্রণাম করা যেমন সোজা, তোমাকে দিয়ে তেমনি কুকুর ঝোলানোর চমৎকার একটা ঝুঁটি হতে পারে,’ এই বলে বুড়ি ঝুক হাসি হাসল স্ত্রিস্তোনিয়া বুড়ির দাঁত মেখে অবাক হয়ে গেল। ঘন সার বাঁধা খুঁদে খুঁদে দাঁতগুলোতে এতটুকু ক্ষয়ের কোন চিহ্ন নেই

‘ওঃ কী গজগজ্জে দাঁত তোমার! আমার দশা দেখে দয়া করে যদি গোটা দেশক উপহার দিতে। বয়সে ছোয়ান হলে কী হবে, চিবোনোর উপায় নেই।’

‘তোমাকে দিয়ে দিলে আমি কী নিয়ে থাকব গো?’

কিছু ঘোড়ার দাঁত লাগিয়ে দেব’খন ঠানদি। তোমার এখন মরতে বাকি রয়েছে পরলোকে তোমার দাঁতের বিচার কেউ করবে না ভগবানের চর যারা ওখানে আছেন তাঁরা ত আর বেদে নন যে দাঁত মেখে তোমার গুণাগুণ বিচার করবে’

‘ওগো পিসি যত পার পেঁষো,’ এই বলে মুচকি ছেসে তোমিগিন গাড়িতে উঠে বসল

বুড়ি স্ত্রোপানের সঙ্গে চাল্যঘরের দিকে চলে গেল

‘কেন্ ঘোড়াটা।’

‘কালো কুচকুচেটা, দীর্ঘশ্বাস ফেলে স্ত্রোপান বলল।

বুড়ি তার লাঠিগাছা মাটিতে রেখে নিজের শক্তির ওপর অগাধ আস্থার পরিচয় দিয়ে পুরুষালী ভঙ্গিতে ঘোড়ার খোঁড়া পাটা তুলে নিল। আঁকশির মতো বাঁকা বাঁকা সবু আঙুলগুলো দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে ঘোড়ার হাঁটুর চাকিটা হাতুড়াতে লাগল যত্নগাম ঘোড়াটা কানদুটো নুইয়ে ফেলল, তার ওপরের দাঁতের ঝয়েরী রঙের পাটি বেরিয়ে পড়ল, ছটফট করতে করতে সে পেছনের দু’পায়ে ভর দিয়ে বসে পড়ল।

‘না রে কসাক ছেলে, ডাঙে নি। রেখে যা, সাগিয়ে দেব।’

‘রেখে দিলে কি কোন লাভ হবে ঠানদি?’

‘লাভের কথা বলছিস? তা কে বলতে পারে বাছা আমার। লাভ হবে বলেই ত মনে হচ্ছে’

স্বেপান অগত্যা হতাশ ভঙ্গিতে হাত নেড়ে গাড়ির দিকে এগোল।

‘কি রে রাখবি, না নিয়ে যাবি?’ চোখ কুঁচকে তার দিকে তাকিয়ে বুড়ি জিজ্ঞেস করল।

‘থাকুক’

‘বুড়ি ওকে সারাবে, তবেই হয়েছে। রেখে গেলি তিন ঠ্যাঙে, নিতে এসে দেখবি একটা ঠ্যাঙও নেই। ঠুং, ঘোড়ার বদা ঠাওরাল কিনা এক কুঁজীকে।’ হো হো করে হেসে উঠল ব্রিস্টোনিয়া।

## চৌদ্দ

‘ওর জন্যে আমার মন আকুলিবিগুলি করে গো ঠানদি। দিনকে দিন আমি শুকিয়ে যাচ্ছি। নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছি সেলাই দিয়ে ঘাঘরার কোমর ছোট করে কুল পাই নে একদিন যেতে না যেতে ঢিলে হয়ে যাচ্ছে আমাদের আঙিনার পাখ দিয়ে যখন ওকে হেঁটে যেতে দেখি আমার বুকের ভেতরটা আছাড়ি পিছাড়ি বেতে থাকে আমি পারলে মাটিতে আছড়ে পড়ি, ওর পায়ের নাগে চুমো খাই ও কি আমাকে গুন করেছে? বাঁচাও আমাকে বুড়ি-মা ওরা ওকে বিয়ে দেবার উদ্যোগ করছে। ওগো বাঁচাও আমাকে যা লাগে তা-ই দেব। মরকার হলে আমার পরনের শেষ কাপড়টিও খুলে দেব শুধু বাঁচাও আমাকে’

অসংখ্য জাল-জাল সূক্ষ্ম বলিরেখার ভেতর থেকে জ্বলজ্বলে চোখ মেলে বুড়ি দ্রোহদ্বিখা তাকায় আঞ্জিনিয়ার দিকে আঞ্জিনিয়ার তিক্ত কাহিনীর তালে তালে দুলতে থাকে তার মাথা

‘কাদের ছোঁড়া যে ওটা?’

পাঙেলেই মেলেখতের।’

‘সেই তুর্কীর নাকি?’

‘হ্যাঁ’

বুড়ি তার দম্ভহীন মাড়িদুটো চিবুতে থাকে উত্তর দেওয়ার জন্য তার তেমন একটা তাড়া দেখা যায় না

‘কাল খুব সকাল থাকতে থাকতে আসিস ছুঁড়ি ভোরের আলো উঠতে না উঠতেই আসিস। দনের জলে নামব আমরা। ভোর দুঃখ যন্ত্রণা সব ধুয়ে দেব এক চিমটে নুন নিয়ে আসিস বাড়ি থেকে মনে থাকে যেন’

আঞ্জিনিয়া একটা হলদে রঙের হালকা শালে মুখ ঢেকে ঘাড় গুঁজে ফটক পেরিয়ে যায়



বাতের অন্ধকারে মিশে গেল তার কালো মূর্তিটা। তাব পায়ের জুতোর তলা শুকনো খসখস আওয়াজ তুলল। দেখতে দেখতে পদ্মশব্দও মিলিয়ে গেল। গ্রামের এক প্রান্তে কোথায় যেন কারা ঝগড়া মাবামারি করছে, গানবাজনার জোর আওয়াজও শোনা যাচ্ছে।

আগ্নিনিয়া সারা রাত ঘুমোতে পারল না। ভোরবেলায় সে এসে দাঁড়াল দ্রোজদিখার জানলার সামনে।

‘ঠানদি’

‘কে?’

‘আমি, ঠানদি উঠে পড়।’

একুনি, জামাকাপড় গায়ে দিয়ে নিই।

অলিগলি ঘুরে ওরা দুজনে দনের ধারে এসে নামল জেটির ধারে। সাঁকোগুলোর কাছাকাছি জায়গায় কেউ গোবুর গাড়ির জোয়াল ও চাকা সমেত সামনের অংশ ফেলে দিয়েছে - জলে ডিঙছে। জলের কাছের বালি বরফের মতো চুঁচ ফেটায়। দন থেকে ভেসে আসছে সৈতসৈতে, কনকনে অন্ধকার।

দ্রোজদিখা তাব হাড় জিরজিরে হাতে আগ্নিনিয়ার হাত চেপে ধবে তাকে টেনে নিয়ে এলো জলের ধারে।

নুন এনেছিস? এদিকে দে পূব দিকে মুখ করে ক্রুশ-প্রণাম কর।

আগ্নিনিয়া ক্রুশ-প্রণাম কবে বিদ্বৈষ ভরা দৃষ্টিতে তাকাল উজ্জ্বলিত বক্ষিমাভ পূব আকাশের দিকে।

গণ্ডুষ ভরে জল নিয়ে খেয়ে ফেল।’ দ্রোজদিখা হুকুম দিল

আগ্নিনিয়া চৌ চৌ কবে জল খেয়ে ফেলল। তাব জামাব হাতা ভিজ়ে গেল। জলের অলসমহুর তরঙ্গের ওপর বুড়ি একটা কালো মাকড়সার মতো হাতের আঙুলগুলো বাঁকিয়ে উবু হয়ে বসে বিড়বিড় করে বলতে লাগল।

‘অতল জলের কনকনে স্রোত তপ্ত তাজা রক্তমাস মনের মধ্যে হিংস্র পশু আকুল-বিকুল জ্বরবিকার পবিত্র ক্রুশ তোমার দোহাই শূদ্ধ-আত্মা পূণ্যবতী ভগবানের দাস গ্রিগোরিকে এই রকম ভাসা ভাসা সব কথা ভেসে আসছিল আগ্নিনিয়ার কানে।

দ্রোজদিখা কিছু নুন ছিটিয়ে দিল তার পায়ের কাছের ভেজা বালির ওপর কিছুটা জলে, আর বাকিটা আগ্নিনিয়ার জামাব ভেতর দিয়ে বুকের কাছটায়

‘কীধের ওপর দিয়ে খানিকটা জল ছিটিয়ে দে, শিগগির।’

আগ্নিনিয়া তাই করল। বিদ্বৈষভরা, ব্যাকুল দৃষ্টিতে সে তাকাল দ্রোজদিখার বাদামীরঙের গালের দিকে।

হল? নাকি আরও কিছু আছে?’

‘যা বাছা একটু ঘুমো গে যা। আর কিছু করতে হবে না।’

আগ্নিনিয়া হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটল বাড়ির দিকে। উঠোনে গোরুগুলো হাঙ্গা হাঙ্গা ডাকতে শুরু করেছে। মেষখন্ডদের বাড়ির দারিয়া ঘুম জড়ানো চোখে, আরস্তিম মুখে সুন্দর ভ্রূন নাচাতে নাচাতে তাদের গোরুর পাল চড়ানোর জন্য তড়িয়ে নিয়ে চলেছে। আগ্নিনিয়াকে পাশ দিয়ে ছুটে চলে যেতে দেখে সে ফিরে তাকিয়ে মুচকি হাসল।

‘কি গো পড়শী, রাতের ঘুমটা ভালো হয়েছিল ত?’

‘হ্যাঁ, তা দিবি হয়েছিল।’

‘এই সাত সকালে কোথায় ঘুরে বেড়াও?’

এই এখানে একটা জায়গায় গিয়েছিলাম, একটু কাজ ছিল ভাই।’

সকালের উপাসনার ঘন্টা বাজল। সকালের বাতাসে মুড়মুড় করে ভেঙে ভেঙে ছড়িয়ে পড়ছে কঁসার ঘন্টার গম্ভীর মিনাদ গ্রামের গলির ভেতরে রাখাল-ছেলে সপাং সপাং চাবুক হাঁকাচ্ছে।

আগ্নিনিয়া তড়িঘড়ি গোরুগুলোকে বার করে দিল বার-বারান্দায় দুধ নিয়ে এলো ছাঁকার জন্য জামার হাতা সে কনুই পর্যন্ত গুটিয়ে নিয়েছে বুকের ওপর ঝোলানো কাপড়টায় দু’হাত মুছে নিয়ে নিজের কোন এক ভাবনায় বিভোর হয়ে সে কেনার ভর্তি ছাঁকনির ভেতর দিয়ে কঁেড়েতে দুধ ঢালতে লাগল।

রাস্তা থেকে ভেসে এলো একটা গাড়ির চাকার কর্কশ কন্‌কন শব্দ ঘোড়ার চিহিহি ডাক। আগ্নিনিয়া কঁেড়েটা নামিয়ে বেখে জানলা দিয়ে দেখতে গেল।

তলোয়ারের মাথাটা হাতে চেপে ধরে গেটের দিকে হনহন করে এগিয়ে আসছে স্তেপান। আব সব কসাকবা পাল্লা দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে বারোয়ারিতলার মিকে আগ্নিনিয়া তার বুকের ওপরকার ঝোলানো কাপড় আঙুলের ফাঁকে চেপে মজা পাকিয়ে ফেলল, তারপর বসে পড়ল বেকের ওপর। এবারে দেউড়িতে পদশব্দ পদশব্দ উঠে আসছে বারান্দায়। শেষকালে দরজার ঠিক সামনে।

ট্রোকাটের ওপর এসে দাঁড়াল স্তেপান রোগা হয়ে গেছে, তাকে দেখে চেনা যায় না।

‘তারপর

আগ্নিনিয়া তার বিশাল পুরুট শরীরটা দুলিয়ে উঠে স্তেপানের মুখোমুখি এগিয়ে গেল।

‘মার আমাকে।’ পাশ ফিরে দাঁড়িয়ে টেনে টেনে সে বলল।

‘কী ব্যাপার, আঞ্জিনিয়া?’

‘আমি লুকেছি না। পাশ করেছি আমি। মার আমাকে, স্তেপান!’

দুই কঁধের মাঝখানে মাথাটা গুটিয়ে নিয়ে, গুটিসুটি মেরে সে দাঁড়াল স্তেপানের মুখোমুখি শুধু দু’হাত দিয়ে পেট বাঁচিয়ে ভয়ে বিকৃত ভাবলেনশহীন মুখের কালো কালো কোটরের ভেতর থেকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তার দুটি চোখ। স্তেপান কাত হয়ে পাশে সরে গেল তার না-কাচা জামা থেকে পুরুষের ঘাম আর পথের ধারের সোমরাঙ্ক সত্যার কটু গন্ধ ভেসে আসছে স্তেপান ধরাচড়া পরা অবস্থাতেই খাটে শুয়ে পড়ল। শুয়ে শুয়ে কঁধ ঝাঁকিয়ে তলোয়ারের বেল্ট খুলে ফেলে দিল তার লাল বাদামীরঙের গৌফজোড়া অমনিতে বেশরোয়া ভঙ্গিতে চুমড়ানো থাকত, এখন তা নেতিয়ে খুলে পড়েছে আঞ্জিনিয়া ঘাড় না ফিরিয়ে আড়চোখে দেখতে লাগল তাকে থেকে থেকে কঁপতে লাগল স্তেপান পালকের বাকুতে পা রাখল তার পায়ের বুটজোড়া থেকে পাকিয়ে পাকিয়ে পড়তে লাগল ঐটেল মাটির কাদা তলোয়ারের বেল্টের স্বালর আঙুল দিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে সে কড়িকাঠের দিকে চেরে রইল

‘সকালের রাগা এখনও হয় নি?’

‘না’

‘যাও দেখি, খাবারের যোগাড় কর’

বাটিতে মুখ ডুবিয়ে স্তেপান দুখে চুমুক দিল, তারপর গৌফ চটল বুটির ডেলা চিবুতে লাগল অনেকক্ষণ ধরে, আচের আস্তে তার ধোলাপী চামড়ার নীচে দুই গালের মাংসপেশী টানটান হয়ে নড়েচড়ে বেড়াতে লাগল আঞ্জিনিয়া দাঁড়িয়ে রইল চুম্বীর কাছে আঞ্জিনিয়া নিম্নাঙ্গ আতঙ্কভরে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল স্বামীর ছোট ছোট নরম কানদুটো চিবুকের সঙ্গে সঙ্গে কেমন্ উঠছে নামছে শেষকালে স্তেপান টেবিল ছেড়ে উঠে এলো, কুশচিহ্ন আঁকল।

‘আজ্ঞা, সোনা আমার, এই বারে বল দেখি কী ব্যাপার,’ সংক্ষেপে জিজ্ঞেস করল সে

আঞ্জিনিয়া মাথা নীচু করে টেবিল পরিষ্কার করছিল সে কোন কথা বলল না।

‘বল দেখি, কেমন্ করে স্বামীর পথ চেয়ে বসে ছিলি। শত্ৰুদেবতার মানসস্থান রক্ষা করেছিল। কী?’

মাথায় একটা প্রচণ্ড ঘুনি খেয়ে আঞ্জিনিয়ার পায়ের নীচ থেকে মাটি সরে গেল, সে ছিটকে পড়ে গেল দরজার চৌকাটের গায়ে। চৌকাটের সঙ্গে ঠুক গেল তার পিঠ আঞ্জিনিয়া চাপা আর্তনাদ করে উঠল।

অসার মাংসপিণ্ডসর্বস্ব নির্জীব মেয়েমানুষ ত দূরের কথা! স্ত্রোপানের হাতের মোক্ষম ঘুসি আত্মমান বক্ষিসলের যে-কোন আগড়াই জোয়ানকে পর্যন্ত কুপোকাত করার পক্ষে যথেষ্ট আগ্রিনিয়া আতঙ্কেই উঠে দাঁড়াল কিংবা মেয়েমানুষের টিকে থাকার প্রবল শক্তিই বা বুঝি তাকে টেনে তুলল - কিছুক্ষণ চুপচাপ পড়ে থেকে নিশ্বাস নিয়ে চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

আগ্রিনিয়া কখন দু'পায়ে উঠে দাঁড়িয়েছে স্ত্রোপান দেখতে পায় নি। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সে তখন তামাক ধরাচ্ছিল। সে যখন তামাকের ধলোটা টেবিলের ওপর ছুঁড়ে বেখে দিল ততক্ষণে আগ্রিনিয়া পেছন থেকে দড়ায় করে দরজা ঠেলে দিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে। স্ত্রোপান তাকে তাড়া করল।

দরদর ধারে রক্ত করছে আগ্রিনিয়ার সর্বাঙ্গ বয়ে উর্ধ্বাধানে সে ছুটল তাদের আর মেলেথভদেব উঠোনের মাঝখানের বেড়াটার দিকে। বেড়ার কাছে স্ত্রোপান তাকে ধরে ফেলল। বাজপাখির খাবার মতো তার কালা হাতের মুঠো! এসে পড়ল আগ্রিনিয়ার মাথার ওপর। শক্ত আঙুলের ফাঁকে চেপে ধরল চুলের মুঠি। তারপর এক হেঁচকা টানে তাকে ফেলে দিল মাটিতে, ছাইয়ের গাদার মধ্যে। এখানে, এই বেড়ার ধারের আগ্রিনিয়া রোজ চুন্নী পরিষ্কার করে ছাই ঝেড়ে ফেলত।

কোন স্বামী যদি দিবা পেশ্চনে দু'হাত জড় করে তার নিজের বৌকে বুট দিয়ে মাড়ায়, তাতে কার কী বলার আছে? নুলো আলিগুশকা শামিল পাশ দিয়ে যেতে যেতে একবার তাকিয়ে দেখল চোখ টিপল। মৃদু হেসে ঝোপড়া দাড়িটা দু'ভাগ করে নিল। স্ত্রোপান তার আইন সজ্জা বিয়ে-করা-বৌয়ের ওপর এমন মধুর ব্যবহার কেন করছে সেও কি আবার বলে দিতে হবে নাকি?

শামিল পারলে থেমে দাঁড়িয়ে দেখত। এরকম কৌতূহল কাবই বা না হয়! স্ত্রোপান তার বৌকে গিটাতে গিটাতে মেরে ফেলে কিনা কিন্তু তার বিবেকে বাধল। হাজার হোক সে ত আর মেয়েমানুষ নয়!

দূর থেকে স্ত্রোপানকে দেখলে মনে হতে পারে কোন লোক বুঝি কসাক-নাচ নাচছে। সামনের ঘরের জানলা থেকে স্ত্রোপানকে লম্পলম্প করতে দেখে গ্রিশকাও তা-ই ভেবেছিল। কিন্তু একটু ভালো করে দেখার পর সে আর থাকতে না পেরে এক লাফে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো। দু'হাতের মুঠো পাকিয়ে বুকের সঙ্গে সঙ্গে শক্ত করে চেপে ধরে পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে সে ছুটল বেড়ার দিকে। হাতের মুঠো পাকানো আঙুলগুলো যেন অসাড় হয়ে গেছে। তার পেছন পেছন ভারী বুট থপথপ করে চলল পেত্রো।

উঁচু বেড়াটার ওপর দিয়ে গ্রিগোরি পাখির মতো সাঁ করে উড়ে গেল। স্ত্রোপান তার কাজে ব্যস্ত। গ্রিগোরি ছুটে ছুটেই পেছন থেকে তাকে মারল।

এক ধাক্কা। স্তম্ভপান টাল খেয়ে ফিরে তাকাল, তারপর ভালুকের মতো হেলেদুলে ধেয়ে গেল গ্রিগোরির দিকে।

মেলেকভাসের দাদা ভাই দু'জনেই মরিয়া হয়ে লড়াই করতে লাগল। শকুন যেমন করে ভাগাভেব মড়াকে ঠোকরায় তেমনি করে তারা ঠোকরাতে লাগল স্তম্ভপানকে স্তম্ভপানের সীসের মতো ভারী হাতের মুঠোর যা খেয়ে গ্রিশ্কা কয়েকবার মাটিতে পড়ে গেল। ঘাঘী শক্তপোক্ত স্তম্ভপানের কাছে সে একটু পাতলা ধরনের কিন্তু বেষ্টোখাটো পেত্রো ঘুসি খেয়ে বাতাসের মুখে শরের মতোই নুয়ে পড়ে, তবু খাড়া ঠিক থাকে।

স্তম্ভপানের এক চোখে আগুন ঠিকায়োতে লাগল (তার আরেকটা চোখ ফুলে ঢোল হয়ে গেছে, তাতে আধ-পাকা কুলের রঙ ধরেছে) সে বারান্দার দিকে পিছু হটল।

গ্রিস্তেনিয়া সেই সময় ঘোড়ার কী একটা সাজ নিতে যেন পেত্রোর কাছে এসেছিল। সে ওদের ছাড়িয়ে দিল।

‘সরে যা, থাম্মা বলছি।’ সৌভাগ্যের মতো হাতদুটো নেড়ে সে বলল ‘থাম্মাও নইলে সর্দারকে বলে দেব কিন্তু।’

পেত্রো সাবধানে হাতের চেটোয় থুতু ফেলল খানিকটা রক্ত আর আধখানা ভাঙা দাঁত থুতুর সঙ্গে পড়ল। ভাঙা ভাঙা গলায় সে বলল, ‘চল রে গ্রিশ্কা আমরা শুকে দেখে নেব।’

স্তম্ভপানের শরীরের বহু জায়গায় কালশিটে পড়ে গেছে। বারান্দা থেকে হুঙ্কার দিয়ে সে বলল, ‘যাবি কোথায় তুই আমার হাত থেকে?’

‘আচ্ছা, আচ্ছা, দেখা যাবে।’

‘ওসব ‘আচ্ছা আচ্ছা’ নয় তোদের নাড়িভুড়ি আমি টেনে বার করব।’

‘বলি ঠাট্টা কবছিস, নাকি সত্যি সত্যি বলছিস?’

স্তম্ভপান তড়াক করে বারান্দা ছেড়ে নেমে এলো। গ্রিশ্কাও তার দিকে তেড়ে গেল। কিন্তু গ্রিস্তেনিয়া তাকে ধাক্কা দিয়ে গেটের দিকে ঠেলতে ঠেলতে বলল, ‘আরেকবার লেগেই দ্যাখ না, এমন হাল করে ছাড়ব যে কুকুরছানার মতো কেঁউ কেঁউ করতে হবে।’

সেই দিন থেকে মেলেকভ পরিবারের সঙ্গে স্তম্ভপান আস্তাখভের যে শত্রুতা শুরু হল তার জট ছাড়ায় সাধ্য কার।

ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে এই ঘটনার দু'বছর পরে পূর্ব প্রাশিয়ার স্তলিশিন শহরের উপকণ্ঠে গ্রিগোরি মেলেকভকে এই জট ছাড়াতে হয়।

‘পেত্রাকে বল ঘুড়ীটাকে আর ওর নিজের ঘোড়াটাকে জুততে’

খিগোরি উঠোনে নেমে এলো। পেত্রো চালাঘরের ভেতর থেকে গাড়টাকে গড়িয়ে নিয়ে আসছিল

‘বাবা ঘুড়ীটাকে আর তোর ঘোড়াটাকে জুততে বলছে’

‘সে আর বলতে হবে না মুখ বুজে থাকলেই ত পারে’ গাড়ির সামনে ঘোড়া জোতার ডাণ্ডাজোড়া ঠিক করতে করতে পেত্রো বলল

পাঙ্কেলেই প্রকোফিয়েভিচ দিবা-উপাসনার সময় গিঙ্কায় উপস্থিত সেন্সটনেব মতো গুব্বুগুড়ীর ভঙ্গিতে হুসহুস করে গরম বাঁধাকপির খোল খেয়ে চলছে, দরদর করে যামছে

দুনিয়াশ্কা ছটফটে দৃষ্টিতে খিগোরিকে নিরীক্ষণ করে দেখল। তার চোখের ঢেউ খেলানো পালকের শীতল ছায়ার গহনে কোথায় যেন লুকিয়ে ছিল কুমারী মেরের সলজ্জ মুচকি হাসি। ইলিনিচনাকে বেশ আঁচসাঁট আর ভারিকি দেখাচ্ছে ফিকে হলদে রঙের পোশাকী শালটা গায়ে দিয়ে মাতৃহৃদয়ের উৎকণ্ঠা ঠোঁটের কোনায় গোপন রেশে খিগোরির দিকে তাকাল সে। তারপর বুড়োর দিকে তাকিয়ে বলল, ‘হয়েছে গো প্রকোফিচ, যথেষ্ট সাঁটিয়েছ, লোকে ভাববে বুঝি না খেতে পেরে মারা যাচ্ছে’

‘একটু খাব যে তারও উপায় নেই কী গেরো যে বাবা’

দবজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মাঝল পেত্রোর গমের মতো হলুদ দীর্ঘ গোর্ফজোড়া

‘উঠতে আজ্ঞা হোক গাড়ি তৈরি।’

দুনিয়াশ্কা মিলমিল করে হেসে উঠেই হাতার আড়ালে মুখ ঢাকে

দারিয়া রাসাঘরের ভেতর দিয়ে পার হয়ে যায় সূক্ষ্ম ব্রুধনু নাচিয়ে বিয়ের ডাবী পাট্রটিকে একবার ঝুটিয়ে দেখে নেয়।

ঘটকী হয়ে সঙ্গে যাচ্ছে ইলিনিচনার এক বিশ্ববা ঝড়তুত বোন ভাসিলিসা মাসী। ঝানু মহিলা। নদী থেকে তোলা নুড়ি পাথরের মতো মাথটা ঘোরাতে ঘোরাতে, ঠোঁটের ভাঁজের ভেতর থেকে বিশ্রী কালো কালো বাঁকাচোরা দাঁত বার করে হাসতে সকলের আগে সে গাড়ির ভেতরে গিয়ে জাঁকিয়ে বসল

‘তুমি আবার ওখানে দাঁত বার করতে যেয়ো না পাঙ্কেলেই প্রকোফিয়েভিচ তাকে সাবধান করে দিল। ‘তোমার ওই দাঁত বার করলে পুরো ব্যাপারটাই কেঁচে যেতে পারে। আহা, দাঁত ত নয় যেন মূখের ভেতরে কতকগুলো মাতালকে ধরে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে একটা শুদিকে বৈকেছে ত আরেকটা শুদিকে’

‘আরে মশাই, আমার বিয়ের সম্বন্ধ ত আর হচ্ছে না! আমি ত আর পাত্র নই’

‘তা না হয় হন, কিন্তু তুমি বাপু হেলো নি তোমার দাঁতগুলো যা-ই বল না কেন বেজায় কালো, দেখলেই গা গোলায়।’

ভাসিলিসা ক্ষুব্ধ হল। পেত্রো ততক্ষণে উঠানের গেট হাঁ করে খুলে দিয়েছে লাগামের চামড়া থেকে গন্ধ উঠছে। গ্রিগোরি লাগাম গোছগাছ করে নিয়ে লাফিয়ে উঠে পড়ল কোচোম্যানের আসনে পাশ্বেলেই প্রকোফিয়েভিচ বসল পেছনের আসনে। ইলিনিচনার পাশটিতে ঠিক যেন নতুন বব-বৌ

‘চাবুক হাঁকা’ রাল আলগা করে দিয়ে পেত্রো হাঁক দিল

‘হয়তো রে হারামজাদা! এবারে খেল দেখা!’ একটা ঘোড়াকে বিচলিত ভাবে কান নাড়াতে দেখে ঠোট কামড়ে তার শিঠে চাবুক আছড়ে গ্রিশকা বলল

দুটো ঘোড়াই চামড়ার ফিডের বাঁধনে হেঁচকা টান মেরে ছুট দিল।

‘দেখ কাণ্ড! ধামের গায়ে লেগে যাবে’ হাউমাউ করে উঠল দারিয়া কিন্তু গাড়িটা আচমকা একটা পাক খেয়ে পথের ধারের চিবিগুলোর ওপর দিয়ে লাফাতে লাফাতে শেষকালে তরতর করে রাস্তা ধরে ছুটতে শুরু করল

পেত্রোর পলটনের ঘোড়াটা গাড়িতে জোতার ফলে ধামেলা করছিল গ্রিগোরি কাত হয়ে চাবুক কষিয়ে সেটাকে খেপিয়ে তোলার চেষ্টা করল। পাশ্বেলেই প্রকোফিয়েভিচ হাতের চোট দিয়ে এমন ভাবে দাড়ি চেপে ধরে আছে যেন তার ভয় হচ্ছে পাছে বাতাসে দাড়ি উড়িয়ে নিয়ে যায়

‘দুড়ীটাকে চাবুক মার’ চারদিকে চোখ ঘোরাতে ঘোরাতে গ্রিগোরির পিঠের ওপর ঝুঁকে পড়ে কর্কশকণ্ঠে সে বলল।

বাতাসের ঝাপটায় ইলিনিচনার চোখে জল এসে গিয়েছিল। গায়ের জামার লেস-বোনা হাতায় জলের কণা মুহূর্তে মুহূর্তে চোখ পিটপিট করতে করতে সে তাকিয়ে দেখল গ্রিগোরির গায়ের নীল সাটিনের জামাটা বাতাসে পতপত করে উড়ছে, পিঠের দিকে ফলে ঝুঞ্জের মতো উঁচু হয়ে উঠছে তাদের পথের সামনে যে সব কসাকরা পড়ল তারা সস্রে সস্রে পথ ছেড়ে পাশে সরে গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। উঠান থেকে কুকুরগুলো ছুটে বেরিয়ে এসে ঘোড়াগুলোর পায়ের কাছে ছুটোছুটি শুরু করে দিল নতুন করে লোহার বেড় লাগানো চাকার বনবাননিতে তাদের ডাক কানে আসে না

না চাবুক না ঘোড়া কোনটার ওপরই এতটুকু মায়া-মমতা দেখাল না গ্রিগোরি। দশ মিনিটের মধ্যে তারা গ্রাম পেছনে ফেলে এলো। পথের ধারে সবুজের ঘূর্ণি তুলে চলে গেল গ্রামের শেষপ্রান্তের গৃহস্থবাড়িগুলোর বাগান। দেখতে দেখতে এসে গেল কোরশুনভদের বিরাট খোলামেলা বাড়িটা তক্তার বেড়া। গ্রিগোরি

রাশ টানল। গাড়িটার লোহার ছন্দে তাল কেটে গেল কোন একটা কাহিনী বলতে বলতে হঠাৎ যেন মাঝপথে বাধা পেয়ে থেমে গেল - দাঁড়িয়ে পড়ল সূক্ষ্ম নক্সা-কাটা রঙ-করা ফটকের সামনে।

গ্রিগোরি রয়ে গেল ঘোড়াদুটোর কাছে, এদিকে পাস্তেলেরই প্রকোফিয়েভিচ খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলল দেউড়ির দিকে তার পেছন পেছন ঘাঘরায় খসখস আওয়াজ তুলে দেখা দিল লাল টিকটকে চেহারার ইলিনিচনা আর ভাসিলিসা। ভাসিলিসার ঠোঁটজোড়া দেখে মনে হয় কেউ যেন কোন দয়ায়্যা না দেখিয়ে শক্ত করে কালা দিয়ে ঐটে দিয়েছে বুড়ো তাড়াতাড়ি করছিল, তার ভয় হজ্বিল পথে যেটুকু সাহস সে সফর করেছিল পাছে তা ফুরিয়ে যায়। ঊঁচু চৌকাটের গায়ে সে হোঁচট খেল, তাতে খোঁড়া পাটিয় চোট লাগল। ব্যথায় ভুবু কঁচকে ধোঁয়া-মোছা ওকতকে ধাপ বয়ে দুমদাম পা ফেলে সে ওপরে উঠতে লাগল।

সে আর ইলিনিচনা দু'জনেই প্রায় একই সঙ্গে বাড়ির ভেতরে এসে ঢুকল বৌয়ের পাশে দাঁড়ানো তার পক্ষে সুবিধাজনক নয় বৌ তার চেয়ে অস্বস্ত আধ হাতখানেক লম্বা। তাই সে আরও এক পা এগিয়ে গেল কঁকড়ের মতো একটা ঠ্যাঙ তুলে, মাথা থেকে টুপি খুলে নিয়ে পটে আঁকা আবছা, কালো বিগ্রহের দিকে তাকিয়ে ক্রুশ-প্রণাম করল তারপর বলল

‘আপনাদের সব কুশল ত?’

‘ভগবানের কৃপায় কুশল বটে,’ বেকি ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বাড়ির কর্তা উত্তর দিল লোকটা একজন মাথায় মাঝারি শ্রৌট কসাক, সারা মুখে তার ছিট ছিট দাগ

‘আমরা কয়েকজন আপনাদের কাছে বেড়াতে এলাম মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ!’

‘অতিথিদের জন্য সব সময় দরজা খোলা। অতিথিদের বসার জন্য কিছু দিয়ে যাও গো মারিয়া’

শ্রৌট গৃহকর্ত্রীটির বক্ষদেশে উন্নতি রেখাধীন সমতল। লোক সেবানোর খাতিরে কয়েকটা টুল ঝেড়ে দিয়ে অতিথিদের দিকে এগিয়ে দিল সে। পাস্তেলেরই প্রকোফিয়েভিচ একটার ধারে বসে পড়ে বুঝল দিয়ে রোদে-পোড়া তামাটে রঙের ভিজে কপালের ঘাম মুহুতে লাগল।

‘আমরা একটা দরকারে এসেছি আপনাদের কাছে,’ কোন রকম ভনিভা না করেই সে শুরু করল।

কথাবার্তা যখন এই পর্যায়ে এসে পৌছেছে সেই সময় ঘাঘরা গুটিয়ে ইলিনিচনা ও ভাসিলিসাও বসে পড়ল।

‘তাই নাকি? কী সেই দরকার বলুন, বাড়ির কর্তা মুচকি হাসল।



ত্রিগোরি এসে ঢুকল ঘরের চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিয়ে সে বলল, 'আশা করি আপনাদের সুনিদ্রা হয়েছে '

ভগবানের অসীম কৃপা,' সুরেলা কণ্ঠে টেনে টেনে বলল গৃহকর্তা।

'ভগবানের অসীম কৃপা, গৃহকর্তাও সঙ্গে সঙ্গে সেই একই কথা বলল। তার সারা মুখমণ্ডলে ছড়ানো ছিট ছিট দাগ ভেদ করে ফুটে উঠল একটা লালচে আভা ঠিক এখনই সে আন্দাজ করতে পারল ওদের আগমনের উদ্দেশ্যটা কী 'ওদের ঘোড়াগুলোকে বাড়ির উঠানে নিয়ে এসে কিছু খড়টু দিতে বল,' বৌয়ের দিকে ফিরে সে বলল

বৌ বেরিয়ে গেল।

'একটা ছোটখাটো ব্যাপারে কথা বলার আছে আপনার সঙ্গে ' এই বলে পাশ্বেলেই প্রকোফিয়েভিচ তার ঢেউ খেলানো কালো কুচকুচে দাড়িতে হাত বুলাল তারপর উত্তেজনা কানের মাঝড়টা টানতে টানতে বলতে লাগল, 'আপনাদের বিয়ের যুগ্মি মেয়ে আছে, আমাদেরও একটা ছেলে আছে বিয়ের যুগ্মি তা বলি কি, আমাদের মধ্যে কি কোন ভাবে কটুখিতা পাতানো যায় না? বলছিলাম কি মেয়েটাকে কি আপনারা শিগগিরই পাত্রস্থ করতে চান? আমরা কি তাহলে কুটুম হতে পাবি নে?'

'কে জানে?' গৃহকর্তা তার টাকমাথা চুলকাল 'সত্যি কথা বলতে গেলে কি এই শরতে ত বিয়ে দেবার কোন কথা এখনও ভাবি নি বাড়িতে এখন অঢেল কাজ। তা ছাড়া ওর বয়সই বা আর এমন কী হয়েছে? এই সব আঠারো পেরোল। তাই না মারিয়া?'

'হ্যাঁ।'

'বাঃ, তাহলে এ-ই ত বিয়ের ফুল ফোটান বয়স' তবে আর ধরে রাখা কেন? বসিয়ে বসিয়ে আইবুড়োদের দল ভান্নী করা কেন? ওদের কথার মধ্যে নাক গলাল ভাসিলিসা। টুলেব ওপর বসে বসে সে উসখুস করছিল (বাড়িতে ঢোকান মুখে বারান্দা থেকে একটা ঝাঁটা চুরি করে জামার ভেতরে লুকিয়ে রেখেছিল, তাইতে ফুটছিল। লোকের সংস্কার এই যে ঘটকী যদি কেনের ঝাঁটা চুরি করে তাহলে তাকে আর ফেরানো যায় না

'গত বসন্তেই আমাদের মেয়ের বিয়ের সংস্কার নিয়ে লোক এসেছিল মেয়ে আমাদের পড়ে থাকবে না। বলতে নেই, ভগবানের অসীম দয়া ক্ষেতখামায়ের কাজ হোক আর ঘরসংসারের কাজ হোক সবোত্তে সমান '

'সে বকম ভালো পাত্র হলে আব. বিয়ে না দেবার কী আছে?' মেয়েদের কিচিরমিচির কথাবার্তার মধ্যে পাশ্বেলেই প্রকোফিয়েভিচ এক ফাঁকে বলে বসল।

‘আসলে বিয়ে দেওয়াটা কথা নয়,’ কঠা মাথা চুলকে বলল ‘বিয়ে ত যে কোন সময়ই দেওয়া যেতে পারে’

পাণ্ডেলেই প্রকোফিয়েভিচ ধরে নিজ তাদের ‘না’ বলা হচ্ছে। তাই সে উত্তেজিত হয়ে পড়ল

‘সেক্ষেত্রে আর বলার কী আছে? আপনার নিজের ব্যাপার, যা ভালো বুঝবেন অবিশ্যি করবেন পাত্রপক্ষের অবস্থা হল যে সাধু সন্যাসীদের মতো - যেখানে খুশি ভিক্ষে মাঙতে পারে তবে আপনারা যদি স্বাবসাদার বা আরও কোন নামী-দামী পাত্রের খোঁজ করে বেড়ান তাহলে অবশ্য আলাদা ব্যাপার। তাহলে ক্ষমা করবেন।’

ঘটকাসী প্রায় কৈসে যাওয়ার উপক্রম পাণ্ডেলেই প্রকোফিয়েভিচ ফৌসফৌস করতে লাগল লাল বাটের রসের মতো টকটকে হয়ে উঠল তাব মুখ। মেয়ের মা এদিকে চিলেব ছায়া দেখে চমকে ওঠা তা-দেওয়া মুরগীর মতো বকবক করে করে চলেছে। কিন্তু মোক্ষম মুহূর্তটিতে যোগ দিল ভাসিনিসা শান্ত, অনুচ্চ কণ্ঠে তড়বড় করে ছোট ছোট কথার এমন ফুলঝুরি সে ছুটিয়ে দিল যে মনে হল বুঝি পোড়া জায়গায় নুন ছিটিয়ে দিচ্ছে। যে ফটল দেখা দিয়েছিল তা জুড়ে দিল সে

‘তা হলে আব কি বলুন ব্যাপারটা যদি তা-ই হয়ে থাকে তার মানে নিজের সম্ভানের কল্যাণের কথা ভেবে তার উপযুক্ত সমাধানও করা দরকার এই নাতালিয়ার কথাই ধরা যাক না কেন অমন মেয়ে ত সারা দুনিয়া খুঁজেও পাবো না তার কাজের জন্যে যেন ছুটফট করছে। তা সে সেলাই ফৌড়াই বল আর গৈবস্থলির অন্যান্য কাজই বল! আর চেহারার কথা যদি বলেন সে ত আপনারা দশজনে স্বচক্ষেই দেখতে পাচ্ছেন’ গোল করে ঘুরিয়ে মধুর ভঙ্গিতে দু’হাত ছড়িয়ে পাণ্ডেলেই প্রকোফিয়েভিচ আর গোমডামুখে ইলিনিচনার দিকে ফিরে সে বলল ‘তবে আমাদের এই ছেলেটিও পাত্র হিসেবে ফেলনা নয় ওর দিকে তাকালেই আমার বুকের ভেতরটা হুহু করে ওঠে আমার সেই গুঁর সঙ্গে এত মিল না আর কী খাটিয়ে ওদের পরিবাব আর প্রকোফিচ? সারা তল্লাট খুঁজে দেখুন না ভালো কাজের জন্যে এক ডাকে সকলে চেনে তাহলেই বলুন আমরা কি আমাদের ছেলেমেয়েদের শত্রুর আমরা কি তাদের খারাপ চাইতে পারি?’

ঘটকীর মধুর কলকল ভাব পাণ্ডেলেই প্রকোফিয়েভিচের কানে যেন মধু বর্ষণ করে চলল বুড়ো মেলেক্স তার বুড়ো আঙুল আব তর্জনী দিয়ে নাকের কোঁকড়া কোঁকড়া কালো লোম ছিড়তে ছিড়তে মুখ্য হয়ে ভাবতে লাগল ওঃ মাগীর জিভের কি ধার দেখ চুলবুল করছে কথার কী বুনট! কোন দিক দিয়ে কী

হচ্ছে লোকে বোঝার আগেই কথার পর কথা কেমন সাজিয়ে যাচ্ছে! কোন কোন মেয়েমানুষের অবশ্য কথা দিয়ে কসাক পুরুষকে ঘায়েল করার ক্ষমতা থাকে 'আহা, মেয়েমানুষ ত নয় যেন জ্বলন্ত বিদ্যুৎ মোহিত হয়ে সে শূন্যে লাগল' কানে আর তার উর্ধ্বতন পাঁচ পুরুষের উদ্দেশে ঘটকীর গমগদ প্রশংসা।

'অন্ত ফলারই বা কী আছে, আমাদের ছেলেমেয়েদের খারাপ আমরা কেউই চাই নে

'আসলে বলছিলাম কি, একটু যেন সকাল-সকাল হয়ে যাচ্ছে,' শান্ত গলায় বাড়ির কর্তা বলল মুখে তার খেলে গেল মৃদু হাসির ঝলক

'সকাল-সকাল হতে যাবে কেন? সত্যি বলছি, মোটেই সকাল-সকাল নয় পাঙ্ডেলেই প্রকোফিয়েভিচ অনুনয়ের সুরে বলল

'আজ হোক কাল হোক মেয়েকে পরের ঘরে দিতেই হবে,' ঝানিকটা ভান করে, ঝানিকটা বা সত্যি করেই গিন্নী কুপিয়ে উঠল

'তাহলে মেয়েকে ডাকুন মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ, একবার দেখি আমরা ' 'নাভালিয়া'

তামাটে আঙুল দিয়ে বুকের সামনের ঝোলানো কাপড়ের কুচি অঙ্গির ভাবে নাড়াচাড়া করতে করতে সলজ্জ ভাবে দরজার সামনে এসে দাঁড়াল কানে

'ভেতরে আয়, ভেতরে আয় মেয়ে আমার বড় লজ্জা পাচ্ছে,' মেয়েকে উৎসাহ দিয়ে মা হাসল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চোখের জলে ঝাপসা দেখতে লাগল।

রঙ চটা নীল ফুল অঁকা একটা ভারী সিঁদুরের পাশে গ্রিগোরি বসে ছিল নাভালিয়ার দিকে তাকাল সে।

কুবুল-কাঠি দিয়ে বোনা জামাট কালো ধুলোর মতো স্বাক্ষর নীচে সাহসদীপ্ত দুটি ধূসর চোখ গালের টানটান চামড়ার ওপর গোলাপী আভার একটা ছোট্ট টোল বিহীন সংযত হাসিতে কঁপছে। গ্রিগোরি দুটি ফিরাল ওর হাতের দিকে বড় বড় হাত দু'খানা ঝাঁপির চাপে কঠিন, কড়াপড়া। সবুজ রঙের জামার নীচে বাঁধা পড়ে আছে আঁটসাঁট পুষ্ট শরীরটা। কবুণ ভাবে প্রবল উজ্জ্বল পৃথক পৃথক রেখায় তরঙ্গিত হয়ে উঠে গেছে কুমারী মেয়ের প্রস্তরকঠিন উজ্জ্বল ছোট ছোট স্তনদুটি বোতামের মতো উঁচিয়ে আছে তীক্ষ্ণ দুটি স্তনবৃন্ত

মুহূর্তের মধ্যে গ্রিগোরি তার মাথা থেকে লম্বা লম্বা সুন্দর পা পর্বত আপাদমস্তক সব দেখে নিল মাঝী ঘোড়া কেনার আগে খরিস্কার যেমন করে ঝুটিয়ে ঝুটিয়ে দেখে নেয় তেমন করে তাকে সে দেখে নিল মনে মনে ডাবল, 'খাসা।' তারপর নাভালিয়ার চোখে চোখে তাকাতেই দেখতে পেল সে একদৃষ্টিতে তারই দিকে তাকিয়ে আছে তার চোখের সরল, অকপট, স্বেচ্ছ সলজ্জ দৃষ্টি যেন

বলছে 'এই আমি, আমার সব, আমি যেমন আছি তেমনই এবারে আমাকে যেমন ভাবে খুশি বিচার কর।' 'চমৎকার।' গ্রিগোরি মুচকি হেসে তার চোখের ভাষায় বলল।

'আচ্ছা, এবারে যা,' গৃহকর্তা হাত নেড়ে তাকে বাইরে যেতে বলল।

নাভালিয়া বাইরে গিয়ে পেছনে দরজা ভেজিয়ে দেওয়ার সময় হাসি আর কৌতূহল চেপে না রেখে গ্রিগোরিকে একবার তাকিয়ে দেখল।

গৃহকর্তা তার গিরীষ সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করে এবারে শুরু করল।

'তাহলে শুনুন পাশ্চাত্যেই প্রকোফিয়েভিচ. আপনারা বিচার বিবেচনা করে দেখুন, আমরাও নিজেদের মধ্যে পারিবারিক ভাবে পরামর্শ করে দেখি তারপরে না হয় দেখা যাবে কুটুন্নিতা হবে কিনা.'

দেউড়ি থেকে নামতে নামতে পাশ্চাত্যেই প্রকোফিয়েভিচ বলল।

'আসছে রবিবার আমরা আবার আসব.'

গৃহকর্তা ফটক পর্যন্ত ওদের এগিয়ে দিল। একথা শোনার পরও ইচ্ছে করেই চূপ করে বইল। ভাব দেখাল যেন কিছুই শুনতে পায় নি।

## ঘোল

তোমিলিনের কাছ থেকে আক্সিনিয়া সম্পর্কে জানার পর থেকেই মনের মধ্যে একটা কাতরতা ও ঘৃণার ভাব পোষণ করার সঙ্গে সঙ্গে স্তম্ভন বৃদ্ধিতে পারল যে তাদের বিব্রী জীবন যাপন সম্বন্ধে, বহুদিন আগেকার অপমানের সেই জ্বালা সম্বন্ধে আক্সিনিয়ার প্রতি তার একটা বৈদন্যদায়ক, ঘৃণামিশ্রিত ভালোবাসা আছে।

রাতের পর বাত মাথার ওপরে হাতদুটি রেখে ওভারকোট গা ঢেকে সে গাড়ির ভেতরে শুয়ে থাকত, চোখ বুজে শুয়ে শুয়ে সে ভাবত কী ভাবে বাড়ি ফিরবে বাড়ি ফিরলে তার বৌ তাকে কী ভাবে গ্রহণ করবে। এসব কথা ভাবতে ভাবতে তার মনে হত বৃকের ভেতবে হৃৎপিণ্ডের বদলে যেন একটা বিষাক্ত লোমশ মাকড়সা কিলবিল করছে। মনে মনে তখন সে তার ওপর প্রতিশোধ নেবার হাজারো পন্থা ঝুঁটিয়ে ঝুঁটিয়ে বার করত। ভাবতে ভাবতে তার মনে হত যেন বড় বড় বালির দানা দাঁতে বাধছে। পেছোব সঙ্গে মারামারি করে এই রূপ খানিকটা উগড়ে দেওয়ার পর সে যখন বাড়িতে এলো তখন নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। তাই আক্সিনিয়া অনেক ওপর দিয়ে বৈঠে গেল।

সেই দিন থেকে আন্তাখভদের বাড়ির ওপরে যেন একটা অদৃশ্য প্রেতের ছায়া এসে ভর করল। আক্সিনিয়া পা টিপে টিপে চলে, ফিসফিস করে কথা বলে।

কিন্তু তার চোখেব কোণে তখনও ভালো করে দেখলে লক্ষ করা যায় আতঙ্কেব ছাইচাপা শিকিধিকি আগুন গ্রিশ্কা যে আগুন ছালিয়েছিল তারই অবশেষ

আগ্নিনিয়ার দিকে তাকালে স্তেপান তা যতটা না দেখতে পায় সম্ভবত তাব চেয়েও বেশি উপলব্ধি করে সে যত্নশায় কাতর হয়ে পড়ে রাতের বেলায় ঘর গরম করার চুল্লীর মাথার ওপর মাছির ঝাঁক যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন রাতের বিছানা পাততে গিয়ে আগ্নিনিয়ার চোঁট ধরখর করে কঁপাতে থাকে স্তেপান তার কালো খসখসে হাতের তালু দিয়ে আগ্নিনিয়ার মুখ চেপে ধরে তাকে মারে নির্লঙ্ঘের মতো জানতে চায় গ্রিশ্কার সঙ্গে তার সম্পর্কের গুঁটিনাটি কাহিনী। ভেড়ার চামড়ার গন্ধযুক্ত শক্ত খাটটার ওপর আগ্নিনিয়া ছটফট করতে থাকে তার দম আটকে আসে। ময়দার তালের মতো নরম শরীরটাকে ছেনে ডলে পীড়ন করে করে স্তেপান যখন হয়রান হয়ে যায় তখন সে তার মুখে হাত বুলিয়ে দেখে চোখে জল এসেছে কিনা কিন্তু আগ্নিনিয়ার গাল গনগনে আগুনের মতো শুকনো, স্তেপানের আঙুলের নীচে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়ে নড়েচড়ে বেড়ায় তার চোয়াল

‘বলবে কিনা?’

না

‘খুন করব।’

‘কর খুন কর। ভগবানের দোহাই শেষ হোক এই যন্ত্রনার

একে বাঁচা বলে না

দীতে দীত চেপে স্তেপান তার বৌয়ের ঘামে ভেজা ঠাণ্ডা স্তনের পাতলা চামড়া টেনে ধরে পাক দিতে থাকে।

আগ্নিনিয়া শিউরে ওঠে, আর্তনাদ করে

‘বাথা লাগছে নাকি?’ স্তেপান উল্লসিত হয়ে ওঠে

‘লাগছে।’

‘তুমি কি ভাবছ বাথা আমার লাগে নি?’

ঘুমিয়ে পড়ে সে অনেক রাতে। ঘুমের ঘোরে সে তার ফেল-ফেল গাট-গাট কালো আঙুলে মুঠি পাকায়, আবার মুঠি বুলে আঙুল ছড়ায়। আগ্নিনিয়া কনুইয়ে স্তর দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকে স্বামীর মুখের দিকে ঘুমের মধ্যে বদলে গেছে, সুন্দর দেখাচ্ছে মুখখানা। তারপর থপ করে বালিশের ওপর মাথা ফেলে সে কী যেন বলে ফিসফিস করে।

গ্রিশ্কাকে ইদানীং সে প্রায় দেখতেই পায় না একবার অবশ্য দনের ধারে তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। বলদগুলোকে জল খাওয়ানোর জন্য খেদিয়ে নিয়ে

যাচ্ছিল গ্রিগোরি পায়ের দিকে নজর রেখে লালচে রঙের একটা শুকনো ডাল দোলাতে দোলাতে চড়াই বেয়ে ওপরে উঠছিল সে আঞ্জিনিয়া তার মুখোমুখি আসছিল। তাকে দেখামাত্র আঞ্জিনিয়ার মনে হল যেন হাতের নীচে বালতির বাঁকটা ঠাণ্ডা কনকনে হয়ে গেল, মাথার দু'পাশের রঙে খেলে গেল টগবগে রক্তোচ্ছ্বাস

পরে যখনই এই সাক্ষাৎকারের কথা মনে পড়েছে, নিজেকে বোঝানো তার পক্ষে কঠিন হয়েছে যে এটা আদৌ স্বপ্ন নয় সত্যি সত্যিই ঘটেছিল আঞ্জিনিয়া যখন প্রায় তার কাছাকাছি চলে এসেছে তখনই গ্রিগোরি তাকে দেখতে পেল বালতির একটানা বনবন আওয়াজের দাবি উপেক্ষা করতে না পেরে সে চোখ তুলে তাকাল তাব ভুবুজোড়া কঁপে উঠল মুখে ফুটে উঠল একটা বোকা-বোকা হাসি আঞ্জিনিয়া চলতে চলতে গ্রিগোরির মাথা ডিঙিয়ে দেখতে লাগল দনের বৃকের সবুজ তরঙ্গোচ্ছ্বাস এবং আরও দূরে বালিয়াড়ির মাথাব ঝুঁটিটা

তার মুখে রক্তোচ্ছ্বাস খেলে গেল, চোখ থেকে নিস্তরে বেরিয়ে এলো জলের ধারা।

‘আঞ্জিনিয়া’

কয়েক পা চলে যাওয়াব পর যেন একটা প্রচণ্ড ঘা খেয়ে মাথা নীচু করে আঞ্জিনিয়া দাঁড়িয়ে পড়ল। একটা সাদা-কালো রঙের বলদ পিছিয়ে পড়ে ছিল। রাগে সেটার গায়ে ধাঁই করে ডালের কাড়ি কবিয়ে দিয়ে ঘাড় না ফিরিয়েই গ্রিগোরি জিজ্ঞেস করল ‘স্বেপান কখন বেরোবে রাই কটিতে?’

‘এই একুনি গাড়ি জুতছে’

‘ওকে বিদেয় দিয়ে চলে এসো জনামাঠে, আমাদের সেই সূর্যমুখীর ক্ষেত্রে। আমি আসব’

বালতির বনবন আওয়াজ তুলে আঞ্জিনিয়া নেমে গেল জলের ধারে। পাড়ের কাছে ঢেউয়ের সবুজ কিন্নবাব ওপর দিয়ে হলুদ রঙের জমকাল নজ্জা কেটে একে বেকে চলেছে ফেনার রাশি। সাদা মেছো গাঙচিলের দল তীব্র চিৎকার করতে করতে দনের জলের বৃকে ছৌঁ মেয়ে যাচ্ছে।

রুপোলি বৃষ্টির কণার মতো জলের বৃকে ঝিলমিলিয়ে যাচ্ছে চুনো মাছের বাকি ওপাড়ে। বালিয়াড়ির ধবলিমা ছাড়িয়ে মহিমাঙ্গু কঠোর ভঙ্গিতে উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে বাতাসে দুলছে বৃক্ষ পপলার গাছের ধূসর চূড়াগুলো। জল তুলতে গিয়ে একটা বালতি আঞ্জিনিয়ার হাত থেকে পড়ে গেল। বাঁ হাতে ঘাঘবা তুলে সে হাঁটু-জলে নামল পায়ের পেশীতে জল সুড়সুড়ি দিতে লাগল স্বেপান ফিরে আসার পর আঞ্জিনিয়া এই প্রথম হাসল নিঃশব্দে, অনিশ্চিতমনে।

গ্রিশ্কাব দিকে ফিরে তাকাতে দেখতে পেল তখনও সে হাতের পাচনি

দোলাচ্ছে, ডাশমাজি তাড়ানোর ভঙ্গিতে পাচনি দোলাতে দোলাতে ধীরে ধীরে ঢাল বেয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে।

শক্ত পায়ে মাটিতে ভর দিয়ে সে চলেছে। আঙ্গিনিয়া চোখের-জলে-ঝাপসা সোহাগভরা দৃষ্টি বুলাল ওর সেই পাদুটির ওপর সাদা পশমী মোজার নীচে গোঁজা গ্রিগোরির চওড়া সালায়ারের দু'পাশের লাল ডোরা ঝলমল করছে। তার পিঠের ওপরে, কাঁধের ফলার কাছে ময়লা জামার খানিকটা সদা ছিড়ে গিয়ে পতপত করে উড়ছে, সেখান থেকে দেখা যাচ্ছে রোদে-পোড়া তামাটে গায়ের একটা নগ্ন তোকোনা অংশ পরম আনন্দের ধন যে সেইটা একদিন তার অধিকারে ছিল তারই এক রত্তি এই টুকরোটাকে আঙ্গিনিয়া দৃষ্টি দিয়ে চূষন করল। তার হাসি-হাসি দ্বান ঠোঁটের ওপর ঝরে পড়ল চোখের জল।

বালির ওপর বালতিদুটো নমিয়ে রেখে বাকের আঙটার সঙ্গে লাগাতে লাগাতে তার চোখে পড়ল গ্রিগোরির বুটের চোখা চোখা কাঁটার দাগ। চোরের মতো চারপাশে চোখ বুজিয়ে দেখে মিল - না, কেউ কোথাও নেই - শুধু দূরের ঘাটে কিছু ছেলেপুলে স্নান করছে। উবু হয়ে বসে পড়ে সে তার দু'হাতে পায়ের দাগগুলো ঢাকল, তারপর উঠে এক ঝটকায় বাকটা কাঁধে তুলে আপন মনে একটু হেসে বাড়ির দিকে দ্রুত পা চালাল।

মসলিনের মতো আবহাওয়া ঢাকা সূর্য চলেছে গ্রামের মাথার ওপর দিয়ে কোথাও কোথাও ভেড়ার পালের মতো সাদা সাদা কৌকড়ানো মেঘখণ্ডের নীচে দীপ্তি পাচ্ছে ব্রিঙ্ক শীতল চারপাশের গভীর ঘন নীলিমা কিন্তু গ্রামের মাথার ওপর, উত্তপ্ত টিনের চাল, খুঁজিখুঁজি জনহীন রাস্তার মাথা আর উঠোনের রোদে ঝলসানো, শুকনো হলুদ ঘাসের স্তুপের ওপর ধমধম করছে মৃদু বা দাবদাহ

দুলতে দুলতে ঘুটিফাটি মাটির ওপর বালতি থেকে ছলকে ছলকে জল ফেলতে ফেলতে আঙ্গিনিয়া দেউড়ির দিকে চলল। চওড়া কানাওয়াল বড়ের টুপি মাথায় স্তম্ভপান ফসল কাটার কলে ঘোড়া জুতছে। ঘাড়ে জোয়াল লাগানো বিমস্ত ঘুড়ীটার পেটের ও পেছনের দিককার বেল্টগুলো ঠিকঠাক করতে করতে সে আঙ্গিনিয়ার দিকে তাকাল।

‘পিপেতে জল ঢেলে দাও।’

আঙ্গিনিয়া বালতি থেকে পিপেতে জল ঢালল জল ঢালতে গিয়ে পিপের চারপাশে লাগানো লোহার পাতের সঙ্গে লেগে তার হাতটা ছড়ে গেল

‘একটু বরফ হলে হত জল গবম হয়ে উঠবে, স্বামীর ঘামে ভেজা পিঠের দিকে তাকিয়ে সে বলল

‘যাও দেখি মেনেবভদের কাছ থেকে একটু চেয়ে নিয়ে এসো আচ্ছা

না, যেতে হবে না! ' মনে পড়ে যেতে স্বেপান চৌকিয়ে বলল

পাশের গেটটা হাঁ করে খোলা ছিল। আক্সিনিয়া ভেজিয়ে দেওয়ার জন্য সে দিকে পা বাড়াল স্বেপান চোখ নামিয়ে নিল। চাবুকটা চেপে থরল

'কোথায় চললে?'

'দোরটা ভেজিয়ে দিয়ে আসি।'

'ফিরে আয় হারামজাদী বললাম না এদিকে যাবি নে।'

একথায় সে হস্তদস্ত হয়ে সেউড়ির দিকে ফিরে এসে বাকটা জায়গায় ঝুলিয়ে রাখতে গেল কিন্তু তার হাত তখন ঠকঠক করে কাঁপছে, তার নিজের বশে নেই - তাই বাকটা ধাপ বয়ে গড়িয়ে পড়ে গেল।

সামনের আসনের ওপর স্বেপান ডেরপলের বর্ষান্তিটা ছুঁড়ে মিল আসনের ওপর চেপে বসে লাগাম ঠিকঠাক করে নিল

'গেটটা খুলে দাও'

ফটকের পান্না খুলে দেবার পর আক্সিনিয়া সাহস করে জিজ্ঞেস করল, 'কখন ফিরবে?'

'সন্দের দিকে আনিকুলকাকে কাটার সময় সঙ্গে নেব - ওর সঙ্গে এই বকমই কথা হয়েছে ওর জন্যে আনিকটা খাবার নিয়ে যেয়ো কামারের দোকানের কাজ শেষ করে সোজা মাঠে চলে যাবে।'

ফসল-কাটা কলের ছোট ছোট চাকাগুলো ধূসর খুলিরাশির ভেতরে কেটে বসে গিয়ে কাঁচকাঁচ আওয়াজ তুলে গেটের বাইরে চলে গেল আক্সিনিয়া বাড়ির ভেতরে ঢুকল, বুকের ওপর হাত চেপে একটু দাঁড়িয়ে রইল, তারপর বুমালে মাথা ঢেকে ঘরের দিকে ছুটল

'আজ্ঞা বসি ফিরে আসে? তাহলে কী হবে?' চিন্তাটা এক ঝলক উঠে তাকে যেন ঝলসে দিয়ে গেল। সে এমন ভাবে থমকে দাঁড়াল যেন পায়ের সামনেই দেখতে পেয়েছে একটা গভীর খাত। ফণেকের জন্য পিছু ফিরে ডাকাল, তারপর প্রায় উর্ধ্বশ্বাসে ঘরের পাড়ের ওপরকার তাল বয়ে ছুটতে শুরু করল জলামাঠের দিকে

বেড়ার পর বেড়া সবজি বাগানের পর সবজি বাগান। সূর্যের চোখে চোখ রেখে চেয়ে আছে সূর্যমুখী ফুলের হলুদ সমারোহ। সবুজ আলু শাকের ওপর ফুটেছে ফেফাসে রঙের ফুল। ওই ত দেখা যাচ্ছে শামিলদের বাড়ির মেয়ে-বৌরা আলুশ্কেতের আগাছা তুলছে কাজে হাত দিয়েছে তারা দেবিতা। ওদের গায়ে গোলাপী জামা, পিঠিগুলো নুয়ে পড়েছে ধূসর চষাক্কেতের ওপর ঘচঘচ মিডানি পড়ছে। আক্সিনিয়া কোথাও না থেমে এক ছুটে পৌঁছল মেলেকভদের সবজিক্ষেতের কাছে চারপাশে তাকিয়ে দেখল। ফটকের খুঁটির গা থেকে ডালের ঠেকা দেওয়া



খলটা তুলে পান্না খুলে ফেলল একটা পায়-চলা সবু পথ ধরে গিয়ে হাজির হল জীবন্ত সূর্যমুখীর ডাঁটার ঘন সবুজ বেড়ার ধারে। শরীর নুইয়ে গুড়ি মেবে সে গিয়ে ঢুকল একেবারে ঘন জাম্বাটার ভেতরে সোনালি রেণুতে তার সারা মুখ মাখামাখি হয়ে গেল ঘাঘরাটা তুলে শেওনার জাল-বোনা মাটির ওপর বসে পড়ল সে।

কান পেতে শুনল নিস্তব্ধতায় কান ঝিঝি করতে লাগল। ওপরে কোথায় যেন একটা নিঃসঙ্গ ভোমরা গুনগুন করছে। সূর্যমুখী ফুলের ডাঁটাগুলো ককঁশ ফাঁপা নলের ভেতব দিয়ে নীরবে মাটির রস শুষে খাচ্ছে

আধঘন্টাখানেক বসে রইল মনে মনে যত্ননা পেতে লাগল সম্ভেদ হুজির ও আসবে কিনা। শেষকালে যখন চলে যাবে ঠিক করে উঠে দাঁড়িয়ে মাথাব ওড়নার নীচে চুল গোছগাছ করছে, এমন সময় ফটকের পান্নার ভারী কাঁচকৌচ আওয়াজ কানে এলো পদশব্দ শোনা গেল

‘আঞ্জিনিয়া

‘এদিকে এসো

‘আচ্ছা এসেছ তাহলে।’

পাতার সরসর আওয়াজ তুলে এগিয়ে এসে গ্রিগোরি তার পাশে বসল দৃষ্টির কারও মুখে কোন কথা নেই।

ভোমরা গালে এগুলো কী লেগেছে?’

আঞ্জিনিয়া জামার হাতায় মুখ ঘসল মিষ্টি গন্ধভরা রেণুতে মাখামাখি হয়ে গেল তার জামার হাতা।

‘সূর্যমুখীর হবে।’

এই যে এখানে, চোখের কাছটায় আরও খানিকটা আছে।’

সেটুকুও মুছে ফেলল এবারে দৃষ্টির চোখে চোখ পড়ল গ্রিগোরির মুখে নীরব প্রশ্ন তার উত্তরে কান্নায় ভেঙে পড়ল আঞ্জিনিয়া’

‘আমার আর শক্তি নেই গ্রিগা আমি শেষ হয়ে গেলাম।’

‘কেন? ও কী করে?’

আঞ্জিনিয়া রাগে অন্ধ হয়ে জামাব কলার ধবে টেনে খুলে ফেলল বেরিয়ে পড়ল কুমারী মেয়ের মতো উজ্জ্বলিত, গোলাপী রঙের আঁটসাঁট স্তনযুগল জ্বলজ্বল জমাট বেঁধে আছে বেগুনী-লাল দাগ অসংখ্য কালসিটে

‘কী করে, জান না?’ রোজ আমাকে পেটায়। আমার রক্ত শুষে খাচ্ছে

আর তুমিও বেশ কুকুরের মতো নোংরা ছিটিয়ে শেষকালে পালিয়ে গেলে ভোমরা সবাই ’ বলতে বলতে কাঁপা কাঁপা আঙুলে জামার টিপ

বোতাম আঁটল ভয়ে ভয়ে তাকাল গ্রিগোরির দিকে - ভাবল ও হয়ত অসঙ্কট হয়েছে গ্রিগোরি তখন মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে অন্য দিকে।

‘কে দোষী তার খোঁজ করতে যাচ্ছ এখন?’ একটা ঘাসের ডাঁটা চিবুতে চিবুতে গ্রিগোরি বলল।

গ্রিগোরির শান্ত কণ্ঠস্বর আক্সিনিয়ার গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিল।

‘তুমি কি বলতে চাও দোষ তোমার নেই?’ তীক্ষ্ণকণ্ঠে সে চিৎকার করে উঠল।

‘কুস্তী যদি না চায় কুস্তা তার পেছনে যাবে না।

আক্সিনিয়া দু’হাতে মুখ ঢাকল হিসেব-করা কড়া চাবুকের ঘায়ের মতো আঘাতটা সপাং করে এসে লাগল।

গ্রিগোরি ভুরু কঁচকে বাঁকা চোখে তার দিকে তাকাল তর্জনী ও মধ্যমার মাঝখানে সবু ফাঁকটার ভেতর দিয়ে টুইয়ে পড়ল এক ফোঁটা চোখের জল।

সূর্যমুখীর ঝোপেব ভেতরে বাঁকা হয়ে এসে পড়েছে হুলিহুসরির একটি কিন্নরগেবা, তাইতে ঝলমল করছে সেই টলটলে জ্বলের কৌটাটা শুকিয়ে দিচ্ছে চামড়ার ওপর রেখে যাওয়া ভেজা দাগ।

গ্রিগোরি চোখের জল সহ্য করতে পারে না। সে দারুণ অস্থির হয়ে উঠল। ভয়ঙ্কর কিন্তু হয়ে সে তার সালোয়ারের পা থেকে একটা লাল কাঠপিপড়ে খোঁড়ে ফেলে দিয়ে আবার সংক্ষিপ্ত দৃষ্টি হানল আক্সিনিয়ার ওপর। আক্সিনিয়া সেই একই ভাবে বসে আছে শুধু তার হাতের তালুর পিঠ বয়ে এখন আর একটা নয়, একের পর এক তিনটে বিন্দু গড়িয়ে পড়ছে।

‘কাদার কী হল? তোমার মনে ব্যথা দিলাম নাকি গো? আক্সিনিয়া! হয়েছে। আচ্ছা খামাও দেখি। আমার কিছু বলার আছে তোমাকে।’

আক্সিনিয়া ভিজে মুখের ওপর থেকে হাত সরিয়ে নিল।

‘আমি এসেছিলাম তোমার পরামর্শ চাইতে অমন কবছ কেন তুমি? কী করেছি আমি? অমনিতেই এত কষ্ট আর তুমি কিনা।’

‘মড়ার ওপর খাঁড়ার যা মারলাম, এই ভেবে গ্রিগোরির মুখ লাল হয়ে উঠল।

‘আক্সিনিয়া, লক্ষী সোনা আমার। আজ্ঞেবাজ্ঞে কথা বলে ফেলেছি কিছু মনে করো না।

‘আমি তোমার ওপর জোর খাটাতে আসি নি ভয় পেয়ো না।’

ঠিক সেই মুহূর্তে আক্সিনিয়ার নিজেরও বিশ্বাস হচ্ছিল যে গ্রিগোরির ওপর সে জোর খাটাতে আসে নি কিন্তু দনের পার ধরে জলামাঠের দিকে ছুটে আসার ব্যাপরটা খুব একটা গভীর ভাবে তলিয়ে না দেখার ফলে তার মনে হয়েছিল ‘কথা বলে ওকে ফেরাব ওর বিয়ে করা চলবে না কাকে নিয়ে

আমি জীবন কাটাও তাহলে?’ সেই সময় স্ত্রোপানের কথা মনে হতে সে সজোরে মাথা নেড়ে হঠাৎ এসে-পড়া এই অপ্রাসঙ্গিক চিন্তাটাকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করে।

‘তার মানে আমাদের ভালোবাসার এখানেই শেষ?’ উপড় হয়ে শুয়ে কনুইয়ে ভর দিয়ে খিগোরি জিজ্ঞেস করল কথা বলতে বলতে বনফুলের গোলাপী পাপড়ি চিবিয়ে সে থুথু করে ফেলতে লাগল।

শেষ হতে যাবে কেন?’ অগ্নিনিয়া ভর পেয়ে গেল ‘তা কেমন করে হবে?’ কথাটা ফের জিজ্ঞেস করে খিগোরির চোখে চোখে তাকানোর চেষ্টা করল সে

খিগোরি তার চোখের নীল-নীল স্বীত সাদা ডেলাটা ঘোরাল চোখ অন্য দিকে সরিয়ে নিল

বাতাসের দৌরাঘোঁ বিশ্বক, শ্রান্ত-ক্লান্ত মাটি তার বুক থেকে উঠে আসছে শুলো আর রোদের গন্ধ বাতাস সরসর আওয়াজ তুলে সূর্যমুখীর সবুজ পাতাগুলোকে ওলটপালট করে গেল মুহূর্তের জন্য এক ঋণ কৌকড়ানো মেঘের পিঠের আড়ালে সূর্য ঢাকা পড়ে বাপসা হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রোপের ওপর, জ্বামের বৃকে, অগ্নিনিয়ার আনত মাথার ওপর, বনফুলের গোলাপী কোষের ওপর কুণ্ডলী পাকিয়ে ভাসতে ভাসতে নেমে এলো একটা ধৌয়াটে ছায়া

খিগোরি দীর্ঘশ্বাস ফেলল একটা ঘড়ঘড়ে কাশির মতো শোনালা তার সেই দীর্ঘশ্বাস এবারে সে গরম মাটিতে শক্ত করে পিঠ ঠেকিয়ে চিত হয়ে শূল।

ধীরে ধীরে আলাদা আলাদা করে একেকটি শব্দ উচ্চারণ করে সে বলল, ‘শোন তা হলে অগ্নিনিয়া। আমার বৃকের ভেতরে কোথায় যেন কী একটা বিশ্রী ভাবে কুরে কুরে যাচ্ছে আমি তাই ভেবে ঠিক করেছি’

সবজি বাগানের মাথার ওপর থেকে ভেসে এলো গোবুর গাড়ির কাঁচকৌচ আওয়াজ।

‘এই হট, টেকো বলদ! হট হট’

গাড়োয়ানের হাঁকডাক অগ্নিনিয়ার কানে এত জোরে এসে বাজল যে সে উপড় হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ল। খিগোরি মাথা উঁচু করল, ফিসফিস করে বলল, মাথার গুড়নাটা খুলে ফেল। সাদা ঝকঝক করছে চোখে পড়তে পারে।’

অগ্নিনিয়া মাথার বুঝল খুলে ফেলল সূর্যমুখীর বনের ভেতর থেকে গরম বাতাসের স্রোত তার ঘাড়ের কাছের সোনালী চূর্ণকুন্তলে শিহরণ জাগিয়ে চলে গেল অপস্রম্যমাণ গাড়িটার কাঁচকৌচ আওয়াজ দূরে মিলিয়ে গেল

‘আমি যা ভেবে দেখেছি, শোন,’ খিগোরি এবারে চান্স হয়ে উঠে বলল ‘যা হবার হয়ে গেছে যা হয়ে গেছে তাকে ত আর ফিরিয়ে আনা যায় না।’

কে দেখি, কে নয় তার বিচার করে কী লাভ বল? যে ভাবেই হোক এর পরে আমাদের জীবন কাটাতে হবে

অগ্নিনিয়া উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগল। অপেক্ষা করতে লাগল শেষ পর্যন্ত গ্রিগোরি কী বলে, একটা পিপিড়ের কাছ থেকে একটা ডাঁটা ছিনিয়ে নিয়ে সেটা ভাঙতে লাগল।

গ্রিগোরির মুখের দিকে তাকাতে দেখতে গেল তার চোখের শুক ও উৎকণ্ঠাপূর্ণ দীপ্তি

‘ আমি ভেবে দেখলাম আমরা শেষ করে দিই এই ’

অগ্নিনিয়া দুলে উঠল। তার আঙুলগুলো কঁকড়ে গেল, সে আঁকড়ে ধরল শক্ত শিরাবহুল বুনা লতা। তার নাকের দু’পাশ ফুলে উঠল সে অপেক্ষা করতে লাগল গ্রিগোরির মুখের বাকি কথাটুকু শোনার জন্য। একটা আতঙ্ক ও অসহিষ্ণুতার আগুন লকলক করে উঠে লেহন করল তার মুখ গলা শুকিয়ে গেল ভাবল গ্রিগোরি হয়ত বলবে ‘শেষ করে দিই ত্তেপানটাকে।’ কিন্তু তা না বলে গ্রিগোরি বিরক্তিতে শুনলো ঠোঁট চাটল (ঠোঁট যেন তার সহজে নড়তে চায় না), বলল, ‘শেষ করে দেওয়া যাক আমাদের এই ব্যাপাবটা কী বল?’

অগ্নিনিয়া উঠে মীড়াল দোলে যাওয়া সূর্যমুখীর হলদে মাথাগুলো বুক নিয়ে ঠেসতে ঠেসতে চলে গেল ফটকের দরজার দিকে

‘অগ্নিনিয়া গ্রিগোরি চাপা গলায় ডাকল

উত্তরে গেটের পালাগুলো ভারী আড়নাদ করে উঠল।

### সংক্ষেপে

রাই কাটার পর গোলায় তুলতে না তুলতে এসে গেল গম দো-আঁশ মাটির মাঠে, টিলার ওপরে পাথাগুলো যোমে পুড়ে হলুম হয়ে গেল, কঁকড়ে নলের মতো পাকিয়ে গেল ডাঁটা শুকিয়ে ধরে যেতে লাগল।

লোকে খুশি হয়ে বলাবলি করতে লাগল যে ফসল এবারে বেশ ভালোই হয়েছে। শিবগুলো দানায় ভর্তি, দানাগুলো ভারী নিটোল।

ইলিনিচনার সঙ্গে পরামর্শ করার পর পাঙ্কলেই প্রকোফিয়েভিচ ঠিক করল কোরশুনভদের মেয়ের সঙ্গে যদি বিয়ে হয়ই তাহলে বিয়েটা আগস্ট মাসের শেষ গির্জের পার্বণ পর্যন্ত স্থগিত রাখতে হবে

পাকা কথার জন্য অবশ্য কোরশুনভদের কাছে এখনও যাওয়া হয়ে ওঠে

নি - ফসল কাটার সময় এসে গেল, তারপর এখন আবার পার্বণের জন্য অপেক্ষা।

ফসল কাটতে তারা যেদিন বেরোল সে দিনটি ছিল এক শুক্রবার ফসল কাটা কলের সঙ্গে চলল তিনটি ঘোড়া পাশ্বেলেই প্রকোফিরেভিচ থেকে গেল ফসল বসে আনার জন্য গাড়িতে নতুন একটা মাচা বানাতে হবে - সেটাই গাড়ার কাজে সে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ফসল কাটতে মাঠে গেল পেত্রো আর গ্রিগোরি।

তিন ঘোড়ায় টানা ফসল-কাটা গাড়ির সামনের আসনে বসে ছিল পেত্রো। গ্রিগোরি সেই আসনে হাত রেখে গাড়ির পাশে পাশে ছোট্টে চলল তার মুখ গম্ভীর। নীচের চোয়াল থেকে গালের হাড় অবধি কাঁপতে কাঁপতে তেরহা ভাবে এদিক-ওদিক নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে মুখের মাংসপেশী। পেত্রো জানে, গ্রিগোরি যে মনে মনে ফুসছে এবং যে-কোন রকমের হঠকারি কাজ যে সে করে বসতে পারে এটা তার নিশ্চিত লক্ষণ কিন্তু সেদিকে আমল না দিয়ে গম-রাঙের গোর্গেফের ফাঁকে মুচকি হেসে ভাইকে খেপিয়ে চলল

‘মাইরি বলছি, সে মাগী বলছে।’

‘বললে বলুক গে,’ গোর্গেফ এক প্রান্ত কামড়াতে কামড়াতে গজগজ করে বলল গ্রিগোরি

‘বলে কি ‘সবজি বাগানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, এমন সময় শুনি মেলেখভদের সূর্যমুখীর ক্ষেতের ভেতরে মানুষের গলার আওয়াজ।’

‘ধামলি?’

‘হ্যাঁ, ঠিকই গলার আওয়াজ বলে, ‘আমি তাই বেড়ার ওপর দিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম

গ্রিগোরি ঘন ঘন চোখ পিটপিট করতে লাগল।

‘ধামলি কি না?’

‘আজব ছেলে ত’ আরে, কথাটা শেষই করতে দে না আমাকে।’

‘দাখ পেত্রো, একচোট মারপিট হয়ে যাবে কিন্তু, পিছিয়ে পড়ে গ্রিগোরি শাসাল।

পেত্রো ভুরু নাচাল গ্রিগোরি এবাব পেছন পেছন যাচ্ছিল পেত্রো ঘোড়ার দিকে পিঠ রেখে, গ্রিগোরির দিকে মুখ করে ঘুরে বসল

‘তা হ্যাঁ, বেড়ার ওপর দিয়ে উঁকি মেরে দেখি কি দুটিতে জোড় বৈধে জড়াজড়ি ক’বে দিবি্য শূয়ে আছে।’ আমি জিজ্ঞেস করলাম, ‘ওরা কারা?’ মাগী বললে, ‘কারা আবার? আস্তাখভের আক্সিউডকা আর তোমার ভাই গো’ আমি বললাম

ফসল-কাটা কলের পেছনে একটা ছোট হাতলওয়ালা বিদেকাঠি পড়ে ছিল সেটার হাতল মুঠোর চেপে ধরে গ্রিগোরি যেয়ে গেল পেত্রোর দিকে পেত্রোও

সঙ্গে সঙ্গে লাগাম ছেড়ে দিয়ে তড়াক করে আসন থেকে লাফিয়ে নেমে ঢালাকী খাটিয়ে ঘোড়াগুলোর সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

‘আই হারামজাদা, খেলি নাকি? আই, আই! দেখ কাণ্ড

নেকড়ের মতো দাঁত খিচিয়ে খিগোরি বিদেটা ছুঁড়ে মারল। পেত্রো হাতে ভর দিয়ে মাটিতে পড়ল। বিদে তার মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে পাথরের মতো শুকনো খটখটে মাটিতে আঙুলখানেক গৈধে বসে বনবন শব্দে কাঁপতে লাগল।

পেত্রোর মুখ তখন কালো হয়ে গেছে ঘোড়াগুলো উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। তাদের মুখের লাগাম চেপে ধরে পেত্রো গালাগাল দিয়ে বলল, ‘তুই আমাকে আরেকটু হলেনই খুন করে ফেলেছিলি, শুরোর’

‘খুনই করতাম’

‘তুই একটা আহাম্মক শয়তানটা কী বকম ক্ষেপেছে দেখ’ বাপের বংশের সেই ঘাঁচ পেয়েছিস দেখছি। সত্যিকারের একটা ক্যাপা পাহাড়ী’

পেত্রো শুকে আঙুলের ইশারায় ডাকল।

‘এদিকে আয় দেখি বিদেটা দে আমাকে

বা হাতে ঘোড়ার লাগাম ভাইয়ের হাতে তুলে দিল। সাদা রঙ করা কাঁটার মিক ধরে বিদেটা হাতে নিল তারপর বলা নেই কওয়া নেই হাতলটা দিয়ে খিগোরির পিঠে এক ঘা বসিয়ে দিল।

খিগোরি লাফ দিয়ে এক পাশে সরে গেল সেই দিকে ফিরে তাকিয়ে আকশ্যাস করে পেত্রো বলল, ‘আচ্ছা কবে দেওয়া উচিত ছিল’

কিছুক্ষণ বাদে তামাক ধরিয়ে ওরা দু’জনে চোখে চোখে তাকাতেই হে-হে করে হেসে উঠল।

খ্রিস্তোনিয়ার বৌ আরেক রাস্তা ধরে ফসল বোঝাই গাড়ি নিয়ে যেতে যেতে গ্রিশকাকে তার দাদার ওপরে বিদেকাঠি ছুঁড়তে দেখতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে সে ফসলের গাদার ওপর উঠে দাঁড়াল কিন্তু মেলেনবড ভাইরা ফসল কাটার কল আর ঘোড়াগুলোর আড়ালে পড়ে যেতে ওদের মধ্যে যে আসনে কী হচ্ছিল ঠিকমতো দেখতে পেল না বাড়ির গলিতে পৌঁছুতে না পৌঁছুতেই পড়শীকে ডেকে চিৎকার শুরু করে দিল সে।

‘ক্রিমডনা! এক ছুটে গিয়ে তুর্কী পাঙ্কেনেইকে বলে আয় যে ওদের দুই ব্যাটা তাতার-টিলার কাছে বিদেকাঠি নিয়ে কাটাকাটি শুরু করে দিয়েছে দস্তুরমতো মারপিট এদিকে গ্রিশকাটা তোমরা ত জানই কী বকম ক্যাপা ওটা’ পেত্রোর পাঁজরায় এমন ভাবে ছ্যাচাং করে বিদেটা বিধিয়ে দিলে না এদিকে পেত্রোও ততক্ষণে ওটাকে ওখানে বন্ধের বনো বয়ে যাচ্ছে’ কী সাংঘাতিক!’

এদিকে পেত্রোদের ঘোড়াগুলো খেটে খেটে হমরান হয়ে গিয়েছিল তাদের ওপর চিংকার চৈচামেচি করে করে পেত্রোরও গলা ভেঙে গেছে সে তাই এখন জোরে জোরে শিস দিয়ে ওদের ডাড়া দিচ্ছে। গ্রিগোরি তার ধুলোবালিমাখা কালো একটা পায়ে আড়কাঠ চেপে ধরে ফসল-কাটা-কলের ফলা থেকে ফসলের আঁটি বেড়ে বেড়ে ফেলছে। রক্তচোষা মাছির কামড়ে ক্ষতবিক্ষত ঘোড়াগুলো লেজ ঘোরাতে ঘোরাতে চামড়ার ফিতের বাঁধনগুলোতে এলোপাতাড়ি টান মারছে।

স্ত্রোপের ওপর সর্বত্র, দূর দিগন্তের সেই নীল কিনারা পর্যন্ত লোকে গিজগিজ করছে। ঘর্ষ, ঝৎঝৎ আওয়াজ তুলছে ফসল-কাটা-কলের ফলাগুলো, কাটা ফসলের আঁটি স্থপাকার হয়ে পড়ছে স্ত্রোপের বুকে মেঠো ইস্তরের দল তাদের গর্তের বাইরে জুপ করা মাটির ঢিবিব ওপব বসে কিচমিচ করে গাড়েয়ানদের নকল করছে।

‘আরও দুটো খেপ তারপর তামাক খাওয়া যাবে!’ ফসল-কাটা-কলের ফলার ঘসঘস আব চালানোর ঘর্ষ আওয়াজ ছাপিয়ে কথাগুলো বলে পেত্রো মাথা ঘোরাল।

উত্তরে গ্রিগোরি সাথ দিয়ে কেবল ঘাড় নাড়াল হাওয়া লেগে শুকিয়ে ঠোট ফেটে এমন অবস্থা হয়েছে যে খোলের সন্ধি নেই ফসলের ভারী জুপ ঝেঁটিয়ে পাশে রাখা যাতে আরেকটু সহজ হয় সেই জন্য সে বিদার হাতলটা ফলার আরও কাছাকাছি মুঠো করে ধরল দমকে দমকে নিশ্বাস নিতে লাগল। বুকের কাছটা ঘামে ভিজে গেছে, চুলাকোছে টুপিগ তলা থেকে দরদর করে বিজ্রী রকমের ঘাম বারছে চোখে এসে পড়ায় সাবানের মতো জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে। ঘোড়া ধামিয়ে দিয়ে আকণ্ঠ জল পান করার পর ওরা তামাক ধরাল।

ওরে বড় রাস্তার ওপর দিয়ে কে যেন ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে, হাতের চেটো দিয়ে চোখের আলো আড়াল করে দেখে নিয়ে পেত্রো বলল

গ্রিগোরি ডালো করে তাকিয়ে দেখল বিষয়ে তার ভুবু ওপরে উঠে গেল

‘এ যে দেখছি বাবা!’

‘পাগল হলি নাকি কিসে চেপে আসবে? আমাদের ঘোড়াগুলো ত ক্ষেতে’

‘না, না বাবাই!’

‘ভুল দেখছিস রে গ্রিগোরি!’

‘মাইরি বলছি, বাবা!’

কিছুক্ষণ বাদেই ঘোড়া আর সওয়ার দু’জনকেই স্পষ্ট দেখা গেল ঘোড়াটা ছুটছে উর্ধ্বশ্বাসে

‘বাবা!’ পেত্রো ভয় পেয়ে ভেবাচেকা খেয়ে জায়গায় দাঁড়িয়ে উসখুস করতে লাগল

‘বাড়িতে হয়ত কিছু হয়েছে,’ ওদের দু’জনেরই মনে যে চিন্তাটা হচ্ছিল  
খ্রিগোরির মুখ দিয়ে এবার তা বেরিয়ে গেল।

পান্ত্লেই প্রকোফিয়েভিচ শ’ পাঁচেক হাত দূরে থাকতেই রাশ টেনে ঘোড়াটাকে  
দুলকি চালে চালিয়ে দিল

‘চাষকে নাল করব আচ্ছকে তোদের শূয়োবের বাচ্চা!’ দূর থেকেই  
চামড়ার চাবুকটা মাথার ওপর ঘোরাতে ঘোরাতে সে গর্জন করে উঠল

‘এ আবার কী’ পেত্রো একেবারে হকচকিয়ে গেল। সে তার সোনালি গোর্ফের  
অর্ধেকটাই পুরে দিল মুখের ভেতরে

‘কলের পেছনটায় সরে দাঁড়া আজ আর রক্ষে নেই, চাবুকের বাড়ি পড়বেই  
কী ব্যাপার কী বৃশ্চান্ত বোঝার আগেই পিঠে পড়বে মুচকি হেসে এই কথা বলে  
সতর্কতার খাতিরে কলের ওপাশে গিয়ে গা ঢাকা দিল খ্রিগোরি

ঘোড়াটা ঘেমে নেয়ে উঠেছে। দুলকি চালে হেলেদুলে কাটা ক্ষেতের ওপর  
দিয়ে চলেছে। পান্ত্লেই প্রকোফিয়েভিচের দুই ঠাণ্ড ঘোড়ার পিঠের দ্বাধারে  
আছড়াচ্ছে (জিন ছাড়াই সে ঘোড়ায় চেপেছে)। মাথার ওপর চাবুক ঘুরিয়ে সে  
চৌচাচ্ছে।

‘এখানে তোদের কী কাণ্ডকারখানা চলছে রে শয়তানের বাড়?’

‘কেন? ফসল কাটছি’ পেত্রো কিছু বুঝতে না পেরে দু’হাত ছড়াল,  
ভয়ে ভয়ে আঙুলোখে চাবুকটার দিকে তাকাল

‘কে কাকে বিদেকাঠি দিয়ে মেবেছে শুনি? কী জনো মারামারি করেছিস?’

খ্রিগোরি বাপের দিকে পিছন ফিরে ফিসফিস করে হাওয়ায় ছিন্নভিন্ন মেঘের  
টুকরোগুলো বিভ্রিভি করে গুনতে লাগল

‘বলছ কী? কিসের বিদে? কে মারামারি করল?’ বিচলিত হয়ে এক পা  
থেকে আরেক পায়ের ওপর দেহের ভার রাখতে রাখতে চোখ পিটপিট করে  
বাপের আপাদমস্তক সে দেখে নিল

‘সে কি’ হতজ্ঞাড়ী মাগী যে ছুটতে ছুটতে এসে হাউমাউ করে চৌচিয়ে  
বলল ‘তোমার বাটারা বিদেকাঠি নিয়ে মারামারি করতে লেগেছে গো!’ অ্যাঁ?  
এ কেমনধারা কাণ্ড!’ পান্ত্লেই প্রকোফিয়েভিচ ডেবাচেকা খেয়ে মাথা ঝাঁকতে  
লাগল লাগামে হুঁড়ে ফেলে দিয়ে শ্বাসবুদ্ধ-প্রায় ঘোড়ার পিঠ থেকে সে লাফিয়ে  
নেমে পড়ল এদিকে অ্যামি ফেদকা সেমিশ্চিকিনের কাছ থেকে ঘোড়া চেয়ে নিয়ে  
ছুটতে ছুটতে এলাম। অ্যাঁ?’

‘কে বলল তোমাকে এসব কথা?’

‘এক মাগী!’



‘আবোল-তাবোল বকেছে বাবা’ বোটি হয়ত গাড়িতে ঘুমিয়ে পড়েছিল ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেছে।’

নন্দাড মাগী! দাড়ি টেনে হিড়তে হিড়তে তীক্ষ্ণকণ্ঠে চিৎকার করে বলল পাঙ্কলেই প্রকোফিয়েভিচ ওই ক্রিমভনাটা একটা খানকী মাগী ওঃ ভগবান! তবে রে! হারামজাদীটাকে আমি চাবকাব! বোঁড়া বাঁ পাটার ওপর ডর দিয়ে ন্যাঙচাতে ন্যাঙচাতে সে দাপাদাপি শুরুর করে দিল

খ্রিগোরি নিঃশব্দ হাসিতে কঁপতে লাগল, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল পায়ের দিকে পেরো তার ঘর্মান্ত মাথার হাত কুলাতে লাগল বাপের ওপর থেকে সে চোখ সরাত্তে পারছিল না

বেশ খানিকক্ষণ ল্যাফলাফি দাপাদাপি করার পর পাঙ্কলেই প্রকোফিয়েভিচ শান্ত হয়ে এলো ফসল-কাটা-কলের ওপর চড়ে বসে ক্ষেতের এমুডো ওমুডো দু’বার চালিয়ে দিয়ে দু’ধেপ ফসল কাটল, তারপর আবার খিস্তি করতে করতে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল বড় রাস্তার ওপরে গিয়ে পড়ল দুটো ফসল বোঝাই গাড়িকে পিছে ফেলে ধুলোর ঝড় তুলে গ্রামের দিকে চলে গেল। জমির আলোর ওপর পড়ে রইল ছোট ছোট বিনুনি কবে পাকানো জমকাল গোছা লাগানো চাবুকটা। ভুলে ফেলে গেছে পেরো সেটা হাতে তুলে নিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে মাথা দুলিয়ে খ্রিশকাকে বলল, ‘আজ আর আমাদের দেখতে হত না। ওঃ এটাকে কি চাবুক বলা যায়? চাবুক ত নয় ভাই, সাক্ষাৎ যম এ দিয়ে লোকের মুণ্ড খসিয়ে দেওয়া যায়।’

### আঠারো

পয়লা নম্বরের ধনী পরিবার বলে তাতারস্কি গ্রামে কোরশুনভদের নামডাক আছে। চৌদ্দ জোড়া বাঁড়, একপাল ঘোড়া, প্রভাল্‌স্ক প্রজ্ঞনশালা থেকে কেনা মাদী ঘোড়া, গোটা পনেরো গাই, অসংখ্য পশুপাল, কয়েকশ ভেড়ার পাল। তা ছাড়া চোখ জুড়ানোর মতোও অনেক কিছু আছে বৈ কি! - মোষভদের বাড়ির চরে কোন অংশে খারাপ বাড়ি নয় তাদের বাড়িতে ছয়টা ঘর, টিনের চাল দেওয়া, দেয়ালে আস্তুর লাগানো বসতবাড়ির লাগোয়া আস্তাবল, গোয়াল ও গৃহস্থালির অন্যান্য নানা কাজের ঘরগুলোর ছাদ সুন্দর নতুন টালি ছাওয়া চার একর জমির ওপর বাগান অসংখ্য গাছগাছালি এর বেশি আর কী মানুষের চাই?

ঠিক এই কারণেই অনেকটা ভয়ে-ভয়ে গোপন অনিচ্ছা নিয়ে পাঙ্কলেই প্রকোফিয়েভিচ প্রথমবার বিয়ের সম্বন্ধ করতে ওদের বাড়িতে এসেছিল। কোরশুনভরা তাদের মেয়ের জন্য অবশ্যই খ্রিগোরির চেয়ে ভালো পাত্র পেতে পারে পাঙ্কলেই

প্রকোফিয়েভিচ এটা বুঝতে পারছিল, তার ভয় ছিল ওরা তাকে কিরিয়ে দেবে। তাই খাপছাড়া প্রকৃতির কোরশুনভদের কাছে গিয়ে হাতজোড় করে দাঁড়ানোর ইচ্ছে তার ছিল না কিন্তু ইলিনিচনা উঠতে বসতে তাকে কথা শোনাতে লাগল হিনে জ্বোঁকের মতো লেগে রইল তার পেছনে শেষ পর্যন্ত বুড়োর একগুয়েমি ভাঙল। পাশ্বেলেই প্রকোফিয়েভিচ যেতে রাজী হল। মনে মনে গ্রিশ্কা আর ইলিনিচনাকে এবং তাবৎ বিশ্বসসোরকে শাপ-শাপান্ত করতে করতে সে চলল কোরশুনভদের বাড়ি

পাকা কথার জন্য দ্বিতীয় বার যাওয়ার দরকার ছিল রবিবারের অপেক্ষা ইতিমধ্যে কোরশুনভদের বাড়ির সবুজ রঙ করা ছাদের নীচে বোধে গেছে চাপা উত্তেজনার এক তীব্র পারিবারিক কলহ মেলেন্ধরা বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে চলে যাওয়ার পর মায়ের প্রশ্নের উত্তরে মেয়ে বলল, 'গ্রিশ্কাকে আমার ভালো লেগেছে ও ছাড়া আর কাউকে আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি নে।'

'হুঃ বোকা মেয়ে বর পছন্দ করেছে দেখ।' মেয়েকে ফাস্ত করার চেষ্টায় প্রবল আপত্তি জানিয়ে বাপ বলল। 'একমাত্র ভালোর মধ্যে ভালো যেটা তা হল জিপসীদেব মতো কালো চুল। ওবে আমার সোনা মেয়ে, তোর জন্যে আমি অমন বর খুঁজছি নাকি?'

'আর কাউকে আমি চাই নে বাবা।' মুখ আরক্ত হয়ে উঠল, চোখের জল ফেলতে ফেলতে সে বলল, 'আর কাউকে বিয়ে করতে আমি যাচ্ছি নে, আর কেউ যেন বিয়েব সম্বন্ধ নিয়ে না আসে তার চেয়ে বরং তোমরা আমাকে উল্-মেদভেদিৎসার মঠে পাঠিয়ে দাও।'

'ওটা যে একটা লম্পট। মেয়েবাজ, সেপাইলের বাড়ির বৌদের পেছন পেছন ঘুরে বেড়ায়।' বাপ তার শেষ অঙ্গটা ছাড়ল 'সারা গায়ে যে টি-টি পড়ে গেছে।'

'তা হোক।'

'তোর যদি মনে হয় তা হোক, তাহলে আমার আর কী? তা-ই যদি হয়, তাহলে ত ল্যাঠাই চুকে গেল - আমার ঘাড় থেকে একটা ভারী বোঝা নেমে গেল।'

নাতালিয়া বড় মেয়ে বাপের বড় আদরের মেয়ে। তাই পছন্দ নিয়ে তার ওপর কোন দিন কোন চাপ সে দেয় নি এই ত গত শরৎকালেই একটা সম্বন্ধ এসেছিল এসেছিল অনেক দূর থেকে - তসুতুস্তান নদীর এলাকা থেকে। সনাতন ধর্মবিশ্বাসী, বেজায় ধনী কসাক পরিবার। দনের বাঁ ধারের ও ডান ধারের শাখানদী খোপিয়োর ও চির এলাকা থেকেও এসেছিল, কিন্তু কোন পাত্রই নাতালিয়ার পছন্দ হয় নি ঘটকদেব চাটুবাকো কোন ফল হয় নি

গ্রিশ্কার কসাকসুলভ বোপেরোয়া ডাব, খেতখামারি এবং গের্জালির অন্যান্য

কাজে ভালোবাসার জন্য মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচের মনে মনে তাকে বেশ পছন্দ। একবার ঘোড়দৌড়ের সময় বাহাদুর ঘোড়সওয়ার বলে গ্রিশ্কা যখন প্রথম পুরস্কার পেলে সেই দিনই তল্লাটের ছেলেছোকরাদের ভিড়ের মধ্যে বুড়ো তাকে বিশেষ চোখে দেখে। কিন্তু অস্বচ্ছল ঘরের কারণে সঙ্গে তার ওপরে বদনাম রটেছে এমন কোন ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবে একথা ভাবতেই তার মনে কষ্ট হচ্ছিল।

‘খাটিয়ে ছেলে, আর দেখতে শুনতেও বেশ’ স্বামীর ছিট ছিট লাগ ধরা, কটা রঙের কর্কশ লোমে ভর্তি হাতে হাত বুলাতে বুলাতে রোজ একবার রাতে ফিসফিস করে বলে লুকিনিচনা। ‘আর নাভালিয়ারও অবস্থাটা দেখ ওর কথা ভেবে ভেবে দিনে দিনে একেবাবে শুকিয়ে যাচ্ছে। মেয়েটা ভীষণ ভাবে মজেছে।’

মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ বৌয়ের হাড়-গুঠা ঠাণ্ডা বুকের দিকে পিছন মিরে রাগে গরগর করে বলে, ‘ধুস্তোর এ যে দেখছি কাঁটার মতো লেগে রইল। ধাম বলছি ইচ্ছে হয় হাবা পাশ্কাটার সঙ্গে বিয়ে দাও না কেন। আমার কী? ভগবান তোমাকে ছিটে ফোঁটা বুদ্ধিও দেয় নি। ‘দেখতে শুনতেও বেশ’ - আহা কী কথাই না বললে।’ মুখ ভেঙিয়ে সে বলল ‘বলি, ওর মুখ ধূয়ে কি তুমি জল খাবে? ও দিয়ে কি তোমার ফসল কাটা হবে?’

‘তা কেন হবে? সে কথা আমি বলছি নে’

‘ওর চেহারার কথা কেন ওঠে তা আর বুঝি নে? আরে যদি সত্যিকারের একটা মানুষ হত তাহলেও না হয় বুঝতাম হ্যাঁ, সত্যি বলতে গেলে কি তুর্কীদের ঘরে মেয়েকে বিয়ে দিতে হবে একথা ভেবে আমি মনে এতটুকু সোয়াস্তি পাচ্ছি নে। আমাদের পালাটি ঘর হলে না হয়’ মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ মনে মনে গর্ব অনুভব করে একটা গভীর নিশ্বাস ছেড়ে বিছানায় দুলে উঠল।

‘খাটিয়ে পরিবার, অবস্থাও অস্বচ্ছল নয়,’ ফিসফিস করে এই কথা বলে স্বামীর বলিষ্ঠ পিঠের কাছে সরে এসে শান্ত করার জন্য তার হাতে হাত বুলাতে থাকে

‘ধুস্তোর! সরে যাও বলছি জায়গায় কুলোচ্ছে না নাকি? গাড়ীন গোরু পেয়েছ নাকি আমাকে? অমন হাত বুলাচ্ছে যে? আর নাভালিয়ার কথা যদি বল সে তুমি যা ভালো বোঝার কর ইচ্ছে করলে কোন ন্যাডামাথা খানকীর সঙ্গেও বিয়ে দিতে পার’

‘নিজের সম্ভ্রানের ওপর দয়ামায়া থাকতে হয় ওসব টাকাপয়সার কথা ভেবে কী হবে বল?’ মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচের লোমশ কানের কাছে মুখ এনে ফোঁস ফোঁস করে বলল লুকিনিচনা।

মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ পা ঝাড়া দিয়ে এক ঝটকায় সরে গিয়ে দেয়ালের

সঙ্গে লেটে রইল, তারপর ঘুমানোর ভান করে নাক ডাকতে লাগল।

পাকা কথার জন্য মেলেখাঁভমের আগমন ওদের কাছে আকর্ষক ছিল। সকালের উপাসনার পর তাদের ঘোড়ার গাড়িটা গডগড করে এগিয়ে এলো ফটকের দিকে। গাড়ির পা-দানিতে পা ফেলতে গিয়ে ইলিনিচনা আরেকটু হলেই গাড়ি উলটে দি রেছিল। কিন্তু পাঙ্ডেলেই একোফিয়েভিচ বীতিমতো একটা বাজা মোরগের মতো তড়াক করে আসন থেকে লাফিয়ে নামল। নামতে গিয়ে পাদুটো চিনচিন করে উঠলে মুখে কোন ভাব প্রকাশ করল না, জোয়ান পুরুষের মতো দরদর করে পা ফেলে বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

‘আরে এসে গেছে দেখছি।’ এ যে শয়তানের কারসাজি! জানলা দিয়ে তাকিয়ে ওদের দেখতে পেয়ে আত্মনাদ করে উঠল মিরোন খিগোরিয়েভিচ।

‘হা ভগবান! আমি যে এদিকে রামাবান্না করছিলাম কাপড়টাও ছাড়ার সময় শেলায় না!’ কর্তী কঁকিয়ে উঠল।

ওতেই হবে! তোমার স্বয়ং ত আর নিয়ে আসে নি। কে সাধ করে নিতে যাবে এই দামের চুলকুনি!’

‘করারই অসভ্য, বুড়ো হয়ে একেবারেই গেছে।’

‘আচ্ছা, আচ্ছা, তুমি একটু যুখে রাশ টান ত বাপু!’

‘একটা পরিষ্কার জামা পরলেও ত পারতে পিঠের কুঁজটা ত দেখা যাচ্ছে লজ্জাও করে না? বুড়ো ভায়!’ পাত্রপক্ষের লোকজন যখন উঠোন পেরোচ্ছে সেই সময় মিরোন খিগোরিয়েভিচকে ঝুটিয়ে দেখতে দেখতে তার বৌ বলল।

‘চিনবার হলে এতেই চিনবে বলে মনে হয় অলকুস পরে থাকলেও ঠিক চিনত।’

‘আপনাদের কুশল ত?’ চৌকাটের গায়ে হেঁচট খেতে খেতে পাঙ্ডেলেই একোফিয়েভিচ যেন মোরগের গলায় কঁকর-কঁ ডাক ছাড়ল। তারপর নিজের চড়া গলার আগুয়াজে লজ্জা পেয়ে আরও একবার বিগ্রহের সামনে কুশ-প্রণাম করল।

‘নমস্কার, কটমট করে আগাপাশতলা আগন্তুকদের দেখে নিয়ে কর্তা বলল।

‘ভগবানের কৃপায় আবহাওয়াটা এবারে বেশ ভালোই।’

‘হ্যাঁ, ভগবানের কৃপায়, ভালোই যাচ্ছে।’

এরকম চললে ফসল ভালো ওঠানো যাবে।’

‘হ্যাঁ, তা ত বটেই।’

‘হ্যাঁ আ-আ-’

‘হুম’

‘আমরা এই এলাম মিরোন খিগোরিয়েভিচ। মানে জানতে এলাম আশনারা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলে শেষ পর্যন্ত কী ঠিক করলেন? এই

সহজ করার ইচ্ছে আপনাদের আছে, কি নেই?

‘আসুন, ভেতরে আসুন বসুন।’ লম্বা ঝুলের, কুঁচি দেওয়া ঘাঘরার কিনারা দিয়ে সুরকি-খসা মেঝে ঝেঁটিয়ে আড়মি নত হয়ে অভ্যর্থনা জানাল গৃহকন্যা।

‘ঠিক আছে, ঠিক আছে, অত ব্যস্ত হবেন না,’ বলতে বলতে পপলিনেব পোশাকের খসখস আওয়াজ তুলে বসে পড়ল ইলিনিচনা চমৎকার একটা নতুন অয়েলক্রথ বিছানো টেবিলের ওপর কনুই ঠেকিয়ে মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ চূপচাপ বসে রইল। অয়েলক্রথটা থেকে ভিজে রবার এবং আরও কিসের যেন একটা দুর্গন্ধ ছাড়ছে। পাড বসানো কোনায় কোনায় মৃত রাজা আর রানীদের ছবি - গভীর দৃষ্টিতে তারা তাকিয়ে আছে মাঝখানে শোভা বর্ধন করছে সাদা টুপি মাথায় মহিমাষিতা বাক্কুমারীরা আর মাছি-বসার দাগে কলঙ্কিত সম্রাট নিকলাই আলেক্সান্ড্রভিচ

নীরবতা ভঙ্গ করে মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ বলল, ‘তা হলে হ্যাঁ আমরা আমাদের মেয়ে দেব বলে ঠিক করেছি এখন আমাদের মধ্যে বোঝাপড়াটা হয়ে গেলেই আমরা কুটুম্বিতা পাতাতে পারি

ঠিক এই মুহূর্তে ইলিনিচনা তার ফোনা-হাতা চকচকে জামার কোন এক লুকানো গহ্বর থেকে বৃষ্টি বা পিঠের ওপাশের কোন এক জায়গা থেকে একটা ইয়া লম্বা সাদা বুটি টেনে বার করে ধপাস করে টেবিলের ওপর রাখল

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ কেন যেন ক্রুশ করতে চাইল কিন্তু তার দাঁড়ার মতো বাঁক খরখরে আঙুলগুলো ক্রুশ করার ভঙ্গিতে একত্রিত হয়ে উল্লিত পথের অর্ধেক পর্যন্ত উঠে ইঠাৎ অন্য রূপ নিল - কর্তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে মোটা নবসৃষ্ট কালো বুড়ো আঙুলটা অপ্রত্যাশিত ভাবে তর্জনী আর সধ্যমার ফাঁকে ঢুকে গেল আঙুলের এই নির্লব্ধ গোছাটা চোরের মতো সুবুৎ করে নীল রঙের লম্বা কোটের ঠেলে-ওঠা কিনারার ভেতরে ঢুকে গিয়ে সেখান থেকে ঘাড় ধরে টেনে বার করল লাল-মাথাওয়ালা একটা বোতল

এবারে আসুন তাহলে আমাদের প্রিয় বেয়াই আর বেয়ান, ভগ্নবানের নাম করে একটু মদ খেয়ে আমাদের সম্ভানদের বিবয়ে আর দেয়া-ধোয়ার ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করা যাক

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ গদগদ হয়ে চোখ পিটপিট করতে লাগল, ভাবী বেয়াইয়ের ছিটছিট দাগে ছাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে ঘোড়ার খুরের মতো চওড়া হাতের তালু দিয়ে সে সপ্নেহে বোতলটার তলায় চাপড় মারল

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই দুই বেয়াইকে এত কাছাকাছি ঘেষে বসে থাকতে দেখা গেল যে মেলেখভের কালো কুচকুচে দাড়ির কুণ্ডলীগুলো কোরশুনভের কটারঙের

সোজা দাড়ির গোছা স্পর্শ করতে লাগল পাত্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ নিঃশ্বাসের সঙ্গে নুনে জারানো শসার চাটের ভুরভুরে গন্ধ ছাড়তে ছাড়তে মেওয়া-খোয়ার কথা চালিয়ে যেতে লাগল।

‘আমার প্রাণের বেয়াই মশাই,’ নীচু গলায় গুনগুনিয়ে সে শুরু করল, ‘আমার প্রাণের বেয়াইমশাই গো’ হঠাৎ সে গলা চড়িয়ে চিৎকার করে উঠল। ‘বেয়াই মশাই’ কালো কালো ভোঁতা মাটির দাঁত বার করে সে গর্জন করে উঠল। ‘আপনার দাবি-মাওয়া মেটানো আমার একেবারে সাধির বাইরে। একবার ভেবে দেখ, ভালো করে ভেবে দেখ গো বেয়াই মশাই, কী বেকায়দায় ফেলার চেষ্টা করছ আমাকে - জুতোর গোড়ালি থেকে হাঁটু পর্যন্ত গরম কাপড়ের পাটি, তার সঙ্গে গাম্বুট এক, লোমের কোট দুই, দুটো পশমী শোশাক তিন, ত্রেশমী বুয়াল চাব এ যে একেবারে ফতুর হবার জো।’

পাত্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ বিস্মৃত করে দু’হাত ছড়াল। সঙ্গে সঙ্গে পরনের কসাক দেহরক্ষী সৈনিকের উদ্দিটা দুই কাঁধের কাছে সেলাইয়ের জায়গায় টান লেগে পটপট করে খানিকটা ধুলো ওড়াল মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ মাথা নীচু করে তাকিয়ে বইল ভোদকা আর জারানো শসার জলে দ্রাবিত অয়েল ক্রুথটার দিকে সে পড়ল মাথার দিকে সুন্দর করে পাকিয়ে পাকিয়ে নজ্রার মতো করে লেখা - ‘সারা রাশিয়ার সার্বভৌম অধিপতিবর্গ’ তারপর চোখ বুলাল আরও একটু নীচে। ‘মহামানা সম্রাট বাহাদুর নিকলাই’ বাকিটা ঢাকা পড়ে গেছে আলুর খোসায়। ছবিটার দিকে মনোযোগ দিল সম্রাটের মুখটা নজরে পড়ছে না ওই জায়গায় ভোদকার খালি বোতল থাকায় চাপা পড়ে গেছে। মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ শ্রদ্ধাভরে চোখ পিটপিট করতে করতে কোমরে সাদা বেলট আঁটা দামী উদ্দিটার আকার নিরীক্ষণ করার চেষ্টা করল। কিন্তু ওখানে ঘন হয়ে জমে আছে ধু ধু করে ছিটানো শসার পিছল বীচি একই রকম দেখতে ফেকাশে চেহারার কন্যাবর্গ পরিবৃতা হয়ে একটা চওড়া কানাওয়াল টুপির তেতর থেকে আশ্চর্য্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন সম্রাজ্ঞী

মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচের মনে এত কষ্ট হল যে তার চোখে জল এসে গেল, সে মনে মনে ভাবল ‘এখন বেশ মেমাক দেখছি যেন বুড়ির তেতর থেকে বেরিয়ে এলো মাদী রাজহাঁসটি। আচ্ছা, আমিও দেখব মেয়েদের ত বিয়ে দিতে হবে তখন দেখা যাবে তোমার হালটা কেমন হয়।’

তার কানের কাছে একটা বিরাট কালো ভ্রমরের মতো গুনগুন করে চলেছে পাত্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ।

জলভরা কাপসা চোখ মেলে তার দিকে তাকিয়ে কোকশুনভ শুনতে লাগল

তোমার মেয়েকে এখন অবিশ্যি একই কথা - আমার মেয়েও বল-  
তে পার তোমার আর আমার আমাদের মেয়েকে এ পরিমাণ পণ  
দিতে গেলে এই ক্ষুতোর গোড়ালি থেকে হাঁটু পর্যন্ত গরম কাপড়ের পটি  
আর তার সঙ্গে গামবুট লোমের কোট এসব দিতে গেলে আমাদের গোন্ধুবাছুর  
খামার থেকে বার করতে হয়।

‘দুঃখ হচ্ছে বুঝি?’ মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ টেবিলের ওপর ঘুসি মেরে বলল

‘দুঃখ হবার ব্যাপার ঠিক নয় ’

‘দুঃখ হচ্ছে?’

‘সবুর, সবুর বেয়াইমশাই ’

‘দুঃখ যদি হয় তাহলে চুলোয় যাও ’

মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ তার ঘামে ভেজা হাতখানা টেবিলের ওপর রেখেছিল।  
এবারে কথা বলতে বলতে হাতটা টেবিলের ওপর চালিয়ে দিতে মদের গলাসগুলো  
ছটকে পড়ল মেঝেতে।

‘কিন্তু অমন করলে ত ওই টাকা উশূল করার জন্যে তোমার মেয়েকেই  
বাটতে হবে।’

‘তা হোক পণ ছাড় নইলে এ সম্বন্ধ হবে না।

‘গোন্ধুবাছুর বেচতে হবে যে।’ পাঙ্কেলেই প্রকোফিয়েভিচ মাথা নাড়ল তার  
কানের মাকড়িটা সামান্য টিকটিক করে উঠল

‘পণ না হলে কেমন দেখায়। ওর এক বাগ্ন বোঝাই সাজপোশাক  
আছে। কিন্তু আমাদের মেয়ে তোমাদের যদি পছন্দই হয়ে থাকে তাহলে  
আমাকেও সম্মান দেখাবে ত এটা আমাদের কসাক প্রথা। সেকালে এই  
রকম ছিল সেকালের প্রথা আমাদের মেনে চলা উচিত।’

‘সে সম্মান আমি দেখাব।’

‘তাহলে দেখাও।

‘দেখাবই

‘আর খাটাখাটুনির কথা যদি শুনে তাহলে যাদের সঙ্গে বিয়ে হল তারা  
খাটুক! আমরা অনেক খেটেছি তা সে মরুক গে বলতে নেই  
অন্যদের চেয়ে আমরা খারাপ নেই তাহলে ওরাই বা খেটে রোজগার করবে না  
কেন?’

দুই বেয়াইয়ের দাড়ি মিলেমিশে বিচিত্রবর্ণের কঞ্চির বেড়ার মতো দেখাতে  
লাগল পাঙ্কেলেই প্রকোফিয়েভিচ একটা শূকনো রসকম্বইীন শাসা গিলে বেয়াইয়ের  
চুলোর খাড়াটা ভেতরে পাচার করে দিল নানা ধরনের অনুভূতি মনের ভেতরে

মিলে একাকার হয়ে যেতে সে কৈদে ফেলল

এদিকে দুই বেয়ানে গলা জড়াজড়া করে একটা সিন্দুকের ওপর বসে কলবল করে একে অন্যের কান ঝালাপালা করে দিচ্ছে ইলিনিচনা চেঁরী ফলের মতো লাল টকটকে হয়ে উঠেছে, কিন্তু তার বেয়ানটি ভোদকার কল্যাণে হয়ে উঠেছে শিল পড়ে দড়কচামারা শীতের বুনো নাসপাতির মতো সবজেটে

‘অমন মেয়ে দুনিয়ার আর দুটি হয় না’ কথার বাধ্য, গুরুজনদের মানি করতে জানে হাতের বাইরে ও কব্বখনো যাবে না এটা বলে দিতে পারি। কারও মুখের ওপর চোপা করবে সে সাহস ওর হবে নি গ্যে বেয়ান ঠাকবুন

‘আ-হা-হা, বেয়ান ঠাকবুন গো আমার,’ বাঁ হাত গালে ঠেকিয়ে, ডান হাতের ওপর বাঁ হাতের কনুই ভর দিয়ে তার কথার মাঝখানে ইলিনিচনা কল, ‘কতবার পই পই করে বলেছি শুরোরের বাচ্চাটাকে এই ত এই রোববারই সন্দেবেলায় বেরোতে যাচ্ছিল। তামাকের ধলেতে তামাক পুরছে তখন আমি ওকে বললাম ওটাকে কবে ছাড়বি বল ত লক্ষীছাড়া? এই বুড়ো বয়সে আর কত দিন এ লক্ষ্মী আমাকে সইতে হবে? আর এই শুপানটা ত এক লহমার মধ্যে তোর ঘাড় মটকে দিকে পারে।’

রায়দার থেকে দরজার ওপরকার একটা ফাটল দিয়ে বাইরের ঘরে উঁকি মারছে নাভালিয়ার ভাই মিতকা। নাভালিয়ার ছোট বোনদুটি নীচে নিচ্ছেদের মধ্যে কিসকাস করতে লাগল

নাভালিয়া দূরে কোণের ঘরে তক্তপোষের ওপর বসে বসে জামার আঁটো হাতায় চোখের জল মুছতে লাগল। একটা নতুন জীবনের দ্বারপ্রান্তে এসে তার ভয়-ভয় করতে লাগল, অনিশ্চিতের আশঙ্কায় সে শঙ্কিত হয়ে উঠল।

ভেতরের বড় ঘরে ততক্ষণে তৃতীয় বোতল খালি হতে চলেছে ঠিক হল আগস্টের প্রথম দিকে বরকনের দু’হাত এক করা হবে।



কোরশুনভদের বাড়িতে বিয়ের জোড়ছোড় চলছে। সারা বাড়িটা সরগরম হয়ে উঠেছে কনের জন্য খুব তাড়াতাড়ি কিছু জামাকাপড় সেলাইয়ের কাজ শেষ করা হচ্ছে নাভালিয়া রোজ সন্ধ্যায় বসে বসে এখানকার চিরাচরিত প্রথামতো ছাগলের ধোঁয়া-ধোঁয়া রঙ ফুরফুরে পশমে বরের জন্য স্বার্থ আর দস্তানা বুনতে থাকে



নাতালিয়ার মা লুকিনিচনা সঙ্কের অঙ্ককার ঘনি়ে না আসা পর্যন্ত সেলাই-কলেব ওপর হুমড়ি ঝেয়ে পড়ে থাকে। তাকে সাহায্য করার জন্য সদর থেকে এক মেয়ে-দর্জিকে ডেকে আনা হয়েছে।

মিত্কা তার বাবা আর খুনিষদের সঙ্গে ক্ষেতের কাজ সেয়ে ফিরে এসে হাত পা না ধুয়ে, কড়া পড়া পা থেকে ক্ষেতে কাজ করার ভারী জুতো না খুলেই সোজা চলে যায় বাইরের ঘরে নাতালিয়ার কাছে। গিয়ে তার পাশটিতে বসে বোনের সঙ্গে খুনসুটি করে সে বড় মজা পায়।

‘বুনছিস বুঝি?’ স্কার্ফের ফুরফুরে রৌয়াগুলোর দিকে চোখের ইশারা করে সে সংক্ষেপে জিজ্ঞেস করে

‘হ্যাঁ বুনছি তোর তাতে কী রে?’

‘কী বোকা, কী বোকা! বুনো বা, বুনো যা যার জন্যে তুই বুনছিস সে কিছু তোকে ভালো ত বলবেই না উল্টে তোর খোঁতা ভেঙে দেবে’

‘কেন? কিসের জন্যে?’

‘কেন আবার? অমনি খ্রিশ্কাকে আমি জানি, ওর সঙ্গে আমার খাতির আছে মরদ বটে কুস্তার মতন কামড়াবে, কিন্তু বলবে না কেন।’

‘আজ্ঞেবাজে বকিস নে আমি যেন আর জানি নে ওকে

‘আমি ত আরও ভালো জানি। আমরা একসঙ্গে দুলে বেতাম।’

মিত্কা ভান করে একটা ভারী দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল লম্বা চওড়া গিঠটা সামনের দিকে ঝুকিয়ে বিদার ঘসায় ক্ষতবিক্ষত হাতের তালু নিরীক্ষণ করতে লাগল

‘ওর জন্যে তুই যে অমন হেসিয়ে মরছিস এতে তুই কিছু যায় থাকি রে নাতাশা তার চেয়ে বরং আইবুড়ো হয়েই থাক। ওর মধ্যে ভালোটা তুই কী দেখলি বল ত? আঁ? এতই কুছিত যে ঘোড়ায় চড়েও ওর সামনে আসতে প্রবৃত্তি হয় না। কেমন যেন বোকা-বোকা একটু ভালো করে দাখ, তাহলেই বুঝতে পারবি একটা বিস্তী ছোঁড়া।’

নাতালিয়া বেগে যায়, চোখের জলে তার গলা বুজে আসে, মুখের চেহারা তার করুণ হয়ে ওঠে। সে স্কার্ফের ওপর ঝুকে পড়ে

‘আর সবচেয়ে বড় কথা ওর বুকে ছালা খরানোর মতো মেয়ে আছে’

মিত্কা নির্মম টিপ্তনী কাটল ‘কেন তুই অমন চিংকর-চোঁচোমেচি করে অনর্থ বাধাচ্ছিস? তুই একটা বোকা মেয়ে রে নাতালিয়া হাঁকিয়ে দে। আমি একুনি ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে যাচ্ছি, গিয়ে বলে আসি আর বাপু এনো নি তোমরা’

এই অবস্থায় নাতালিয়াকে উদ্ধার করে ওদের ঠাকুরদা খ্রিশ্কা হাতের গিঠগিঠ লাঠি দিয়ে ঠুকে ঠুকে মেঝেটা কতখানি মজবুত যেন পরীক্ষা করে

দেখতে দেখতে ভেতরের বড় ঘরে এসে ঢেকে সে তারপর শগের নুড়ির মতো জটা ধরা হলুদ দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে লাঠি দিয়ে মিত্কার গায়ে খোঁচাঝেঁরে জিহ্বাস করে, 'এই হতচ্ছাড়া বাদর, তুই এখানে কী বলে আঁ?'

'এই একবার চোখের দেখা দেখতে এসেম দাদু,' মিত্কার কৈফিয়তের সুরে বলে।

'চোখের দেখা দেখতে? বটে? তবে রে বাদর, এখান থেকে যা বলছি। সেলি? কুইক মার্চ!'

কাঠির মতো সবুসবু শুকনো জিহ্বাজিরে পায়ে টলমল করতে করতে লাঠি ঘুরোতে ঘুরোতে বুড়ো এগিয়ে যায় মিত্কার দিকে।

গ্রিশাকা ঠাকুরদা উনসত্তর বছর বিচরণ করছে এই ধরাধামে। ১৮৭৭ সালে তুর্কীদের বিরুদ্ধে অভিযানে বোণ দিয়েছিল এক সময় জেনারেল গুর্কার আদালিও হয়েছিল, কিন্তু বিরাগভঞ্জন হওয়ায় ফিরে আসতে হয় রেজিমেন্টে প্লেডনার্য আর রোশিচে সামরিক কতিভের জন্য দুটো সেন্ট জর্জ ক্রস ও একটা সেন্ট জর্জ মেডেল পায়। এখন সে তার ছেলের বাড়িতে বাকি জীবনটা কাটাচ্ছে। এই বুড়ো বরসেও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার জন্য, তার অকলুষ সত্যতা ও আতিথেয়তার জন্য গ্রামে সে সর্বসাধারণের আদার পাত্র। সামনে অবশিষ্ট আর যে দিনগুলি পড়ে রয়েছে সেগুলো তার কাটছে স্মৃতিচারণ করে।

গরমকালে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সে বাড়ির বোরাকের ওপর বসে থাকে, লাঠি দিয়ে উঠোনে আঁকিইঁকি কাটে, মাথা নীচু করে যত রাজ্যের কথা চিন্তা করতে থাকে। বিশ্বস্তির অঙ্ককার গছের ফুঁড়ে স্মৃতিচারণের অনুচ্ছল প্রভার সুপ ধরে তার সেই ভাবনাচিন্তাগুলো ভেসে আসে অস্পষ্ট, ছাড়া ছাড়া নানা চিন্তায় সে বিভোর হয়ে পড়ে।

তার মাথার রংচটা কসাক টুপি় টুটোফটা কানাতটা থেকে কালো ছায়া পড়ে তার বোজা চোখের কালো কালো পালকের ওপর। সেই ছায়ার গালের বলিরেখাগুলো আরও গভীর দেখায়। পাকা দাড়িতে নামে নীল রঙের ঢল লাঠি আঁকড়ে ধরে থাকা বীকা আঙুলগুলোর ভেতর দিয়ে, হাতের কবজি আর ফুলো ফুলো কালো শিরাগুলোর ভেতর দিয়ে মন্থর গতিতে বয়ে চলেছে ক্ষেতের কালো মাটির মতো কালো-কালো রক্ত।

যত দিন যাচ্ছে তত ঠাণ্ডা হয়ে আসছে রক্ত। গ্রিশাকা দাদু তার আদরের নাতনী নাতালিয়াকে দুঃখ করে বলে, 'দ্যাখ দেখি, পশমের মোজামণ্ড আমার পাগুলো গরম হচ্ছে না! লক্ষ্মী সোনা মেয়ে, তুই আমাকে কুবুশ কাটায় একজোড়া মোজা বুনে দে।'

'বলছ কি দাদু! এখন যে ডর গ্রীষ্মকাল।' হাসতে হাসতে নাতালিয়া বলে

তারপর দাদুর পাশে রোয়াকের ওপর বসে পড়ে তার বলিরেখা আঁকা হলুদ রঙের বড় কানের দিকে তাকিয়ে থাকে।

‘তাহলে কী হবে রে দিনিভাই গরম হলে কী হবে গায়ের রক্ত যে এদিকে বহু নীচের মাটির মতো ঠাণ্ডা মেয়ে গেছে।’

নাতালিয়া দাদুর শিরা-জাল সমাকীর্ণ হাতের দিকে তাকায় তার মনে পড়ে যায় যখন সে খুবই ছোট সেই সময় একবার উঠোনে ইঁদারা ঝোঁড়া হজ্জিল তখন একটা বালতি থেকে খানিকটা ভিজে কাদামাটি নিয়ে ভারী ভারী কতকগুলো পুতুল আর খুরখুরে শিঙাওয়ালা কয়েকটা গোবু বানিয়েছিল তার এখনও বেশ মনে পড়ে ঐতিশ্য হাত নীচেকার গভীর তলা থেকে ওঠানো মাটির নিষ্প্রাণ হিমশীতল স্পর্শ।

ঘটনাটা মনে পড়তেই সে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে তাকাল তার দাদুর বার্থকোর দখুন বাদামী ছোপ ধরা মাটি-রঙের জরাগ্রস্ত হাতের দিকে।

নাতালিয়ার মনে হল দাদুর হাতের শিরার ভেতরে লাল টকটকে টগবগে রক্তধারার বদলে যেন বইছে বাদামী-নীল দো-আঁশ মাটি।

‘তুমি কি মরতে ভয় পাও দাদু?’ সে জিজ্ঞেস করে

প্রশ্নাকা দাদু যেন তার নোংরা হেঁড়া উদীর খাড়া কলারের ভেতর থেকে মুক্ত করার চেষ্টায় বলিরেখাময় শিরা ওঠা লিকলিকে ঘাড়টা খোঁরায়, সবজেষ্টে ছাইরঙা গোঁফজোড়া নাড়ে

‘লোকে যেমন অতিথি দেবতার জন্যে বসে থাকে তেমনি বসে আছি মরণের অপেক্ষায় আর কেন? সময় ত হয়ে এলো জীবনটা কাটিয়ে দিলাম, জ্বরের সেবা কবলাম, ভোদকাও এই জীবনে কম খেলায় না, চোখের বলিরেখা কাঁপিয়ে, একগাল সাদা ঝকঝকে দাঁত বার করে হেসে সে যোগ করে

নাতালিয়া দাদুর হাতে হাত বুলিয়ে চলে যায়। এদিকে বুড়ো তখনও কুঁজো হয়ে রোয়াকে বসে বসে হাতের লাঠি দিয়ে মাটিতে আঁচড় কাটে। লাঠির হাতলের কাছটা ঘসে রক্ত চটে গেছে, তার গায়ের ছাই ছাই উদ্ভিটার বহু জায়গায় রিফু করা কিন্তু শক্ত খাড়া কলারের গায়ে যৌবনের উজ্জলতা ও চাকল্যের পরিচয় দিয়ে খুশিতে হাসছে লাল রঙের কলার-ব্যাঙ্ক।

নাতালিয়ার বিয়ে হতে চলেছে এই সংবাদটা বুড়ো বাহ্যত শান্ত ভাবে গ্রহণ করলেও মনে মনে তার ধুংস হয়েছ, রাগ হয়েছে। খাবার টেবিলে নাতালিয়া ভালো ভালো খাবারের টুকরোগুলো তার পাতে তুলে দিত, নাতালিয়াই তার জামাকাপড় ধুত, মোজা রিফু করত, বুনত, তার সালোয়ার ও জামা মেয়ামত

করত। তাই ব্যাপারটা জ্ঞানতে পেরে গ্রিশাকা দাদু দু'দিন হল ওর দিকে বেজায় কটমট করে তাকচ্ছে।

‘মেলেন্থভরা নাম করা কসাক। স্বর্গীয় প্রকোফি মহাশয় সত্যিকারের সাহসী কসাক ছিলেন কিন্তু ওদের নাভিরা কেমন হয়েছে? আঁ?’

‘নাভিরাও মন্দ নয়, দায়সারা গোছের উত্তর দিল মিলোন থ্রিগোরিয়েভিচ

‘গ্রিশাকাটা ত একটা বদ ছোকরা, গুরুজনদের কোন ভক্তিশ্রদ্ধা করে না এই সেমিন গির্জের থেকে বাড়ি ফিরছি, পথে মেঝে, নচ্ছারটা নমস্কার পর্যন্ত করল না আজকাল আর কোকে বুড়োদের কোন ভক্তিশ্রদ্ধা করে না’

‘ছেলেটা কিন্তু বেশ মিষ্টি স্বভাবের,’ ভাবী জামাতার পক্ষ নিয়ে লুকিনিচনা বলল

‘তাই নাকি? বলছ, মিষ্টি স্বভাবের? ভগবান করুন, তাই ফেন হয়। তাছাড়া নাভালিয়ার যখন পছন্দ

বিয়ের কথাবার্তার মধ্যে গ্রিশাকা দাদু যোগ দিল না বললেই চলে অল্প সময়ের জন্য সে তার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে টেবিলের ধারে বসে, অতি কষ্টে সঙ্কীর্ণ কঠিনালীর ফাঁক দিয়ে এক গেল্যাস ভোদকা ভেতরে চালান করে দেয় তার শরীর গরম হয়ে ওঠে, কিন্তু কেমন মাতাল-মাতাল লাগছে উপলব্ধি করার সঙ্গে সঙ্গে স্থান ত্যাগ করে

দু'দিন ধরে নীরবে সে উদ্বেগাকুল ও খুশিতে ভগমগ নাভালিয়াকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল, সবজেরটে রঙধনু সাদা গৌফের বিপুল গোছা নাভাল। শেবকালে বোধহয় তার মন কিছুটা নরম হল।

‘নাভাশা রে. ও নাভাশা’ সে তাকে ডাকল নাভালিয়া কাছে এলো।

‘তুই খুশি ত রে দিদিভাই? আঁ?’

‘আমি নিজেই বুঝতে পারছি না দাদু,’ নাভালিয়া স্বীকার করল

‘বটে বটে বটে দেখ কাণ্ড। যাক সে যিশু তোর সহায় হোন। ভগবান মঙ্গল করুন। তারপর বিব্রত হয়ে ভিত্তকণ্ঠে ভর্ৎসনার সুরে বলল, ‘আমার মরা পর্যন্ত সবুর করতে পারলি নে মুখপুড়ী। আমি মরে যাবার পর বিয়েটা হলেই ত হত! তোকে ছাড়া আমার জীবন যে ফাঁকা হয়ে যাবে রে’

রান্নাঘর থেকে ওদের কথাবার্তা শুনতে পেয়ে মিতকা বলল

‘তুমি হয়ত আরও একশ বছর বাঁচবে দাদু। ও এত দিন অপেক্ষা করে থাকবে নাকি? আচ্ছা চিক বটে তুমি।’

গ্রিশাকা দাদুর মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠে শেষকালে কালো হয়ে গেল তার গলা প্রায় বুকে এলো হাতের লাঠি আর দু'শা মেঝেতে ঠুকে বলল

‘চোপ হারামজাদা, শূয়োরের বাচ্চা! গেলি ভাগ বলছি! হতভাগা শয়তান! ব্যাটা আবার কান পেতে শুনছিল দেখ

মিত্কা মুচকি হেসে ছুটে উঠানে বেরিয়ে গেল এদিকে বুড়ো দাদু অনেকক্ষণ ধরে রাগরাগি করতে লাগল, মিত্কাকে গালাগাল দিয়ে চলল, খাটো পশমী মোজার ওপর বৃটজুতো পরা তার পাদুটো হাঁটুর জায়গায় ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল

নাতালিয়ার দুই বোন বছর বারো বয়সের কিশোরী মারিশকা আর আট বছরের বিল্ছু, আদুরে মেয়ে জিশ্কা অধীর আগ্রহে বিয়ের দিন গুনতে লাগল।

যে সব মুনিষ স্থায়ী ভাবে কোরশুনভদের কাছে বাস করে তাদের মধ্যেও চাপা খুশির ভাব দেখা গেল প্রভুর কাছে তারা ভূরিভোজের প্রত্যাশা করছিল। তাদের আশা ছিল এই উপলক্ষে দিন দুয়েক ছুটি পাওয়া যাবে তাদের মধ্যে একজন- তালগাছের মতো চ্যাঙা, ইউক্রেনের বগুচার অঞ্চলের লোক পদবীটাও তার উদ্ভট! হেটমাগী বছরে দু'বার মদ বেয়ে চুর হয়ে থাকত। সেই সময় সে তার সর্বস্ব এবং উপার্জনের শেষ কপর্দক পর্যন্ত উড়িয়ে দিত তার সেই ভেতরে ভেতরে শুষে থাওয়া, গা-গোলানো পরিচিত উপলব্ধিটা অনেক দিন হলেই তাকে নাড়া মিজিল। কিন্তু সে নিজেকে সামলে রেখেছে বিয়ের আসর দিয়েই সে তার পানপর্ব শুরু করবে বলে ঠিক করে রেখেছে।

আরেকটি মুনিষ এক স্কীমেই কসাক, রোদে পোড়া গায়ের রঙ নাম মিখেই। লোকটা এসেছে মিগলিন্‌স্কা সদর থেকে সবো বাস করতে শুরু করেছে কোরশুনভদের কাছে। অগ্নিকাণ্ডে সর্বস্বান্ত হয়ে মুনিষের কাছে ভাড়া খাটিতে এসেছে হেটের সঙ্গে (হেটমাগীকে সংক্ষেপে এই বলেই ডাকা হয়) তার ভান্নী ভাব সে-ও অবরে-সবরে মদ বেতে শুরু করে দিয়েছে লোকটা ঘোড়ার দাবুণ ভক্ত মদ খেয়ে সে কৈদে ভাসিয়ে দিত হাড়গোড় বার করা, তুবুলেশহীন মুখটা চোখের জলে একাকার হয়ে যেত সে তখন মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচের পেছনে লেগে থাকত

‘কর্তামশাই! ওগো, আমার কর্তা গো মেয়ের যখন বিয়ে দেবে তখন মিখেইকে বিয়ের গাড়ি চালাতে দিয়ো গো! আমি এমন ভাবে চালাব না সবাই হাঁ করে চেয়ে দেখবে জ্বলন্ত আগুনের ভেতর দিয়ে চালিয়ে যাব ঘোড়ার একটা চুলও পুড়বে না আমার নিজেরই ঘোড়া ছিল যে। এঃ!’

হেট সব সময় বিষন্ন হয়ে থাকত, লোকজনের সঙ্গে বিশেষ মিশত না কিন্তু মিখেইয়ের সঙ্গে তার কেন যেন একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। একই ঠাট্টার কথা বলে মিখেইকে সে খেপায়

‘মিখেই, শুনছিস? কোন সদরের লোক যেন তুই?’ আজানুলস্থিত হাতদুটো কচলাতে কচলাতে সে জিজ্ঞাস করে তারপর নিজেই উত্তর দেয় গলার স্বর পালাটে ‘মিগুলেভ্কারা, না?’ ‘তাহলে তুই অমন শূটকো কেন রে?’ ‘আরে আমাদের খাতই হল ওই।’

বারবার এই একই মন্তব্য করবে, আর নিজের মন্তব্য নিজেই কর্কশ হবে হ্যাঁ হ্যাঁ করে হাসবে তারপর নিজের শুকনো পায়ের নলিতে হাত দিয়ে এমন চাপড় মারবে যে সেগুলো ঝনঝন করে উঠবে মিখেই তখন হেটের নিখুঁত কামানো মুখের দিকে ঘণাভরে তাকায়, দেখতে পায় ওর গলার ভেতরে কঠমণিটা কীপছে মিখেই ওকে ‘ভুতোম পাঁচা’ ‘খোস পাঁচড়া’ বলে গালাগাল দিতে থাকে।

সাপ্তিক আহার পর্বের পর সেপ্টেম্বরের প্রথম যে দিন থেকে শাস্ত্রমতে মাংসভক্ষণ প্রাপ্ত, সেই দিন বিবাহ ধর্ম হল আর তিন সপ্তাহ বাকি ‘মাতা মেরীর স্বর্গারোহণ দিনে’ গ্রিগোরি এলো তার ভাবী বধূকে দেখতে। ভেতরের বড় ঘরে গোল টেবিলের ধারে মেয়ে-পরিবৃত হয়ে—কনের সখীদের সঙ্গে বসল তাদের সঙ্গে সূর্যমুখী ফুলের বাঁচি আর বাদাম ভেঙে ভেঙে খেল তারপর চলে গেল। নাতালিয়া ওকে এণিয়ে দিতে গেল গ্রিশ্কার ঘোড়ার পিঠে ঝকঝকে নতুন জিন চাপানো হয়েছে। চালার নীচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘোড়াটা জাবনা খাচ্ছিল সেখানে আসার পর নাতালিয়া তার বুকের কাছে জামার ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিল। লজ্জায় লাল হয়ে প্রেমার্ত চোখে গ্রিগোরির দিকে তাকিয়ে তার হাতে একটা দলা পাকানো ছোট্ট কাপড়ের টুকরোর মতো কী যেন একটা জিনিস গুঁজে দিল। কুমারী মেয়ের বুকের ছোঁয়ায় সেটা তখনও গরম। উপহারটা ওর কাছে থেকে নেওয়ার সময় গ্রিগোরি নেকড়ের দাঁতের মতো সাদা ঝকঝকে দাঁতের পাটি বার করে নাতালিয়ার চোখ ধাঁধিয়ে দিল জিজ্ঞাস করল, ‘এটা কী?’

‘পরে দেখো। একটা তামাকের থলি বুনেছি।’

গ্রিগোরি ইতস্তত করে ওকে কাছে টেনে নিল। চুমু খেতে গেল কিন্তু নাতালিয়া দু’হাতে গ্রিগোরির বুকে ঠেলা দিয়ে জোর করে তাকে সরিয়ে দিল একেবেঁকে পেছনে সরে গিয়ে বাড়ির জানলাগুলোর দিকে শক্তিত দৃষ্টিতে তাকাল

‘দেখতে পাবে।’

‘সেবুক গে।’

‘লজ্জা করছে।’

এই প্রথম কিনা তাই, গ্রিগোরি ওকে কাবণটা বুঝিয়ে বলল

নাতালিয়া ঘোড়ার মুখের কাছের লাগাম ধরল। গ্রিগোরি চোখ কঁচকে রোকাবের খাঁজে পা গলিয়ে দিল। জিনের গদির ওপর ঠিকঠাক হয়ে বসে উঠোন

শেরিয়ে চলে গেল। নাভালিয়া ফটক খুলে দিল। হাতের তালু দিয়ে আলো থেকে চোখ আড়াল করে মেঝেতে লাগল তার যাওয়া। খিগোরি খাঁ দিকে সামান্য হেলে কালমিকদের ভক্তিতে বসেছে ঘোড়ার শিঠে, মহা ফুর্তিতে চাবুক দোলাচ্ছে

‘আরও এগারো দিন, নাভালিয়া মনে মনে হিসাব করল। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে হেসে উঠল

## শিশু

গমের চারার সবুজ ঝুঁচের মতো পাতা দেখা দিয়েছে, বেড়ে উঠছে আর মাস দেড়েকের মধ্যে দাঁড়কাক এই ক্ষেতের ভেতর দিয়ে হেঁটে গেলে তার মাথা চোখে পড়বে না। মাটির ভেতর থেকে রস টেনে শিশু বেরিয়ে আসছে। তারপর গুলো ফুটবে, সোনালি রংগে ঢেকে যাবে সুগন্ধী মিষ্টি দুধে ফুলে উঠবে গমের দানা। চাষী এসে দাঁড়াবে স্তম্ভের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে, দেখবে দেখে দেখে তার আর আল মিটেবে না। কিন্তু কোথা থেকে যেন, কে জানে একপাল গোবু বাছুর এসে ইতিমধ্যে ফসলের ক্ষেত মাড়িয়ে গেছে খুর দিয়ে মাড়িয়ে তছনছ করে গেছে, খেঁচো করে দিয়ে গেছে ভারী শিকগুলো যেখান যেখান দিয়ে তারা গেছে কসল ধামসে পড়ে আছে, বিস্তীর্ণ লাগে, মেখে মুখে হয়

আগ্নিনিয়ারও মনের অবস্থা হল সেই রকম সোনালি ফুল হয়ে প্রস্ফুটিত তার উপলব্ধিকে খিগোরি যেন কাঁচা চামড়ার ভারী জুতোয় মাড়িয়ে চলে গেল কালি লেগে দিল, পুড়িয়ে ছাই করে দিল - এখন সব শেষ

মেলেকভদের সূর্যমুখী ক্ষেত থেকে ফেরার পর আগ্নিনিয়ার মনটা শূন্য হয়ে পড়ল। খাঁ খাঁ করতে লাগল - যেন বুনা শাকপাতা আর আগাছায় ছেঁয়ে গেছে ফসল মাড়াইয়ের একটা পরিত্যক্ত উঠোন

বুমালের খুঁট চিবোতে চিবোতে সে পথ হেঁটে চলল। তার গলার ভেতর থেকে ঠেলে উঠতে চাইছিল আর্জিৎস্কার ভেতরের বারাম্বায় এসে মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়ল সে। চোখের জলে, তীব্র যন্ত্রণার, মাথার ভেতরে একটা চরম শূন্যতাব চাবুক খেয়ে তার দম আটকে আসছিল। পরে সব দূরে সরে গেল হৃদয়ের গভীর তলে কোথায় যেন সেই দহন জ্বালা স্তব্ধ ভাবে, ধিকিধিকি জ্বলতে থাকে

গোবু বাছুরের খুরে মাড়ানো ফসলও আবার মাথা তোলে শিশিরে ভিজে সূর্যের তাপ পেয়ে আবার ঝাড়া হয়ে ওঠে মাটির সঙ্গে পিবে যাওয়া ফসলের

শিব, প্রথমে অসহ্য ভারী বোঝার ভারে ডেঙে-পড়া মানুষের মতো নুইয়ে নুইয়ে পড়ে। তারপর সোজা হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। তখন সেই আগের মতোই দিনের আলো তাকে উজ্জ্বল করে তোলে, সেই একই বাতাস তাকে দোলা দেয়।

রাতের বেলায় আকুল হয়ে স্বামীকে সোহাগ করতে করতে আঙ্গিনিয়া ভাবে অন্য আরেকজনের কথা। তখন তার বৃকের ভেতরের ঘৃণা এসে মেশে এক গভীর ভালোবাসার সঙ্গে। সে নারীর মাথায় তখন ঘোরে নতুন আরেক অপঘনের, সেই পুরনো কলঙ্কেবই পথ ধরার চিন্তা। সে মনে মনে ঠিক করল সৌভাগ্যবর্তী এই যে নাতালিয়া কোব্‌লুনভা, প্রেমের সুখ দুঃখ কোনটাই যার জানা নেই, তার কাছ থেকে গ্রিশকাকে ছিনিয়ে নিতে হবে। রোজ রাতে রাজ্যের যত চিন্তা তার মাথায় এসে ভর করে। শূকনো চোখে সে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকে, চোখ পিটপিট করে আর ভাবে তার ডান হাতের ওপর নিদ্রায় ভারী হয়ে পড়ে থাকে স্তম্ভপানের মাথাটা। ওর সুন্দর মাথাটার সামনের দিকে, একপাশে কৌকড়া চুলের লম্বা ঝুটি স্তম্ভপান আঘাখোলা মুখে নিশ্বাস নিচ্ছে। তার কালো হাতটা অসতর্ক ভাবে এসে পড়েছে বৌয়ের বৃকের ওপর। খাটখাটুনিতে চৌচির লোহার মতো কঠিন আঙুলগুলো থেকে থেকে নড়ছে আঙ্গিনিয়া ভাবে। মনে মনে হিসাব করে, আবার ভাবে তবে একটা সিদ্ধান্তেই তার আর কোন নড়চড় নেই। গ্রিশকাকে সকলের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবে, প্রেমের বন্যায় ভাসিয়ে দেবে তাকে, আগের মতো আবার অধিকার করবে তাকে।

মৌমাছি শরীরের ভেতরে তীক্ষ্ণ হুল ফুটিয়ে বেখে গেলে যেমন হয়, তার অন্তরের অন্তস্তলেও কোথায় যেন এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে খচখচ করে সেই রকম একটা জ্বালা।

এ হল রাতের বেলায় কিন্তু দিনের বেলায় ঘর-গেরস্থানির নানা ঝামেলা ও ব্যস্ততার মধ্যে তার এই সব ভাবনাচিন্তা তলিয়ে যায়। গ্রিশকার সঙ্গে কোথাও দেখা হয়ে গেলে সে ফেঁকাশে হয়ে ওঠে, গ্রিশকার জন্য ব্যাকুল তার সুন্দর দেহটা নিয়ে ওর পাশ দিয়ে যেতে যেতে ওর আদিম চোখের কালো তারার দিকে চেয়ে নির্লজ্জ আমন্ত্রণ জানান।

প্রতিবারই আঙ্গিনিয়ার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর গ্রিশকার মনে হয় যেন একটা উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষা তাকে ব্যাকুল করে তুলছে, তার ভেতরটা কুরে কুরে বাচ্ছে। সে তখন অকারণে রেগে ওঠে। যত ভাল ঝাড়ে দুনিয়াশা আর মার ওপরে তবে বেশির ভাগ সময়ই তলোয়ার হাতে নিয়ে পেছনের উঠোনে গিয়ে দাঁত মুখ খিচিয়ে, গালের মাংসপেশী ফুলিয়ে মাটিতে শক্ত-করে পৌতা মোটা মোটা উইলো গাছের ডালপালার ওপর ঝপাঝপ কোপ মারতে থাকে, কোপ মারতে মারতে



যেমে নেয়ে ওঠে এক সপ্তাহে সে ডালপালা কেটে ডাই করে ফেলে পাত্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ কানের মাকড়ির কিকিমিকি তুলে, চোখ পাকিয়ে গালিগালাজ করে

কী রকম নোংরা শয়তান দেখ' যা ডালপালা কেটেছে তাতে দুটো বেড়া হয়ে বৈচে বায়। ওঃ কী আমার বাহাদুর এসেছেন রে' খানকীর বাচ্চা! ওই ডালপালার মধ্যেই তোর যত জারিজুরি দাঁড়া না ছোঁড়া, পলটনের কাজে ত যেতে হবে, তখন দেখা যাবে কত কাঁটতে পারিস সেখানে তোদের মতো ছোকরাদের সূজুত করতে সময় লাগবে না'

### একুশ

কানে আনতে যাবার জন্য সাজানো হল চারটে জুড়িগাড়ি। উৎসবের সাজগোজ পড়ে ম্বেলখভদের বাড়ির উঠানে, গাড়িগুলোর সামনে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে লোকজন

পেরো হয়েছে মিতবর \* গারে চাপিয়েছে একটা কালো কোর্ড। তার পরনে দু'পাশে লাল ডোরা দেওয়া হালকা নীল রঙের সালোয়ার, বাঁ হাতের আঙ্গিনের ওপর বাঁধা দুটো সাদা বুয়াল \*\* গমের মতো সোনালি রঙের গৌফের ফাঁকে স্থায়ী ডাবে লেগে আছে মুচকি হাসি। তার জায়গা হয়েছে বরের পাশে

'ধাবড়াবি না গ্রিৎকা। মোরগের মতো মাথা উঁচু করে থাকবি। অমন গুম মেরে আছিস কেন?'

গাড়ির সামনে হৈ-হুয়া, গঙগোল

'মিতবর আবার কোথায় গেল। এখুনি বেরিয়ে পড়তে হয় যে

'দাদা গো, ও দাদা।'

'অ্যাঁ?'

'শুনতে পাচ্ছ? তুমি পরের গাড়িটাতে যেয়ো গো। বুঝলে?'

'গাড়িতে গদি বসানো হয়েছে ত?'

\* বাংলায় 'মিতবর' বা 'মিতবর' অর্থ হল বিয়ের সময় যে বালক বরের সহযাত্রী হয় ও পাশে থাকে এক্ষণেও বরের মিতা অর্থে তাকে সে বালক নয় তার ভূমিকা বয়সের গির্জায় বিবাহানুষ্ঠানের সময় বরের মাথার ওপর সে মুকুট ধরে এক সঙ্গে দু'জনও মিতবর হতে পারে। বরপক্ষে যেমন মিতবর, তেমনি কনেপক্ষেও মিতকনে থাকে অনুঃ

\*\* 'মিতবরের' চিহ্নসূচক অনুঃ

‘ভয় নেই, গদি না থাকলেও পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে না অমনিতেই নয়ম আছ।’

দারিয়া পরেছে গাঢ় লাল রঙের একটা পশমী ঘাঘরা তাকে দেখাচ্ছে একটা বেতের মতো পাতলা ছিপছিপে আঁকা জ্বনুভঙ্গ করে পেত্রোকে ঠেলা দিয়ে সে বলল, এখন যেতে হয় বাবাকে বল ওরা হয়ত এতক্ষণ অপেক্ষা করতে করতে ছুটিফট করছে।’

বাপ কোথা থেকে যেন ঝোঁড়াতে ঝোঁড়াতে এসে উপস্থিত তার সঙ্গে থানিকটা ফিসফাস করে শেষকালে পেত্রো ডুকুম দিল ‘বে যার জায়গায় বসে পড়। আমার গাড়িতে বরের সঙ্গে পাঁচজন আনিকেই, গাড়ি চালাবে তুমি।’

সকলে উঠে বসল। বিজয়ের উল্লাসে দৃপ্ত ইলিনিচনার মুখ লাল টকটক করছে সে-ই শেট খুলে দিল চারখানা গাড়ি একটা আরেকটার সঙ্গে পান্না দিয়ে উর্ধ্বাঙ্গে ছুটল রাস্তা ধরে

পেত্রো বসে ছিল গ্রিগোরির পাশে তাদের মুখোমুখি বসে একটা লোসের বুমাল নাড়াজিল দারিয়া যারা গান ধরেছিল গাড়ি চলতে চলতে বাস্তার খানাখন্দতে ও এবড়োখেবড়ো জায়গায় পড়ে ঝাঁকুনি লেগে তাদের কণ্ঠস্বরে বাধা পড়তে লাগল। কসাক-চুপির লাগ ফিতে, মীল ও কালো উর্দি আর কোর্ডা, সাদা বুয়ালের পাট বীধা হাতা, মেয়েদের শাল থেকে ছড়িয়ে পড়া রামধনুর সাতরঙ, রঙিন ঘাঘরা প্রত্যেকটি গাড়ির পেছনে মসলিনের মতো হালকা ধুলোর জাল বরষাত্তীব দল চলেছে কনে আনতে

বরের গাড়ি চালাচ্ছিল মেলেখভদের পড়শী আনিকেই সম্পর্কে সে গ্রিগোরির জ্ঞাতিভাই কোচবন্স থেকে ঝুল বেয়ে প্রায় পড়তে পড়তে সে সপাং সপাং চাবুক হাঁকড়ালে, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে হাঁকড়াক করছে। ঘমাক্ত ঘোড়াদুটো সঙ্গে সঙ্গে টানটান হয়ে, দড়িদড়ায় টান মেঝের জোর কদমে ছুটে চলছে

‘লাগা লাগা, কষে লাগা’ পেত্রো চোঁচায়

নপুংসক চেহাবার গুচ্ছহীন আনিকেই তার মেয়েলী মাকুন্দ মুখটা কঁচকে চোখ টিপে হাসল মৃদু তীক্ষ্ণ চিৎকার করে, ঘোড়াদুটোর পিঠে চাবুক মারল।

‘ববদার! সরে যাও।’ এদের পাশ কাটিয়ে সামনে গাড়ি ছোটানোর চেষ্টা করতে করতে গর্জে উঠল বরের মামা ইলিয়া ওজোগিন। গ্রিগোরি তাকাতে দেখতে পেল মামার পেছনে দুনিয়াশার মুখ খুঁশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, তার রোয়ে পোড়া দুই গাল যেন হাসিতে উপছে পড়ছে

‘উঁহু, সেটি হচ্ছে না।’ আনিকেই লাফিয়ে পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠল, তীক্ষ্ণ শিস মারল

ঘোড়াদুটো তাত্তা খেয়ে কিন্তু হায়ে টগবগিয়ে ছুটল

প-প-পাড়ে যাবে।' নাফিয়ে উঠে দু'হাতে আনিকেইয়ের পালিশ করা বৃটজুতো জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে উঠল দারিয়া

'সামাল! সামাল' পাশ থেকে হৈকে বলল ইলিয়া মামা চাকর একটানা আতনাদের মধ্যে ডুবে গেল তার কষ্টস্বব

লোকজনের বস্ত্রিন স্ত্রুপে উপড়ি চুপড়ি ঠাসা বাকি দুটো গাড়ি কলরব মুখরিত হয়ে পাশে পাশে ছুটে চলেছে। গাড় লাল, নীল ও ফিকে গোলাপী রঙের কাপড় আর কাগজের ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছে ঘোড়াগুলোকে তাদের ঘাড়ের কেশর আর কপালের সামনের চুল ফিতে দিয়ে বোনা। বেলটের গায়ে ঘটিগুলো টুংটাং বাজছে। সাবানের ফেনার মতো ঘাম স্রবতে স্রবতে এবড়োষেবড়ো স্রবতার ওপর দিয়ে তারা ছুটে চলেছে, ঘর্মাক্ত ভিজ পিঠের ওপরকার কাপড় বাতাসে ঢেউ খেলে যাচ্ছে, লুটোপুটি খাচ্ছে

কোরশুনদের বাড়ির গেটের সামনে একদল ল বাচ্চা দাঁড়িয়ে ছিল বরবাড়ীদের অপেক্ষায়। পথের ওপর ধুলো উড়তে দেখেই তারা দুদাড় করে উঠানের ভেতরে ঢুকে গেল

'আসছে, আসছে'

'গাড়ি ছুটিয়ে আসছে'

'আমরা দেখতে পেয়েছি'

হেটকে সামনে আসতে দেখে ওরা তাকে ঘিরে ফেলল।

'বলি, ভেড়ার পালের মতো অমন দলল বেধে ঘিরে দাঁড়ালি কেন বে? হেট এখন থেকে যত সব শয়তানের ছা' কিচিরমিচির করে কান খালাপালা করে দিলে।'

'ওরে বোঁটন\* তেলো হাঁড়ি দাঁড়া, আমরা এখন তোরা পেছনে লাগব বোঁটন! বোঁটন! আলকাতরার পিপে।' হেটের বস্ত্রার মতো বিশাল সালায়ারের চরধারে লাফাতে লাফাতে ছেলের দল ওকে ঝেপাতে লাগল

এদিকে হেট যেন কুস্রোর ভেতরে কিছু একটা দেখছে এই ভাবে মাথা নীচু করে বাচ্চাদের ছটফটানি দেখতে লাগল কপার দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়ে নিজের আঁটসাঁট লম্বা ঝুঁটিটা চুলকোতে লাগল

বিপুল সোরগোলের মধ্যে গাড়িগুলো ঘর্ষন করে এসে ঢুকল উঠানে। পেত্রো

\* ইউক্রেনের লোকেরা চুলের সামনের দিকটা ঝুঁটির মতো করে রাখত কুশীরা তাই অবজ্ঞার্থে তাদের বোঁটন বলত। বাংলায় ঘটি 'বাসল' বলতে বা বোঝায় — অনু:

হাত ধরে গ্রিগোরিকে নিয়ে গেল বাড়ির মেউড়ির দিকে পেছন পেছন হুড়হুড় করে এসে নামল বাকি বরষাত্রীরা।

বাইরের বারান্দা আর রান্নাঘরের মাঝখানের দরজা বন্ধ ছিল পেত্রো দরজায় ঘা মাবল।

প্রভু বিশু আমাদের দয়া করুন।

‘তার ইচ্ছা পূর্ণ হোক, দরজার ওপাশ থেকে উত্তর এলো

পেত্রো এই ভাবে আরও তিন বার দরজায় ঘা মারল, সঙ্গে সঙ্গে আউড়ে গেল কণাগুলো। প্রতিবারই ওপাশ থেকে এলো চাপাকঠের উত্তর।

‘আমরা ভেতরে আসতে পারি কি?’

‘আসতে আজ্ঞা হোক।’

দরজা হাঁ হয়ে খুলে গেল।

কনের তরফে মিতে হয়েছে নাতালিয়ার ধর্ম-মা সুন্দরী বিধবা মহিলা। বিশ্ব ফলের মতো লাল ঠোঁটে মৃদু হাসি খেলিয়ে আনত নমস্কারে সে অভ্যর্থনা জানাল পেত্রোকে।

‘নাও গাে বরের মিতে, ধর তোমাব স্বাস্থ্য ভালো থাকুক।’ এই বলে সে এক গেলাস ফোলাটে কভাস তার দিকে এগিয়ে দিল। পানীয়টা তখনও ভালো করে মজে নি।

পেত্রো হাত বুলিয়ে গৌফটা সমান করে নিয়ে ঢক করে পানীয়টা গিলে ফেলেই থক থক করে উঠল। সকলে চাপা হাসি হাসতে পেত্রো বলল

‘বেশ খাওয়া খাওয়ালে ত অতিথিকে।’ আজ্ঞা সুন্দরী, এক মাঘে শীত যায় না আমিও তোমাকে এমন খাওয়া খাওয়াব যে নাকের জলে চোখের জলে এক করে ছাড়ব।’

‘মাফ চাইছি,’ নীচ হয়ে নমস্কার জানিয়ে পেত্রোর দিকে মিষ্টি, চটুল হাসি ছুড়ে দিল মহিলা।

বরপক্ষ আর কনে পক্ষের দুই মিতের মধ্যে যখন চাপান-কাটান চলছে সেই সময়ের মধ্যে চুক্তি অনুযায়ী বরের আত্মীয়স্বজনকে তিন গেলাস করে ভোদকা পরিবেশন করা হল।

ইতিমধ্যে বিয়ের পোশাকে ঘোমটা পরিয়ে দুই ছোট বোন মারিশকা ও গ্রিপকার রক্ষণাবেক্ষণে নাতালিয়াকে নিয়ে আসা হয়েছে টেবিলের ধারে মারিশকা হাত সামনের দিকে বাড়িয়ে ধরে রেখেছে একটা বেলন। গ্রিপকা মহা ফুটিতে চালুনি ঝাঁকচ্ছে। ভোদকার নেশায় ইষৎ মত্ত, ঘর্মাক্ত পেত্রো মাথা ঝুঁকিয়ে সসন্ত্রমে তাদের দু’জনের সামনে গেলাসে করে একেকটি আধুলি রাখল মিতকনে

মারিশ্কাকে চোখের ইশারা করতে সে বেলন দিয়ে টেবিলের ওপর যা মেরে বসল, 'এত কমে হবে না এই দামে আমরা কনে বেচব না!'

গেলাসের মধ্যে ঝনঝন করে আকণ্ড সামান্য কয়েকটা বুপোর মৃদা ফেলে শেক্সো আবার সামনে এনে ধরল।

দেব না! নতমুখী নাতালিয়ার গায়ে কনুইয়ের ঠেলা মেরে ঝড়ার দিয়ে উঠল দুই বোন

'এসব কী ব্যাপার? অমনিতেই যা দাম তার চেয়ে অনেক বেশি দিয়ে দিয়েছি'

'ছেড়ে দাও মেরেরা, মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ এই বলে মৃদু হাসতে হাসতে টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল গাওয়া ঘি মাখিয়ে পাট করা তার কটা চুল থেকে ঘাম আর পাচা গোবরের বোটিকা গন্ধ ছাড়তে লাগল

কনের আত্মীয়স্বজন ও পরিবারের লোকজন যারা টেবিলের ধারে বসে ছিল তারা উঠে দাঁড়িয়ে জায়গা করে দিল।

পেরো একটা চাদর হাতে নিয়ে তার একটা হুঁট গ্রিগোরির হাতে গুঁজে দিল। তারপর লাফিয়ে বেঞ্চের ওপরে উঠে তাকে এগিয়ে দিল টেবিলের যেখানটায় বিগ্রহের কুলুঙ্গির নীচে কনে বসে ছিল সেইখানে। নাতালিয়া বিব্রত হয়ে ঘামে জবজবে হাতে চাদরের অন্য হুঁটটা ধরল

টেবিলের চারপাশে ততক্ষণে অতিথিরা টেনে ছিড়ে ছিড়ে গবগব করে সেদ্ধ মুরগীর মাংস খেতে শুরু করেছে, খেতে খেতে চুলে হাত মুছেছে। আনিকেই মুরগীর বকের হাড় কড়মড় করে চিবোচ্ছে, তার মাকুন্দ চিবুক বয়ে কলারের ওপর গড়িয়ে পড়ছে হলুদ চর্বি।

গ্রিগোরির নিজের আর নাতালিয়ার চামচ বুমালা দিয়ে একসঙ্গে বাঁধা। গ্রিগোরি কবুণ চোখে সেই দিকে তাকাল, তারপর তাকাল সেমাইয়ের ঝোলের বাটির দিকে বাটি থেকে ধোঁয়া উঠছে তার বড় খিদে পেয়েছে, পেটের ভেতরে বিশ্রী রকম একটা চাপা গরগর আওয়াজ হচ্ছে

দারিয়া তার মামাশ্বশুর ইলিয়ার পাশে বসে খাচ্ছে। ইলিয়া দু'পাশের কবের বিশাল বিশাল দাঁত দিয়ে ভেড়ার পাজিরার হাড় থেকে মাংস ছিড়তে ছিড়তে দারিয়ার কানে কানে বোধহয় কোন অশোভন কথা বলছিল তাই দারিয়া আরক্ত হয়ে উঠেছে, চোখ কুঁচকে, ভুরু নাচিয়ে মিটিমিটি হাসছে

খাওয়াদাওয়া বেশ জোর চলল, অনেকক্ষণ ধরে চলল। মেরেদের ঘামেব ঝাঁকাল মশলা মশলা গন্ধের সঙ্গে এসে মিশছে পুরুষের গায়ের ঘামের আলকাতরার

\* তুলনীয় আমাদের দেশের বিবাহানুষ্ঠানের শয্যাভুলুনি অনুঃ

মতো গল্প বহু কালের বাস্তববন্দী ঘাঘরা, কোর্তা ও শাল থেকে ভেসে আসছে ন্যাপথলিন এবং উগ্র মিষ্টি আরও কিসের যেন একটা গল্প বিশেষ উৎসব উপলক্ষে বুড়িরা যখন তাদের যত পুরনো টুকরোটাকরা বার করে তখন এরকমই গল্প বার হয় সেগুলো থেকে।

গ্রিগোরি আড়চোখে তাকাল নাতালিয়ার দিকে এই প্রথম লক্ষ করল নাতালিয়ার ওপরের ঠোঁটটা একটু ফোলা, নীচের ঠোঁটের ওপর টুপির কানাতের মতো ঝুলে পড়েছে আরও লক্ষ করল ডান গালে, গালের হাড়ের একটু নীচে একটা ঝয়েরি রঙের আঁচিল, আর আঁচিলের ওপর দুটো সোনালি চুল। এই দেখে তার কেন যেন বিস্মী লাগতে লাগল মনে পড়ে গেল আন্নিয়ির সুডৌল ঘাড়, ঘাড়ের ওপর কৌকড়ানো চুলের রৌয়া রৌয়া কুণ্ডল, সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল কে যেন তার জামার কলারের ভেতর দিয়ে গলিয়ে ঘর্মান্ত পিঠের ওপর ছড়িয়ে দিল খোঁচা খোঁচা এক মুঠো ঝড়কুটো তার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল, অবদমিত মনোবেদনা নিয়ে সে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল লোকজন গবগব করে হুসহাস শব্দে খাবার গিলছে

সকলে যখন টেবিল ছেড়ে উঠল তখন তাদের মধ্যে কে একজন গ্রিগোরির মাথার ওপর নিশ্বাস ছাড়ল ময়দার হুটি ঠেসে ঝাওয়ার ফলে তার নিশ্বাসের গন্ধটা ঝাঁঝাল। সেই সঙ্গে ফলের রসের গন্ধ। লোকটা অশদেবতার নজর থেকে বরকে রক্ষা করার জন্য তার হাইবুটের ফাঁকে একমুঠো কাউনের চাল ঢেলে দিল। বাড়ি ফেরার পথে সাবান্ধপ হাইবুটের ভেতরকার সেই কাউনের চাল পায়ে ফুটতে লাগল। জামার আঁটসাঁট কলারে তার দম বন্ধ হয়ে আসছিল বিয়ের এই সব আচার-অনুষ্ঠানের ফলে গ্রিগোরির মনমেজাজ বিগড়ে গেছে, তার আর কোন উৎসাহ নেই। বেজায় ক্ষেপে গিয়ে সে আপন মনে বিড়বিড় করে শাপ-শাপান্ত করতে লাগল।

## বাইশ

কোরশুনাভদের বাড়িতে বিশ্রাম করার পর ঘোড়াগুলো তাদের সর্বশেষ শক্তি সঞ্চয় করে মেলেখভদের বাড়ির পথ ধরল তাদের শরীরের বাঁধগুলোর ওপর দিয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল পুঞ্জ ফেনা।

গাড়োয়ানরা ঈষৎ পানোয়ন্ত তারা তাই কোন রকম দয়ামায়া না করে ঘোড়াগুলোর পিঠে চাবুক মারছে।

কনেবাড়ি ফেবত বরযাত্রীদের অভ্যর্থনা জানাল মেলেখড বুড়োবুড়ি। পাশ্বেলেই প্রকোফিয়েভিচ বিগ্রহ হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার কালো আর কুপোলি রঙে মেশানো পাট কবা কাঁচাপাকা দাড়ি চকচক করছে পাশে দাঁড়িয়ে আছে ইলিনিচনা তার পাতলা ঠোঁটজোড়া পাথরের মতো জমে শক্ত হয়ে আছে

সুগন্ধী লতার কল আর গম বৃষ্টির মধ্য দিয়ে\* গ্রিগোরি ও নাতালিয়া এগিয়ে গেল আশীর্বাদ নিতে। আশীর্বাদ করতে গিয়ে পাশ্বেলেই প্রকোফিয়েভিচ চোখের জল ফেলল সঙ্গে সঙ্গে সর্বসমক্ষে এই দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে পড়ায় মনে মনে তার আক্ষেপ হল সে তাই ব্যস্ততার ভাব দেখাল ভুবু কৌচকাল

বরকনে ঘবের ভেতরে ঢুকল। ভোদকার প্রভাবে, পথশ্রমে আর বোদের তাপে দারিয়াকে লাল টকটকে দেখাচ্ছে হস্তদণ্ড হয়ে দেউড়ির ধাপেব কাছে যেতে বান্নাঘর থেকে দুনিয়াশ্কাকে ছুটে বেরিয়ে আসতে দেখামাত্র তার ওপর শ্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে সে জিজ্ঞাস করল, 'পেত্রো কোথায়?'

দেখি নি ত!'

'তাজাতাড়ি পুরুত ডেকে আনতে হয় এদিকে কোন্ চুলোয় গেল কল দিকি - তার কোন পাখাই নেই'

মাত্রাতিরিক্ত ভোদকা টানার ফলে পেত্রো তখন খুলে-রাখা-গাড়ির ভেতরে শুয়ে গৌঁ গৌঁ করছে দারিয়া চিলের মতো ছোঁ মেবে তাকে চেপে ধরল

'হুঁ, গেলা হয়েছে? আহাশুক কোথাকার এদিকে পুরুতঠাকুরকে ডাকতে যেতে হবে যে! উঠে পড়!'

'ভাগু এখন থেকে। তোর হুকুম মানতে আমার বয়েই গেছে ওঃ কোথাকার কোন ওপরওয়ালা এলেন আমার।' দু'হাতে মাটি ঘসটাতে ঘসটাতে কিছু মুরগীর বিষ্ঠা আর জাবনার তুফাবশিষ্ট খড়কুটো সাপটে গান্না করে রাখতে রাখতে সে মোক্ষম মস্তব্য কবল।

দারিয়া কান্দতে কান্দতে দুটো আঙুল স্বামীর মুখের ভেতরে ঢুকিয়ে দিল পেত্রোর কদর্য জিভটা মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ে ঝুলছিল। জিভে চাপ দিয়ে দারিয়া তাকে বমি করিয়ে সহজ হয়ে উঠতে সাহায্য করল তারপর পেত্রো কিছু বোঝার আগেই তাকে হতভম্ব করে দিয়ে আচমকা এক বালতি কুয়ার জল ঢেলে দিল তার মাথায়। হাতের কাছে খোড়ার গা ঢাকার একটা কাপড় পাওয়া যেতে সেইটা দিয়ে তাকে মুছিয়ে শুকনো খটখটে কবে পাঠিয়ে দিল পুরুতের কাছে।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে দেখা গেল গ্রিগোরি গির্জায় দাঁড়িয়ে আছে নাতালিয়ার

\* শূভানুষ্ঠানে লাজবর্ষণের মতো অনুঃ

পাশে। গির্জার মোমবাতিব আলোয় নাতালিয়াকে দিব্য সুন্দর দেখাচ্ছে ঘন দেয়ালের মতো ভিড় করে দাঁড়িয়ে লোকজন ফিসফাস করছে। তাদের ওপর ক্যালফেলে চোখের দৃষ্টি বুলিয়ে হাতের মোমবাতিটার ওপর চাপ দিতে দিতে গ্রিগোরি মনে মনে আউড়ে চলেছে 'আর মজা নয় আর মজা নয়' কথাগুলো নাছোড়বান্সর মতো কিছুতেই মাথা থেকে ছাড়ছে না। তার পেছনে পেত্রো কাশছে। তাকে ফোলা-ফোলা দেখাচ্ছে ভিড়ের মধ্যে কোথায় যেন জ্বলজ্বল করছে দুনিয়াশকার চোখদুটো আরও কাদের যেন সব মুখ চেনা অথচ চেনা নয় কোরাসের বেসুরো-বেতাল গলাগুলো আর গির্জার পুরুতের একটানা মস্তোচ্চারণ কানে আসছে। একটা উদাসীন ভাব পেয়ে বসল গ্রিগোরিকে নাকি-সুর পুরুতমশাই ভিসসারিওনের ক্ষয়ে-যাওয়া জুতোর হিল্ মাড়াতে মাড়াতে সে বিগ্রহের মঞ্চ প্রদক্ষিণ করতে লাগল পেত্রো যখন সকলের অলঙ্কো তার কোর্টার কিনারা ধরে মৃদু টান মারে তখন সে ধেমে যায় তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে আগুনের ছোট ছোট বিনুনি পাকানো শিখাগুলো দপদপ করছে। একটা তক্তার ঘোর তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে বুঝতে পেরে সে তার বিবুদ্ধে যুঝতে থাকে

এভাবে আঙটি বদল কর গ্রিগোরির দিকে দরদমাখা মধুর দৃষ্টিতে চেয়ে ফাদার ভিসসারিওন বলল।

আঙটি বদলের পালা শেষ হল। পাশ থেকে পেত্রোর চোখে চোখ পড়ে যেতে গ্রিগোরি চোখের ইশারায় তাকে প্রশ্ন করল 'শেষ হতে আর কত দেরি?' পেত্রোর ঠোঁটের কোনোদুটো নড়ে উঠল, হাসির ঝলক নিভিয়ে দিয়ে সে বলল 'আব দেবি নেই।' এর পর গ্রিগোরি তিনবার তার বৌয়ের ভিজে-ভিজে বিশ্বাদ ঠোঁটে চুমু খেল নেভানো মোমবাতির কটু গন্ধে ভরে উঠল গির্জার ভেতরটা। লোকজন বাইরে বেরোবার জন্য পেছন থেকে ঠেলাঠেলি করতে লাগল।

নাতালিয়ার বিশাল খসখসে হাতটা হাতের মুঠোর ধরে গ্রিগোরি বেবিয়ে এলো গির্জার সামনের বারান্দায় কে যেন তার মাথার খেবড়ে বসিয়ে দিল টুপিটা। দক্ষিণের উষ্ণ বাতাসের সঙ্গে ভেসে আসছে সুগন্ধী লতার গন্ধ। স্তম্ভ থেকে বইছে শিথল হাওয়া দনের ওপাবে কোথায় যেন চমকে উঠল বিদ্যুতের নীল আলো বৃষ্টি এলো বলে গির্জার সাদা রঙের দেয়ালের বাইরে ঘোড়াগুলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উসখুস করছে লোকজনের কোলাহলের সঙ্গে এসে মিশছে তাদের ঘুন্টির আমন্ত্রণভরা মৃদু টুং টাং আওয়াজ।



বরকনেকে গির্জায় নিয়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত কৌশলভরা এলো না। পাশ্বেলেই প্রকোফিয়েভিচ বেশ কয়েকবার ফটকের বাইরে এসে রাস্তার ওপর নজর করে দেখেছে কিন্তু দু'পাশে মাঝে মধ্যে ফণীমনসাব খোপে ছাওয়া ধূসর বাস্তাটা একেবারে ফাঁকা, জলমানবশূন্য। দনের দিকে দৃষ্টি ফেরাল বনের গাছপালায় লক্ষ করার মতো হলুদ রঙ ধরতে শুরু করেছে। কাশবনের কাশে পাক ধরেছে দনের ওপারে ঝিলের বৃকে, হোঁগলাব বনের মাথাব ওপরে ক্লাস্তিভরে নুইয়ে পড়েছে থলো থলো কাশের মাথা

গোধূলির আলো-অঁধারির সঙ্গে শরতের আগমনীর একটা মন-কেমন-করা নীলাভ তন্মালস ডাব মিশে গ্রামখানাকে দনের বৃক, খড়িমাটির শৈলশাখা, দনের ওপারে বেগুনী রঙের আবছায়াতে লুকিয়ে থাকা বনভূমি আর স্তম্ভের বিস্তীর্ণ প্রান্তরকে জড়িয়ে রেখেছে। সদর রাস্তার মোড় ছাড়িয়ে চৌরাস্তার কাছে আকাশের পটভূমিতে সূক্ষ্ম রেখায় ফুটে উঠছে ভজ্জনালায়ের চূড়া

চাকার প্রায় অল্পস্ট ঘর্ষর শব্দ আর কুকুরের ঘেউ ঘেউ ডাক পাশ্বেলেই প্রকোফিয়েভিচের কানে ভেসে এলো

বারোয়ারিতলা পেরিয়ে রাস্তায় এসে পড়ল দু'খানা ঘোড়ার গাড়ি। প্রথমটার পেছনের দোল বাওয়া আসনে পাশাপাশি বসে দোল খাচ্ছে মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ আর লুকিনিচনা, তাদের মুখোমুখি ধোপদুরন্ত উর্দি গায়ে গ্রিশাকা দাদু বৃকে ঝুলিয়েছে বাজোব সেট জর্জ ক্রস আর মেডেল। গাড়িটা চালাচ্ছে মিডকা কোচবক্সের ওপর সে বসে আছে তাচ্ছিল্যের ডাব নিয়ে দানাপানি বাওয়া কাপো কুচকুচে ঘোড়াগুলো স্ক্যাপার মতো ছুটে আসনের নীচে গোঁজা চাবুকটা বার করে দেখাতে পর্যন্ত হচ্ছে না পরেরটা চালাচ্ছে মিখেই পেছনে হেলে পড়ে রাশ টেনে ছুটন্ত ঘোড়াগুলোকে দলকি চালে চালানোর আশ্রাণ চেষ্টা করছে সে মিখেইয়ের ডুবুহীন তীক্ষ্ণ মুখ বেগুনী রঙ মেশানো গোলাপী আভায় ছেয়ে গেছে, মাথার টুপির মাঝখানে ভাগ করা আধখানা কানাতের ভেতর থেকে অঝোরে ঘাম ঝরছে।

পাশ্বেলেই প্রকোফিয়েভিচ ফটক হাট করে খুলে দিল গাড়ি দু'খানা একে একে উঠানের ভেতরে এসে ঢুকল।

ইলিনিচনা যেন একটা মাদী হীসেব মতো পাখা মেলে বারান্দা থেকে উড়ে এলো ঘাঘরাব প্রান্ত দিয়ে ধাপের ওপরকাব গোবর আর কাদার জঞ্জাল ঝেঁটিয়ে।

‘আসুন আসুন আসতে আজ্ঞা হোক বোয়াই মশাই, বোয়ান ঠাকরুন। আমাদের

গরিবের কুঁড়ে-ঘরে পায়ের ধুলো দিয়ে কৃতার্থ করুন।’ সে তার স্থূল শরীরটা নুইয়ে নমস্কার করল।

পান্ত্বেলেই প্রকোফিয়েভিচ ঘাড়টা একপাশে কাত করে হাতদুটো ছড়িয়ে দিয়ে

‘দয়া করে আসুন ভেতরে আসতে আজ্ঞা হোক বেয়াইমশাই, বেয়ান ঠাকরুন।’  
ঘোড়াগুলো স্থলে নিতে হুকুম দিয়ে সে এগিয়ে গেল বেয়াইমশাইয়ের দিকে।

মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ হাত দিয়ে সালোয়ারের ধুলো ঝাড়ল নমস্কারের পালা শেষ হলে তারা দেউড়ির ধাপের দিকে এগোল গ্রিশাকা দাদু এই অতৃতপূর্ব পথযাত্রায় ঝাঁকুনি খেয়ে হয়রান পড়েছে, তাই পিছিয়ে পড়ে যাচ্ছিল

‘আসুন আসুন, ভেতরে আসুন’ ইলিনিচনা মিনতি জানান।

‘ঠিক আছে, ঠিক আছে ধন্যবাদ যাব ত বটেই।’

‘সেই কখন থেকে আপনাদের জনো অপেক্ষা করছি আসুন এক্ষুনি ঝাড়ুন দেব আপনার উর্দি পরিষ্কার করার জন্যো। এই সময় ধুলোটা বড় বেশি নিশ্বাস নেওয়া যায় না।’

‘হ্যাঁ আবহাওয়াটা যা শুকনো। তাইতেই ত এত ধুলো অত ব্যস্ত হবেন না। আমি এই এক্ষুনি ’ বড়ো মাথা নুইয়ে নমস্কার জানিয়ে তার নতুন আকীয়াটিকে কিছু বোঝার অবকাশ না দিয়ে তাকে হতবুদ্ধি করে চালাঘরের দিকে পিছন দিক করে পা বাড়াল, তারপর চালার রঙ করা যে ঘরটাতে ফসল বাড়ি হয় তার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল

‘মুখ্য আর কাকে বলে। বড়ো মানুষকে নিয়ে পড়লেন উনি।’ দেউড়ির সামনে ইলিনিচনার মুখোমুখি হতে পান্ত্বেলেই প্রকোফিয়েভিচ ঝাঁকিয়ে উঠল।  
‘মানুষের কত রকমের দরকার থাকতে পারে আর তুমি কিনা ধুস্তোর হা ভগবান, এমন বোকাও হয়।’

‘আমি কী করে জানব অতশত?’ বিব্রত হয়ে বলল ইলিনিচনা

‘বোকা উচিত ছিল। যাক গে, অনেক হয়েছে যাও এবারে বেয়ানকে ভেতরে নিয়ে যাও।’

টেবিলে খাবারদাবাব সাজানো চারপাশে অতিথি অভ্যাগতরা বসেছে সকলেবই কিঞ্চিৎ নেশা ধরেছে টেবিল ঘিরে গুঞ্জন করছে তারা। কনের মা-বাবাকে বসানো হয়েছে সবচেয়ে ভালো ঘরটায় বসার ঘরে, টেবিলের ধারে দেখতে দেখতে নব-দম্পতি ফিরে এলো গির্জা থেকে পান্ত্বেলেই প্রকোফিয়েভিচ সঙ্গে সঙ্গে একটা বিশাল বোতল থেকে গেল্লাসে ভোদকা ঢালল তার চোখ ছলছল করে উঠল

‘তাহলে আসুন বেয়াই বেয়ান আব আপনাবা সকলে আসুন আমাদের

হেলেমেয়ের জন্য আমাদের মতো ওদেরও যেন সব কিছু ভালোয় ভালোয় চলে ওরা যেন সুখে সুস্থদেহে জীবন কাটাতে পারে

কনের ঠাকুর্দাকে সকলে একটা পেটমোটা গেলাসে ভোদকা ভরে দিল, চাপাচাপি করে ওয় মুখেও ঢেলে দিল তাতে সবজেটে দাড়িটা এলোমেলো হয়ে গিয়ে অর্ধেকটা সেই দাড়ির জব্বল ভেদ করে মুখে গেল, বাকি অর্ধেকটা ঢুকল তার উর্দির খাড়া কলারের ভেতরে গেলাস ঠোকাঠুকি করে মদ্যপান চলতে লাগল আবার যার যার খুশিমতো অমনিতেও খেয়ে চলল হাটুরে হট্টগোল শুরু হয়ে গেল। টেবিলের একেবারে শেষ প্রান্তে বসেছিল কোরশুনভদের দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়, আতামান রক্ষিসজের বুড়ো সৈনিক নিকিফর কলোভেইদিন হাত তুলে, পাঁচটা আঙুল ছড়িয়ে হাত নেড়ে সে গার্জে উঠল, 'তেতো'

'তেতো' তেতো অমনি টেবিলের চারপাশ থেকে আর সকলে ধুয়ো তুলল

ওঃ কী তেতো কী তেতো' লোকভর্তি পাশের রান্নাঘর থেকেও সমর্থন মিলল

ত্রিগোবি ভুরু কুঁচকে বৌয়ের পানসে ঠোঁটে চুমু খেল + বিষ-নজরে চারধারে তাকাল

আরক্ত চোখমুখ নেশার ঘোরে ঘোলাটে চোখের বৃক্ষ দৃষ্টি আর হাসি তারিয়ে তারিয়ে সকলে মুখে চিবিরে চলেছে খাবার, নজ্জা-তোলা টেবিল-ঢাকনার ওপর করে পড়ছে মাতালের মুখের লাল। এক কথায়, জোব খানাপিনা চলছে।

নিকিফর কলোভেইদিন তার ফোকলা দাঁত বার করে ফের হাত তুলে চৈচাল

'তেতো'

তার গায়ে রক্ষিবাহিনীর যে হালকা নীল উর্দিটা ছিল সেটার হাতার ওপর ভাঁজ পড়ে কুঁচকে উঠল তিনটে সোনালি পটি-দীর্ঘমেয়াদী চাকরির পুরস্কার

'তেতো!'

ত্রিগোবি ঘৃণাভরে তাকাল কলোভেইদিনের ফোকলা-দাঁত মুখের দিকে। 'তেতো' বলার সঙ্গে সঙ্গে তার দুই দাঁতের মাঝখানের ফাঁকা জায়গাটা দিয়ে একটা নলের মতো পাকিয়ে বের হয়ে পড়ছে লাল টকটকে লালাসিক্ত জিভটা

'চুমু খাও গো বকম বকম জোড়া পায়রা ভোদকায় জুবজুবে ভেজা দু'পাশের গৌফজোড়া দুটো বৈদীর মতো নাড়াতে নাড়াতে ফৌসফৌস করে বলল পেত্রে।

\* বুদী প্রথা অনুযায়ী বিয়ের আসরে উপস্থিত আত্মীয়স্বজন ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ 'তেতো, তেতো' বলে চৈচালে বর-কনে পরস্পরকে চুখন করবে অনুষ্ঠানকে মধুর করে তোলার জন্য - অনুঃ

বালাঘরে দারিয়ারও কিষ্কিৎ নেশা ধরেছে, তার মুখে বক্তিম আভা দেখা দিয়েছে সে গান ধরেছে। তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে অনোকাও ধরেছে আর সেখান থেকে ছুড়ে দিচ্ছে বাইরের ঘরে

এই যে নদী, এই যে সাকো,  
এই যে ঘাটে খেয়ার নৌকা

সকলের কণ্ঠস্বর মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল কিন্তু শিগগিরই অন্যদের কণ্ঠস্বরকে ছাড়িয়ে জানলার শার্মি কাঁপিয়ে ঝড়ভগ্ননে ফেটে পড়ল শ্রিস্তোনিয়া

আহা কেউ এনে দিলে,  
খাই সুরা প্রাণ ভরে

এদিকে শোবার ঘর থেকে আসছে মেয়েদের অবিমিশ্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর

হারালাম, খোয়ালাম,  
বড সাধের গলাখান

ওদের সাহায্যের জন্য সুর ধরল এক পুরুষকণ্ঠ লোহার পাতের মতো ঝনঝন করে আছড়ে পড়ল বুড়ো-বুড়ো গলার আওয়াজ

আহা আমি হারালাম  
আহা আমি খোয়ালাম,  
বড সাধের গলাখান  
এর গুর বাগান গিয়ে,  
কষ্টা ফলে মুখ দিয়ে

‘দেখ ভাই, দেখ সকলে, কী ফুটি আমরা করছি’

‘এই ভেড়ার মাংসটা একটু চেখে দেখ।’

হাতখানা সরাও দিকি নি বাপু - দেখছ না আমার স্বামী এই দিকে চেয়ে আছে।’

‘তেতো

‘ছেলের দামরি বেলেচাপনা দেখ। ইস্, মেয়ের ধম্ম-মা’র সঙ্গে কী কাণ্ডটাই না করছে

‘ন-না, ও সব ভেড়া-টোড়া দিও নি বাপু আমি বরং ইলিশ মাছ-টাই খাই হ্যাঁ হ্যাঁ তাই-ই খাব - চমৎকার তেলতেলে

‘ওঃ হো প্রাশ্কা আমার, দাদা গো, যাত্রার আগে গেলাসে গেলাসে চৌকা-  
ঠুকি করি ’

‘ওঃ পাজরার ভেতর দিয়ে যেন আগুন খেলে গেল ’

‘সেমিওন গদেইচ ’

‘আঁা ’

‘সেমিওন গদেইচ ’

‘মুস্তোর ’

রামাঘরের মেঝেটা ঝুলে পড়ে দুলতে শুরু করল জুতোর গোড়ালির খটখট  
আওয়াজ উঠল একটা গেলাস আছড়ে পড়ল হৈ হুল্লোড়ের মধ্যে চাপা পড়ে  
গেল তার বনকন আওয়াজ টেবিলের পাশে যারা বসে ছিল তাদের মাথার  
ওপর দিয়ে শ্রিগোরি রামাঘরের দিকে দৃষ্টিপাত করল হো-হো হা-হা আর  
তীক্ষ্ণকণ্ঠের উৎসাহবর্ধক আওয়াজের তালে তালে গেল হয়ে পা দাঁপিয়ে নাচছে  
মেয়েরা স্থল নিতম্ব নাচাচ্ছে (পাতলা কারোই ছিল না, কারণ প্রত্যেকেই পাঁচ  
ছয়টা করে ঘাঘরা পরেছে), লেসের বুমাল শুভাচ্ছে, কনুই মুচড়ে দোলাতে  
দোলাতে নাচছে সকলের মনোযোগ দাবি করে, কানে তাল ধরিয়ে বেজে উঠল  
অ্যাকর্ডিয়ন বাজনা। বাজনার দর খামের সুরে ধরল কসাক নাচের একটা গং

‘গোল হও। গোল হয়ে দাঁড়াও সবাই!’

একটু চাপাচাপি কবে দাঁড়াও গো দিদিয়া’ নাচে গলদঘর্ম মেয়েদের গরম  
পেটে গুতো মারতে মারতে পেত্রো অনুময় করল।

শ্রিগোরি চাক্ষু হয়ে উঠল, নাজনিয়ার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল,

‘পেত্রো এখুনি কসাক-নাচ কাকে বলে দেখাবে, তাকিয়ে দেখ না একবার ’

‘কার সঙ্গে নাচছে?’

‘দেখতে পাচ্ছ না? তোমার মা’র সঙ্গে।’

লুকিনিচনা কোমরে হাত ঠেকিয়ে, বাঁ হাতে বুমাল নিয়ে এগিয়ে এলো

চলে এসো কী হল? নইলে কিছু আমিই শুরু করে দেব ’

পেত্রো গুটি গুটি পা ফেলে তার কাছে এগিয়ে গেল চমৎকার একটা ভক্তি  
করে পাক খেল তারপর ফিরে গেল নিজের জায়গায়। এবারে লুকিনিচনার পালা।  
ঘাঘরার প্রান্তটা সে এমন ভাবে উঁচু করে ধরল যেন কোন ডোবার ওপর দিয়ে  
পা ফেলে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে, জুতোর ডগা দিয়ে সে তাল ঠুকল লোকজনের  
সমর্থনসূচক কলরবের মধ্য দিয়ে পুনরাবলী ভঙ্গিতে পা ঝুঁড়তে ঝুঁড়তে এগিয়ে গেল

অ্যাকর্ডিয়ন-বাজিয়ে এবারে নীচু পর্দায় ছোট-ছোট কাটা-কাটা তালে গং ধরল  
পেত্রো আর স্থির থাকতে পারল না। হুপ’ করে হুজার দিয়ে লাফিয়ে পড়ল

উষ্ হয়ে বসে পড়ে গোঁফের ডগা ঠোঁটের কোণে কামড়ে ধরে হাতের চেটে দিয়ে বুটের গোড়ালিতে চাপড় মারতে মারতে নাচতে শুরু করে দিল সে পা দাপিয়ে বেড়াতে লাগল, তার দুই হাঁটু এত ঘন ঘন কাঁপতে লাগল যে চোখে ধরা পড়ে না পায়ের সঙ্গে ভাল রাখতে না পেবে ঝাঁকুনির চোটে তার কপালের ওপর লটপট করতে লাগল মাথার সামনের চুলের ঘর্ষাজ্ঞ গোছ।

দরজার সামনে লোকজন ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে তাদের পিঠে আডাল পড়ায় পেত্রোকে খিগোরি দেখতে পাচ্ছিল না সে কেবল শুনতে পাচ্ছিল মাতাল অতিথিদের উত্তেজিত চিৎকার আর লোহার মাল লাগানো জুতোর একটানা চড়বড় আওয়াজ ঠিক যেন পাইন কাঠ পুড়ছে আগুনে

শেষের দিকে মিরোন খিগোরিয়েভিচ নাচল ইলিনিচনার সঙ্গে নাচল সে গুরুগম্ভীর ভঙ্গিতে যেন খুব একটা কাজের কাজ করছে। তার সব কাজেই যেমন স্বীকৃতি

পান্তলেই প্রকোকিয়েভিচ একটা চুলের ওপর দাঁড়িয়ে পড়েছে, খোঁড়া পাঁটা দোলাতে দোলাতে টাকডায় জিভ ঠেকিয়ে টকাস টকাস আওয়াজ করছে। পায়ের বদলে নাচছে তার ঠোঁটজোড়া - যেন কোনমতেই স্বস্তি পাচ্ছে না আর সেই সঙ্গে নাচছে তার কানের মাকড়ি

যারা একেবারে আনাড়ি। হাঁটু পর্যন্ত সজিকারের বাঁকাতে পারে না, তারাও পাকা নাচিয়েদের সঙ্গে কসাক-নাচের পাল্লা দেওয়ার চেষ্টা করল।

তাদের সকলের উদ্দেশ্যেই ভিড়ের ভেতর থেকে চিৎকার উঠতে লাগল

‘দেখো হে মাটি করো না।’

‘কুচি কুচি করে কাট’ আহা।’

পা ত হালকা করেই ফেলছি, কিন্তু পাছটার জন্যে অসুবিধে হচ্ছে

চটপট চটপট

‘আমাদের দল জিতছে।’

‘চালাও, চালাও, নয়ত দেখবে মজা।’

‘দেখ কাণ্ড হরামজাদার দম ফুরিয়ে গেছে আরে বাটা নাচ বলছি, নইলে এই বোতলটা দিয়ে দেব এক ঘা বসিয়ে।’

প্রিশাকা দাদুর নেশা চড়েছে বেঞ্চের তল্ল পাশে যে লোকটা বসে ছিল তার চওড়া-হাড়-ওঠা পিঠটা জড়িয়ে ধরে কানের কাছে মশার মতো পিনপিন করে বলল, ‘কোন সালে পলটনে ঢুকেছিলেন?’

ছালচর্ম ওঠা প্রাচীন বটবৃক্ষের গুঁড়ির মতো চেহারা পাশের বৃদ্ধটি হাতের কাঁটাক্ষ তাকে সরিয়ে দিয়ে গাঁক গাঁক করে বলল, ‘উনচল্লিশ সালে রে বোটা।’

‘কেন সালে? আঁ?’ গ্রিশাকা দাদু তার বলিরেখা আঁকা কানের গহ্বরটা পাশে বাড়িয়ে দিল

‘বললাম ত, উনচল্লিশ সাল’

‘কার রেজিমেন্টে ছিলেন? কী ছিলেন?’

‘বাকলানভের রেজিমেন্টে সার্জেন্ট-মেজর ছিলাম। মাক্সিম বগাতিরিওভ আমার আদি নিবাস আদি নিবাস হস গিয়ে লাল দরী গাঁ

‘মেলেকভদের কেউ হন আপনি?’

‘কী?’

‘বলছি, মেলেকভদের কেউ হন নাকি?’

‘ও, হ্যাঁ বরের দাদামশাই হই

‘বাকলানভের রেজিমেন্টের কথা বললেন না?’

একটা না-চিবানো খাবারের ঢুকরো দস্তাইন মাড়ি দিয়ে মুখের ভেতরে এপাশ-ওপাশ গড়াতে গড়াতে ম্যাডমেডে চোখ তুলে তাকাল বুড়ো, সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল

‘তার মানে ককেশাস অভিযানে আপনি ছিলেন?’

‘খেদ পরলোকগত বাকলানভের কাছেই চাকরী করেছি আমি তাঁর আশ্রয় অক্ষয় স্বর্গলাভ হোক। আমরাই ত ককেশাস জয় করলাম। আমাদের রেজিমেন্টে সেরা সেরা সব কসাক ছিল নেওয়া হত গার্ডদের সমান মাথায় লম্বা লোকজন, তবে একটু কুঁজো লম্বা হাত হলে যেমন হয়, আর কাঁধও তেমনি চওড়া - একালের কোন কসাককে আড়াআড়ি শুইয়ে দিলে যতটা হবে।

বুঝলে ত বাছা, কী লোক ছিল তখন একবার চেলেনজিইন্ডি গাঁয়ে মহামান্য পরলোকগত জেনারেল আমাকে চাবুক মেরে কৃতার্থ করেছিলেন

‘আর আমি ছিলাম তুর্কী অভিযানে আঁ? হ্যাঁ, সত্যি বলছি, ছিলাম বলতে বলতে গ্রিশাকা দাদু তার চুপাসে যাওয়া বুক টানটান করল, সঙ্গে সঙ্গে বুকের ওপর টুংটাং বেজে উঠল সেন্ট জর্জ ক্রসগুলো

গাঁটা আমরা দখল করেছিলাম ভোরবেলায় এদিকে দুপুর বেলাতেই শিঙা বাজিয়ে বিপদের জানান দেওয়া হল

‘সাদা জারের চাকরী আমাদেরও করতে হয়েছে। বশিচের কাছাকাছি লড়াই চলছিল। আমাদের রেজিমেন্ট বারো নম্বর দল-কসাক রেজিমেন্ট ওদের ‘ইয়ানিচার-দের’\* সঙ্গে লড়াইল।

\* তুর্কী শব্দ এর ঋৎপঞ্জিগত অর্থ ‘নতুন বাহিনী’ তুরস্কের তুর্কী মুলতান আমলে বাছাই করা বিশেষ সুবিধাভোগী পদাতিক বাহিনী আদিতে ছিল শৈশবে ইসলামে ধর্মান্তরিত খ্রীষ্টানদের নিয়ে গঠিত বাহিনী - অনুঃ

‘তা হ্যাঁ, যা বলছিলাম। শিঙা বাজিয়ে ত বিপদের কথা জানিয়ে দেওয়া হল।’ গ্রিশাকা দাদুর কথায় কোন কান না দিয়ে বলে চলল বাকলানভ রেজিমেন্টের লোকটি।

ওদের ‘ইয়ানিচাররা’ হল অনেকটা আমাদের আত্মান গার্ড সৈন্যের মতন আর কি ‘হ্যাঁ, তাই’ গ্রিশাকা দাদু এবারে উত্তেজিত হয়ে উঠল রেগে হাত নাড়ল ‘ওবা ওদের জারের চাকরী করে মাথায় পরে সাদা খলে। হেঃ সাদা খলে পরে মাথায়’

‘আমি তখন আমার স্যাঙাতকে বললাম দেখা যাচ্ছে আমাদের পিছু হটতে হবে রে তিমোশা। তাহলে দেয়াল থেকে গালিচাটা টেনে নামাতে হয়। আমরা ওটাকে সঙ্গে নিয়ে যাব’

‘দুটো জর্জ ক্রস পেনাম যুদ্ধে সাহস দেখানোর জন্যে এই সম্মান। একটা তুর্কী মেজরকে জ্যাঙ ধরেছিলাম’

গ্রিশাকা দাদু কৈদে ফেলল। শুকনো ছাতের ঘুঠো পাকিয়ে বাকলানভ বাহিনীর সেই বুড়ো দাদুর ভালুকের মতো খপখপে আর ফাঁপা ঢপঢপে পিঠের ওপর একটা কিল মেরে বসল। কিন্তু বুড়ো দাদু ঝাল আচারের বদলে চেরীর জেলিতে মুরগীর টুকরো ডুবিয়ে নিয়ে ঝোলে ভাসাভাসি টেবিল-ঢাকনাটার দিকে নিম্প্রাণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তারপরে ভেতরে বসা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বিভ্রিভ করে বলল। এবার তাহলে বলি বাছা, শয়তান আমার কানে কী মন্ত্রণা দিল বলতে বলতে দাদু এমন ভাবে ঘড়ির মতোঃ স্থিরদৃষ্টিতে টেবিল-ঢাকনার সাদা কুণ্ডনরেখাগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল যেন সে ভোদকা আর ঝোলে ভাসাভাসি টেবিল-ঢাকনা দেখছে না, দেখছে ককেশাস পর্বতমালার গায়ে চোখ ধাঁধানো ভূষারের ভাঁজ। ‘এর আগে জন্মে কখনও অন্যের জিনিসে হাত দিই নি

এমন হয়েছে যে চেবকেসদের কোন পাহাড়ী গাী দখল করেছি, ওদের ঘর-বাড়িতে কত সম্পত্তি। কিন্তু তা মেখে আমার কখনও চোখ টাটায় নি। শয়তানই বুদ্ধি দেয় অন্যের জিনিসে হাত মেবার। কিন্তু এখানে মেখ কাও চোখে লেগে গেল ঝালর লাগানো গালিচাটা। ভাবলাম ঘোড়ার গায়ের একটা দিবি ঢাকনা হবে

এরকম হরেক চিহ্ন আমরা দেখেছি, অটেল দেখেছি। সাগর পেরিয়ে ভিন দেশেও গেছি। গ্রিশাকা দাদু তার পাশের বুড়োর চোখের দিকে তাকানোর চেষ্টা করল। কিন্তু গভীর কোটরে বসা চোখদুটো গোছা গোছা সাদা ভুরু আর দাড়ির জঙ্গলে ছেয়ে আছে যেন আগাছায় ঢাকা একটা খাদ। চোখের হৃদিস পাওয়া গ্রিশাকা দাদুর সাধ্য নয়। সর্বত্র কেবল খোঁচা খোঁচা দুর্ভেদ্য লোম



সে তখন একটা চালাকি খাটাল তার উদ্দেশ্য হল গল্পের ঠিক মোক্ষম জায়গাটায় বাকলানভ বাহিনীর বুড়োর মনোযোগ আকর্ষণ করা তাই সে কোন রকম গৌরবচক্রিকা না করে শুরু করে দিল একেবারে মাঝখান থেকে

‘তা মেজব তের্সিনৎসেভ ত হুকুম দিল ‘ট্রুপের সবাই সাব বেঁধে ঘোড়া হাঁকাও হাঁকাও ঘোড়া। মার্চ মার্চ।’

যুদ্ধের ঘোড়া তুরী ভেতরীর আওয়াজ শুনে যেমন করে বাকলানভ রেজিমেন্টের বুড়োও ভেতমনি ঝট করে মাথা ওপরে তোলে, তারপর গ্রিছিল আকারের মুঠি দিয়ে টেবিলের ওপর মডাম করে একটা কিল মেত্রে ফিসফিস করে বলল

‘বর্শা বাগিয়ে ধর, তলোয়ার খোল, বাকলানভের সেশাইরা।’ এই কথা বলতে বলতে তার গলা হঠাৎ জোরাল হয়ে উঠল, ঘোলাটে চোখের স্রদি চকচক করে উঠল, বৃদ্ধ বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যে আগুন নিভে গিয়েছিল অতীতের সেই আগুন যেন আবার দগ্ন করে জ্বলে উঠল তার চোখে। ‘সাবাস বাকলানভের সেশাইরা।’ দস্তহীন হলুদ মাটি বার করে বিরাট হাঁ করে সে গর্জে উঠল ‘ঝাঁপিয়ে পড় এগিয়ে চল এগিয়ে চল।’

কেমন যেন একটা অর্থপূর্ণ, যৌবনদগ্ন দৃষ্টিতে সে তাকাল গ্রিশাকা দাদুব দিকে। চিবুকে সুরসুরি দিয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল অশ্রুধারা, তবু লম্বা পোশাকের নোংরা লাগা হাতা দিয়ে চোখের জল সে মুছল না

গ্রিশাকা দাদু চাফা হয়ে উঠল

‘আমাদের এই রকম হুকুম দিয়ে তলোয়ার নাড়াল আমরা ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম। এদিকে তুর্কী ইয়ানিচাবরা রয়েছে এই ভাবে’ বলতে বলতে সে টেবিলের ঢকনার ওপর আঙুল দিয়ে একটা আঁকাবঁকা চতুষ্কোণ আঁকল ‘ওবা ত আমাদের ওপর বন্দুক ছুঁড়তে লাগল দু’বার আমরা ওদের ওপর হান দিলাম, কিন্তু ওরা আমাদের সমানে হাটিয়ে দিতে লাগল। তাবপর হঠাৎ দেখি পাশের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসছে ওদের ঘোড়সওয়ার দল আমাদের স্কোয়াড্রন-কম্যান্ডার হুকুম দিল আমরাও আমাদের ডান দিকের সারিটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে নতুন করে সাজলাম তাবপর সোজা চার্জ করলাম তাদের ওপর পিষে মারলাম ওদের কসাকদের সামনে কোন ঘোড়সওয়ারের সাধি আছে নীড়াবে? যা হবার তা-ই হল ওরা হাউমাউ করতে করতে জঙ্গলের দিকে পালাল এমন সময় দেখি কি ওদের একজন অফিসার একটা বাদামী ঘোড়ায় চড়ে আমার সামনে দিয়ে পালাচ্ছে। বেশ চালাক চতুর চেহারার জোয়ান গোছের অফিসার, কালো গৌফজোড়া নীচের দিকে ঝুলছে। আমার দিকে বারবার ফিরে তাকাচ্ছে, আর এদিকে খাপ থেকে পিস্তল বার করছে খাপটা আবার কিনা জিনের সঙ্গে বাঁধা। গুলি

ছুড়ল, কিন্তু কসকাল আমি তখন আমার ঘোড়াটাকে ঝুটিয়ে জোর ছুটিয়ে ওর নাগাল ধরলাম প্রথমে ভাবলাম দিই দু' আখলা করে, কিন্তু পরে মত পালটলাম হাজার হোক মানুষ ত রে বাবা ডান হাতে ওর কোমর জড়িয়ে ধরতেই - বোঝা কাণ্ড! জিন থেকে টুক করে মাটিতে লাফিয়ে পড়ল আমার হাত কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করে দিল তবু কিছু ঠিকই বন্দী করলাম ওকে ।

খ্রিষ্টাব্দে দাদু বিজয়ীর ভঙ্গিতে তার পাশের বুড়োর দিকে তাকাল বুড়োর তে আঁটিয়া মাথাটা ততক্ষণে বুকেব ওপর ঝুলে পড়েছে, প্রচণ্ড হৈ হুট্টোগানের মধ্যে সে দিবি, আবামে নাক ডাকিয়ে নিদ্রা যাচ্ছে

## দ্বিতীয় পর্ব

### এক

সেগেই প্রাতোভিচ মোখভ অনেক পেছন থেকে তার বংশবৃত্তান্ত টানতে পারে।

প্রথম পিওতরের রাজত্বকালে খাস্তা বিস্কুট আর গোলাবাবুদের হলাহল নিয়ে একখানা রাজকীয় বজরা একদিন দনের ওপর দিয়ে আজ্ঞা সাগরের দিকে যাত্রিল দনের উজ্জানে, খোপিওরের মোহানাব কাছাকাছি গড়ে উঠেছে কসাকদের একটা ছোট শহর 'রাহাজানদের' শহর চিগোনাকি সেখানকার কসাকরা একদিন রাতের বেলায় এই বজরার ওপর হামলা করল। গ্রহরীরা তখন থিমোছিল। তাদের মেরেকেটে ফেলে কসাকরা বিস্কুট আর গোলাবাবুদ নুটে নিল বজরাটা ডুবিয়ে দিল।

জারের হুকুমে ভরোনেজ থেকে ফৌজ এলো তারা সেই 'রাহাজানদের' শহর চিগোনাকি পুড়িয়ে ছাই করে দিল কসাকরা, যারা বজরা নুটের সঙ্গে জড়িত ছিল, কেউ বেহাই পেল না - লড়াইয়ে কোন রকম দয়ামায়া না দেখিয়ে তাদের পর্যুদস্ত করে দেওয়া হল কসাক-মেজর ইয়াকির্কা আর তার সঙ্গে যে চম্পিশজন কসাককে ওরা বন্দী করেছিল তাদের ভাসন্ত ফাঁসিকাঠের ওপর ঝুলিয়ে দিল। তারপর দনের নীচের অববাহিকার বিদ্রোহী কসাক-পল্লীগুলোর লোকজনের মনে আতঙ্কসৃষ্টির উদ্দেশ্যে সেই ভেলাগুলোকে ওরা ডাসিয়ে দিল দনের ভাটির স্রোতে

এই ঘটনার বছর দশেক পরে চিগোনাকি বসতির যে জায়গায় একদিন কসাকদের ভিটেমাটি পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল, নবাগত কিছু কসাক এবং যারা সেদিনকার তাগুবে কোন রকমে প্রাণ বক্ষা করতে পেয়েছিল তারা এসে সেখানে বসত পাতল আবার গড়ে উঠল কসাক-বসতি, তাকে ঘিরে গড়ে উঠল প্রতিরক্ষা-বাঁধ সেই সময়ই ভরোনেজ থেকে জারের হুকুমনামা পেয়ে জারের গোয়েন্দা হয়ে ওখানকার লোকদের ওপর নজর রাখার জন্য এলো নিকিতা মোখভ নামে এক চাষী ব্যবসা সে কবত হাতে হাতে, জিনিসের মধ্যে থাকত কসাকদের নিত্য প্রয়োজনীয় নানা রকমের হবিজ্জাবি - ছুরির বাঁট, তামাক, চকমকি পাথর - এই

সব সে চোরাই মাল কেনা বেচা করত বছরে দু'বার করে ভরোনেজ যেত, ডাব দেখাত যেন মালপত্তর কিনতে যাচ্ছে, কিন্তু আসলে জেলাটা যে আপাতত শান্ত এবং কসাকরা যে এখনও নতুন কোন দৃষ্টিমসৃণের মতলব কবছে না এই সব খবর সে কর্তৃপক্ষের কাছে দিয়ে আসত।

এহেন নিকিতা মোখভ থেকেই ব্যবসায়ী মোখভ পরিবারের উৎপত্তি কসাকদের মাটিতে তারা শক্ত শেকড় গাড়ল প্রচুর বীজ ছড়িয়ে দিয়ে সারা জেলায় বংশবিস্তার করে চলল রাস্তার ধারের আগাছার মতো - যতই ওপড়াও না কেন সে ঝাড়ের আর শেখ নেই ভরোনেজের ফৌজদার এককালে বিদ্রোহী কসাক-বসতিতে পাঠানোর সময় মোখভদের পূর্বপুরুষকে যে নিদর্শন পত্রটি দিয়েছিলেন তার অর্ধেকটা পচে গেলেও মোখভবা পরম প্রকাশহকারে সেটা রক্ষা করে আসছিল। আন্ধ্র হরত টিকে থাকত কিন্তু যে কাঠের ঝাঁপির মধ্যে করে ঘরের বিগ্রহের পেছনে কাগজটা রাখা ছিল সেগেই প্রাতোনভিচের ঠাকুর্দার আমলেই এক বড় অগ্নিকাণ্ডের ফলে সেটাসুদ্ধ পুড়ে ছাই হয়ে যায় ঠাকুর্দা তখন অমনিতেই সর্বস্বান্ত। তাসের জুয়ো খোলে সমস্ত সম্পত্তি খুইয়েছে। তবে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছিল এমন সময় এই অগ্নিকাণ্ড। সর্বস্ব গেল সেগেই প্রাতোনভিচকে গোড়া থেকে শুরু করতে হল পঞ্চাষাতন্ত্র বাপ মাঝা গেল তাকে কবরস্থ করা পব সেগেই প্রাতোনভিচ ব্যবসা শুরু করল কানাকড়ি দিয়ে গ্রামে গ্রামে গিয়ে সে শূয়োরের কুটি লোম আর ছাগলের রোয়া কিনতে লাগল আশেপাশের গ্রামের কসাকদের ঠকিয়ে, প্রতিটি পাই-পয়সা নিংড়ে চরম দাবিদ্রাব মধ্যে বছর পাঁচেক তাকে চালাতে হল। তারপর কেমন করে যেন 'ফড়ে সেরিওজকা'\* রাস্তারতি হয়ে গেল সেগেই প্রাতোনভিচ কসাক-বসতিতে সে মনিহারী দোকান খুলে বসল আধা পাগলা এক পুরুতের মেয়েকে বিয়ে করল বিয়েতে যৌতুক কম নিল না। তারপর একটা কাপড়ের দোকান খুলল। মোক্ষম সময়টিতে কাপড়ের ব্যবসা শুরু করেছিল সেগেই প্রাতোনভিচ। এই সময় কসাক ফৌজী সরকারের নিদেশে দনের বাঁ তীরের অনূর্ব ও কঠিন বালি আর পাথরে মোশানো এটেল মাটির জায়গাগুলো ছেড়ে কসাকদের গ্রামকে গ্রাম বসবাস করার জন্য উঠে আসতে লাগল দক্ষিণ তীরে নতুন ক্রান্তকৃতক্ষার জেলাটি দ্রুত বেড়ে উঠল, বহু দালান-কোঠায় ছেয়ে গেল। শ্রান্তন জমিদারদের জমির সীমান্তে, চির চোরনায়া ও হ্রলোভকা নদীর

\* সেরিওজকা সেগেইয়ের ডাবনামের অপভ্রষ্ট বৃণ। অবজ্ঞার্থে ব্যবহৃত সেগেই প্রাতোনভিচ' পোশাকী নামের সঙ্গে পিতৃনাম (এক্ষেত্রে 'প্রাতোনভিচ') ধরে সংশোধন সম্মতসূচক (চবিত্ত পবিত্তিতি ডঃ) অনুঃ

থারে, শ্বেপকুমির লম্বা আর চওড়া সমস্ত খাতের ওপরে, ইউক্রেণীয় বসতিগুলোর পাশাপাশি গজিয়ে উঠল নতুন নতুন গ্রাম। জিনিসপত্র কেনার জন্য লোকজনকে পনেরো-ষোল ক্রোশ এমন কি তারও বেশি যেতে হত। এমন সময় হাতের নাগালের মধ্যে কিনা মোখভের দোকান টাটকা পাইন কাঠের তাক তাকের ওপর বোঝাই না। রকমের কাপড় থেকে ভেসে আসছে সুন্দর গন্ধ। সেগেই প্লাতোভিচ তিন থাক দেওয়া অ্যাকডিয়ানের মতো ধরে ধরে তার কারবার ফলাও করে বসল কাপড় ছুড়োও গ্রামের সাধারণ গেরস্থালিতে যা যা দরকার যেমন চামড়ার জিনিসপত্র নুন, কেরোসিন, মনিহারী জিনিস সবেবই ব্যবসা করতে লাগল সম্প্রতি যথেষ্ট সরঞ্জামও রাখা শুরু করেছে সবুজ রঙের খড়খড়ি দেওয়া দোকানখরের ডে-গরটা গরমকালেও ঠাণ্ডা থাকে এই দোকান ঘরটার পাশে সুন্দর ভাবে সাজানো থাকে আক্সাই ফাষ্টবী থেকে আনা ফসল-কাটার কল, বীজ কেনার ড্রিল, মই, লাঙল ঝাড়াই আর বাছাইয়ের মানা সরঞ্জাম পরের গৌজোতে কত টাকা আছে সেটা কঠিন কিছু এটা ঠিক যে কারবার থেকে বিচক্ষণভাবে সেগেই প্লাতোভিচ ভেবে আয় বেশ ভালোই হচ্ছিল তিন বছর বাদে সে ফসল মজুত করার তোলা বসাল। তারও পরের বছর প্রথম বৌ মারা যাবার পর সে বাপে চলা আটকল বানানোর কাজে হাত দিল

তাতারস্কি গ্রাম আর তার আশেপাশের সবগুলো গ্রামকে সে দেখতে দেখতে কালো চকচকে বিরল লোমে ঢাকা পোড়া রঙের ছোট্ট মুঠিটার ভেতরে চেপে ধরল বলতে গেলে এমন কোন বাড়ি নেই সেগেই প্লাতোভিচের কাছে যার টিকি বাঁধা নই তারা সকলেই ফসল-কাটা-কলের জন্য মেয়ের বিয়ের যৌতুক যোগাড় করতে গিয়ে (মেয়ের বিয়ে দিতে হয়, এদিকে পারামনভদের মজুতের জায়গায় গানের দর বড় কম দিচ্ছে, অতএব কর্তৃ দাও প্লাতোভিচ) এবং আরও কত কিছুর জন্যই না গোলাপী রঙের পাড় দেওয়া সবুজ টিট কাগজ সেগেই প্লাতোভিচ ৫ নিয়েছে তার আটকলে নয় জনলোক কাজ করে, দোকানে কাজ করে সাত জন, তাছাড়া বাড়িতে আছে আরও চার জন চাকর মোট এই বিশটি প্রাণীর অল্পসংখ্যান হয় এই ব্যবসায়ীটির কপায় প্রথম পাঙ্কের দুই ছেলেমেয়ে মেয়ে লিজা ছেলে ডলদিমির তার চেয়ে দু'বছরের ছোট, নিজীব গোছের, রোগে ভোগে। দ্বিতীয় পাঙ্কের বৌ আল্লা ইভানভনা বাঁজা শঁটকো চেহারার নাক চোখা তার এতকালের মূলতবী, বিলম্বিত মাতৃস্নেহ আর সঞ্চিত বিশ্ব্বেষের (টোব্রিশের কোঠা পেরনের পর সেগেই প্লাতোভিচের সঙ্গে তাব বিয়ে হয়, সবটা বর্ষিত হয় বেষে যাওয়া ছেলেমেয়েদের ওপরে বিমাতাব দ্বাযবিক চরিত্র তাদের শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রে ভালো প্রভাব ফেলে নি আর বাপ আন্তাবলের সহিস নিকিতা

কিংবা রাধুনির ওপর যতটা নজর দিত তার চেয়ে বেশি নজর ছেলেমেয়েদের ওপর দিত না। ব্যবসায়ের কাজ আর নিরন্তর এখানে ওখানে যাত্রার মধ্যে এতটুকু অবকাশ সে পেত না এই মস্তো, এই নিজনি। কখনও উরিউপিন্ধায়া কখনও বা এ জেলার ও জেলার নানা মেলায় ভালোমতো তঙ্কাবধান ছাড়াই ছেলেমেয়েরা বড় হতে লাগল। সূক্ষ্ম অনুভূতিহীন আরা ইভানভনা শিশুমনের রহস্যভেদের কোন চেষ্টাই করল না। তত বড় গেরাগুলির মধ্যে সেদিকে মন দেওয়ার কোন ফুরসৎ ছিল না। তাই ভাই আর বোন পরস্পরের অচেনা হয়ে বেড়ে উঠল। তাদের দু'জনের চরিত্র হল আলাদা। যেন তাদের মধ্যে আত্মীয়তার কোন সম্পর্ক নেই। ভ্লাদিমির কোনো স্বভাবের জড় গোছের সব সময় ভুবু কঁচকে থাকে, বয়সের তুলনায় বড় বেশি গভীর। লিজা মানুষ হয়েছে বাড়ির ঝি আর রাধুনির মহলে। রাধুনিটা আবার নষ্টা, অনেক ঘাটের জল খাওয়া মাগী। তাই অল্পবয়সেই জীবনের নোংরা দিকটা জানতে লিজার আর যাকি রইল না। সে যখন আনাড়ি ধরনের লাজুক কিশোরীমাত্র তখনই এই দুই মেয়েমানুষ তার মধ্যে অসুস্থ কৌতুহল জাগিয়ে তুলল, তাই সে আপন মনে, সবার অলক্ষ্যে বুনা বিষকলের মতো বেড়ে উঠতে লাগল।

মহুরগতিতে গড়িয়ে চলল বছরগুলো।

অমনিতে যেমন হয়ে থাকে, বৃদ্ধ হয়ে পড়তে লাগল জরাজারগ্রস্ত তরুণ। বেড়ে উঠতে লাগল যৌবনের শ্যামলিমায়।

একবার সন্ধ্যাবেলায় চা পানের সময় মেয়ের দিকে চোখ পড় ত (ইয়েলিজাভেতা\* তত দিনে হাই স্কুলের পড়া শেষ করেছে, দেখতে শুনতে মন্দ হয়ে ওঠে নি - বরং বেশ চোখে পড়ার মতনই বলা চলে)। সেগেই প্রাতোনভিচ বিশ্বয়ে হতবাক হয়ে গেল। এত অবাক হয়ে গেল যে আরেকটু হলেই টলটলে সোনালি রঙের চাসুন্ধ তার হাতের পিরিচটা পড়ে যেত। মনে মনে ভাবল 'ওর মা'র মতন দেখতে হয়েছে। ওঃ ভগবান, কী মিল' বলল। 'লিজা ঘুরে দাঁড়া ত মা' একেবারে ছোট থাকতেই যে মা'র চেহারার সঙ্গে ওব আশ্চর্য রকমের মিল ছিল এটা সেগেই প্রাতোনভিচের নজরেই পড়ে নি।

ভ্লাদিমির মোখভের গায়ের রঙ রোগীর মতো হলদে, কাঁধ সবু ফিফথ ক্লাসের ছাত্র সে। আটাকলের অগুণিতার ওপর দিঘে সে হেঁটে যাচ্ছিল সে আব তার দিদি - ওরা দু'জনে সবে গরমের ছুটি উপলক্ষে বাড়ি ফিরেছে। প্রত্যেকবারই আসার পর সে যা করে, এবাবেও তেমনি চলেছে আটাকলের দিকে। বেরিয়েছে

\* লিজার ভালো নাম অনুঃ

আটর গুড়োমাখা লোকজনের ভিড় দেখতে, তাদের মধ্যে গুতোগুতি করতে, রোলার আর খাঁজকাটা চাকার সমান তালে চলার আওয়াজ আর মেশিনের বেলট ঘোরার সরসর শব্দ শুনতে। আটাকল থেকে যে সব কসাক মাল নিয়ে যায় তারা যখন সসঙ্কমে ফিসফিসিয়ে বলে 'আমাদের মালিকের ওয়ারিশ' তখন জোষামোদে তার বুক ফুলে ওঠে

উঠোনের চাবধাবে ছড়িয়ে থাকা গাড়িগুলো আর গোবরের গাদার পাশ কাটিয়ে সন্তর্পণে যেতে যেতে ভ্লাদিমির যখন গেটের কাছে এসে পড়েছে তখন তার মনে পড়ল মেশিন-ঘরটা দেখা হয় নি তাই আবার ফিরল।

মেশিন-ঘরে ঢোকান মুখে লাল বস্তুর তেলের চৌবাচ্চার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল রোলিং মিল-এর মজুর তিমফেই, কারখানার কয়লা, যাকে লোকে 'গোলাম' বলে ডাকে। আর তিমফেইয়ের সহকারী, অল্পবয়সী ছোকরা দাভিদকা। দাভিদকার সাদা দাঁতগুলো ঝকঝক করছে। প্যান্টটা হাঁটু পর্যন্ত গুটিয়ে তারা বড় একটা গর্তের মধ্যে কাদামাটি দলছিল

আরে, কত যে ঠাট্টা করে সস্তাবণ জ্ঞানাল গোলাম

'ভালো ত সব?'

'আপনার খবর ভালো ত, ভ্লাদিমির সের্গেয়েভিচ?'

'এ সব কী করছ তোমরা?'

'এই কাদামাটি ছানছি আর কি,' গোবরের পুতিগন্ধময় ঘন পাকের ভেতর থেকে অতি কষ্টে পা টেনে বার করতে করতে কাষ্ঠ হাসি হেসে ক্রুদ্ধভাবে দাভিদকা বলল। 'কামিনের পেছনে পয়সা ঠেকাতে তোমার বাপের গায়ে লাগে, আমাদের দিয়েই তাই কাজটা সেরে নেয় হাত দিয়ে জল গলে না তোমার বাপের।' হুপ হুপ করে পা চালিয়ে কাদামাটি ছানতে ছানতে সে বোগ করল

ভ্লাদিমিরের মুখচোখ লাল হয়ে উঠল। সদা হাস্যময় দাভিদকা ও তার তাচ্ছিল্যাপূর্ণ কণ্ঠস্বরের প্রতি, এমনকি তার সাদা ঝকঝকে দাঁতগুলোর ওপরও সে একটা নিদারুণ বিতৃষ্ণা উপলব্ধি করল

'জল গলে না মানে?'

'তাহাড়া আর কী? হাড় কেমন নিজের গু-মুতও খায়।' দাভিদকা মৃদু হেসে তাকে সহজ করে বুঝিয়ে দিল

\* ডাকনাম ভলোদিয়া এখানে পুরো নাম (ভালো নাম ও পিড়নাম) ধরে সম্বোধন করা হয়েছে অর্থাৎ সম্মানসূচক সম্বোধন অনুঃ

গোলাম আর তিমফেই শুর কথায় সায় দিগে মুখ টিপে হাসতে লাগল ভ্লাদিমির অপমানের খোঁচা উপলব্ধি করল। সে নীতল দৃষ্টিতে দাভিদকাকে নিরীক্ষণ করে দেখল।

‘তার মানে তুমি খুশি নও বলতে চাও?’

‘একবার এই পাঁকের ভেতরে নৈমেই দেখ না কেন টের পাবে এমন বোকা কে আছে যে খুশি হবে? তোমার পিতাঠাকুরকে এখানে পাঠাতে পারলে হত তার ভুঁড়ি খানিকটা স্বরত।’

দাভিদকা দুলতে দুলতে থপথপ করে গর্তের ভেতরকার কাদা মাখছিল, উঁচু উঁচু করে পা ফেলছিল। এবারে তার মুখেচোখে কোন ক্রোধের ভাব প্রকাশ পেল না। মজা পেয়ে সে হাসল। ভ্লাদিমির তাকুনি মনে মনে একটা মন্তব্য এঁটে ফেলল। ভবিষ্যতের ছবিটা চোখের সামনে ভেসে উঠতে সে পরম তৃপ্তি বোধ করল। জ্বৎসই উত্তর তার মুখে এসে গেল।

‘বেশ’ সে কাটা কাটা স্বরে বলল। বাবাকে তাহলে বলব, এ কাজে তুমি খুশি নও।’

এই বলে সে আড়চোখে দাভিদকার দিকে তাকাল। তার কথার যা প্রতিক্রিয়া হল তাতে সে অবাক হয়ে গেল। দাভিদকার চোঁটের কোনায় কবুণ হাসি ফুটে উঠেছে, সে জোর করে হাসছে। অন্যদের চোখমুখও ধমধমে হয়ে উঠেছে। কয়েক মুহূর্ত ওরা তিনজনেই চূপচাপ অটি-লাগা কাদামাটি ছেনে চলল। শেষকালে দাভিদকা তার কাদামাখা পা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে ক্রোধ ও ভয়াক্রম মেশানো সুরে বলল, ‘আমি শুধু ঠাট্টা করছিলাম ভলোদিয়া নহাৎই ঠাট্টা করে বলেছিলাম।’

‘তুমি যা বলেছ বাবাকে আমি জানাব।’

বাপের অপমানে, নিজের অপমানে, সেই সঙ্গে দাভিদকার কবুণ হাসির জন্য মনে মনে গ্লানি উপলব্ধি করে চোখ কেটে জল আসছে। ঝড়ে পরে ভ্লাদিমির সেখানে আর দাঁড়াল না। তেলের চৌবাচ্চাটার পাশ দিয়ে এঁটি ব গেল।

‘ভলোদিয়া ভ্লাদিমির সের্গেয়েভিচ।’ ‘ভয়া কঃ চিৎকার করে বলল দাভিদকা। তারপর হাঁফি থেকে সোজা কাদামাখা পায়ে গুব পাণ্ট নামিয়ে দিতে দিতে উঠে এলো গর্ত থেকে।

ভ্লাদিমির থমকে দাঁড়াল। দাভিদকা হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে । তার কাছে

‘আপনার বাবাকে বলবেন না ওটা একটা অমানি কথার কথা।

বোকামির জন্যে আমাকে মাফ করবেন ভগবানের দিবি, খারাপ কিছু ভেবে বলি নি। অমানি ঠাট্টা করছিলাম।’



‘বেশ, বলব না।’ ভুবু কঁচকে গলা উঁচিয়ে এই কথা বলে ভলাদিমির গোটের দিকে এগিয়ে গেল।

নাভিদকার ওপর কনুগাব উপলব্ধিটাই শেষ পর্যন্ত জরী হল। মনে মনে স্থিতি অনুভব করে সে সাদা বেড়ার পাশ দিয়ে বড় বড় পা ফেলে ফেলে চলল আটাকলের প্রাক্কণের এক কোনায় যে কামারশালাটা আছে, সেখান থেকে কানে আসতে লাগল হাতুড়ির উচ্ছ্বাসিত ঠকা ঠাই ঠাই আওয়াজ। লোহার ওপর একটা বাড়ি - চাপা ধপাস আওয়াজ তারপর দু’বার - ঠিকরে পড়ছে - সেইহি ঝনঝন করে উঠছে

‘কোথায় খোঁচা মারতে গেলি বল ত?’ যেতে যেতে ভলাদিমিরের কানে এলো গোলামের চাপা হেঁড়ে গলা ‘খোঁচাস নে, তাহলে আর দুর্গন্ধও ছাড়বে না।’

‘তবে রে শুরোরের বাচ্চা।’ তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে ভলাদিমির মনে মনে ডাবল ‘কথাব ছিঁরি দেখ বলব নাকি বলব না?’

পেছন ফিরে তাকাল, নাভিদকা তখনও আগের মতো ঝকঝকে সাদা দাঁত বাব করে হাসছে দেখে ভলাদিমির স্থির সঙ্কল্প কবে বসল ‘নাঃ, বলবই!’

দোকানের কাছেই চাতালে গাড়ির সঙ্গে জোতা একটা ঘোড়া ঝুঁটিতে বেঁধে রাখা হয়েছে। ফায়ার ব্রিগেডের চালার ওপর ধূসর মেঘের মতো দক্ষল বেঁধে চড়াই পাখিরা কিচিরমিচির করছে দেখে এক দল ছেলে তাদের তাড়া করে বেড়াচ্ছে। অলিন্দ থেকে গমগম করে ভেসে আসছে কারিগরি শিক্ষায়তনের ছাত্র বইয়ারিশকিনের গম্ভীর, উদাস্ত কণ্ঠস্বর, সেই সঙ্গে আরও একজন কার যেন গলা একটু ভাঙা ভাঙা খসখসে।

ভলাদিমির ধাপ বয়ে ওপরে গিয়ে উঠল বাড়ির দেউড়ি আর অলিন্দের গা বয়ে জড়াজড়ি করে উদ্দাম ভঙ্গিতে লতিয়ে উঠেছে বুনো আঙুরলতা, মাথার ওপব সবসর আওয়াজ করছে ফেনায়িত হয়ে জাকবিকটা নীল কার্নিস থেকে উপছে পড়ছে সবুজ পাতার চৌপার

বইয়ারিশকিনের পাশে বসে আছে স্কুল-টীচার বালান্দা। বয়সে তবুণ, কিন্তু মুখভর্তি দাড়ি গৌফ বইয়ারিশকিন তার দিকে ফিরে বেগনী রঙের কামানো মাথাটা নাড়িয়ে বলে চলছে, ‘আমি একজন কসাক-চাষীর সন্তান হলে কী হবে তাঁর লেখা পড়তে পড়তে সেই আমিও, সুবিধাভোগী সমস্ত শ্রেণীর প্রতি অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই প্রবল বিদ্বেষ সঙ্কেত। একবার ভেবে দেখুন সমাজের এই মৃতপ্রায় সম্প্রদায়টির জন্য মনে মনে নিদাঙ্গুণ কনুগা বোধ না করে পারি না আমি নিজেই যেন হয়ে যাই সেই অভিজাতদের, সেই জমিদারশ্রেণীর একজন, তারিফ করি তাদের নারী জাতির আদর্শকে আমি জড়িত হয়ে পড়ি তাদের স্বার্থের সঙ্গে এক

কথার বলতে গেলে, আমার ভেতবে ভেতরে কী যে ছাই হয় কে জানে। তাহলেই বুঝুন মশাই, প্রতিভা কাকে বলে মানুষের বিশ্বাস পর্যন্ত পাল্টে দেয়।’

বালাঙ্গা তার বেশমী কোমরবন্ধনীর খোপনাটা হাতে ধরে কচলাচ্ছিল মৃদু স্নেহের হাসি হেসে সে নিজের গায়ের জামার মুড়িতে পশমী সুতোয় তোলা নক্সা নির্দীক্ষণ করতে লাগল। লিজা একটা গদি আঁটা চেয়ারে গা এলিয়ে বসে ছিল। দেখেশুনে মনে হচ্ছিল এই সব কথাবার্তায় সে এতটুকু উৎসাহ বোধ করছে না সে তার চিরকালের অভ্যাসবশত কোন কিছু হারিয়ে ঝুঁজে ফেলার মতো উদগ্রাস্ত দৃষ্টি মেলে তাকাল বইয়ারিশ্কিনের এখানে ওখানে আঁচড়ের দাগ লাগা বেগুনী রঙের মাথাটার দিকে।

ভ্লাদিমির মাথা নুইয়ে নমস্কার জানিয়ে ওদের পাশ কাটিয়ে বাপের খাস কামরার সামনে এসে দরজার দা মারল। সেগেই প্রাতোনভিচ একটা বেশ শরীর জুড়ানো ঠাণ্ডা চামড়ার গদিতে বসে ‘বুসঙ্কয়ে বগাত্তভো’\* পত্রিকার জুনসংখ্যার পাতা ওলটাইছিল। মেঝের ওপর পড়ে ছিল হলদে রঙ ধরা হাড়ের বাঁটের একটা কাগজকাটা ছুরি।

‘কী রে, কী চাই তোর?’

ভ্লাদিমির নুই কাঁধের ভেতরে মাথাটা টেনে নিয়ে নার্ভাস হয়ে গায়ের শাটটা টেনেটেনে ঠিকঠাক করে নিল।

‘আমি যখন আটাকল থেকে ফিরছিলাম...’ ইতস্তত করে বলতে শুরু করল ভ্লাদিমির, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল দাভিদকার চোখ-খাঁধানো বাঁকা হাসির ঝলক। এবারে আর কোন ইতস্তত না করে আঁটসাঁট তসরের কাপড়ের ওয়েস্টকোটে ঢাকা বাপের নেয়াপাতি ভুঁড়িটার দিকে তাকিয়ে হিরকণ্ঠে সে বলে চলে, ‘শুনতে পেলাম দাভিদকা বলছে...’

সেগেই প্রাতোনভিচ মন দিয়ে ছেলের বৃত্তান্ত শুনল।

‘আচ্ছা যা। বরখাস্ত করে দেব বন,’ এই কথা বলতে বলতে অস্ফুট কাতর ধ্বনি করে ছুরিটা তোলাব জন্য মেঝের ওপর ঝুঁকে পড়ল।

সন্ধ্যার সময় গ্রামের বুদ্ধিজীবী লোকজন সেগেই প্রাতোনভিচের বাড়িতে আসার জমায়। তাদের মধ্যে থাকে মস্কোর কারিগরি শিক্ষায়তনের ছাত্র বইয়ারিশ্কিন।

\* ‘বুসঙ্কয়ে বগাত্তভো’ বৃন্দ সম্পদ, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও রাজনীতি সংক্রান্ত এই মাসিক পত্রিকাটি ১৮৭৬-১৯১৮ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হত। শুরুর প্রকাশিত হত মস্কো থেকে, পরে সেন্ট পিটার্সবুর্গ থেকে ১৮৮০ সাল থেকে নারোদনিক মনোভাবাপন্ন লেখক সমিতির মুদ্রণ ১৮৯৩ সাল থেকে সম্পাদকমণ্ডলী পত্রিকাটিকে নারোদনিকদের বৈধ কেন্দ্রীয় মুদ্রণে পরিণত করে—অনুঃ

নিদারুণ অসুখগ্রস্তিমা আর কয়রোগে ঝাঁকরা, শীর্ণকায় শিক্ষক বালান্দা, তার সহবাসিনী শিক্ষিকা মাফা গেরাসিমভনা এক স্থিরবৌবনা গোলগাল তরুণী, পেটি-কোটটা সব সময় অশ্রীল ভাবে বেরিয়ে থাকে, উদ্ভট ধরনের, কেমন যেন ছাতাপড়া চেহারার চিরকুমার পোস্টমাস্টার যার গায়ে গালা আর সস্তা আতরের গন্ধ। জনৈক অভিজ্ঞাত ব্যক্তি ও জমিদারের পুত্র, অল্পবয়সী লেফটেন্যান্ট ইয়েভগেনি লিন্ডনিংস্কি তাব বাপের জমিদারীতে বেড়াতে এলে কখন-সখন সেখান থেকে ওই আসরে এসে জোটে। সন্ধ্যাবেলায় তারা বারান্দায় বসে চা পান করে, যত সব আগড়ম্ব বাগড়ম্ব বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। কথাবার্তা সব পচা সূতোটা শেষ পর্যন্ত যখন ছিড়ে যায় তখন অতিথিদেব মধ্যে কেউ একজন কারুকাজ-করা কেসের ভেতরে রাখা বাড়ির দামী গ্রামোফোনটা দম দিয়ে চালিয়ে দেয়।

কদাচিৎ বড় কোন পরব উপলক্ষে সেগেই প্রাতোনভিচ লোকের চোখে ধুলো দেওয়ার চেষ্টা করে। লোকজন নিমন্ত্রণ করে এনে দামী দামী মদ আর এই উপলক্ষে যাতাইস্ক থেকে বিশেষ করে আনানো স্টার্কেন মাছের ডিম ও সেরা সেরা চাট দিয়ে তাদের আপ্যায়ন করে। অন্য সময় সে হিসেব করে চলে। একমাত্র যে ব্যাপারে সে কোন সংযমের বালাই রাখে না তা হল বইয়ের পেছনে খরচ। বই পড়তে এবং মুক্তি দিয়ে কোন বিষয়কে লতার মতো আঁকড়ে ধরে তার গভীরে অনুসন্ধান চালাতে সে ভালোবাসে।

সেগেই প্রাতোনভিচের অংশীদার ইয়েমেলিয়ান কনস্তানতিনভিচ অতিওপিন। ফেস্কাসে রঙের টুচালো দাঁড়ি, চোখদুটো রহস্যময় ছোট ছোট, কোটরে বসা। কালেভদ্রে সেগেই প্রাতোনভিচের বাড়িতে সে আসে। বিয়ে থাকে সে করেছিল সে এককালে ছিল উস্ত-মেদভেদিৎসা মঠের এক সন্ন্যাসিনী তাদের পনেরো বছরের দাম্পত্য জীবনে তারা দু'জনে আটটি সন্তানের জন্ম দিয়েছে। বেশির ভাগ সময়ই সে কাটায় বাড়িতে। ইয়েমেলিয়ান কনস্তানতিনভিচ ব্রেজিমেণ্টের কেবানি থেকে ওপরে উঠেছে। সেখান থেকেই সে পরিবারে বয়ে নিয়ে এসেছে মোসাহেবি আর লোককে তোরাজ করার হীন মনোবৃত্তি। ছেলেমেয়েরা তার উপস্থিতিতে বাড়িতে পা টিপে টিপে চলে। কথাবার্তা বলে ফিসফিসিয়ে বোজ সকালে হাতমুখ ধোয়ার পর খাবার ঘরে একটা বুলন্ত কালো কম্বিনের মতন বিরাট দেয়ালঘড়ির নীচে তারা সকলে সার বৈধে দাঁড়ায়, মা দাঁড়ায় তাদের পেছনে। যেই শোবার ঘর থেকে বাপের শুকনো কাশির আওয়াজ ভেসে আসে 'অমনি নানা গলায় নানা সুরে সকলে মিলে শুরু করে দেয় 'প্রভু, কৃপা কর তব জনে', তারপর 'ছে মোদের পিতঃ'।

প্রার্থনা যখন শেষ হয় হয় ততক্ষণে ইয়েমেলিয়ান কনস্তানতিনভিচেরও

জামাকাপড় পরা হয়ে গেছে। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে চোখের সব ফোকরগুলো ঝুঁচকে লোমহীন ন্যাড়া মাংসল হাতটা আঁচবিশপের ভঙ্গিতে সে সামনে বাড়িয়ে দেয়। ছেলেমেয়েরা এক এক করে তার সামনে এসে হাতে চুমো খেয়ে যায়। ইয়েমেলিয়ান কনস্তানতিনভিচ বৌয়ের গালে চুমো খেয়ে 'চ' বর্ণটাকে কেমন যেন আধো-আধো উচ্চারণ করে বলে

'ওগো তসা হল কি?'

'হ্যাঁ, ইয়েমেলিয়ান কনস্তানতিনভিচ '

'কভা তসা তসাই আমার '

দোকানের হিসাব নিকাশের ভার তার ওপর বড় বড় মোটা হরফে 'ডেবিট' 'ক্রেডিট' লিখে তার তলায় কেরানির পাকানো ইস্তাফরে সে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করে যায়। ধ্যাবড়া নাকটাকে অস্থখা কষ্ট দিয়ে সোনার পিশনে চশমা; এঁটে 'স্টক এক্সচেঞ্জ সমাচার' পড়ে কর্মচারীদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করে

'ইতান পেত্রোভিৎস, এই ভদ্রলোকটির দিকে একবার ভেসেয়ে দেখুন, উনি ভসিট কাপড তসান '

দ্বীর কাছে সে ইয়েমেলিয়ান কনস্তানতিনভিচ, ছেলেমেয়েদের কাছে 'বাবামতসাই' আর দোকানের কর্মচারীদের কাছে 'তসাতসা'

গ্রামের দুই পাল্লী ফাদার ভিসসারিওন আর রেভারেণ্ড ফাদার পানক্রাতির সঙ্গে সেগেই প্রাতোনভিচের সম্ভাব নেই বহু কালের বগড়া ওদের তবে ওদের নিজেরদের মধ্যেও সম্পর্ক ভালো নয়। একবোখা, কুচুটে স্বভাবের ফাদার পানক্রাতি তার ঘনিষ্ঠ লোকজনের ক্ষতি করতে ওস্তাদ। বিপত্নীক ফাদার ভিসসারিওনের গৃহস্থালি দেখাশোনার কাজ করে এক ইউক্রেণীয় মেয়েমানুষ। তারই সঙ্গে সে থাকে উপদংশ রোগের ফলে ফাদার একটু নাকি সূরে কথা বলে অমায়িক স্বভাবের লোক বাড়াবাড়ি রকমের অহঙ্কার আর কুচুটে স্বভাবের জন্য রেভারেণ্ড ফাদারকে ভালো চোখে দেখে না।

শিক্ষক বাস্তাখা ছাড়া আর সকলেরই গ্রামে নিজের নিজের বাড়ি আছে। বারোয়ারিতলার ওপর শোভা পাচ্ছে মোখভদের বিশাল জমকাল বাড়িটা বাইরের দেয়ালটা পাতলা কাঠের চাদরে ঢাকা নীল রঙ করা বাড়ির উলটো দিকে বারোয়ারিতলার ঠিক মাঝখানটাতে মাঁড়িয়ে আছে মোখভদের দোকানঘরটা দুনো দরজা দেওয়া আবছা সইনবোর্ডে লেখা আছে 'সেগেই মোখভ ও ইয়েমেলিয়ান আতিওপিনের বাণিজ্যভবন'।

দোকানের সঙ্গে লাগোয়া একটা লম্বা নীচু চাল্য, তার নীচে তল-কুঠুরি তাব শ'খানেক হাত দূরে গির্জার প্রাঙ্গণের নীচু ইটের দেয়াল, সেই সঙ্গে মোদ গির্জা

যাব গম্বুজটা একটা পরিপক্ব সবুজ পেষাজেব মতো উঠে আছে। গির্জার ওপাশে  
 বুল বাড়ির চুনকাম করা কঠিন দেওয়াল আনুষ্ঠানিকতার ধমক দিয়ে ঠাসা, আর  
 চমৎকার ছিমছাম দুটো বাড়ি। একটার রঙ নীল, বাগানের বেড়াও সেই রঙের  
 এই বাড়িটা ফাদার পানক্রাতির অন্যটার রঙ খয়েরি (যাতে দেখতে একরকম  
 না হয়), বেড়ার গায়ে জাফরিকাটা, চওড়া কুল-বারান্দা। এটা ফাদার ভিস্‌সারিওনের  
 আতিথ্যপিনের বাড়িটা আগাগোড়া দোতলা, এত সবু যে চোখে লাগে। এই  
 বাড়িটার পরেই ডাকঘর, কসাকদের খড়ু আর টিনের চাল দেওয়া ঘরবাড়ি,  
 আটাকলের গড়ানে টিনের ছাদ, তার মাথার ওপর জংধরা টিনের হাওয়া-মোরগ।

বাইরের সমস্ত জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাইরেব ও ভেতরের খড়খড়ি বন্ধ  
 করে দরজা-জানলায় ছিটকিনি লাগিয়ে ওরা বাস করে। সন্ধ্যাবেলায় কাবও বাড়িতে  
 বেড়াতে না গেলে দরজার ছিটকিনি খুলে পাহারাদার কুকুরগুলোর গলার শেকল  
 খুলে উঠানে বার করে দেয়, মুক গ্রামের স্তব্ধতা ভঙ্গ করে চলে শূণ্য রাতজাগ্য  
 চৌকিদারের লাঠি ঠোকার ঠকঠক আওয়াজ।

## দুই

আগস্ট মাসের শেষ দিকে একদিন দনের ধারে সেগেই প্লাতোনভিচের মেয়ে  
 ইয়েলিজাবেতার সঙ্গে মিতকা কোরশুনভের সৈবাৎ দেখা হয়ে গেল। মিতকা সবে  
 দনের ওপার থেকে নৌকো বেয়ে এসেছে। নৌকো ঘাটে বঁধতে যাবে এমন  
 সময় দেখতে পেল সুন্দর রঙচঙে একটা পানসী তরতর করে স্রোত কেটে  
 চলেছে। পানসীটা পাহাড়ের নীচের কোন জায়গা থেকে ঘাটের দিকে আসছে।  
 দাঁড় বাইছে বইয়ারিশকিন তার ন্যাড়া মাথাটা ঘামে ভিজ়ে চকচক করছে,  
 কপালের দু'ধারের রং ফুলে উঠেছে।

মিতকা প্রথমে ইয়েলিজাবেতাকে চিনতে পারে নি। মাথার ঝুঁ হ্যাটের নীলাভ  
 ছায়া পড়েছে তার চোখের ওপর। রোদে-পোড়া দু'হাত দিয়ে বুকে চেপে ধবে  
 আছে একগোছা জলপদ্ম।

‘কোরশুনভ’ মিতকাকে দেখতে পেয়ে সে মাথা দু'লিয়ে বলল। ‘আমাকে  
 ঠকালে তা হলে?’

‘সে কী কী করে ঠকালাম?’

‘মনে নেই বুঝি সেই যে মাছ ধরতে নিয়ে যাবে বলে কথা দিয়েছিল?’

বইয়ারিশকিন দাঁড় ফেলে দিয়ে পিঠ সোজা করল। পানসীর গলুই সঙ্গে

সঙ্গে পাবের খড়িমাটি মড়মড় করে গুড়িয়ে দিয়ে ঘস করে মাটিতে এসে ঠেকল

‘মনে আছে ?’ লাকিয়ে নৌকো থেকে নেমে আসতে আসতে লিজা হাসল

‘সময় করে উঠতে পারি নি। কাজের যা চাপ।’ মিতকা কৈফিয়তের সুরে বলল। মেয়েটিকে কাছে এগিয়ে আসতে দেখে তার নিশ্বাস বন্ধ হওয়াব উপক্রম হল

‘না, না এ চলে না’ আশি আর পারব না বলে দিচ্ছি ইয়েলিজাবেতা সের্গেয়েভনা। আপনার হাল আপনার লাঙল আপনারই থাক, আমাকে রেহাই দিন। এই হতচ্ছাড়া জলের ওপর দিয়ে কতটা পথ চালিয়ে এসেছি একবার ভেবে দেখুন দেখি দাঁড়ের ঘস্টায় আমার হাত ছুড়ে গেছে, হাতে ফোসকা পড়েছে থেকে থেকে ডাঙায় ভিড়তে হচ্ছে’

বইয়ারিশকিন তার লম্বা খালি পায়ের চোটো শক্ত করে এবড়োখেবড়ো খড়িমাটির ডেলার ওপর রাখল, তারপর ছাত্রদের ধরনের দলমোচড়া পাকানো চুশির মাথাটা দিয়ে কপাল মুছল, ওর কথার কোন উত্তর না দিয়ে লিজা এগিয়ে গেল মিতকার দিকে। মিতকা আনাড়ির ভঙ্গিতে লিজার বাড়ানে হাতটা ধবে ওর করমর্দন করল

‘তাহলে কবে মাছ ধরতে যাব ?’ মাথা পেছন দিকে হেলিয়ে চোখ কুঁচকে সে বলল

‘চাই ত কালই যাওয়া যেতে পারে’ খাড়াই মাড়ুইয়ের কাজ শেষ হয়ে গেছে, এখন যাওয়া যেতে পারে’

‘ঠকাবে না ত আবার ?’

‘না, না’

‘খুব সকালে আসবে ত ?’

ভোরের আলো ফোটার আগে আগে’

‘অপেক্ষা করব কিন্তু।’

‘আসব, মাইরি বলছি, আসব’

‘কোন জানলায় টোকা মারতে হবে ভুলে যাও নি ত ?’

‘সে ঠিক ঝুঁজে যাব করে নেব, বলে মিতকা হাসল

‘আমাকে হয়ত শিগগিরই এখান থেকে চলে যেতে হবে’ যাবার আগে মাছ ধরতে যেতে চাই।’

মিতকা চুপচাপ পানসীর তালার মরচেধরা চাবিটা হাতে নিয়ে খেলা করতে করতে লিজার ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে বইল

‘কী হল ? আর কতক্ষণ ?’ হাতের তালুর ওপর একটা নকশাকাটা বিনুক নিয়ে সেটা নিরীক্ষণ করতে করতে বইয়ারিশকিন জিজ্ঞেস করল।

এই একুনি যাব।

লিজা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল তারপর আবার কেন যেন হেসে জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের বাড়িতে কার যেন বিয়ে ছিল না?'

'হ্যাঁ, আমার বোনের।

'কার সঙ্গে বিয়ে হল?' কিছু উত্তরের কোন অপেক্ষা না করে ছোট্ট করে একটা দুর্বোধ্য হাসি হাসল। 'এসো কিছু।' সেই যে প্রথম দিন মোম্বাসের বাড়ির বারান্দায় যেমন হয়েছিল, আজও তেমনি তার এই হাসিটা মিত্কার গায়ে যেন বিছুটির জ্বালা ধরিয়ে দিল

মিতকা তাকিয়ে দেখল মেয়েটি নৌকায় উঠছে বইয়ারিশ্কিন হাঁটু ভেঙে ঝুঁকে পড়ে নৌকা জলে ঠেলে দিল। লিজা মৃদু হেসে তার মাথার ওপর দিয়ে মিত্কার দিকে তাকিয়ে বিদায়ের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল দেখল মিতকা তখনও চাৰি নিয়ে বেলা করছে

তীর থেকে হাত পঁচিশেক দূরে সরে যাওয়ার পর বইয়ারিশ্কিন মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করল

ছোঁড়াটা কে?

চেনা লোক '

হৃদয়ঘটিত কোন ব্যাপার আছে নাকি?

মিতকা ওদের কথাবার্তা শুনছিল কিন্তু দাঁড়ের আঙটার কাঁচকাঁচ আওয়াজের মধ্য দিয়ে উত্তরটা আর শুনতে পেল না সে দেখতে পেল বইয়ারিশ্কিন দাঁড়ের গায়ে শুয়ে পড়ে হাসতে হাসতে ঝটকা মেবে পেছনে ঝুঁকে পড়ল লিজার মুখ সে দেখতে পেল না - সে বসে ছিল মিত্কার দিকে পেছন করে মাথার টুপি থেকে বেগুনী রঙের ফিতে তার গড়ানে নগ্ন কঁধের ওপর গড়িয়ে পড়ে মৃদু বাতাসে তিরতিব করে কাঁপছে, গলে দূরে কোথায় মিলিয়ে যাচ্ছে, মিত্কার কাপসা হয়ে আসা দৃষ্টিকে বাজ করছে

মিতকা অমনিতে কালেভদ্রে ছিপ নিয়ে মাছ ধরতে যায় কিছু সে দিন সম্ভায় যেমন দেখা গেল এর আগে তেমন উৎসাহ নিয়ে কখনও সে তোড়জোড় করে নি। কিছু ঘূটে নিয়ে তাই জ্বালিয়ে সবজি বাগানে গিয়ে মাছের চারের জন্য কাউনের জাউ ফুটিয়ে নিল, যে সব ছিপের সূতো চলবে না সেগুলো বাতিল করে দিয়ে দ্রুত হাতে নতুন করে বঁড়ালী বাঁধল

মিখেই তার প্রকৃতি দেখতে পেয়ে অনুময় করে বলল

'আমায় সঙ্গে নে মিত্রি। একা পেরে উঠবি নে।'

'ঠিক পারব একা।'

মিথৈই দীর্ঘস্থায়ী ফেল

‘কত কাল আমরা একসঙ্গে মাছ ধরতে যাই নে আহা, সের দশেক ওজনের  
কুই-কাউল আমি ছিঁপে ধরে বাথতে পারতাম কিন্তু।’

মাছের জন্য সৈদ্ধ করা চারের কড়াই থেকে গলগল করে গরম ভাপ ওঠাতে  
মিত্কা চোখ কুচকে ছিল। সে কোন কথা বলল না। যোগাড়বস্তুর শেষ হয়ে  
গেলে সে সামনের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

খিশাকা দাদু জালার ধারে বসে ছিল নাকের ওপর তামার ফ্রেমের গোল  
চশমা বসিয়ে সে সুসমাচার পড়ছিল। দরজার চৌকাটে হেলান দিয়ে মিত্কা ডাকল

‘দাদু’

বুড়ো চশমার ওপর দিয়ে তাকাল

‘আঁ?’

‘মোরগের প্রথম ডাকের সঙ্গে সঙ্গে আমাকে তুলে দিও।’

‘অত ভোরে কোথায় যাবি?’

‘মাছ ধরতে’

মাছ দাদু অমনিতে ভালোবাসে। তবু লোক দেখানোর খাতিরে আপত্তি  
তুলে বলল

‘তোমার বাপ যে বলল কাল তিমিগলো মাজাই বাছাই করতে হবে বাজে  
সময় নষ্ট করে কাজ নেই হুঃ এই বুঝি তোমার মাছ ধরার সময় হল?’

মিত্কা দরজার চৌকাট থেকে ছিটকে সরে দাঁড়াল। এবারে সে একটা  
চালকি খাটল। বলল

‘আমার আর কী? ভেবেছিলাম দাদুকে একটু মাছ খাওয়াব তা তিসি  
ঝাড়াইয়ের কাজ যখন রয়েছে তখন না হয় না-ই গেলাম।’

‘দাঁড়া, দাঁড়া, চললি কোথায়?’ খিশাকা দাদু ঘাবড়ে গেল চশমা বুকে নিয়ে  
বলল, ‘আমি মিরোনের সঙ্গে কথা বলে দেখব এখনই যাব নাকি? একটু মাছ  
পেলে মন্দ হত না কাল আবার বুধবারও বটে। আচ্ছা যা, যা রে বোকা ছেলে,  
তুলে দেব অমন দাঁত বার করছিস কেন রে?’

মাঝরাতে দাদু এক হাতে মোটা কাপড়ের পাজামা চেপে ধরে, অন্য হাতে  
লাঠি মুঠো করে ধরে হাতড়ে হাতড়ে বাপ বয়ে নীচে নামল বুড়োর সাদা  
ভুজুড়ে মূর্তিটা কাঁপতে কাঁপতে উঠানের ওপর দিয়ে ভেসে চলে এলো গোলাঘবে  
মিত্কা মাদুরে শুরে ভৌস ভৌস করে ঘুমোচ্ছিল। বুড়ো হাতের লাঠি দিয়ে তার  
গায়ে ঝেঁচা মিল সদ্য ঝাড়াই করা গম আর ইঁদুরের নাদির গন্ধ ছাড়িও লোকজন  
বাস না করলে কোন দালানকোঠার ভেতরে যেমন গন্ধ হয় সেই রকম একটা



বাসি বাসি ধমধমে বাতাসে ও মাকড়সার গন্ধে জায়গাটা ভরে আছে

মিত্কার ঘুমের ঘোর সহজে ভাঙল না গ্রিশাকা দাদু প্রথমে তাকে আন্তে কবে লাঠি দিয়ে ঠেলা মেরে ফিসফিসিয়ে বলল

‘মিত্কা! এই মিত্কা ওরে হারামজাদা মিত্কা!’

মিত্কা ঘড়ঘড় করে নাক ডাকাতে লাগল, পাদুটো গুটিয়ে নিল বুড়ো ক্ষেপে গিয়ে এইবারে লাঠির ভৌতা দিকটা দিয়ে ওর পেটে খোঁচা মারল, ডিলের মতো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পাঁচ মিতে লাগল। মিত্কা ব্যথায় কাতরে উঠে লাঠিটা হাতে চেপে ধরল এইবারে তার ঘুম ভেঙে গেল।

‘এ যে একেবারে কুন্তকর্ণের ঘুম ইস যে ভাবে ঘুমোস যা তা কাণ্ড দেখছি।’ দাদু বকাবকি করল

‘চুপ, চুপ আর ড্যান ড্যান ক’রো না’ মিত্কা ঘুমচোখে ফিসফিস করে এই কথা বলে মেঝেব ওপব হাতড়ে পায়ের জুতো ঝুজতে লাগল

উঠোন পেরিয়ে বারোয়ারিতলায় এসে পড়ল এবারে সারা গ্রামের ওপর ছড়িয়ে পড়ল দ্বিতীয়বার মোরগ ডাকাব আওয়াজ। রাস্তায় পাত্রী ভিস্কারিওনের বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে যেতে শুনতে পেল মুরগীর ঘরে পাখা ঝাড়া দিয়ে ছোট পাত্রীর মতো গুরুগম্ভীর গলা ফাটিয়ে ডেকে উঠল মোরগ, আর তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যেন ভর পেয়ে নীচু গলায় কঁক-কঁক করে উঠল মুরগীগুলো

দোকানঘরের নীচের ধাপে বসে ভেড়ার লোমের গরম কলারের ভেতরে নাক গুজে চৌকিদার চুলছে। মোখভদের বাড়ির বেড়ার সামনে এসে মিত্কা তার ছিপগুলো আর টোপেব খলেটা মাটিতে নামিয়ে রাখল

কুকুরগুলো যাতে জেগে না ওঠে সেই জন্য পা টিপে টিপে দেউড়িতে গিয়ে উঠল। দরজার ঠাণ্ডা হাতলটা ধরে টানল ভেতর থেকে বন্ধ বারান্দার রেলিং টপকে একটা জানলার কাছে এগিয়ে গেল খড়খড়ি অর্ধেক খোলা খড়খড়ির কালো কাঁক দিয়ে ভেসে আসছে নিদ্রায় ঈষদুঃ কুমারী মেহের আর অপরিচিত মিষ্টি আন্তরের সৌরভ

‘লিজ্জাভেতা সের্গেয়েভনা’

মিত্কার মনে হল খুব জোরে ডেকে ফেলেছে তাই সে চুপ করে অপেক্ষা করতে লাগল। নিশ্চকতা ‘আচ্ছা যদি জানলা ভুল করে থাকি? যদি এমন হয় যে খোদ বাড়ির কর্তা এখানে ঘুমোচ্ছে? তা হলে আর দেখতে হবে না’ গুলিই করে বসবে হয়ত, জানলার হাতল চেপে ধরে মিত্কা মনে মনে ডাবল

‘লিজ্জাভেতা সের্গেয়েভনা, উঠে পড়. মাছ ধরতে যেতে হবে।’

আবার ডাবল, ‘জানলা ভুল হলে মাছ ধরা বেরিয়ে যাবে’

‘কী হল, উঠলে?’ রীতিমতো বিরক্ত হয়ে এই কথা বলে জানলার ফাঁক দিয়ে ঘরের মধ্যে গলা বাড়িয়ে দিল

‘কে? কে ওখানে?’ ঘুটঘুটে অন্ধকারের ভেতর থেকে ভেসে এলো মৃদু ভয়ান্ত কণ্ঠ।

‘মাছ ধরতে যাবে কিনা? আমি কোরশুনভ’

‘ও! আচ্ছা একটু দাঁড়াও।’

ঘরের মধ্যে সরসর আওয়াজ হল। উষ্ম ঘুমজড়ানো কণ্ঠস্বরে কেমন যেন মিষ্টি-মিষ্টি গন্ধ মিত্কা দেখতে পেল সামান্যতো কী একটা থসথস করে ঘরের মধ্যে নড়াচড়া করছে।

শোবার ঘরের গন্ধ নিশ্বাসের সঙ্গে টানতে টানতে আবছা আবছা ভাবল ‘ওর সঙ্গে ফুটি করে ঘুরে সময়টা কাটাতে পারলে কী ভালোই না হত তা নয়ত মাছ ধরতে যাও ওখানে বসে বসে ঠাণ্ডায় জমে যাও।

জানলাব ধারে দেখা দিল মাথায় সাদা ওড়না জড়ানো হাসি-হাসি মুখখানা

‘আমি জানলা দিয়ে বেরোচ্ছি। হাতটা বাড়িয়ে দাও।’

‘নেমে পড়’ মিত্কা ওকে সাহায্য কবল।

মিত্কার হাতের ওপর শরীরের ভার রাখতে গিয়ে সে কাছ থেকে ওর চোখে চোখ রাখল

‘দেখি হয় নি ত আমার?’

‘ও কিছু নয় আমাদের সময় আছে।’

ওরা দু’জনে দনের দিকে চলল। নিজা তার হাতের গোলাপী বড়ের তালু দিয়ে সামান্য ফুলো ফুলো চোখদুটো কচলে বলল

ওঃ কী মিষ্টি ঘুমটা ছিল! আরও একটু ঘুমোতে পারলে হত। বড় বেশি সকাল-সকাল যাচ্ছি যেন

এ-ই ত সময়।’

বারোয়ারিতলা থেকে প্রথম যে গলিপথটা চলে গেছে সেটা ধরে তার দনের দিকে নেমে গেল রাতারাতি কোথা থেকে যেন জল বেড়ে গেছে গতকালই শুকনো ডাঙার ওপরে পড়ে থাকা একটা গুড়ির সঙ্গে নৌকোটা বাঁধা ছিল এখন চারপাশে জল থে থে করছে, নৌকো মোল খাচ্ছে

‘জুতো খুলতে হবে নৌকো পর্যন্ত দূরত্বটা চোখের আঙ্গায়ে মাপতে মাপতে দীর্ঘশ্বাস ফেলল নিজা।

‘এসো না, তোমাকে কোলে করে নিয়ে যাই?’ মিত্কা প্রস্তাব করল

‘না, না কেমন যেন অসোয়াস্তি লাগছে আমি বরং জুতোই খুলি।’

‘অসোয়াস্তির কিছু নেই, বরং সেটাই সোজা হবে’

‘কাজ নেই বাপু,’ কৃষ্ণাজড়িত স্বরে আমতা-আমতা করে বলল সে

মিতকা বাঁ হাতে তার হাঁটুর খানিকটা ওপরে জড়িয়ে ধরে অবলীলাক্রমে তুলে ধরল তাকে তারপর হুপাত হুপাত করে জল ভেঙে এগোতে লাগল নৌকোর দিকে লিজা নিজেব অজানতেই মিতকার রোদে পোড়া তামাটে শক্ত থামের মতো ঘাড়টা অঁকড়ে ধরে পাখির কৃজনের মতো মৃদু আওয়াজ করে হাসল।

গ্রামের মেয়ে-বৌরা যে-পাথরটার ওপর কাঠের কেলন দিয়ে আছড়ে আছড়ে কাপড় কাচে, মিতকা যদি তাতে হৌচট না খেত তা হলে আকস্মিক ছোট্ট চন্দনের ঘটনাটি ঘটত না চমকে উঠে সে মিতকার ফটল-খরা ঠোঁটে মুখ চেপে ধরল, মিতকাও সঙ্গে সঙ্গে নৌকোর ছাইরঙা গা থেকে দু’পা দূরে ধমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ওর জুতোর ভেতর দিয়ে গল্গল্ করে জলের স্রোত বয়ে গেল পাদুটো হিম হয়ে গেল। নৌকোর বাঁধন খুলে জোরে ধাক্কা দিয়ে গুঁড়ি থেকে সরিয়ে দিয়ে চলন্ত নৌকোয় লাফিয়ে উঠে পড়ল সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছোট দাঁড় দিয়ে নৌকো বাইতে লাগল পাছ গলুইয়ের পেছনে জল ছলছল করে বৈদ্যে বয়ে চলেছে নৌকো স্বচ্ছন্দে জল কেটে নাক উঁচিয়ে তরতর করে ছুটে চলেছে অপর পাড়ের দিকে নৌকোর খোলের ভেতরে মাছ ধরার ছিপগুলো ল্যাফাতে ল্যাফাতে খনখন করতে লাগল

‘কোন দিকে চালাচ্ছ নৌকো?’ পেছন ফিরে তাকাতে তাকাতে লিজা জিজ্ঞাস

ওপাড়ে

বালিয়াড়ির পায়ে এসে নৌকোটা ভিড়ল মেয়েটার সম্মতির অপেক্ষা না করে মিতকা তাকে দু’হাতে পঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে পাড়ের কাছের কাঁটাকোপের ভেতবে নিয়ে এলো মিতকার মুখ সে আঁচড়াল, কামড়াল, বার দুয়েক অফুট আঁঠনাদ করল শেষে যখন বুঝতে পারল যে শক্তি ফুরিয়ে আসছে তখন রাগে সে ফৌপাতে লাগল, কিন্তু চোখের জল ফেলল না।

ওরা যখন ফিরে এলো তখন প্রায় ন’টা বাজে। আকাশ ছেয়ে গেছে হলদে-লাল কুয়াশায় দনের বৃকে বাতাস নাচছে, কেশর ফুলিয়ে ছুটে চলেছে তরঙ্গরাশি আড়াআড়ি ভাবে ঢেউ এসে পড়ছে। নৌকো নাচতে নাচতে সেই ঢেউ ডিঙিয়ে চলেছে গভীর জলরাশি ভেদ করে কনকনে ঠাণ্ডা ফেনার কণা ছিটকে এসে লিজার নিঃশেষিত পাণ্ডুর মুখের ওপর ঝাপটা মারছে, গড়িয়ে পড়ছে, ঝুলে আছে তার চোখের পাতার, মাথার ওড়নার তলা থেকে বেরিয়ে পড়া চুলের গোছায়।

সে ক্রান্ত ভাবে শূন্য দৃষ্টি মেলে তাকাল চোখ কৌচকাল কোথা থেকে যেন দৈবাৎ একটা ফুল নৌকোর ভেতরে এসে পড়েছিল আঙুলের ভেতরে মুচড়ে তার ডাঁটাটা ভাঙতে লাগল। মিতকা ওর মুখের দিকে না তাকিয়ে নৌকো বেয়ে চলল তার পায়ের কাছে একটা ছোট বৃহৎ আঁর ব্রিম মাজ পড়ে আছে ত্রিম মাজটার মুখে মৃত্যুযন্ত্রণার একটা স্থির ছাপ পড়েছে, কমলারঙের রেশমায় ঘেরা তার একটা চোখ বিফারিত মিতকার মুখের ওপর ফুটে উঠেছে একটা অপরাধী ভাব উদ্বেগের সঙ্গে তৃপ্তির মিশ্রণ

‘সেমিওনভের ঘাটে তোমাকে নামিয়ে দেব আমি তোমার পক্ষে কাছে হবে,’ নৌকো স্রোতের মুখে ঘোরাতে ঘোরাতে সে বলল।

‘বেশ,’ ফিসফিস করে সম্মতি জানাল লিজা

তীর জনমানবশূন্য দনের উঁচু পারের মাথার ওপরে সবজি বাগানের বেড়াগুলো ঝড়িমাটির সাদা ধুলোয় ছাওয়া এখন গরম হলকায় ঝলসে গিয়ে পোড়া ডালপালার গন্ধে বাতাস পরিপূরিত করে দিচ্ছে। চড়ুই পাখিতে ঠুকরে ঝাওয়া সূর্যমুখীর ভারী মাথাগুলো যতদূর সম্ভব পেকে ওঠার ফলে মাটিতে হেলে পড়ে আলগা বীজ সব ছড়িয়ে দিচ্ছে। কচি দূর্বাঘাস উঠে কূলের জলামাঠের ওপর ছড়িয়ে দিয়েছে মরকতের আভা। দূরে অশ্বশাবকেরা পা হুঁড়ছে, তাদের গলায় ঝোলানো ছোট ছোট ঘণ্টির একটানা হাস্যকঙ্কার দক্ষিণের গবম হাওয়ায় ভেসে আসছে দনের দিকে

ইয়েলিজাভেতা নৌকো থেকে নামতে মিতকা একটা মাজ তুলে তার দিকে বাড়িয়ে দিল

এই যে মাও। তোমার ভাগটা ত নেবে

সচকিত হয়ে তাকাতো তার চোখের পাতা কেঁপে উঠল মাজটা নিল

‘আচ্ছা, চলি।’

‘আচ্ছা

মাজটা একটা বেতের ডালে গাঁথা ছিল ডালটা সামনের দিকে বাড়িয়ে হাতে ধরে নিয়ে চলল সে এই কিছুক্ষণ আগে কীটাকোপের মধ্যে সমস্ত আত্মবিশ্বাস আর প্রফুল্লতা জলাঞ্জলি দিয়ে তাকে এখন দেখাচ্ছে করুণ, বিভ্রান্ত

‘লিজাভেতা!’

ডাক শুনে সে ঘুরে দাঁড়াল তার বৃত্তে ফুটে উঠল প্রচ্ছন্ন বিরক্তি ও বিস্ময়

‘এদিকে ফের দেখি একটু’

লিজা কাছে আসতেই নিজের কুণ্ডাবোধে নিজেরই যেন বিরক্ত হয়ে মিতকা বলল, ‘আমরা কিন্তু ভালোমতো খেয়াল করি নি ইস, তোমার ঘাঘবার

পেছন দিকটাতে একটা দাগ দেখছি অবশ্য খুবই ছোট

লিজাব মুখে রক্তোচ্ছ্বাস খেলে গেল, কান পর্যন্ত লাল টকটকে হয়ে উঠল।

মিত্কা একটু চূপ করে থেকে পরামর্শ দিল, 'পেছন দিকের গলি ধরে যাও'

'যেখান দিয়েই যাই না কেন, বারোয়ারিতলা আমাকে পেরোতেই হবে কালো ঘাঘরাটাই পরে আসতে চেয়েছিলাম' ফিসফিস করে সে বলল সঙ্গে সঙ্গে মিত্কার মুখের ওপর দৃষ্টি পড়তে একটা ব্যাকুল বিষন্নতায় ও আকস্মিক ঘৃণায় তার মন ভরে উঠল

'পাতা ঘসে সবুজ কবে দিই?' মিত্কা সরল ভাবে প্রস্তাব করল লিজাব চোখ জলে ভরে উঠতে দেখে সে অবাক হয়ে গেল

বাতাসের সরসর আওয়াজের মতো সাতকান হয়ে সারা গায়ে ছড়িয়ে পড়ল সেই বার্তা মিত্কা কোবশুনভ সেগেই প্লাতোনভিচের মেয়েকে নিয়ে মজা লুটেছে। ভোরবেলায় গোবু বাছুর মাঠে চরাতে যাবার সময় মাঠে বার করার পর কুয়োতলার ছাইমণ্ডের ধুলো-ওড়ানো কপিকলের এক ফালি ছায়ায় নীচে বালতির জল ছলাত ছলাত ছলকাতে ছলকাতে কিংবা দনের ধারে পাথরের পাটাব ওপর আছড়ে জামাকাপড় কাচতে কাচতে মেয়েদের মধ্যে সেই একই কথা

'নিজের মা না থাকলে যা হয়'

'বাড়ির কঠার নিজের ত নিশ্চেস ফেলারও সময় নেই। আর সংগ্রাম ত দেখেও দেখে না'

চৌকিদার দাভিদকাই ত বলেছে 'মাঝরাতে টহল দিতে গিয়ে দেখি বাড়ির শেষ জানলাটার কাছে একটা লোক ঘুরঘুর করছে। ভাবলাম প্লাতোনভিচের বাড়িতে বুঝি চোরে সিন কাটছে আমি তাই ছুটে গেলাম। ভাবলাম কে ওটা? দাঁড়াও না পুলিশ ডাকছি' শেবকালে দেখি কি আর কে? আমাদের মিত্কা

'আজকালকার মেয়েরা সব যা হয়েছে' পা থেকে মাথা পর্যন্ত পাপে ডুবে আছে

'মিত্কা আমার মিকিশকাকে আবার বড়াই কবে বলে কি জান? ওই মেয়েকে নাকি বিয়ে করবে।'

'ইঃ গোডিম না ভাঙতেই কিনা'

'শোনা যায়, জোর কবেছিল, ওর ওপর নাকি জোর খাটিয়েছিল

'আরে রাখ দেখি দিদি ওসব গল্প আমরা ঢের শুনছি'

রাস্তায় ঘাটে অলিতে-গলিতে গড়তে গড়তে চলল এই গুজব। নতুন ফটকের ওপর পুর করে আলকাতরা লেপে দিলে যেমন হয়, দেখতে দেখতে মেয়েটার আগেব সুনামে সেই বকম কালি পড়ল

এই গুজব শেষ পর্যন্ত সেগেই প্লাতোনভিচেরও কানে গেল তার ঢাক পড়-পড় মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। পুরো দুদিন সে বাড়ি থেকে বেরোল না দোকানে গেল না। কারখানায়ও গেল না বাড়ির বাইরের মহলের একটা ঘরে যে দাসী থাকত সে-ই কেবল এসে খাবার তৈরি করে দিয়ে যেত।

তিন দিনের দিন একটা হালকা ফিটন গাড়িতে দূরত্ব ছিট দেওয়া তেজী ঘোড়া জুতে সেগেই প্লাতোনভিচ সদরে যাত্রা করল। পথে যে সব কসাকের সঙ্গে দেখা হল দুর্ভেদ্য। গুরুগম্ভীর ভঙ্গিতে তাদের দিকে তাকিয়ে সে মাথা নাড়ল। তার গাড়িটা যাত্রা করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের উঠোন থেকে গডগড করে বেরিয়ে এলো কালো চকচকে বাণিশ কবা আরেকটা ঘোড়ার গাড়ি। এ গাড়ির কোচম্যান ইয়েমেলিয়ান। ছোট একটুখানি দাড়ি, পাকতে শুরু করেছে মুখে সর্বক্ষণ লেগে আছে একটা বাকা পাইপ। দেখলে মনে হয় যেন খুতু দিয়ে তার দাড়ির সঙ্গে সাঁটা ইয়েমেলিয়ান নীল রঙের রেশমী লাগ্যম হাতে জড় করে নিয়ে ঝাঁকুনি দিল, সঙ্গে সঙ্গে কালো কুচকুচে টগবগে ঘোড়াদুটো খটাখট শব্দে রাস্তা ঘরে ছুটল। ইয়েমেলিয়ানের বিশাল খাড়া পিঠের আড়ালে অর্ধেক ঢাকা পড়ে আছে ইয়েলিজাবেতা। তার মুখ পাণ্ডুর। হাতে ধরে আছে একটা হানকা সুটকেস, মুখে করুণ হাসি ফটকের কাছে ভলদিমির ও সৎমা দাঁড়িয়ে ছিল তাদের উদ্দেশ্যে সে হাত নাড়ল ঠিক এই সময় পাণ্ডুলেই প্রকোফিয়েভিচ খৌড়াতে খৌড়াতে দোকান থেকে বেরিয়ে আসছিল কৌতূহল হতে ওদের বাড়ির খাস-চাকর নিকিতাকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের কর্তার মেয়েটি চলল কোথায় গো?'

নিকিতাও এই সাধারণ মানবিক দৌর্বলাকে প্রশ্রয় দিয়ে উত্তবে বলল, 'মস্কোয় চলেছে, পড়াশুনো করতে।'

পরের দিন যে ঘটনা ঘটল তা বহুদিনের মতো দনের ধারে কুয়োতলায় কপিকলের হারায়, গোরুবাহুর চরাতে নিয়ে যাবার পথে সর্বত্র লোকজনের আলোচনার ও চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়াল। গোখুলির দিকে খুরে ধুলো উড়িয়ে গোরুব পাল গোঠ থেকে ঘরে ফিরে এসেছে, এমন সময় মিত্কা এলো সেগেই প্লাতোনভিচের কাছে লোকের চোখ এড়ানোর জন্য সে ইচ্ছে করেই একটু দেবি করেছে এসেছে সে শুধু শুধু দেখা করতে নয়। তার মেয়ে ইয়েলিজাবেতার সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে।

এর আগে ইয়েলিজাবেতার সঙ্গে তার বার চারেকের বেশি দেখা হয় নি শেষবার যখন দেখা হয় তখন তাদের মধ্যে কথাবার্তা হয়েছিল এই রকমের 'আমাকে বিয়ে করবে লিজাবেতা. আঁ?'

‘মাথা খারাপ

তোমাকে ভালোবাসব যত্ন করে রাখব      আমাদের কাজের লোকজন  
আছে, তুমি জানলার ধারে বসে বসে বই পড়বে।’

তুমি একটা হাঁদারাম

মিতকা মনে কষ্ট পেয়ে চুপ করে গেল। সেই দিন সন্ধ্যাবেলায় সে রোজকার  
চেয়ে আগে আগে বাড়ি ফিরল। পরদিন সকালে মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচকে অর্ধাক  
করে দিয়ে ঘোষণা করল

‘বাবা, আমার বিয়ে দিতে হবে ’

‘ভগবান, ওকে ক্ষমা করো।’

‘না না ঠাট্টা নয়, সত্যি বলছি।’

‘অত তাড়াটা কিসের শুনি?’

‘ধাকলেই বা সোষের কী?’

‘কে তোর মাথা বিগড়ে দিল বল ত? হাবা মেয়ে মার্গা নয়ত?’

‘সেগেই প্রাতোনভিচের বাড়িতে ঘটক পাঠাও।’

মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ ঘোড়ার সাজ মেরামত করছিল এবারে সেলাইয়ের  
সরঞ্জাম যত্ন করে বেঞ্চের ওপর নামিয়ে রেখে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল।

‘তোর হল কী রে? আজ দেখছি বেশ খোশমেজাজে আছিস।’

কিন্তু মিতকা ভেড়ার মতো গৌ ধরে রইল বাপ এবারে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল

‘বুদ্ধির টেকি সেগেই প্রাতোনভিচের পুজি লাখখানেকেরও ওপরে সে হল  
একজন ব্যবসায়ী আর তুই? ভাগ এখন থেকে, নইলে দেখছিস এই চামড়ার  
বেল্টটা? - বর হবার সাধ বেরিয়ে যাবে এখন ’

আমাদের চৌদ্দ জোড়া বলদ আছে, আর তালুক তাই বা কম কিসের?  
তাছাড়া হাজার হোক সে একজন চাষা আর আমরা হলেম গিয়ে কসাক ’

‘ভাগ বলছি ’ মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ সংক্ষেপে হুকুম দিল কথা বাড়াতো  
সে ভালোবাসে না

একমাত্র ঠাকুর্দার কাছেই মিতকা সহানুভূতি পেল। বুড়ো গ্রিশাকা হাতের  
লাঠি দিয়ে মেঝে ঠুকতে ঠুকতে ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে ছেলের কাছে এসে হাজির হল

‘মিরোন ’

‘কী বলছেন?’

‘তুই অমন অমত করছিস কেন বল ত? ছেলেটার যখন মাথার ঢুকছে তখন ’

‘বাবা, আপনি দেখছি একবারে ছেলেমানুষ ভগবানের দিবা।’ ছেলেমানুষ  
ছাড়া আর কী? মিত্রিটা না হয় একটা হাঁদারাম, কিন্তু আপনারও বুদ্ধির বলিহারি ’

'চোপ্‌ রও' বুড়ো মেঝেতে লাঠি ঠুকল। 'আমরা ওদের পালাটি ঘর নই বলতে চাস? আরে এক কসাকের ব্যাটা যে ওর মেয়ের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছে তাতে ওর বর্তে যাওয়া উচিত। বিয়ে ত দেবেই, সেই সঙ্গে আরও কিছু দেবে সারা তল্লাটে আমাদের নাম ডাক আছে আমরা ত আর কাঙাল নই। ঘর-গেবস্থান আমাদের বাড়-বাড়ন্ত। তা নয়ত কি? যা না মিবোন একবার গিয়েই দাখ না রে। দেখবি আটাকলাটা যেন বিয়ের ষোড়ুক হিসেবে দেয়। চেরে দেখিস!'

মিবোন গ্রিগোরিয়েভিচ রাগে জ্বলে উঠল। উঠোনে বেরিয়ে পড়ল সে। এদিকে মিত্কা ঠিক করল সঙ্গে পর্যন্ত দেখে নিজেই যাবে মোখভের কাছে। বাপের জেদ তার জানা আছে - কিছুতেই টলার নয় - ভাঙবে, তবু মচকাবে না।

মোখভদের বাড়ির সদর পর্যন্ত দিবা শিস দিতে দিতে গেল, কিন্তু তার পরেই তার আর সাহসে কুলোল না মুহূর্তের জন্য জায়গায় দাঁড়িয়ে একটু উসখুস করে শেষকালে উঠোন ধরে এগিয়ে গেল কড়মড়ে কলপ লাগানো একটা আঙরাখা বুকের সামনে ঝুলিয়ে ঝনঝন আওয়াজ তুলে একজন দাসীকে বাড়ির মেউড়িতে ঘোরাঘুরি করতে দেখে জিজ্ঞেস করল, 'কর্তা বাড়ি আছেন?'

'চা যাচ্ছেন। অপেক্ষা কর।'

বসে বসে অপেক্ষা করতে লাগল একটা সিগারেট ধরিয়ে টানতে শুরু করল শেষ হয়ে যাওয়ার পর আঙুলে থুতু দিয়ে নেভাল অবশিষ্ট অংশটা পা দিয়ে মাড়িয়ে মোকের মাটির সঙ্গে তালো করে মিশিয়ে দিল। ওয়েস্ট-কোর্ট থেকে খাজা বিস্কুটের গুড়ো ঝাড়তে ঝাড়তে বেরিয়ে এলো সেগেই প্রাতোনভিচ। মিত্কাকে দেখতে পেয়ে অবাক হয়ে ভুরু নাচাল

'ডেতরে এসো।'

মিত্কাই প্রথম ঢুকল মোখভের খাসকামরায়। ঘরের ডেতরটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা, বেশ আরামের বই আর তামাকের গন্ধে ভুরভুর করছে। মিত্কা অনুভব করল যে সাহস সম্বল করে সে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। ঠিক এই ঘরের চৌকাট পর্যন্ত এসেই তা ফুবিরে গেল

সেগেই প্রাতোনভিচ টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল তারপর জুতোর গোড়ালিতে স্তর দিয়ে কিচ করে আওয়াজ তুলে ঘুরে দাঁড়াল

'কী ব্যাশার?' পেছনে হাতের আঙুলগুলো দিয়ে লেখার টেবিলের ওপর সে আঁচড় কাটতে লাগল।

'আমি জানতে এলাম মোখভের চোখদুটো ভাঁটার মতো ঘুবছে, তাব সেই দৃষ্টির ঠাণ্ডা কনকনে পাকে মিত্কা তলিয়ে গেল একটা শীত-শীত ভাব



এসে ভর করতে কাঁধদুটো কৈপে উঠল

‘লিজ্জাভেতাকে আমার সঙ্গে বিয়ে দেবেন কি?’ খরাব সময় মাটি শিশিরে ভিজলে যেমন হয় হতাশা ক্রোধ ভয় সব মিলে কৃপণের মতো সামান্য এক বিন্দু ঘাম করিয়ে দিয়ে হতবুদ্ধি মিত্কার মুখটাকেও সেইরকম কবুণ করে তুলল।

সেগেই প্রাতোনভিচের বাঁ ভুরুটা কৈপে উঠল ওপরের চোঁটটা সে এমন ভাবে ওলটাল যে লাল টুকটুকে ভেতবটা সামনে উঁচিয়ে রইল গলা বাড়িয়ে গোটা শরীর সামনের দিকে ঝুকিয়ে দিল সে

‘কী?’ কী-ই-ই? পাঁজি বদমাশ ভাগ এখন থেকে। আতমানের কাছে নিয়ে যাব তোকে।’ শূয়োবের বাচ্চা। ই-ত-র।

অন্যের গলার চিংকারে মিত্কা যেন সাহস ফিরে পেল। সে লক্ষ করে দেখল সেগেই প্রাতোনভিচের দুই গাল নীলাভ লাল রঙের রক্তোচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ছে

‘অপরাধ নেবেন না আমি ভেবেছিলাম যে দোষ করেছি সেটা শোধরাব

সেগেই প্রাতোনভিচ চোখের জল আর রক্তোচ্ছ্বাসে নীত চোখদুটো পাকিয়ে বিশাল ঢালাই লোহার একটা ছাইদানি ধাঁ করে মিত্কার পা লক্ষ্য করে ছুড়ে মারল সেটা ঠিকরে উঠে মিত্কার বাঁ পায়ের মালাই চাকিতে গিয়ে লাগল, কিন্তু মিত্কা অবিচল থেকে ব্যথা সহ্য করল, এক ষট্কার দরজাটা খুপে ফেলল, তারপর যন্ত্রণায় ও ক্ষোভে দাঁত মুখ খিচিয়ে লজ্জাব মাথা খেয়ে চিংকার করে বলল

‘আপনার যেমন মর্জি সেগেই প্রাতোনভিচ যা ভালো মনে করেন। আমি কিন্তু মনেপ্রাণেই চেয়েছিলাম এখন কে-ই বা ওকে বিয়ে করতে রাজী হবে? ওব নামে যে টি-টি পড়ে গেছে সেটা ঢাকার জন্যেই না নয়ত অন্যের এঁটো কারই বা দরকার বলুন? কুকুরেও ছোঁবে না’

সেগেই প্রাতোনভিচ দল্য পাকানো বুঝাল চোঁটের ওপর চেপে ধরে মিত্কার পেছন পেছন ছুটল সদর দরজার বাস্তুটা সে আটকে দিল মিত্কা ছুটে উঠানে এসে পড়ল উঠানে মোতায়েন ছিল কোচোয়ান ইয়েমেলিয়ান এবারে তার দিকে তাকিয়ে সেগেই প্রাতোনভিচকে চোখের একটিমাত্র ইশারা করতে হল। গেটের শক্ত কবে আঁটা হুড়কেটা খোলাব জন্য মিত্কা যতক্ষণ টানটানি করতে লাগল ততক্ষণে ইয়েমেলিয়ান চালাঘরের কোনা থেকে চারটে কুকুরের বাঁধন খুলে ছেড়ে দিয়েছে কুকুরগুলো একজন অচেনা লোককে সামনে দেখতে পেয়ে চার পা তুলে ঝাঁট দেওয়া পরিষ্কার উঠানের ওপর দিয়ে তীব্রবেগে ছুটল

১৯১০ সালে নিজনি নোভগরদের এক মেলায় সেগেই প্রাতোনভিচ একজোড়া কুকুরছানা কিনেছিল একটা মর্দা আরেকটা মাদী কুকুরছানাদুটো ছিল কালো, গায়ের লোম কৌকড়া, ভাবী চোয়াল এক বছরের মধ্যে তারা ধাঁক ধাঁক করে

খেঁড়ে আকারে এক বছরে বাছুরের সমান হয়ে দাঁড়াল। প্রথম প্রথম মোখভদের বাড়ির উঠানের পাশ দিয়ে যে কোন মেয়ে-বৌকে যেতে দেখলেই তারা তার ঘোঁরা টেনে ছিঁড়ত। তারপর মেয়েদের মাটিতে ফেলে দিয়ে তাদের ঠাণ্ড কামড়ানোর বিদ্যাও রপ্ত করল, কিন্তু শেষকালে যখন ফাদার পানক্রাতির একটা বকনা বাছুর আর অতিওপিনের একজোড়া খাড়ি শূরোরকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে মেরে ফেলল একমাত্র তখনই সেগেই প্রাতোনভিচ ওদের শেকল দিয়ে বেঁধে বাথার চুকুম দিল। ছাড়া হত রাতের বেলায়, আর বছরে একবার - বসন্তকালে, সসমের সময়

মিতকা ঘাড় ফিবিয়ৈ তাকাতে না তাকাতে সামনের কুকুরটা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। থাবা দিয়ে কাঁধ চেপে ধরে তার তুলো ভরা কোঁটার ভেতরে দাঁত বসিয়ে দিল। কুকুরের কালো ঝাঁকটা কামড়াকামড়ি টানটানি করতে লাগল। বাতে মাটিতে না পড়ে যায় সেই চেঁচায় দু'হাতে আক্রমণ চৈকিয়ে চলল মিতকা। এক ঝলকের জন্য সে দেখতে পেল ইয়েমেলিয়ানকে পাইপ থেকে ফুলকি ওড়াতে ওড়াতে রান্নাঘরের ভেতরে চলে গেল সে, দড়াম করে বন্ধ করে দিল স্তম্ভ-করা দরজাটা।

দেউড়ির এক কোনায় ড্রেন-পাইপের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল সেগেই প্রাতোনভিচ চকচকে শক্ত কুটির মতো লোমে ভর্তি সাদা হাতের মুঠো পাকানো মিতকা চলতে চলতে কোন রকমে গেটের হুড়কোটা টেনে খুলে ফেলল, তারপর রক্তাক্ত পায়ের সঙ্গে সঙ্গে উঠোন থেকে ছেঁচড়ে বার করে আনল কামড়ে থাকা কুকুরের ঝাঁক। গর্জন করে চলছে উগ্র চিমসে গন্ধ ছাড়ছে তাদের গা থেকে প্রথমটাকে মিতকা টুটি টিপে দম বন্ধ করে মেরে ফেলল। বাকিগুলোকে পথ চলতি কসাকবা অতি কষ্টে মেরে ত্যাগাল

## তিন

মোখভদের ঘর সংসারের সঙ্গে নাভালিয়া বেশ খাপ খাইয়ে নিল। মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ তার ছেলেমেয়েদের কড়া শিক্ষায় মনুষ্য করে তুলেছে অটেল টাকাপয়সা এবং বাড়িতে খাটখাটুনির মতো যথেষ্ট মানুষজন থাকলে কী হবে, ছেলেমেয়েদের সে কাজ শিখিয়েছে খাটিয়ে মেয়ে নাভালিয়া তার স্বশুর শাশুড়ির মন জয় করে নিল। বড় ছেলের বৌ দারিয়ার কেবল সাক্ষীগোক্তের দিকে ঝোঁক ইলিনিচনা অমনিতেই ভেতরে ভেতরে তাকে অপছন্দ করত এখন নাভালিয়াকে পেয়ে প্রথম দিন থেকেই তাকে কাছে টেনে নিল।

‘আহা বাহু! আমার ঘুমোও ঘুমোও! অত সকালে ওঠার কী আছে?’ রান্নাঘরে ভারী ভারী পায়ে থপথপ করে হাঁটতে হাঁটতে স্নেহবিগলিত মধুর কণ্ঠে বুড়ি বলে। ‘যাও গো আরেকটু ঘুমিয়ে নাও, তোমাকে ছাড়াই আমরা চালিয়ে নেব ‘খন’।’

রান্নাবান্নার কাজে সাহায্য করতে হবে বলে নাভালিয়া খুব ভোরে উঠেছিল শাশুড়ির কথায় সে সামনেব বাড় ঘরে শূতে চলে যায়।

এমন কি যে পাঙ্কেলেই প্রকোফিয়েভিচ বাড়িতে এত কড়া সেও বৌকে বলে, ‘শুনছ গিল্লি নাভাশাকে জাগিও না, অমনিতেই দিনে খেটে খেটে হয়রান হয়ে যায় গ্রিশ্কার সঙ্গে মাঠে যাচ্ছে চাষ কবতে। তাড়া দিতে হয় ওই দারিয়াটাকে দাও। ওটা গোপ্পায় গেছে, কুঁড়ে মানী খালি গালে বড় মাথা আব ভুবু কালো করা। খানকীর মেয়ে!’

‘হ্যাঁ, অদ্ভুত প্রথম বছরটা একটু আশ্রয় করে নিক না।’ সারা জীবন হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে তার নিজের কেমন মাজা পড়ে গেছে সে কথা মনে হতে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ইলিনিচনা

গ্রিগোরি তার নতুন-বিয়ে-করা জীবনের সঙ্গে একটু একটু করে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে লাগল তার আগের সেই বীজ আর বইল না। কিন্তু সপ্তাহ তিনেক পরে শব্দা ও বিরজির সঙ্গে সে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করল যে আন্নিনিয়ার সঙ্গে তার সম্পর্কটা শেষ হয়েও একেবারে ছিঁড়ে যায় নি বুকের ভেতরে একটা কাঁটার মতো যেন বচুচ্চ করছে। সে বুঝতে পারল যে এই জ্বালা সহজে যাবার নয়। বিয়ে করার দুরন্ত উচ্ছ্বাসে যে ক্ষতটাকে সে হালকা মনে এই বলে বাতিল করে দিয়েছিল যে সময়ে শুকিয়ে যাবে, ভুলে থাকা যাবে, তাব শিকড় কিন্তু অনেক গভীরে ছিল ভুলে থাকা সম্ভব হল না, স্মৃতিচারণের সঙ্গে সঙ্গে সেই ক্ষতমুখে রক্ত বরতে লাগল। বিয়ের আগেও একবার যখন পেত্রোর সঙ্গে মাড়াইয়ের জায়গায় ফসল মাড়াইয়ের কাজ কবছিল সেই সময় পেত্রো তাকে জিজ্ঞেস করে

‘আন্নিনিয়ার কী হবে রে গ্রিশ্কা?’

‘কী আবার হবে?’

‘ফেলে দিতে মায়া লাগবে না?’

‘আমি ফেলে দিলে আর কেউ ভুলে নেবে,’ গ্রিশ্কা তখন হেসে বলেছিল

‘দেখিস, ষেয়াল থাকে যেন,’ পেত্রো তার বহুচর্চিত গৌফের ডগা চিবোতে চিবোতে বলল, ‘নইলে বিয়ে করাটা কিন্তু ঠিক হবে না।’

‘শরীর বুড়োর, তাপও জুড়োর’ রসিকতা করে বলল গ্রিশ্কা

কিন্তু কাজের বেলায় তা হল না রাতে যখন সে কর্তব্যের খাতিরে ঘোবনের

উদগ্র কামনার আগুনে তার বৌকে উত্তপ্ত করে তুলতে যায় তখন নাতালিয়ার কাছ থেকে গ্রিশ্কা পায় শুধুই নিবৃত্তাপ আর কুঠাজ্জড়িত আত্মসমর্পণ। স্বামীর কামনা পরিতৃপ্তির ব্যাপারে নাতালিয়ার কোন চাড়া ছিল না। জন্মসূত্রে মা'ব কাছ থেকে সে পেয়েছে তার মস্তুরগতি নিবৃত্তাপ রক্তধারা। গ্রিগোরি তখন অগ্নিনিয়ার উদ্বৃত্ত কামনার কথা ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে তোমার বাপ বোধহয় তোমাকে বরফের চাঁই দিয়ে গড়েছিল, নাতালিয়া। বড় বেশি ঠাণ্ডা তুমি '

এদিকে অগ্নিনিয়া তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে ক্রীণ হাসি হেসে চোখের তারার গাঢ় রঙ খেলিয়ে আবেগজ্জড়িত হয়ে বলে 'তারপর গ্রিশ্কা, নতুন বৌকে নিয়ে ভালোবাসাবাসির পালাটা কেমন চলছে? দিনকাল কেমন কাটছে?'

'এই কাটছে আর কি ' গ্রিগোরি ভাসা-ভাসা উত্তর দিয়ে যত তাড়াচাড়ি পারে অগ্নিনিয়ার সোহাগভরা দৃষ্টির সামনে থেকে সরে পড়ার চেষ্টা করে

স্তেপানকে দেখে মনে হয় বৌয়ের সঙ্গে তার মিতমটি হয়ে গেছে। এখন সে কদাচিত্ শূঁড়িখানার যায় একবার সন্ধ্যাবেলায় মাড়াইয়ের জায়গায় ফসল ঝাড়তে ঝাড়তে এতদিনের মনোমালিন্যের মধ্যে এই প্রথম সে প্রস্তাব করে বসল, 'এসো অগ্নিনিয়া, একটা গান গাই '

ওরা দুজনে মাড়ানো গমের একটা ধুলোমাখা গাদায় হেলান দিয়ে বসল স্তেপান একটা ফৌজী গান ধরল। অগ্নিনিয়া বুক ভরে নিশ্বাস নিয়ে গমগমে গলা চড়িয়ে তার সঙ্গে যোগ দিল বেশ সুরে গাইছিল ওরা ওদের বিবাহিত জীবনের প্রথম দিকে যেমন গাইত। সে এক সময় ছিল যখন ক্ষেতের কাজ সেরে গোধুলির রক্তরাঙা আঁচলের আড়াল দিয়ে স্তেপান হয়ত গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফিরছে, তখন গাড়ির বোকার ওপর দুলতে দুলতেই সে শুরু করে দিত কোন প্রাচীন গীত - বিস্তীর্ণ স্তেপভূমির ওপরে পথের ধারের আগাছায় ছাওয়া খাঁ খাঁ বন্য রাস্তাটির মতোই করুণ, অলসমহুর। অগ্নিনিয়া তার স্বামীর বিশাল শরীত বুকের ছাতির ওপর মাথা রেখে গানের ধূয়ো ধরত ঘোড়াগুলো গাড়ির সামনের ডাঙা দুলিয়ে বগির কাঁচকৌচ আওয়াজ তুলত। গাঁয়ের বুড়োরা দূর থেকে গান শুনতে পেয়ে যলাবলি করত, 'ওঃ স্তেপান একটা বৌ পেয়েছে বটে খাসা গলা '

'আহা, কেমন সুরে গাইছে '

'আমাদের স্তেপকারও গলাটা যেন ঘন্টার মতন নিবৃত্ত বাজছে '

আর ঠাকুর্দার বয়সী যে সব বুড়ো যার যার বাড়ির রোয়াকে বসে ধুলিধূসরিত রক্তরাঙা সূর্যাস্তকে বিদায় দিত, তারা রাস্তার এপার-ওপার পরস্পরকে ডাকাডাকি করে বলত 'পাহাড়ের কোন নীচু এলাকার গান গাইছে যেন?'

'এই গানটা হল গিয়ে জর্জিয়ার '

‘আহা এই গানটাই ত ভালোবাসত আমার কিবিউশ্কা । ওর আত্মার শান্তি হোক ।’

গ্রিগোরি এখন সন্ধ্যাবেলা শুনতে পায় আন্তাখভরা গান গাইছে সেখানে পায় ফসল মাড়াই করার সময় (ওদের মাড়াইয়ের উঠোন স্তেপানদেবটার পাশেই অগ্নিনির্যাকে যেন আগের মতোই সুখী আর দৃঢ়প্রত্যয়ী দেখাচ্ছে অন্তত ওর জা-ই মনে হয়

মেনেখভদের সঙ্গে বাকবিনিময় করে না স্তেপান । বিদা নিয়ে সে মাড়াই-উঠানের এখার ওখার ঘুরে ঘুরে কাজ করে, তার বিশাল কাঁধজোড়া ঝুঁকে পড়ে নড়াচড়া করতে থাকে কখন সখন কাজের ফাঁকে ফাঁকে বৌয়ের সঙ্গে ঠাট্টা মকরা করতে থাকে । অগ্নিনির্যা তার মাথার বুমানের ফাঁক দিয়ে কালো চোখের ঝিলিক খেলিয়ে হাসে । গ্রিগোরি চোখ বুজলেও দেখতে পায় ওর সবুজ ঘাঘবার ঢেউ । কেন এক অজ্ঞাত শক্তি যেন ঘাড় ধরে তার মাথাটাকে ঘুরিয়ে দেয় স্তেপানদের মাড়াই-উঠানের দিকে এদিকে মাড়াইয়ের জন্য ফসলের গোছা ছড়ানোর কাজে পাশ্বেলেই প্রকোপিয়েভিচকে সাহায্য করতে করতে নাভালিয়া যে ঈর্ষামিশ্রিত সন্দেহ দৃষ্টিতে স্বামীর চোখের প্রতিটি অনিচ্ছুক গতিবিধির ওপর নজর রাখছে সে দিকে তার খেয়াল থাকে না সে দেখতে পায় না উঠানে গোল হয়ে ঘুরে ঘুরে ঘোড়া দিয়ে ফসল মাড়াই করতে করতে পেত্রো তাকেই নিরীক্ষণ করছে, সবার অলক্ষ্যে মুখ টিপে বাক্য হাসি হাসছে

একটা গুমগুম চাপা গুঞ্জনের মতো পাথরের ঘাঁতার তলায় পিষ্ট ধরিত্রীর আঠানাঙ্কের তালে তালে চলতে লাগল গ্রিশ্কার মনের অস্পষ্ট নানা চিন্তা । চিন্তার একেকটা ছেঁড়া ছেঁড়া টুকরো তার চেতনার পাশ কাটিয়ে পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছে, সেগুলোকে সে ধবার চেষ্টা করছে, কিন্তু নাগালে আনতে পারছে না

আশেপাশের ও দূরের মাড়াই-উঠানগুলো থেকে মাড়াইয়ের আগুয়াজ, ঘোড়া তাড়ানোর চিংকার, চাবুকের শিস আর ঝাড়াই-কলের ঘড়ঘড়ানি ভেসে আসছে, বীরে বীরে মিলিয়ে যাচ্ছে কূলের জলামাঠের বৃকে । ফসলে ফুলে কেঁপে উঠেছে গ্রামখানা, দনের ধারে সেন্টেব্রের স্নিঞ্চ রোদ পোহাচ্ছে যেন রাস্তার ওপর আড়াআড়ি ছড়িয়ে পড়ে আছে শ্রুতির মালার মতো একটা সাপ কন্দির বেড়ায় ঘরা প্রতিটি প্রাঙ্গণে, প্রতিটি বাড়ির চালার নীচে অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঘূর্ণিবোনে আবর্তিত হয়ে চলেছে যার যার নিজস্ব ধারার তিক্তমধুর জীবনের স্রোত । বুড়ো গ্রিশ্কা ঠাণ্ডা লেগে দাঁতের বাথায় ভুগছে সেগেহি প্রাতোনিভিচ লজ্জায় অপমানে মুসড়ে গিয়ে একাঙে তার খাসকামরায় বসে নিজের দোপাট্টা দাড়ি দু’হাতে ঘসে ঘসে হিঁড়ছে, চোখের জল ফেলছে, দাঁত কড়মড় করছে গ্রিশ্কার প্রতি প্রবল ঘৃণা বৃকে নিয়ে স্তেপান রাতের বেলায় ঘুমের ঘোরে লোহার

যতো শক্ত আঙুল দিয়ে টুকরো কাপড়ে সেলাই করা কাঁধটা আঁচড়াচ্ছে নাভাজিয়ার কপাল পুড়েছে, সেই দুঃখে ঢালাঘরের ভেতরে ছুটে গিয়ে ফুটের গাদার ওপর আছড়ে পড়ে গুটিসুটি মেরে শূ্যে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে সে।  
 ত্রিস্টোনিয়া মেলায় একটা বকনা বাছুর বেচে মদ খেয়ে সেই পয়সা উড়িয়ে দিয়ে  
 এখন বিবেকের দংশনে কষ্ট পাচ্ছে, একটা অতৃপ্তির পূর্বাভাসে আর ফিরে আসা  
 বেদনার উপলব্ধিতে পীড়িত হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে গ্রিশকা স্বামীকে সোহাগ  
 করতে গিয়ে আক্সিনিয়া চেয়েই জলে ডাসিয়ে দিচ্ছে তার প্রতি দুর্নিবার ঘণায়।

কারখানার বোলিং মিল-এর মজুর দাভিদকা ছাঁটাই হয়ে গেছে রাতের পর  
 রাত সে মাল চালানোর গুমটি ঘরে গোলামের কাছে বসে থাকে। গোলামের  
 চোখজোড়া জোখে ধকধক করে জ্বলতে থাকে সে বলে

‘ন-ন-না, বড় ষাড়াবাড়ি শূ্য করেছে ওদের মাথাগুলো শিগগিরই কাটা  
 পড়বে। একটা বিপ্লবে ওদের কিছু হবার নয় আরও একটা উনিশ শ’ পাঁচশ  
 মরকার, তবেই কডায় গণ্ডায় শেষ হবে ক-ডা-য় ন-ন-ডায়’ বলতে বলতে সে  
 তার টুটো-ফটা আঙুল তুলে শাসায়, তাবপর কাঁধের ওপর ঘুলিয়ে রাখা কোটটা  
 ঝাঁকুনি দিয়ে ঠিক করে নেয়।

এদিকে গ্রামের বুকের ওপর দিয়ে গড়িয়ে চলে দিনগুলো, দিনের পর নামে  
 রাত, কাটে সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস বাতাস বয়ে চলে, পাহাড়ের  
 বুকে হু-হু আর্তনাদ তুলে দুর্যোগের আভাস দেয় আর শবতের সবুজাভ আসমানী  
 রঙা স্বচ্ছ কাচের মতো টলটলে দন উদাসীন ভাবে বয়ে চলে সমুদ্রে।

## তার

অক্টোবরের শেষ দিকে এক রবিবারে ফেদোত বদভঙ্কোভ সদরে গিয়েছিল।

সঙ্গে ঝুড়িতে করে সে নিয়ে গিয়েছিল ভালোমতো খাইয়ে দািয়ে মোটা  
 করা চাব জোড়া হাঁস সেগুলোকে সেখানকার বাজারে বেচে দোকান থেকে  
 বৌয়ের জন্য চমৎকার ফুল আঁকা খানিকটা ছিট কাপড় কিনে সে বাড়িতেই চলে  
 যাবে বলে ঠিক করেছে (চাকার বেড়ের ওপর পা ভর দিয়ে ঘোড়ার গলবন্ধনীর  
 দৃষ্টাবের চামড়াব ফিতে সে কমে বাঁধছিল), এমন সময় একজন লোক তার

\* ১৯০৫-১৯০৭ সালে রাশিয়ার প্রথম যে বুদ্ধোন্নয়ন গণতান্ত্রিক বিপ্লব হয় তাব  
 কথা বলা হয়েছে অনুঃ

দিকে এগিয়ে এলো লোকটা ভিন দেশী, কসাকও নয়

‘নমস্কার’ কালো টুপি কানায় রোদে-পোড়া তামাটে আঙুল ছুঁয়ে ফেনোতকে সন্তোষ জানাল সে।

‘নমস্কার’ ফেনোত তার কালমিক ধাঁচের চোখ কুঁচকে সপ্রাণ দৃষ্টিতে লোকটার দিকে চেয়ে দীতের ফাঁক দিয়ে চেপে চেপে বলল।

‘কোথেকে আসছেন আপনি?’

‘এই এদিকের এক গাঁ থেকে। এখানকার লোক নই আমি।’

‘কোন গাঁ জানতে পারি কি?’

‘ভাতারুন্ডি।’

ভিন দেশী লোকটা তার পাশ পকেট থেকে চাকনাব ওপর নৌকো খোদাই-করা একটা বুপোব সিগারেট-কেস বার করে একটা সিগারেট দিয়ে ফেনোতকে আপ্যায়ন করতে গেল, সঙ্গে সঙ্গে তার জিজ্ঞেসবাদও চালিয়ে গেল

‘আপনাদের গাঁটা কি খুব বড়?’

‘না না, আর খাব না, এইমাত্র একটা সিগারেট খেয়েছি আমাদের গাঁয়ের কথা বলছেন ত? বেশ বড় কম করে হলোও তিনশ’ ঘর লোকের বাস।’

‘গির্জা আছে?’

‘তা আর বলতে’

‘লোহার আছে?’

‘মানে বলতে চান কামার? আছে বৈ কি।’

‘আর মিল-এ ওয়ার্কশপ আছে?’

ঘোড়াটা ছটফট করছিল ফেনোত লাগাম দিয়ে তাকে চাপড় মেরে অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে লোকটার কালো টুপি আর বড়সড় সাদা মুখের ওপর দিয়ে ছোট কালো মাড়িটার ভেতরে ঢুকে পড়া ভাঁজগুলো তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল, তারপর বলল

‘আপনার কী চাই বলুন ত?’

‘আমি আপনাদের গ্রামেই বাস করতে যাচ্ছি এই ত আপনাদের জেলাসদরের বিনি কসাক-সর্দার, তাব কাছে গিয়েছিলাম আপনি কি খালি গাড়ি নিয়ে ফিরছেন?’

‘হ্যাঁ’

‘আমাকে নেননি আপনার গাড়িতে? আমি অবশ্য একা নই। সঙ্গে আছে আমার স্ত্রী আর দুটো তোরঙ্গ, মন তিনেক ওজন হবে।’

‘তা নেওয়া যেতে পারে’

দুটো বুবলের বিনিময়ে ফেনোত বাস্কী হয়ে গেল। ফেনোতের যাত্রীটি উঠেছিল বোল-বুটির কারিগর ফ্রোস্কার বাড়িতে। গাড়ি হাঁকিয়ে সেখানে গিয়ে ছোটখাটো

পাতলা গড়নের ফেকাশে চুল মহিলাটিকে গ্যাড়িতে উঠতে সাহায্য করল, তারপর সোহার পাত দিয়ে বাঁধা দুটো তোরঙ্গ উঠিয়ে রাখল গাড়ির পেছনে।

গ্যাড়ি চালিয়ে জেলাসদর থেকে বেরিয়ে এলো ওরা। জিত দিয়ে টক টক আওয়াজ করতে করতে ফেন্দোত তার গ্যাড়োগ্যাড়ি ছোট্ট মোড়টার মাথার ওপর ঘোড়ার লোমের লাগাম নাড়তে লাগল। থেকে থেকে তার বেচাপ মাথাটা, মাথার চেপটা পেছন দিকটা এদিক ওদিক ঘোরতে লাগল। তার বোজায় কৌতূহল হচ্ছিল এদিকে তার গাড়ির দুই সওয়ার বিনীত ভঙ্গিতে চুপচাপ পেছনে বসে আছে। ফেন্দোত প্রথমে একটা সিগারেট চেয়ে নিল, তারপর জিজ্ঞেস করল

‘মশাইয়ের সাকিন?’

‘আজ্ঞে, কী বললেন?’

‘বলি, আসা হচ্ছে কোথেকে?’

‘ও, আসছি কোথেকে জিজ্ঞেস করছেন?’ রস্তোভ থেকে

‘জন্মও কি ওখানেই?’

‘হ্যাঁ, ওখানেই জন্ম।’

ফেন্দোত তার ব্রোঞ্জরঙের হাড়-উঁচু গাল সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে মাথা উঁচু করে নিরীক্ষণ করতে লাগল দূরে স্তেপভূমির আগাছার ঝোপঝাড়। হেটমান সড়ক সোজা চলে গেছে একটা গড়ানে টিলার দিকে। টিলাটার ঝুটির ওপরে বাদামী রঙের শুকনো বনা আগাছার মধ্যে, রাস্তা থেকে সিকি ক্রোশ মতো দূরে অস্পষ্ট ভাবে নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে কয়েকটা তুন্দার পাখির মাথা। আর কারও নজরে পড়ক আর না পড়ক ফেন্দোতের কুতকুতে কালমিক\* চোখের তীক্ষ্ণ লক্ষ্যভেদী দৃষ্টিতে তা ঠিকই পড়ে গেল।

আহা বন্দুক নেই, নইলে পাখিগুলোকে মারা যেত ওই ষে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আঙুল দিয়ে সেমিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল সে

‘সেখানে পাখি নে।’ ক্ষীণদৃষ্টিতে তাকিয়ে চোখ পিটপিট করতে করতে যাত্রীটিকে কবুল করতে হল।

পাখিগুলো গিরিখাতের ভেতরে নেমে যাচ্ছিল ফেন্দোত দৃষ্টি দিয়ে তাদের অনুসরণ করল তারপর আরোহীর দিকে ঘুরে বসল লোকটা মাঝারি ধরনের লম্বা, রোগা নাকের মাংসল খাঁজের কাছাকাছি বসানো দুটি চোখে চাতুরীর বলক কথা বলতে গিয়ে সে প্রায়ই মৃদু হাসছে তার বোটি হাতে বোনা শালো মুড়ি

---

\* কালমিক - বর্তমান সোভিয়েত ইউনিয়নের রাজসীমায় বসবাসকারী এক কালের যাবার মোঙ্গল জনগোষ্ঠী অনুঃ



দিনে বসে বসে ঝিমোচ্ছে। ফেদোত মুখটা নজর করতে পারল না।

‘আমাদের গাঁয়ে থাকতে যাচ্ছেন কিসের জন্যে?’

‘আমি একজন ফিটার মিস্ত্রি, একটা ছোটখাটো কারখানা খোলার ইচ্ছে আছে ছুতোর মিস্ত্রির কাজও জানি।’

ফেদোত সন্দেহের দৃষ্টিতে যাত্রীটির বড় বড় হাতগুলোর দিকে তাকাল লোকটা সেটা লক্ষ করে যোগ করল, ‘তাছাড়া আমি আবার সিগার কোম্পানির এজেন্টও সেলাইয়ের কল বিক্রি করি।’

‘আপনার নামটা জানতে পারি কি?’ ফেদোত ঔৎসুক্য প্রকাশ করল।

‘আমার পদবী হল স্টকমান।’

‘তার মানে, আপনি বুশী নন?’

না, আমি বুশীই। আমার ঠাকুরদা ছিলেন লাটভিয়ার লোক।’

অল্প সময়ের মধ্যে ফেদোত জানতে পারল যে ফিটার-মিস্ত্রী ইয়োসিফ দাভিডভিচ স্টকমান আগে কাজ করত ‘আকসাই’ কারখানায়, তারপর কুবানের কোন এক জায়গায়। আরও পরে দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের ওয়ার্কশপে কৌতূহলপ্রবণ ফেদোত এছাড়াও অচেনা লোকের জীবনের আরও একগাছা খুঁটিনাটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বার করে নিল। সরকারী বনের কাছে পৌঁছুতে না পৌঁছুতে কথাবার্তার পুজি ফুরিয়ে গেল ঘোড়াটার গায়ে সামান্য ঘাম দেখা দিয়েছে পথের ধারে মরনার জল জমে একটা কুয়োমতন হয়ে ছিল ঘোড়াটাকে ফেদোত সেখানে জল খাওয়াল তাবগর পথযাত্রায় ও অনবরত গাড়ির ঝাঁকুনিতে ক্লান্ত হয়ে ঝিমোতে লাগল। গ্রামে পৌঁছুতে তখনও ক্রোশ দুয়েক পথ বাকি। ফেদোত লাগাম হাতে জড়িয়ে নিয়ে, পা ঝুলিয়ে দিয়ে বেশ আরাম করে শুয়ে পড়ল।

কিন্তু ঝিমোবে যে তার উপায় কী?

‘তোমাদের গাঁয়ের লোকজনের দিনকাল কাটছে কেমন?’ স্টকমান তার আসনে বসে গাড়ির ঝাঁকুনিতে দুলতে দুলতে, তড়াক তড়াক কবে লাফাতে লাফাতে জিজ্ঞেস করল।

‘কেমন আবার? আছি, খাজ্জিমাছি।’

‘আর কসাকরা? তারা কি মোটের ওপর খুশি এমন জীবনে?’

‘কেউ খুশি, কেউ খুশি নয় সবাইকে ত আর খুশি করা যায় না।’

‘তা ঠিক।’ ফিটার-মিস্ত্রীটি ওর কথায় সায় দিয়ে বলল তারপর কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে আবার প্রশ্ন করে যেতে লাগল। তার প্রশ্নগুলো কুটিল ধরনের সেগুলোর ভেতরে ভেতরে যেন গোপন কোন অভিসন্ধি আছে। ‘তাহলে সবাই খেয়ে-পরে আছে বলছ?’

‘তা মশ্শ কাটছে কি’

‘এই যে ফৌজে কাজ করতে হয় এটা বোধহয় একটা উৎপাত, তাই না?’

‘ফৌজে কাজ করার কথা বলছেন? সে আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে, তাছাড়া তখনই ত আসল জীবনকে জানতে পারি আমরা।’

‘খারাপ যেটা তা হল কসাকদের নিচ্ছেদেরই সব সংস্থান করতে হয়।’

‘হ্যাঁ তা ঠিক। জাহাঙ্গামে যাক পাঞ্জীগুলো।’ বলতে বলতে ফেদোত উৎসাহিত হয়ে উঠল, একবার শক্তি দৃষ্টিতে স্বীলোকটির দিকে তাকাতো দেখতে পেল সে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। ‘এই ওপরওয়ালাগুলোকে নিয়েই যত গণ্ডগোল। আমি যখন চাকরি করতে গেলাম তখন বলদ বেচে একটা ঘোড়া কিনতে হল। কিন্তু সেই ঘোড়াটাকে ওরা অচল বলে বাতিল করে দিল।

‘বাতিল কবে দিল?’ অবাক হওয়ার ভান করে ফিটার-মিস্ত্রী বলল

‘হ্যাঁ সরাসরি বাতিল। বলল ওটার পাগুলো খারাপ আমি এটা ওটা কত রকম কথা বলে ওদের বোঝাতে গেলাম। বললাম, আমার অবস্থায় একবার নিচ্ছেকে ভেবে দেখুন, এও বললাম যে ওর পা যে-কোন পেরাইজ পাওয়া জাত ঘোড়ার মতন শুধু ওর চলনটাই অমনি হাঁটে মোরগের মতো দুলাকি চলে কিসের কী? ওরা নিলই না ওঃ, ফ-তু-র হয়ে গেলাম আমি।’

আলাপ-আলোচনা বেশ জমে উঠল ফেদোত এত দূর উৎসাহিত হয়ে উঠল যে গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল। মহা উৎসাহে গ্রামবাসীদের কথা বলতে শুরু করল, অন্যায় ভাবে ঘাসজমি ভাগাভাগি করার জন্য গ্রামের মোড়লের আদ্যজ্ঞান করল। পোল্যাণ্ডে যে রকম ব্যবস্থা চালু আছে তার সুখ্যাতি করল। বলল যে সক্রিয় সৈনিক হয়ে যখন সে সেনাবাহিনীতে কাজ করে সেই সময় তার বেক্সিমেন্টের ঘাঁটি ছিল পোল্যাণ্ডে। ফেদোত লম্বা লম্বা পা ফেলে গাড়ির পাশে পাশে চলছিল। ফিটার-মিস্ত্রীটি আঙুরের মতো পেঁচালো একটা সিগারেট-হোল্ডারে হালকা ধরনের সিগারেট টানতে টানতে মাঝে মাঝে মৃদু হাসছিল, খুব কাছাকাছি লেগে থাকা তার দুই চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ঘুরতে লাগল ফেদোতের মুখের ওপর। কিন্তু তার সারা ঢালু কপালের ওপর দিয়ে যে তেরজা ভাঁজটা আড়াআড়ি কেটে চলে গেছে, সেটা ধীরে ধীরে মন্থরগতিতে নড়েচড়ে বেড়াতে লাগল যেন ভেতর থেকে ঠেলে বেরোতে চাইছে কোন গোপন ভাবনাচিন্তা।

সন্ধ্যার দিকে তারা গ্রামে পৌঁছল।

ফেদোতের পরামর্শক্রমে স্টকমান লুকেশকা পপোভা নামে এক বিধবার কাছে গিয়ে তার বাড়িতে দু’খানা ঘর ভাড়া নিল

পড়শী মহিলারা গেটের কাছে ফেদোতকে পাকড়াও করে জিজ্ঞেস করল।  
'সদর থেকে কাকে নিয়ে এলে?'

এক এজেন্টকে?'

এজেন্ট? কিসের এজেন্ট?'

ওঃ কোথাকাব হাঁদা সব বললাম না এজেন্ট। সেলাইয়ের কল বেচে  
সুন্দরীদের অমনি দিয়ে দেয়, তোমার মতো হাঁদা বারো, মারিয়া' খুড়ি, তাদের কাছ  
থেকে দাম নেয়।

'ওরে তুই অলঙ্ঘন্যে বাঁকা-পা কালমিক শয়তান। তোর ওই কালমিক-বদনের  
মুখে ঝাঁটা মারি। খোড়াও দেখে ভড়কে সরে যাবে।'

'কালমিক আর তাতার এরাই ত শ্বেশের প্রথম লোকজন। তাই বলি কি  
খুড়ি, অমন ঠাট্টা করে কাজ নেই।' ফেদোত যাওয়ার সময় জবাব দিতে ছাড়ল না।

ফিটার-মিস্ত্রী স্টক্‌মান সেই যে টেরা লুকেশকার বাড়িতে গিয়ে আস্তানা গাড়ল  
তার জিতটা ছিল আবার বেশ আলগা। তাই লোকটা সেখানে এক রাত কাটাতে  
না কাটাতে মেয়েদের মুখে মুখে সারা গাঁয়ে তাকে নিয়ে কথা চলতে লাগল।

'শুনেছ গা দিদি?'

'কী? কিসের কথা বলছিস ল্যা?'

'কালমিক ফেদোতটা এক জার্মানকে নিয়ে এসেছে এখানে।'

'আঁ, বলিস কি? তারপর?'

'ওঃ, যেক্ষে কর গো বেরী মাতা! মাথায় হ্যাট পরে, স্টোপল না স্টোকাল  
কী বেন নামটা।'

'পুলিশের লোক-টোক নয় ত?'

না তাই, আবগারির লোক।'

কী যে বলিস ভাই তোরা সব ও সব স্বেফ গাঁজাখুরি। শুনছি লোকটা  
নাকি আমাদের ফাদার পানক্রাতির ছেলের মতোই একজন অ্যাকাশেট

ওরে পাশকা লক্ষ্মীটি যা ত এক ছুটে লুকেশকার বাড়িতে গিয়ে ফাঁক  
বুকে তাকে জিজ্ঞেস করে আয় 'কে এসেছে গো খুড়ি, তোমার বাড়িতে?'

জলদি ছোট রে বাজু।'

পরের দিন আগজুক গ্রামের মোড়লের সঙ্গে দেখা করল

ফিল্ডমর মানিৎসকোভ এই নিয়ে তিন বছর হল গ্রামের মোড়লের পদে  
আছে। অয়েল্লকথে মোড়া কালো ছাড়পত্রটা হাতে নিয়ে অনেককণ ধরে সে  
উন্টে-পান্টে দেখল তার পালা শেষ হলে কেবানী ইয়েগোর জার্বকোভ সেটা  
উন্টে-পান্টে ভালো করে দেখে নিল তারপর ওরা দু'জনে চোখাচোখি করল

শেষকালে মোড়ল তার পূর্বনো সার্জেন্ট-মেজর অভ্যাসমতো ভারিঙ্কি চালে হাত দু'লিমে বলল, 'আচ্ছা, থাকতে পার '

আগন্তুক নমস্কার করে চলে গেল এক সপ্তাহ তার টিকি পর্যন্ত দেখা গেল না সে তার কোটের থেকে বেরোলই না শুধু কুড়ুলের ঠকঠক আওয়াজ শোনা যেতে লাগল পরম কালে রান্নাবান্না করার জন্য বাড়ির বাইরে যে খবখবে হৈসেলটা ছিল সেটা মোরামত করে সে তখন তার নিজের কারখানা তৈরি করার কাজে ব্যস্ত। তার সম্পর্কে মেয়েদের অনন্য কৌতুহলেও দেখতে দেখতে ভাটা পড়ে গেল। শুধু বাচ্চা ছেলেমেয়েরা গজ্ঞানশরমহীন কৌতুহল নিয়ে দিনের পর দিন অবিরাম বেড়ার আশেপাশে ঘুর ঘুর করতে থাকে, উঁকি মেরে দেখার চেষ্টা করে ভিন দেশী লোকটার কাণ্ডকারখানা

### পাঁচ

অক্টোবরের পয়লা তারিখে যখন 'উদ্ধারকর্তী মেরীমাতা পার্বণ' তার তিন দিন আগে খ্রিগোরি আর তার বৌ মাঠে লাঙল দিতে চলল পাড়লেই প্রকোপিয়েভিচের অসুখ করেছিল লাঠিতে ভর দিয়ে, গিঠেব বাধায় ঝঁকতে ঝঁকতে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো ওদের দু'জনকে রপনা করিয়ে দিতে

'গোরু-বাছুর চরানোর জন্যে লাল দরীর শেছনে যে দুটুকরো জমি আছে সেই দুটোতে লাঙল দিবি রে খ্রিশ্কা '

'আচ্ছা, সে না হয় যুসলাম কিন্তু উইলো খাতের নীচে যে ভাগটা আছে তার কী হবে?' ভাঙা ভাঙা গলায় জিজ্ঞেস করল খ্রিগোরি মাছ ধরতে গিয়ে ঠাণ্ডা লেগে তার গলা বসে গিয়েছিল, তাই গলায় বুঝল জড়ানো

'সে পরবের পরে হবে এখনকার মতো ও-ই যথেষ্ট। লাল দরীর নীচে ঐয়তাল্লিশ বিঘা মতন জমি আছে। বেশি লোভ করতে হবে না।'

'দাদাকে কি পাওয়া যাবে না?'

'পেত্রো আর দাশ্কা যাবে আটাকলে এখুনি ভাঙাতে না গেলে পরে ভিড়ভাটা বেড়ে যাবে '

নাতালিয়ার গায়ের জামাঘ ভেতরে দুটো নরম সৈকা ব্রুটি গুঁজে দিয়ে ইলিনিচনা ফিসফিস করে বলল, 'দুনিয়াশকাকে নিলে হত না? ও ত বলদগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে যেতে পারত।'

'কোন দরকার নেই আমরা দু'জনে ঠিক চালিয়ে দেব।'

'দেখো মা। ভগবান তোমার সহায় হোন '

দুনিয়াশকা উঠোনের ওপর দিয়ে একগাদা কাপড়চোপড় নিয়ে ধুতে চলছিল  
দনের ধারে, ভিজ্জে কাপড়ের বোঝায় তার সব মেইটা নিয়ে পড়েছে

‘লক্ষীটি বৌদি, লাল দরীতে অনেক টক পালং আছে কিছু তুলে এনো।’  
‘আনব, আনব।’

‘ভাগ দেবি এখন থেকে! কিচিরমিচির বন্ধ কর!’ পাত্তেলেই প্রকোকিরেভিচ  
লাঠিটা তুলে নাড়াল

শরতের খরায় আর অনাবৃষ্টিতে রাস্তা শুকনো খটখটে। দিন জোড়া বলদ  
রাস্তার ওপর দিয়ে রেখা আঁকতে আঁকতে টেনে নিয়ে চলল উল্টে রাখা লাঙলটা।  
খিগোরি গলায় আট্টেপুষ্ঠে জড়ানো বুঝালটা ব্যরবার ঠিক করে নিতে নিতে পথের  
ধার দিয়ে চলেছে, থেকে থেকে বক বক করে কলছে খিগোরির পাশে পাশে  
লম্বা লম্বা পা ফেলে চলেছে নাভালিয়া, তার পিঠে দুলছে ঝাবরের থলে।

গ্রাম ছাড়িয়ে ক্ষেপের বুকে জমাট বেঁধে আছে একটা স্বচ্ছ নিস্তব্ধতা। গোচর  
মাঠের পেছনে, ঝুঁকে পড়া টিলাটার ওপাশের মাটিতে চাষীরা লাঙল মিছে, শিস  
দিয়ে হালের বলদগুলোকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। কিছু এধারের এই বড় রাস্তায়  
সোমরাজ গুম্মের নীলাভ বেঁটে বেঁটে ঝাড়, পথের ধারে ভেড়ার দাঁতে কাটা নানা  
ধরনের ঘাস আর লতাপাতা জড়াজড়ি করে মাথা নুইয়ে আছে প্রার্থনার ভঙ্গিতে,  
আর মাথার ওপরে মাকড়সার জালের মণিমুক্তারঙের উড়ন্ত সূত্যের আঁকিঁকি  
কাটা কাঁচের মতো স্বচ্ছ স্ননঝনে হিয়েল আকাশের নীতল বিস্তার।

পেত্রো আর দারিয়া ওদের দু’জনকে চাষের কাজে রওনা করিয়ে দিয়ে  
আটাকলে যাওয়ার জন্য তৈরি হল। গোলাঘরে একটা বিশাল চালুনি টাঙিয়ে  
পেত্রো তাই দিয়ে গম ঝাড়ল, দারিয়া সেই গম বস্তায় ভরে গাড়িতে তুলল।

পাত্তেলেই প্রকোকিরেভিচ যোড়া জুতে দিল, যত্ন করে ঝোড়ার সাজসজ্জা  
ঠিক করে দিল

‘আর কত সেরি রে?’

এই একুনি, গোলাঘরের ভেড়ার থেকে পেত্রো সাড়া দিল

• • •

আটাকলে অনেক লোক গম নিয়ে এসেছে। আজিনায় গাড়ির গাদাশাদি  
বেশানে ওজন হচ্ছে সে জায়গাটার কাছে বেজার ভিডের চাপ। দারিয়ার হাতে  
লাগাম হুঁড়ে দিয়ে পেত্রো গাড়ি থেকে লাফিয়ে নামল ওজন করার ডার ছিল  
গোলামের ওপর। পেত্রো তাকে স্কিস্টেস করল

‘আমার নম্বর আর কত পরে?’

‘এখনও ঢের সময় আছে।’

‘এখন কত নম্বরেরটা ভাঙানো হচ্ছে?’

‘অটকিশ নম্বরের।’

পেট্রো বেরিয়ে গেল গাড়ি থেকে বস্তুগুলো নামাতে এই সময় ওজনঘর থেকে গালাগাল ভেসে এলো কে যেন ডাঙা ডাঙা গলায় বৈকিয়ে উঠল

‘তোমার পালা এসে চলে গেছে এতক্ষণ পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছিলে বুঝি? এখন ডাড়া দিলে কী হবে? ডাঙা এখন থেকে বলাহি বাটা কোটন নইলে দেহ এক রসদ।’

গলার আওয়াজে লোকটাকে চিনতে পারল পেট্রো। ‘ঘোড়ার নাল’ ইয়াকভ কান পেতে শুনল ওজনঘরটা যেন কেটে পড়ল দরজা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এলো একটা চিংকার।

ঘুষিটা মোক্ষম লেগেছে একজন দাড়িওয়ালা বয়স্ক তাত্শীয়\* লোক দরজা দিয়ে দড়াম করে বাইরে এসে পড়ল। তার কালো টুপিটা মাথার পেছনে সরে এসেছে।

‘কিসের জন্যে, শুনি?’ গাল চেপে ধরে সে চৈতিয়ে উঠল।

‘তোমার টুটি ছিড়ে ফেলব, শালা।’

‘দাঁড়া না, দেখাচ্ছি।’

‘এদিকে আয় ত রে যিকিঞ্চর।’

‘ঘোড়ার নাল’ ইয়াকভ মস্তান গোছের তাগডাই চেইরার গোলন্দাজ (মিলিটারীতে কাজ করার সময় একবার সে যখন একটা ঘোড়ার পারে নাল লাগাতে যায় তখন ঘোড়াটা চট করে লাফিয়ে উঠে তার মুখে লাগি বসিয়ে দেয় তাহিতে ইয়াকভের নাক ভেঙে ঠোঁট কেটে গিয়ে মুখের ওপর ঘোড়ার খুরের লাগ বসে যায় ঘোড়ার নালের আকারের এই কাটা দাগটা শুকিয়ে কালশিটে পড়ে গিয়ে শেষকালে কালো কালো কতকগুলো কাঁটার চিহ্ন রেখে গেল। সেই থেকে ইয়াকভের নাম হয়ে গেল ‘ঘোড়ার নাল’। জামার আঙ্গিন গোটাতে গোটাতে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো সে গোলাপী রঙের শার্ট গায়ে এক লম্বা তাত্শীয় পেছন থেকে তার ওপর একটা প্রচণ্ড ঘা বসিয়ে দিল ‘ঘোড়ার নাল’ একটু টাল খেলোও পায়ের ওপর খাড়া হয়ে রইল।

\* সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় ইয়েকাতেরিনার হুকুমে ক্রিমিয়ার (তাত্শিয়ার) সমিকটবর্তী দক্ষিণাঞ্চল থেকে যে-সমস্ত ইউক্রেনীয়কে অন্যত্র অভিবাসন করানো হয় তাদের বংশধরেরা দন এল্যাকায় তাত্শীয় নামে পরিচিত। অনুঃ

ওরে ভাই, কে কোথায় আছিস, কসাকদের পেটাচ্ছে রে!’

আটাকলের ভেতর থেকে গাড়িতে ছড়াছড়ি উঠোনের ওপর দেখতে দেখতে পিলপিল করে ছড়িয়ে পড়ল দলে দলে কসাক আর তাত্তীয়রা। বাঘের একটা পুরো মহিমা আবার সেদিন সেখানে এসেছিল।

মারপিট শুরু হয়ে গেল সদর দরজার সামনে। জড়াজড়ি করা দেহের চাপে দরজা মড়মড় করে উঠল। পেত্রো বস্তা ফেলে দিয়ে একটা অশ্রুট আওয়াজ করল, তারপর ছোট ছোট পা ফেলে ছুটে লাগল আটাকলের দিকে। গাড়ির বোঝার ওপর দাঁড়িয়ে দারিয়া দেখতে গেল হাতের কাছে যাকেই পাচ্ছে তাকে থাকা মেঝে ফেলে দিয়ে পেত্রো সোজা মাঝখানে ঢুকে গেল, কিন্তু যখন দেখল লোকের কিশাট বেষ্টে বেষ্টে সে মেঝালের গায়ে এসে ঠেকল এবং শেষকালে মাটিতে পড়ে গিয়ে সকলের পায়ের তলায় ধেঁতো হতে লাগল, তখন আত্ননাদ করে উঠল দারিয়া। মেশিনঘরের কোনা থেকে একটা লোহার হুড়কো ঘোরাতে ঘোরাতে ছুটে বেরিয়ে এলো মিতকা কোরশুনড।

তাত্তীয় শ্রেণীর সেই যে লোকটা ‘ঘোড়ার নাল’কে পেছন থেকে ঘুসি মেরেছিল, সে এবারে ভিড়ের ভেতর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেছে। গোলাপী রঙের জামাটার একটা ছেঁড়া হাতা পাখির ডাঙা ডানার মতো তার পিঠের ওপর লটপট করছে নীচু হয়ে ঝুঁকে পড়ে দু’হাতে মাটি ভর দিয়ে একটা পাক খেয়ে লোকটা সবচেয়ে কাছের গাড়িটার দিকে ছুটে গেল, সেখান থেকে সহজেই গাড়ি জোতার ডাঙাখানা খসিয়ে নিল। আটাকলের উঠোনের মাথার ওপর ভেসে বেড়াতে লাগল ডাঙা ডাঙা কণ্ঠের দীর্ঘ একটানা ‘হু-হু হা-হা হুম-হুম’ হুঙ্কার, ধূপধাপ, দুমদাম, আত্ননাদ আর বহু কণ্ঠের গুঞ্জন, কোলাহল।

শুমিলিনরা তিন ভাই বাড়ি থেকে দৌড়ে এলো। গেটের সামনে কে যেন একজোড়া লাগাম ফেলে রেখে দিয়েছিল, তাহঁতে পা জড়িয়ে নুলো আলেঞ্জাই হুমড়ি খেয়ে গেটের গায়ে পড়ে গেল, কিন্তু পরক্ষণেই তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে বাঁ হাতের ফাঁকা আঙ্গিনটা শেটের ওপর চেপে ধরে গায়ে গায়ে লেগে-থাকা গাড়ির জোয়ালগুলোর ওপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলল তার ভাই মার্তিনের গোটানো প্যান্ট সাদা মোজার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে মার্তিন নীচু হয়ে মোজার ভেতরে প্যান্ট গুঁজতে যাবে এমন সময় কারখানার সামনে ছিটকে বেরিয়ে এলো একটা আত্ন চিংকার চালু ছাদটার মাথার ওপরে, অনেকটা উঁচু দিয়ে মাকড়সার আঁকিঝুকি কাটা জালের মতো উড়ে গেল কার যেন আত্ননাদ মার্তিন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তার সাদা আলেঞ্জাইকে ধরার জন্য ছুট দিল।

দারিয়া হাঁপাতে হাঁপাতে হাতের আঙুল মোচড়াতে মোচড়াতে গাড়ির ওপর

দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। চার পাশে মেয়েদের হাউমাউ, চিৎকার চোঁচামেচি। ঘোড়াগুলো অস্থির হয়ে উঠেছে, বলদগুলো গাড়ির সঙ্গে গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে তারস্বরে ডাক ছাড়াচ্ছে। চৌট দিয়ে চুকচুক আওয়াজ করতে করতে ফেঁকাসে মুখে পাশ দিয়ে বৌড়াতে বৌড়াতে চলে গেল সেগেই প্রাতোনভিচ। ওয়েস্টকোটের নীচে তার নেয়াপাতি ভুঁড়িটা নাচতে লাগল, দারিয়া দেখতে পেল গোলাপী রঙের ছিঁকির জামা গায়ে সেই তালীয় লোকটা পায়ে গাড়ির ডাঙা মেরে মিতকা কোরশুনভকে ফেলে দিল, কিন্তু পরক্ষণেই তার হাত থেকে ডাঙা খসে গেল। মুখ খুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল সে এবারে দেখা গেল নুলো আলেক্সেই লোকটার পিঠের ওপর বসে তার মাথার পেছন দিক লক্ষ্য করে সীসের মতো কঠিন হাতের ঘুসি মেবে চলছে। দারিয়ার চোখের সামনে নানা রঙের কাপড়ের টুকরোর মতো একের পর এক ঝলকাতে লাগল তাণ্ডবলীলার নানা দৃশ্য দেখতে পেল সেগেই প্রাতোনভিচ পাশ দিয়ে ছুটে যাবার সময় মিতকা কোরশুনভ হাঁটুতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই তার পা লক্ষ্য করে লোহার হুড়কো ছুঁড়ে তাকে ফেলে দিল এতে দারিয়া এতটুকু অবাক হল না সেগেই প্রাতোনভিচ দু'হাত ছড়িয়ে মাটিতে পড়ে কাঁকড়ার মতো করে গুড়ি মেরে ওজনঘরের ভেতরে ঢুকে পড়ল। সেখানে লোকজন তাকে পায়ে মাড়াতে লাগল তাকে ধরে চিত করে ছুঁড়ে ফেলে দিল। দারিয়া উদ্ভাবগ্রস্তের মতো হো-হো করে হাসি ছুঁড়ে দিল, হাসির চোটে তার রঙ-করা ভয়-কালো শ্রুণু ভেঙে গেল কিন্তু পেত্রোর ওপর চোখ পড়ামাত্র থেমে গেল তার সেই উদ্ভাস্ত হাসি। বিপুল গুঞ্জনবত, উদ্বেলিত জনতার ভিড় টালে টলতে টলতে বেরিয়ে এসেছে পেত্রো, এসেই সে একটা গাড়ির নীচে শূয়ে পড়ে মুখ দিয়ে ঝলকে ঝলকে রক্ত তুলতে লাগল। দারিয়া একটা চিৎকার দিয়ে তার দিকে ছুটে গেল এদিকে গ্রাম থেকে লাঠিসোঁটা নিয়ে দলে দলে ছুটে আসছে কসাকরা। একজন আবার একটা শাবল ঘোরাচ্ছে তাণ্ডবলীলা একটা দানবীয় আকার নিতে চলল এ খুঁড়িখানার সামনে মাতালের মারপিট নয়, পিঠেপার্বণের সময়কার ঘুষোঘুষিও নয় ওজনঘরের দরজার কাছে মাথা ফেটে পড়ে আছে এক অল্পবয়সী তালীয়। পাদুটো ছড়ানো, কালচে চাপ চাপ রক্তস্রোতের মধ্যে মাথাটা চুবানো, রক্তমাখা চুলগুলো লম্বা লম্বা শক্ত ঝট পাকিয়ে মুখের ওপর এসে পড়েছে, দেখে শুনে মনে হয় লোকটার ভবলীলা সাজ হতে চলেছে।

তালীয় লোকগুলো ভেড়ার পালের মতো এক জায়গায় দঙ্গল বেঁধে ছিল কসাকরা ওই অবস্থায় তাদের কোণঠাসা করে তাড়িয়ে নিয়ে গেল খন্দের জমায়েতের ঘরটার দিকে। পরিপতি গুবুর হতে চলেছে, এমন সময় তালীয়দের ভেতর



থেকে এক বুড়োর মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল এক ছুটে সে খন্দের জমায়োতের ঘরটার ভেতরে গিয়ে চুন্নীর ভেতর থেকে একখানা স্থলন্ত কাঠ টেনে নিয়ে দৌড়ে বাইরে চলে এলো তাবপব ছুটল গুনামঘরের দিকে, যেখানে আটাকলে ভাঙানো চার পাঁচ শ' মন আটা মজুত আছে লোকটার কাঁধের পেছন থেকে ধোয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে, আগুনের ফুলকি ছিটকোচ্ছে, দিনের আলোয় সেগুলোকে আবছা দেখাচ্ছে।

‘জ্ব-জ্ব-লি-য়ে দে-বো-ও’ চড়বড় করে জ্বলতে-থাকা চালাকাঠটা উলুখাগড়ায় ছাওয়া চালের দিকে বাড়িয়ে ধরে বুনো জানোয়ারের মতো দুফার দিয়ে উঠল সে

কসাকরা শিউরে উঠল, থমকে দাঁড়াল তাবা। পূব দিক থেকে একটা শুকনো দমকা ছাওয়া বইছে, তাইতে ঘরের ছাদ থেকে ধোয়া উড়ে আসছে দম্পন বোধে থাকা তাত্তীয় লোকগুলোর দিকে।

উলুখাগড়ায় ছাওয়া শুকনো চালায় ভালোমতো একটা ফুলকি, বাস্ আর দেখতে হবে না সারাটা গ্রাম মাউ মাউ করে জ্বলে উঠবে

কসাকদের সারিগুলোর মধ্যে সংক্ষিপ্ত চাপা গুঞ্জন উঠল। কেউ কেউ উলটো দিক করেই পিছু হটতে লাগল এদিকে তাত্তীয় লোকটা মাথার ওপর চালাকাঠ ঘুরিয়ে নীলচে আগুনের ফুলকি ছড়িয়ে চিৎকার করে চলছে

পুড়িয়ে দেব। জ্ব-লি-য়ে দে-বো-ও। বেরিয়ে যাও সব উঠোন থেকে।

এই মারদাক্ষর যে নাটের গুরু - ঘোড়ার নাল' ইয়াকত - বীভৎস মুখের ওপর আরও কিছু কালসিটে নিয়ে সে-ই প্রথম বেরিয়ে এলো উঠোন ছেড়ে তার পেছন পেছন দেখতে দেখতে আর সব কসাকও দুড়দাড় করে ছুটল।

তাত্তীয়রাও এই ফাঁকে তাদের বস্তাগুলো চটপট গাড়িতে তুলে নিয়ে ঘোড়া জুতে ফেলল গাড়ির ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লাগামগুলো গিট পাকিয়ে ধরে মাথার ওপর ঘোরাতে ঘোরাতে, ঘোড়াগুলোকে চাবুকে খেপিয়ে তুলে তারা ঝটিতি গাড়ি চালিয়ে উঠোন থেকে বেরিয়ে পড়ল, রাস্তার ওপর দিয়ে ঘর্ষর আওয়াজ তুলে গ্রামের বাইরে মিলিয়ে গেল

নুলো আলেম্বাই তখন আঙিনার মাঝখানে দাঁড়িয়ে। তার জামার ফাঁকা হাতটার প্রান্তে গিট দেওয়া, চিমসে পেটের ওপর সেটা লটপট করে বুলছে। সে তার অভ্যেসমতো চোখ আর গালের মাংসপেশী খিচিয়ে নাচাতে নাচাতে চিৎকার করে উঠল ‘ঘোড়ায় চাপ কসাকরা, ঘোড়ায় চাপ।’

‘ওদের পাকড়াও কর’

ওই টিলার মাথাটা ছড়িয়ে আর যেতে হচ্ছে না।

মিডকা কোরশুনড ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে আঙিনা ছেড়ে ছুটে বেরোতে যাচ্ছিল

মিলের কাছে যে কসাকরা জমায়েত হয়ে ছিল তাদের মধ্যে আবার একটা চাঞ্চল্য লক্ষ করা গেল আবার একচোট হুড়োহুড়ি পড়ে গেল কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে কালো টুপি মাথায় এক অচেনা লোক, যাকে আগে কেউ কখনও লক্ষ করে নি, লম্বা লম্বা পা ফেলে মেশিন-ঘর থেকে তাদের দিকে এগিয়ে এলো অল্প ব্যবধানে বসানো তীক্ষ্ণ দুই চোখের শানিত ফলায় জনতাকে বিদ্ধ করল লোকটা, তারপর হাত তুলে বলল

‘রোসো।’

‘তুমি কে হে?’ ‘ঘোড়ার নাল’ ভুবু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল

‘কোথেকে এসে জুটলে?’

‘ধরু ওটাকে।’

‘আহা।’

‘বা-হা।’

‘মীড়াও গো পাড়াপড়শীরা।’

‘তোমার পড়শীর গুটির তুষ্টি করেছি।’

‘চাষা রে, চাষা।’

‘একটা আকাট।’

‘ওরে ইয়াকভ, দে ত এক ঘা বসিয়ে।’

‘ওর চোখদুটোর মাঝখানে বসিয়ে দে চোখদুটোর মাঝখানে।’

লোকটা বিব্রত ভাবে হাসল, কিন্তু ভয়ের কোন চিহ্ন দেখা গেল না তার চোখেমুখে সে তার মাথার টুপিটা খুলে এক আশ্চর্যরকমের সরলতার ভাব করে কপাল মুছল তার হাসিই শেষ পর্যন্ত সকলকে নিরস্ত করল

‘ব্যাপার কী?’ দৃষ্টান্ত করা টুপিটা নাড়িয়ে ওজনঘরের দোরগোড়ার রক্তে ভেজা কালচে মাটি দেখিয়ে সে বলল।

‘বৌটনগুলোকে ঠেঙাছিলাম,’ শাস্তকণ্ঠে জবাব দিয়ে নুলো আলেঞ্জেরই চোখ পিটপিট করে গালের মাংসপেশী নাচাল,

‘কিন্তু কেন?’

‘কেন আবার? লাইন-টাইন মানতে চায় না, পালা আসার আগেই এগিয়ে যায়,’ সামনে এগিয়ে এসে হাতের এক সাপ্টিয় নাকের নীচ থেকে রক্তমেশানো সর্দি ঝেড়ে ফেলে দিয়ে ‘ঘোড়ার নাল’ বোঝাল,

‘জন্মের মতো ওদের যাতে মনে থাকে।’

‘এঃ ধরা বেত।’ স্তম্ভে ত আবার পোড়ানোর কিছু নেই।’

‘আমরা ভয়েই পিছিয়ে গেলাম। আরে অত সাহস কি আর হত লোকটার?’

‘বলা যায় না, লোকটা হয়ত মরিয়া হয়ে সত্যি সত্যি আগুন ধরিয়ে দিত।’

‘আরে ঝাঁটিনদের কথা আর বলা না। ব্যাটারা বেজায় বদরাগী, মন্দ হেসে বলল আফোনকা ওজেরভ

এবারে লোকটা ওজেরভের দিকে টুপি নাড়িয়ে জিজ্ঞাস করল

‘বলি তুমি কে?’

এ কথায় ওজেরভ তাব ফাঁক-ফাঁক দাঁতের পাটির একটা ফাঁক দিয়ে ঘৃণাভরে পিচ কাটল, দুই পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে থুতুর দলটা কেমন পাক খেয়ে মাটিতে পড়ল তা লক্ষ করতে করতে বলল

‘আমি তু কসাক কিন্তু তুমি? বেদে নাকি?’

‘না। আমি তুমি আমরা সকলেই বুশী।’

‘আজ্ঞেবাজে কথা বলা না।’ আফোনকা এবারে স্পষ্ট করে বলল

‘কসাকরা বুশীদের থেকেই এসেছে। সেটা জান কি?’

‘আমি তোমাকে বলছি কসাকদের জন্ম কসাক থেকে।’

‘অনেক কাল আগে জমিদারদের অত্যাচারে যে-সমস্ত ভূমিদাস পালিয়ে এসে মনের পারে বসবাস করতে থাকে তাদেরই কলা হয় কসাক।’

‘ওহে চাঁদ, যাও দেখি, নিজের চরকায় তেল দাও গে।’ ফুলে ওঠা আঙুলগুলো দিয়ে শব্দ করে মুঠো পাকিয়ে চাপা রাগে গরগর করতে করতে নুলো আলোজেই উপদেশ দিল তার চোখ আর গালের ঝাংসপেশীর খিচুনি আরও ঘনঘন হয়ে উঠল।

‘শালা হারামজাদা আমাদের এখানে থাকতে এসেছে ইশ্, দেখ দেখি, আমাদের কিনা চাবা বানাতে চায়?’

‘লোকটা কে রে? শুনছিস, আফোনকা?’

‘বাইরে থেকে কে একটা লোক এসেছে টারার লুকেশ্কার গুবানে ঘর ভাড়া নিয়ে আছে।’

ভাড়া করার মুহূর্তটা হাতছাড়া হয়ে গেছে কসাকরা উত্তেজিত হয়ে দাসার কথা আলোচনা করতে করতে যে যার বাড়ির পথ ধরল

\* \* \*

সেই রাতে গ্রাম থেকে আড়াই ক্রোশখানেক দূরে স্ত্রোপের মধ্যে মোটা বনাত কাপড়ের কুটকুটে জাবুন-কোভা গায়ে জড়তে জড়তে খিগোরি বিষয় কঠে নাভালিয়াকে বলছিল

‘কেমন যেন অচেনা মনে হয় তোমাকে তুমি যেন আকাশের ওই

চাঁদটার মতো ঠাণ্ডা করতে পার না গরমও দিতে পার না। তোমাকে আমি ভালোবাসি না নাতাশ্কা, তুমি রাগ করো না। এই নিয়ে কথা বলার ইচ্ছে আমার ছিল না, কিন্তু এটাও ত ঠিক যে এভাবে ঘর করা চলে না তোমার জন্যে আমার দুঃখ হয় ঠিকই - এই কয়েক দিনে আমাদের মধ্যে একটা সম্পর্কমন্ডনও পড়ে উঠেছে, কিন্তু মনের ভেতরটার কোন সাদা পাই নে। ফাঁকা মনুভূমির মতো খাঁ খাঁ করছে।'

উর্বে তারা-ডরা অগম্য প্রান্তর, মাথার ওপর ভাসছে মেঘের ছায়া ছায়া অশরীরী আবরণ নাভালিয়া সেই দিকে তাকিয়ে রইল চূপ করে রইল সে। সেই গভীর নীল কালো শূন্যতা ভেদ করে কোথা থেকে যেন যুপোলী ঘণ্টার আওয়াজের মতো ভেসে আসছে বাসাবন্দলকারী সারসদের ডাক এরা বিলম্বে পথযাত্রা শুরু করেছে

ঘাসগুলো বড় বেশি পুরনো, মৃত্যুর কবুথ গন্ধ ছড়াচ্ছে তারা টিলার ওপরে কোথায় যেন চাষীদের ছালানো অগ্নিকুণ্ডের একরকমি আগুনের আভা মিটিমিট করছে।

ভোরের আলো ফোটার আগেই গ্রিগোরির ঘুম ভেঙে গেল। তার কোর্তার ওপর আঙুল দুয়েক পুরু হয়ে বরফ পড়েছে। তাজা বরফের অকলঙ্ক উজ্জ্বল শূন্যতার মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছে স্তেপ-প্রান্তর, আর ক্ষেতের যে চালাটির নীচে সে ঘুমিয়ে ছিল তার কাছে শীতের প্রথম তুষারের ওপর দিয়ে ঐক্যবৈক্যে চলে গেছে ঋণশেষের পায়ে চলার নীলচে দাগ

## ছয়

অনেক কাল হল এই রকম একটা নিয়ম চলে আসছে মিনেরোভোর পথে বন্ধুবান্ধব ছাড়া কোন কসাক একা কোন বাইনে চড়ে চলতে গিয়ে সামনে ইউক্রেনীয়দের (ইউক্রেনীয়দের বসতিগুলো ভাটির ইয়াননেভস্কি গ্রাম থেকে শুরু হয়ে সেই মিনেরোভো পর্যন্ত প্রায় পঁচিশ ক্রোশ জুড়ে ছড়িয়ে আছে) দেখতে পেয়ে যদি পথ না ছাড়ে তাহলে ইউক্রেনীয়দের হাতে তাকে মারধর খেতে হয়। তাই স্টেশনে যেতে হলে তারা সচরাচর কয়েকটা গাড়ি নিয়ে একসঙ্গে দল বেঁধে চলে। তাহলে আর স্তেপের বুকে ইউক্রেনীয়দের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে গালিগালাজের উত্তরে গালিগালাজ ঝাড়তে ভয়ের কোন কারণ থাকে না

'আই বোঁটন রাস্তা ছাড়্ শালা শুরোবের বাচ্চা, আছিস কসাকদের দেশে, আবার কিনা রাস্তা ছাড়তে চাস নে?'

আবার যে সব ইউক্রেনীয় দনের ধারে পাবায়োনভদের গোলায় গম নিয়ে আসে তাদের পক্ষেও ব্যাপারটা সুখকর নয়। বিনা কারণেই দাঙ্গা বেধে যায় 'কোয়টিন' হলোই হল আর দেখতে হবে না, 'কোয়টিন' যখন, তখন তাকে ধরে শেটানোই উচিত।

শত শত বছর আগে কসাকদের দেশের মাটিতে সমস্ত পৌত্তা হয়েছিল সাম্প্রদায়িকতার এই বীজ সেই বীজ সমস্তে লালিত হয়েছে, বৃদ্ধি পেয়েছে, তার ফলও ফলেছে ভালো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় মাটি ভিজেছে কসাক আর বহিরাগত কুর্দী ও ইউক্রেনীয়দের রক্তে।

কারখানায় দাঙ্গার দু'সপ্তাহ পরে একজন কোভোয়ান আর তদন্তকারী গ্রামে এসে উপস্থিত।

জেরার জন্য প্রথমেই ডাক পড়ল স্টকমানের। তদন্তকারী ইন্স্পেক্টরটির বয়স কম কোন সম্ভ্রান্ত কসাক বংশোদ্ভূত আমলা। ব্রিফ-কেসের ভেতরটা হাতড়াতে হাতড়াতে সে জিজ্ঞেস করল

'এখানে আসার আগে আপনি কোথায় থাকতেন?'

'রস্কোভে '

'উনিশ শ' সাত সালে জেল হয়েছিল কেন?'

স্টকমান তদন্তকারী ইন্স্পেক্টরের ব্রিফ-কেস এবং তার ঝুঁকে পড়া-মাথার খুসকি-ভরা বাঁকা সিঁথির ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল

'হাজারাসটির জন্যে '

'হু-উ-ম্ সে সময় কোথায় কাজ করতেন?'

'বেলগরে ওয়ার্কশপে।'

'আপনার পেশা?'

'ফিটার-মিস্ত্রি।'

'আপনি ইহুদী নন ত? ধর্মাস্ত্রিত নাকি?'

'না। আমার মনে হয় '

'আপনার কী মনে হয়, তাতে আমার আগ্রহ নেই। নির্বাসনে ছিলেন কি কখনও?'

'হ্যাঁ, ছিলাম।'

তদন্তকারী ইন্স্পেক্টর এবারে ব্রিফ-কেস থেকে মাথা তুলল, তারপর চাঁচাছোলা-কামানো ফুসকুড়ি ভরা চৌঁট চিবিয়ে বলল, 'আমি আপনাকে এ জায়গা থেকে চলে যাবার পরামর্শ দেব।' তারপর আপন মনে যোগ করল 'আমি অবশ্য নিজেও এ ব্যাপারে চেষ্টা করব '

'কেন বলুন ত ইন্স্পেক্টর মশাই?'

প্রব্লেম উত্তরে পাল্টা প্রশ্ন

‘কারখানায় দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময় স্থানীয় কসাকদের সঙ্গে কী নিয়ে কথাবার্তা হয়েছিল আপনার?’

‘সত্যি কথা বলতে গেলে কি’

‘আচ্ছা, আপনি যেতে পারেন’

স্ট্রুমান মোমডদের বাড়ির বারান্দায় বেরিয়ে এলো (ওপরওয়ালারা সব সময়ই সরাইখানায় থাকার চেয়ে সেগেই প্লাতেনভিচের বাড়িতে ওঠা বেশি পছন্দ করেন), কিছু বুঝতে না পেরে সে কাঁধ ঝাঁকিয়ে সুন্দর রঙ লাগানো দরজার ভাঁজ-করা পাল্লার দিকে ফিরে তাকাল

## ৩৩

শীতটা জমল একটু দেরিতে যে বরফ পড়েছিল উদ্ধারকর্ত্রী মেরীমাতার অক্টোবর পার্বণের পর তা গলতে শুরু করল বোড়ার পালগুলোকে চরতে পাঠানো হল মাঠে। সপ্তাহখানেক ধরে বইতে লাগল দখিন হাওয়া, আবহাওয়ার খানিকটা গরমের ছোঁয়া লাগল, মাটি ঘেন একটু সুস্থ হয়ে উঠতে লাগল, স্ক্রেশের বৃকে দেরিতে-গজিয়ে-ওঠা ঘাস উজ্জ্বল শ্যামলিমা নিয়ে দেখা দিল

‘সন্ত মাইকেলের দিন,’\* পর্যন্ত এই রকম বরফ গলতে লাগল। কিন্তু তারপরেই শুরু হয়ে গেল হিমের প্রকোপ, প্রচুর তুষারপাত হল। যত দিন যেতে লাগল তত কড়া ঠাণ্ডা পড়তে লাগল। আরও চার আঙুলখানেক পুরু হয়ে বরফ জমল। দনের আশপাশের সবজিবাগানগুলো এখন খালি বেড়ার মাথাগুলো পর্যন্ত বরফে ঢাকা পড়ে গেছে। সবজি বাগানের ভেতরে কনের হাতের সেলাই করা নন্দীকাঁথার কাছের মতো ফোঁড় দিয়ে চলে গেছে খরগোসের বিকলিত পায়ের দাগ। পথঘাট জনমানবশূন্য

গ্রামের মাথার ওপর গলগল করে উঠছে ঝুটের ধোঁয়া। রাস্তার ধারে ছাইয়ের ভাঁই ছড়িয়ে পড়ে থাকতে দেখে মানুষের বাসস্থানের সন্ধান পেয়ে কাকের দল সেখানে ঘোরাফেরা করছে। গ্রামের বৃকের ওপর দিয়ে একটা রঙচটা নীল ফিতের

---

\* পুরনো কালেক্টার অনুযায়ী ‘সন্ত মাইকেলের দিন’ আটই নভেম্বর, আর ‘উদ্ধারকর্ত্রী মেরীমাতার অক্টোবর পার্বণ’ অক্টোবরের পয়লা তারিখ অর্থাৎ সময়ের ব্যবধান তিন সপ্তাহের ওপরে - অনুঃ

মতো একেবেঁকে চলে গেছে শীতের একফালি সমতল রাস্তা - স্নেহ চপাচপের পথ

মাঠ ভাগাভাগি করে ঘোপঝাড়ের শুকনো ডালশালা কেটে তোলার সময় হয়ে এসেছে। এ ব্যাপারে আলোচনার জন্য ইতিমধ্যে একদিন ময়দানে সবাইকে ডাকা হল ভেড়ার চামড়ার কোট আর পশুলোমের লম্বা কোট গায়ে লোকজন কাছারি-ঘরের দেউড়িতে ভিড় করে এসে জুটল, তাদের পায়ের ফেলট-বুটের চাপে মচমচ শব্দে বরফ ভাঙতে লাগল ঠাণ্ডার চোটে শেষকালে সন্ধ্যাকে ঘরের ভেতরে গিয়ে ঢুকতে হল। টেবিলের ধারে মোড়ল আর মুহুরীর পাশে পাকা কুশোলা দাড়ির শোভা বিস্তার করে বসেছে গ্রামের ব্রাহ্মভাজন লোকজন - বয়োবৃদ্ধ মাতব্বরেয়া। যে সমস্ত কসাক বয়সে একটু ছোট তাদের নানা জন্মের নানা রঙের দাড়ি, কারও বা দাড়িই নেই তাবা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে ভেড়ার লোমের গরম কলাব তুলে তার ফাঁক দিয়ে গুল্লন করতে লাগল মুহুরী তার ঠাসবুননি লেখায় পাতা ডবিয়ে চলল, মোড়ল তার কাঁধের ওপর দিয়ে লক্ষ করতে লাগল। কাছারির ঠাণ্ডা কনকনে ঘরের মধ্যে চলতে লাগল চাপা গুল্লন

এ বছরের ঘাস বিচুলির ব্যাপাঝটা

‘হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক কথা ঘাস-জমিতে গোবু-ঘোড়ার ভালো খাবার আছে, কিন্তু স্তেনের ফাঁকা মাঠে শুধুই কাঁটার কাঁটির মতো শুকনো ঝাড়।’

‘আগেকার দিনে বড় দিনের আগে পর্যন্ত কিছু স্তেন-মাঠেই গোবু-ঘোড়া চরানো হত’

‘কালমিকদের কাছে ওটাই ছিল ভালো।’

‘হু-উ-ম’

‘মোড়লের গর্দানটা নেকড়ের মতো। ইশ, মাথাও ঘোরায় না ছাই।’

‘শালা শুরোরের বাচ্চা, শুরোরের মতো গণ্ডেপিণ্ডে সাঁটিয়ে এসেছে।’

‘বাঃ রে ভাই, শীতকে ডড়কে দেবার মতলব বুঝি? কোটিখানা ত’

‘শীত ত যাই যাই যেদে তার পশুলোমের কোট বেচে বসে আছে।’

‘তা হলে শোন, যিশুর জন্মদিন থেকে শুরু করে দীক্ষার দিন পর্যন্ত যে পূণ্য সপ্তাহটা পেল সেই সময় এক দিন এই বেদেদেরই একটা দলকে স্তেনের খোলা মাঠে রাত কাটাতে হয় ঢাকা দেবার মতো কিছু না থাকায় ওদের একজন ত জ্বালেই গা মুড়ি দিয়ে শূয়ে পড়ল কিন্তু ঠাণ্ডায় ফর্শন জমে যাওয়ার দশা হল তখন লোকটার লুম ভেঙে গেল, জ্বালের একটা ফাঁক দিয়ে আঙুল গলিয়ে দিয়ে বলল ‘ও মা, বাইরে বড় বিল্বী ঠাণ্ডা পড়েছে দেখছি।’

‘ভগবান না করুন, বরফে মাঠঘাট পেছল না হয়ে পড়ে।’

‘সে বকম হলে বলদগুলোর খুরে মাল লাগাতে হবে।’

‘সে দিন শরত্যানের খাঁড়িতে কিছু সাদা বেতের ডাল কেটেছিলাম দিবি।’

‘ওরে জাখার, তোর ওই ঝাঁপের বোতাম লাগা। ঠাণ্ডাম জমিরে ফেললে তোর মাগু তোকে ঘর থেকে দূর করে বার দেবে।’

‘কী ব্যাপার আভদেইচ, গাঁয়ের পাল দেওয়াব যাঁড়টার নাকি তুমিই দেখাশোনা করছ?’

পারব না বলে দিয়েছি পারানুকা মরিখিনা ওটার ভার নিতে রাজী হয়েছে। কেন জান? বলে কি, আমি হলেন গিয়ে বেধবা, তা ভালোই হল ওটা থাকলে বেশ মজাই পাওয়া যাবে আমি বললাম, হ্যাঁ হ্যাঁ নিয়েই নাও ছাওয়াল-টাওয়াল পয়সা হলেও হতে পারে

‘হাঃ হাঃ হাঃ!’

‘হি-হি-হি!’

‘তাহলে বুড়ো কর্তারা, কাঠ কাটার কী হবে? এই চূপ, চূপ!’

‘আমি বললেম ছাওয়াল-টাওয়াল পয়সা হলে আমি না হয় ধম-বাধ হব

চূপ দয়া করে চূপ কর না বাণু সবাই!’

বৈঠক শুরু হয়ে গেছে। সভা পরিচালনার দণ্ডটার গায়ে হিম জমে গিয়েছিল। সোটার ওপর হাত বুলাতে বুলাতে মোড়ল লোকজনের নাম আর তাদের ডাগ চেষ্টিয়ে চেষ্টিয়ে পড়ে শোনাতে লাগল। তার মুখ দিয়ে ভাপ বেরোতে লাগল থেকে থেকে কড়ে আঙুল দিয়ে সে তার দাড়ির ওপর জমা বরফের কাঠি টেনে টেনে বার করতে লাগল পেছনে দরজা মড়াম মড়াম করে খোলা-বন্ধ হচ্ছে আরও কসাক ঘরে এসে ঢুকছে ভিড়ের চাপ বাড়ছে, নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে ভাপ বেরোচ্ছে, নাক ঝাড়ার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

কাটার কাজটা বেস্পতিবার ঠিক করা উচিত হবে না!’ চিংকার করে মোড়লকে ধামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল ইভান তোমিলিন কথাটা বলেই সে তার গোলদাড়ী নীল টুপির তলা থেকে মাথাটা কাত করে লাল টকটকে কানদুটো ঘসতে লাগল

‘তার মানে?’

‘ওরে গোলদাড়ী তোর কানজোড়া শেষ কালে খসে না যায়।’

‘আমরা তার বদলে বলদের কান স্লেই করে দেব।’

‘বেস্পতিবার আদেক গাঁই মাঠে যাবে খড় আনতে। হুঁ, কথাবার্তাগুলো একটু ভেবেচিন্তে বলবে ত।’

‘সে কাজ রোববারেও করতে পার।’



‘বুড়ো কর্তারা শুনুন একবার।’

‘এখন কী উপায়?’

‘ভালোর ভালোয় যাত্রা শুরু করুক।’

‘হু-উ-উ-উ’

‘হা-আ-আ!’

কসাকদের ভেতর থেকে প্রবল আপত্তির বোল উঠল। বুড়ো মাতভেই কাশুলিন তেলেবেগুনে ঝুলে উঠল। নড়বড়ে টেবিলটার ওপর দিয়ে সামনের দিকে ঝুকে পড়ে আশকাঠের মসৃণ লাঠিগাছা তোমিলিনের দিকে বাড়িরে ধরে ঝেঁকিয়ে উঠল

‘ধাসবিচুলি পরে আনলেও চলবে ঢের হয়েছে আর পাঁচজনে যা করছে তাই কর না বাপু! চিরকালই বাগড়া দেওয়া স্বভাব তোমার ওই তবয়স। আবার কিনা তুমি ভায়া একটা বুদ্ধির টেকি। ঠুং ফত সব।

তুমি তুমি’

‘তুমি নিজে ত বাপু এই বুড়ো বয়সেও অন্যের বুদ্ধিতে চল,’ পেছনের সারি থেকে গল্যা বাড়িয়ে দিয়ে ফোড়ন কাটল নুলো আলেজ্জাই। কথার সঙ্গে সঙ্গে সে চোখ পিটপিট করল, ঘন ঘন নাচতে লাগল তার টুটোকাটা গালের পেশী

ছ’বছর ধরে এক টুকরো চাবের জমি নিয়ে বুড়ো কাশুলিনের সঙ্গে তার বিবাদ চলছে প্রত্যেক বছরই চাবের সময় সে গুটির ওপর তার দাবি জানায়, অথচ যে জমিটা বুড়ো তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে সেটা এতই ছোট যে চোখ বুজে ওপারে ধুতু ফেলা যায়

‘চোপ রও, মুখ-খিচুনি।’

‘বড় আকশোসের কথা যে দূরে আছে এখান থেকে নাগাল পাব না। নইলে তোমার ওই ধোঁতা মুখ ভেঙে আজ রক্ত ঝরিয়ে ছাড়তাম।’

ওরে তুই পিটপিটে-চোখ, নুলো’

‘ধাম দেখি তোমরা আর সময় পেলে না’

‘মারপিট করতে হয় বেবিয়ে ওই ওখানে। উঠোনে চলে যাও কেউ কিছু বলতে যাবে না

‘ছাড়ান দে আলেজ্জাই দেখতে পাচ্ছি নে বুড়োর রোয়া কেমন ফুলে উঠেছে, মাথার টুপিটা কেমন দুলছে। খসে পড়ল বলে।’

‘কী কেলেক্সারি কারবার শুরু করে দিয়েছে দেশ হাজতে পুরে রাখতে হয়’

মোড়ল এবারে টেবিলের ওপর দুম করে একটা ঘুসি মারতে টেবিলটা আর্দনাদ করে উঠল

‘একুনি সৈপাই ডেকে পাঠাব কিন্তু! চোপ্’

গোলমালটা আস্তে আস্তে পেছনের সাবির দিকে গড়াতে গড়াতে শেষকালে একেবারে থিতিয়ে পড়ল।

‘বেশ্পতিবার ভোবের আলো ফোটান সঙ্গে সঙ্গে কাঠ কাটতে যাবে।’

‘তাহলে বুড়ো কর্তারা আপনারা কী বলেন?’

‘ভালোয় ভালোয় যাত্রা করুক সব।’

‘ভগবান মঙ্গল করুন।’

‘আজকাল বুড়োদের কথা কেউ শোনে না।’

‘শুনবে না মানে? না শুনলে চলবে কী করে? ওদের বাগে আনা কি আর এতই কঠিন? এই আমার আলেক্সেইয়েব কথাই ধর না কেন। ওকে যেই ওর ভাগ্য বুঝিয়ে দিয়ে আলাদা করে দিলাম অমনি আমার সঙ্গে মারদাক্স বাধানোর ফিকির, আমার গলা টিপে ধবে আর কি। আমিও সঙ্গে সঙ্গে পালটা ঝাড়লাম একুনি মোড়ল আর মাতব্বরদের বলে দেব, ধোলাইয়ের ব্যবস্থা করব।’ ব্যস একেবারে কৈচো আর মাথা চাড়া দেয় সাথী কি

‘আরও একটা কথা বুড়ো কর্তারা জেলা সদরের আতামানের কাছ থেকে হুকুম এসেছে।’ মোডলের উদীর খাড়া শব্দ কলারটা পুতনিতে ঠেকছে, ঘাড়ে কেটে বসছে, তাই সে মাথাটা এদিক ওদিক ঘোরাল। তারপর গলার স্বর পালটে বলল, ‘এই শনিবারেই জেলা সদরে গ্রামের জোয়ান ছেলেদের মিলিটারিতে শপথ নিতে যেতে হবে তোমাদের দেখতে হবে সন্সেনাগাদ যেন সবাই জেলা-সদরের মণ্ডুরে হাজির থাকে।’

পান্তলেই প্রকোফিয়েভিচ খোঁড়া পাটা গুটিয়ে সারসের মতো দাঁড়িয়ে ছিল দরজার শেষ প্রান্তের জানলার ধারে তার পাশে ভেড়ার চামড়ার কোটের কোতাম খুলে জানলার ধারিতে বসে তার বেয়াই মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ বাদামী বঙের দাড়ির ফাঁকে মৃদু মৃদু হাসছিল। তার চোখের পাতার সাদাটে কঁচো কঁচো লোমের ওপর হিমের কণা জমে ফুরফুর করছে, মুখের ঝয়েরি রঙের বড় বড় মেচেতার দাগগুলো ঠাণ্ডায় রক্তিম হয়ে উঠেছে, কেমন যেন ছাই-ছাই দেখাচ্ছে। কাছাকাছি ছেলেছোকরা কসাকরা ভিড় জমিয়েছে। তাবা এ ওর চোখ টিপে ইশারা করছে, মুখ টিপে হাসছে। ভিড়ের মধ্যখানে জুতোর ডগায় দেহ ভব দিয়ে এধার ওধার দুলছে পান্তলেই প্রকোফিয়েভিচেরই সমবয়সী আডদেইচ - সকলের কাছে ‘চালিয়াত’ নামে যার পরিচয়। নীলরঙের চুড়োর ওপব বুগোব ক্রসচিক বসানো আতামান রক্তিদলের পশমী টুপিটা ঢাক পড়-পড় চেপটা মাথাব পেছনে হেলানো লোকটার বয়স যেন আর বাড়ে না মথ চিরকালই শীতের আপেলের মতো লাল টসটস করছে

কোন এক সময় সে আত্মমান রেজিমেন্টের দেহরক্ষিদলে কাজ করত চাকরিতে যখন ঢোকে তখন সে ছিল ইডান আড়দেইচ সিনিলিন কিন্তু ফিরে যখন এলো ততদিনে তার নাম হয়ে গেছে 'চলিয়াত'।

গ্রামের মধ্যে সে-ই প্রথম আত্মমান রেজিমেন্টে যেতে পেরেছিল। সেখানে যাওয়ার পরই এই কসাকটির মধ্যে ঘটে গেল এক আশ্চর্য পরিবর্তন ছোকরা আর দশটা ছেলের মতোই মানুষ হয়ে উঠছিল, ছোটবেলায় তারও মাথায় উদ্ভট উদ্ভট দু-একটা খেয়াল খেলত কিন্তু পল্টনের চাকরী থেকে যখন ফিরে এলো তখন সে একেবারে লাগামছাড়া। যে দিন বাড়ি ফিরল ঠিক সেই দিন থেকেই সে রাজদরবারে তার চাকরীর এবং সেন্ট পিটার্সবুর্গে তাব অসাধারণ রোমাঞ্চকর ঘটনার চমক লাগানো সব বস্তান্ত্র মিতে শুরু করল। শ্রোতার প্রথম প্রথম তার গল্প শুনে অবাক হয়ে যেত। হাঁ করে শুনত, সরল মনে বিশ্বাসও করত, কিন্তু পরে তারা আবিষ্কার করল যে আড়দেইচ একটা ডাহা মিথোবাদী - শুবু তা-ই নয় এতবড় মিথোবাদী গ্রামে এর আগে আর একটাও জন্মায় নি লোকে তাই তাকে নিয়ে সামান্যসামান্য হাসাহাসি শুরু করল। কিন্তু সে অবিচল। যত রাজ্যের বিদগ্ধুটে গল্প কবিতা গিয়ে হাতে নাতে ধরা পড়লেও সে আরও হত না (হয়ত বা হতও, কিন্তু মুখে সব সময় রক্তিমভা থাকলে আর কী করে বোঝা যাবে), মিথ্যে কথা বলাও সে থামাল না। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মাথাটা আবার একেবারেই বিগড়ে গেল। কোণঠাসা হয়ে গেলে রোগে মারামারি বাধায় কিন্তু লোকে যদি চুপচাপ শোনে আর মিটিমিটি হাসে তাহলে নিজের কল্পনায় নিজেই মশগুল হয়ে থাকে, ঠাট্টাবিশ্বাসের দিকে কোন আমল দেয় না।

ক্ষেত্ৰব্যমারির কাজে সে ছিল পটু, খাটতেও পারত, সব কিছু সে করত স্বীতিমতো বুদ্ধি-বিবেচনা করে, এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে বেশ চালাকি খাটিয়ে কিন্তু যেই আত্মমান রক্ষিদলে তার চাকরীর প্রসঙ্গ উঠত তখন যে-কোন লোকের ধৃদ্ধ না লেগে পারত না হাসতে হাসতে তাদের পেটে খিল ধরে যেত। তারা মাটিতে গড়িয়ে পড়ত।

আড়দেইচ ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ক্ষয়ে যাওয়া ফেল্ট-বুটের ডগায় ভর দিয়ে এধার ওধার দুলছে। ভিড় করে দাঁড়ানো কসাকদের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে ভারিকি চালে, হেঁড়ে গলায় সে বলল

'আজকালকার কসাকরা আগেকার দিনের মতো একেবারেই নয়। পেতি কসাক, কোন কন্সের নয় একটা নাক ঝাড়ানি দিলে দু' আধখানা হয়ে পড়ে যায় সংক্ষেপে বলতে গেলে 'অবজ্ঞার হসি হেসে একমলা ধূতু বুট দিয়ে মাড়াতে মাড়াতে সে বলল, 'ভিওশেন্স্কারা এলাকায় একবার আমার সুযোগ

ঘটেছিল মরা মানুষের কিছু হাড় দেখার। হ্যাঁ, কসাকের মতন কসাক বটে।

‘কোথাকার মাটি খুঁড়ে বার করলে আভদেইচ?’ পাশের লোকের গায়ে কনুইয়ের ঠেলা মেরে জিজ্ঞেস করল আনিকুশকা।

‘সামনে যে পর্বত আসছে অন্তত তার কথা ভেবে দোহাই তোর মিথ্যে কথার ঝুলিটা বন্ধ কর।’ বলতে বলতে পাশেলেই প্রকোফিয়েভিচ তার বাঁকা নাকটা কৌচকাল কানের মাকড়িটা টানল। এই হামবড়াটাকে সে দু’চক্ষে দেখতে পারে না।

‘আমি ডাই জীবনে কখনও বাজে কথা বলি নি,’ গুরুগম্ভীর চালে এ কথা বলার পর সে অবাক হয়ে ফিরে তাকাল আনিকুশকার দিকে। আনিকুশকা তখন চাপা হাসির দমকে এমন ঠকঠক করে কাঁপছিল যেন তার কম্প দিয়ে জ্বর এসেছে। কিন্তু তাতেও না মমে আভদেইচ বলে চলল ‘মড়া মানুষের সেই হাড়গোড় দেখেছিলাম আমার শালার বাড়ি ওঠার সময়। ভিত তৈরির কাজ যখন আমরা শুরু করি তখনই ঝুঁড়তে ঝুঁড়তে বেরিয়ে পড়ল কবর বোঝা গেল সেকালে গির্জের পাশে, মনের ধারের এই জায়গাটায় একটা কবরখানাও ছিল।’

‘তা হাড় পাওয়া গেল ত কী হল?’ পাশেলেই প্রকোফিয়েভিচ সরে পড়ার উদ্যোগ করতে করতে অসন্তুষ্ট স্বরে জিজ্ঞেস করল।

‘ওঃ সে কি হাত! - ইয়া লম্বা’ আভদেইচ আঁকশির মতো লম্বা লম্বা দু’হাত ছড়িয়ে দেখাল ‘আর মাথাটা - মাইরি বলছি, এতটুকু বাজে কথা নয় যেন ইয়া বড়া এক হাঁড়ি।’

‘তুমি আভদেইচ বরং জেয়ান বয়সে সেন্ট পিটার্সবুর্গে কেমন করে ডাকাত ধরেছিলে সেই গল্পটা বল,’ এই বলে গায়ের ভেড়ার চামড়ার কোটটা ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে জানলার ধারি থেকে মিরোন প্রিগোবিয়েভিচ নেমে পড়ল।

‘ও আর বলার কি আছে?’ আভদেইচ ইঠাৎ যেন বিনয়ে গদগদ হয়ে পড়ল ‘বলই না।’

‘হ্যাঁ হ্যাঁ, বল, বল।’

‘শুনিই না আভদেইচ।’

‘ব্যাপারটা হয়েছিল কি শোন।’ আভদেইচ গলা খাঁকাবি দিল। তারপর সালোয়ারের পকেট থেকে তামাকের থলি বার করল। হাতের পুটে এক চিমটে মতন তামাক টেলে তামাকের সঙ্গে সঙ্গে থলির ভেতর থেকে যে দুটো তামাব পয়সা পড়ে গিয়েছিল সেগুলো ভেতরে ফেলে দিয়ে তৃপ্তিভরে শ্রোতাদের মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে সে শুরু করল, ‘দুর্গের জেল থেকে পালাল একটা বদমাশ। এখানে-ওখানে কত জায়গায় হোঁজাবুজি চলল কোন পাক্সা নেই।’

কর্তব্যাক্তির খই পায় না বেমানুম হাওয়া হয়ে গেছে ব্যাটা। রাতের বেলায় পাহারাদারদের দলের বড় কর্তা আমাকে ডেকে পাঠাল। আমি আসতে সে কী বললে জান? বললে, 'যাও, মহামান্য সত্ৰাট বাহাদুর নিজে তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান' বুঝতেই পারছি, ভয়ে আমার বুক টিপ টিপ করতে লাগল। তা যাক গে, গিয়ে ত ঢুকলাম অ্যাটেনশন করে দাঁড়লাম কিন্তু হুজুরের কী দয়ার শরীল আমার কাঁধ চাপড়ে বললেন, 'শোন হে ইভান আভদেইচ, আমাদের রাজ্যের সবচেয়ে বড় বদমাশটা পৈলিয়েছে মাটি খুঁড়ে পার, যেখান থেকে পার বার করে আন, নইলে ও মুখ আর আমাকে দেখাতে এসো নি' 'যে আঞ্জে মহামান্য সত্ৰাট বাহাদুর' আমি বললাম। হুঁ হুঁ তা ভাই আমার তখন বড় কঠিন অবস্থা। জারের আন্তাবল থেকে ও আমি সেরা সেরা তিনটে ঘোড়ার এক দ্রোইকা গাড়ি নিয়ে তড়িঘড়ি ছুটলাম। আভদেইচ পাকানো সিগারেটটা ধরিয়ে তার শ্রোতাদের দিকে ফিরে তাকিয়ে যখন দেখতে পেল তারা সবাই মাথা নীচু করে আছে তখন উৎসাহিত হয়ে এক গাল ধোঁয়া ছাড়ল ধোঁয়ায় তার মুখ ঢাকা পড়ে গেল। তারপর জমাট ধোঁয়ার মেঘের আড়াল থেকে গমগমে গলায় সে বলল, 'তা একদিন এক রাত সমানে ছুটলাম, শেষ কালে তিনদিনের দিন তার নাগাল পেলাম মস্তোর কাছে এসে টপ করে সেই চাঁকে গাড়িতে তুলে নিয়ে সোজা ওই একই রাস্তা ধরে হীকালাম উলটো দিকে, যখন এসে পৌঁছুলাম তখন মাঝ রাত। সারা গায়ে জল কাদা, সেই অবস্থাতেই গেলাম সটান তাঁর কাছে। সত্ৰাট বাহাদুরের ঘত পত্রমিত্র আমার পথ আটকানোর চেষ্টা করল, আমি তাদের কোন আমল না দিয়ে গ্যাটম্যাট করে চলে গেলাম। হ্যাঁ তারপর দরজায় ধাকা মারলাম। 'মহামান্য সত্ৰাট বাহাদুর, ভেতরে আসতে পারি কি?' 'কে ওখানে?' উনি জিজ্ঞেস করলেন আমি বললাম, 'আমি হুজুর, আমি ইভান আভদেইচ সিনিলিন।' সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভেতরে হুলস্থূল পড়ে গেল। শুনতে পেলাম খোদ তিনি চৈচাচ্ছেন 'মারেইয়া ফিওদরভনা, মারেইয়া ফিওদরভনা শিগিরি ওঠ, সামোভারে জল চাপাও আভদেইচ এসে গেছে।'

পেছনের সারি থেকে প্রচণ্ড শব্দে হাসির বোমা ফেটে পড়ল। মুহুরী কাব কটা গোরু ভেড়া হারিয়েছে, কোন্ কোন্ গোরু ভেড়া অন্যের পালে এসে মিশেছে সেই সম্পর্কে একটা নোটিশ পড়ছিল। সেটার বাঁ পায়ে হাঁটু অবধি সাদা পশম এই পর্যন্ত পড়েই সে হৌচট খেয়ে থেমে গেল মোড়ল রাজহাঁসের মতো গলাটা বাড়িয়ে দিয়ে দেখতে লাগল জনতা হাসির দমকে কেঁপে কেঁপে উঠছে।

আভদেইচ তার মাথার টুপিটা টেনে খুলে ফেলল তার মুখ কালো হয়ে

গেল ফাল ফাল করে একবার এর ওপর আরেকবার ওর ওপর দ্রুত চোখ  
ঝুলতে লাগল

‘রোসো রোসো।’

ও হো-হা-হা-হা।’

‘ওঃ হেসে আর বাঁচি নে রে ভাই।’

‘হি-হি-হি।’

‘ওরে আভুদেইচ, লোম ওঠা টেকো কুস্তা। ও-হো-হো।’

‘সা-মো-ডারে জল চা-পা-ও। আভুদেইচ এসে গেছে।’ জোব দিয়েছে কিন্তু।’

জমায়েত ডাঙতে শুরু করল। বারান্দার কাঠের ধাপগুলো বরফে জমাট বেঁধে  
যাওয়ার লোকজনের পায়ের চাপে অবিরাম একটানা আর্দ্রনাদ করে চলল কাছারি  
ঘরের সামনের পায়ে মাড়ানো বরফের ওপর স্তম্ভপন আন্তরিক আর হাওয়া  
কলের মালিক, রোগা চ্যাঙামতন এক কসাক দাপাদাপি করে কুস্তী লড়ে শরীর  
গরম করতে লাগল।

‘মাথার ওপর দিয়ে জাপটে ধর রে ময়দাওয়ালটাকে। ওদের চারধারে  
যে-সমস্ত কসাক ভিড় কবে দাঁড়িয়ে ছিল তারা পরামর্শ দিল। ওর সব ভূমি  
ঝেড়ে বার করে দে রে স্তম্ভপন।’

‘এই, এই অমন জোরে ঘাড়ে মোচড় দিস নে। ওঃ কী চালাক দেখ।’ বুড়ো  
কাশুলিন চড়াই পাখির মতো ওদের চারধারে লাফালাফি করতে লাগল উত্তেজনার  
বশে সে লক্ষ্যই করল না কখন তার নীলচে নাকের ডগায় ছোট্ট এক রঙি  
জলের ফোঁটা জমাট বেঁধে ঝুলতে শুরু করে দিয়েছে।



জমায়েত থেকে ফিরে এসে পাশ্চাত্যেই প্রকোফিয়েভিচ সোজা গিয়ে ঢুকল  
পাশের ঘবে যেখানে সে আর তার বুড়ি থাকত কয়েক দিন ধরে ইলিনিচনা  
ভুগছিল। তার জল-টসটসে ফোলা কোলা মুখে ক্রান্তি ও বেদনার ছাপ। উঁচু  
নরম পালকের গদির ওপর একটা খাড়া করা বালিশের গায়ে পিঠ রেখে সে  
আধবসা হয়ে শুয়ে ছিল অনেক কালের বৃষ্ণতার ছাপ পড়েছে তার মুখে।  
পরিচিত পায়ের লম্বে সে ঘাড় ফিরিয়ে স্বামীর দিকে চোখ তুলে তাকাল দৃষ্টি  
আটকে গেল প্রকোফিয়েভিচের ঘন দাড়িগোঁফে ঢাকা মুখের ওপর জটা পড়া  
দাড়িটা নিম্নাঙ্গে ভিজে উঠেছে, দাড়ির সঙ্গে জড়ানো-পাকানো বোলা গৌকজোড়াও

ভিক্ষে-ভিক্ষে ইলিনিচনার নাকের পাশদুটো ফুলে উঠল কিছু বুড়োর গা থেকে ভেসে এলো শুধু তুষারের আর সেই সঙ্গে ভেড়ার চামড়ার বোটিকা টক টক গন্ধ। 'আজ দেখছি মাথাটা ঠিক আছে,' মনে মনে ভাবল বুড়ি। খুশি হয়ে গোড়ালি-পর্বন্ত না-বোনা অসমাপ্ত মোজা আর কুঁচকাটা নামিয়ে রাখল নরম ফোলা পৈটটার ওপর।

'কাঠ-কাটার কী হল?'

'ঠিক হল বেস্পতিবার কাটতে যাওয়া হবে।' একোফিয়েডিচ হাত বুলিয়ে গৌফ সম্মান করে নিল। 'বেস্পতিবার সকালে, খাটের পাশে সিন্দুকের ওপর বসতে বসতে সে আবার বলল। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'এখন কেমন আছ? একটু ভালো বোধ করছ কি?'

ইলিনিচনার মুখের ওপর একটা চাপা বিষন্নতার কালো ছায়া পড়ল

'ওই একই রকম। গাঁটে গাঁটে ব্যথা যেন ছুঁচ ফোটছে'

'আহাম্মক আর কাকে বলে। কতবার বলেছি, শরৎকালে জলে নামতে যেয়ো নি নিজের শরীলে কোথায় কিসে গোলমাল হয় জানই যদি তাহলে একটু সামলে সূমলে থাকলেই ত পার,' উদ্বেজিত হয়ে হাতের লাঠি দিয়ে মেঝের ওপর বড় বড় গোল গোল দাগ কাটতে কাটতে সে বলল 'বাড়িতে কি মেয়েছেলের কর্মতি আছে নাকি? চুলোয় যাক তোমার ওই শণ। গেলে ত ভেজাতে, এখন বোধ! হা ভগবান হুঃ যন্ত সব।'

'শণগুলোও তাই বলে ত আর নষ্ট হতে দেওয়া চলে না মেয়েছেলে বাড়িতে আর কেউ ছিল না। শিশুকা তার বৌকে নিয়ে গিয়েছিল চাষের কাজে, পেত্রোও দরিয়াকে নিয়ে কোথায় যেন গিয়েছিল।'

সামনে খাটের দিকে ঝুঁকে পড়ে দু'হাত ছড় করে বুড়ো তার ওপর নিশ্বাস ছাড়ল

'নাতাশার খবর কী?'

ইলিনিচনা সঙ্গে সঙ্গে চঞ্চল হয়ে উঠল, বীতিমতো উদ্বেগের সুরে সে বলল

'কী করব বুঝতে পারছি না এই ত সেদিন আবার কঁদছিল। উঠানে বেরোতে দেখি কি গোলাঘরের দরজাটা কে যেন হাট করে খুলে রেখে দিয়েছে ভাকলাম, খাই, বন্ধ করে দিয়ে আসি। ভেতরে ঢুকে দেখি যাবের গামলাটার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। আমি ওকে জিজ্ঞেস কবলাম, 'কী, সোনা মা আমার, কী হয়েছে?' ও বলল 'মা গো মাথাটা কেমন যেন ব্যথা-ব্যথা করছে' আসল কথা ত বার করার উপায় নেই।'

'অসুখ বিসুখ করে নি ত?'

‘না, অনেক জিজ্ঞেসবাদ করে দেখেছি। আমার মনে হয় কেউ ভুল করেছে, নয়ত গ্রিগরি কিছু একটা কাণ্ড করেছে

‘আবার সেই ওটার সঙ্গে শুরু-তুরু করে নি ত ? তুমি কিছু শোন নি ?’

‘বলছ কী গো। আরে না না।’ ইলিনিচনা ভয় পেয়ে দু’হাত ছুঁড়ে বলল ‘জ্ঞেপান কি এতই বোকা ? আমার নজরে পড়ে নি না ’

বুড়ো খানিকক্ষণ বসে থেকে বাইরে চলে গেল

গ্রিগোরি তার ঘরে বসে উঠে দিয়ে ঘসে ঘসে ঝড়লি খার দিচ্ছিল নাভালিয়া সেগুলোকে শূয়োরের গলানো চর্বি মাখিয়ে আলাদা আলাদা করে একেকটা কাপড়ের টুকরোয় সবচেয়ে ছড়িয়ে রাখছিল পাড্ডেলেই প্রকোফিয়েভিচ ঝুড়িয়ে ঝুড়িয়ে পাশ দিয়ে যেতে যেতে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল গ্রীষ্মের বরা পাতার মতো হলদেটে বসা গালের ওপর পড়েছে একটা ফেকাসে গোলাপী আভা। এই এক মাসের মধ্যে নাভালিয়া যে রকম রোগা হয়ে গেছে তা চোখে পড়ার মতো তার চোখে ফুটে উঠেছে কেমন যেন একটা নতুন, কবুণ ভাব। বুড়ো দরজার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। নাভালিয়ার মাথাটা বেগ্নির ওপর ঝুঁকে আছে, সুন্দর পাতা-কটেট চুল আঁচড়ানো। আরও একবার সেই দিকে দৃকপাত করে বুড়ো মনে মনে বলল ‘ইশ্, মেয়েটার কী হাল হয়েছে দেখ ’

গ্রিগোরি জানলার ধারে বসে ছিল। উঠে ঘসার সঙ্গে সঙ্গে তার কপালের সামনের জটপাকানো কালা চুলের গোছা এদিক ওদিক দুলছিল

‘ওসব ছাড় দেখি। চুলোয় ঝক। হঠাৎ প্রচণ্ড খেপে গিয়ে লাল হয়ে উঠে চিংকার করে উঠল বুড়ো হাতটাকে সামলে রাখার জন্য হাতের লাঠিটা শক্ত মুঠোয় চেপে ধরল।

গ্রিগোরি চমকে উঠে ভেবাচেকা খেয়ে বাপের দিকে চোখ তুলে তাকাল

‘দুটো দিকেই খার দিয়ে রাখতে চাই বাবা।’

‘তোকে বললাম না ছাড় কাঠ কটিতে যাবার জন্য তৈরি হ’।’

একুনি

‘স্নেজগুলো সব খুলে খুলে পড়ে যাচ্ছে, আর উনি এখানে পড়ে আছেন ঝড়লী নিয়ে।’ বুড়ো এবারে আগের চেয়ে শাস্ত্রবরে বলল তারপর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ উসখুস কবল মনে হল যেন আরও কিছু বলতে চায় – কিন্তু শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে চলে গেল বাকি যেটুকু রাগ ভেতরে ছিল, তা ঝাড়ল পেরোর ওপরে।

পশুলোমের কোঁটটা গায়ে পরতে পরতে গ্রিগোরি শুনতে পেল উঠোনে বাপ চৈত্যাচ্ছে।



‘গোবু বাছুরগুলোকে এখনও জল-টল দেওয়া হয় নি। বলি নজরটা কোন্ দিকে থাকে রে হতভাগা। আর এই যে বেড়ার পাশের গাদাটায় আবার কে হাত দিতে গেল?’ কতবার বলেছি না, অসময়ে কাজে লাগবে বলে রেখেছি। হাত দিস নে? হতভাগারা সবচেয়ে ভালো খড়গুলো যদি শেষই করে দিস তাহলে বসন্তকালে হালচাষের সময় বলদগুলোকে খাওয়াবি কী?’

বৃহস্পতিবার ভোর হওয়ার দু’ঘণ্টা আগে ইলিনিচনা দারিয়াকে ডেকে তুলল

‘উঠে পড়, উন্ন ধরাতে হবে এখন’

দারিয়া সেমিজ পরেই ছুটল উন্নের দিকে, কুলুঙ্গি হাতড়ে কিছু দেশলাইয়ের কাঠি পেয়ে আগুন জ্বালাল।

আলুখালুকেশ পেত্রো তামাক ধরাতে ধরাতে কাশতে কাশতে বৌকে জাড়া দিতে লাগল

‘তুমি একটু চটপট রান্নাটা সার গো।’

‘নাতাশকাকে ঘুম থেকে টেনে তুলতে বুঝি কষ্ট হয়? পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে দেখ বেহায়া, বেলাজ কোথাকার আমার ত আর দুটো বৈ চারটে হাত নেই।’ দারিয়া ফৌস করে উঠল। তার ঘুমের ঘোর তখনও কাটে নি, চোখমুখ তুলুলে

‘যাও না, ডেকে তোল পেত্রো পরামর্শ দিল।’

তার আর দরকার হল না নাতালিয়া নিজেই উঠে পড়েছে। গায়ে একটা জামা চড়িয়ে বেরিয়ে চালাঘবে চলে গেল ঘুটে আনতে।

‘জ্বালানি নিয়ে এসো গো’ বড় জা হুকুম দিল

‘দুনিয়াশকাকে জল আনতে পাঠিয়ে মাও শুনছ দাশা\*?’ অতি কষ্টে রান্নাঘরের ভেতরে পা ঘষটে চলতে চলতে ভাঙা গলায় ইলিনিচনা বলল

আরক তৈরির টটকা উপকরণ ঘোড়ার সাজ আর মানুষের গায়ের উষ্ণতার গন্ধে রান্নাঘর ম ম করছে

দারিয়া পশমের বুট ঘষটে ঘষটে লোহার বাসনকোসনের বানকন আওয়াজ তুলে এদিক ওদিক ছোটোছুটি করতে লাগল তার গায়ের গোলাপী জামাটার হাতা কনুই পর্যন্ত গোটানো। জামার নীচে কেঁপে কেঁপে উঠছে তার ছোট ছোট স্তনদুটো বিবাহিত জীবন তাকে বিশুদ্ধ ও বিবর্ণ করে ফেলতে পারে নি। লম্বা ছিপছিপে গড়নের দারিয়ার তনুদেহটি উইলো ডালের মতোই কোমল, তাকে দেখলে এখনও মনে হয় যেন একটি কিশোরী হিল্লোলিত তার গতিভঙ্গি, কাঁধদুটোও সেই সঙ্গে নাচছে। স্বামীর চিৎকার চোঁচামেচিতে মুখ টিপে

\* দারিয়ার ডাক নাম। অনুঃ

টিপে হাসছে। তার কুটিল দাঁতের পাতলা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে ছোট ছোট দাঁতের নিবিড় ঘন পংক্তি

‘ঘুটেগুলো কাল সন্ধ্যাবেলায় উন্মেষের ভেতরে রাখা উচিত ছিল তাহলে রাতের মধ্যে শুকিয়ে যেত,’ অসন্তুষ্টস্বরে গজগজ করে বলল ইলিনিচনা।

‘ভুলে গিয়েছিলাম মা এখন আমাদের বিপদ হল দেখছি, সকলের হয়ে উত্তর দিল দায়িত্ব।

রামা হতে হতে ফরসা হয়ে এলো পাঙ্কলেই প্রকোষিয়েতিচ মুখ পুড়িয়ে তাড়াতাড়ি করে পাতলা জাউ খেতে লাগল। খ্রিগোরি গোমড়া মুখে গালের মাংসপেশী নাড়িয়ে ধীরেসুস্থে খাবার চিবিয়ে চলল। দুনিয়াশকা দাঁতের ব্যথায় ভুগছে, তার গালে পাটি বঁধা পেত্রো বাপের অলঙ্কা তাকে ফেপিয়ে মজা করতে লাগল

গ্রামের সর্বত্র ব্রোজের কাঁচকৌচ আওয়াজ উঠল দূসর ভোরেব আবছারায় মধ্যে বলদটানা স্নেজগুলো এগিয়ে চলেছে দনের দিকে খ্রিগোরি আর পেত্রো গাড়ি জুততে বেরিয়ে পড়ল বিয়ের আগে কনে হিশেবে নাতালিয়া তার ভাবী করকে যে নরম স্মার্টটা দিয়েছিল চলতে চলতে খ্রিগোরি সেটা গলার জড়িয়ে নিল। এক রাশ কনকনে শুকনো বাতাস সে গিলে ফেলল। আঙিনার মাথার ওপর দিয়ে তারস্বরে কর্কশ কা কা ধ্বনি করতে করতে উড়ে গেল একটা কাক। কনকনে হিমেল নিস্তব্ধতার মধ্যে স্পষ্ট শোনা গেল তার মৃদুমন্দ ডানা ঝাপটানোর শব্দ। পেত্রো সেই দিকে চেয়ে বলল, ‘দক্ষিণের গরম দেশে উড়ে যাচ্ছে।’

কুমারীর শূচিনিক্ষ হাসিব মতো উচ্ছ্বসে গোলাপী হয়ে উঠেছে একটা মেঘবগু, তারই আড়াল থেকে আকাশে ঝাপসা উঁকি মারছে সবু এক ফালি চাঁদের প্রান্ত। রামাঘরের চিমনি থেকে ধোঁয়া যেন খাড়া হয়ে উঠে তার হস্তহীন শরীরটাকে বাড়িয়ে দিয়েছে ধরাছোঁয়ার বাইরে দূর আকাশের ওই প্রতিপদের চাঁদের শানানো কান্তেটার দিকে

মেলেখভদের বাড়ির উল্টো দিকে দন এখনও জমে যায় নি তীর থেকে ছড়িয়ে পড়েছে তুষারের আল-দেওয়া জমাট সবজেষ্টে বরফ তাব নীচে মূল শ্রোতের করল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জল স্নিগ্ধ গতিতে বয়ে চলেছে, বৃহদ তুলছে মাঝখান থেকে আরও খানিকটা দূরে, বাঁ তীরে যেখানে ‘কালো খাতের’ ভেতর থেকে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে নির্ঝরের জলধারা, সেখানে সাদা তুষারের মাঝখানে খাওয়া-খাওয়া জায়গাগুলোতে মারাত্মক ভাবে হাঁ করে আছে কালো গহ্বর, যেন হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকছে যে সব বুনো হাঁস শীত কাটানোর জন্য এখানে থেকে গেছে তারা ওই গহ্বরের ভেতরে সঁতার কাটেছে কখনও ডুব দিচ্ছে,

কখনও ভেসে উঠছে, তাদের কালো খয়েরী রঙের শরীরগুলো বলক দিচ্ছে।

দ্রোণগুলোর যাত্রা শুরু হল বারোয়ারিডলা থেকে

পান্তেলেই প্রকোফিয়ারভিচ ছেলোদের জন্য আর অপেক্ষা না করে বুড়ো বলদদুটো হাঁকিয়ে আগে আগে চলে গেল। পেত্রো আর গ্রিগোরি একটু পরেই তাকে অনুসরণ করল। ঢালুর মুখে আনিকুশকার সঙ্গে ওদের দেখা হয়ে গেল। আনকোরা নতুন হাতলওয়ালা একটা কুড়ুল দ্রোণের গায়ে বিধিয়ে নিয়ে সবুজ চওড়া কাপড়ের ফেটি কোমরে জড়িয়ে আনিকুশকা হেঁটে চলেছে তার বলদদুটোর পাশে পাশে গাড়ি চালাচ্ছিল তার বৌ অবাড়ন্ত গড়নের মেয়েমানুষ, অসুখে ভোগে পেত্রো দূর থেকেই হাঁক দিল

‘কি গো পড়লী, বৌকে সঙ্গে নিয়ে চলেছ?’

আনিকুশকা অমনিতেই মজা করতে পারে নাচের ভঙ্গিতে সে ওদের দু’ভাইয়ের দ্রোণের সামনে এগিয়ে এসে বলল, ‘তা নয়ত কি? শরীরটা গরম রাখতে হবে না?’

ওর কাছ থেকে গরম আর কতটা পাবে? বড় বেশি শুকনো।

‘ওট খাওয়াচ্ছি ত, কিছু কিছুতেই গায়ে মাংস লাগছে না’

‘আমরা একই জমিতে কাঠ কাটব, তাই না?’ গ্রিগোরি দ্রোণ থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ে জিজ্ঞাস করল।

একই জমিতে। বলি, তামাক খাওয়াবে ত?’

‘ওঃ আনিকেই, পরের ওপর দিয়ে চালানোটা তোর চিরকালের অভ্যাস’

‘জিন্সের জিনিস আর চুরি-করা জিনিসের মতো মিটি আর কী হতে পারে চাপা হি-হি হাসিতে ভাঁজ পড়ল মেয়েদের মতো মাকুন্দ মুখের চামড়ায়।

ওরা একসঙ্গে চলল। হিমের কণা জমাট হয়ে বনেন গায়ে লেসের কাজ হয়ে ঝুলছে, সারা বন সামা ফটফটে আনিকুশকা পথের ওপর ঝুলে পড়া ডালপালার গায়ে চাবুক মারতে মারতে আগে আগে চলেছে। আনিকুশকার বৌ চাদর মুড়ি দিয়ে বসে ছিল। ঝুচের ডগার মতো সবু সবু বুরবুরে বরফ ঝরে পড়তে লাগল তার গায়ের ওপর।

‘গুস্তোর, এসব কী হচ্ছে?’ গায়ের বরফ ঝাড়তে ঝাড়তে বৌ চৌচিয়ে উঠল

‘তুই বরফের জুপের ডেভতরে ওর নাক গুঁজে দে’ চলার বেগ বাড়ানোর উদ্দেশ্যে বলদের পেটের নীচে জুতসই বেতের বাড়ি মারার কিংকি করতে করতে পেত্রো ওকে পরামর্শ দিল

‘মাগ খানা’ নামে জায়গাটির দিকে মোড় নেওয়ার সময় স্তোপান আস্তাখভের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল আলাগা করে বোরাল লাগানো একজোড়া বলদ

তাড়িয়ে নিয়ে সে চলেছে গ্রামের দিকে। চলেছে লম্বা লম্বা পা ফেলে। তালিমারা ক্লেট-বুটের চাপে পায়ের নীচের বরফ মচমচ আওয়াজ করছে। কপালের সামনে কৌকড়া চুলের ঝুটিটা হিমে জমাট বেঁধে গিয়ে তেরছা করে পরা ভেড়াব লোমের লম্বা টুপির নীচ থেকে একগোছা সাদা আঙুরের মতো দুলছে।

‘কী হল রে ভেওপা, পথ হারিয়ে ফেলেছিস নাকি?’ পাশ দিয়ে যেতে যেতে আনিকুশকা চিৎকার করে বলল

পথ হারিয়েছি না তোমার মাথা গুঁড়ির সঙ্গে হাক্সা লেগে স্নেজের তলার একটা লোহার পাত গেল ভেঙে দু’অথলা হয়ে তাই ফিরতে হচ্ছে, স্তেপান সঙ্গে সঙ্গে থিথি করে উঠল পেত্রোর পাশ দিয়ে যেতে যেতে চোখেব পাতার লম্বা লম্বা পালকের তলা থেকে হালকা বস্তুর ডাকাতে চোখদুটো কুঁচকে নির্ভেজর মতো তাকিয়ে দেখল

‘স্নেজ কি ফেলে গেলি নাকি?’ আনিকুশকা ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল

স্তেপান অবজ্ঞাভরে হাত ঝটকাল বলদদুটোকে ঘুরিয়ে ঠিক পথের ওপর আনার জন্য সপাং করে চাবুক মারল, স্নেজের পেছন পেছন লম্বা লম্বা পা ফেলে গ্রিশকাকে চলে যেতে দেখে অনেকক্ষণ কঠিন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল। প্রথম খানাতার খানিকটা দূরে গ্রিগোরি দেখতে পেল রাস্তার মাঝখানে একখানা স্নেজগাড়ি পড়ে আছে পাশে দাঁড়িয়ে আছে আন্নিয়া। বাঁ হাত দিয়ে দন এলাকার ফার-কোটের প্রান্ত ধরে তাকিয়ে আছে সামনের দিক থেকে এগিয়ে আসা স্নেজগাড়িগুলোর দিকে।

‘বাস্তা ছেড়ে দাঁড়াও, নইলে গায়ের ওপর দিরেই গাড়ি চালিয়ে যাব কিন্তু আহা বড় আফশোস আমার বৌ নয়।’ আনিকুশকা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল আন্নিয়া মুচকি হেসে সরে গিয়ে তোবড়ানো স্নেজগাড়িটার ওপরে গিয়ে বসল।

‘তোমার বৌ ত তোমার সঙ্গেই আছে দেখছি।’

‘আর বলো না, ছিনে জ্যৌকের মতো লেগে আছে নইলে ত তোমাকে ভুলে নিতেই পারতাম।’

‘আহা, তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক গো।’

পেত্রো আন্নিয়ার পাশ দিয়ে যেতে যেতে কিরে তাকাল গ্রিগোরির দিকে গ্রিগোরি কেমন যেন অস্বস্তিভরে হাসতে হাসতে আসছে, তার সমস্ত অঙ্গভঙ্গিতে ফুটে উঠেছে উদ্বেগ আর প্রত্যাশার ভাব।

‘কেমন আছ গো পডমী-বৌ?’ পেত্রো হাতের দস্তানা মাথার টুপিতে ঠেকিয়ে তাকে নমস্কার জানাল

‘ডালোই আছি ভগবানের কৃপায়।’

‘দ্বৈজ ভেঙে গেল নাকি?’

‘হ্যাঁ, ভেঙে গেছে,’ পেত্রোর দিকে না তাকিয়ে টেনে টেনে এই কথাগুলো বলে খ্রিগোরিকে এগিয়ে আসতে দেখে উঠে তার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, ‘আপনার সঙ্গে আমার একটু কথা ছিল খ্রিগোরি পাষ্টেলোয়েভিচ।’

পেত্রো গাড়ি চালিয়ে একটু এগিয়ে গিয়েছিল খ্রিগোরি আক্সিনিয়ার দিকে ঘুরে দাঁড়াল, তারপর পেত্রোর উদ্দেশ্যে হেঁকে বলল, ‘আমার বলদদুটোর ওপর একটু নজর রাখিস।’

‘আচ্ছা, আচ্ছা,’ তামাকের ধোঁয়ায় তিতকুটে গৌফ মুখের ভেতরে গুঁজতে গুঁজতে কুৎসিত বাঁকা হাসি হাসল পেত্রো।

দুজনে নিঃশব্দে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইল। আক্সিনিয়া সচকিত হয়ে চারধারে দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। তারপর ছলছল চোখে তাকাল খ্রিগোরির দিকে লজ্জায় আর আনন্দে ঝাঁঝ করে উঠল তার গালদুটো, ঠোঁট শুকিয়ে গেল। থেকে থেকে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলতে লাগল সে।

ওক গাছের বাদামী ঝাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল আনিকুল্কা ও পেত্রোর দ্বৈজগাড়ি খ্রিগোরি আক্সিনিয়ার চোখে চোখ রেখে একদৃষ্টে তাকাল, দেখতে পেল সে চোখে জ্বলছে সর্বনাশা প্রজন্মের আগুন।

‘এখন খ্রিশা, তোমার যা বুলি তা-ই করতে পার, কিন্তু তোমাকে ছাড়া আমার বাঁচার কোন সাধি নেই,’ আক্সিনিয়া দৃঢ়কণ্ঠে এই কথাগুলো বলে শত কবে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে উত্তরের অপেক্ষা করতে লাগল।

খ্রিগোরি চুপ করে রইল নিঃশব্দতা আটপোটে বেষ্টে ফেলল বনকে একটা কাচস্বচ্ছ শূন্যতা কানে বিনবিন করে বাজতে লাগল। দ্বৈজের ঘবার ঘষায় মসৃণ চকচকে রাস্তা, আকাশের ধূসর ছিন্নকন্থা, মরণঘুমের আচ্ছন্ন নির্বাক বনভূমি হঠাৎ কাছে কোথায় যেন একটা দাঁড়কাক কর্কশ গলায় ডেকে উঠতে খ্রিগোরির কবিকের তন্ত্রা বুঝি ভঙ্গ হল। সে চোখ তুলে ওপরের দিকে তাকাল। দেখতে পেল কালো কুচকুচে পালকে ঢাকা পাখিটা পাদুটি গুটিয়ে নিঃশব্দে ডানা নাড়তে নাড়তে বিদায় জানিয়ে চলে যাচ্ছে।

‘গরম পড়বে গরম দেশে উড়ে চলছে’ ‘আপন মনে বলেই সে চমকে উঠল কর্কশকণ্ঠে হেসে ফেলে বলল, ‘আচ্ছা’ তারপর গাড়ি মদির চোখের মণি নীচে নামিয়ে হঠাৎ হেঁচকা টানে আক্সিনিয়াকে বুকের কাছে টেনে নিল।

রোজ সন্ধ্যায় টেরা লুকেশ্কার বাড়িতে স্টকমানের ঘরে নানা ধরনের লোকজনের আড্ডা জমতে থাকে যারা আসে তাদের মধ্যে আছে শ্রিস্তোনিয়া তেলচিটে, নোংরা কোট কাঁধে ফেলে আটাকনের গোলাম, নীত-বার করা দাভিদকা গত তিন মাস হল যার কোন কাজকর্ম নেই, ইঞ্জিন-ড্রাইভার ইভান আলেক্সেয়েভিচ কতলিয়াবোভ, মাঝেমধ্যে আসে ফিলকা মুচি এই আসরের নিয়মিত অতিথি মিশ্কা কশেভয় নামে এক তরুণ কসাক, এখনও পল্টনে পুরোদস্তুর কাঞ্চে ঢোকান সময় তার হয় নি।

প্রথম প্রথম এটা ছিল মামুলি তাস খেলার আসর। পরে স্টকমান কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে কোন এক ফাঁকে নেক্রাসভের\* কবিতার একটা চটি বই বার করে সবাই চোঁচিয়ে পড়তে থাকে। ভালোও লাগে ওদের। এর পরের ধাপে নিকিতিন\*\* আর বড়দিনের কাছাকাছি এক সময় স্টকমান বীধাই-খোলা, হেঁড়াবোঁড়া একটা মোটরবই নিয়ে ওদের পড়তে বলল। কশেভয় কোন এক সময় গির্জার স্কুলে পড়েছিল, স্কুলের পাঠ শেষও করেছিল সে-ই সকলকে বই পড়ে শোনাত। তেলচিটে নোটবইটা অবজ্ঞাভরে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখার পর সে বলল, 'এটা কেটে কুটে বেশ ভালো খোল রান্না করা যায় বেশ তেলাতেলে।'

শ্রিস্তোনিয়া হাসিতে ফেটে পড়ল। দাভিদকা চোখ-ধীধানো দাঁতের পাটি বিকশিত করে হাসল কিন্তু স্টকমান সকলের হাসি ঠাট্টা খিটিয়ে পড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর শেষকালে বলল, 'পড় মিশা পড় লেখাটা কসাকদের নিয়ে পড়তে ভালোই লাগবে।'

কশেভয় মাথার সামনের সোয়ালি চুলের ঝুটি টেবিলের ওপর ঝুকিয়ে আলাদা আলাদা একেকটা শব্দ উচ্চারণ করে পড়ল, 'মন কসাকদের সংকিশ্প্ত ইতিহাস।'

\* নিকলাই আলেক্সেয়েভিচ নেক্রাসভ (১৮২১-১৮৭৭ ৭৮) রুশ কবি ১৮৪৭-৬৬ সাল পর্যন্ত সত্রেমেরিক' (সমকালীন) সাময়িক পত্রিকার সম্পাদক। তিনি তাঁর রচনায় বিপ্লবী গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর রচনায় পার্বত্য অধিবাসী, সমাজের নিম্নস্তরের মানুষ ও চাষীদের দুঃখদুর্দশা এবং নারীজাতির দুর্ভাগ্যের চিত্র যেমন আছে তেমনি আছে জাতির ভবিষ্যৎ সুখের স্বপ্ন জীবনের শেষ কয়েক বছর তিনি 'অভ্যন্তরীণভাবে জাতিশাস্ত্র (স্বদেশ বৃত্তান্ত) পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। - অনুঃ

\*\* ইভান সাভভিচ নিকিতিন (১৮২৪-১৮৬১) নেক্রাসভধারার রুশ কবি। ভূমিদাস কৃষকপন্থীর নিরানন্দ জীবন সম্পর্কে কবিতা লিখেছেন নিঃস্বর্গমূলক গীতিকবিতা রচনায় বিশেষ পারদর্শম অনুঃ

তারপর যারা আগ্রহ নিয়ে চোখ কুঁচকে অপেক্ষা করতেন তাদের সকলের ওপর একবার নজর বুলিয়ে নিল।

পড়ে বাও,\* ইভান আলেক্সেয়েভিচ বলল

তিন তিনটে সাক্ষ্য আসর ওটা নিয়ে খবস্তাখবস্তি করে কেটে গেল। পুগাচিওভের\* কথা, মুক্ত জীবনের কথা, স্তেপান রাজিন\*\* আর কন্ড্রাতি ব্লাভিনের\*\*\* কথা তারা পড়ল

অবশেষে তারা এসে পড়ল আধুনিক কালে। অজ্ঞাতনামা লেখকটি বেশ প্রাঞ্জল ভঙ্গিতে, কটু ভাষায় কসাকদের শোচনীয় জীবনযাত্রা নিয়ে উপহাস করেছেন, আইনশৃঙ্খলা, প্রশাসন ব্যবস্থা ও জীবনসরকারকে নিয়ে কটাক্ষ করেছেন এবং পরিশেষে যে কসাক ব্যবস্থা রাজন্যবর্ণের ভাড়াটে দেহরক্ষিবাহিনীর জন্ম দিয়েছে তাকেও কঠোর বিদ্রূপ করেছেন। শ্রোতাদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিল তর্কবিতর্ক শুরু হয়ে গেল। খ্রিস্তোনিয়া সোজা হয়ে দাঁড়াতে ছাদের কড়িকাঠে তার মাথা ঠুকে গেল। সে সর্গর্জনে তার নিজের মন্তব্য প্রকাশ করল স্টকমান দরজার সামনে বসে গোল গোল আঙুটা বসানো হাড্ডের সিগারেট-হোল্ডারে সিগারেট টানতে লাগল কেবল তার চোখদুটো হাসছে।

‘ঠিক কথা ঠিকই বলেছে।’ খ্রিস্তোনিয়া ফেটে পড়ল

‘দোষ ত আর কসাকদের নিজের নয় এরকম শোচনীয় অবস্থায় তাদের টেনে নামানো হয়েছে,’ বলতে বলতে কশেভায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে হাত নাড়ল। তার কালো চোখ বসানো সুন্দর মুখের ওপর দেখা দিল কুণ্ণনবেশ।

---

\* ইয়েমেলিয়ান পুগাচিওভ (১৭৪০ অথবা ১৭৪২-১৭৭৫, দন কসাক ১৭৭৩-১৭৭৫ সালের রুশ কৃষকবৃদ্ধের নেতা উল্লেখযোগ্য সামরিক ও সাংগঠনিক ক্ষমতার পরিচয় দেন ১৭৭৪ সালে ষড়যন্ত্রকারীরা তাকে সরকারের হাতে তুলে দিলে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন - অনুঃ

\*\* স্তেপান তিমফেয়েভিচ রাজিন (অনুমানিক ১৬৩০-১৬৭১ বা স্তেনকা রাজিন - দন কসাক। ১৬৬২-১৬৬৩ সালে দন-কসাকদের আভ্যন্তরীণ ক্রিমিয়ার তাতার ও তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। কাম্পিয়ান সাগরে এবং পারস্যেও অভিযান চালান। ১৬৭০ সালের বসন্তকালে কৃষকবৃদ্ধের নেতৃত্ব দেন। সংগঠক ও সামরিক নেতা হিঁপেবে দক্ষতার পরিচয় দেন কসাক সেনাপতিমণ্ডলীর জার সরকারের হাতে তাকে তুলে দিলে তিনিও মৃত্যোর প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন - অনুঃ

\*\*\* কন্ড্রাতি আফানাসিভিচ ব্লাভিন (আনুমানিক ১৬৬০-১৭০৮ - দন কসাক জেলা সদরের জটনিক কসাক-সঙ্গীর পুত্র। সামন্তপ্রথা বিরোধী বিপ্লবের নেতা ১৭০৭ সালের অক্টোবরে অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দেন চেরকাস্কে কসাক সেনাপতিমণ্ডলীর হাতে নিহত হন - অনুঃ

লোকটা গাট্টাগাট্টা ধরনের। কাঁধ আর ঊরু তার সমান চওড়া, তাই দেখলে মনে হয় যেন চারকোনা ঢালাই লোহার শক্ত ভিতের ওপর বসানো পাটকিলে রঙের পোক্ত ঘাড়বানা আশ্চর্য হতে হয় এই ঘাড়ের ওপরই সুন্দর ভাবে বসানো ছোট মাথাটি দেখে নমনীয় গাল, মেয়েলি ধাঁচের মুখেরখা ছোট মুখগহ্বর ভাতে জেদী-জেদী ডাব, সোনালি রঙের এক রাশ কৌকড়া চুলের নীচে একজোড়া গভীর কালো চোখ ইভান আলেক্সেয়েভিচ নামে ইঞ্জিন-ড্রাইভার কসাকটির দেহের হাড়গুলো বিরাট চওড়া চওড়া ভয়ঙ্কর তর্ক চালিয়ে যেতে লাগল সে। তার ওই চওড়া শক্ত হাড় গড়া দেহের রক্তে রক্তে কসাক-ঐতিহ্যের ধারালোত বইছে, অস্থিতে-মস্তকায় গঁথে বসে আছে সে কসাকদের পক্ষ সমর্থন করতে লাগল তার ভীতির মতো চোখদুটো জ্বলজ্বল করে উঠল খ্রিস্টোনিয়ার ওপর ঋণা হয়ে নিয়ে সে বলল, 'তুই খ্রিস্টোনিয়া একটা 'চাষা' বনে গেছিস আমার সঙ্গে তর্ক করতে আসা তোর সাজে না তোর শরীরের একেক বালতি বদ চাষী-রক্তের মধ্যে পাওয়া যাবে এক আধ ফোঁটা কসাক-রক্ত! তোর মা ত তোকে পয়দা করেছে ভরোনেজের এক ডিমওয়ালার কাছ থেকে।'

'তুই একটা গাধা যাকে বলে আকাট বুঝলি?' ভরাট গলায় খ্রিস্টোনিয়া বলল 'যা সত্যি আমি তারই পক্ষ নিয়ে বলছি।'

'আমি আতামান রেজিমেন্টে চাকরী করি নি, ইভান আলেক্সেয়েভিচ খোঁচা দিয়ে বলল 'যত গাধা সব ত ওখানেই থাকে জানি।'

'অমনি আর্মিতেও মাথা মোটা লোকের কমতি নেই।'

'তুই চুপ কর চাষা

'চাষা হলেই বা কি? চাষারা কি মানুষ নয়?'

'চাষারা চাষাই। ভেতরে খড় পোড়া, ছালবাকলে তৈরি।'

'সেন্ট পিটার্সবুর্গে যখন চাকরী করতাম তখন অনেক কিছুই দেখেছি ভায়া। তাহলে বলি শোন, একবার কী ঘটেছিল,' শেষ কথাটির ওপর বিশেষ জোর দিয়ে খ্রিস্টোনিয়া বলতে শুরু করল 'জ্বরের রাজপুরীতে ত আমরা পাহারায় আছি, জ্বরের বিস্তারের ঘরে যেমন, তেমনি বাইরেও পাহারা দিছি। বাইরে যারা পাহারায় আছে তারা পাঁচিল বরাবর ঘোড়া চালিয়ে টহল দেয় দু'জন এদিকে, দু'জন ওদিকে। মুখোমুখি দেখা হলেই জিজ্ঞেস করে, 'সব ঠিক আছে? কোন বিদ্রোহ-টিদ্রোহ দেখা দেয় নি ত?' 'সব ঠিক আছে,' বলেই যে যার পথ ধরে দাঁড়িয়ে যে দুটো কথা বলবে একদম বারণ তাছাড়া চেহারাও বেছে বেছে নিত দরজার ধারে পাহারার জন্যে দু'জনকে যখন বাছত তখন চেষ্টা করত একই চেহারার লোক নিতে একজনের কালো চুল হলে অন্যজনেরও তাই,



একজনের পাট রঙের চুল হলে অন্যজনেরও তেমনি। শুধু চুলই বা বলব কেন মুখের আদলও একরকম হতে হবে এই সব আগড়ম্ব বাগড়ম্ব ব্যাপ্যবের জন্যে একবার ত নাপিত ডাকিয়ে আমার দাড়ি রঙ করে দেওয়া হল আমার ডিউটি পড়েছিল ডেপিকিন্সিয়া জেলার এক কসাকের সঙ্গে নাম তার নিকিফর মেন্চেবিয়াকোভ আমাদেরই স্কোয়াড্রনের। হাবামজাদার দাড়ি কেমন যেন একটা বাদামী রঙের আর জুলপির রঙ? কে জানে ছাই কোথা থেকে ওরকম হয় আগুনের মতো লকলক করছে অনেক খোঁজাখুঁজি কবেও আমাদের দলের মধ্যে ওরকম আর কাউকে পাওয়া গেল না। লেফটেন্যান্ট বারকিন তখন আর কী করে? আমাকে এসে ধরল। বলল, ‘নাপিতের কাছে গিয়ে একুনি দাড়ি গোঁপ ছুঁপিয়ে এসো।’ ফিরে এসে আশ্চর্য মুখ দেখতে গিয়ে দেখি বাপু এ কী রঙ করেছে! আমার বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল মনে হল আমার সর্বাত্ম যেন দাউ দাউ করে জ্বলছে দাড়িতে হাত ঠেকাই ওঃ মনে হল যেন হাতের আঙুলগুলো জ্বলে গেল। বোঝ কাণ্ড

কোথা থেকে কী কথা দেখ’ কী নিয়ে কথা শুরু হয়েছিল? ইভান আলেক্সেয়েভিচ তাকে যথা দিয়ে বলল।

‘কী নিয়ে আবাব? সাধারণ মানুষ নিয়ে কথা হচ্ছিল না? সেই কথাই ত বলছি।

‘আচ্ছা, সেই কথাই বল না তা হলে তোর ও ছাই দাড়ি দিয়ে আমাদের কী কাজ?’

‘তা ই ত বলছি তোমাদের একবার ঘোড়ায় চড়ে পাহারা দেবাব পালা এলো। দু’জনার মিলে জুড়ি বেঁধে ত চলছি, এমন সময় এক কোনা থেকে ছুটে এলো একদল ছাত্র কত যে হবে তার কোন গোনাগুণতি নেই! আমাদের দেখেই ‘হা-রে-রে-রে-রে-রে’ করে সে যা বিকট গর্জন। দু’-দু’বার। আমরা কোথায় আছি, কী বিস্তারিত বোঝার আগেই ওরা আমাদের ঘিরে ফেলল ‘ওহে কসাকরা তোমরা এখানে ঘোড়ায় চড়ে কী করছ?’ আমি বললাম, ‘কী আবাব? পাহারা দিচ্ছি। আরে আরে, লগাম ছাড় বলছি।’ খবরদার, ধরবে না’ বলেই আমি আমার তলোয়ারে হাত দিতে গেলাম ছাত্ররা তাই দেখে বলল ‘ও দেলোয়ালি দাদা নিশ্চিন্তি থাকতে পার। আমিও কামেনস্কায়া জেলার লোক। এখানে নেকাপড়া করি নিভিসিতে’ নাকি ‘নিভিসিটি’ না কী যেন বলে সেইখানে আমরা তাই আর কিছু না বলে এগিয়ে গেলাম এমন সময় ওদের একজন ইয়া বড তার নাক পোর্টমেন্টো থেকে দশ বুবলের একটা নোট বার করে বলল ‘কসাক দাদারা আমার পিতেঠাকুরের আখ্যার শান্তির জন্যে একটি মদ খেও’ দশ বুবলের নোটটা আমাদের দিন, তারপর ধলে থেকে একটি ছবি বার করে বলল ‘এই

যে আমার পিতৃঠাকুরের ছবি, চিহ্ন হিশেবে রেখে দাও। আমরা নিলাম এর পর আমরা না নিই বা কী করে? ছাত্রের দলটাও আবার ওই 'হারে রে-কে-কে-রে' হাঁক দিয়ে ওখান থেকে সরে গেল। আমরাও তখন চললাম নেভস্থি এবিনুর দিকে। এদিকে রাজবাড়ির খিড়কি দরজা দিয়ে আমাদের দিকে সোজা ঘোড়া ছুটিয়ে লেফটেন্যান্ট তার পলটন সঙ্গে নিয়ে এসে উপস্থিত হল, 'কী ব্যাপার?' আমি তখন বললাম, 'একদল ছাত্র এসে আমাদের ঘিরে ফেলে কথাবার্তা শুরু করে দিয়েছিল। আমরাও আমাদের বিধিমতো তলোয়ারের কোণ মারতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ওরা আমাদের ছেইড়ে দেওয়ায় আমরাও সরে গেলাম।' তারপর যখন আমাদের ডিউটি শেষ হল, আমরা সার্জেন্ট-মেজরকে বললাম, 'এই যে লুকিচ আমরা দশটা রুবল রোজগার করেছি। এই যে এখানে যে বুড়োদানুর ছবি আছে তার শাস্তি স্বত্বায়নের নাম কবে আমাদের মদ খেতে হবে। এই বলে আমরা ছবিটা দেখালাম। সার্জেন্ট-মেজর সঙ্গেবেলা আমাদের জন্যে ভোদকা এনে মিল। আমরা ত ওই খেয়ে দুদিন দিন-রাত্তির ফুটি করলাম। কিছু পরে জানা গেল পুরো ব্যাপারটাই একটা ধাঙ্গাবাজী। শ্রেফ আমাদের বেকায়দায় ফেলার জন্যে খানকীর বাচ্চা ছাত্রটা তার বাপের ছবি বলে যে ছবিটা আমাদের দিয়েছিল সেটা আসলে হাসানাবাজমের এক পালের গোদার ছবি। নোকটা নাকি জাতে জার্মান। আমি ত দিব্যি ভালোমানুষী করে ছবিটা নিলাম। নিয়ে চিহ্ন হিশেবে বিছনার মাথার ওপর টাঙিয়ে রেখেছিলাম। ছবিতে দেখি কি লোকটার সাদা মাড়ি, দেখতে শুনতে মন্দ নয় ব্যবসাদারের মতো চেহারা। এদিকে আমাদের লেফটেন্যান্ট এসে ওটা দেখতে পেয়ে 'কোথেকে এই ছবি পেলো?' হান-তেন জিজ্ঞেসবাদ করতে শুরু করে দিলে আমিও তাকে খুলে বললাম ব্যাপারটা। সে তখন ভোড়ে গালাগাল করতে লাগল আমাকে, তারপর দিল মুখের ওপর এক ঘুসি চালিয়ে, শুধু কি তাই? কি মার, কি মার। গজরাতে গজরাতে বলল, 'জানিস, এটা কে? এটা হল ওদের আতামান সর্দার কার্ল।' কিন্তু ওই যে পুরো নামটা ওটা যেন কী? ভুলে গেছি। ওঃ ভগবান, কিছুতেই মনে আসছে না।'

'কার্ল মার্কস?' মুচকি হেসে স্টকমান ধরিয়ে দিল।

'ঠিক ঠিক।' কার্ল মার্কসই বটে।' থ্রিস্টোনিয়া উৎফুল হয়ে উঠল 'ওঃ বাপের নাম ভুলিয়ে দিয়েছিল। জারপুত্রর আলেক্সেই কখন-কখন তাঁর মাস্টার-টাস্টারদের সঙ্গে হুট করে আমাদের ওই পাহারাদারদের কুঠুরিতে এসে পড়েন। তখন যদি তাঁর চোখে পড়ে যেত? তাহলে কী কাণ্ডটাই না হত।'

'তবু কিনা তুই চাষাভুষোদেব অত প্রশংসা করিস? দিয়েছিল ত তোর

বারেটা বাজিয়ে? ইতান আলেক্সেয়েভিচ মুখ টিপে হাসল।

‘তা যাই বল না বাপু, দশ নুবলের মদ ত টেনেছিলাম দেড়েল কার্নেব নাম করে হোক আর যার নাম করেই হোক, টেনেছিলাম ত’

‘নাম করে মদ খাবার মতোই লোক উনি, তামাকের ধোঁয়ায় তামাতে সিগারেট-হোল্ডারটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে হেসে বলল স্টকমান

‘কী এমন ভালো কাজটা সে করেছে?’ কশোভয় জিজ্ঞেস করল

‘সে আরেক দিন বলল ‘খন আজ রাত হয়ে গেছে,’ এই বলে হাতের চাপড় মেরে স্টকমান সিগারেটের অবশিষ্ট নিভন্ত টুকরোটা ঝেড়ে ফেলে দিল।

অনেক দিন ধরে ঝাড়ই বাছাইয়ের পর জনা দশেক কস্যাকের একটি ছোট দল গড়ে উঠল টেরা লুকেশ্কাব ঘুরঝুরে বাড়িতে নিয়মিত ভাবে তারা জমায়েত হতে শুরু করল আসরের মধ্যমণি হল স্টকমান পরম নিষ্ঠার সঙ্গে সে ধীরে ধীরে এগোতে লাগল এক স্থির লক্ষ্যের দিকে, যে লক্ষ্য সে ছাড়া আর কেউ জানে না কাঠের শোকার মতো সে লোকের অভ্যস্ত সহজ বিশ্বাসে ঘৃণ ধরিয়ে দিতে লাগল, তাদের মনের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে লাগল বর্তমান ব্যবস্থার ওপর ঘৃণা আর প্রবল বিতর্ক প্রথমে অবিশ্বাসের ঠাণ্ডা ইম্প্যাক্টের গায়ে ধাক্কা খেললেও সে কিছু হটল না, তারই ভেতর দিয়ে দাঁত ফুটিয়ে দিল



দনের মাথার ওপরে, বাঁ তীরের বালিয়ার্ডির ঢালুতে ভিওশেনস্কায়া জেলা সদর দনের উজ্জানে এটাই সবচেয়ে পূর্বনো জেলা সদর প্রথম পিওতরের আমলে বিপ্লব চিহ্ননাকি জেলা সদর এখানে স্থানান্তরিত হওয়ার পর তার নতুন নাম দেওয়া হয় ভিওশেনস্কায়া। ব্যুৎপত্তিগত ভাবে শব্দটির অর্থ দিকন্তু। আর ভিওশেনস্কায়া বাস্তবিকই কোন এক কালে ভরোনেজ ও আজভ সাগরের মধ্যকার বিশাল জলপথের দিকন্তুও ছিল

জেলা সদরের উলটো দিকে তাতার ধনুকের দণ্ডের মতো বাক নিয়েছে দন দেখলে মনে হয় মোড় নিয়েছে যেন ডান দিকে, কিন্তু সামান্য দূরে বাজকি গ্রামের কাছে এসে ফের স্বমহিমায় সোজা হয়ে গিয়ে দক্ষিণ উপকূলের খড়িমাটির গিরিশাখ, ডানধারের সারি সারি নিবিড় গ্রাম আর বাঁ ধারের বিরল বসতিগুলোব পাশ দিয়ে সবুজাভ স্বচ্ছ সুনীল জলরাশি বয়ে নিয়ে চলেছে সাগরে নীল আজভ সাগরের দিকে।

উত্ত-খোপিওবঙ্গময়র সামনে এসে মিলেছে খোপিওর নদীর সঙ্গে, উত্ত-মেদ-ভেদিংস্ময়ার সামনে এসে মেদভেদিংসা নদীর সঙ্গে, তারপর ভরা জলে প্রাবিত হয়ে প্রচুর জনবসতিপূর্ণ বেশ কিছু বর্ষিক গ্রাম ও জেলা সদরের মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে নীচের দিকে।

ভিওশেনস্ময়া আগাগোড়া হলদে বালিতে ছাওয়া একটা বিশ্রী রকমের ন্যাড়া জায়গা কোন বাগবাগিচার বালাই নেই এখানে। বারোয়াবিতলার মাঝখানে একটা পুরনো ক্যাথিড্রাল, বয়সের খুসর ছাপ লেগেছে গায়ে মনের প্রবাহ বরাবর বেরিয়ে গেছে ছটা রাস্তা। দন যেখানে বাঁক নিয়ে এবান থেকে বাজুকের দিকে চলে গেছে সেই জায়গাটায় শাখা মতন বেরিয়ে পপ্লার ঝাডেব ভেতবে ঢুকে গিয়ে একটা হুদ তৈরি হয়েছে। জল যখন নেমে যায় তখনও হুদটা মনের সমান চওড়া হুদের যেখানে শেষ সেখানে জেলা সদরেরও শেষ সোনালি ফণিমনসার ঘন জঙ্গলে ঢাকা একটা ছোটমতন চত্বরের ওপর দাঁড়িয়ে আছে আরও একটা গির্জা। তার মাথার গম্বুজগুলো সবুজ ছাদও সবুজ - হুদের ওধারে পপ্লারের যে ঝাড় বেড়ে উঠেছে তারই শ্যামলিমার রঙে রঙ মেলানো

এই বসতিটা ছাড়িয়ে উত্তরে জলস্রোতের সঙ্গে গেরুয়া রঙের বালির প্লাবন, পাইনের শীর্ণ অপুষ্ট আবাদ আর নদীর পেছনের বঙ্গ জলাভূমি লাল মাটির সঙ্গে মিশে সেখানকার জল হয়ে উঠেছে গোলাপী গৈরিক বালুকায়শিব প্লাবনের মধ্যে এবং দূরের দানা দানা বালির বিস্তারের মধ্যেও দুটো একটা গ্রাম, ঘাসে ঢাকা জমি আর কটা বগু ধরা বেতের ঝোপ ছাড়া ছাড়া ধীরে মতো জেগে আছে

ডিসেম্বরের এক রবিবারে পুরনো গির্জার সামনের বারোয়াবিতলায় জেলার সবগুলো গ্রাম থেকে পাঁচশ' জন তরুণ কসাকদের একটা দল কালো ভিড় করে এসে জমা হল। গির্জার ভেতরে তখন ভোরের উপাসনা চলছিল। স্তোত্রগীতির ঘন্টা বাজল বাইরে তরুণদের সার বৈধে দাঁড়ানোর কন্ধ্যাও দিল সিনিয়র সার্জেণ্ট এক প্রৌঢ় কসাক। দেখতে সাহসী গোছের পোশাকের ওপর সেলাই করা ষ্টাইপগুলো দেখে বুঝতে থাকি থাকে না চাকরী করছে মেয়াদেব অতিবিক্ত তাব কন্ধ্যাওর সঙ্গে সঙ্গে জনতার গুল্লন শান্ত হয়ে গেল, সকলে এদিক ওদিক ছড়িয়ে গিয়ে দুটো লম্বা লম্বা বাঁকাচোরা সার বৈধে দাঁড়িয়ে পড়ল। কয়েকজন সার্জেণ্ট এখানে ওখানে ছুটোছুটি করে আঁকাবাঁকা সাবিগুলো ঠিক করতে লাগল

‘সারি ঠিক কর’ সিনিয়র সার্জেণ্ট হাঁক দিলে তারপর হাত দিয়ে কিসের জন্য কে জানে একটা অস্পষ্ট ভঙ্গি করে মাথা নেড়ে বলল, ‘চারজন হবে’

পুরোমস্তুর আনুষ্ঠানিক পোশাকে, অফিসারের নতুন খেটকোট গায়ে চড়িয়ে, ঘোড়া দাবড়ানোর কঁটা-লাগানো জুতোর টুটাং আওয়াজ ভুলে গির্জার প্রাঙ্গণে

এসে ঢুকল আতামান, তার পেছন পেছন মিলিটারী পুলিশের কর্তা

গ্রিগোরি মেনেখভ দাঁড়িয়ে ছিল মিতকা কোবশুনভের পাশে তারা দু'জনে  
চাপা গলায় নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলতে লাগল

‘জুতোটা পায়ে বজ্জ আঁটো আঁটো লাগছে, আর পারছি নে মিতকা বলল

‘যে সময় সে আতামান হয়’\*

এখন আমাদের মার্চ করিয়ে ভেতরে নিয়ে যাবে

ওর এই কথার সমর্থনেই যেন সিনিয়র সার্জেন্ট পেছনে হটে গিয়ে গোড়ালির  
ওপর তর দিয়ে বোঁ করে ঘুরে দাঁড়াল।

‘ডাইনে মোড়’

বুট পরা পাঁচশ’ জোড়া পা-ও পরিষ্কার আওয়াজ তুলল খট-খটাস’

‘বোঁ কাঁধ বাড়িয়ে! কুইক মার্চ’

গির্জার আঙ্গিনার খোলা গেটের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলল ওদের সারি  
মাথা থেকে খোলা পশমী টুপিগুলো হাতে বলকাতে লাগল, গির্জার গম্বুজ পর্যন্ত  
গমগম করে উঠল মাচ-করা পায়ের শব্দে

পাত্রী যে আনুগত্যের শপথ পড়ে যাচ্ছিল তার একটি কথাও গ্রিগোরি মন  
দিয়ে শুনছিল না। সে তাকাচ্ছিল মিতকার মুখের দিকে যত্নগাম মিতকা মুখ  
বিকৃত করছে, জুতোর ভেতরে আঁটেপুটে বেড দেওয়া পাদুটোর একটা থেকে  
আরেকটার ওপর দেহের ভার বাখতে বাখতে যত্নগা লাঘবের চেষ্টা করছে  
গ্রিগোরি সেই যে হাতটা তুলে রেখেছে সেটা যেন অসাড় হয়ে উঠেছে, তার  
মাথার ভেতরে বয়ে চলেছে এলোমেলো নানা চিন্তার স্রোত বহু লোকের ঠোঁটের  
ছোঁয়ায় ভিজে বুপোর কুশটার সামনে এসে চুমো খাওয়ার সময় তার মনে পড়ে  
গেল আঙ্গিনিয়ার কথা, বৌয়ের কথা। একটা আঁকাবঁকা বিদ্যুৎ রেখার মতো তার  
সমস্ত ডাবনাচিন্তাকে যেন কেটে ফালা ফালা করে দিয়ে বলকে উঠল ক্ষণিকের  
স্মৃতি সেই বনভূমি সুন্দর বুপোর কাজ করা ঘোড়ার সাজের মতো বলমলে  
সাদা সাজে গাছপালার বাদামী রঙের গুঁড়ি আর মাথাঘ বাঁধা ফুরফুরে বুমালের  
নীচে আঙ্গিনিয়ার জলডরা কালো চোখের প্রথর দীপ্তি।

গির্জার অনুষ্ঠান শেষ হতে সকলে বেবিয়ে এলো বারোযাত্রিলায় আবার  
সার বৈধে দাঁড়াল। সিনিয়র সার্জেন্ট নাক ঝেড়ে সবার অলঙ্কার উর্দির ভেতরকার  
আস্তরে আঙুল মুছে বক্ষতা শুরু করে দিল। ‘এখন তোমরা আর বাচ্চা ছেলে  
নও, তোমরা এখন কসাক। তোমরা শপথ নিয়েছ কিসের এই শপথ, কী এর

\* কৃশী প্রবচন বাংলায় কষ্ট করলে কেউ মেলে’। - অনুঃ

অর্থ, তোমাদের বোঝা উচিত এখন তোমরা কসাক হয়ে উঠেছ, এখন থেকে তাই তোমাদের নিজস্বের মান-সম্মান রক্ষা করে চলতে হবে, বাপ-মাকে মানি করবে এবং আরও অনেক কিছু মেনে চলতে হবে। যখন ছোট ছিলে তখন অনেক ছেঁবলামি করেছ, হয়ত রাস্তার ওপরে ডাংগুলি বেলেছ কিন্তু আর নয়, এর পর থেকে তোমাদের মনে রাখতে হবে পলটনে তোমাদের ভবিষ্যৎ কাজের কথা আর এক বছরের মধ্যে তোমাদের যেতে হচ্ছে গুরোদস্তুর ফৌজের চাকরীতে। এই পর্যন্ত বলে সিনিয়র সার্জেন্ট ফের নাক ঝাড়ল, হাতের তেলো ঝেড়ে নিঃসৃত পদার্থটুকু ফেলে দিয়ে ফুরফুরে খরগোসের লোমের জমকাল দস্তানাটা টেনে হাতে পরতে পরতে শেষ করল। 'তাই বলছি কি তোমাদের বাপ-মাকে এখন সরঞ্জাম ঘোগাড় করার কথা ভাবতে হবে পলটনের ঘোড়া চাই, মানে মোটর ওপর সাধারণ ভাবে যা যা প্রয়োজন আচ্ছা, এখন ছেলেরা বাড়ি ফিরে যাও। ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন।'

গ্রিগোরি আর মিত্কা সাকোর ধারে গ্রামের আর সব ছেলেদের জন্য অপেক্ষা করছিল। সকলে একসঙ্গে তাদের গ্রামের পথ ধবল তাবা তাঁর ধরে চলতে লাগল বাজকি গ্রামের মাথাব ওপর গলগল করে চিমনির ধোঁয়া উড়ছে, একটা ঘন্টার মদু টুংটাং আওয়াজ উঠছে। পাথে মিত্কা একটা শুকনো ধরনের ঝুটি কোথা থেকে যেন ভেঙে নিয়েছিল সেটার ওপর ভর দিয়ে সে ঝুড়িয়ে ঝুড়িয়ে সবাই পেছনে চলতে লাগল।

'জুতো খুলে ফেল,' ছেলেদের মধ্যে একজন পরামর্শ দিল।

'বরফে পা খেয়ে যাবে না?' মিত্কা খানিকটা পিছিয়ে পড়ে গেলেনও ইতস্তত করতে লাগল।

'মোজা পায়ে হেঁটে যাবি 'কন।'

মিত্কা বরফের ওপর বসে পড়ে ক্ষমতাস্বপ্ন করে পা থেকে বুটজোড়া টেনে খুলল জুতোছাড়া শুধু মোজা পায়ে হেলেন্দুলে হাঁটতে হাঁটতে চলল মুচমুচে বরফের ওপর ক্রুশ-কাঁটায় বোনা মোটা মোজার স্পষ্ট ছাপ পড়তে লাগল।

'কোন রাস্তায় যাব আমরা?' বোটেশটো গটিগেটি চোহরার আলোজ্জ্বল বেশনিয়াক জিন্জোস করল।

'দনের ধার দিয়ে,' সকলের হয়ে গ্রিগোরি উত্তর দিল।

ওরা কথাবার্তা বলতে বলতে চলল, চলতে চলতে ইয়ার্কি করে একজন আরেকজনকে গুতো মেরে রাস্তা থেকে ঠেলতে লাগল।

ঝেলার ছলে, ওবা যেন নিজস্বের মধ্যে যুক্তি করেই একেক বার একেকজনকে পথের ধারের বরফের স্তূপের মধ্যে ঠেলে ফেলে দিয়ে সকলে মিলে তার ওপর

চেপে বসে। বাজুকি আর গ্রমকোভস্কি গ্রামের মাঝখানে মিত্কাই প্রথম দেখতে  
পায় একটা নেকড়ে বরফে জমাট দন পেরিয়ে চলে যাচ্ছে

ওরে ভাই একটা নেকড়ে যাচ্ছে রে. দ্যাখ, দ্যাখ। ওই যে।'

হাল্-লু-ম

'হুম্' .

নেকড়েটা আলস্যভরে হেলেদুলে কয়েক গজ ছুটে গেল, ও পাড়ের কাছাকাছি  
এক পাশ হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল

ধর ওটাকে

ধর।'

'তবে রে হারামজাদা।'

ওরে মিত্রি ওটা তোকে দেখে অবাক হয়ে গেছে, তুই শুধু মোজা পায়ে  
হাঁটহিস কিনা।'

'ওঃ দ্যাখ, দ্যাখ এক পাশে কাত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ঘাড় এমিক ওমিক  
করার নাম নেই।'

'আরে ও ঘাড় নাড়াতে পারে না।'

ওই, ওই, চলে যাচ্ছে বে।'

ছাইরঙা জুতুটা একটা ডাঙার মতো লেজটা খাড়া করে পাথরের মূর্তির  
মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। পরে চটপট একপাশে লাকিয়ে গিয়ে তীর ঘেঁষে  
যে উইলো গাছগুলো ছিল সেগুলো লক্ষ্য কবে চোঁ চাঁ ছুট দিল।

ওরা যখন গ্রামে পৌঁছুল তখন সন্ধ্যা নেমে এসেছে। গ্রিগোরি বরফের ওপর  
দিয়ে তাদের বাড়ির গলিতে এসে গেটের দিকে উঠে গেল। উঠোনে একটা  
পরিত্যক্ত ব্রেকগাড়ি পড়ে আছে বেড়ার গায়ে জড় করা শুকনো ভালপালাব  
গম্বার মধ্যে চড়াই পাখিরা কিচিরমিচির করছে। কেমন যেন একটা ব্যাড়া-ব্যাড়া  
গন্ধ, পোড়া কুলকালি আর পোয়ালের টাটকা উষ্ণ গন্ধ ভেসে আসছে

দাপ বয়ে দেউড়িতে উঠতে উঠতে গ্রিগোরি জানলা দিয়ে উঁকি মেরে বাড়ির  
ভেতরটা দেখে নিল। রান্নাঘরের ভেতরে টিমটিম করছে খোলালো কুপি, তার  
স্বপনা আলোয় দেখা যাচ্ছে পেন্ত্রো দাঁড়িয়ে আছে জানলার দিকে পিঠ করে  
গ্রিগোরি সরঞ্জার পাশ থেকে ঝাঁটা দিয়ে বুটের বরফ ঝেড়ে ঘন বাষ্পের মেঘের  
মাথোই ঢুকে পড়ল রান্নাঘরে 'আমিও এসে পড়েছি, লাঃ দিবি ব্যবস্থা ত।'

'তাড়াতাড়িই হয়ে গেল দেখছি ঠাণ্ডায় জন্মে গেছিস নাকি?' ওর কথার  
উত্তরে পেন্ত্রো ব্যস্তসমস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি করে বলে উঠল

পান্তলেই প্রকোফিয়েভিচ দুই হাঁটুর ওপর কনুই ঠেকিয়ে মাথা নীচু করে

বসে ছিল। দারিয়া চরকায় সুতো কাটছিল নাভালিয়া গ্রিগোরির দিকে পিছন দিয়ে টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে। মুখ ঘোরাতে না রান্নাঘরের ওপর এক পলক নজর বুলিয়ে নিল গ্রিগোরি। তার দৃষ্টি পেরোবর মুখের ওপর এসে আটকে গেল পেরোবর চোখেমুখে আশঙ্কা ও উদ্বেগের ভাব লক্ষ করে গ্রিগোরির বুঝতে বাকি রইল না কিছু একটা ঘটেছে।

‘শপথ নেওয়া হল?’

‘হ্যাঁ, তা হল’

গ্রিগোরি সময় বাঁচানোর জন্য ইচ্ছে করেই ধীরেসুস্থে জামাকাপড় খুলতে লাগল, সেই ফাঁকে মনে মনে নানা ভাবে আঁচ করার চেষ্টা করতে লাগল এই নীরব নিবৃত্তাপ অভ্যর্থনার কারণ কী হতে পারে

ভেতরের ঘর থেকে রান্নাঘরে এসে ঢুকল ইলিনিচনা তার মুখেও কেমন যেন একটা দৃষ্টিভঙ্গির ছাপ।

‘নাভালিয়াকে নিয়েই কোন ব্যাপার হবে মনে মনে এই কথা ভাবতে ভাবতে গ্রিগোরি বেঞ্চের ওপর তার বাপের পাশে বসে পড়ল

‘ওকে খাবার দাও,’ চোখেব ইশারায় গ্রিগোরিকে দেখিয়ে দিয়ে দারিয়াকে বলল ইলিনিচনা

দারিয়া চরকার গান যাবপথে থামিয়ে দিয়ে উঠে পড়ল, দুই কাঁধ আর কিশোরীর মতো কীণ কটিদেশে একটা অদৃশ্য হিম্মোল তুলে সে এগিয়ে গেল উনুনের দিকে রান্নাঘরে বুদ্ধধাম নিস্তকতা। ফৌস ফৌস আওয়াজ তুলে সেই নিস্তকতা ভঙ্গ করেছে সদ্য বিয়ানো একটা ছাগল ছানাসুদ্ধ ছাগলটাকে গরম হওয়ার জন্য এনে রাখা হয়েছে উনুনের খোঁড়লের সামনে

গ্রিগোরি বাঁধাকপির ঝোল খেতে খেতে নাভালিয়ার দিকে তাকাল, কিছু তার মুখ দেখতে পেল না নাভালিয়া বুনুনি-কাঁটার ওপর মাথা নুইয়ে তার দিকে আড় হয়ে বসে আছে পাশ্বেলেই প্রকোফিভিচই প্রথম অসহিষ্ণু হয়ে ভঙ্গ করল ঘরের এই অসহ্য নিস্তকতা ভাঙা ভাঙা কৃত্রিম কান্নার আওয়াজ তুলে গলা বীকারি দিয়ে শেষ কালে বলল, নাভালিয়া বাপের বাড়ি চলে যেতে চাইছে।’

গ্রিগোরি বুটির টুকরো দিয়ে খাবারের গুঁড়োগুলো চেঁছেপুঁছে তুলতে লাগল কোন কথা বলল না।

‘বলি এর কারণ কী?’ বাপ জিজ্ঞেস করল কথাগুলো বলার সময় তার নীচের চোঁট বীতিমতো খরখর করে কাঁপতে লাগল আসন্ন ঝড়ের পূর্বাভাস এটা

‘কারণ কী তা ত বলতে পারছি নে।’ গ্রিগোরি চোখ কৌচকাল, তারপর বাঁটিটা সরিয়ে রেখে ক্রুশ-প্রণাম করল।



আমি কিন্তু জানি এবারে বাপ গলা চড়াল

টেঁচিও না, টেঁচিও না, ইলিনিচনা মাঝখানে বাধা দিয়ে বলল

‘আমি কিন্তু জানি কেন।’

‘আহা, এতে অমন টেঁচামেচি করার কী আছে?’ জানলার কাছ থেকে ঘরের মাঝখানে সরে এলো পেত্রো। এ হল ভালোবাসাবাসির বাপার। যদি চায় থাকবে আর না চাইলে থাকবে না। যেখানে খুশি যেতে পারে।’

‘নাতালিয়ার কোন দোষ আমি দেখি না। ব্যাপারটা লজ্জার আব ভগবানের সামনে পাপের কিন্তু তাহলেও ওর বিচার আমি করতে যাচ্ছি সে দোষ ওর নয়। যত দোষ এই শূয়োরের বাচ্চাব।’ পাঙ্ডেলেই প্রকোফিয়েভিচ আঙুল তুলে গ্রিগোরিকে দেখিয়ে বলল। গ্রিগোরি তখন উনুনের ধারে হেলান দিয়ে গা গরম করছে

‘কর কাছে আমার কী অপরাধ?’

‘তুই জানিস নে? তুই জানিস নে শয়তানের বাচ্চা?’

‘না, জানি নে।’

পাঙ্ডেলেই প্রকোফিয়েভিচ এক ধাক্কায় বেঞ্চি উল্টে দিয়ে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল সোজা এগিয়ে গেল গ্রিগোরির দিকে। নাতালিয়ার হাত থেকে মোজাটা পড়ে গেল। হাতের কুরশি-কাঁটা মাটিতে পড়ে গিয়ে বনাৎ করে আওয়াজ হল সেই শব্দে মাথা একদিকে কাত করে উনুনের মাথা থেকে লাফিয়ে নামল একটা বেড়ালছানা। সে তার বাঁকা পায়েব ধাবা দিয়ে ধাক্কা মেরে উলের গোলাটা গড়িয়ে দিল সিঁদুকের দিকে।

‘তাহলে আমি তোকে বলি বুড়ো সংযতকণ্ঠে প্রতিটি শব্দ আলাদা আলাদা উচ্চারণ করে বলতে শুবু করল। ‘নাতালার সঙ্গে যদি ঘব করতে না চাস তাহলে দূর হয়ে যা বাড়ি থেকে, যেখানে তোর দু’চোখ যায়। এই হল আমার সাক্ষ্য কথা। দূর হয়ে যা। যেখানে তোর দু’চোখ যায়।’ স্বাভাবিক শাস্ত কণ্ঠে পুনরাবৃত্তি করে সে সরে গেল, যাবার সময় বেঞ্চিটা উঠিয়ে রাখল।

দুনিয়াশকা ঝাটের ওপর বসে ছিল। ভয়ে চোখ গোল গোল করে সে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল।

‘তাহলে আমিও বলি বাবা, মনে কোরো না যে রাগের মাথায় বলছি, গ্রিগোরির গলার আওয়াজ কেমন যেন চাপা বসখসে শোনাল। ‘বিয়ে আমি নিজে করি নি। তোমরা আমার বিয়ে দিয়েছ। নাতালিয়ার ওপর আমার কোন টান নেই। খুশি হয় ত চলে যাক বাপের বাড়ি।’

‘সঙ্গে সঙ্গে তুইও দূর হ এবেন থেকে।’

‘যাবই ত।’

‘চলো যা তুই’

‘যাব, যাব, অত তাড়া দেবার কী আছে?’ পশুলোমের কোর্তাটা খাটের ওপর ফেলে রেখেছিল গ্রিগোরি কথা বলতে বলতে কোর্তার হাতার দিকে হাত বাড়াল সে বাপের মতোই রাগে সে কাঁপতে লাগল তার নাকের পাটা ফুলে উঠল।

দু’জনেরই শিরায় বইছে একই তুর্কী রক্তের মিশাল। এই মুহূর্তে তাদের দু’জনের মধ্যে আশ্চর্য সাদৃশ্য।

‘কোথায় যাবি রে তুই?’ গ্রিগোরির হাত খপ করে চেপে ধবে আর্তনাদ করে উঠল ইলিনিচনা কিন্তু গ্রিগোরি জোর কবে মাকে সরিয়ে দিল পশরী টুপিটা খাট থেকে গড়িয়ে পড়তে না পড়তে লুফে নিল।

‘যেতে দাও, যেতে দাও, বজ্রাত কুস্তা কোথাকার জাহান্নামে যাক! যা, যা, দূর হ’ দরজা হাট খুলে দিয়ে বাপ গাঁক গাঁক করে বলল

গ্রিগোরি লাফিয়ে বাইরের বারান্দায় চলে এলো। শেষ যা সে শুনতে পেল তা হল নাতালিয়ার কান্নার শব্দ

হিমেল রাত ঢেকে ফেলেছে গ্রামটাকে কালিমাখা আকাশ থেকে ঝিরঝির করে ঝরে পড়ছে ছুঁচের মতো ধারাল তুষারকণা থেকে থেকে দনের বৃকে কামানের গর্জনের মতো গুমগুম আওয়াজ করে ফটিছে বরফের চাঁই গ্রিগোরি হাঁপাতে হাঁপাতে গেটের বাইরে ছুটে গেল। গ্রামের অন্য প্রান্তে নানা স্ববে যেউ যেউ শুরু করেছে কুকুরের দল। ধোঁয়া ধোঁয়া অঙ্ককারের মধ্যে চোখে পড়ছে স্বাঁঝির মতো আলোকবিন্দুর হলুদ দীপ্তি

গ্রিগোরি লক্ষ্যহীন ভাবে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে লাগল স্ত্রোপানদের বাড়ির জানলাগুলোব গায়ে কালো হীরের টুকবোর মতো ঝলমল করতে অঙ্ককার

‘গ্রিশা!’ গেটের কাছ থেকে শোনা গেল নাতালিয়ার কান্নাভরা ব্যাকুল চিৎকার।

‘মর গে যা! তোরা ছালায় আমি অতিষ্ঠ হয়ে গেলাম!’ দীত কড়মড় করে অশ্রুটরুরে কথাগুলো বলে গ্রিগোরি পায়ের গতি বাড়িয়ে দিল

‘গ্রিশা, ফিরে এসো!’

প্রথম যে গলিটা পড়ল গ্রিগোরি মাতালের মতো এলোপাতাড়ি পা ফেলতে ফেলতে তার ভেতরে ঢুকে পড়ল শেষ বারের মতো দূর থেকে তিস্ত কান্নামেশানো চাপা চিৎকার তার কানে এলো

‘গ্রিশেনকা, ওগো, লক্ষ্মীটি আমার!’

মৃত পা চালিয়ে বারোয়ারিতলা পেরিয়ে গেল রাস্তার মোড়ে এসে সে ধমকে দাঁড়িয়ে পরিচিত যে যে ছেলের বাড়িতে বাতটা কাটানো যেতে পারে মনে মনে তাদের নাম আউড়ে গেল

ভেবেচিন্তে মিখাইল কশেভয়ের বাড়িতেই রাত কাটানো ঠিক করল গ্রামের বাহিরে পাহাড়ের ঠিক গায়ে মিখাইল থাকে। বাড়িতে লোক বলতে মিখাইল নিজেকে তার মা, অবিবাহিতা এক বোন, আর ছোট ছোট দুটি ভাই। উঠোনে ঢুকে মাটির কুটিরের ছোট জানলাটায় ঘা মারল।

কে ওখানে ?

‘মিখাইল বাড়ি আছে ?’

‘আছে। কে ডাকে ?’

‘আমি আমি গ্রিগোরি মেলেকভ।’

মিনিটখানেক পরে মিখাইল এসে দরজা খুলে দিল প্রথম রাতের মিটি ঘুমটা তার ভেঙে গেছে

‘গ্রিগা তুই ?’

‘হ্যাঁ’

এত রাতে কী মনে করে ?

ঘরের ভেতরে ঢুকতে দে আগে, তারপর কথা হবে

বারান্দায় মিখাইলের কনুই ঝপ করে চেপে ধরল গ্রিগোরি। প্রয়োজনের সময় ঠিকমতো কথা বুজে না পাওয়ার নিজের ওপরই খান্না হয়ে উঠে ফিসফিস করে

■■■■■

রাতটা তাদের এখানে কাটাতে চাই। বাড়ি থেকে ঝগড়া করে বেরিয়ে এসেছি তাদের কি জায়গার খুব টানটানি ? আমার অবশ্য যেমন তেমন হলেই চলে যাবে।’

জায়গা হয়ে যাবে ‘খন, চলে আয় কী নিয়ে গোলমাল রে ?’

‘সে ভাই পরে হবে। তাদের দরজাটা কোথায় রে ? কিছুই দেখতে পাচ্ছি নে যে।’

বেগের ওপর গ্রিগোরির বিছানা পাতা হল মিখাইলের মা মেয়ের সঙ্গে একই খাটে শোয়। ওদের দু’জনের ফিসফিসানি যাতে কানে না যায় সেজন্য পশুলোমের কোর্তাটা মাথায় মুড়ি দিয়ে গ্রিগোরি শূয়ে পড়ল মনে মনে ভাবতে লাগল ‘আচ্ছা, এখন বাড়িতে কী হচ্ছে ? নাতাশা কি সত্যি সত্যিই চলে যাবে ? জীবনটা দেখছি নতুন মোড় নিতে চলেছে কোথায় মাথা গাঁজা যায় ?’ সঙ্গে সঙ্গে উত্তরও যেন সে পেয়ে গেল ‘কালই অক্সিনিয়াকে ডাকব ওকে নিয়ে চলে যাব কুবানে, এখন থেকে দূরে অনেক অনেক দূরে।’

গ্রিগোরি চোখ বন্ধ করল। তার চোখের সামনে একে একে ভেসে বেড়াতে লাগল স্তপ্‌পড়মির টিলা অজানা অপরিচিত পরিবেশ, এমন সমস্ত গ্রাম আর গল্প

বাঁ এর আগে সে কখনও চোখে দেখে নি। আব ভবজের পর তরঙ্গ খেলিয়ে ওই যে টিলাগুলো চলে গেছে তার ওধারে, ধূসর পথের শেষে যেন বৃপকধার কোন এক গল্পের মতো আছে এক মধুর দেশ, সুনীল আকাশ, আর সবচেয়ে বড় কথা - আছে অগ্নিনিয়ার ভালোবাসা। যে ভালোবাসা বিলম্বিত বিদ্রোহের কর্ণসুধমায় উজ্জ্বল।

ঘুমিয়ে পড়ল কিন্তু অজানা ভবিষ্যতের চিন্তায় বাববার তার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটতে লাগল। ঘুমিয়ে পড়ার আগে সে প্রাণপণে মনে করে দেখার চেষ্টা করল কী সেই জিনিস যা তাকে পীড়িত করছে, অথচ যাকে কিছুতেই ধরা যাচ্ছে না? অর্ধজাগ্রত অবস্থায় তার চিন্তাভাবনাগুলো স্রোতের মুখে তরীর মতো স্বচ্ছন্দগতিতে তরতর করে বয়ে চলে, কিন্তু তারপর হঠাৎ বেন কিসের সঙ্গে ধাক্কা খায়, যেন চম্পায় আটকে যায়। আর তখনই ভয়ঙ্কর অস্বস্তি হতে থাকে, তখন সে ছুটফট করতে থাকে ব্যাকুল হয়ে ধরার চেষ্টা করে 'সেটা কী? কী সেটা যা তার পথের প্রতিবন্ধক হয়ে আছে?'

সকালে ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু তার মনে পড়ে গেল আরে তাই ত অগ্নিনিয়াকে নিয়ে যাব কোথায়? বসন্তকালে শিক্ষাশিবির আর শরৎকালে পুরোদস্তুর পল্টনের কাজ। এখানেই ত আটকাচ্ছে।

সকালের খাওয়াদাওয়ার পর মিঝিলকে বারান্দায় ডেকে আনল

‘একটু আশ্বাষভদের বাড়ি যা শিশা। গিয়ে অগ্নিনিয়াকে বলবি সঙ্কের অঙ্ককার নামামাত্রই যেন হাওয়া-কলের কাছে চলে আসে।’

‘কিন্তু ত্তেপান আছে যে।’ মিঝিল আমতা আমতা করল।

‘একটা কোন কাজের ছুতো ভেবে বার করে নিস।’

‘আচ্ছা যাব

‘হ্যাঁ বলবি অবশিাই যেন আসে।’

‘আচ্ছা, আচ্ছা।’

সন্ধ্যাবেলায় গ্রিগোরি এসে বসল হাওয়া-কলের কাছে, জামার হাতায় আড়াল দিয়ে সিগারেট খরিয়ে টানতে লাগল। হাওয়া-কলের ওপাশে ডুট্টার শুকনো জটাগুলোর জঙ্গল ভেদ করে বাতাস যেতে যেতে বাধা পেয়ে ফৌঁস ফৌঁস করছে। হাওয়া-কলের পাখাগুলো স্থির হয়ে আছে, পাখার গায়ের হেঁডারোঁড়া কাপড়ের টুকরো হাওয়ায় পতপত করছে। গ্রিগোরির মনে হল তার মাথার ওপর যেন একটা বিরাট পাখি পাখা ঝাপটাতে ঝাপটাতে ঘুরপাক খেয়ে চলেছে, কিন্তু কিছুতেই আর উড়ে যেতে পারছে না। অগ্নিনিয়ার এখনও দেখা নেই। পশ্চিমের আকাশে স্নান সোনালি আভার ওপর পড়েছে সূর্যাস্তের বেগুনী রঙ। পূর্বের হাওয়া

আরও প্রকল হয়ে এলো, আরও দ্রুত বইতে লাগল বেতের ঝাড়ের ফাঁদে আটকে পড়া চাঁদের পিছু ধাওয়া করে নেমে এলো অন্ধকার। হাওয়া-কলের মাথার ওপরে ছড়ে যাওয়ার লাল লাল মাগ আর মীল কালশিটে পড়া আকাশটা মৃত্যুর মতো কালো হয়ে গেল। গ্রামের মাথার ওপর ভেসে বেড়াচ্ছে সারা দিনের ব্যস্ততা ও কোলাহলের বেশ।

গ্রিগোরি পর পর ডিনটে সিগারেট শেষ করল। শেষ সিগারেটের পোড়া টুকরোটা বরফের মধ্যে গুঁজে দিল বাকুল হয়ে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে সে চারপাশে তাকাল। হাওয়া-কল থেকে গ্রামের দিকে লোকজন যাতায়াতের ফলে বরফ সামান্য গলে গলে যে শূঁড়ি পথগুলো তৈরি হয়েছে সেগুলো মিশকালো অন্ধকারে ঢাকা গ্রাম থেকে কাউকে আসতে দেখা যাচ্ছে না।

গ্রিগোরি উঠে দাঁড়াল, দুই কাঁধের হাড়ে মটমট আওয়াজ তুলে শরীরের আড় ভাঙল। মিখাইলদের বাড়ির জন্মলায় মিটমিট করে আলো জ্বলছে, যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে সেই দিক লক্ষ্য করেই এগিয়ে গেল গ্রিগোরি দাঁতের ফাঁক দিয়ে শিস দিতে দিতে সে যখন মিখাইলদের বাড়ির উঠানের একেবারে কাছে চলে এসেছে এমন সময় আন্সিনিয়ার সঙ্গে তার একেবারে মুখোমুখি ধাক্কা লাগার উপক্রম দেখেই বোঝা গেল আন্সিনিয়া ছুটে আসছে, অস্তুত খুব জোরে জোরে পা চালিয়ে ত বটেই। সে হাঁপাচ্ছে। তার ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া মুখের ভেতর থেকে তাজা হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এমন একটা মৃদু গন্ধ ভেসে আসছে ঘোটা ধরাছোঁয়াব বাইরে গন্ধটা অমনি হাওয়ার হতে পারে, আবার দূরেব স্তেপের টটকা ঘাস বিচালিরও হতে পারে।

‘অপেক্ষা করে করে হয়রান হয়ে গেলাম, ভাবলাম তুমি আর এলে না।’

‘স্তেপানকে জোরজোর করে বাইরে পাঠিয়ে তবে এলাম।’

‘হতচ্ছাড়ী মাগী, তোর জন্যে আমি ঠাণ্ডায় জমে গেলাম।’

‘আমার গা গরম আছে, তোমাকে গরম করে দিচ্ছি।’ দু’পাশে পুরু লোমের পাড় লাগানো ফারকোটের সামনেটা খুলে ফেলে গ্রিগোরিকে জড়িয়ে ধরল, বটগাছের গায়ে জড়িয়ে থাকা স্বর্ণলতার মতো জিজ্ঞেস করল

‘ডেকে পাঠিয়েছ কেন?’

‘দাঁড়াও দাঁড়াও হাত সরোও না এখানে লোকজন চলাফেরা করে।’

‘বাড়ির লোকজনের সঙ্গে ঝগড়া কর নি ত?’

‘বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছি: গত রাত থেকে মিশকাদের ওখানে আছি রাস্তার ছন্নছাড়া কুকুরের মতো জীবন কাটছে।’

‘এখন তাহলে তোমার কী অবস্থা হবে?’ আন্সিনিয়া তার বাহুবন্ধন থেকে

খ্রিগোরিকে মুক্ত করে হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে পশুলোমের ওভারকোটের দু'পাশ ঐটে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে বলল, 'চল খ্রিষা, বেড়ার পাশে গিয়ে সরে দাঁড়াই। এরকম রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে কী হবে?'

ওরা রাস্তা থেকে সরে এলো। খ্রিগোরি বরফের স্তূপ সরিয়ে জায়গা পরিষ্কার করে নিয়ে বেড়ার গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল। বেড়টা বরফে জমে মচমচ করছে।

নাতালিয়া বাপের বাড়ি চলে গেছে কিনা জান?'

'জানি না। যাবে নিশ্চয়ই কী করেই বা থাকবে ওখানে?'

আগ্নিনিয়ার কনকনে ঠাণ্ডা হাতটা নিজের কোটের হাতার ভেতরে ঢুকিয়ে তার হাতের সরু কবজিতে আঙুলের চাপ দিয়ে সে জিজ্ঞেস করল

'এখন তাহলে কী হবে আমাদের?'

'সে আমি জানি নে গো। তুমি যা বলবে'

স্টেপানকে ছাড়তে পারবে?'

'এতটুকু দুঃখ করব না বল ত একুনি!'

'কোথাও একটা কাজ জুটিয়ে নেব আমরা দু'জনে, থাকার জায়গা করে নেব'

'তোমার সঙ্গে গোমালঘরে থাকি তাও সই খ্রিষা। তোমার সঙ্গে থাকতে পারলেই হল।'

দু'জনে গায়ে গা জড়িয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শরীর গরম করল। খ্রিগোরির যাবার কোন ইচ্ছে দেখা গেল না। বাতাসের দিকে মাথা ঘুরিয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল, তাব নাকের দু'পাশ কাঁপতে লাগল, নিখিলিত চোখেব পাতা সে তুলল না। আগ্নিনিয়া খ্রিগোরির বগলে মুখ গুঁজে তার বড় আপন জনের মাতাল-করা ঘামের গন্ধে নিশ্বাস নিতে লাগল। সৌভাগ্য পূর্ণ হওয়ার আনন্দে কলুষিত কামনায় ভরা তার ঠোঁটদুটো খ্রিগোরির অলঙ্কে, মৃদু হাসিতে ধরধর কাঁপতে লাগল।

'কাল মোকভের কাছে যাব, ওর ওখানে কোন কাজ জুটলেও জুটতে পারে, আগ্নিনিয়ার হাতের কবজিটা এতক্ষণ আঙুলে চেপে ধরে রাখার ফলে যেমে গিয়েছিল, তাই কথাগুলো বলতে বলতে খ্রিগোরি ওখান থেকে আঙুল সরিয়ে আরও খানিকটা ওপরের দিকে চেপে ধরল।

আগ্নিনিয়া কোন কথা বলল না। মাথাও তুলল না। এই কিছুক্ষণ আগে তার ঠোঁটে যে হাসি ফুটে উঠেছিল তা বেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। তার বিস্মারিত দুই চোখে ফুটে উঠল তাড়া খাওয়া জন্তুর মতো ভয় আর বিষণ্ণ ব্যাকুলতা। সে যে অন্তঃস্বা একথা মনে পড়ে যেতে ভাল, 'বলাটা ঠিক হবে, কি না?' 'বলাই উচিত,' মনে মনে সে প্রায় ঠিকই করে ফেলেছিল কিন্তু সঙ্গে

সঙ্গে ভয়ে শিউরে উঠল। ভয়ঙ্কর চিন্তাটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলল দিল। নাবীদের সহজাত উপলব্ধি দিয়ে সে বুঝতে পারল যে এখন একথা বলার সময় নয়। বুঝতে পারল যে তাহলে খ্রিগোরিকে চিরদিনের মতো হারাতে হতে পারে। তার হৃৎপিণ্ডের নীচে যে-সন্তান নড়াচড়া শুরু করে দিয়েছে সেটা খ্রিগোরির না স্ত্রীপানের ওদের দু'জনের মধ্যে কার এ ব্যাপারে সন্দেহ থাকায় সে তার মনের কথা চেপে গেল কিছু বলল না।

'অমন কৌপে উঠল কেন? শীত করছে?' নিজের কোর্তার আঁচলের নীচে তাকে জড়াতে জড়াতে খ্রিগোরি জিজ্ঞেস করল,

একটু শীত শীত করছে। আমাকে যেতে হয় গ্রীশা। স্ত্রীপান ফিরে এসেই আমার খোঁজ করবে সেখানে আমি বাড়ি নেই।

'গেছে কোথায়?'

'জোরজোর করে আনিকেইদের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ে এসেছি তাস খেলতে।'

ছাড়াছাড়ি হয়ে চলে গেল ওরা দু'জনে। খ্রিগোরির ঠোঁটে লেগে রইল আক্সিনিয়ার ঠোঁটের সেই উত্তেজনাঙ্কর মৃদু গন্ধ, যেটা ধরাছোঁয়ার বাইরে। অমনি হাওয়ার হতে পারে, আবার মে-মাসের বৃষ্টির জলে ধোয়া দূরের স্ত্রীপানভূমির ঘাস বিচালিরও হতে পারে।

আক্সিনিয়া গলির ভেতরে মোড় নিল, মাথা নীচু করে প্রায় ছুটতে শুরু করল। কার একটা কুয়ের সামনে গোলুবাছুরে শরতের কাদা ঘেঁটে একাকার করে রেখেছে সেখানে অসতর্ক ভাবে ঠাণ্ডায় জমাট কাদার তালের মধ্যে পা হড়কে গেল আক্সিনিয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা তীব্র ব্যাথা পেটের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠতে বেড়ার খুঁটিগুলো সে শক্ত করে চেপে ধরল। ব্যাথাটা দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল, কিন্তু পেটের একপাশে জীবন্ত একটা কী যেন নড়াচড়া করে উঠল ওলটপালট খেতে খেতে যেন ক্রুদ্ধ হয়ে পরিপূর্ণ কয়েকবার জের থাকা মারল।

## এগারো

পরদিন সকালে মোখভদের বাড়ির দিকে রওনা দিল খ্রিগোবি। সেগেই প্লাতোভিচ চা-পানের জন্য দোকান থেকে সবে বাড়িতে ফিরেছে। ওক কাঠের মতো দেখতে দামী ওয়াল-পেপারে মোড়া খাবার ঘরে আতিথ্যপিনের সঙ্গে বসে বসে সে লালরঙের কড়া চায়ে চুমুক দিচ্ছিল। খ্রিগোবি সামনের ঘরে মাথার টুপিটা খুলে রেখে খাবার ঘরে এসে ঢুকল।

‘আপনার সঙ্গে আমার একটু দরকার ছিল সেগেই প্রাতোনভিচ।’

‘আরে, পাশ্বেলেই ম্বেলেখভের বেটা না?’

‘হ্যাঁ’

‘কী দরকার তোমার?’

‘জিঙ্গেস করতে এলাম আপনি কি কোন কাজের লোক নেবেন?’

পেছনের দরজা কাঁচ করে উঠতে গ্রিগোরি ঘাড় ফিরিয়ে সে দিকে তাকাল। সামনের বড় ঘর থেকে এক তরুণ অফিসার খাবার ঘবে এসে ঢুকল তার হাতে চার ভাঁজ করা একটা খবরের কাগজ গায়ে মিলিটারির সবুজ আঁটো জামা, জামার কাঁধপাটি থেকে বুঝতে বাকি থাকে না যে সে একজন লেফটেন্যান্ট। গ্রিগোরি তাকে চিনতে পারল এ হল সেই অফিসার যাকে মিতকা কোরশুনভ গত বছর ঘোড়দৌড়ে হারিয়ে দিয়েছিল।

অফিসারের দিকে একটা চেয়ার বাড়িয়ে দিতে দিতে সেগেই প্রাতোনভিচ গ্রিগোরিকে জিঙ্গেস করল, ‘তোমার বাপ কি এতই গরিব হয়ে গেল যে ছেলেকে অন্যের বাড়িতে কাজ করতে পাঠাচ্ছে?’

‘আমি আর তার সঙ্গে থাকি নে।’

‘আল্যাদা হয়ে গেছ বুঝি?’

‘হ্যাঁ।’

‘নিতে পারলে খুশিই হতাম তোমাদের পরিবারকে চিনি বেশ খাটিয়ে লোক তোমরা কিন্তু আমার এখানে কোন জায়গা খালি নেই যে।’

‘কী ব্যাপার?’ টেবিলের ধারে বসতে বসতে গ্রিগোরির দিকে আড়চোখে তাকিয়ে লেফটেন্যান্ট জিঙ্গেস করল।

‘ছোকরা একটা কাজ চায়।’

‘ঘোড়ার তদারক করতে পার?’ জুড়িগাড়ি চালাতে পার ঠিক মতন?’ চামচ দিয়ে গেলাসের চা মেশাতে মেশাতে লেফটেন্যান্ট জিঙ্গেস করল।

‘তা পারি আমাদের নিজেদের হয় ছয়টা ঘোড়ার দেখাশোনা আমিই করতাম।’

‘আমার একজন কোচোয়ান দরকার। তোমার কাজের কডার কী?’

‘বেশি আমি চাই নে।’

‘তা-ই যদি হয় তাহলে কাল চলে এসো আমার বাবার জমিদারিতে নিকলাই আলেক্সেয়েভিচ লিন্তনিৎস্কির জমিদারি কোথায়, জান?’

‘হ্যাঁ তা জানি।’

এখান থেকে ক্রোশ চারেকের পথ। কাল সকাল থাকতে থাকতে চলে এসো, ওখানেই যা ঠিক করার করা যাবে



গ্রিগোরি জায়গায় দাঁড়িয়ে উসখুস করতে লাগল। বেরোবার জন্য দরজার হাতলটায় হাত রেখেও শেষকালে বলে ফেলল, ‘আপনার সঙ্গে গোপনে একটু কথা বলতে পারলে ভালো হত হুজুর’

গ্রিগোরির পেছন পেছন লেফটেন্যান্ট আধা-অন্ধকারে ঘেরা দরদালানে বেরিয়ে চলে এলো। ওপাশের বারান্দা থেকে ঘসা কাচ ভেদ করে চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে গোলাপী আলোর যৎসামান্য স্রান আভা।

‘কী ব্যাপার?’

‘আমি একা নই হুজুর লজ্জায় গাঢ় লাল হয়ে উঠল গ্রিগোরি। ‘আমার সঙ্গে একজন মেয়েমানুষ আছে। ওকেও কোন কাজ দিতে পারবেন?’

‘বৌ?’ স্রান আলোর গোলাপী ছোঁয়া-লাগা ভুবু তুলে মুচকি হেসে লেফটেন্যান্ট জিজ্ঞাসা করল

‘অন্যের বৌ।’

‘আচ্ছা, তা-ই বল। বেশ হৈসেলের ফাইফরমাস খাটার কাজে তাকেও ঢুকিয়ে দেওয়া যাবে ‘কন। কিন্তু ওর স্বামী কোথায়?’

‘আমাদের এই গাঁয়েরই লোক’

তার মানে, আরেকজনের বৌ ভাগিয়ে নিয়েছ তুমি?’

নিজের ইচ্ছেয় চলে এসেছে’

‘এ যে দস্তুরমতো রোমান্টিক গল্প আচ্ছা, ঠিক আছে, কাল চলে এসে এখন যেতে পার ভাই।’

লিভনিংস্তিদের জমিদারি ইয়াগদনোয়েতে গ্রিগোরি এলো সকাল আটটার কাছাকাছি। বিশাল আঙিনা চারপাশের ইটের পাঁচিল ধসে পড়েছে। আঙিনার ওপর বিশ্রীরকম ভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বসত বাড়ির লাগোয়া দালান কোঠা টালির ছাদ দেওয়া সদর-দালান, ওপরে মাঝখানে রঙবেরঙের টালির কুচি দিয়ে ১৯১০ সাল লেখা এছাড়া আছে চাকরবাকরদের মহল, স্নানঘর, আস্তাবল, হাঁসমুরগীর ঘর, গোয়ালঘর, একটা লম্বা গোলাঘর আর গাড়ি রাখার ঘর বসন্তবাড়িটা বেশ বড়সড়, পুরানো, আঙিনার দিক থেকে একটা নীচু বেড়া দিয়ে আলাদা করা, একটা বাগানের মধ্যে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ির পেছনে কতকগুলো ন্যাড়া পপলার আর উইলো গাছের একটা ছাইরঙা দেয়াল উঠেছে গাছগুলোর মাথায় কাকদের ছেড়ে যাওয়া খয়েরি রঙের বাসার টুপি বসানো

উঠানে, পেটেব সামনেই গ্রিগোরিকে অভ্যর্থনা জানানাল একপাল কালো ক্রিমীয় বর্জেই কুকুর। সেগুলোর মধ্যে একটা খোঁড়া মাদী কুকুর - তার চোখদুটো বুড়িদেব মতো অনবরত জলীয় বাষ্প ভরে আসছে প্রথমেই এগিয়ে এসে গ্রিগোরিকে

শুঁকে দেখল, তারপর মাথা নীচু করে চলল তার শেছন শেছন। চাকরদের মহলে এক রীতুনি মুখে মেচেতার সাগওয়ালা এক যুবতী দাসীর সঙ্গে ঝগড়া করেছে মোরগোড়ায় বসে আছে এক বুড়োমানুষ, ঠোঁট খোলা। তামাকের ধোঁয়ায় লোকটার সর্বাঙ্গ ঢাকা, যেন বস্তাবন্দী দাসী ত্রিগোয়রিকে বাড়ির ভেতরে নিয়ে গেল। সামনের ঘরটায় কুকুর আর কাঁচা চামড়ার বেটিকা গন্ধ। টেবিলের ওপর পড়ে আছে দোনলা বন্দকের একটা খাপ আর শিকারের একটা ধলে ধলেটার সবুজ বেশমী ঝালরগুলো ছিন্নভিন্ন।

‘ছোটকস্তা ডাকছেন,’ পাশের দরজা দিয়ে উঁকি মেরে দাসী বলল

ত্রিগোয়রী শঙ্কিত দৃষ্টিতে তার নিজের পায়ের কাদামাখা বুটজোড়ার দিকে তাকাল। তারপর পা বাড়াল দরজার দিকে।

জন্মলার পাশে পাতা একটা বাটের ওপর শুয়ে আছে লেফটেন্যান্ট কমান্ডার ওপরে সিগারেট পাকানোর কাগজ আর তামাকের একটা ডিবে একটা পাকানো নলের ভেতরে তামাক পুরে সাদা শার্টের কলারের বোতাম লাগিয়ে লেফটেন্যান্ট বলল, ‘বেশ সকাল-সকাল এসে গেছ দেখছি অপেক্ষা কর একটুনি বাবা এসে পড়বেন।’

ত্রিগোয়রী দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল মিনিট খানেক বাদে বাইরের ঘরে কার যেন পায়ের আওয়াজ শোনা গেল, কাঠের মেঝে কাঁচকোঁচ আওয়াজ করে উঠল। দরজার ফাঁক থেকে এক বাজখাই গলা প্রশ্ন করল, ‘ইয়েভগেনি, ঘুমোচ্ছিস নাকি?’

‘ভেতরে আসুন।’

কালো ককেশীয় ফেলট-বুট পরা এক বৃদ্ধ ঘরে ঢুকল ত্রিগোয়রী আড়চোখে তার দিকে তাকাল, প্রথমেই যা তার চোখে পড়ল তা হল বৃদ্ধের সুন্দর বাঁকা নাকটি, নাকের নীচে তামাকের ধোঁয়ায় হলদে ছোপ ধরা অর্ধচন্দ্রাকার প্রশস্ত পাকা গোঁফজোড়া। বৃদ্ধ দীর্ঘকায়, বৃষস্বচ্ছ, কিন্তু একহারা গড়নের। ডিটের পশমের বনাতে তৈরি লংকোটটা তার গায়ে ঢলঢল করেছে, কলারটা তার বলিরেখাঙ্কিত বাদামী রঙের গলার চারধারে ফাঁসের মতো জড়িয়ে আছে। নিম্ভ্রান্ত চোখজোড়া নাকের দু’পাশের খাঁজের কাছাকাছি বসানো

‘এই যে বাবা, যে কোচোয়ানেন্স কথা বলেছিলাম। ভালো পরিবারের ছেলে।’

‘কাদের বাড়ির ছেলে?’ জলদগন্তীর স্বরে বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করল

‘মেলেক্সভের ছেলে।’

কোন মেলেক্সভ?’

পাঙ্কেলেই মেলেক্সভ।

‘প্রকৌক্ষিকে চিনতাম, পাণ্ডুলেইকেও চিনি। খৌড়ামতন, চেনকেসীয় ত?’

‘হ্যাঁ, হুজুর খৌড়া,’ বীধা তারের মতো টানটান হয়ে গ্রিগোরি বলল। মনে পড়ল বাপের মুখে শোনা বৃশ-তুর্কী যুদ্ধের নায়ক অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল লিস্তনিথস্কির কাহিনী।

‘কাজ ঝুজছে কেন?’ ওপর থেকে বেন বাজের আওয়াজ হল।

‘বাবার সঙ্গে আমি আর থাকি না হুজুর।’

‘তুমি যদি অন্যের কাছে ডাড়াই খাট তাহলে কিসের আর কসাক হবে হে তুমি? তোমার বাবা তোমাকে বখন আলাদা করে দেয় তখন সম্পত্তির কিছু ভাগই কি দেয় নি?’

‘না হুজুর, দেয় নি।’

‘তাহলে অবশ্য আলাদা কথা। তোমার বৌয়েরও কাজ চাই, তাই ত?’

লেফটেন্যান্ট খাটের ওপর নড়েচড়ে বসতে খাটটা ভীষণ ভাবে কাঁচকাঁচ আওয়াজ করে উঠল। সে দিকে চোখ ফেঁদাতে গ্রিগোরি দেখল লেফটেন্যান্ট চোখ টিপছে আর মাথা নাড়ছে।

‘হ্যাঁ হুজুর।’

‘অমন ‘হুজুর’ ‘হুজুর’ বাদ দাও ওসব আমি পছন্দ করি না। মাইনে পাখে মাসে আট কুবল দু’জনের জন্যেই তোমার বৌ বাড়ির চাকরবাকর আর ঠিকের মুনিষদের জন্যে রান্নাবান্না করবে রাজী ত?’

‘আজ্ঞে হ্যাঁ।’

‘আগামীকালই আসা চাই কিন্তু। চাকরবাকরদের মহলের যে অংশটাতে আগের কোচোয়ান থাকত, সেখানে থাকবে তুমি।’

‘গডকাল আপনার শিকার কেমন হল?’ পায়ের সবু সবু চেটোদুটো গালিচার ওপর নামিয়ে পুত্র জিঞ্জেরস করল বৃদ্ধকে।

‘গর্জন খাতের’ ধারে একটা চমৎকার শেরালকে তাড়া দিয়ে বার করেছিলাম ওটাকে আমরা বন পর্যন্ত তাড়া কবে নিয়ে যাই। কিন্তু বুড়ো শেরাল বড় ধূর্ত কুকুরগুলোকে বোকা বানাল।’

‘কাজ্বেকটা এখনও খৌড়াচ্ছে নাকি?’

‘ওর দেখা যাচ্ছে পা’টা মচকেছে তুই ইয়েভগেনি চটপট কর। খাবার জুড়িয়ে যাচ্ছে।’

বৃদ্ধ গ্রিগোরির দিকে ঘুরে দাঁড়াল, শুকনো হাড়িসার আঙুলগুলো মটকাল গ্রিগোরিকে বলল, ‘শিগ্গির! কুইক মার্চ! কাল সকাল অটটার মধ্যে যেন এখানে দেখতে পাই।’

খ্রিগোরি গেটের বাইরে চলে এলো। গোলাবাড়ির পেছনের দেয়াল ঘেঁষে বরফগলার পর যে একফালি জমি শুকিয়ে গেছে বর্জ্যেই কুকুরগুলো সেখানে রোদ পোহাছিল। বুড়ি-বুড়ি চাউনির সেই মাদী কুকুরটা দুলকি চালে খ্রিগোরির দিকে এগিয়ে এলো, পেছন থেকে তাকে আগাপাশতলা ঝুঁকে দেখল, বিষয় ভাবে মাথা নীচু করে এক পা দু'পা করে প্রথম খাতটা পর্যন্ত গিয়ে তাকে এগিয়ে দিল তারপর ফিরে গেল।

## ২৪৩

আগ্নিনিয়া সকাল-সকাল রান্নাবান্না সারল। উনুনের গনগনে আঁচ ঝুঁচিয়ে নামাশ, বাসনপত্র মাছল। চিমনির বাঁপ বন্ধ করে দিল তারপর উঠোনের দিককার জানলাটা দিয়ে বাইরে উঁকি মেরে দেখল। মেলেবভদের উঠোনের দিকে বেড়ার গায়ে চুড়োচুড়ি করে যে লাকড়ির জুপ রাখা আছে তারই পাশে স্তোপান দাঁড়িয়ে তার কঠিন ঠোঁটের কোনায় ঝুলছে একটা অর্ধমুদ্র সিগারেট কাঠের গাদাটা থেকে সে উপযুক্ত ঝুঁটি ঝুঁজে বার করাব মতলবে আছে। চালায় বাঁ কোনাটা ভেঙে পড়েছে, শক্তপোক্ত দুটো ঝুঁটি মূতে যেটুকু উলুখাগড়া বাকি আছে তাইতে ছেয়ে দিলেই হল।

আজ সকাল থেকে আগ্নিনিয়ার দু'গালে পড়েছে গোলাপী আভা, তার দু'চোখে যৌবনের দীপ্তি। ওর এই বদল স্তোপানের চোখ এড়াল না। সকালের খাবার খেতে খেতে জিজ্ঞেস করল, 'বলি ব্যাপারটা কী?'

'কার? আমার কথা বলছ?'' আগ্নিনিয়াব মুখে দগ্ধ করে লাল আগুন জ্বলে উঠল।

'যুখ যে একেবারে চকচক করছে।' তেল-টেল মেখেছ নাকি?'

'উনুনের আঁচ লেগেছে। যত্ন মাথায় উঠে এসেছে।' এই বলে সরে গিয়ে চোরা চাউনি হেনে জানলার দিকে তাকাল মিশকা কশেভয়ের বোন আসছে কিনা দেখার জন্য।

কিন্তু মেয়েটা এলো সম্ভার অঙ্গকার নামার ঠিক আগে আগে। আগ্নিনিয়া ততক্ষণে প্রতীক্ষা করে করে একেবারে ক্রান্ত। ওকে দেখে সে আর স্থির থাকতে পারল না। 'আমাকে ডাকছ মশুতকা?'

'একটু বাইরে এসো।'

উনুনের চুনকাম করা বুকের ওপর গেঁথে বসানো এক টুকরো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে স্তোপান তখন গোবুর শিঙের তৈরি একটা হাতলছাড়া চিবুনী দিয়ে মাথার সামনের চুলের ঝুঁটি আঁচড়াচ্ছিল, হালকা বাদামী রঙের গোঁফজোড়া পাট করছিল।

আগ্নিনিয়া শঙ্কড়রে স্বাধীর দিকে তাকাল।

‘তুমি কোথাও যাচ্ছ নাকি?’

স্তেপান সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না। চিবুণীটা সালোয়ারের জেবের ভেতরে রেখে কুন্ডুরির ভেতর থেকে তাসের তড়ি আর তামাকের থলোটো তুলে নিয়ে বলল, ‘আনিকুশকার বাড়িতে চললাম, কিছুক্ষণ বসব ওখানে।’

‘তোমার কি কখনও ক্রান্তি আসে না গো? তাসের বাই মাথায় চেপেছে রাত হল কি খেলা শুরু হল বাবুদের চলবে সেই মোহরগ ডাকা অবধি।’

‘হয়েছে, হয়েছে, অনেক শূন্যেছি।’

‘আবার সেই তিন তাসের খেলা নাকি?’

‘আঃ আগ্নিনিয়া, ঘ্যানঘেনি ছাড় দেখি। ওই যে কাইরে তোমার জানো লোক অপেক্ষা করে আছে, যাও।’

আগ্নিনিয়া একপাশে কাত হয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল বাইরের বারান্দায় বাইরের দরজার সামনে হাসিমুখে তাকে অভ্যর্থনা জানাল মশুতকা তার মেচেতাডরা গালে গোলাপী আভা

‘প্রিন্স এসেছে কিন্তু।’

‘তারপর?’

‘বলেছে অঙ্ককার হয়ে এলেই আমাদের বাড়ি চলে এসো।’

আগ্নিনিয়া খপ করে মশুতকার হাত চেপে ধরে দরজার এক কোনায় তাকে টেনে নিয়ে গিয়ে বলল, ‘আন্তে, আন্তে ভাই তারপর আর কী বলল ও মানা? আর কিছু বলতে বলেছে?’

‘বলল তোমার নিজের যা যা জিনিস সঙ্গে নিতে চাও, গুছিয়ে নিয়ে এসো।’

আগ্নিনিয়ার সর্বাস্থে যেন আগুন জ্বলে উঠল, উত্তেজনায় সে কাঁপতে লাগল, একবার এপায়ে আরেকবার ওপায়ে ভর রাখতে রাখতে ছটফট করে এদিক ওদিক মাথা ঘোরাতে লাগল, ঘন ঘন তাকাতে লাগল দরজার দিকে

‘হা ভগবান সে আমি কী করে পারব? আঁ? এত তড়াতাড়ি কী করে পারব বল ত? না, দাঁড়াও, দাঁড়াও, ওকে বলো যে আমি এখন আসছি কিন্তু ও আমার সঙ্গে দেখা করবে কোথায়?’

‘সোজা আমাদের বাড়ি চলে এসো।’

‘না, না, তা হয় না।’

‘আচ্ছা বেশ, আমি ওকে বলব। ও নিজেই বেরিয়ে এসে দেখা করবে।’

স্তেপান কোর্তী চাপাল, কুলন্ত ল্যাম্পটার দিকে মুখ বাড়িয়ে দিয়ে সিগারেট ধরাল।

‘কী জনো এসেছিল?’ দুটো টানের ফাঁকে সে জিজ্ঞেস করল

‘কে ? কার কথা বলছ ?’

‘আরে ওই যে কশেভয়দের মাশ্কাটা।’

‘ও হ্যাঁ, এসেছিল ওর নিজের একটা কাজ নিয়ে বলল একটা ঘাঘরা কেটে দিতে হবে ওকে।’

সিগারেটের মাথা থেকে কালো কালো ছাইয়ের গুড়ো ফুঁ দিয়ে ঝেড়ে ফেলে দরজার দিকে এগোল স্ত্রোপান।

‘তুমি শূয়ে পড় আমার জন্যে অপেক্ষা করো না।’

‘আচ্ছা আচ্ছা, বুঝেছি।’

আগ্নিনিয়া ছুটে গিয়ে বরফজমাট জানলার খারি ঘেঁবে দাঁড়াল, বৈষ্ণব সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। লোক চলাচলের ফলে বরফের ওপর গেট পর্যন্ত যে পায়ে-চলা-পথটা তৈরি হয়েছে তার ওপর স্ত্রোপানের পা পড়ায় মচমচ আওয়াজ হচ্ছে স্ত্রোপান চলে যাচ্ছে বাতাসের ঝাপটায় সিগারেটের আগুনের একটা ফুলকি উড়ে এলো জানলার দিকে জানলার কাছে গল্য বরফের একটা চক্র হয়েছে, তার ভেতর দিয়ে ছলছল সিগারেটের আলোয় অর্ধবৃত্তাকারে এক ঝলক চোখে পড়ল লম্বা পশমী টুপির নীচে স্ত্রোপানের একটা নরম কান আর তার রোদে-পোড়া গালের একটা পাশ।

আগ্নিনিয়া পাগলের মতো হয়ে সিন্দুকের ভেতর থেকে একে একে বার করতে লাগল তার ঘাঘরা, ওপরের জামা, গায়ের ছোট শাল তার বিয়ের যৌতুক সব ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগল একটা বড় শালের ওপর হাঁপাতে হাঁপাতে, বিহ্বল দৃষ্টিতে ডাকাতে ডাকাতে শেষ বারের মতো এক পাক রান্নাঘরটা ঘুরে এলো, বাতি নিভিয়ে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে এলো দেউড়িতে মেলেখভদের বাড়ি থেকে কে যেন বেরিয়ে এলো গোবুবাছুর দেখতে যতক্ষণ না তার পায়ের শব্দ মিলিয়ে যায় ততক্ষণ অপেক্ষা করল আগ্নিনিয়া তারপর দরজায় শিকলি তুলে দিয়ে পুটলিটা বকের কাছে চেপে ধরে ছুটল দানের দিকে মাথায় বাঁধা ফুরফুরে গুড়নটার তলা থেকে গোছা গোছা তুল খসে পড়ে তার গালের ওপর সুড়সুড়ি দিতে লাগল। পেছনের অলিগলি দিয়ে ছুটতে ছুটতে যখন কশেভয়দের বাড়ির উঠানে এসে পৌঁছল ততক্ষণে তার সমস্ত শক্তি ফুরিয়ে এসেছে, নীসের মতো ভারী পাদুটো অতিকষ্টে একটার পর একটা ফেলছে খ্রিগোরি গেটের কাছে ওর জন্য অপেক্ষা করছিল ওর হাত থেকে পুটলিটা নিয়ে নীরবে আগে আগে চলতে লাগল স্ত্রোপানুজের দিকে।

মাড়ই-উঠোন ছাড়িয়ে চলে আসার পর আগ্নিনিয়া পায়ের গতি কমিয়ে দিয়ে খ্রিগোরির জামার আঁতনি ধরে টানল।

‘একটু থাম না গো।’

‘থামতে যাব কেন ? চাঁদ উঠতে দেরি আছে, এই ফাঁকে আমাদের তাড়াতাড়ি সরে পড়তে হবে।’

‘দাঁড়াও গ্রিশা,’ ব্যথায় নূরে পড়ে থমকে দাঁড়াল আঞ্জিনিয়া

‘কী হল তোমার ?’ গ্রিগোরি ওর দিকে ঝুঁকে পড়ল

এই পেটের ভেতরে কেমন যেন যন্ত্রণা হচ্ছে সেদিন একটা ভারী বোঝা টানতে হয়েছিল কিনা।’ যন্ত্রণায় আঞ্জিনিয়ার চোখে যেন আগুনের ঝলক খেলে গেল। শুকনো চোঁট চাটতে চাটতে সে চোখ বুজল। পেট চেপে ধরল। নূরে পড়ে কবুণ ভজিতে সে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বুমানের নীচে চুলের গোছা ঠিকঠাক করে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল।

‘বাস ঠিক আছে, চল এবারে।’

‘তুমি যে জিজ্ঞেসও করছ না কোথায় আমি নিয়ে যাচ্ছি তোমাকে। এমনও ত হতে পারে যে প্রথম যে খাতটা পড়বে তার কাছাকাছি নিয়ে গিয়ে সেখান থেকে ঠেলে ফেলে দেব ?’ অঙ্ককারের মধো হাসল গ্রিগোরি

‘এখন আমার কাছে সব সমান যা হবার হয়ে গেছে।’ নিরানন্দ হাসিতে কঁপে উঠল আঞ্জিনিয়ার কণ্ঠস্বর।

রোজকার মতো সেদিনও স্তেপান বাড়ি ফিরে এলো মাকরাতের আন্তাবলে ঢুকল ঘোড়ার পায়ের নীচে কিছু ঝড়বিচালি পড়ে আছে দেখে সেগুলো উঠিয়ে চাড়িতে ফেলে দিল। গলার লাগামটা খুলে দিল, তারপর দেউড়ির ধাপ বয়ে যারান্দায় উঠল। দরজার শিকলি খুলতে খুলতে মনে মনে ডাবল, ‘হয়ত কোথাও আড্ডা মারতে বেরিয়েছে রান্নাঘরে ঢুকে দরজাটা ভালো করে বন্ধ করে দিল, তারপর দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালাল। আঙ্ক সে খেলায় জিতেছে (দেশলাই বাজি ধরেছিল), তাই বেশ শান্ত ঘুমঘুম পাচ্ছে তার। বাড়ি জ্বালাল। তাকিয়ে দেখল রান্নাঘরের চতুর্দিকে জিনিসপত্র এলোমেলো হয়ে পড়ে আছে কারণ কিছু বুঝতে পারল না খানিকটা আশ্চর্য হয়েই ভেতরের ঘরে গিয়ে ঢুকল সিঁপুকের কালো গহ্বর হাঁ করে আছে, মেঝের ওপর পড়ে আছে একটা পুরনো কামিজ তাড়াতাড়ি স্তেপানের বৌ সেটা নিতে ভুলে গেছে স্তেপান এক টানে ভেড়ার চামড়ার কোটটা গা থেকে খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিল, রান্নাঘরে ছুটে গেল আলো আনতে ভেতরের ঘরটা ভালো করে দেখার পর সে বুঝতে পারল হাতের বাড়িটা পাক মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিল কী করতে যাচ্ছে সে সম্পর্কে স্পষ্ট কিছু না বুঝে শুনাই নিখিলিকজ্ঞানশূন্য হয়ে দেয়াল থেকে তলোয়ারখানা বসিয়ে নিল। তলোয়ারের হাতলটা এত জোরে চেপে ধরল যে হাতের আঙুলগুলো ফুলে টসটসে ও

কালোকালো হয়ে উঠল। তারপর আন্নিনিয়ার ফেলে যাওয়া সেই হালকা হসনে রঙের ফুল আঁকা নীলরঙের জামাটা তলোয়ারের ডগায় তুলে নিয়ে শূন্যে ছুঁড়ে দিল, মাটিতে পড়তে না পড়তে চটপট এক কোণে কেটে দু'আখলা করে ফেলল।

নেকড়ে মতো শোকে দুঃখে ফেঁকাসে হয়ে গিয়ে, একটা ভয়ঙ্কর বনা উদ্গাদনার বেশে নীল রঙের ফলা ফলা কাপড়ের টুকরোগুলো সে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিতে লাগল কড়িকাঠের দিকে। শানানো ইম্পাতের ফলা সেগুলোকে মাটিতে পড়তে না দিয়ে সই সই আওয়াজ তুলে শূন্যপথেই টুকরো টুকরো করে চলল।

তারপর হাতলের সঙ্গে লাগানো বাঁধনটা ছিঁড়ে ফেলে তলোয়ারখানা এক কোনায় ছুঁড়ে দিয়ে রামাঘরে গিয়ে টেবিলের ধারে বসল। মাথা এক পাশে কাত করে লোহার মতো শক্ত কাঁপা-কাঁপা আঙুলে আ-ধোয়া টেবিলের ওপরটায় হাত বুলাতে লাগল।

## তেরো

বিপদ যখন আসে তখন একা আসে না কখনও সেদিন সকালে হেটের অসাবধানতায় মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচের পাল-মেবার বাঁড়টা সবচেয়ে ভালো মান্নী ঘোড়াটার ঘাড় শিঙ দিয়ে গুঁতিয়ে এফোড় ওফোড় করে দিল হেট ভেবাচেকা খেয়ে, ফেঁকাসে হয়ে কাঁপতে কাঁপতে বাড়িতে ছুটে এলো

‘সকলনাশ হয়ে গেছে কস্তা! শ্যালার বাঁড়টা মরণও হয় না শ্যালার’

‘কী হয়েছে? কী হয়েছে বাঁড়টার বল!’ মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল

‘মান্নী ঘোড়াটার দফা রফা করে দিল আসুন, দেখে যান, শিঙ দিয়ে গুঁতিয়ে

মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ ওপরে আর কোন পোশাক না চাপিয়ে যেমন ছিল তেমনি ছুটে বেরিয়ে এলো উঠানে। কুয়ার পাশে মিতকা একটা ডাঙা দিয়ে পাঁচ বছরের লাল বাঁড়টাকে শিটোচ্ছে, বাঁড়টা মাটিতে নীচু হয়ে তার থলথলে গলকম্বলটা বরফের ওপর হেঁচডাচ্ছে, হেঁচ-মাথা এদিক-ওদিক ঘোরাচ্ছে, খুর দিয়ে বরফ ঝুঁড়ে ঝুঁড়ে পেছনে অনেক দূর ছুঁড়ে দিচ্ছে, তার সর্পিলা আকারে পাকানো লেকের চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছে বুপোর মতো বরফের মিহি গুঁড়ো। সে কিন্তু মারের চোটে পালাচ্ছে না, কেবল চাপাধরে ডাক ছাড়তে ছাড়তে পেছনের দু’পা গুঁহিয়ে নেবার চেষ্টা করছে ভাবটা এমন যে এবুনি লায় মেবে



তার গলার ভেতরকার চাপা ঘড়ঘড় আওয়াজটা বিস্তার পেতে লাগল, আরও প্রবল হয়ে উঠতে লাগল তার গর্জন মিত্‌কাকে মিশেই ওর পেটের কষি ধরে শেছন থেকে টানলে কী হবে, সে দিকে মিত্‌কার কোন খেয়াল নেই। বাঁড়টার মুখে আর পাঁজরে সে মেরে চলেছে, সেই সঙ্গে সমানে গলা ফাটিয়ে অসন্তোর মতো শিঙি করে চলেছে।

‘সরে যা রে মিত্‌রি, সরে যা। ভগবান খ্রীষ্টের দোহাই। ওটা গুঁড়িয়ে তোর পেটের নাড়িভুঁড়ি বার করে দেবে এই যে খ্রিগোরিচি\* তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী দেখছ? থামাও।’

মিরোন খ্রিগোরিয়েভিচ কুয়োব দিকে দৌড়ে গেল বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে আছে মাদী ঘোড়াটা। মাথাটা তার ক্রান্ত ভাবে ঝুঁকে পড়েছে শেটের দু’পাশের বনা জায়গাগুলো কালো দেখাচ্ছে, আরও ভেতরে বসে গেছে, ঘামে ভিজে গেছে, নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত ওঠা-পড়া করছে। ঘাড় থেকে বরফের ওপর এবং বুকের গোলাকার খীত মাংসপেশীর ওপর টুইয়ে টুইয়ে রক্ত পড়ছে পিঠের আর দু’পাশের হালকা বাদামী রঙের লোমের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে মৃদুস্পন্দন, কুচকি কৈপে কৈপে উঠছে

মিরোন খ্রিগোরিয়েভিচ ছুটে গেল সামনে, ঘোড়াটার দিকে ঘাড়টা একোড় ওকোড় হয়ে গেছে, সেখানে গোলাপী রঙের ক্ষতস্থান থেকে বৌয়ার মতো বাষ্প উঠছে কাটা জায়গাটা লম্বা হয়ে চলে গেছে, বেশ গভীর ভেতরে হাতের মুঠো চুকিয়ে দেওয়া যায় গলার বাঁকা মোচডানো নলিটা বেরিয়ে পড়েছে, তিরতির কবে কাঁপছে। মিরোন খ্রিগোরিয়েভিচ সামনের চুলের গোছা মুঠোর চেপে ধরে ঘোড়ার হেঁট মাথা উঁচু করে তুলে ধরল প্রভুর ঠিক মুখের ওপর তার চকচকে চোখের বেগুনী রঙের মণি তুলে ধরল, যেন প্রশ্ন করল, ‘এখন কী হবে?’ তার এই নিঃশব্দ প্রশ্নের উত্তরে মিরোন খ্রিগোরিয়েভিচ হাঁক ছাড়ল ‘মিত্‌কা! ওক-গাছের ছাল ছাড়িয়ে আনতে বল জলদি।’

হেঁট ছুটল ওকগাছের ছাল ছাড়িয়ে আনতে ছুটতে গিয়ে ঝাঁকুনি লেগে তাব নোংবা গলার সামনের দিকে তিনকোনা কষ্টমশিটা দুলতে লাগল মিত্‌কা এগিয়ে এলো বাপের কাছে বারবার ফিরে তাকাতে লাগল বাঁড়টার দিকে বাঁড়টা তখন উঠোনময় ঘুরপাক খাচ্ছে সাদা ধবধবে গলস্ত তুষারের ওপর লাল মূর্তি ধরে মুখ দিয়ে অবিরাম হুঙ্কার ছাড়তে ছাড়তে উঠোনে চক্রর মেরে চলেছে।

এটার সামনের চুলের গোছা ধরে রাখ।’ মিত্‌কাকে বাপ বলল ওরে

\* অর্থাৎ মিরোন খ্রিগোরিয়েভিচ। অনুঃ

মিষেই, একছুটে যা শু একটা দড়ি নিয়ে আয়। চটপট বলছি, নইলে এবুনি মেরে তোরা বদন বিগড়ে দেব।

ঘোড়াটা যাতে ব্যাথা টের না পায় সেইজন্য তার হালকা লোমে ঢাকা মখমলের মতো নরম ওপরের ঠোঁটটা কসে দড়ি দিয়ে পেঁচিয়ে বাঁধা হল গ্রিশাকা দাদু এলো। একটা রঙচঙে বাটিতে করে ওকফলের মতো বড়ের কিসের যেন একটা ক্বাথ এনে রাখা হল।

‘জুড়িয়ে নে গরম বলেই মনে হচ্ছে। শুনছিস মিরোন?’

‘ভগবানের দোহাই বাবা, বাড়ির ভেতবে চলে যান এখানে ঠাণ্ডা লাগাবেন না।’

‘কিন্তু আমি বলি কি জুড়িয়ে নে। মাদীটাকে কি বডম করতে চাস?’

কতস্থান ধূয়ে দেখা হল মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ ঠাণ্ডায় আড়ই আঙুলগুলো দিয়ে পান-সেলাইয়ের মোটা ছুঁচে টোন সুতো পরাল। নিজে হাতে সেলাই করল চমৎকার সেলাই পড়ল কতস্থানের ওপর মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ কুয়োতলা ছেড়ে পা বাড়ালে না বাড়ালে ঘরের ভেতর থেকে ছুটে উঠোনে বেরিয়ে এলো লুকিনিচনা তার ঝুলে পড়া নিম্রভ দুই গালের থলেদুটি আতঙ্কে যেন ভুবড়ে গেছে। স্বামীকে একপাশে ডেকে নিয়ে সে বলল, নাতালিয়া চলে এসেছে গ্রিগোরিচ ছার রে, কপাল আমার।’

‘কেন কী হয়েছে?’ মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ খান্না হয়ে উঠল তার সাদা মুখের ছিট ছিট দাগগুলো যেন ফেকাসে হয়ে গেল

‘গ্রিগোরির সঙ্গে কী যেন হয়েছে জামাই বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে!’ ওড়ার আগে দৌড়কাক যেমন পাখনা মেলে লুকিনিচনাও তেমনি দু’হাত ছড়িয়ে আঁচলে হাতের চাপড় মারল, তারপর কান্নায় ভেঙে পড়ল, বিলাপ করতে করতে বলল ‘গ্রামের লোকের সামনে মুখ দেখাব কী করে! হা ভগবান, হা অন্নদাতা শ্রবু, এ কী বিপদ ওঃ হো-হো।’

রান্নাঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিল নাতালিয়া। তার মাথায় ওড়না, গায়ে বুবই খাটো একটা গরম কোর্তা। নাকের খাঁজের দু’পাশে টলমল করছে দুটি অশ্রুবিন্দু। দু’গালে চাপ চাপ লাল দাগ ফুটে উঠেছে।

‘তুই এখানে কী বলে?’ রান্নাঘরে ঢুকে বাপ গর্জন করে উঠল। ‘স্বামী মারধোর করেছে নাকি? বনিবনা হল না বুঝি?’

‘বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে, শুকনো গলায় ঢোক গিলে ফোঁপাতে ফোঁপাতে হিঁকা ভুলল নাতালিয়া, তারপর সামান্য টাল খেয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল বাপের সামনে ‘বাবা গো, আমার জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল আমাকে ফিরিয়ে নাও। গ্রিশাকা ওর সেই মেয়েমানুষটার সঙ্গে চলে গেছে। আমি একা বাবা গো,

গাড়ির চাকা যেন আমাকে পিষে দিয়ে গেল ' অনুন্দের ভঙ্গিতে নীচ থেকে বাপের কঁটা দাড়ির সামান্য-হালু ছোপের দিকে তাকতে তাকতে নাতালিয়া অসংলগ্ন ভাবে ঘনঘন বিড়বিড় করতে লাগল একটা কথাও শেষ করতে পারল না

‘দাঁড়া, দাঁড়া, আরে থাম দেখি একটু’

ওখানে থাকার আর কোন উপায় নেই আমার আমাকে কিরিয়ে নাও! হাঁটুতে ভর দিয়ে নাতালিয়া চটপট সিঁদুরের কাছে এগিয়ে গিয়ে কান্নায় ফুলে ফুলে উঠতে উঠতে দু’হাতের মাথো মাথো গুঁজল। তার মাথার ওড়না খসে পড়ল পিঠের ওপর, ফেঁকাসে দুই কানের ওপর বুলতে লাগল পরিপাটি আঁচড়ানো সোজা সোজা কালো চুলের গোছা। কঠিন মুহুর্তে কান্না-এ যেন চৈত্বের খবো দিনে ধরাবর্ষণ। মা নাতালিয়ার মাথোটা কেঁচিরে বসা পেটের ওপর চেপে ধরে আবোল-তাবোল মেয়েলী ভাবায় ছাড়া-ছাড়া বিড়বিড় করে মাঝুনা দিতে লাগল এদিকে মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ দেউড়িতে ছুটে এসে ক্ষিপ্ত হয়ে গর্জন করে উঠল ‘ওরে দুটো স্নেজগাড়ি জোড়! একসঙ্গে, দুটো ঘোড়ায়

দেউড়ির কাছে মুরগীর ওপর চেপে বসে একটা মোরগ দিবি দাপাদাপি শুরু করে দিয়েছিল, কিন্তু এই ঘোর গর্জনে ভয় পেয়ে সে লাফিয়ে নেমে পড়ল মুরগীটার পিঠ থেকে, রাগে কাঁপতে কাঁপতে কঁক কঁক ডাক ছাড়ল, হেলেদুলে ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে দেউড়ি ছেড়ে চলে গেল আরও দূরে গোলাঘরের দিকে।

‘জোড় শিগগির’ মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ সদর দরজার সামনের নম্বাকাটা রেলিং-এর ঝুটিগুলোর গায়ে বৃটজুতো দিয়ে এমন গুতো মারল যে সেগুলো ভেঙে পড়ে গেল। যখন দেখল যে হেট আস্তাবল থেকে একজোড়া কালো কুচকুচে ঘোড়া বার করে এনে দুলকি চালে চলা অবস্থাতেই তাদের ঘাড়ে জোয়াল পরিয়ে দিচ্ছে কেবল তখনই বিস্ত্রী রকমের হাঁ-বার-করা রেলিংটা ছেড়ে ঘরের ভেতরে চলে গেল

মিত্কা আর হেট স্নেজগাড়ি হাঁকিয়ে চলল নাতালিয়ার জিনিসপত্র আনতে একটা শূয়োরছানা সময়মতো পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াতে না পারায় হেটের অনামনস্ব তার ফলে স্নেজগাড়ির ঝাক্স খেয়ে ছিটকে পড়ে গেল।

‘এরকম একটা ব্যাপারের পর কস্তা নিশ্চয়ই ঘোড়াটার কথা ভুলে যাবে’ মনে মনে এই ভেবে উল্লসিত হয়ে ইউক্রেনীয়টি লাগাম টিলে করে দিয়েছিল।

পরক্ষণেই তার মনে হল, ‘ব্যটা হাড় বজ্জাত ভুলবে না আরও কিছু’ সঙ্গে সঙ্গে সে ভুরু কৌচকাল, ঠোঁট বাঁকাল

‘তবে রে, শরতানের বাচ্চা। ছোট বলছি নইলে তোরই একদিন কি

আমারই একদিন।’ এই বলে কালো ঘোড়াদুটোর একটার পেটের নীচে যেখানে শিলে চমকছিল সেই জায়গাটা লক্ষ্য করে গভীর মনোযোগের সঙ্গে সপাং করে হাতের চাবুকের এক মোক্ষম ঘা বসিয়ে দিল

## চৌদ্দ

লেকটেন্যান্ট ইয়েভ্‌গেনি লিস্তনিৎস্কি আত্মমান রক্ষী-রেজিমেন্টে চাকরী করত। অফিসারদের এক ঘোড়দৌড়ে পড়ে গিয়ে বাঁ হাতটা কাঁধের কাছাকাছি জায়গায় সে ভেঙে ফেলেছিল। মিলিটারী হাসপাতালে কিছুদিন কাটানোর পর সে ছুটি নিরে মেরু মাসের জন্য এসেছে বাপের জমিদারী ইয়াগদনোয়েতে।

বুড়ো জেনারেল লিস্তনিৎস্কি বহুকাল হল বিপত্নীক। একাই থাকে ইয়াগদনোয়েতে। গত শতাব্দীর অষ্টম দশকে ওয়ারশর এক শহরতলিতে সে তার স্ত্রীকে হারায় কসাক জেনারেলকে লক্ষ্য করে বিপ্লবীরা গুলি ছুঁড়েছিল। কিন্তু গুলি এসে লাগল তার স্ত্রী আর কোচোয়ানের গায়। জেনারেলের গাড়িটা বহু জায়গায় কাঁধরা হয়ে গেলেও সে নিজে বেঁচে যায়। স্ত্রী রেখে গেল শিশুসন্তান ইয়েভ্‌গেনিকে। তখন তার বয়স দু’বছর। এই ঘটনার অনতিকাল পরেই জেনারেল সেনাবাহিনী থেকে অবসরগ্রহণ করে উঠে এলো ইয়াগদনোয়েতে (তার বত্রিশ হাজার বিঘা পরিমাণ ভূসম্পত্তি ছিল সারাতত প্রদেশে। ১৮১২ সালের যুদ্ধে\* অংশ গ্রহণের জন্য জেনারেলের প্রপিতামহ এই সম্পত্তির অধিকার পেয়েছিলেন) সেখানে কাটিতে লাগল তার কঠোর তপস্বী জীবন।

ইয়েভ্‌গেনি একটু বড় হলে সে তাকে পাঠিয়ে দিল ক্যাডেট কোর-এ,\*\* আর নিজে মনোযোগ দিল জমিদারী পরিচালনার কাজে। ভালো জাতের পোশু ভেড়ার বংশ বাড়িয়ে তুলল, রাজকীয় পশুপ্রজনন আশ্রয়াল থেকে জাত রেসের ঘোড়া কিনে দন অঞ্চলের বিখ্যাত প্রভালস্ক পশুপ্রজনন কেন্দ্র আর ইংলণ্ড থেকে আনা ভালো জাতের মাদী ঘোড়ার সঙ্গে মিশিয়ে শেষকালে নিজেই নতুন এক জাতের ঘোড়া উদ্ভাবন করে ফেলল। নিজের কেনা খাস জমিতে এবং কসাক

\* নেশাপলিয়ানের আক্রমণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। রুশ দেশের ইতিহাসে ১৮১২ সালের ‘সিভিল্লার যুদ্ধ’ নামে পরিচিত। অনুঃ

\*\* ক্যাডেট কোর জারের আমলে রাশিয়ার অভিজাত পরিবারের সন্তানদের জন্য আধ্যাত্মিক সামগ্রিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। অনুঃ

হিসাবে প্রাপ্য পত্তনি জমিতে সে খোড়ার পাল রাখতে শুরু করল, কসল ফলাতে লাগল অবশ্য মনিষজ্ঞন খাটিয়ে। শরতে আর শীতে বর্জাই কুকুর নিয়ে শিকারে যায়, মাঝে মাঝে একটানা কয়েক সপ্তাহ ‘সাদা কামরার’ খিল দিয়ে পড়ে থেকে মদ গেলে পাকস্থলীর একটা উৎকট অসুখে সে ভোগে, তাই শক্ত কোন খাবার চিবিয়ে গিলে খেতে ডাক্তারের একদম বারণ। খাবার চিবিয়ে সে তার রসটুকু খায়। ভেন্‌ইয়ামিন নামে চাষী পরিবারের এক অল্পবয়সী ছেলে তার খাস চাকর। প্রভুর খাওয়ার সময় সে নিয়মিত ভাবে এক পাশ থেকে হাত বাড়িয়ে একটা বুপোর রেকাব ধরে রাখে। প্রভু সেই রেকাবের ওপর থু থু করে খাবারের ছিবড়ে ফেলে।

ভেন্‌ইয়ামিন ছোকরাটা আকাট ধরনের। গায়ের রঙ রোদে পোড়া। তামাটে তার গোল মাথার ওপর যা শোভাবর্ধন করত তাকে চুল না বলে কালো মধ্যমজাতীয় জিনিস কলা যেতে পারে ছ'বছর ধরে নিশ্চিন্তির কাছে কাজ করেছে। প্রথম প্রথম যখন জেনারেলের কাছে বুপোর রেকাব নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হত, তখন বুড়োকে দাঁতে পিষে থেতো করা ধূসর রঙের ছিবড়েগুলো উগড়ে ফেলতে দেখে তার গা বমি বমি করত, কিন্তু পরে সহ্য হয়ে যায় বছর খানেক বাদে একদিন কর্তাকে সাদা টার্কির মাংসের কাটলেট চিবিয়ে ছিবড়ে ফেলে দিতে দেখে সে মনে মনে ডাবল ‘ইস, কী বাজে খরচ দেখ’ লোকটার খাবার ক্ষমতা নেই, এদিকে আমার পেটের ভেতরে নাড়িঁড়িঁ হাঁড়ার উপক্রম এ ত আর নয় না। যা থাকে কপালে ওর শেষ হলে আমিই খেয়ে নেব। কী আর হবে?’ খেয়ে সেখল, খাওয়ার পর কোন অসুখবিসুখ হল না। এর পর থেকে প্রভুর খাওয়া হয়ে গেলে সে ছিবড়েসুদ্ধ রেকাবটা পাশের ঘরে নিয়ে যেত, ডাক্তাররা প্রভুকে যে জিনিস গিলতে বারণ করে দিয়েছে (ভৃত্য) সেগুলো গবগব করে গিলতে শুরু করে দিল এই কারণে। অথবা অন্য যে কোন কারণেই হোক, সে স্থূলকার্য ও তৈলচিকণ হয়ে উঠতে লাগল, তার ঘাড়ে অসংখ্য থাক থাক ভাঁজ পড়তে লাগল।

ভেন্‌ইয়ামিন ছাড়া বাড়ির চাকরবাকর বলতে আর যারা যারা সেখানে থাকে তারা হল লুকেরিয়া নামে এক নৌবুনি, বুড়ো ঘুঘুড়ে সহিস সালকা আর রাখাল তিখোন। তাদের সঙ্গে এখন এসে জুটল কোচোয়ানের চাকরীতে সদ্য বহাল গ্রিগোরি আর আন্নিয়া মুখে বসন্তের দাগ, থলথলে, পাহা-ভারী লুকেরিয়াকে দেখতে অনেকটা হলুদ একতাল কাঁচা ময়দার মতো। প্রথম দিন থেকেই সে আন্নিয়াকে উনুনের ধারে কাছে খেঁষতে দিল না।

‘গরমকালে কপ্তা যখন মূনিষ ভাড়া নেবেন তখন রান্না করবি এখনকার মতো আমি নিজেই চালিয়ে নিতে পারব।’

আগ্নিনিয়ার কাজ হল সপ্তাহে তিন বার করে ঘরের মেঝে ধোওয়া-পাকল করা, হাঁসমুরগীদের খাওয়ানো, হাঁসমুরগীদের উঠোন পরিষ্কার রাখা আগ্নিনিয়া মনপ্রাণ ঢেলে কাজ করতে থাকে, চেষ্টা করতে থাকে সকলের মন রেখে চলার এমন কি লুকেরিয়ারও। গ্রিগোরির বেশির ভাগ সময় কাটে সহিস সান্ধকার সঙ্গে, কাঠের গুড়ি কেটে তৈরি প্রশস্ত আস্তাবলটায় বুড়ো সহিসের এখন ম্রাধাভর্তি পাকচুল, কিন্তু তার ওই ডাক নাম 'সান্ধকা' আর ঘুচল না কেউ তাকে তার পুরো নাম ধরে ডেকে প্রথায় দেয় নি আর তার পদবী? বুড়ো জিত্তিনিথ্দের কাছে সান্ধকা আত্ম বিশ বছরেরও বেশি কাল হল থাকলে কী হবে সেও তার পদবী জানে কিনা সন্দেহ, বয়সকালে সান্ধকা কোচোরানের কাজ করেছে। কিন্তু এখন জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে অপটু হয়ে পড়ার, দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে এসেছে, তাই সে আস্তাবলে ঘোড়া দেখাশোনার কাজ করেছে, বেটেখাটো গড়নের মানুষ, মাড়ি লোম চুল সব সাদা, তার ওপর সবুজ আঁকা (এমন কি হাতে যে লোম গজিয়েছে তাও সাদা) নাকটা খ্যাবড়ানো, ছোটবেলাতেই লাঠির মায়ে খেবড়ে গেছে। বুড়োর মুখে সর্বক্ষণ লেগে আছে শিশুর মতো সরল, মধুর হাসি, লাল লাল পাতার ডাঁজে ঢাকা সরল চোখদুটি আশপাশের সকলের দিকে মিটিমিটিয়ে আকার ওর এই দেবসুন্দ মুখের শ্রী নষ্ট করে দিয়েছে ওর হাস্যকর রকমের খ্যাবড়া নাক, সেই সঙ্গে নীচের দিকে ঝুলে পড়া কাটা ঠোঁটটা। বুশ সৈন্যদলে চাকরী করার সময় (বগুচারের ইউক্রেনীয়দের মধ্যে জন্ম হলেও সান্ধকা আসলে ছিল রুশী, অতএব একজন 'মস্কাল'\*) একবার সে মাতাল অবস্থায় ডুল করে সাদা ভোদকার বদলে নাইট্রিক এসিড মেশানো একটা তরল পদার্থের খানিকটা খেয়ে ফেলে। তরল আগুনের ধারার সংস্পর্শে তার নীচের ঠোঁট ধুতনির সঙ্গে সেলাই হয়ে যায় ওই তরল ধারা যেখান দিবে গড়িয়ে পড়েছে সেখানে রেখে গেছে একটা কৌতুকবহ তেরছা গোলাপী ক্ষতচিহ্ন সেটার ওপরে কোন চুল গজায় না। দেখে মনে হয় যেন কোন অজ্ঞাতনামা জন্তু সান্ধকার মাড়ি চেটে দিয়েছে, সেখানে রেখে গেছে তার সুস্বাদু খবখবে জিত বুলাবোর চিহ্ন সান্ধকা প্রায়ই ভোদকা খেয়ে মাতামাতি করে। সেই সব মুহূর্তে সে উঠানে এমন ভাবে ঘুরে বেড়ায় যেন সে-ই বাড়ির কর্তা। প্রভুর শোবার ঘরের জানলার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ঠুকতে থাকে, চালাক চালাক ভাব করে নিজের মজার নাকের সামনে আঙুল নাচাতে নাচাতে বৃক্ষস্বরে হাঁকডাক শুরু করে

\* ইউক্রেনিয়া ও বেলোরুশিয়ার স্লোকেরা এককালে রুশীদের, মস্কো সাম্রাজ্যের প্রতিনিধিদের এবং বুশ সৈন্যদেরও এই আখ্যায় অভিহিত করত সর্ধীর্ণ প্রাদেশিকতা এর ভিত্তি অনুঃ

‘মিকলাই লেব্লেইচ। অ মিকলাই লেব্লেইচ।’

বুড়ো মনিব সেই সময় শোবার ঘরে থাকলে জানলার ধারে এগিয়ে এসে বাজখাঁই গলায় ধমক দিয়ে ওঠে

‘ওরে ব্যাটা হারামজাদা। আবার গিলেছিস?’

সাম্পকা কোমর থেকে বসে-পড়া প্যান্টলুন টেনে তুলতে থাকে চোখ টেপে, বদমাযশি করে হাসে। কৌচকানো বাঁ চোখ থেকে শূন্য করে ঠোঁটের ডান কোনা থেকে গোলাপী রঙের যে কাটা দাগটা চলে গেছে সেই জায়গাটা পর্যন্ত তার সারা মুখ জুড়ে তেরহা হয়ে হাসি নাচতে থাকে। হাসিটা অমন আড়াআড়ি কাটা হলে কী হবে, মধুর

‘মিকলাই লেব্লেইচ, হুজুর, তোমাকে আমি জ্ঞ-জ্ঞা-নি’ এই বলে সাম্পকা তার নোংরা শীর্ণ আঙুল বাড়ান করে নড়িয়ে শাসায় আর নাচতে থাকে।

‘যা, ঘুমো গে,’ তামাকের ধোঁয়ায় হলদেটে পাঁচটা আঙুলের সবগুলো জড় করে ঝোলা গৌফে চাড়া দিতে দিতে জানলা থেকে হেসে আপসের সুরে কঠা বলে।

কোন শালা শয়তানের সাথি সাম্পকাকে ঠেকায়?’ সাম্পকা হাসতে হাসতে বাগানের বেড়ার দিকে এগিয়ে যায় ‘মিকলাই লেব্লেইচ, তুমি তুমি দেখছি আমারই মতো। আমি আর তুমি আমরা হলেম গিয়ে জল আর মাছ। মাছেব আছে জলের তলা, আর আমাদের আছে গামের গোলা। আমরা যা বড়লোক, ওঃ এই এত বড় বড়লোক’ বলতে বলতে সাম্পকা শরীর বাঁকিয়ে চুরিয়ে দু’হাত অনেকখানি ছড়িয়ে দেবার ‘আমাদের সবাই চেনে। এই দন এল্যাকার সবাই। আমরা’ সাম্পকার কণ্ঠস্বরে বিষণ্ণতা ফুটে ওঠে। সে হুজুর দিয়ে বলে ওঠে, ‘আমরা ধর্মাবতার, আমি আর তুমি সব ব্যাপারেই ভালো, কেবল আমাদের নাকদুটো একেবারে জঘন্য, এই যা।’

‘বলি ব্যাপারটা কী?’ কঠা কৌতূহল প্রকাশ করে হাসতে হাসতে তার মুখ নীলবর্ণ ধারণ করে তার গৌফজোড়া আর ষাট ষাট জুলফির চুলগুলো সেই সঙ্গে নড়তে থাকে।

‘তোদকার জন্যে আর কি,’ গোলাপী রঙের কাটা দাগের ঝাল বয়ে লাল গড়াতে থাকার জিভ দিয়ে সুড়ুং করে চেটে নিয়ে ঘন ঘন চোখ পিটপিট করতে করতে স্পষ্ট উচ্চারণ করে বলে সাম্পকা। ‘তুমি বাপু মিকলাই লেব্লেইচ, মদ খেয়ে না। খেলে আমাদের দু’জনারই কিছু বারোটা বেজে যাবে সব উড়িয়ে দেব আমরা

‘এবারে যা দেখি, এই নে খোঁয়ারি ভাঙার জন্যে আরও কিছুটা থা গে যা

এই বলে কঠা জানলা দিয়ে একটা সিকি ছুড়ে দেয়। সিকিটা মাটিতে

পড়তে না পড়তে সাশুকা লুফে নিয়ে টুপির ভাঁজের নীচে লুকিয়ে ফেলে

‘আজ্ঞা জেনারেল, চলি তাহলে’ যাওয়ার সময় সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে

‘এই ঘোড়াগুলোকে জল খাইরেহিস ত?’ আগে থাকতেই কিছুর একটা প্রত্যাশা করে মৃদু হাসে কর্তা

‘তবে রে হতছাড়া!’ শালা শুমোরের বাচ্চা!’ সাশুকা লাল হয়ে ওঠে, চিৎকারের চোটে তার গলাই ভেঙে যায়। রাগে অন্ধ হয়ে সে ঠকঠক করে কাঁপতে থাকে। ‘সাশুকা কিনা ঘোড়াকে জল খাওয়াতে ভুলে যাবে? অ্যা? আরে মরতে মরতেও ত আমি হামাগুড়ি দিয়ে উঠে এসে বলতি করে জল তুলে একেক কৈড়ে করে ওদের দিতে ভুলব না, আর উনি কিনা ভাবেন যন্ত সব।’

মিছিমিছি এই ভাবে অপমানিত হওয়ায় বিস্ত্রি করতে করতে, হাতের মুঠো পাকিয়ে শাসাতে শাসাতে সাশুকা ওখান থেকে চলে যায়। এই মাতলামি, প্রভুর সঙ্গে তার এই অন্তরঙ্গতা সবচেয়েই সে বেশ পাব পেয়ে যায়, পার পেয়ে যায় আরও এই কারণে যে সহিস হিসেবে সাশুকার জায়গা নিতে পারে এমন কেউ নেই কী শীত কী গ্রীষ্ম আস্তাবলের একটা খালি খোঁয়াড়ে সে ঘুমোয় ঘোড়ার পরিচর্যা সাশুকার চেয়ে ভালো আর কেউ করতে পারে না সে ঘোড়ার সহিস, আবার ঘোড়ার বদনিও সে-ই। বসন্তকালে, মে মাসে যখন ফুল লতাপাতা ফোটে সেই সময় সে স্তোপের প্রান্তরে গিয়ে নানারকম গাছগাছড়া বোগাড় করে আনে, গভীর উপত্যকার ভেতরে, লম্বা ভিজে খাতের ভেতরে ঘুরে ঘুরে কবিরাজী শেকড়বাকড় তোলে আস্তাবলের দেয়ালে উঁচুতে ঝোলে গোছা গোছা নানা রকমের শুকনো গাছগাছড়া নানা রকমের পাতা তাদের ফুসফুসের কষ্ট সারানোর জন্য উগ্রগন্ধী ইয়ারভিক লতা, সাপের কামড়ের ওষুধ-বুনো রসুন, খুর নষ্ট হয়ে গেলে তার জন্য এক ধরনের কালো পাতা, ক্রান্তি ও অবসাদ দূর করার জন্য জ্বলা জায়গায় উইল্যের গোড়া থেকে সংগ্রহ করা এক ধরনের ছোট ছোট সাদা ঘাস, এছাড়াও ঘোড়াদের অসুখ বিসুখ ও আঘাত সারিয়ে তোলার আরও বহু না-জানা গাছগাছড়া

আস্তাবলের যে খোঁয়াড়টার ভেতরে সাশুকা ঘুমোয় সেখানে শীতে ও গ্রীষ্মে সব সময় একটা মৃদু সুগন্ধ যেন মাকড়সার জালের মতো ঝুলতে থাকে, গলার ভেতরে যেন একটা চটচটে ভাব জাগিয়ে তোলে। ঋতুবিচালি ঠেসে ঠেসে তন্তুপোষের ওপবটা লোহার মতো শক্ত করা, তার ওপরে ঘোড়ার গায়ের একটা মোটা চামর আর আগাগোড়া ঘোড়ার ঘামের বোটিকা গন্ধমাখা মোটা বনাত কাপড়ের জাবুন কোর্তা এই হল সাশুকার বিছানা। এই জাবুন কোর্তা আর ভেড়ার চামড়ার একটা খাটো কোট ছাড়া সম্পত্তি বলতে আর কিছু নেই তার।



পূরু চৌটি, দশাসই শরীর, ভুলবুদ্ধি কসাক তিখোন থাকে লুকেরিয়ার সঙ্গে।  
সাম্বাককে সে মনে মনে দ্বিষী করে, অথচ তার এই দ্বিষীর কোন কারণ নেই।  
মাসে একবার সে সাম্বাককে তার তেলচিটে জামার বোতাম ধরে হিড়হিড় করে  
টানতে টানতে নিয়ে যায় চাকার পেছনে বলে

‘এই বুড়ো দাদু তুমি আমার মাগের ওপর নজর দিয়েছ।’

কথাটা কী জান ‘সাম্বাক অর্থপূর্ণ ভঙ্গিতে চোখ টেপে।

‘ছেড়ে দাও বলছি বুড়ো!’ তিখোন মিনতি করে।

‘মাদের মুখে ওই বসন্তের দাগ-টাগ আছে তাদের আমার বেশ পছন্দ, ভাই  
পাঁচট আমাকে না দিলেও চলবে, কিন্তু মুখে বসন্তের দাগওয়ালা মেয়ে-আহা,  
একবার বার করে এনে দাওই না যত বেশি দাগ হবে হারামজাদীরা শাপী তত  
বেশি ভালোবাসবে আমাদের এই পুরুষ জাতটাকে।’

এই বয়সে তোমার লজ্জা হওয়া উচিত বুড়ো দাদু, অমন চিন্তা মনে ঠাই  
দেওয়া পাপ ইস্ তুমি কিনা আবার বাদি, ঘোড়ার চিকিচ্ছে কর, মস্তুর তস্তুর  
জান

‘আমি সব রকম রোগের চিকিচ্ছে জানি,’ সাম্বাক জেসের সুরে বলে

‘আবারও বলছি বুড়ো, ছেড়ে দাও ওসব ঠিক নয়।’

‘তোমার লুকেরিয়াকে আমি ভাই বাগাবই। ওই হারামজাদীর আশা ছাড়।  
তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেব! আহা, যেন কিসমিস দেওয়া পিটে। তবে  
কিসমিসগুলো কে যেন খুঁটে খুঁটে তুলে নিয়েছে, এই যা। তাতেই ত একটু  
দাগড়া দাগড়া। এমনটিই আমার পছন্দ।’

‘আচ্ছা নাও, এই ধর। কিন্তু ওই কথা, আমার পথের কাঁটা যদি হও,  
তাহলে খুন করে কেলব,’ এই বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিখোন তার তামাকের থলে  
থেকে কিছু তামার পয়সা বার করে ওকে দেয়

এই ভাবেই চলতে থাকে মাসের পর মাস

মানুষের চেতনার ওপর ছাতলা ধরিয়ে দিয়ে বিমব্রিম তস্তুর ঘোরে কাঁটতে  
থাকে ইয়াগদনোয়ের জীবন মানুষজন আর গাড়িঘোড়া চলাচলের সদর রাস্তা  
থেকে দূরে নির্জন এক উপত্যকার মধ্যে এই জমিদারিটি শরৎকাল থেকেই  
জেলা সদর আর আশেপাশের সমস্ত গ্রামের সঙ্গে তার সমস্ত যোগাযোগ বন্ধ  
হয়ে যায় এবানকার ‘কালো বনে’ নেকড়েরা শীত কাটায়। অন্তরীপের মতো  
আকার নিয়ে স্কীভকায় বাসিল যেই টিবিটা বাড়ির পেছনকার ঝোপজঙ্গলের মধ্যে  
নেমে গেছে শীতের রাতে সেটার ওপর দলে দলে নেকড়েবা বেরিয়ে আসে।  
বিকট চিংকারে সন্ত্রস্ত করে তোলে ঘোড়াগুলোকে। তিখোন বন্দুকের আওয়াজ

করে নেকড়ের পালকে ভয় দেখানোর জন্য কর্তার দোনলা বন্দুকটা নিয়ে বাড়ির পেছনের অঙ্গলে চলে যায়। এদিকে উনুনের গায়ের মতো বিশাল চণ্ডা পাছায় একটা মোটা খসখসে কাপড় জড়িয়ে লুকেরিয়া বসে বসে বসন্তের দাগে ভর্তি গালের পুরু চর্বির ভাঁজ ঠেলে দু'চোখ মেলে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে অঙ্ককারের মধ্যে বুদ্ধবাসে অপেক্ষা করে গুলির আওয়াজ শোনার জন্য। এই সময় কদাকার, টেকোমাথা তিখোন তার কল্পনায় বুপান্তরিত হয়ে যায় এক দুসোহসী কন্দর্পকান্তি যুগাপুত্রে। আর তারপর একসময় যখন চাকরবাকরদের মহলের দরজা দড়াম করে খুলে যেতে ভেতরে ঠাণ্ডায় ধুমায়িত তাপ ঢুকে পড়ে এবং সেই সঙ্গে তিখোন এসে ভেতরে ঢোকে তখন লুকেরিয়া সরে গিয়ে খাটে জায়গা করে দেয়, অশ্রুটি গুঞ্জন তুলে তার জীবনসঙ্গীর শীতে-জমা শরীরটাকে মধুর আলিসনে বেঁধে ফেলে।

গ্রীষ্মকালে ইয়াগদনোয়ে সন্ধ্যারাত পর্যন্ত মুনিষজনের হাঁকডাকে সরগরম থাকে মনিব প্রায় সাড়ে তিনশ' বিঘা মতন নানা রকম ফসলের ধাঁজ বোনে। সেই ফসল তোলার জন্য মুনিব খাটাতে হয় গ্রীষ্মকালে মাঝে মধ্যে ইয়েভগেনি জমিদারিতে আসে, তখন সে বাগানে, বাড়ির পেছনের বনজঙ্গলে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, মনে মনে ক্রান্তি বোধ করে সারাটা সকাল ছিপ নিয়ে পুকুরের পাড়ে বসে থাকে ইয়েভগেনি মাঝামাঝি গড়নের, চণ্ডা বুক চুল ডান দিকে পাট করে আঁচড়ে মাথার সামনে সে কসাক কায়দায় ঝুটি রাখে। তার অফিসারের পোশাকটা শরীরে টানটান হয়ে থাকে

আগ্নিনিয়ার সঙ্গে লিভনিৎস্কির জমিদারিতে কাজে বহাল হওয়ার প্রথম কয়েকদিনের মধ্যেই ছোট কর্তার কাছে গ্রিগোরি ঘন ঘন ডাক পড়ে। ভেন্‌ইয়ামিন চাকরদের মহলে এসে তার মখমলের মতো চুলে ঢাকা মাথাটা কাত করে মৃদু হেসে বলে

‘যাও গ্রিগোরি, ছোট কর্তা ডেকে পাঠিয়েছেন।’

গ্রিগোরি যত্নে ঢুকে দরজার একপাশে দাঁড়িয়ে রইল ইয়েভগেনি ফাঁক ফাঁক চণ্ডা দাঁতের পাটি বার কবে হেসে হাতের ইশারায় একটা চেয়ার দেখিয়ে দিল।

‘বোস।’

গ্রিগোরি চেয়ারের এক ধারে জড়সড় হয়ে বসল

‘আমাদের ঘোড়াগুলো তোমার কেমন লাগছে?’

‘ঘোড়াগুলো ভালো আর ছাইরঙাটা ত রীতিমতো ভালো।’

ওটাকে খুব করে হাঁকাও তবে হ্যাঁ, দেখো, হুডহুড করে হাঁকিও না ঘেন।’

‘হ্যাঁ সাশকা দাদু আমাকে বলেছে।’

‘আর তেজীটা কেমন?’

‘শাটকিলে রঙের ঘোড়ার কথা বলছেন ত? ওর দাম ঠিক করে বলা মুশকিল এখন ওর খুর দোফাঁক হয়ে গেছে, নাল লাগানো দরকার’

ছোট কর্জা তার ছাইরঙা চোখ কঁচকে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি ছেনে জিজ্ঞেস করল  
‘তোমাকে যে মাসে কাম্পে যেতে হবে তাই না?’

‘আজ্ঞে হ্যাঁ’

‘আমি আভামানকে বলে দেব যাতে তোমাকে যেতে না হয়।’

‘আপনার অসীম দয়া।’

দু’জনেই চূপ উদ্বিগ্ন কলারের বোতাম খুলে লেফটেন্যান্ট মেয়েলি ধরনের সাদা বুকাটার হাত বুলাল

‘আচ্ছা তোমার কি ভয় হয় না যে আঞ্জিনিয়ার স্বামী আঞ্জিনিয়ারকে তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারে?’

‘আঞ্জিনিয়ার স্বামী ওকে ত্যাগ করেছে, আর নেবে না ওকে।’

‘কে বলেছে তোমাকে?’

সেদিন নালের কাঁটা আনতে জেলা সদরে গিয়েছিলেন সেখানে আমাদের গাঁয়ের একজনের সঙ্গে দেখা। বলল ত্তেপান নাকি বেহন্দের মতো মদ গিলছে বলছে, ‘আঞ্জিনিয়ার জন্যে আমি কানাকড়ি দিতেও রাজী নই। মরুক গো ইচ্ছে করলে ওর চেয়ে আরও সরেস কাউকে আমি পেতে পারি।’

‘আঞ্জিনিয়া খাসা মেয়ে,’ খ্রিগোরির চোখের খানিকটা ওপরের দিকে অনমনস্ক ভাবে তাকিয়ে লেফটেন্যান্ট বলল। হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তার মুখ।

‘মেয়ে যশ নয়’ খ্রিগোরি সাম দিল সঙ্গে সঙ্গে ভুরু কৌচকাল

ইয়েভগেনির ছুটির মেয়াদ শেষ হয়ে আসছে। এখন সে স্বচ্ছন্দে, ব্যাণ্ডেজ ছাড়া হাত নাড়াচাড়া করতে পারে কনুইয়ের কাছে ডাঁড় না করে হাত ওঠাতে পারে

ছুটির শেষ কয়দিন সে ঘন ঘন চাকরমহলে খ্রিগোরির ঘরে আসে, সেখানে বসে বসে সময় কাটিয়ে দেয় ঘরের ছাতলা পড়া নোংরা দেয়াল আঞ্জিনিয়ার ঘসে ঘসে পরিষ্কার করেছে, চুনকাম করেছে, জানলার টোকাটের তক্তাগুলো ধুয়ে মুছে সাফ করেছে, আশা দিয়ে ঘাস মেঝে ঝকঝকে করেছে। খুশির আমেজ মাখা খালি ঘরখানা এমন আরাগের গন্ধে ভরপুর হয়ে উঠেছে, যা কেবল একজন মেয়েমানুষের উপস্থিতির ফলেই সম্ভব। ছোট উনুনটা পরম নিখাস ফেলেছে লেফটেন্যান্ট নীল বনাতের রমানভ-কোটখানা হাতা না গলিয়ে দুই কাঁধের ওপর ফেলে চলে চাকরদের মহলে বেছে বেছে ঠিক সেই সব মুহূর্তে যায় যখন খ্রিগোরি ঘোড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকে। প্রথম প্রথম সে আসত রান্নাঘরে, লুকোরিয়ার

সঙ্গে খানিকটা হাসিঠাট্টা করত, তারপর ঘুরে গিয়ে ঢুকে পড়ত পাশের ঘরে সেখানে মাটিতে গর্ত করা উনুনের ধারে একটা টুলের ওপর বসে পড়ে পিঠটা অনেকখানি বাঁকিয়ে হাসি-হাসি মুখে নির্লঙ্ঘের মতো দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে আঞ্জিনিয়ার দিকে আঞ্জিনিয়া তার উপস্থিতিতে বিব্রত বোধ করে, মোজা বোনার জন্য ঘর তুলতে গিয়ে তার হাতের কাঁটাগুলো কাঁপতে থাকে

‘কেমন আছ গো আঞ্জিনিয়া?’ সিগারেটের নীল ধোঁয়ায় ঘর ভবিয়ে দিয়ে লেফটেন্যান্ট জিজ্ঞাস করে।

‘আম্মে, ভালোই আছি, আপনার দয়ায়’

আঞ্জিনিয়া চোখ তুলে তাকায় লেফটেন্যান্টের চোখে চোখ পড়ে যেতে তার স্বচ্ছ দৃষ্টির মধ্যে দেখতে পায় কামনার নীরব অভিব্যক্তি। সঙ্গে সঙ্গে সে রাঙা হয়ে ওঠে ইয়েভগেনি নিকলয়েভিচের উজ্জ্বল চোখের নয় দৃষ্টি তার বিস্তী লাগে। সে মনে মনে বিরক্ত হয় আঞ্জিনিয়া ইয়েভগেনির আক্কেবাজে সমস্ত প্রবলের এলোমেলো উত্তর দিতে থাকে, কী ভাবে তাড়াতাড়ি বাইরে যাওয়া যায় তার অজুহাত খুঁজতে থাকে।

‘যাই, হাঁসগুলোকে দানা দিয়ে আসি’

‘আরে একটু বসো অত তাড়ার কী আছে?’ লেফটেন্যান্ট হেসে বলে তার টনটন সঁটা চুস্ত প্যাণ্টের ভেতরে পাদুটো ঠকঠক কবে কাঁপতে থাকে

অনেকক্ষণ ধরে আঞ্জিনিয়াকে তার অতীত জীবন সম্পর্কে জিজ্ঞেসবাদ করে চলে, বাপের মতোই চাপা খাদের গলায় সুর ভাঁজে, করনার জ্বলবে মতো স্বচ্ছ চোখের দৃষ্টি মেলে অশ্লীল নিবেদন জানায়

গ্রিগোরি হয়ত ততক্ষণে কাজকর্ম সেরে চাকরদের মহলে ফিরে এসেছে এই কিছুক্ষণ আগেও লেফটেন্যান্টের চোখে যে লালসার আগুন জ্বলে উঠেছিল গ্রিগোরিকে দেখামাত্র সে তা নিভিয়ে ফেলে গ্রিগোরিকে একটি সিগারেট দিয়ে আপ্যায়িত করে ঘর ছেড়ে চলে যায়।

‘কী কবতে এসেছিল?’ আঞ্জিনিয়াব দিকে না তাকিয়ে চাপাশব্দে জিজ্ঞাস করে গ্রিগোরি।

‘আমি তার কী জানি?’ লেফটেন্যান্টের দৃষ্টি মনে পড়ে যেতেই সে জোর করে হাসে এসে বসল এই এখানে, দেখ দেখ গ্রিগো, ঠিক এমনি করে’ লেফটেন্যান্ট কেমন করে ঝুঁজো হয়ে বসে ছিল দেখিয়ে সে বলে, ‘যসে থাকল ত থাকলই এদিকে আমার প্রাণ যায় আর কি আর হাঁটুটা, মা গো, কী বিস্তী ভাবে যে খাড়া হয়ে রইল’

‘ওর সঙ্গে তুমিও বোধহয় একটু আধটু বং ঢং করলে?’ খ্রিগোরি রাগে চোখ কৌচকাল

‘আমার ভারী ব্যয়ে গেছে’

‘দেখো কিছু, নইলে একদিন ওকে দেউড়ি থেকে লাথি মেরে ফেলে দেব।’

অগ্নিনিয়া খ্রিগোরির দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসে, সে বুঝতে পারে না এটা খ্রিগোরির মনের কথা নাকি সে ঠাট্টা করছে

### অন্যদিক

মাংস ব্রত পালনের\* চতুর্থ সপ্তাহেই লীডের আর তেমন প্রকোপ রইল না। দনের ধারে ধারে কেউ যেন বরফ-গলা জলের আলব বিছিয়ে দিয়েছে গলা বরফে দনের জমাট বুকটা সামান্য স্ফীত আর ঝাঁঝরা-ঝাঁঝরা দেখাচ্ছে, ধূসর বর্ণ ধারণ করেছে সন্ধ্যাবেলায় পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে বাতাসের চাপা গজ্জন ভেসে আসে এখানকার বুড়োদের মতে, হিম পড়বে এ হল তারই ইঙ্গিত অথচ আসলে দেখা যাচ্ছে আরও বেশি করে বরফ গলতে শুরু করেছে সকালবেলায় হালকা হিম পড়ে, তাতে বাতাসে মচমচে গুঁড়ো বরফের নুঙ্গু টুংটাং বাজনা বাজে, কিন্তু দুপুর হতে না হতেই মাটি যেন সূস্থ হয়ে উঠতে থাকে, বসন্তের স্রোতে বরফে জমাট চেরিগাছের বাকল আর পচা খড়ের গন্ধে ভরে ওঠে।

মিরোন খ্রিগোরিয়েভিচ ক্ষেতে লাঙল দেওয়ার জন্য ধীরেসুস্থে তৈরি হতে থাকে দিন বড় হওয়ার সুযোগে সে এখন সারাদিন চালাঘরের নীচে এটা ওটা কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে, মইয়ের ফলাগুলো চেষ্টাচুলে ঠিক করে। হেট তাকে দুটো নতুন গাড়ির কাঠামো তৈরির কাজে সাহায্য করছে পরবের চতুর্থ সপ্তাহে ধর্মীয় অনুষ্ঠান অনুযায়ী খ্রিশাকা দাদু সান্ত্বিক আহায়েব ব্রত পালন করে ঠাণ্ডায় প্রায় কালো হয়ে গিয়ে গির্জা থেকে বাড়ি ফিরে এসে সে তার ছেলের বৌয়ের কাছে অনুযোগ করে ‘পুতুতঠাকুর কোন কাজের নয় ঈঃ, পুজো করার কী ছিри! যেন ডিমের বোঝা নিয়ে ডিমওয়ালা টিকিস টিকিস করে গাড়ি চালাচ্ছে কী অবস্থা।’

‘আপনি বাবা ইস্টারের সপ্তাহে ব্রত রাখলেই ত পারতেন ততদিনে গরমও পড়ে যেত আরেকটু’

‘তুমি বরং নাতাশটাকে একটু ডেকে দাও ত আমাকে আরও মোটা দেখে

\* ইস্টারের অব্যবহিত পূর্ববর্তী চল্লিশ দিনব্যাপী খ্রীষ্টীয় পবনবিশেষ অনুঃ

মোজা বুনে দিক। এ যা মোজা, এতে পায়ের গোড়ালি খালি থেকে যায় -  
নেকড়ে যে নেকড়ে সেও এ মোজা পরলে ঠাণ্ডায় জমে সিটকি মেরে যাবে।

নাতালিয়া বাপের বাড়িতে দিন কাটাচ্ছে 'কণিকের অতিথি' হয়ে। তার দৃঢ়  
বিশ্বাস গ্রিগোরি তার কাছে ফিরে আসবে। মনেপ্রাণে সে প্রতীক্ষা করে আছে  
গ্রিগোরির জন্য, যুক্তিতর্কের শাস্ত্র সংঘাত গুঞ্জন সে শুনতে চাইছে না যে  
অপমানের বোঝা তার প্রাণ্য নয় অপ্রত্যাশিত ভাবে তারই মীচে দলিত হওয়ার  
ভীষণ জ্বালায় অস্থির হয়ে সে রাতের পর রাত কাটায়, ক্লান্তিতে অবসাদে ভেঙে  
পড়ে। সেই সঙ্গে এসে জুটেছে আরেক জ্বালা। একটা হিমশীতল আতঙ্ক যেন  
তাকে ঐশ্বর্যের শেষ সীমায় ঠেলে নিয়ে চলেছে বিয়ের আগে বাড়িতে তার যে  
ঘরটা ছিল এখন সেই ঘরে গুলিরোধা পাখির মতো ছটফট করতে করতে সে  
রাত কাটায়। বাপের বাড়ি কিরে আসার একেবারে গোড়া থেকেই দাদা মিত্কা  
যেন তাকে অন্য চোখে দেখতে শুরু করেছে এক দিন ত বাইরের বারান্দায়  
তাকে পেয়ে সরাসরি জিজ্ঞাস করেই বসল

'কি রে, গ্রিগোরি জনো মন খারাপ লাগে বুঝি?'

'তোমার ভাতে কী?'

'তোমার মনের কষ্টটা দূর করতে চাই আর কি '

মিত্কাব চোখের দিকে তাকাতাই নাতালিয়া যা অনুমান করতে পারল ভাতে  
আতঙ্কে শিউরে উঠল। মিত্কার বেড়ালের মতো সবুজ চোখদুটো খেলা করছে,  
ভেল চকচকে সরু কোটবের মাঝখান থেকে অঙ্কুরের মধ্যে ঝিলিক দিচ্ছে  
চোখের তারাদুটো। নাতালিয়া দড়াম করে মরজা বন্ধ করে দিয়ে গ্রিগোরি দাদুর  
ঘরে ছুটে গেল সেখানে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনতে  
লাগল তার নিজের ভীতসন্ত্রস্ত বুকের ধুকপুকানি এই ঘটনার দু'দিন পরে মিত্কা  
উঠানে তাকে ধরল গোবুর পালের জন্য মিত্কা খড় বিচুলি ছুঁড়ে ছুঁড়ে গাদা  
করে রাখছিল তার সোজা সোজা চুল আর পশমের টুপি থেকে ঝুলছিল কটি  
ঘাসের সবুজ ডাঁটা। কয়েকটা কুকুর এসে শূয়ারগুলোর খাবারের চাড়িতে মুখ  
দিয়ে ঝামেলা করতে থাকায় নাতালিয়া তাদের খেদানোর চেষ্টা করছিল

'অত বড় মুখ করে কাজ নেই নাতালিয়া।'

'আমি কিছু চেষ্টামেচি করে বাবাকে ডাকব বলে দিচ্ছি ' নাতালিয়া দু'হাত  
তুলে মিত্কার কাছ থেকে নিজেকে আড়াল করতে করতে চেষ্টা করে উঠল।

'ধস্তোর, বুকিসুজি লোপ পেল দেখছি।'

'যা যা বলছি, হারামজাদা।'

'আরে, অমন চিল্লাজিস কেন?'

‘যাও দাদা! একুনি বাবাকে গিয়ে সব বলে দেব। অমন চোখে কী বলে তুমি আমার দিকে তাকাতে পার? উঃ কি নিলাজ, বেহায়া!’ আশ্চর্য, ধরনী এখনও দ্বিধা হচ্ছে না।’

‘দ্বিধা ত হচ্ছেই না, দিবি ধরে রেখেছে আমাকে!’ এই বলে মিড়কা তার নিজের কথার সমর্থনে কোমরের দু’পাশে হাত ঠেকিয়ে মাটিতে জুতো ঝুঁকল

‘স্ববরদার, আমার কাছে এসো না বলছি।’

‘আরে একুনি কি আর আসছি, রাতের বেলায় আসব মাইরি বলছি, আসব।’

নাতালিয়া কাঁপতে কাঁপতে উঠেন ছেড়ে পালাল সেদিন সন্ধ্যাবেলায় সে নিজের ঘরে তোরঙ্গের ওপর বিছানা পাতল। ছোট বোনটাকে শোয়াল নিজের কাছে। সারা রাত সে এপাশ ওপাশ করতে লাগল, জ্বলন্ত চোখে অন্ধকার ঘুঁড়ে ফেলার চেষ্টা করতে লাগল অপেক্ষা করে রইল কখন পায়ের খস্‌খস্‌ আওয়াজ হয়। তাহলেই আর দেখতে হবে না, গোটা বাড়ি মাথায় করে টিংকার দিয়ে উঠবে কিন্তু দেয়ালের ওপাশে পাশের ঘরে ঘুমন্ত গ্রিশাকা দাদুর ভারী নিশ্বাস আর থেকে থেকে ছোট বোনের ছটফটানি ও অস্ফুট নাক ডাকার আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই সে-রাতের নিশ্চিন্ততা ভঙ করল না।

নারীর সাধুনাহীন শোকে দুঃখে জর্জরিত দিনগুলো একের পর এক পাক খুলে খুলে পেরিয়ে যেতে লাগল

মিড়কা সেই যে বিয়ের ব্যাপারে কথা বলতে গিয়ে অপমানিত হয়েছিল তার ধাক্কা এখনও সে কাটিয়ে উঠতে পারে নি সব সময় রাগ-রাগ ভাব, মুখ কালো করে ঘুরে বেড়ায়। রোজ সন্ধ্যাবেলায় হৈ ডুমোড় করতে ও আজ্ঞা মারতে বেরিয়ে যায়, কদাচিৎ সকাল-সকাল বাড়ি ফেরে, ক্রমেই বেশি করে তার ফিরতে ফিরতে রাত গড়িয়ে একেবারে ভোর হয়ে যায়। যে সমস্ত কসাক পলটনের কাছে বাইরে আছে তাদের বাড়ির কিছু নষ্ট চরিবের বৌয়ের সঙ্গে সে মিশতে শুন করেছে, স্ত্রীপানের কাছে সে তাদের জুয়ো খেলতে যায় মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ আশ্রিত কিছু বলল না বটে, কিন্তু চোখ কান খোলা রাখল

একবার ইস্টারের আগে আগে মোখভের নোকানের সামনে পাশ্বেলেই প্রকোফিয়েভিচের সঙ্গে নাতালিয়ার দেখা হয়ে গেল। পাশ্বেলেই প্রকোফিয়েভিচই তাকে প্রথমে ডাকল

‘একটু দাঁড়াও ত!’

নাতালিয়া দাঁড়িয়ে পড়ল শ্বশুরের বাঁকা নাক আর মুখটার দিকে তাকাতে অস্পষ্ট ভাবে গ্রিগোরির চেহারা মনে পড়ে যেতে তার বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল

‘কী গো বুড়োবুড়িদের কাছে একবার ভুলেও আস না যে?’ বুড়ো বিব্রত হয়ে নাতালিয়ার দৃষ্টি এড়িয়ে যে ভাবে কথা বলতে শুরু করল তাতে মনে হল সে নিচ্ছেই যেন নাতালিয়ার কাছে অশ্রাব্যী ‘বুড়ি ওদিকে তোমার জন্যে হেঁদিয়ে নয়ছে, জিজ্ঞেস করছে কেমন আছ, কী করছ তা হ্যাঁ, কেমন আছ, কী করে চলেছে বলই না’

নাতালিয়া অপ্রস্তুত ভাবটা কাটিয়ে উঠল।

‘এই আছি একরকম’ তারপর ইতস্তত করে, খতমত বেয়ে (বলার ইচ্ছে ছিল ‘বাবা’) শেষ করল. ‘পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ।’

‘আমাদের দেখতে আস না কেন?’

‘ঘর-গেরস্থানির কত কাজ।’

‘আমাদের গ্রিশকাটা, এঃ কী যে করল।’ বুড়ো সখেদে মাথা নাড়াল ‘আমাদের পায়ে কুড়ুল মেরে গেল সব মিলেমিশে থাকতে শুরু করেছিলাম সবাই

‘ওসব কথা থাক বাবা’ নাতালিয়ার কণ্ঠস্বর যেন চড়ায় উঠে কান্নায় খনঝন করে ভেঙে পড়ল ‘ভাগ্যে ছিল না, তাই হল না।’

নাতালিয়ার দু’চোখ জলে ভরে উঠতে দেখে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ ভেবাচেকা খেয়ে গিয়ে অস্বস্তিভরে ছটফট করতে লাগল চোখের জল আটকানোব চেষ্টায় নাতালিয়া ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরল।

‘আচ্ছা চলি মা ওই হারামজাদা শূগোরের বাচ্চাটার কথা ভেবে তুমি আর দুঃখু করো না। ও তোমার পায়ের নখের যুগ্ম নয়। ও ফিরে এলেও আসতে পারে একবার দেখা পেলে হয় ওকে দেখে নিতাম।’

নাতালিয়া একেবারে ভেঙে পড়েছে। দুই কঁধের মাঝখানে মাথাটা গুঁজে সে চলল পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ অনেকক্ষণ একই জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উসখুস করতে লাগল দেখে মনে হল যেন পুরোনমে ছুট মারার জন্য তৈরি হচ্ছে। নাতালিয়া মোড় নেওয়ার সময় পিছন ফিরে তাকাল, দেখতে পেল ঋণুর অতি কষ্টে লাঠির ওপর ভার দিয়ে ঝুঁড়িয়ে ঝুঁড়িয়ে চলেছে বারোয়ারিতলা দিয়ে



স্টকম্যানের ঘরে বৈঠক আগের চেয়ে কমে আসতে লাগল। বসন্ত এসে পড়ছে। গ্রামের লোকজন তাই ক্ষেতের কাজের জন্য তৈরি হচ্ছে এখন আসে কেবল আটাকলের গোলায় আর দাভিদকা আর ইল্লিন-ড্রাইভার ইভান আলেক্সেয়েভিচ।



যিশু খ্রীষ্টের মৃত্যু তিথি পালনের আগের বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা নাগাদ তারা স্টকমানের কারখানাঘরে এসে জড় হল। স্টকমান তার কাজের বেঞ্চির ওপর বাসে বুপোর আধুলি দিয়ে তৈরি একটা আঙুটি উল্খো দিয়ে ঘসে ঘসে পালিশ করছিল। অন্তর্গামী সূর্যের এক গোছা কিরণ জানলা দিয়ে ভেতরে এসে পড়েছে। মেকের ওপর পড়েছে হলদে ছাঁট মেশানো গোলাপী রঙের ধুলো ধুলো আলোর একটা চৌকো ছাপ।

ইভান আলেক্সেয়েভিচ একটা সাঁড়ানী হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বলল

‘সেদিন মনিবের কাছে গিয়েছিলাম একটা পিস্টনের ব্যাপারে কথা বলতে। মিল্মেরোভোতে নিয়ে যেতে হবে। ওখানে সারাইয়ের জন্যে দেওয়া যাবে। এখানে আমরা কীই বা করতে পারি? এদিকে চিড ধরেছে। এই এত বড়,’ এই বলে কার উদ্দেশ্যে কে জানে, ইভান আলেক্সেয়েভিচ তার কড়ে আঙুলটা তুলে মেশে দেখাল।

‘মিল্মেরোভোতে একটা কারখানা আছে যেন মনে হচ্ছে?’ উল্খো চালাতে চালাতে আঙুলের চারধারে বুপোর মিহি গুঁড়ো জিটিয়ে স্টকমান জিজ্ঞেস করল।

‘হ্যাঁ বোলা চুম্বির ইস্পাত কারখানা। গত বছর আমাদের ওখানে যেতে হয়েছিল।’

‘অনেক মজুর আছে?’

‘কমতি কিছু নেই শ’ চারেক হবে।’

‘আচ্ছা তাদের হালচাল কেমন?’ স্টকমান কাজ করতে করতে মাথা ঝাঁকানো, তাই তার মুখ থেকে কথাগুলো ধমকে ধমকে আলাদা আলাদা করে বেরিয়ে এলো।

‘হ্যাঁ একেই বলে থাকার মতো থাক! ওরা তোমার ওই সর্বস্বরা নয় ওরা সব বাঁড়ের গোবর।’

গোলাম তার দু’হাতের মোটা মোটা বৈটে আঙুলের ফাঁকে আঙুল ঢুকিয়ে হাঁটুর নীচে হাত গুঁজে স্টকমানের পাশে বসে ছিল। ইভান আলেক্সেয়েভিচের কথায় কৌতুহলী হয়ে সে জিজ্ঞেস করল ‘কেন? সে আবার কী কথা?’

আটাকলের চালক দাভিদকাব মাথার চুলের ফাঁকে ফাঁকে আঁটার গুঁড়ো ঢুকে থাকে, তাই তার চুলগুলো সাদা। কারখানা ঘরের ভেতরে পায়চারি করতে করতে ফেনার অ্যাকাবে স্তূপ হয়ে জমে থাকা ঝসঝসে, চাঁচনিগুলোকে সে লাগি মেবে চর্রাং চর্রাং করে একপাশে সরিয়ে দিচ্ছিল, হাসি হাসি মুখ করে কান পেতে শুনছিল ডুরডুরে গন্ধমাখা শুকনো ঘর্মরন্ধনি। তার মনে হচ্ছিল সে যেন লাল-বেগনি রঙের বরা পাতায় ছাওয়া কোন খাতের ভেতর দিয়ে পা ফেলে ফেলে চলেছে,

পাতাগুলো আশে আশে তার পায়ের চাপে মাটিতে বসে যাচ্ছে, পাতার রশ্মির  
নীচে কীচা নরম সৌন্দর্য মাটির নয়নীয় স্পর্শ

‘কারণ এই যে ওদের সবারই অবস্থা খুব স্বচ্ছল সকলের নিজের নিজের  
বাড়ি আছে, মাগ-বৌ আছে, সব ব্রকমের সুখসুবিধে আছে তার ওপর ওদের  
আদেকই আবার ব্যাণ্ডিস্ট ওদের যে মনিব সে নিজেই প্রচার করে, তাই এ  
ওর পিঠ চুলাকোর কিছু দু’পাকেরই নোংরা এত জমেছে যে কোমাল দিয়ে  
চেষ্টেও তোলা যাবে না’

কারা এই ব্যাণ্ডিস্ট, ইভান আলেক্সেয়েভিচ ?’ অজানা একটা শব্দ কানে  
ঘেঁষে দাঙিঙ্গকার খটকা লাগল

‘ব্যাণ্ডিস্টদের কথা বলছ ? ওরা নিজেদের মতো করে ভগবানকে বিশ্বাস  
করে অনেকটা আমাদের সদাচারীদের মতন !’

একেক আহাম্মকের একেক পাগলামী আর কি,’ গোলাম যোগ করল।

‘তা যা বলছিলাম, আমি ত সেগেই প্রাভেনভিচের কাছে গোলাম, ইভান  
আলেক্সেয়েভিচ যে ঘটনাটা বলতে শুরু করেছিল তার ক্ষেত্র টেনে বলে চলল,  
‘এমিকে ওর কাছে তখন বসে আছে আতিওপিনটা আমাকে কড়া বললেন,  
‘একটু অপেক্ষা কর সামনের ঘরে।’ বসে বসে অপেক্ষা করতে থাকি দবজার  
ফাঁক দিয়ে শুনতে পাচ্ছি ওদের কথাবার্তা বোদ কত্না বলছেন আতিওপিনকে,  
খুব শিগগিরই নাকি জার্মানদের সঙ্গে যুদ্ধ বাধবে কোন এক কেতাবে নাকি  
পড়েছেন আর আতিওপিন যে কেমন বকবক করতে পারে সে ত তোমরা  
জানই। শুনে সে বলল, ‘যুদ্ধের তসত্ত্বিনা তসম্পক্ষে আমি কিছু আপনার তসঙ্গে  
মোটাই একমত নই’

আতিওপিনের গলা ইভান আলেক্সেয়েভিচ এত সুন্দর নকল করল যে  
দাঙিঙ্গকা ঠোট্টোটো গোল করে পাকিয়ে মুখ ফুটে একটা ছোট্ট হাসি বার করল,  
কিন্তু গোলামের ঠোট্টের কোনায় বিস্ময়ের ঝোঁটা লক্ষ করে তক্ষুনি তার মুখের  
হাসি মিলিয়ে গেল

‘রশিয়ার সঙ্গে লড়াই বাধতে পারে না কেননা আমাদের ফসলের ওপরে  
জার্মানি টিকে আছে,’ ইভান আলেক্সেয়েভিচ তার শোনা কথাবার্তার বিবরণ দিয়ে  
যেতে লাগল। ‘এর পর আরও কে একজন যেন যোগ দিল। গলা শূনে চিনতে  
পারলাম না। পরে অবশ্য টের পেলাম কথাগুলো বলেছিল স্ত্রিমিথঙ্কি মশাইয়ের  
ছেলে, সেই অফিসারটা। সে বলছিল, ‘লড়াই যদি বাধেই ত বাধবে জার্মানি আর  
ফ্রান্সের মধ্যে সে লড়াই হবে আঙুরক্ষেত নিয়ে তার সঙ্গে আমাদের কোন  
সম্পর্ক নেই’

‘তোমার কী মনে হয় ওসিপ দাভিদভিচ ?’ স্টকমানের দিকে ফিরে প্রশ্ন করল ইডান আলেক্সেয়েভিচ

‘আমি ত আর গুণতে জানি নে,’ তৈরি করা আঙটিটা হাতের ওপর রেখে খানিকটা দূরে বাড়িয়ে ধরিয়ে গভীর মনোযোগ সহকারে নিরীক্ষণ করতে করতে উত্তর এড়িয়ে গিয়ে বলল স্টকমান

ওদের মধ্যে লড়াই একবার শুরু হয়ে গেলে আমাদেরও ছুটেতে হবে সেখানে চাও আর না চাও যেতে হবে, চুলের মুঠি ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাবে, গোলাম্য তাব সূচিস্তিত মন্তব্য প্রকাশ করল

‘এখানে ভাই ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে ইডান আলেক্সেয়েভিচের হাত থেকে আস্তে করে সাঁড়াশীটা টেনে নিয়ে স্টকমান শুরু করল

স্টকমান বলতে শুরু করল বেশ গুরুত্ব দিয়ে তার কথা শুনলে বুঝতে বাকি থাকে না যে বিষয়টা সে আগাগোড়া পরিষ্কার ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে চায় গোলাম্যের পাদুটো বেঞ্চ থেকে পিছলে যাচ্ছিল। পা গুটিয়ে নিয়ে সে নড়েচড়ে জুত করে বসল। দাভিদকার ঠোঁটজোড়া নিটোল বৃত্তের আকার ধারণ করল, তার হাঁ-করা মুখের ভেতর থেকে বেরিয়ে রইল ঠাস বুননি দাঁত আর কিছু ভিজ়ে গাঁজলা, স্টকমান তার সহজাত নিয়মে জোরাল শব্দ দিয়ে সংক্ষেপে বাজার আর উপনিবেশ দখলের জন্য শুল্কিবাদী রাষ্ট্রগুলোর লড়াইয়ের এক উজ্জ্বল বিবরণ দিয়ে গেল শেষের দিকে ইডান আলেক্সেয়েভিচ বেশ বিরক্ত হয়েই বাধ্য দিয়ে বলল

‘রোসো, কিন্তু এতে আমাদের কী ?’

‘অন্যের খোয়্যারিতে তোমার ত বটেই, আরও অনেকেরই মাথা ব্যথা করবে,’ স্টকমান হাসল

‘ছেলেমানুষের মতো কথা বলিস নে, গোলাম্য খোঁচা মারল, ‘জানিস নে বুঝি কথায় বলে ‘রাষ্ট্রায় রাজ্যায় যুদ্ধ হয় উলুখাগড়ার প্রাণ যায়।’

‘উ-হু-হু-ম।’ ছবু কঁচকে একটা বেয়াড়া ধরনের বিরাট চিন্তার জট ছাড়ানোর চেষ্টা করতে লাগল ইডান আলেক্সেয়েভিচ

‘লিঙ্কনিখ্‌স্‌টিট আবার মোখভের ওখানে ঘুরঘুর করে কেন ? ওর মেয়েটার জন্যে নাকি ?’ দাভিদকা ভিজ়েস করল।

‘আরে কোরশুনভদের বাড়ির ছেলে ত সে রাস্তা মেরে দিয়ে গেছে গোলাম্য কীধের সঙ্গে বলল

‘শুনছ ইডান আলেক্সেয়েভিচ ? বলি অফিসারটা ওখানে কিসের গন্ধ পেয়েছে ?’

ইডান আলেক্সেয়েভিচ যেন হাঁটুর পেছনে চাবুক খেয়ে চমকে উঠল।

‘আঁ, কী বলছ ?’

‘যুমিয়ে পড়লে নাকি দাদা? আরে বলছিলাম কি শুই লিভুনিংস্‌কির কথা’

‘স্টেশনে যাবার পথে এসেছিল হ্যাঁ আরও একটা খবর আছে। আমি যখন দেউড়িতে বেরিয়ে আসি তখন কাকে দেখলাম জনন? গ্রিশ্কা মেনেখভকে লড়িয়ে আছে হাতে চাবুক নিয়ে। জিজ্ঞাস করলাম, এখানে কী মনে করে রে গ্রিগোরি?’ তা বলল কি, ‘লিভুনিংস্‌কি মশাইকে মিমেরোভোতে নিয়ে যাচ্ছি’

‘ছোঁড়া ওদের কোচোয়ান হয়েছে,’ দাভিদকা এক ফাঁকে বলল।

‘বড় মানুষের পাতের ঐটোকাটা কুড়িয়ে খায়’

‘তুই গোলাম একটা শেকলে বাঁধা কুস্তার মতো, যাকে সামনে পাস, তারই ওপর ঘেউ ঘেউ করিস’

মিনিট খানেকের জন্য কথাবার্তায় ছেদ পড়ল। ইতান আলেক্সেয়েভিচ যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল

‘তোমার যে গির্জের ধ্বংস করতে যাবার তাড়া মনে হচ্ছে?’ গোলাম সব শেষে টিল্লনী কাটল।

‘ধ্বংস আমার রোজই আছে।’

স্বক্‌মান তার রোজকার অতিথিদের গোট অবশি এগিয়ে দিল। কারখানা-ঘরের দরজায় তালা লাগিয়ে বাড়ির ভেতরে চলে গেল

ইস্টারের আগের দিন রাতে কালো মেঘের বিপুল স্তনভারে ছেয়ে গেল সারা আকাশ, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়তে লাগল গ্রামের ওপর চোপে বসল একটা ডিঙ্কে সৈতসৈতে অন্ধকার। দিনের আলো নিভে আসার সঙ্গে সঙ্গে দনের বৃকে বরফ ফটার একটা একটানা আর্তনাদ গড়িয়ে গড়িয়ে চলতে থাকল ভাঙা বরফ পিণ্ডের চাপ খেয়ে এই প্রথম সরসর শব্দে একটা চাণ্ডু জলের টানে বেরিয়ে এলো গ্রামের দিকে প্রথম বাঁক নিতে না নিতে ক্রোশ দেড়েক জায়গা জুড়ে বরফ একবারে ফেটে টোচির হয়ে গেল, তরতর করে ছুটে চলল বরফগলা জলের ধারা। দনের বৃকে গির্জাব নিয়মিত ঘণ্টাধ্বনির তালে তালে চাপ চাপ বরফ একটা আরেকটার গায়ে ধাক্কা লেগে তীরভূমি কাঁপিয়ে সম্মুখে ভেঙে পড়ছে মন যেখানে এক পাশ হয়ে বাঁ দিকে ঘুরে গেছে সেই বাঁকটাতে বাধা সৃষ্টি হয়েছে, শোতে ভেসে আসা বরফের চাঁইরের ঘর্ষর চড়চড় আওয়াজ আশেপাশের গ্রাম থেকে শোনা যেতে লাগল। বরফগলা জল জমে গির্জার আঙিনাটা চকচক করছে, তারই মধ্যে পাড়ার একপাল ছেলেছোকরা সেখানে এসে জুটেছে গির্জার ভেতর থেকে হট-করা দরজা দিয়ে বারান্দায় বারান্দা থেকে আঙিনায় গড়িয়ে পড়ছে মস্তোচ্চারণের ফাঁপা আওয়াজ। জাকরিকাটা জানলাগুলো অমনদোৎসবের আলোর ঝলমল করছে এদিকে আঙিনায় ছেলেছোকরা পাড়ার ছুকরিসের গা

হাতড়াচ্ছে, তাহিতে ছুকরিগুলো মৃদু গলায় 'আঃ-ঐঃ' করছে, ছেলেরা তাদের চুমো খাচ্ছে আর চাপা গলায় রাজ্যের অন্নীল গল্প বলে যাচ্ছে।

ইস্টারের ধর্মোপাসনা উপলক্ষে আশপাশের ও দূর দূর পল্লী থেকে যে-সমস্ত কসাক এসেছে তাদের ভিড়ে গির্জার তত্ত্বাবধায়কের বাড়িটা ভরে উঠেছে। পথের শ্রমে আর অতিথি-ঘরের জুমাট গুমোট আবহাওয়ায় ক্লান্ত হয়ে তারা বেঞ্চে, জানলার ধারিতে, মেঝের ওপর - যে যেখানে পেরেছে ঘুমিয়ে পড়েছে।

ভাঙা সিঁড়ির ধাপের ওপর বসে কেউ কেউ তামাক টানছে, আবহাওয়া নিয়ে নীতকালীন ফসল নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে।

'তোমাদের গাঁয়ের লোকেরা কবে নাগাদ মাঠে নামবে?'

'সেন্ট টমাসের দিনেই ত নামবে বলে ঠিক হয়েছে।'

'তোমাদের ভাগিটা সেদিক থেকে ভালোই বলতে হবে স্তেপের বেলেমাটির মাঠ কিনা, তাই না?'

'বেলেমাটি ঠিকই, কিন্তু খাতের এই দিকটায় নোনামাটির জলা।'

এখন কিছু জমি বেশ ভালো জল খাবে।'

'গত বছর চাষ করতে গিয়ে আমরা দেখি মাটি একেবারে ঝুরঝুরে - সব জায়গায় শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে।'

'ওরে দুনিয়া, কোথায় গেলি রে?' নীচে, বাড়ির সমর দরজার সামনে থেকে সরু গলায় কে ঘেন চিচি করে ডাকল।

এদিকে গির্জার গেটের কাছে বৃক্ষ ফাঁসফাঁসে গলায় একজন গর্জন করে উঠল

'তবে রে হতভাগা, বেম্বিক! ভাগ সব এখান থেকে চুমোচুমির আর জায়গা পেলি নে! বড্ড তাড়া, না?'

'তোমার বুকি জোটে নি, না? যা আমাদের মাদী-কুকুরটাকে গিরে চুমো খা গে,' অন্ধকারের ভেতর থেকে অন্ধবয়সের একটা ভাঙা গলা লোকটাকে শুনিয়ে দিল

'আঁ কী বললি? মাদী কুকুর? তবে রে '

কাদার ওপর দিয়ে পা ফেলে ছোট্টা প্যাচপ্যাচ আওয়াজ, ঝিলঝিল হাসি আর মেয়েদের ঘাঘরার খসখসানি শোনা গেল

ছাদ থেকে কাচ ভাঙার টুংটাং আওয়াজ করে ফেঁটা ফেঁটা জল পড়ছে ফের কালো চটচটে কাদামগটির মতো ধীর টানা-টানা গল্লা এই সেদিন প্রোখরের কাছ থেকে একটা লাঙল কিনব বলে দরদাম করতে গেলাম বারোটা বুবল দিতে চাইলাম গৌ ছাড়ল না। ব্যাটা এতটুকু কমাবে না '

দনের বৃকে ব্রিঙ্ক মর্মবর্ধনি, খসখস মচমচ শব্দ। যেন নীচের দিকে, গ্রাম ছাড়িয়ে বটগাছের মাথা সমান উঁচু, বিশাল আকার কোন এক মেয়েমানুষ সুন্দর

সাজগোজ করে হেঁটে চলেছে, তার অদৃশ্য পোশাকের বিশাল আঁচলটা খসখস আওয়াজ তুলছে

মাঝরাতে থকথকে অন্ধকারটা যখন আরও গাঢ় হয়ে এলো তখন জিন-না-পরানো ঘোড়ায় চেপে গির্জার আঙিনার কাছে এসে উপস্থিত হল মিত্কা কোরশুনভ। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে মুখের লাগামটা ঘোড়ার কেশরের সঙ্গে বাঁধল, উত্তেজিত ঘোড়াটার গায়ে চাপড় মারল। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ঘোড়ার পারের খুরে মাটি দাবড়ানোর আওয়াজ কান পেতে শুনল, তারপর কোমরের বেল্ট ঠিকঠাক করে নিয়ে আঙিনার দিকে পা বাড়াল। গির্জার বারান্দায় উঠে মাথার টুপি বুলল, এষড়োখেরডো বাটিছাঁট-দেওয়া মাথাটা শ্রণামের ভঙ্গিতে নোয়াল, তারপর কনুইয়ের ধাক্কা দিয়ে মেয়েদের ঠেলে সরিয়ে দিতে দিতে এগিয়ে গেল বেদির দিকে। বাঁ দিকে কালো দল্লল বৈধে ডিড় করে আছে কসাক পুরুষেরা, ডান দিকে মেয়েদের বিচিত্রবর্ণের সাজসজ্জার সমারোহ। মিত্কা এদিক ওদিক চোখ মেলে খুঁজে বেড়াতে লাগল তার বাবাকে শ্রম সারিতে তাকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে গেল। নিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ সবে কৃশচিহ্ন আঁকার জন্য হাত তুলেছে এমন সময় মিত্কা তার কনুই চেপে খরে লোমের জঙ্কলে ঢাকা কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, 'বাবা, একটু বাইরে এসো ত '

নানা রকমের উৎকট গন্ধের নিশ্চিত পর্দা ফুড়ে পথ করে যেতে যেতে মিত্কার নাকের পাটা কাঁপতে লাগল। গরম মোমের ধোঁয়াবাপ, মেয়েদের ঘর্মান্ত শরীরের ভেপসা গন্ধ, বহুদিন পড়ে থাকা পোশাক থেকে কবরের পুতিগন্ধ (যে সব পোশাক কেবল বড়দিন আর ইস্টারের সময় সিম্বুকের গভীর তলদেশ থেকে বার করা হয়) তাকে যেন ঠেলে ফেলে দিতে লাগল। চারদিকে ভেসে বেড়াচ্ছে ভিজ়ে জুড়োর চামড়া আর ন্যাকখালিনের চিমসে গন্ধ, ক্ষুধার্ত পাকস্থলী থেকে উপোসী লোকজনের নিশ্বাসপ্রশ্বাসের দুর্গন্ধ।

বারান্দায় এসে বাপের কাঁধে বুক ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে মিত্কা বলল, 'নাতালিয়া মারা যাচ্ছে '

### সন্ধ্যা

ইয়েভগেনিকে মিল্লেরোভোভেতে পৌঁছে দিয়ে ইস্টারের আগের সপ্তাহের বিবাবে গ্রিগোরি ফিরতি পথ ধরল। বরফ এখন তাপের কবলে পড়ে গলতে শুরু করেছে। মাত্র দুদিনের মধ্যে রাস্তাটা ভেঙেচুরে গেছে।

রেল স্টেশন থেকে আট-নয় ক্রোশ দূরে গুলখোন্ডি বোণ নামে এক ইউক্রেণীয় বসতিতে একটা ছোট নদী পার হওয়ার সময় গ্রিগোরির ঘোড়াদুটো ডুবতে ডুবতে অল্পের জন্য বেঁচে গেল। বসতিটাতে সে পৌঁছায় সন্ধ্যার আগে আগে আগের দিন রাতে নদীর জমা বরফে চিড় ধরেছিল, ঘ্রোতের টানে সেই বরফ ভেঙ্গে চলে যায় বরফগলা গৈরিক জলের ঘ্রোতে নদী উচ্ছ্বসিত ও ফেনাযুক্ত হয়ে উঠেছে, নদীর দু'কূল ছাপিয়ে জল উঠে বসতির অলিগতির দিকে এগিয়ে আসছে।

স্টেশনে যাওয়ার পথে ঘোড়াগুলোকে দানাপানি খাওয়ানোর জন্য লোকে যে সবাইখানায় এসে খামে সেটা ছিল নদীর ওপারে রাতে নদীর জল আরও বাড়তে পারে। তাই গ্রিগোরি আর অপেক্ষা না করে নদী পার হওয়ার সিদ্ধান্ত নিল।

এই একদিন আগেও যাওয়ার সময় যেখানে জমিট বরফের ওপর দিয়ে স্নেজগাড়ি চালিয়ে গিয়েছিল তার কাছাকাছি এসে গ্রিগোরি দেখতে পেল জল কূল ছাপিয়ে উঠেছে, খোলা জলে নদীর পাড় ভেঙ্গে যাচ্ছে, বেড়ার একটা ভাঙা টুকরো আর গাড়ির একটা চাকার আধখানা অন্যরাসে মাঝনদীতে ঘুরপাক খাচ্ছে বরফ গলে যেখানে বালি বেরিয়ে পড়েছে সেখানে স্নেজগাড়ি ঘসটানোর সদ্য দাগ দেখা যাচ্ছে ঘোড়াদুটোর পায়ের মাঝখানে পুঞ্জ পুঞ্জ ফেনা হয়ে ঘাম জমেছে। গ্রিগোরি তাদের ধামিয়ে গাড়ি থেকে লাফিয়ে নীচে নেমে স্নেজের দাগগুলো পরীক্ষা করে দেখতে লাগল। সবু সবু দুটো দাগ পাশাপাশি চলে গেছে জলের ধারে এসে বাঁ দিকে একটু ঘূরে গিয়ে জলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে গ্রিগোরি দূরত্বটা চোখের আন্দাজে মাপে নিল - বড় জোর একশ হাত হবে ঘোড়াদুটোর কাছে এসে দেখল সেগুলোর সাজ ঠিকঠাক আছে কিনা এমন সময় সবচেয়ে কাছের বাড়িটা থেকে বেরিয়ে এলো এক মাঝবয়সী ইউক্রেণীয় তার মাথায় শেরালের চামড়ার গরম টুপি লোকটা গ্রিগোরির দিকেই এগিয়ে আসছিল গ্রিগোরি আবর্তিত গৈরিক জলঘ্রোতের দিকে হাতের লাগামটা নাড়িয়ে তাকে জিজ্ঞেস করল

‘এখান দিয়ে পার হওয়া যায়?’

‘লোকে পার হয় বটে আজ সকালেই পার হয়েছিল।’

‘জল কি খুব বেশি?’

‘না, তবে স্নেজ জলে ডুবে যেতে পারে।’

গ্রিগোরি লাগাম হাতে জড় করে নিল, তারপর চাবুকটা উঁচিয়ে ‘হেই!’ বলে সংক্ষেপে হুক দিয়ে ঘোড়াগুলোকে তড়া দিল তারা নাক দিয়ে ঘডঘড় আওয়াজ তুলে জল ঝুকতে ঝুকতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও এগিয়ে গেল

‘হেই’ বলতে বলতে কোচোয়ানের আসনে ঋড়া হয়ে খ্রিগোরি চটাস করে চাবুক হাঁকড়াল

বী পাশের চওড়া-পাহা বাদামী ঘোড়াটা মাথা নাড়াল, তারপর ‘যা থাকে কপালে’ ভাব করে চামড়ার ফিতের বাঁধনে হেঁচকা টান মারল। খ্রিগোবি আড়চোখে পায়ের দিকে তাকাল। ব্লেকের কান ঘেঁষে জল কলকল করে বয়ে চলেছে। জল প্রথমে ঘোড়াদুটোর হাঁটু পর্যন্ত ছিল, তারপর হঠাৎ হয়ে দাঁড়াল বুক সমান খ্রিগোরি ফেরানোর চেষ্টা করল কিন্তু ঘোড়াদুটো এখন আর বলে নেই, জোরে জোরে নাক ঝাড়তে ঝাড়তে সীতরাতে শুরু করে দিয়েছে ব্লেকের পেছনটা জলের তোড়ে ভাসাভাসি হয়ে যেতে ঘোড়াদুটোর মাথা শ্রোতের উজ্জানের দিকে ঘুরে গেছে। তাদের পিঠের ওপর দিয়ে জল ঢেউ খেলিয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল, এমিকে ব্লেকগাড়িটা ঘেঁষে যেতে যেতে প্রচণ্ড জোরে তাদের টানতে লাগল পিছন দিকে।

‘হেই! উঁহু-হু-হু ডাইনে, ডাইনে।’ সেই ইউক্রেমীয় লোকটা পার ধরে দৌড়তে দৌড়তে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে লাগল। আর কেন যেন মাথা থেকে শোয়ালের চামড়ার গরম টুপিটা টান দিয়ে খুলে নিয়ে নাড়াতে লাগল।

খ্রিগোরি ভয়ঙ্কর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে অবিরাম ‘হেই-হাই’ করে হাঁকড়াক ছেড়ে ঘোড়াদুটোকে ত্যাগ দিয়ে চলল ব্লেকগাড়িটা তুলিয়ে যেতে লাগল তাইতে জল এখানে ওখানে ছোট ছোট ঘূর্ণি তুলে ঘুরপাক খেতে শুরু করল। একটা সীকো জলে ভেসে গিয়েছিল তারই অবশিষ্ট ঝুঁটি জেগে ছিল জলের ওপর। ব্লেকগাড়িটা হঠাৎ সেটার গায়ে ধাক্কা খেল, ধাক্কা খেয়েই কেমন যেন এক অদ্ভুত কৌশলে উল্টে গেল খ্রিগোবি আত্ননাদ করে উঠে জলে ছিটকে পড়ে চুবুনি খেল, কিন্তু হাতের লাগাম ছাড়ল না। জলের শ্রোত তার ভেড়ার চামড়ার কোটের প্রান্ত আর পা ধরে টানছে, যেন ভদ্র ভাবে মিনতি করে তাকে টানতে টানতে নিয়ে চলেছে, দোদুল্যমান ব্লেকগাড়ির পাশে তাকে উল্টে দিচ্ছে। খ্রিগোরি কোন রকমে বী হাতে ব্লেকের তলার একটা দিক আঁকড়ে ধরল হাতের লাগাম ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ব্লেকের তলার লোহার পাতের গা ধরে ধরে এগোতে লাগল দুই ঘোড়ার মাঝখানে মড়িমড়া বাঁধা আড়কাঠটার দিকে আড়কাঠের লোহা বাঁধানো মাথাটা সে ধরতে যাবে এমন সময় বাদামী ঘোড়াটা শ্রোতের সঙ্গে ঘুঁষতে ঘুঁষতে সম্মুখে তার পেছনের পায়ের চাঁট কষিয়ে দিল খ্রিগোরির হাঁটুতে। খ্রিগোরির দম আটকে যাবার উপক্রম হল সে একবার এ হাত আরেকবার ও হাত করে ঘোড়ার চামড়ার ফিতের বাঁধন আঁকড়ে ধরে বইল তার মনে হল সে যেন ঘোড়াগুলোর কাছ থেকে আলাগা হয়ে যাচ্ছে, তার হাতের আঙুলগুলোর



ওপর যেন দ্বিগুণ চাপ পাড়েছে, হাতের মুঠি আলগা হয়ে যেতে চাইছে সারা দেহে ঠাণ্ডার ঝুঁচ ফুটে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে শেষ পর্যন্ত সে বাদামী ঘোড়াটার মাথার কাছে এসে পৌঁছল ঘোড়াটার মৃত্যুভর ভীত রক্তজমাট চোখের কিন্তু দৃষ্টি সোজা গ্রিগোরির বিস্মরিত চোখের তারাকে বিদ্ধ করল

ঘোড়ার মুখের সামনের বেলট পিছলে হয়ে যাওয়ায় গ্রিগোরির হাত থেকে কয়েকবার ফস্কে গেল। আবার সীতরে এসে ধরল, কিন্তু আবারও বেরিয়ে গেল আতুল থেকে অবশেষে কোন রকমে আঁকড়ে ধরল তারপর হঠাৎই পায়ের নীচে মাটি ঠেকে গেল।

‘হেই, হেই!’ প্রাণপণ শক্তিতে টানতে টানতে সে ছুট দিল সামনের দিকে, তারপর পেছন থেকে ঘোড়াগুলোর বৃকের ধাক্কায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল ফেনাজমা চড়ার ওপর

ঘোড়াদুটো এক ঝটকির জলের ভেতর থেকে স্নেহজ্বালা টেনে তুলে গ্রিগোরির গা মাড়িয়ে চলে গেল। আরও কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে শক্তি হারিয়ে কাঁপতে কাঁপতে তারা ধমকে দাঁড়িয়ে পড়ল তাদের ভিড়ে পিঠ থেকে ঘোঁয়া উঠতে লাগল।

গ্রিগোরি কোন যন্ত্রণা অনুভব করল না। সে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল অসহ্য গরম একটা ময়দার কাইয়ের মতো তাকে লেপটে ধরল ঠাণ্ডা গ্রিগোরি ঘোড়াগুলোর চেয়েও বেশি কাঁপতে লাগল সে বুঝতে পারছিল এখন একটা দূধের শিশুর মতোই তার পাদুটো দুর্বল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে স্নেহটা সোজা দাঁড় করিয়ে নিল, ঘোড়াদুটোর গা গরম করার জন্য হুড়হুড় করে তাদের ছুটিয়ে দিল। রাস্তার ওপর দিয়ে এমন ভাবে ছোটাল যেন আক্রমণ করতে চলেছে। প্রথম যে বাড়ির উঠোনের গেট খোলা দেখতে পেল গতি এতটুকু না কমিয়ে তার ভেতর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে দিল।

গ্রিগোরির কপাল ভালো যে একজন সহন্য গৃহকর্তাকে সে পেয়ে গেল লোকটা তার ছেলেকে পাঠাল ঘোড়াদুটোর তদারক করতে, নিজে গ্রিগোরিকে জামাকাপড় ছাড়তে সাহায্য করল এমন স্বরে বৌকে ‘উনুন ধরাও’ বলে হুকুম দিল যে তারপর আর কোন ওজর আপত্তি করার অবকাশ রইল না

গ্রিগোরি তার নিজের জামাকাপড় না শুকানো পর্যন্ত গৃহকর্তার প্যান্ট পরেই চুল্লির ওপরকার গরম বিছানার ওপর শুয়ে রইল। নিরামিষ বাঁধাকপির বোল দিয়ে বাওয়া সেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

ভোর হওয়ার অনেক আগেই গ্রিগোরি রওনা দিল সামনে পয়তাল্লিশ ফ্রেন্স মতন রাস্তা, প্রতিটি মিনিট এখন তার কাছে দামী। সামনে আসল বিপদ। বসন্তের বরফগলা জলকানায় স্তোমের বিস্তীর্ণ প্রান্তর একস্যা হয়ে যাবে - প্রতিটি খাতে,

প্রতিটি উপভাষার ওপর দিয়ে কলকল করে বয়ে চলবে বরফগলা জলের শ্রোত  
এ পথ পার হওয়া তখন অসম্ভব হয়ে পড়বে।

রাস্তার বরফ গলে গিয়ে কালো মাটি বেরিয়ে পড়ায় ঘোড়াগুলোর চলতে  
কষ্ট হচ্ছে ভোরবেলাকার হিমে জমটি রাস্তা ধরে দেড় ক্রোশ দূরে একটা  
ইউক্রেনীয় পরীর কাছে রাস্তা যেখানে দু'দিকে চলে গেছে সেখানে এসে দাঁড়িয়ে  
পড়ল। ঘোড়াগুলো যেমে নেয়ে উঠেছে, তাদের গা থেকে ধোঁয়া উঠছে, পেছনে  
মাটির ওপর চকচক করছে লেজের দুটো টানা রেখা সেখানে স্নেহখানা ফেলে  
রেখে ঘোড়াদুটোর লেজ বাঁধল। একটার খালি পিঠে উঠে অন্যটার মুখের লাগাম  
ধরে টানতে টানতে আবার পথ চলতে শুরু করল ইস্টাবের আগের সপ্তাহের  
রবিবারে সে ইয়োগদনোয়েতে এসে পৌঁছুল।

বুড়ো কর্তা মন দিয়ে গ্রিগোরির পথস্বাত্রার বিশদ বিবরণ শোনার পর  
ঘোড়াদুটোকে দেখতে গেল। ঘোড়াদুটোর গভীর গর্তে ঢোকা পীজরের দিকে  
রাগে কটমট করে তাকাতো তাকাতো সাশকা ওদের উঠানে ছাঁটিয়ে নিয়ে  
বেড়াচ্ছিল।

‘ঘোড়াগুলোর অবস্থা কেমন?’ কর্তা এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল।

‘অবস্থা কী হতে পারে বুঝতেই পারছেন,’ সবজি আভা ধরা পাকা গোল  
চাপদাড়ি নেড়ে চলতে চলতেই গল্পগল্প করে বলল সাশকা

‘বেশি দৌড় কবানো হয় নি ত?’

‘তা হয় নি। গলার বাঁধনের ঘসা লেগে পাটকিলেটার বুক ছড়ে গেছে। ও  
কিছু নয়।’

গ্রিগোরি উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করছিল কর্তা কী বলে তাকে সরে যাবার  
জন্ম হাতের ইশারা করে সে বলল ‘বিশ্রাম কর গিয়ে।’

গ্রিগোরি চাকরদের মহলে চলে গেল কিন্তু বিশ্রাম তার কপালে জুটল শূধু  
ওই একটি রাত পরদিন সকালে সাটিনের নতুন নীল জামা গায়ে ভেনইয়ামিন  
এসে উপস্থিত মুখে তার সর্বশ্বণের মেদবহুল হাসিটা লেগে আছে সে বলল  
‘গ্রিগোরি, কতটা তোমাকে ডাকছেন। এফুনি।’

জেনারেল ফেল্টেন চাট পায়ে ফটফট করে হল ঘরে পায়চারি করছিল  
গ্রিগোরি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে এক বার এপায়ে আরেকবার ওপায়ে দেহের  
ভার রেখে উসখুস করতে লাগল, একবার গলা খাঁকারি দিল। দ্বিতীয় বার গলা  
খাঁকারি দিতে কর্তা মাথা তুলে তাকাল

‘কী চাই?’

ভেনইয়ামিন আমাকে আসতে বলেছিল।

‘ও হাঁ মন্দা ঘোড়াটা আর তেজীর পিঠে জিন চাপাও লুকেরিয়াকে বলো কুকুরগুলোকে যেন কিছু খেতে না দেয়। শিকারে যাব আমরা’

গ্রিগোরি যাবার জন্য পিছনে ফিরলে কঠা তাকে চিংকার করে ডেকে ফেরাল, বলল, ‘শুনছ? তুমিও কিন্তু আমার সঙ্গে যাবে।’

অগ্নিনিয়া গ্রিগোরির কোর্ডার পকেটে না-মিঠে না-নোনতা একটা বুটি গুঁজে দিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল, ‘শয়তান বুড়োটার জ্বালায় দুটো মুখে সেবার পর্যন্ত উপায় নেই। হাড় কালি করে ছাড়ল তোমার। একটা মাফলার অন্তত জড়িয়ে নাও গো।’

গ্রিগোরি জিন চাপানো ঘোড়াদুটোকে বেড়ার কাছে নিয়ে এসে শিস দিয়ে কুকুরগুলোকে ডাকল। কঠা কোমরের কাছে কুঁচি দেওয়া নীল বনাত কাপড়ের কোঠা গায়ে দিয়ে তার ওপর কাবুকাজ করা দামী কোমরবন্ধনী ঐটে বেরিয়ে এলো। পিঠে কুলিয়েছে সোলার পাতে মোড়া নিকেলের একটা ফ্রাস্ক, সওয়াসী-চাবুকটা হাত থেকে কুলে পেছনে ছেঁচড়াচ্ছে একটা কিলবিলে সাপের মতো

ঘোড়ার মুখের সামনের রাস ধরে রাখতে রাখতে গ্রিগোরি বুড়োর গতিবিধি লক্ষ করতে লাগল। বুড়ো যে-ভাবে অবলীলাক্রমে তার অস্থিসার বুড়ো শরীরটাকে জিনের ওপর ছুঁড়ে দিল তাতে সে অবাক হয়ে গেল

দস্তানা-পরা হাতে গদগদ ভঙ্গিতে লাগাম জড়িয়ে নিতে নিতে জেনারেল সংক্ষিপ্ত কুকুম করল ‘আমার পেছন পেছন চলে এসো!’

গ্রিগোরি যে ঘোড়াটার ওপর চেপেছে তার বয়স চার বছর সেটা কুকুড়োর মতো মাথা উঁচিয়ে তিড়িংতিড়িং করে লাফাতে লাফাতে একপেশে হয়ে চলেছে ঘোড়াটার পেছনের খুরে নাল লাগানো হয় নি, তাই জায়গায় জায়গায় মসৃণ বরফের ওপর পা পড়তেই সে হড়কে পড়ে যাচ্ছিল, তখন চার পায়ের ওপর ভর দিয়ে তাকে নীচু হতে হচ্ছিল তেজী ঘোড়াটার চওড়া পিঠের ওপর একটু কুঁজো হয়ে বসলেও দিবা আরামে দোল খেতে খেতে চলেছে বুড়ো কঠা

‘আমরা কোথায় যাচ্ছি?’ ঘোড়া ছুটিয়ে এসে কঠার পাশাপাশি হয়ে গ্রিগোরি জিজ্ঞেস করল

‘ওলশানস্কি গিরিপথের দিকে.’ হেঁড়ে গলায় কঠা উত্তর দিল

ঘোড়াদুটো তালে তাল মিলিয়ে চলতে লাগল। মন্দা ঘোড়াটা যে ভাবে পাটো ঘাড়টা রাজহাঁসের মতো বঁকিয়ে আড়চোখে ডাবডাব করে সওয়ারীর দিকে তাকিয়ে তার হাঁটু কামড়ানোর চেষ্টা করতে লাগল তাতে তার মুখের লাগাম শক্ত হাতে ধরে রাখতে হচ্ছিল। খাড়া টিলার চুড়োর ওপর উঠে কঠা তার তেজীকে স্বচ্ছন্দ দুলাকি চালে ছেড়ে দিল কুকুরগুলো বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে একটা ছোটখাটো শেকলের মতো করে সার বৈধে গ্রিগোরির পিছন পিছন

ছুটল কালো রঙের বুড়ি কুণ্ডীটা তার বাঁকা নাকের ডগাটা ঘোড়ার লেজের সঙ্গে ঠেকিয়ে ছুটেতে লাগল গ্রিগোরির ঘোড়াটা তাইতে উত্তেজিত হয়ে বসার ভঙ্গিতে নীচু হয়ে নাছোড়বান্দা কুণ্ডীটাকে চাঁট মারার চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু কুণ্ডীটা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ছিল, গ্রিগোরি পিছন ফিরে তাকাতো বুড়িদের মতো কাতর দৃষ্টিতে গ্রিগোরির চোখে চোখে তাকানোর চেষ্টা করতে লাগল

আশ্চর্যের মধ্যে তারা ওলশানস্কি গিরিপথে এসে পৌঁছুল। কর্তা ষয়েরী রঙের ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া আগাছায় ছাওয়া সঙ্কীর্ণ গিরিপথের ওপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল গ্রিগোরি গিরিপথের ধারে ধাবে জলে কয়ে যাওয়া বিশাল হাঁকরা অতল গহ্বরের দিকে নজর রেখে সাবধানে তার ঘোড়া ছুটিয়ে নেমে পড়ল উপত্যকার মধ্যে। থেকে থেকে সে তাকিয়ে দেখতে লাগল কর্তাকে। ইতস্তত ছড়ানো, ইস্পাত-নীল, নিম্পত্র আলুডাব ঝোপ ভেদ করে আকাশের পটভূমিকায় চোখে পড়তে থাকে বৃক্ষের স্পষ্ট রেখায়িত মূর্তিটা। রেকাবের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আসনের সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে সে। কসাক-বেলট-জাঁটা নীল কোর্তাটা পিঠের কাছে কঁচকে আছে। কুকুরগুলো উঁচুনিচু ঢাল বেয়ে মঙ্গল বেঁধে তার পেছন পেছন চলেছে একটা খড়ো জায়গা দিয়ে নেমে জলা উপত্যকা পার হওয়ার সময় গ্রিগোরিকে ঘোড়ার জিনের সঙ্গে ঝুলে থাকতে হল

এখন একটা সিগারেট খেতে পারলে হত একুনি হাতের লাগামটা ফেলে ডামাকের থলোটা বার করি, মনে মনে এই ভেবে হাতের দস্তানা ঝুলে সিগারেট পাকানোর কাগজের জন্য সে পকেট হাতড়াতে লাগল

এমন সময় পাহাড়ের ঢিবির ওপাশ থেকে বন্দুকের আগুয়াজের মতো গমগম করে উঠল একটা চিৎকার, 'ওই, ওটার পেছনে'

গ্রিগোরি সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঘোরাল দেখতে পেল কর্তা পাহাড়ের একটা বেশ ছুঁচালোমতন ঢিবির মাথায় উঠে গেছে, সেখান থেকে হাতের চাবুকটা মাথার অনেকখানি ওপরে তুলে দেলাতে দেলাতে ঘোড়াটাকে পুরোদমে ছুটিয়ে দিয়েছে।

ওই, ওই যে, ওটার পেছনে'

গিরিপথের তলার ঝোপঝাড় আর মলখাগড়ার বনের ভেতর দিয়ে প্যাচপেচে ভিজ়ে মাটির সঙ্গে লেপটে সরসর করে প্রাণপণে ছুটে চলেছে একটা নোংরা ছাইরঙা নেকড়ে নেকড়েটার গায়ের লোম এখনও ঘন কুঁচকির কাছে গোছা গোছা লোম ঝুলছে। একটা নানা লাফিয়ে পার হয়ে সে দাঁড়িয়ে পড়ল, চটপট পাশ ফিরে তাকাল, সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেল কুকুরগুলোকে কুকুরগুলো গিরিপথের শেষের দিক থেকে জঙ্গলের পথ আটকে ঘোড়ার খুরের আকারে বেড় দিয়ে লাভাস্রোতের মতো এগিয়ে আসছে তার দিকে।

নেকড়েটা শিখরয়ের মতো লাফিয়ে উঠে গেল মেঠোজঙ্গুর খোঁড়লের ওপরকার একটা পুরনো ঢিবির মাথায়, সেখান থেকে চটপট ছুটল জঙ্গলের দিকে তার প্রায় মুখোমুখি একটু একটু করে লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে আসছিল বৃড়ি কুন্তীটা। তার পেছন পেছন উপযুক্ত ব্যবধান রেখে এগোতে লাগল ‘শিকারী বাজ’ নামে মাথায় জঁটু একটা সাদা কুকুর শিকারী কুকুরদের দলের মধ্যে এটা সবার সেরা সবচেয়ে হিংস্র

নেকড়েটা মুহূর্তের জন্য থতমত খেয়ে গেল, মনে হল সে যেন কী করবে স্থির করতে পারছে না। গ্রিগোরি ঘোড়াটাকে চক্কর খাইয়ে ঘুরিয়ে ওপরে উঠতে গিয়ে মুহূর্তের জন্য নেকড়েটাকে দেখতে পেল না, পরে যখন সে টিলাব মাথার ওপরে গিয়ে উঠল তাকে অনেক অনেক দূরে এক স্বলক দেখতে পেল ভেপের ফাঁকা ফাঁকা কালো মাটির সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে আগাছার ভেতর দিয়ে ভাসতে ভাসতে চলেছে মিশমিশে কালো কুকুরের দল। বানিকটা দূরে চাবুকেব হাতল দিয়ে প্রহার করতে করতে খাড়া খাতের কিনারা ধরে একটু পাশ ঘেঁসে বৃড়ো কর্তা তার ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে নেকড়েটা ততক্ষণে পাশের গিরিপথে উঠে পড়ার চেষ্টা করছিল, কিন্তু সেখানে পৌঁছাতে না পৌঁছাতে কুকুরগুলো তার প্রায় ঘাড়ের ওপর এসে পড়ল ঘিরে ফেলল তাকে এদিকে ‘শিকারী বাজ’ নামে সাদা রঙের কুকুরটা নেকড়ের কঁচকির কাছের লোমের গোছা ধরে প্রায় ঝুলে পড়েছে, গ্রিগোরি যেখানে আছে সেখান থেকে তাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন এক ফালি সাদা কাপড়।

ওই, ওই, ওটাব পেছনে। ‘ চিংকারটা গ্রিগোরির কানে এসে পৌঁছল

সামনে কী ঘটছে তা দেখাব বৃথা চেষ্টা করে গ্রিগোরি তার ঘোড়ার রাশ সম্পূর্ণ ছেড়ে দিল তার দু’চোখ জলে ঝাপসা হয়ে আসতে লাগল, বাতাস কেটে চলার বেগে হুহু বাতাসের শিসে তার কানে তালি ধরে গেল শিকারের নেশা গ্রিগোরিকে পেয়ে বসল। ঘোড়ার ঘাড়ের ওপর মুয়ে পড়ে সে উদ্দাম গতিতে ঘণিঝায়ুর মতো ছুটতে লাগল যখন সে গিরিপথে গিয়ে পৌঁছল তখন নেকড়ে কি কুকুর কিছুবই পাত্তা পাওয়া গেল না এক মিনিট বাদেই স্বয়ং কর্তা এসে তার নাগাল ধরল পুরোনমে ছুটতে ছুটতে তেজীর রাশ টেনে ধরে কর্তা চিংকার করে বলল ‘কোথায় গেল?’

‘পাহাড়ের সবু খাতের ভেতরে ঢুকে গেল বলেই মনে হচ্ছে।’

‘বী দিক থেকে হাঁকাও পাঞ্চডাও

কর্তার ঘোড়াটা পেছনের দু’পায়ে ঝাড়া হয়ে উঠেছিল জুতোব গোড়ালি দিয়ে তার পেটে গুতো মেরে এবাবে সে তাকে ছুটিয়ে দিল ডাইনে গ্রিগোরি ঘোড়ার

মুখের লাগাম টেনে ধরে নাবালের মধ্যে নেমে পড়ল, তারপর হুকার ছেড়ে এক ছুটে ওপারে গিয়ে উঠল। আধক্রোশ খানেক পথ সে হুকার দিয়ে, চাবুক মারতে মারতে বর্মান্ত ঘোড়াটাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলল। মাটি তখনও ভিজ়ে ঘোড়ার খুরে পাক জড়িয়ে যেতে লাগল, চাপড়া চাপড়া কাদা ছিটে আসতে লাগল শ্রিগোরির মুখে।

লক্ষ্য গিরিপথটা টিলার পাশ দিয়ে আঁকাবাঁকা হয়ে চলতে চলতে ডাইনে বৈকে তিনটে খাঁজ ভাগ হয়ে গেছে। আড়াআড়ি যে খাঁজটা পড়ল সেটা পার হয়ে শ্রিগোরি দূর থেকে কুকুরের কালো সারিকে শ্বেপের বুকে নেকড়েটাকে তাড়া করতে দেখে গডানে ঢাল বেয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। বিশেষ করে ওক আর এলডারেব ঘন জঙ্গলে ছাওয়া গিরিখাতের ঠিক মাঝখানে, যেখানে জড়ুটা ছিল সেখানে থেকে কুকুরগুলো তাকে তাড়া করে যে বাহিরে নিয়ে এসেছে তা বুঝতে বাকি রইল না। মাঝখানের ওই জায়গাটা যেখানে তিনটে খাঁজ হয়ে ভেঙে গেছে এবং গিরিখাত তিনটে কালো-নীল শাখায় ক্রমে গড়িয়ে নীচে নেমেছে, সেখানে নেকড়েটা খালি জায়গায় বেরিয়ে পড়েছে। সামনে কয়েক শ' গজ ঝাঁকা পেয়ে এই সুযোগে সোজা ছুটল পাহাড়ের নীচে, বহুকালের পুরানো ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া বুনো আগাছা আর শুকনো কাঁটাগাছের নিবিড় জঙ্গলে ভাঙি শুকনো উপত্যকা লক্ষ্য করে।

বাতাসেব ঝাপটায় চোখে জল এসে পড়ায় শ্রিগোবি ঝাপসা দেখছিল। জামার হাতায় চোখের জল মুছে রেকাবের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে শ্রিগোরি ওদের গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগল। বাঁ দিকে এক ঝলক তাকাতে সে তাদের জমিটা চিনতে পারল। চিকন মাটির সেই এবড়োখেবড়ো চৌকোনা ভাগটা এই সেই জমি, শরৎকালে সে আর নাতালিয়া যাতে লাঙল দিয়েছিল শ্রিগোরি ইচ্ছে করে ঘোড়া চালিয়ে দিল সেই চষা জমির ওপর দিয়ে। হৌচট খেতে খেতে চাবের জমিটা পার হতে ঘোড়াটার যতটুকু সময় লাগল সেই সামান্য কয়েক মুহূর্তের মধ্যে শ্রিগোরির শিকারের অত উৎসাহ-উদ্দীপনা সব জুড়িয়ে গেল। তার ঘোড়া নাক দিয়ে ঘন ঘন নিশ্বাস ছাড়ছিল। শ্রিগোরি উদাসীন ভাবে তাকে তাড়া দিতে লাগল। কর্তা আবার এদিক ওদিক লক্ষ্য করছে কিনা ভালো করে দেখে নিয়ে ঘোড়াটাকে হালকা চালে ছেড়ে দিল।

দূরে লাল দরীর কাছে দেখা যাচ্ছে ক্ষেতের চালা। সেটা এখন খালি। এক পাশে একটা জমিতে সদা লাঙল দেওয়া হচ্ছে - তিনজোড়া বলদে লাঙল টেনে নিয়ে চলেছে, চষা মাটি মশমলের মতো দেখাচ্ছে।

‘আমাদের গাঁয়ের লোক। কাব জমি হতে পারে? আনিকুশকার নয় ত?’

গ্রিগোরি চোখ কুঁচকে তাকান, বলদগুলোকে আর লাঙলের পেছন পেছন যে লোকটা যাচ্ছে তাকে চেনার চেষ্টা করল।

‘ধব, ধব।’

গ্রিগোরি দেখতে পেল নেকড়েটা চওড়া খাতটার দিকে ছুটে যাওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে দু’জন কসাকের চোখে পড়ে গেছে তারা সঙ্গে সঙ্গে লাঙল বন্ধে রেখে তার যাবার পথ আটকাতে ছুটল। একজন বেশ বড়সড় চেহারার, মাথায় লাল ফিতে জড়ানো কসাক-টুপি। টুপির বাঁধনটা তার খুঁতনির নীচের দিকে নেমে গেছে। লোকটা বলদের জোয়াল থেকে একটা লোহার ডাঙা খসিয়ে নিয়ে খোরাতে শুবু করে দিয়েছে। এই সময় নেকড়েটা হঠাৎই একটা গভীর লাঙলের দাণের মধ্যে পেছন দিকটা নামিয়ে দিয়ে বসে পড়ল। ‘শিকারী বাজ’ নামে ছাইরঙা কুস্তাটা পুরো বেগে ছুটতে ছুটতে সোজা তার ওপর দিয়ে লাফিয়ে গিয়ে ধপ করে মাটিতে পড়েই সামনের দুই খাৰা গোড়ে বসে পড়ল, বুড়ি কুস্তীটা খেমে যাবার চেষ্টায় চৰা মাটির ঢিবিতে পেছন দিকটা ঘসড়াতে লাগল, কিন্তু সামলাতে না পেরে হুড়মুড় করে গিয়ে পড়ল নেকড়েটার গায়ের ওপরে। নেকড়েটা ভীষণ ডাবে মাথা নাড়াতে বুড়ি কুস্তীটা ছিটকে চার পা ছড়িয়ে এক পাশে পড়ে গেল। কুকুরগুলো ইতিমধ্যে নেকড়েটাকে ছেকে ধরেছে। এখন দেখে মনে হচ্ছে ফেন একটা বিশাল কালো কুণ্ডলী সেটা এদিক ওদিক হেলে দুলে চৰা জমির ওপর কয়েক হাত ছুটোপাটি খেল, শেষকালে একটা বল-এর মতো গড়াতে লাগল। গ্রিগোরি মনিবের চেয়ে কয়েক মুহূর্ত আগে এসে উপস্থিত হল। সঙ্গে সঙ্গে জিন থেকে লাফিয়ে নামল, শিকারের ছুরিসুঁজ হাতটা পিছনে রেখে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল।

ওই যে, ওই যে ওটা! তলায়। বসিয়ে দাও ওটার গলায়।’ লোহার ডাঙা হাতে কসাকটার চিৎকার শুনে তার কণ্ঠস্বরটা গ্রিগোরির কেমন যেন চেনা চেনা মনে হল। লোকটা হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসে গ্রিগোরির পাশে নীচু হয়ে বসে পড়ল, নাক দিয়ে ফোঁস ফোঁস আওয়াজ করতে লাগল। যে কুকুরটা নেকড়ের পেট কামড়ে ধরে ছিঁড়ছিল ঘাড়ের চামড়া ধরে তাকে টেনে সরিয়ে দিল, তারপর তার বিশাল পাঁচ আঙুলের খাৰার নেকড়ের সামনের পাদুটো ছেঁদে ফেলল। নেকড়ের গায়ের কর্কশ লোমগুলো খাড়া হয়ে উঠল। ঘন লোমের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে হাতড়ে হাতড়ে নেকড়ের গলার নলিটা বার করে টেনে ধরে গ্রিগোরি খাঁচ করে ছুরি চালিয়ে দিল।

‘কুকুরগুলো।’ কুকুরগুলো তাড়াও। জিন থেকে লাফিয়ে চৰা নরম জমির ওপর নামতে নামতে কড়া পক্ষাঘাতগ্রস্তের মতো ঘড়ঘড় ভাঙা আওয়াজ করে চিৎকার করল। তার মুখ নীল হয়ে গেল।

ত্রিগোবিন্দ অনেক কষ্টে কুকুরগুলোকে ত্যাগ, তারপর ফিরে তাকাল মনিবের দিকে

একটু দূরে এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে স্তম্ভপান আস্তাবত। মাথার টুপি পালিশ করা কিতোটা তখনও খুতনির বেশ খানিকটা নীচে নামানো। লোহার ডাঙাটা সে হাতে নিয়ে যোরাচ্ছে, ফেঁকাসে হয়ে ওঠা মুখের নীচেকার চোয়াল আর ভুরুদুটো সে অদ্ভুত ভাবে নাচাচ্ছে।

‘তোমার বাড়ি কোথায় হে?’ কর্তা তার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল। ‘কোন গ্রাম?’

‘তাতারস্কি। একটু সময় নিয়ে স্তম্ভপান উত্তর দিল, তারপর ত্রিগোবিন্দ দিকে কয়েক পা এগিয়ে গেল

‘কাদের বাড়ির?’

‘আস্তাবত।’

‘তাহলে শোন বাবা, একটা উপকার করতে হবে কখন বাড়ি ফিরবে?’

‘আজ রাতে

‘এটাকে আমাদেব বাড়িতে নিয়ে এসো।’ পা দিয়ে নেকড়েটা দেখিয়ে কর্তা বলল। নেকড়েটা তখন মৃত্যু যন্ত্রণায় থেকে থেকে দাঁত খিচোচ্ছে, তার পেছনের একটা পা টান টান হয়ে উঁচিয়ে আছে। ঠ্যাঙটার হাঁটুর ওপর একগোছা ছাইরঙা চুল বসে গেছে।

‘বা লাগে দেব,’ এই বলে কর্তা গলায় হুমাল দিয়ে আরক্ত মুখের ঘাম মুছে একপাশে সরে গেল। তারপর একটু কাত হয়ে শিঠ থেকে ফ্লাস্কের সব বেল্টটা খুলতে লাগল।

ত্রিগোবিন্দ তার নিজের ঘোড়াটার কাছে চলে গেল। রেকাবে পা রেখে সে ফিরে তাকাল। দেখতে পেল স্তম্ভপানের সর্বাঙ্গ ধরধর করে কাঁপছে, সে-কাঁপুনি সে থামাতে পারছে না। কাঁপতে কাঁপতে, ঘাড় নাড়াতে নাড়াতে, বিশাল বিশাল ভারী হাতদুটো বুকের কাছে শক্ত করে চেপে ধরে স্তম্ভপান এগিয়ে আসছে তার দিকে

## আঠারো

গুড ফ্রাইডের দিন রাতের বেলায় কোরশুনভূমের পড়শী পেলাগেইয়া মাইসা-মিকভের বাড়িতে পাড়ার যত মেয়েবা এসে জুটেছে গল্পগুজব করার উদ্দেশ্যে। পেলাগেইয়ার স্বামী গাব্রিলা লোজ্ থেকে চিঠি লিখেছে, ইস্টাবের ছুটিতে বাড়ি আসবে বলে জানিয়েছে। পেলাগেইয়া সোমবারের মধ্যেই দেয়াল চুনকাম করে ফেলেছে, ঘরদোর গোছগাছ করে রেখেছে। বৃহস্পতিবার থেকে সে প্রতীক্ষা করছে,



গেটের বাইরে ঊঁকি ঊঁকি মারছে, অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে থাকছে বেড়ার কাছে এলো চুল রোগা শরীর মুখে তার ফুটে উঠেছে পোয়াতির চিহ্ন। হাতের চোটো দিয়ে চোখ আড়াল করে সে দেখার চেষ্টা করছে স্বামী তার আসছে কিনা। বলা ত যায় না! সে সম্ভানসম্ভবা, তবে আইনসম্মত ভাবেই। গত বছর গ্রীষ্মকালে গান্ধিলা রেক্সিমেন্ট থেকে ছুটি নিয়ে বাড়িতে এসেছিল, বৌয়ের জন্য এনেছিল পোলিশ ছিট কাপড় এসেছিল অল্প কয়েক দিনের জন্য 'বৌয়ের সঙ্গে চারটে রাত কাটিয়েছিল। পাঁচ দিনের দিন মদ খেয়ে চুর হয়ে পোলিশ ভাষায় আর জার্মান ভাষায় বৌকে গালিগালাজ করতে থাকে আর চোখের জলে ভেসে গিয়ে গাইতে শুরু করে সেই ১৮৩১ সালে পোলায়ণ্ডকে নিয়ে বাঁধা পুরনো একটা কসাক গান ভাই আর ইয়ারবন্ধুদের নিয়ে সে টেবিলের ধারে বসে খানাপিনা করছিল পল্টনের কাজে সে চলে যাচ্ছে বলে ওরা তাকে বিদায় জানাতে এসেছিল দুপুরের খাবারের আগেই সকলে মিলে প্রচুর ভোদকা টেনেছিল, তারাও ওর সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান শুরু করে দেয়

শুনেছি পোলায়ণ্ড নাকি মহা ধনী, বড়লোক দেশ  
 ভাষা মিছে, লক্ষ্মীছাড়া, দারিদ্র্যের সেথা নেই শেষ।  
 সে দেশে বিশাল বড় ঈড়িখানা আছে,  
 রাজকীয় ঈড়িখানা গজা পোল খাঁচে  
 সেখানে প্রুশীয়, পোল, ঘনের কসাকে  
 মস্তান তিনজনে চুর হয়ে থাকে,  
 প্রুশীয় ভোদকা খেয়ে কড়ি ঠিক ফেলে  
 পোল সে ত খেয়ে চাঁদি দেয় হেসেখোলে  
 কসাক সে ঠেকায় না এক কানাকড়ি,  
 সওয়াবের যুট পায়ে কবে পায়েচাষি  
 ঠোকে বুট ঠুনঠুন, ইতি উক্তি চায়  
 দোকানের ছুঁড়িটারে ডাকে ইশাখায়  
 ওরে মেয়ে সাথে চল, ওগো প্রাণেশ্বরী  
 প্রশান্ত ঘনের ধারে আছে মোর বাড়ি  
 তকলিতে সুতো কাটা, চাফাস মাড়াইয়ের কাজে  
 মন নেই আমামের, সাথে আছে সাজে

দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পর গান্ধিলা পরিবারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যায়। সেই দিন থেকেই পোলাগেইয়া তার ঘাঘরার ঘের লক্ষ করতে শুরু করে

নাতালিয়া কোরশুনভাকে সে তার গর্ভবতী হওয়ার যে ব্যাখ্যা দিল সেটা এই রকম

গাড়িউশা আসার দিন করেক আগে আমি ভাই একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম।

আমি যেন একটা জলা মাঠের ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছি, এমন সময় আমার সামনে দেখতে পেলাম বুড়ি গাইটা, যেটাকে আমরা গত গরমকালে আগস্ট পরবের সময় বেচে দিয়েছিলাম। গোরুটা চলেছে আর সঙ্গে সঙ্গে তার বাঁট থেকে টপটপ করে দুধের ধারা করে পোছন পোছন একটা পথ তৈরি হয়ে যাচ্ছে। আমি মনে মনে ভাবলাম, 'মা গো, এমন বিচ্ছিন্নি ভাবে আমি গোরুটাকে দুইলাম কী করে?' এই ঘটনার পর বুড়ি স্রোজদিখা আমার কাছে এলে আমি তাকে স্বপ্নের কথা বললাম। বুড়ি বলল, 'এক ডেলা মোম নিয়ে গোয়ালে যা, ডেলা থেকে ঝানিকটা মোম ভেঙে একটা গোলা পাকিয়ে কাঁচা গোবরের গাদায় পুঁতে আয়, তোর বাড়ির জানলার সামনে অলঙ্করণ ঝুঁকি মারছে।' আমি ত সঙ্গে সঙ্গে ছুটলাম, কিন্তু মোমবাতি ঝুঁকে পেলাম না একটা ছিল বটে, কিন্তু সেটা হয়ত ছেলেপুলেরা গর্ত থেকে কাঁকড়াবিছে ঝুঁচিয়ে বার করার জন্যে কোথাও সরিয়েছে। তারপরই গাড়িউশা এলো বাড়িতে, আর তখন থেকেই এই ভোগান্তির শুরু। এর আগে তিন বছর আমার গায়ে জামাকাপড় ঢলঢল কবত, আর এখন দেখ 'ইস' পেলাগেইয়া তার জয়চাকের মতো ফোলা পেটে খোঁচা মেরে আঁকুপ করে বলল।

স্বামীর অপেক্ষায় থেকে থেকে পেলাগেইয়া হাঁপিয়ে উঠেছে, একা একা তার বারাম লাগে। তাই সে গল্পগুস্তা করে সময় কাটানোর জন্যে এই শুক্রবার পড়শী বৌ-ঝিন্দের ডেকে এনেছে। নাতালিয়া এসেছে তার বোনসব কাজ নিয়ে হাতের মোজাটা এখনও সে বুনে শেষ করতে পারে নি (বসন্ত যত এগিয়ে আসছে গ্রীষ্মকাল দাদুর শীত যেন তত বেশি করে লাগছে)। নাতালিয়াকে বেশ সজীব দেখাচ্ছে। অন্যদের হাসি ঠাট্টায় সে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে হাসছে, আসলে সে চায় না যাতে মেয়েরা টের পেয়ে যায় স্বামীর জন্যে তার প্রাণ ভীষণ ছটফট করছে। পেলাগেইয়া তার বেগমী রঙের শিলা ওঠা খালি পাদুটো ঝুলিয়ে চুমীর ওপরকার তক্তাপোষে বসেছে, ফ্রোসিয়া নামে এক কুচুটে স্বভাবের যুবতীর সঙ্গে ঠাট্টা মশ্কারা করছে।

'আজ্ঞা ফ্রোসিয়া, তুই তোর সোয়ামিটাকে পিটোলি কী করে রে?'

'কী করে তা জান না বুঝি? শিঠে, মাথায়, বেখানে যেখানে পেয়েছি।'

'আরে না আমি সে কথা বলছি নে, বলছি ব্যাপারটা শুরু হল কী ভাবে?'

'যে ভাবে হওয়ার সেই ভাবেই শুরু হল আর কি,' অনিচ্ছাভরে উত্তর দিল ফ্রোসিয়া।

‘তুই যদি অন্য কোন মাসীর সঙ্গে নিজের মরদকে দেখতিস তাহলে কি মুখ বুজে থাকতিস?’ ধীরে ধীরে একেকটা শব্দ আলাদা আলাদা উচ্চারণ করে জিজ্ঞেস করল লগির মতো ঢাঙা এক মেয়েমানুষ - মাতভেই কাশুলিনের ছেলের বৌ।

‘বল না রে ছোসিয়া।’

‘বলার মতো কিছু নেই গালগল্প করার আর জিনিস পেলেন না বুঝি?’

‘অমন করছিস কেন লা? এখানে সবাই আমরা আপনার জন্য’

ছোসিয়া দাঁতের ফাঁক দিয়ে থু থু করে সূর্যমুখীর বিচির খোলা হাতের চেটোয় ফেলে মৃদু হেসে বলল

‘আমি অনেকদিন থেকেই নজর রাখছিলাম এই সময় একজন আমাকে খবর দিল, দেখ গে তোমার মরদ দনের ওপারের এক সোয়ামি-ছাড়া সেপাই-বৌয়ের সঙ্গে আটাকলে গিয়ে কাজ করতে লেগেছে আমিও সঙ্গে সঙ্গে সেখানে গিয়ে হাজির গম ভাঙানোর কলের কাছে ওদের মেথা পেলাম।’

‘কি রে নাভালিয়া, তোর সোয়ামির আর কোন খবর শেলি?’ কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে নাভালিয়ার দিকে ঘুরে জিজ্ঞেস করল কাশুলিনের ছেলের বৌ।

‘ইয়াগদনোয়েতে আছে ও মৃদুস্বরে নাভালিয়া জবাব দিল।

ওর সঙ্গেই ঘর কববি বলে ভাবছিস নাকি?’

‘ও হয়ত ভাবলেও ভাবতে পারে কিন্তু মিংগোরি মোটেই মাথা ঘামায় না,’ গৃহকর্ত্রী কোড়ন কাটল

নাভালিয়া অনুভব করল উষ্ণ রক্তোচ্ছাস ছড়িয়ে পড়ল তার মুখে। তার চোখ ফেটে জল এলো সে সঙ্গে সঙ্গে মোজার ওপর ঝুঁকে পড়ল, আড়চোখে তাকাল মেয়েদের দিকে যখন দেখতে পেল ওরা সকলে তার দিকে তাকিয়ে আছে এবং লজ্জার রঙ তাদের কাছ থেকে লুকানোর কোন উপায় নেই, তখন ইচ্ছে করেই, কিন্তু আনাড়ির মতো এমন ভাবে কোল থেকে পশামের গুলিটা ফেলে দিল যে সেটা কাবও নজর এড়াল না। তারপর গুলিটা তোলার জন্য নীচু হয়ে ঠাণ্ডা মেঝের ওপর হাতড়াতে লাগল

ওর মুখে ব্যাটা মার ঝুঁড়ি। তেমন ঘাড় হলে বোয়াল ত পড়বেই,’ প্রকাশো দরদ দেখিয়ে একজন উপদেশ দিল।

নাভালিয়ার লোক-মেথানো সজীবতা বাতাসের মুখে আগুনের ফুলকির মতো নিভে গেল মেয়েদের কথাবার্তা এবারে সর্বশেষ কেচ্ছাকাহিনী ও গালগল্পের দিকে মোড় নিল। নাভালিয়া নীরবে মোজা বুনতে লাগল আড্ডার শেষ অবধি অনেক কষ্টে বসে রইল মনে মনে একটা অনিদিষ্ট ভাসা ভাসা সঙ্কল্প নিয়ে সে বাড়ি ফিরে এলো নিজের অনিশ্চিত অবস্থার জন্য যে লজ্জা সে এখনও

বিস্বাস করতে পারছে না যে খ্রিগোরি চিরকালের জন্য তাকে ত্যাগ করে চলে গেছে, খ্রিগোরির জন্য সে প্রতীক্ষা করছে, তাকে ক্ষমা করার জন্য সে প্রস্তুত। তা তাকে ঠেলে দিল সত্য পূরণ করার পথে। ঠিক করল বাড়ির কাউকে না জানিয়ে গোপনে ইয়াগদনোয়েতে খ্রিগোরিকে চিঠি লিখে জানাতে চাইবে সে চিরদিনের জন্য তাকে ছেড়ে চলে গেছে কিনা নাকি সে তার মত পরিবর্তন করেছে। পেলাগেইয়ার বাড়ি থেকে সে যখন ফিরল তখন অনেক রাত হয়ে গেছে। ঠাকুর্দা তার নিজের ঘরটিতে বসে গলা মোমের ফোঁটায় ছাওয়া, চামড়ায় ঝাঁপানো একটা ছেঁড়াখোঁড়া তেলচিটে সুসমাচার-পুঁথি পড়ছিল। মিরোন খ্রিগোরিয়েভিচ রান্নাঘরে মাছধরার ছাঁকাজালে একটা আঙুটা লাগাতে লাগাতে মিখেইয়ের মুখ থেকে বহুকাল আগে সংঘটিত কোন এক হত্যাকাণ্ডের বিবরণ শুনছিল। নাতালিয়া যা বাচ্চাদের বিছানায় শুইয়ে দিয়ে উনুনের ওপরকার তক্তাপোষে শুয়ে ঘুমোচ্ছিল। তার দু'পায়ের কালো কালো চোটোদুটো সরজ্ঞার দিকে মুখ করা, নাতালিয়া ওপরকার কোটটা ছেড়ে উদ্দেশ্যহীন ভাবে এঘর ওঘর করল। সামনের বড় ঘরটার এক কোনায় একটা তক্তার পার্টিশন দেওয়া তার পেছনে বোনার জন্য তিসি বীজ জুপাকার করে রাখা হয়েছে। সেখান থেকে ইঁদুরের কিচকিচ আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল।

নাতালিয়া মুহূর্তের জন্য ধমকে দাঁড়াল ঠাকুর্দার ঘরে। কোনার ছোট টেবিলটার পাশে দাঁড়িয়ে বিগ্রহের নীচে থাক থাক করে রাখা ধর্মগ্রন্থগুলোর দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

‘তোমার কাছে কাগজ আছে, দাদু?’

‘কিসের কাগজ রে?’ কপালের পুরু বলিবেখা কুঁচকে চশমার ফাঁক দিয়ে তাকাল বুড়ো।

‘লিখবার কাগজ’

বুড়ো খ্রিশ্চাকা স্তবমালার ভেতরে হাতড়ে এক টুকরো দোমড়ানো কাগজ বার করল। কাগজের টুকরোটা থেকে আগের দিনের পুজোয় ব্যবহার করা মধু আর গুনের ঝাঁঝাল গন্ধ বেরোচ্ছে।

‘পেন্সিল আছে?’

‘তোমার বাপের কাছে গিয়ে চা। এখন যা রে লক্ষ্মীটি, বিরক্ত করিস নে’

নাতালিয়া বাবার কাছ থেকে পেন্সিলের টুকরো যোগাড় করে নিল। টেবিলের ধারে এসে বসল। বহুদিন আগে থেকে যে সূচিক্তিত ভাবনাগুলো তার মনের মধ্যে কুরে কুরে খাওয়া এক অসাড় বেদনা জাগিয়ে তুলেছিল, অনেক কষ্টে আবার নতুন করে তাই নিয়ে সে মনে মনে আন্দোলন করতে বসল।

পরদিন সকালে ভোদকার লোভ দেখিয়ে হেটকে রাজী করিয়ে চিঠি দিয়ে পাঠাল ইয়াগদুনোরোভে। চিঠিতে সে লিখেছিল

‘গ্রিগোরি পাস্তেলেরেভিচ,

আমি কেম্বন করিয়া জীবন কাটাইব এবং আমার জীবন চিরকালের মতো শেষ হইয়া গেল কিনা আমাকে লিখিয়া জানাইবে কি? তুমি ঘর ছাড়িয়া গেলে, কিন্তু আমাকে একটি কথাও বলিয়া গেলে না। আমি কখনও তোমার কোন অমর্যাদা করি নাই। আমি অপেক্ষা করিয়াছিলাম। তুমি আমার হাতের বাঁধন খুলিয়া দিয়া বলিবে যে চিরকালের জন্য চলিয়া গেলে। কিন্তু তুমি তাহা না করিয়া গ্রামের সহিত তোমার সম্পর্ক চুকাইয়া দিলে, মৃত মানুষের মতো চূপ করিয়া রহিলে।

আমি ভাবিয়াছিলাম, তুমি বোঁকের মাথায় চলিয়া গিয়াছ। তাই অপেক্ষা করিতেছিলাম কবে তুমি ফিরিবে। কিন্তু তোমাদের বিচ্ছেদ আমি ঘটাইতে চাই না। দুই জনের অপেক্ষা একা আমার জীবন নষ্ট হওয়াও ভালো। এই শেষ বারের মতন আমাকে দয়া কর, একখানা পত্র দিও। তখন জানিতে পারিব কিসের ভাবনা আমাকে করিতে হইবে, কিন্তু এখন আমি দাঁড়াইয়া রহিয়াছি পথের মাঝখানে।

গ্রীটের দোস্তাই গ্রিশা, আমার উপর তুমি রাগ করিও না

নাভালিয়া’

ভালোমতো ভোদকা টানার আশায় গোমজামুখো হেট মাড়াইয়ের উঠানে একটা ঘোড়া বার করে আনল। মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচের চোখের আড়ালে ঘোড়াটার মুখে কোন রকমে একটা লাগাম পরিয়ে জিন ছাড়াই পিঠের ওপর উঠে বসে হাঁকিয়ে দিল। ঘোড়ার সওয়ারী হওয়ার বাপারে কসাকদের মতো স্বাভাবিক দক্ষতা তার ছিল না। বসল সে আনাড়ির মতো। দুলকি চালের সঙ্গে সঙ্গে তার জামার হাতার ছেঁড়াখোঁড়া কনুইদুটো লটরপটর করতে লাগল। কসাকদের ছেলেপুলেরা রাস্তায় খেলতে খেলতে দ্রুত দুলকি চালে তাকে এই ভাবে ঘোড়া চালিয়ে যেতে দেখে পেছনে লাগল চোঁচাতে লাগল।

‘বোঁটন! বোঁটন!’

‘ওরে বোঁটন তেলো হাঁড়ি

‘দেখিস, পাড়ে ঘাস নি কিন্তু

‘দাখ দাখ, বেড়ার গায়ে একটা কুস্তা বসেছে।’ তার পেছন পেছন ছেলের দল সমানে চিৎকার করে চলল।

জবাব নিয়ে সে ফিরে এলো সন্ধ্যানাগাদ চিঠি বলতে সে যা এনেছে তা হল চিনির ঠোঙার এক টুকরো নীল কাগজ জামার ভেতরে হাত গলিয়ে বুকের কাছে থেকে কাগজটা বাব করে নাতালিয়ার দিকে তাকিয়ে সে চোখ টিপল। বলল, ‘পথ সাংঘাতিক দিদিঠাকরুন! ঝাঁকুনির চোটে তোমার হেট বেচারির পেটের নাড়িভূড়ি হিঁড়ে যায় আর কি।’

চিঠিটা পড়ামাত্রই নাতালিয়ার মুখ ফেকাসে হয়ে গেল। চারবারে চারটে ধারাল দাঁত যেন তার বুকের মধ্যে কেটে বসে গেল।

চারটে ধাবড়ানো শব্দ কাগজটাতে ‘একই থাকিও খ্রিগোরি মেলেক্‌ভ

নিজের শক্তির ওপব নাতালিয়া আর যেন কোন আস্থা রাখতে পারছিল না, তাই সে ব্রহ্ম পায়ে ঘরের ভেতরে ঢুকে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। লুকিনিচনা রাতের জন্য উনুন ধরাচ্ছিল। যাতে সকাল সকাল রান্নাবান্না সেরে সময়মতো ইস্টারের কেক তৈরি করে ফেলা যায়।

‘ওরে নাতাশা, এদিকে এসে একটু হাত লাগা ত আমার সঙ্গে,’ মেয়েকে ডাকল সে।

মাথা ব্যথা করছে মা আমি একটু শুয়ে থাকি।’

লুকিনিচনা দরজা দিয়ে মাথা গলিয়ে বলল একটু কিছু মুখে দিলে পারতিস আঁ। কী বলিস? হয়ত সেরে যেত।’

নাতালিয়া কোন কথা না বলে ঠাণ্ডা ঠোঁটে শুকনো জিভ ঠেকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত গরম পশমী শালে মাথা ঢেকে শুয়ে রইল। তার গুটিসুটি পাকানো শরীরটা মৃদু কম্পনে ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। সে যখন বিছানা ছেড়ে উঠে রান্নাঘরে গেল ততক্ষণে মিরোন খ্রিগোরিয়েভিচ আর খ্রিশাকা দাদু গিজায় যাবার উদ্যোগ করছে সুন্দর পাট করে আঁচড়ানো কালো চুলে দু’পাশের বগের কাছে চিকচিক করছে ঘাম। তার চোখের ওপব পড়েছে একটা অসুস্থ তেলতেলে আবরণ

মিরোন খ্রিগোরিয়েভিচ তার চওড়া সালায়াবের লম্বা সার দেওয়া ঘরায় বোতাম আঁটতে আঁটতে মেয়ের দিকে কটাক্ষ তাকাল

‘এই সময় কি না তুই অসুখে পড়লি। চল, আমাদের সঙ্গে সকালের প্রার্থনায় যাবি চল।’

‘তোমরা যাও আমি পরে যাবি।’

‘যখন সব শেষ হয়ে যাবে?’

‘না, আমি একুনি জামাকাপড় পরছি      জামাকাপড় পরা হয়ে গেলেই  
বেরিয়ে পড়ব।’

বাড়ির পুরুষেরা চলে গেল এখন বাড়িতে রয়ে গেল শুধু লুকিনিচনা আর  
নাতালিয়া অবসাদগ্রস্ত নাতালিয়া উদ্দেশ্যহীন ভাবে সিঁদুকের কাছ থেকে বিছানার  
দিকে পাঁয়চারি করে বেড়াতে লাগল, শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সিঁদুকের  
ভেতরকার ওলটপালট করা তুসীকৃত জামাকাপড়ের দিকে, যত্নপায় কাতর হয়ে  
কী যেন একটা বিষয় নিয়ে ভাবতে ভাবতে আপন মনে ঠোট নেড়ে বিড়বিড়  
করতে লাগল লুকিনিচনা তবল নাতালিয়া হয়ত কোন পোশাক পরবে ঠিক  
করে উঠতে পারছে না তাই জননীসুলভ উদারতাকশত তাকে বলল, ‘আমার  
নীল ঘাঘরাটা পর লক্ষ্মীটি এখন ওটা তোর গায়ে একদম ঠিক হবে।’

ঈর্ষ্যার কোন নতুন পোশাক এবারে নাতালিয়ার জন্য সেলাই করা হয়  
নি। বিয়ের আগে মেয়ে পূজো-পার্বণ উপলক্ষে মায়ের সব খয়ের নীল ঘাঘরাটা  
পরতে যে ভালোবাসত সেকথা মনে পড়ে যেতে লুকিনিচনা নিজে থেকে তার  
সম্পত্তিটা মেরেকে নেওয়ার জন্য জিদ করল তার ধারণা হয়েছিল নাতালিয়া  
বুঝি বাছাই করার মতো কিছু নেই বলে দুঃখ পাচ্ছে।

‘পরবি? আমি তাহলে বাব করে দিই।’

না আমি এই এটা পরে যাব।’ নাতালিয়া সন্তর্পণে তার সবুজ ঘাঘরাটা  
টেনে বাব করল হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল গিগোরি যেদিন ভারী বর হয়ে  
তাকে দেখতে এসেছিল ঠাণ্ডা চাকলটার নীচে আলতো চুমো খেয়ে তাকে প্রথম  
লজ্জা পাইয়ে দিয়েছিল সেদিনও তার পরনে এই ঘাঘরাটাই ছিল। সঙ্গে সঙ্গে  
উদগত কাপ্তার ঠেলায় ধরধর করে কাঁপতে কাঁপতে সিঁদুকের টেনে তোলা ডলার  
কিনারার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল।

‘নাতালিয়া কী হল রে তোর?’ মা হতভম্ব হয়ে বলল।

নাতালিয়ার গলার ভেতর দিয়ে কান্না ঠেলে উঠতে চাইছিল। সেই আকাঙ্ক্ষা  
দমন করে একটা শুকনো কর্কশ হাসি হেসে উঠল সে।

‘কী যে হয়েছে আজকাল আমার।’

‘আমি লক্ষ করছি রে নাতাশা।’

‘কী তুমি লক্ষ করছ মা?’ সবুজ ঘাঘরাটা হাতের মুঠোয় দলা পাকাতে  
পাকাতে হঠাৎ বাগেব মাথায় চিৎকার করে উঠল নাতালিয়া

‘তোর ভালো কোন লক্ষণ আমি দেখতে পাচ্ছি নে।      বিয়ে হওয়া দরকার।’

‘হয়েছে      একবার ত হয়েইছিল

নাতালিয়া জামাকাপড় পরাব জন্য নিজের ঘরে চলে গেল কিছুক্ষণ পরেই

ফের বারান্দাঘরে এসে ঢুকল। এবারে সাজগোজ করে। কুমারী মেয়েৰ মতো তব্বী, নীল পাণ্ডুর বর্ণ, মুখে নিরানন্দের স্বচ্ছ নীল রক্তাভা।

‘একাই যা আমি এখনও হাতের কাজ সেরে উঠতে পারি নি।’ মা বলল

জামার হাতার ভাঁজে বুলাল গুঁছে নিয়ে নাভালিয়া বাড়ির দেউড়ির কাছে বেরিয়ে এলো। দনের বুক থেকে বাতাসে ভেসে আসছে ভাসন্ত বরফের সরসর আওয়াজ আর গলা বরফের ভিজে টাটকা স্নিগ্ধ গন্ধ। বাঁ হাতে ঘাঘরাটা তুলে ধরে রাস্তার এখানে ওখানে নীলাভ শূক্তির মতো ছড়িয়ে থাকা ছোট ছোট ডোবাগুলো বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে নাভালিয়া শেষকালে গির্জায় এসে পৌঁছল। পরবের কথা। ছাড়া ছাড়া ভাসা ভাসা এটা ওটা সব কিছু চিন্তা করতে করতে পথেই সে তার মনের আগেকার সেই ভারসাম্য ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছিল। কিছু তার ডাবনা যেন জিদ ধরে বইল যাববার ফিরে যেতে লাগল বৃকের কাছে লুকিয়ে রাখা নীল ঠোঙার কাগজের টুকরোটোর দিকে ফিরে যেতে লাগল গ্রিগোরির কাছে আর সেই সৌভাগ্যবর্তীর কাছে, যে এখন তার কথা ভেবে কপাডরে হাসছে, হয়ত বা তাকে কবুণাও করছে।

নাভালিয়া গির্জার আঙিনায় ঢুকল। কিছু ছোকরা তার পথ আটকে দাঁড়ান তাদের এডিয়ে ঘুরে যাওয়ার সময় সে শুনতে পেল ওরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছে

‘কাদের বাড়ির মেয়ে রে? ধরতে পারলি?’

‘হ্যাঁ, ওই ত নাভামা কোব্‌শুনভা।’

‘শুনেছি ওর নাকি তলপেটের কী একটা ব্যামো আছে। তাইতে স্বামী ওকে ছেড়ে চলে গেছে।’

‘কী সব আত্মবাক্সে বকছিস মেয়েটা ওর স্বশ্রুতের সঙ্গে খোঁড়া পাঙ্কলেইয়ের সঙ্গে ফটিনাষ্ট্রি করত।’

‘আচ্ছা তাই বল! সেই জন্যই গ্রিশ্কা বাড়ি ছেড়ে পাণিয়েছে?’

‘তা নয়ত কি? আরে মেয়েটা এখনও

আঙিনায় বিছানো উঁচু নীচু পাথরের ওপর হৌচট খেতে খেতে নাভালিয়া গির্জার বারান্দায় গিয়ে উঠল। অম্লীল শব্দের চাপা গুঞ্জন পেছন থেকে ঢিলের মতো তার গায়ে এসে পড়ল। বারান্দার ওপর দাঁড়িয়ে ছিল কিছু মেয়ে, তাকে দেখে বিজবিল করে হেসে উঠল, নাভালিয়া তাই সেখাে অন্য গেটের দিকে এগোল, মাতালের মতো টলতে টলতে বাড়ির দিকে ছুটল। বাড়ির গেটের সামনে এসে সে থেমে দম নিল, ঠোট কামড়াল। ঠোটদুটো কামড়ে কামড়ে ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত হয়ে উঠেছে, ফুলে উঠেছে উঠানে ঢুকতে গিয়ে ঘাঘরার আঁচলে



তার দু'পা জড়িয়ে যেতে লাগল বাড়ির উঠানের ওপর নেমে এসেছে বেগনী রঙের অঙ্ককার তারই মধ্যে কালো হাঁ করে আছে চালাঘরের আধখোলা দরজাটা একটা প্রাণপণ হিংস্র চেষ্টায় নাভালিয়া তার শেষ শক্তিতুক সঞ্চয় করে দরজাটার দিকে ছুটে গেল, ত্রুট পায়ে দরজার চৌকটি পেরিয়ে ভেতরে ঢুকল শুকনো ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা চালাঘরের ভেতরটায় ঘোড়ার সাজের চামড়া আর গাদা করা বাসি খড়ের গন্ধ মনের মধ্যে কোন রকম ভাবনাচিন্তা ও অনুভূতির প্রস্থয় না দিয়ে যে-গভীর কালো বেদনা তার লজ্জা ও কলঙ্কে পরিপূরিত হতাশ হৃদয়ে নখর বসিয়ে তাকে ছিঁড়ে খুঁড়ে ফেলেছে তারই বশে সে হাতড়ে হাতড়ে ঘরের কোনায় এগিয়ে গেল। সেখানে একটা কান্ডে দেখতে পেয়ে হাতল থেকে তার ফলাটা খুলে হাতে তুলে নিল (তার গতিবিধি এখন বীরশ্রির, সুনিশ্চিত ও যথাযথ)। তারপর মাথাটা পেছন দিকে হেলিয়ে একটা বিপুল আনন্দ ও মৃত সঙ্কল্পের প্রবল উচ্ছ্বাসে প্রাণপণ শক্তিতে ধারাল ফলাটা গলায় বসিয়ে দিল আগুনের মতো লেলিহান এক ভয়ঙ্কর যন্ত্রণায় সে যেন বাড়ি থেকে মাটিতে পড়ে গেল কিন্তু পড়ে গিয়েই অনুভব করল, আবছা আবছা বুঝতে পারল যে সে সম্পূর্ণ কৃতকার্য হতে পারে নি। তাই সে প্রথমে চার হাত পায়ে ভর দিয়ে, তারপর দুই হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি (বুক রক্তে ভেসে যাচ্ছে দেখে সে ভয় পেয়ে গেল) কাঁপা কাঁপা আঙুলে টেনে টেনে জামার বোতাম ছিঁড়ে কেন যেন সামনের দিকটা খুলে ফেলল। এক হাতে অবাস্য কঠিন স্তনকে পাশে সরিয়ে নিয়ে অন্য হাতে কান্ডের ফলাটা তার ওপর ধরল। হাঁটুতে ভর দিয়ে দেয়ালের কাছে এগিয়ে গিয়ে কান্ডের ভোঁতা দিকটা দেয়ালে ঠেকিয়ে দিল, তারপর পিছন দিকে হেলানো মাথার ওপরে হাতদুটো ভাঁজ করে তুলে জোর করে বুক এগিয়ে দিল সামনের দিকে আরও সামনে স্পষ্ট শুনতে পেল, অনুভব করতে পারল বাঁধাকপি কাটার মতো একটা বিস্ত্রী কচকচ শব্দ হবে কান্ডের মাংসের মধ্যে কেটে কেটে বসে যাচ্ছে, তীব্র যন্ত্রণার ঢেউটা বাড়তে বাড়তে লকলক করতে করতে বুকের ওপর দিয়ে গলা পর্যন্ত উঠে এলো, বিনবিন করে শত শত ছুঁচ কানে এসে বিধল

বাড়ির দরজায় কাঁচ করে শব্দ হল লুকিনিচনা পা ঘসে ঘসে ধাপ বয়ে যারাম্মা থেকে নামছে। গিঞ্জার ঘণ্টামিনার থেকে সমান তালে ছড়িয়ে পড়ছে ঘণ্টাধ্বনি। দনের বৃকে বিশাল বিশাল ববফের চাঁই অবিবাম কড়কড় আওয়াজ তুলে উদ্দাম গতিতে ছুটে চলেছে। জালে টে-টবুর দন মুস্কির আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ববফের দাসত্বশৃঙ্খল ভেঙে খান খান করে বয়ে নিয়ে চলেছে আজ্ঞাত সাগরের বৃকে



গ্রিগোরির দিকে এগিয়ে এলো স্তেপান। রেকাবটা চেপে ধরে ঘোড়ার ঘর্মান্ত  
পাঁজরের সঙ্গে গা ঘেঁসে দাঁড়াল।

এই যে গ্রিগোরি, কী খবর?

‘ভগবানের কৃপায় ভালোই কলতে হবে।’

‘তা কী ভাবছ-টাবছ? আঁ?’

‘কেন কী নিয়ে ভাবতে যাব আবার?’

এই যে আরেকজনের বৌকে ভাগিয়ে নিয়ে এসে তাকে ভোগ করছ?’

‘বেকাব ছেড়ে দাও বলছি।’

‘ভয় নেই আমি মারব না।’

‘আমি ভয় পাই নি ও কথা বাদ দাও’ গ্রিগোরি গলা চড়াল। তার দুই  
গালের চিবির ওপর লাল ছোপ পড়ল।

‘আজ আমি তোমার সঙ্গে মারপিট করতে যাব না, সে ইচ্ছে আমার নেই  
তবে একটা কথা তুমি মনে রেখো গ্রিশকা, আজ হোক কাল হোক তোমাকে  
আমি খুন করব।’

‘ইঃ অঙ্ক বলে, ‘দেখে নেব’।’

‘যা বললাম, ভালো করে মনে রেখো। তুমি আমার মনে দাগা দিয়েছ  
আমার জীবনের সব কিছু কেড়ে নিয়ে আমাকে একটা জবাইয়ের খাসী করে  
দিয়েছ ওই যে ওখানে সেবছ,’ স্তেপান তার হাতের কালো চেটোনুটো  
ওপরের দিকে তুলে দেখিয়ে বলল, ‘জমি চাষ করছি, কিন্তু নিজেরই জানি নে  
কেন আমার একার জন্যে কতটুকুই বা দরকার? আমি ত এই একটু আধটু  
হাতপা নাড়িয়ে শীতকালটা দিব্যি চালিয়ে দিতে পারতাম। কেবল এই একা  
ধাকার কষ্ট এতেই আমি মারা যাচ্ছি তুমি আমার মনে বড় দাগা  
দিয়েছ গ্রিগোরি’

‘আমার কাছে কীদুনি গেয়ে কী হবে কল? তোমার দুঃখ আমি বুঝতে পারব  
না যার পেট ভরা সে উপোসীর কষ্ট বুঝবে কী করে?’

কথাটা ঠিকই, আগাগোড়া এক বালক গ্রিগোরির মুখের ওপর দাঁটি কুলিয়ে  
নিয়ে স্তেপান সায় দিল। তারপর হঠাৎ শিশুর মতো সরল হাসিতে তার মুখটা  
উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে তার চোখের কোনায় ফুটে উঠল অসংখ্য সূক্ষ্ম  
রেখা সে বলল, ‘শুধু একটা কথা ভেবে আমার দুঃখ হয় এখনও

বড় দুঃখ হয় মনে আছে গত বছরের আগের বছর পিঠেপার্বণের সময় কেমন জোর মারপিট হয়েছিল আমাদের মধ্যে ?

‘সে আবার কবে ?’

‘বাঃ মনে নেই ? সেই যে, যে-বছর ধুনুরীটা খুন হয়ে গেল ষাদের বিয়ে হয় নি তারা লড়ল ষাদের বিয়ে হয়েছে তাদের সঙ্গে, মনে নেই ? মনে আছে তোমার পেছনে কেমন তাড়া করেছিলাম আমি ? তুমি তখন আমার তুলনায় ছিলে একটা কচি নলখাগড়ার ডাঁটার মতো লিকলিকে তখন আমি তোমাকে দয়া করে ছেড়ে দিয়েছিলাম কিছু দৌড়ে যখন পালাচ্ছিলে সেই অবস্থায় যদি একটা ঘা মারতাম তাহলে দু’আধখানা হয়ে যেতে তুমি ! তুমি টানটান হয়ে বড় জোরে ছুটে পালাচ্ছিলে, তখন যদি পাঁজরায় একটা মোক্ষম ঘা বসিয়ে দিতে পারতাম তাহলে এই পৃথিবীর আলো আর তোমাকে দেখতে হত না !’

ও নিয়ে দুঃখ করে কাজ নেই, আবার কোন একদিন আমরা ঘুসোঘুসিতে নামতে পারি !’

স্তেপান হাত দিয়ে কপাল ঘষে কী যেন মনে করার চেষ্টা করল

এদিকে কর্তা তেজীটাকে মুখের লাগাম ধরে চালিয়ে নিয়ে যেতে যেতে গ্রিগোরিকে টেঁচিয়ে বলল, ‘এবারে চল !’

স্তেপান আগের মতোই ত্রেকার হাতের মুঠোয় চেপে ধরে থাকে। গ্রিগোরির পাশে পাশে চলতে থাকে। গ্রিগোরি ওর প্রতিটি গতিবিধির ওপর সতর্ক নজর রাখে ঘোড়ার পিঠে বসে ওপর থেকে সে দেখতে পাচ্ছিল স্তেপানের ঝুলে পড়া গৌফ আর বহুকালের না-কামানো খোঁচা খোঁচা ঘন দাড়িতে ভর্তি মুখটা স্তেপানের গুতনিতে ঝুলছে মাথার চুপির চকচকে পালিশ করা অথচ বহু জায়গায় চুটোফটা চামড়ার ফিতে তার মুখে কাদামাটি লেগে আছে, ঘাম গড়ানোর ফলে তেরছা ডোরা ডোরা দাগ ধরেছে তাতে - মুখটা দেখাচ্ছে অস্পষ্ট, যেন অপরিচিত কারও মুখ। স্তেপানের মুখের নিকে তাকাতে তাকাতে গ্রিগোরির মনে হচ্ছিল সে যেন একটা পাহাড়ের ওপর থেকে ঝিরিঝিরি বর্ষণের কুয়াশায় ছাওয়া বিস্তীর্ণ স্তেপের দূর প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে আছে। বৃসর ক্লান্তি আর শূন্যতা ছাই মাখিয়ে দিয়েছে স্তেপানের মুখে গ্রিগোরির কাছ থেকে বিদায় না নিয়ে সে পিছনে দাঁড়িয়ে গেল। গ্রিগোরি ঘোড়াটাকে ধীরগতিতে চালিয়ে দিল

‘এই দাঁড়াও দেখি একটু। কেমন আছে অগ্নিনিয়া কেমন আছে ?’

চাবুকের ঘা দিয়ে বুটের তলায় লেগে থাকা কাদার তাল ছাড়াতে ছাড়াতে গ্রিগোরি উত্তর দিল, ‘মন্দ নয় !’

রাশ টেনে ঘোড়াটাকে একটু থামিয়ে সে ফিরে তাকাল। স্তেপান পাদুটো

অনেকখানি ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে, একটা অগাছার ডাঁটা দাঁতে কাটছে ওর জন্য গ্রিগোরি ভেতরে ভেতরে অপরিমিত কবুণা অনুভব করল, কিন্তু তার সেই অনুভূতিকে ছাপিয়ে প্রবল হয়ে দেখা দিল ঈর্ষা, তাই জিনের গদিতে খচমচ আওয়াজ তুলে ঘুরে বসে সে চিৎকার করে বলল, ‘মন খারাপ করো না, তোমার কথা ভেবে শুকিয়ে মরছে না!’

‘তাই নাকি?’

গ্রিগোরি ঘোড়ার দুই কানের মাঝখানে সপাং করে চাবুক কষিয়ে দিল, ওর কথার জবাব না দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল।

## বিশ

হয় মাসে পড়তে যখন আর লুকিয়ে রাখার কোন উপায়ই রইল না, তখনই আন্নিয়া গ্রিগোরির কাছে তার গর্ভের কথা স্বীকার করল। এত কাল সে লুকিয়ে রেখেছিল, কারণ তার ভয় ছিল গ্রিগোরি হয়ত বিশ্বাস করবে না যে তারই সন্তান সে পেটে ধরেছে। সময় সময় বিষণ্ণ ব্যাকুলতা আর ভয় ভয় ভাব তার ওপর এসে ভর করত, মুখে হালুদের ছোপ ফেলে দিত, কিসের একটা আশঙ্কায় সে উৎকর্ষ হয়ে থাকত।

প্রথম কয়েক মাস মাংসের বাবারে তার বর্মির উদ্বেক হত, কিন্তু গ্রিগোরি সে দিকে কোন নজর দেয় নি আর নজর দিলেও কারণ নিয়ে মাথা ঘামায় নি, ব্যাপারটার ওপর বিশেষ কোন গুরুত্ব আরোপ করে নি।

কথাটা আন্নিয়া ওঠাল একদিন সন্ধ্যাবেলা। আন্নিয়া উত্তেজিত ভাবে কথাটা গ্রিগোরিকে বলে উৎকর্ষিত হয়ে ঝুটিয়ে ঝুটিয়ে দেখতে লাগল তার মুখের কোথাও কোন ভাবান্তর ধরা পড়ে কিনা। কিন্তু গ্রিগোরি সঙ্গে সঙ্গে জানলার দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বিরক্তির সঙ্গে একটু কান্সল।

‘আগে বল নি কেন আমাকে?’

‘আমার ভয় করছিল গ্রিগা ভেবেছিলাম তুমি আমাকে ত্যাগ করবে।’

খাটের বাজতে টোকা মেরে তাল ঠুকতে ঠুকতে গ্রিগোরি জিজ্ঞাস করল ‘শিগগিরই হবে নাকি?’

‘আগস্ট পরবের কাছাকাছি, মনে হচ্ছে’

‘স্ত্রোপানের নাকি?’

‘তোমার।’

‘আহা, তা ত বলবেই’

‘তুমি নিজে একবার গুনেই দেখ না      সেই যে কাঠ কাটার সময় থেকে

‘বাজে কথা বলো না      স্তম্ভপানের হলেই বা কী করা যাবে এখন তুমি যাবে কোথায়? ঠিক করে বল দেখি?’

রাগে অগ্নিনিয়ার চোখে জল এসে গেল। বেধিতে বসে বসে সে চোখের জল ফেলতে লাগল, কান্নায় গলা বুজে এলো। ফিসফিস করে সে বলল ‘এতটা বছর ওর সঙ্গে ছিলাম কিছুই হল না      তুমি নিজেই একবার ভেবে দেখ না      আমার কোন ব্যাঘাও নেই।      নিশ্চয়ই তোমার থেকে হয়েছে আর তুমি কিনা’

গ্রিগোরি এই নিয়ে আর কোন কথা বলল না। অগ্নিনিয়ার সঙ্গে তার সম্পর্কে ঘিরে পাকিয়ে উঠল সতর্ক পর পর ভাব আর হালকা কৌতুক মাঝা নতুন এক ধরনের তত্ত্ব। অগ্নিনিয়া নিজেকে গুটিয়ে নিল। কোন বকম সোহাগ কাড়তে সে এলো না। পরমকাল পড়তে তার চেহারার জৌলুস নষ্ট হয়ে গেল। কিন্তু অস্ত্রসম্বা অবস্থা তার দেহসৌষ্ঠবেব বিশেষ ক্ষতি করতে পারে নি তার উদবদেহ যে পরিমাণে গোলাকার হয়ে উঠেছে দেহের সাধারণ পৃথুলতার আড়ালে তা ঢাকা পড়ে গেছে, দু’চোখে ঝরে পড়ছে সুন্দর একটা উকতার আমেজ, তাতে তার শীর্ণ হয়ে ওঠা মুখের ওপর সঞ্চারিত হয়েছে এক নতুন দীপ্তি সে তার কাজ স্বচ্ছন্দে চালিয়ে যেতে লাগল। সে বছর মুনিষদের সংখ্যা কম ছিল তাই রান্নাবান্নার কাজও কম

বুড়ো মানুষের অনুরাগের মধ্যে যেমন আবদার থাকে সাক্ষা যে অগ্নিনিয়ার ন্যাওটা হয়ে পড়ল তার মধ্যেও তেমনি একটা ভাব ছিল অগ্নিনিয়া যেহেতু মেয়ের মতো দরদ দিয়ে তার দেখাশোনা করে তার জামাকাপড় ধোওয়া কাচা করে, রিকু করে দেয়, খাওয়ার সময় নরম ও মিষ্টি দেখে খাবাবদ্যাবার তার পাতে তুলে দেয় - হয়ত এই কারণেই তার প্রতি বুড়োর এমন অনুরাগ। বুড়ো সাক্ষা ঘোড়ার পরিচর্যার কাজ শেষ হয়ে গেলে রান্নাঘরে জল বয়ে আনে, শূয়োরের জন্য আলুসেদ্ধ চটকায়, এটা ওটা নানা টুকটাকি কাজে তাকে সাহায্য করে। তিড়িংবিড়িং লাফিয়ে হাত নেড়ে ফোকলা মাটি বার করে সে বলে, ‘তুমি আমার এত করছ আমি তোমার ঋণ শূন্য।’ অগ্নিনিয়া, মেয়ে আমার, তুমি বললে আমার কলজেরটাও উপড়ে দিতে পারি। অ্যান্ডিন কোন মেয়েমানুষ আমাকে দেখে নি বলেই না আমার এমন হাল! উকুনে আমাকে ছরবার করে খেয়েছে তোমার কখনও কোন দরকার হলে আমাকে বলবে কিছু

ইয়েভগেনি লিন্ডনিংস্কির সুপারিশক্রমে শিক্ষা শিবিরেব দায় থেকে বেহাই পেল গ্রিগোরি। সে ঘাস কাটার কাজ করে, মাঝে মধ্যে গাড়ি চালিয়ে বুড়ো

কর্তাকে ছেলা। সময়ে নিয়ে যায় বাদবাকি সময় তার সঙ্গে তিত্তির-ডাডুক শিকার করে কিংবা আর কোন বড় বড় পাখির পিছু ধাওয়া করে কাটিয়ে দেয়। সহজ স্বচ্ছন্দ আয়েসের জীবন তাকে নষ্ট করে ফেলাতে লাগল। দেখতে দেখতে সে আলসে, মোটা হয়ে পড়ল। তাকে এখন বয়সের তুলনায় বড়ো দেখায়। শুধু যে জিনিসটা তাকে পীড়া দিতে লাগল তা হল ফৌজে ভবিষ্যৎ চাকরীর চিন্তা। তার না আছে ঘোড়া। না আছে কোন সাজসরঞ্জাম বাপের কাছ থেকে যে পাবে তেমন কোন আশাও নেই। নিজেব আর আগ্নিনিয়ার মাইনে ব্যবদ গ্রিগোরি যা পেন্ত সেখান থেকে যৎসামান্য খরচ করত। এমনকি তামাক পর্যন্ত বন্ধ করে দিল। তার আশা ছিল বাপের কাছে মাথা হেঁট না করেও ওই জমানো টাকা দিয়ে সে ঘোড়া কিনতে পারবে। বড়ো কর্তাও তাকে সাহায্য করবে বলে কথা দিয়েছিল। বাবা যে তাকে কিছু দেবে না গ্রিগোরির এই অনুমান শিগগিরই সত্য প্রতিপন্ন হল। জুন মাসের শেষ দিকে দাদা পেত্রো এলো ছোট ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে। কথাপ্রসঙ্গে সে উল্লেখ করল। বাবা আগের মতোই গ্রিগোরির ওপর চটে আছে, এমনকি এক রকম জানিয়েই দিয়েছে যে পল্টনের ঘোড়া দেবে না। বদলেছে এলাকার পায়-দল সৈন্যদের দলে গিয়ে ঢুকুক গে।

‘আচ্ছা, আচ্ছা, এই নিয়ে ওকে মাথা না ঘামালেও চলবে। আমার নিজের ঘোড়া নিয়েই পল্টনের চাকরীতে যাব।’ ‘আমার নিজের’ কথাটাব ওপর বিশেষ জোর দিল গ্রিগোরি।

‘কোথেকে পারি রে? নেচে কুঁদে যোগাড় করবি নাকি?’ গৌফ মুখের ভেতরে নিয়ে চিবুতে চিবুতে হাসল পেত্রো।

‘নেচে কুঁদে না পারলে চেয়েচিন্তে নেব। তাতেও যদি না পারি ত চুরি করব।’

‘সাবাস।’

‘মাইনের টাকা দিয়ে কিনব। এবারে তামাসা ছেড়ে গল্লীর হয়ে জানাল গ্রিগোরি।

পেত্রো দাঁড়ায় খানিকক্ষণ বসে থেকে গ্রিগোরিকে তার কাজকর্ম মাইনেপস্তর ও খাবারদাবার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করল। দাঁতে-কাটা গৌফের ডগা চিবুতে চিবুতে গ্রিগোরির সব কথাব সাহা দিয়ে গেল। যা যা জানাব, সব জেনে নেওয়ার পর উঠে পড়ে সে ভাইকে বলল, ‘বাড়ি ফিরে গেলে পারতিস কিন্তু অমন ভাবে মিছিমিছি দেখাক করার কোন মানে হয় না। তুই কি ভাবছিস এই করে অনেক টাকাপয়সার মালিক হতে পারবি তুই?’

‘ওসবের পেছনে আমি ঘুরছি না।’

‘তুই কি ওর সঙ্গেই থাকবি ভাবছিস?’ পেত্রো কথার মোড় ঘুরাল।

‘কার সঙ্গে?’

‘এই যে এখানে যে আছে’

এখন পর্যন্ত ত ডা-ই ভাবছি। কেন?’

‘না, অমনি জিজ্ঞেস করছিলাম জানতে ইচ্ছে হল আর কি।’

গ্রিগোরি ওকে এগিয়ে দিতে গেল শেষকালে জিজ্ঞেস করল, ‘বাড়ির সবাই কেমন আছে?’

দাণ্ডয়ার রেলিং থেকে ঘোড়াটা খুলতে খুলতে পেত্রো বাঁকা হাসি হেসে বলল, খরগোশের খোঁড়লের মতো তোরও অনেক বাড়ি আছে, কিছু না, মোটামুটি বৈচিত্র্যে আছি মার অবশ্য মনটা খারাপ তোর জন্যে আর বড় এবছর যোগাড় হয়েছে অনেক তিনটে গাদা হয়ে গেছে।’

পেত্রো যে কানকাটা বুড়ি ঘুড়ীটার পিঠে চেপে এসেছিল সেটাকে ঝুটিয়ে ঝুটিয়ে দেখতে দেখতে গ্রিগোরি উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, ‘বাচ্চা বিয়েবে বলে মনে হচ্ছে যেন?’

‘না রে, এটা বাঁজা। আর ওই যে বাদামীটা, স্কিস্টোনিয়ার কাছ থেকে যেটা আমরা খরিদ করেছিলাম সেটার বাচ্চা হয়েছে।’

‘মদ্রা না মাদী?’

‘মদ্রা। আহা কী বাচ্চা কোন তুলনা হয় না লম্বা লম্বা পা, সুন্দর পায়ের গোছা, আর কী বুক বড় হলে দাবুণ ঘোড়া হবে একটা।’

গ্রিগোরি দীর্ঘশ্বাস ফেলল

গাঁয়ের জন্যে মনটা বড্ড কেমন কেমন করছে দাদা দনের জন্যেও মন খারাপ লাগছে। এখানে জলের স্রোত চোখে পড়ে না প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে।

‘আমাই না দেখার জন্যে।’ একটা অশুট শব্দ করে ঘোড়ার শক্ত পিঠের ওপর ধুপ করে উপুড় হয়ে উঠে পড়ে ডান পাটা খুলিয়ে দিতে দিতে পেত্রো বলল

‘যাব একদিন।’

‘আজ্ঞা, চলি।’

‘ভালোয় ভালোয় বাড়ি ফের।’

পেত্রো উঠোন ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল, এমন সময় গ্রিগোরিকে দাণ্ডয়ার দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কী যেন মনে হতে সে চিৎকার করে বলল ‘ওরে শুনছিস নাভালিয়া ত তুলেই গিয়েছিলাম ওঃ কী সাম্যাতিক কাণ্ড!’

উঠোনের মাথাব ওপর চিলের মতো চক্কর দিচ্ছে বাতাস পেত্রোর শেষ কথাগুলো বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে গেল - গ্রিগোরির কানে পৌঁছল না পেত্রো আর তার ঘোড়া রেশমী ধুলোর ওড়নায় ঢাকা পড়ে গেল গ্রিগোরি কথাগুলো শুনতে

না পেয়ে মনে মনে ধ্বস্তোর বলে আত্মবলে গিয়ে ঢুকল।

শুকনো খটখটে গ্রীষ্মকাল কদাচিৎ বৃষ্টি পড়ে ফসল সময়ের আগে শেকে উঠল। রাই তুলতে না তুলতে সব তোলার সময় হয়ে এলো ক্ষেতগুলোতে ধোকা ধোকা যাবের শিখ হুলাদ রঙ ধরে পেকে খুলে পড়তে লাগল যে চারজন মুনবকে দিনমজুর হিসেবে নেওয়া হয়েছে গ্রিগোরি তাদের সঙ্গে ফসল কাটতে চলে গেল।

আগ্নিনিয়া সকাল সকাল রান্নাবান্নার কাজে সারল। গ্রিগোরিকে ধরে বসল তাকে সঙ্গে নিতে হবে

‘কী দরকার? ঘরে বসে থাকলে হুত না?’ গ্রিগোরি তাকে স্তম্ভ করার চেষ্টা করল। কিন্তু আগ্নিনিয়া তার জেদ ছাড়ল না চটপট মাথায় একটা গুড়না বেঁধে নিয়ে ছুটে গেটের বাইরে এসে যে গাড়িতে মুনিসরা মাঠে যাচ্ছিল তার নাগাল ধরল

গাড়ীর উদ্বেগ ও অধীর আনন্দে আগ্নিনিয়া যার জন্য প্রতীক্ষা করছিল যার কথা ভেবে গ্রিগোরির মনের মধ্যে একটা অস্পষ্ট আশঙ্কা ছিল সেই ঘটনাই ঘটে গেল ফসল কাটার সময়। আগ্নিনিয়া বিদে দিয়ে ক্ষেত আঁচড়ে ফসল তুলছিল এমন সময় কয়েকটা লক্ষণ টের পেয়ে বিমেকাণ্ডিটা ফেলে দিয়ে একটা ফসলের গানার নীচে শূয়ে পড়ল। দেখতে দেখতে প্রসববেশনা শুরু হয়ে গেল ব্যথায় কালো হয়ে ওঠা জিভটা কামড়ে ধরে সে চিৎ হয়ে শূয়ে রইল তার পাশ দিয়ে ঘোড়াগুলোর ওপর হাঁকডাক করতে করতে ফসল-কাটা-কল চালিয়ে চক্কর মেঝে চলে গেল মুনিসরা। ওদের মধ্যে কমবয়সী একজন তার নাকটা গলে খসে পড়েছে, হলদে মুখটা ফেন কাঠ কুঁদে তৈরি, অসংখ্য ভাঁজপড়া পাশ দিয়ে ফসল-কাটা-কল চালিয়ে যেতে যেতে আগ্নিনিয়াকে ঠাট্টা করে ডেকে বলল, ‘আরে কী হল অমন বিস্তী জায়গায় শূয়ে রোদে ভাজা ভাজা হচ্ছে কেন? উঠে পড়, নইলে গলে যাবে যে’

গ্রিগোরি কাটা-কলে তার জায়গায় আরেকজনকে দিয়ে আগ্নিনিয়ার কাছে এলো। জিজ্ঞেস করল, ‘কী ব্যাপার?’

আগ্নিনিয়ার ঠোঁটদুটো বঁকে গেল, চেষ্টা করেও স্বাভাবিক রাখতে পারল না সে ভাঙা গলায় বলল, ‘আমার ব্যথা উঠেছে।’

‘তখনই বলেছিলাম এসো না। বোধ এখন বজ্রাক্ত মাগী। এখন আমি কী করি?’

‘রাগ করো না গ্রিশা ওঃ’ ওঃ’ গ্রিশা গাড়িতে ঘোড়া বোতো’

বাড়ি যেতে হবে এখানে কী করে হবে? রাস্তার ব্যাটাছেলে এখানে লোহার বেইনীতে পড়ে তীব্র যন্ত্রণায় আর্দ্রনাদ করতে করতে আগ্নিনিয়া বলল।

সামনেই চণ্ডা খাতের মধ্যে একটা ঘোড়া চরে বেড়াচ্ছিল। গ্রিগোরি সেই



ঘোড়াটা আনতে ছুটল ঘোড়া যুড়ে গাড়ি নিয়ে আসতে আসতেই আক্সিনিয়া এক পাশে গাড়িয়ে পড়ে চার হাত পায়ে ভর দিয়ে উঠে পড়ল। ধুলোমাথা যবের গাদার মধ্যে মাথা গুঁজে দিল, যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে মুখের ভেতরে খোঁচা খোঁচা যবের শিষ নিয়ে চিবিয়েছিল, সেগুলো থু থু করে ফেলে দিল। খ্রিগোরি ছুটে আসতে ফোলা ফোলা অস্বাভাবিক চোখ মেলে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে বইল তার দিকে। তার অসম্ভব কন্যা চিংকার যাতে মুনিষদের কানে না যায় সেইজন্য সে তার বুকের সামনের কাপড়টা ডেলা পাকিয়ে দাঁতে কামড়ে ধরে বইল।

খ্রিগোরি ওকে গাড়িতে শূইয়ে দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল বাড়ির দিকে

‘আঃ, অত জোরে ছুটিও না      আঃ ম’লাম      বাঁকানি দিচ্ছ      ’  
আলুথালু মাথাটা গাড়ির পাটাতনের ওপর এদিক ওদিক গড়াতে গড়াতে আক্সিনিয়া কর্কশ স্বরে চিংকার করল।

খ্রিগোরি নিঃশব্দে ঘোড়ার গায়ে চাবুক হাঁকতে থাকে, ভাঙা ভাঙা ভয়ঙ্কর আর্তচিংকার যেখান থেকে উঠে ঢেউয়ের মতো সগর্জনে আছড়ে পড়ছে সেদিকে সে একবার ফিরেও তাকায় না।

আক্সিনিয়া দু’হাতে গাল চেপে ধরে দু’চোখ বিস্ফারিত করে বন্যের মতো উদ্ভ্রান্ত ভাবে এদিক ওদিক তাকাতে থাকে। গাড়ি চলাচলের অনুপায়োগী এবড়োখেবড়ো রাস্তার ওপর দিয়ে চলতে চলতে ওদের গাড়িটা একবার এপাশে আরেকবার ওপাশে কাত হয়ে পড়তে বাঁকুনির চোটে আক্সিনিয়াও লাকাতে থাকে। আকাশের বুকে পলতোলা ফটিকের মতো ফুলে থাকা চোখ ধাঁধানো সাদা মেঘখণ্ডটাকে আড়াল করে খ্রিগোরির চোখের সামনে জোয়ালের ধনুকাকৃতি গ্রাস্তটা স্বচ্ছন্দ গতিতে নেচে চলেছে। আক্সিনিয়া যে গলা চড়িয়ে পরিত্রাণি তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শুরু করে দিয়েছিল মুহূর্তের জন্য তা বন্ধ হয়ে যায়। গাড়ির ঢাকা ঘরঘর আওয়াজ করে চলে, গাড়ির পেছনের ডালটার মধ্যে আক্সিনিয়ার মাথাটা অসহায় ভাবে পাটাতনের ওপর দমাস দমাস করে আছাড় খেতে থাকে। হঠাৎ নেমে আসা এই ত্তকতায় খ্রিগোরি প্রথমদিকে বিচলিত হল না। কিন্তু পরে টনক নড়তে পিছু ফিরে তাকায় দেখে আক্সিনিয়ার মুখটা বিকৃত, বীভৎস আকার ধারণ করেছে, গাড়ির গায়ে শক্ত করে গাল চেপে সে শূয়ে আছে, ডাঙায় তোলা মাছের মতো খাবি খাচ্ছে। তার কপাল থেকে চোখের বসা কোটরের মধ্যে গলগল করে ঘাম বরছে। খ্রিগোরি গুর মাথাটা আলতো করে তুলে ধরে নিজের দল্যামোচড়া পাকানো চুপিটা মাথার নীচে গুঁজে দিল। আক্সিনিয়া চোখ টেরিয়ে তাকিয়ে জোর গলায় বলল, ‘আমি মারা যাচ্ছি খ্রিগা! বাস      সব শেষ!’

খ্রিগোরি আঁতকে উঠল। তার ঘর্মাক্ত পায়ের আঙুল পর্যন্ত হঠাৎ যেন একটা

ঠাণ্ডা সিরনিরে শ্রোত বয়ে গেল গ্রিগোরি বিচলিত হয়ে পড়ল। চাক্স করে তোলার মতো বা দরদ প্রকাশের উপযোগী ভাষা খুঁজতে গেল। কিন্তু খুঁজে পেল না তার ঠোটদুটো। কুঁচকে গেল পরপর করে কাঁপতে লাগল, মুখ ফসকে বেরিয়ে এলো, 'যত সব বাজে কথা। বোকা কোথাকার' বলেই মাথা ঝাঁকাল। তারপর অনেকখানি নীচু হয়ে ঝুঁকে পড়ে আগ্নিনিয়ার মোচড়ানো পায়ে ওপর আনাড়ির মতো চাপ দিয়ে বলল, 'আগ্নিনিয়া ওগো, সোনা আমার'

আগ্নিনিয়ার ব্যথা মুহূর্তের জন্য কমে গেল, কিন্তু পব ক্ষণেই ফিরে এলো কয়েকগুণ শক্তি নিয়ে। পেটটা নীচে ঝুলে পড়েছে এবং পেটের ভেতরে কিসে যেন ছিড়ে ফেলে দিচ্ছে উপলব্ধি করে আগ্নিনিয়া ধনুকের মতো বেকে গিয়ে স্বপ্নায় আবণ্ড ভয়ঙ্কর অবর্ণনীয় চিৎকার করে গ্রিগোরির কানে তাল ধরিয়ে দিল। গ্রিগোরি পাগলের মতো ঘোড়ার পিঠে চাবুক কসিয়ে দিল।

চাক্স ঘর্ষর আওয়াজ ভেস করে গ্রিগোরি অস্পষ্ট ভাবে শুনতে পেল আর্ন্তকর্ষের টানা টানা ক্ষীণ চিৎকার, 'গ্রি-ই-শা'

গ্রিগোরি লাগাম টেনে ধরে ঘাড় ফেরাল। আগ্নিনিয়া হাত দু'খানা ছড়িয়ে শুয়ে আছে, রক্তে ভেসে যাচ্ছে তার সর্বত্র। ঘাঘরার নীচে জীবন্ত কী একটা নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে, টাঁ টাঁ করছে। গ্রিগোরি হকচকিয়ে গিয়ে লাফিয়ে মাটিতে নেমে পড়ল। ছাঁদা-পা ঘোড়ার মতো পায়ে পায়ে জড়িয়ে জড়িয়ে গাড়ির পেছনে গেল। আগ্নিনিয়া মুখ দিয়ে পরম নিশ্বাস ফেলাতে ফেলাতে টেনে টেনে কী যেন বলছে, সেই দিকে তাকাতো শোনার চেয়েও গ্রিগোরি সম্ভবত অনুমানে বুঝতে পারল আগ্নিনিয়ার কথাগুলো।

'নাড়িটা দীত দিয়ে কেটে ফেল। সুতো দিয়ে বেঁধে দাও। গায়ের জামা থেকে'

গ্রিগোরি কাঁপা কাঁপা হাতে তার সুতির জামাব হাতা থেকে একগোছা সুতো টেনে বার করল। চোবদুটো এত জোরে কৌচকাল যে ব্যাথার টনটন করে উঠল। নাভিসংলগ্ন নাড়িটা দীত দিয়ে কেটে ফেলল, বাকি রক্তাক্ত অংশটুকু সুতো দিয়ে সম্বদ্ধে বেঁধে দিল।

## একুশ

শরীরের একটা বাড়তি মাংসপিণ্ডের মতো প্রশস্ত শূন্য উপত্যকার গায়ে লেগে আছে জিন্তনিঃশব্দের ইয়াগদনোয়ে জমিদারি বাতাসের গতি এখানে ক্ষণে ক্ষণে বদলায়। কখনও দক্ষিণ থেকে, কখনও উত্তর দিক থেকে বয় আকাশের

নীল-নীল ধলিমার মধ্যে সূর্য ভেসে বেড়ায়। গ্রীষ্মের আঁচলে শরৎ পা মাড়িয়ে দিতে ঝরা পাতার মর্মবর্ষনি ওঠে, নীত হিম আর বিপুল তুষাররাশি ঝরিয়ে দিয়ে যায় কিন্তু ইয়াগদুনোয়ে সেই একই প্রাণহীন একঘেরেমির মধ্যে ঢাকা পড়ে থাকে বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন, পাঁচিল দিয়ে ঘেরা এই জমিদারির ভেতরে দিনগুলো একটা ছুবছু আরেকটার মতো বাঁধা গতে কেটে যেতে থাকে

উঠোনে শিশু মারতে মারতে ছেলেদুলে চলতে থাকে কালো হাঁসগুলো তাদের চোখের চারধারে লাল চকর মালা-হাঁড়া পুতির মতো এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে চীনে মোরগের পালা আন্তার্যালের চালের ওপর বসে সদা পালক গজানো করেকটা ময়ূর তীক্ষ্ণ চিৎকার করছে বেড়ালের মতো গলায়, যেন হাঁড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে সেই আওয়াজ। বুড়ো জেনারেলের নানা রকম পাখির শব্দ আছে। এমনকি গুলিতে জখম হওয়া একটা সারসও তার পোষ্যবর্গের মধ্যে আছে নভেম্বর মাসে যখন তার স্বাধীন জ্যোতিভাই সারসেরা দল বৈধে বাসাবদল করতে যায় তখন তাদের অস্পষ্ট ডাক শুনতে পেয়ে সারসটা কাংসানিন্দিত কণ্ঠে এমন আর্ত চিৎকার করে যে মানুষের বুক ফেটে যায় কিন্তু উড়বার সাধ্য তার নেই, তার একটা ডানা একেবারে অকেজো, ডাঙা, সোটা এক পাশে কুলে থাকে সারসটা যখন গলা বাঁকিয়ে লাফিয়ে মাটি ছেড়ে ওঠার চেষ্টা করে জানলা দিয়ে সে দৃশ্য দেখতে দেখতে জেনারেল হো হো করে হাসতে থাকে - তার পাকা গৌরুর ঢালার নীচে বড় লম্বা মুখটা হাঁ হয়ে থাকে সাদা দেয়াল-দেওয়া ফাঁকা হল-ঘরের ভেতরে হাসির গম্বক কাঁপতে কাঁপতে ভেসে বেড়ায়

ডেনইয়ামিন সেই আগের মতোই তার মশমলে মাথাটা উঁচু করে, জেলির মতো খলখলে উঁচু নাচিয়ে ধুরে বেড়ায় আর সরাদিন ধরে সামনের ঘরে একটা তোরঙ্গের ওপর বসে একা একা বেঁকুশ হয়ে তাস খেলে। সেই আগের মতোই তিখোন মুখে বসন্তের দাগওয়ালা তার প্রণয়িনীর ব্যাপারে সশকাকে নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে, মুনিষদের হিংসা করে, ত্রিগোরিকে, বুড়ো কর্তাকে, এমনকি সাবসটাকে হিংসা করে, যেহেতু লুকেরিয়া তার বিধবা নারী-হৃদয়ের উচ্ছলিত স্নেহ পাখিটার ওপর ঢেলে দিয়েছে। বুড়ো সশকা সময় সময় মদ খেয়ে মাতলামি করে, তখন জানলার সামনে গিয়ে কর্তার কাছ থেকে সিকি আদায় করে নেয়

এত কালের মধ্যে এই তদ্ভাঙ্কর হৃৎলাধরা জীবনে নাড়া দেওয়ার মতো ঘটনা ঘটেছে মাত্র দুটো আক্সিনিয়ার সন্তানপ্রসব আর ভালো জাতের রাজহাঁসটা হারিয়ে যাওয়া আক্সিনিয়া যে শিশুকন্যাটির জন্ম দিয়েছিল তার সঙ্গে শিগগিরই সকলে খাপ খাইয়ে নিল, আর পপলার গাছের বন পেরিয়ে তীরের কাছে একটা খাতের মধ্যে রাজহাঁসের অবশিষ্টাংশ বলতে তার পালকের সন্ধান মিলতে (বুঝতে

বাঁকি রইল না যে শেষালের কাণ্ড) সকলে শান্ত হয়ে গেল

রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠে ভেনইয়ামিনকে ডেকে কর্তা জিজ্ঞেস কবে

‘কোন স্বপ্নটপ্প দেখেছিলি?’

‘দেখি নি আবার! আহা কী চমৎকার স্বপ্ন’

‘কী দেখেছিস বল দেখি,’ সিগারেট পাকাতে পাকাতে কর্তা সংক্ষেপে হুকুম দেয়

ভেনইয়ামিন তখন স্বপ্নের বিবরণ দিতে থাকে স্বপ্নটা আগ্রহ জাগানোর মতো না হলে বা ভয়ঙ্কর হলে কর্তা ক্ষেপে গিয়ে বলে

‘আরে ছোঃ! আচ্ছা বোকা ত বাটাচ্ছেলে বোকা না হলে অমন বোকা-বোকা স্বপ্ন কেউ দেখে?’

ভেনইয়ামিনও তাই কৌতূহল জাগানোর মতো, মজার-মজার স্বপ্ন ভেবে ব্যস্ত করতে লেগে যায় তার একমাত্র মুশকিলটা এই যে উদ্ভাবনী শক্তি খাটাতে হয় তাই সে কয়েকদিন আগে থাকতেই তোরকের ওপর বসে খেলোয়াড়টির গালের মতোই ফুলোফুলো আর তেলতেলে তাসগুলো দিয়ে পাতা আসনের ওপর চটাস চটাস বাড়ি মারতে মারতে মজার-মজার স্বপ্ন ভাবতে শুরু করে কোন একটা জায়গার ওপর দৃষ্টি স্থির করে সে বোকার মতো ফালফাল করে তাকিয়ে কেবল ভাবে আর ভাবে ভাবতে ভাবতে এমন অবস্থা হল যে শেষ পর্যন্ত বাস্তবিকপক্ষে তার সমস্ত স্বপ্ন দেখা বন্ধ হয়ে গেল। ঘুম থেকে উঠে স্বপ্ন মনে করার প্রাণপণ চেষ্টা করে, কিন্তু পেছনে অন্ধকার মসৃণ, লেপাপোঁছা ঘোর কালো স্বপ্ন ত দূরের কথা, একটা মুণ্ড দেখা যায় না

ভেনইয়ামিনের সাদাসিধে যৎসামান্য কল্পনার ঝুজি ফুরিয়ে আসতে কর্তা ঝাঝা হয়ে ওঠে কথকঠাকুর কোন স্বপ্নাদ্য ঘটনার পুনরাবৃত্তি করলে কর্তা সঙ্গে সঙ্গে তা ধরে ফেলে

‘তবে রে হতভাগা ঘোড়াকে নিয়ে তোর এই স্বপ্ন তুই গত বেম্পতিবারই আমাকে বলেছিস! চুলোয় যা তুই তোর হল কী রে?’

‘ফের দেখলাম কর্তা! খ্রীষ্টের দেহাই, আবার ফিরে এলো, মিথো কথা বলতে ভেনইয়ামিনের এতটুকু বাধে না।

ডিসেম্বর মাসে একজন পৈয়াদা মাত্রফত ডিওশেন্‌স্‌য়াতে, জেলার কাছারিতে খ্রিগোরিকে ডেকে পাঠানো হল সেখানে সে ঘোড়া কেনাব জন্য একশ’ বুবল পেল আর এই মর্মে একটি নির্দেশ পেল যে বড়দিনের পরের পরের দিন তাকে মানকোডো বসতিতে গিয়ে পলটনে নাম লেখাতে হবে

জেলা সদর থেকে খ্রিগোরি হতভম্ব হয়ে ফিরল। বড়দিন এসে পড়ল বলে, এদিকে তার কিছুই তৈরি নেই। সবকারী যে টাকা সে পেয়েছে তার সঙ্গে নিজের

জ্ঞানানো টাকা যোগ করে একশ' চল্লিশ বুঝল দিয়ে গুব্বিভুক্তি গ্রাম থেকে সে একটা ঘোড়া কিনল ঘোড়া কিনতে গিয়েছিল বুড়ো সান্ধাকাকে সঙ্গে নিয়ে। দরাদরি করে ন্যাষা দামে একটা বেশ ভালো ঘোড়া পাওয়া গেল বছর ছয়েক বয়স, লালচে বাদামী রঙ, পেছনের দিকটা ঝুলন্ত। ঘোড়টার একটা ঝুঁত ছিল। সেটা অবশ্য চোখে পড়ার মতো নয় বুড়ো সান্ধাকা দাড়িতে বিলি কাটতে কাটতে বলল, 'এব চেয়ে সম্ভাব্য আন পাওয়া যাবে না। কর্তাদের চোখে এ ঝুঁত ধরা পড়বে না ওদের ক্ষমতায় কুলোবে না।'

কেনা ঘোড়টার চালচলন বোঝার জন্য গ্রিগোরি ওখান থেকে সটান ওটার শিঠে চড়েই ইয়াগদনোয়েতে ফিরল বড় দিনের এক সপ্তাহ আগে একটা স্নেজগাড়িতে চড়ে সশরীরে ইয়াগদনোয়েতে এসে হাজির হল পাস্তেলের প্রকোফিয়েভিচ। স্নেজগাড়িটা আঙিনার ভেতরে না ঢুকিয়ে গাড়ির সঙ্গে যেতো ঘোড়াটা বেড়ার গায়ে বেঁধে রাখল বরফে জমাট বঁধা দাড়িটা ভেড়ার চামড়ার কোটের কলারের গায়ে একটা কালো কড়িকাঠের মতো পড়ে ছিল দাড়ি থেকে বরফের কাঠি ছাড়াতে ছাড়াতে পাস্তেলের প্রকোফিয়েভিচ ঝুঁড়িয়ে ঝুঁড়িয়ে চাকরদের মহলের দিকে চলল জ্ঞানলা দিয়ে বাপকে দেখতে পেয়ে গ্রিগোরি ভেবাচেকা খেয়ে গেল

'দেখ কাশু আরে বাবা যে।'

আক্সিনিয়া কেন যেন দোলনার কাছে ছুটে গিয়ে বাচ্চাটাকে ঢেকে দিল

খানিকটা কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া ছড়িয়ে পাস্তেলের প্রকোফিয়েভিচ ঘরে ঢুকল। মাথার টুপিটা খুলে বিগ্রহের উদ্দেশ্যে ক্রুশচিহ্ন আঁকল। বীরে বীরে ঘরের দেয়ালের ওপর চোখ বুলাতে লাগল

'ভালো আছিস ত তোরা?'

'তুমি ভালো আছ ত বাবা?' বাপের সম্ভাষণে সাড়া দিয়ে এই কথা বলে গ্রিগোরি বেঞ্চ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের মাঝখানে পা বাড়াল

পাস্তেলের প্রকোফিয়েভিচ তার কনকনে ঠাণ্ডা হাতটা গ্রিগোরির দিকে বাড়িয়ে দিল আক্সিনিয়া জড়সড় হয়ে দোলনার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল সে দিকে বিশেষ কোন নজর না দিয়ে ভেড়ার চামড়ার কোটের কিনারাটা ভালো করে চারধারে জড়িয়ে নিতে নিতে পাস্তেলের প্রকোফিয়েভিচ বেঞ্চের এক ধারে গিয়ে বসল

পলটনে ঘাবার জন্যে তৈরি হচ্ছিস?'

'তা নয় ত কী?'

পাস্তেলের প্রকোফিয়েভিচ চুপ করে বইল। অনুসঙ্গিতসু দৃষ্টিতে গ্রিগোরিকে অনেকক্ষণ ধরে ঝুঁটিয়ে ঝুঁটিয়ে দেখল

'তোমার গায়ের জামাকাপড় ছাড় বাবা ঠাণ্ডায় নিশ্চয় জমে গেছে?'

‘ও কিছু নয় সত্য না করার মতো কিছু নয়

‘সামোভারটা ধরাই ’

‘তা বেশ ত ’ কোট থেকে বহু আগেকার একটা শুকনো কাদার দাগ নখ দিয়ে খুঁটতে খুঁটতে বলল, তোর জন্যে কিছু জিনিসপত্র এনেছি দুটো শ্রেটকেট একটা জিন আর সালোয়াব সব ওখানে ওই গাড়িতে আছে গিয়ে নিয়ে আয় ।’

গ্রিগোরি টুপি মাথায় না দিয়েই বাইরে চলে গেল স্নেজগাডি থেকে দুটো বস্তা টেনে নিয়ে এলো

‘কবে যাক্সিস ?’ পাগ্গেলেই প্রকোফিরেভিচ বেক ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে প্রশ্ন করল ।

‘বড়দিনের পরের পরের দিন কী হল বাবা চলে যাচ্ছ নাকি ?’

‘তাড়া আছে একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যেতে চাই ’

গ্রিগোরির কাছ থেকে সে বিদায় নিল । আগের মতোই আক্সিনিয়ার দিকে না তাকিয়ে দবজার দিকে এগিয়ে গেল দবজার খিলেব ওপর যখন হাত রেখেছে তখন দোলনার দিকে এক ঝলক দৃষ্টি হানল, তারপর বলল ‘তোর মা আশীর্বাদ জানিয়েছে । পায়ের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছে, তারপর একটু চুপ করে থেকে ফেন কোন গুরুভাব তুলছে এইভাবে জোব খাটিয়ে বলল ‘তোকে মানকোভো পৌছে দিয়ে আসব আমি তৈরি হয়ে থাকিস ’

একজোড়া হাতে বোনা গরম দস্তানার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে সে বেরিয়ে গেল এমন ভাবে অপদস্থ হওয়াতে আক্সিনিয়া ফেকাসে হয়ে গেল মুখে কিছু বলল না । গ্রিগোরি তার দিকে আডচোখে তাকাত্তে তাকাত্তে ঘরের মধ্যে পায়েচাচি করতে লাগল, হাঁটার সময় বারবার মেঝের পাটাতনের একই জায়গায় একটা ফাঁচকোঁচ আওয়াজ করা কাঠের ওপর তার পা পড়তে লাগল

বড়দিনের দিন গ্রিগোরি লিভনিৎস্কিকে ভিওশেনস্কায়াতে নিয়ে গেল

কর্তা ভোরের উপাসনায় যোগ দিল । তার এক খুঁড়তুত বোন ছিল কাছাকাছি কোন এক জায়গার জমিদারনী তার বাড়িতে প্রাতরাশ সেরে সে স্নেজগাডি যোতার হুকুম করল গ্রিগোরিকে

গ্রিগোরি তখনও শূয়োরের মাংস আর বাঁধাকপি দেওয়া চর্বিওয়ালা ঝোলের খাটি খেয়ে শেষ করে উঠতে পারে নি তবু সে উঠে পড়ল, তক্ষুনি আস্তাবলে চলে গেল ।

হালকা শহুবে স্নেজগাডিটা টেনে এনেছিল অর্লভ জাতের একটা ছাইরঙা, মূলকি চালের ঘোড়া গায়ে তার গোল গোল দাগ গ্রিগোরি তাকে মুখের লাগাম

ঘরে আস্তাবল থেকে বার করে এনে চটপট গাড়িতে যুক্ত

বাতাস উড়িয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছে হুঁচ বৈধানো, মুচমুচে তুষারকণা, আঙিনার ওপব দিয়ে হিসহিস শব্দে বয়ে চলেছে বুপোলি তুষার ঝড় আঙিনার বেড়ার ওপাশে গাছপালার গায়ে ঝুলছে জমাট শিশির-কণার নরম ঝালর। বাতাস ঝেড়ে কেলছে সেই জালর। মাটিতে পড়ে ছড়িয়ে যেতেই সূর্যের আলোয় রামধনুর সাতরঙে ঝিলমিল করে উঠছে, সৃষ্টি হচ্ছে বুপকণার জগতের এক বিচিত্র বর্ণসমারোহ। বাড়ির ছাদের ওপর ধৌয়ার চোঙা থেকে গলগল করে ধৌয়া উঠছে, তার পাশে শীতে জড়সড় হয়ে কতকগুলো দাঁড়কাক ক্ষীণকণ্ঠে কলরব করছিল। বরফের ওপর পায়ের মচমচ শব্দ হতে তারা ভয় পেয়ে সেখান থেকে উড়ে গেল, ছাই ছাই রঙের পৈজা বরফের মতো বাড়ির মাথার ওপরে চকর খেয়ে উড়ে চলে গেল পশ্চিমে, গির্জার দিকে, ভোরের বেগুনী আকাশের বৃকে ছড়িয়ে গেল ঘন নীল রঙ

বাড়ির যে ঝিটি দাওয়ায় ছুটে বেরিয়ে এসেছিল তার দিকে ফিরে খিগোরি চিৎকার করে বলল, 'বল, যে গাড়ি তৈরি'

নকুল-চর্মের কোটের কলারের ভেতরে গৌফজোড়া ঢুকিয়ে কর্তা বেরিয়ে এলো। কর্তা স্নেজের ওপর উঠে বসতে খিগোরি তার পা ঢেকে দিল, মখমলে মোড়া নেকডের চামড়ার কবলটা করে বৈধে দিল

'চাবুক কবাও, ঘোড়াটার দিকে এক পলক তাকিয়ে কর্তা বলল।

হাতের ভেতরে টান পড়তে ঘোড়ার রাশ কঁপতে লাগল টান টান হাতে রাশ ধরে রেখে কোচোয়ানের আসন থেকে ঝুঁকে পড়ে খিগোরি ভয়ে ভয়ে পথের ওপর স্নেজের টানা দাগের দিকে আডচোখে তাকাল, তার মনে পড়ে গেল, প্রথমবার শীতকালে যাত্রা করার সময় স্নেজটা একবার বিস্ত্রী ভাবে থাকা যাওয়ায় কর্তা তার মাথার পেছনে কী প্রচণ্ড ঘুসিটাই না মেরেছিল - বুড়োমানুষের হাতের ঘুসি সেটাকে আদৌ বলা চলে না। সেতুর দিকে গাড়ি ছুটিয়ে দিল কেবল এখানে এসেই দন পার হওয়াব সময় খিগোরি লাগাম ঢিলে করে দিল বাতাসের আপটায় গালে জ্বালা ধরিয়ে মিছিল। খিগোরি হাতের দস্তানা দিয়ে দু'গাল ঘষতে লাগল

দু'ঘন্টায় ইয়াগদনোয়েতে পৌঁছে গেল তারা সারাটা রাত্তা কর্তা চুপচাপ ছিল, কেবল মাঝে মাঝে হাতের একটা আঙুল বাঁকা করে খিগোরির পিঠে টোকা মেরে তাকে ধামতে বলে বাতাসের দিকে শিঠ করে সিগারেট পাকাল।

যখন পাহাড়ের ঢাল বয়ে তারা জমিদারির দিকে নামতে লাগল কেবল

তখনই কঠা জিজ্ঞেস করল, 'কাল কি সকাল সকাল যেতে হবে?'

গ্রিগোরি এক পাশে ফিরল ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া ঠোঁটদুটো ফীক করে অনেক কষ্টে সে মুখ থেকে শব্দ বার করল

'স-অকাল স-অকাল' 'সকাল-সকাল'-এর বদলে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো ঠাণ্ডায় জিভটা জমাট বেঁধে গেছে, যেন কুলে গেছে, দাঁতের পাটির সঙ্গে স্লেগে যাওয়ায় স্পষ্ট করে কথা উচ্চারণ করা যাক্ছিল না

'টাকাপয়সা সব পেয়ে গেছ?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার বৌয়ের জন্য ডেবো না, ভালোই থাকবে মন দিয়ে কাজ কর তোমার ঠাকুর্দা একজন কসাকের মতো কসাক ছিল বটে দেখো তুমি যেন কর্তার গলার স্বর খানিকটা চাপা শোনাল (বাতাস থেকে আড়াল করার জন্য এই সময় সে কলারে মুখ ঢেকেছিল), 'তুমি যেন তোমার বাপ-ঠাকুর্দার মান বজায় রাখতে পার তোমার বাবাই না একবার সম্রাটের পরিদর্শনের সময় ঘোড়ায় চড়ে কসরত দেখিয়ে প্রথম পুরস্কার পেয়েছিল?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার বাবা।'

'তাহলেই বোঝ।' কঠিন স্বরে যেন গ্রিগোরিকে শাসানি দিয়ে কঠা তার কঙ্কণ শেষ করল সঙ্গে সঙ্গে পশুলোমের কোটের কলারের আড়ালে মুখটা সম্পূর্ণ ঢেকে ফেলল

ঘোড়াটাকে সঙ্গে সঙ্গে বুড়ো সশকার হাতে ধরিয়ে দিয়ে গ্রিগোরি চাকরদেব মহলের দিকে পা বাড়াল

'তোমার বাবা এসেছে।' ঘোড়ার গাটা ঢাকনা দিয়ে ঢাকতে ঢাকতে সশ্কা পেছন থেকে তাকে চৈচিয়ে বলল।

পাশ্বেলেই একোফিয়েভিচ টেবিলের সামনে বসে মাংসের জেলি খাচ্ছে। খাওয়া তার প্রায় শেষ হয়ে এসেছে বাপের মুখের ওপর একবার নজর বুলিয়ে নিয়ে বিগলিত ভাব লক্ষ করে গ্রিগোরি স্থির সিদ্ধান্ত করে নিল, 'নেশার ঘোরে আছে।'

'কি গো সেপাইজী, ফিরলে?'

'ওঃ ঠাণ্ডায় একেবারে জমে গেছি।' দু'হাত চাপড়াতে চাপড়াতে গ্রিগোরি জবাব দিল। তারপর আঙ্গিনিয়ার দিকে ফিরে বলল, 'মাথার ঢাকনার বাঁধনটা খুলে দাও ত হাতের আঙুলগুলোতে কোন সাড় পাচ্ছি নে

'তোর ওপর দিয়ে খুব এক চোট গেছে দেখছি। বাতাস ত তুকে উঠেছে,' কান আর দাড়ি নেড়ে খাবার চিবুতে চিবুতে বিড়বিড় করে বাপ বলল।



এবারে তাকে অনেক বেশি নরম দেখাচ্ছে যেন সে-ই বাড়ির কর্তা এমনি করে আঙ্গিনিয়াকে সংক্ষেপে কুকুম দিল। 'আবও খানিকটা বুটি কাট ত একটু দরাজ হাতেই কাট।'

টোবিল ছেড়ে উঠে বাইরে গিয়ে তামাক খাবার জন্য দরজার দিকে এগোল। তারপর যেন নেহাৎই আকস্মিক ভাবে বার দুয়েক দোলনাটা দোলান দোলনার মশারির ভেতরে দাড়ি ঢুকিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'বাটা?'

'বেটী,' গ্রিগোরির হয়ে উত্তর দিল আঙ্গিনিয়া বুড়োর মুখের ওপর অসন্তোষের ভাব ঘুটে উঠে তার দাড়ির ফাঁকে আটকে রইল দেখে সঙ্গে সঙ্গে চটপট যোগ করল, 'ঠিক যেন পটে জাঁকা। অবিকল গ্রিশার মতো দেখতে।'

পান্তেনেই প্রকোফিয়েভিচ একগাদা কাপড়চোপড় আর কাঁধার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা ছোট্ট কালো মাথাটা বাস্তবসম্মত হয়ে খুটিয়ে দেখে সগর্বে রায় দিল, 'আমাদেরই ত রক্ত কুম বটে।'

'তুমি কিসে চড়ে এসেছ বাবা?' গ্রিগোরি জিজ্ঞেস করল

'দুই ঘোড়ার স্নেজে - ঘুড়ীটা আর পেত্রোর ঘোড়াটা যুতে।'

'একটা আনলেই ত পারতে, আমারটা যুতে নেওয়া যেত।'

'তাতে কী আছে? ওটা না হয় খালিই যাক ঘোড়াটা কিন্তু দিবা।'

'দেখেছ?'

'এক ঝলক দেখেছি।'

একই চিন্তায় উদ্ভিন্ন এরা দু'জনে এটা ওটা নানা অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে কথাবার্তা বলতে লাগল। আঙ্গিনিয়া তাদের কথার মধ্যে গেল না, মনমরা হয়ে খাটে বসে রইল তার পাথরের মতো কঠিন স্বকীয় স্তনদুটি ব্লাউজের দু'ধার ঠেলে বেরিয়ে আসাব উপক্রম করছে মেয়েটার জন্মের পর থেকে সে বেশ চোখে পড়ার মতো মোটা হয়েছে, তার চেহারার মধ্যে একটা নতুন ধরনের দৃঢ় বিশ্বাস আর সুখী-সুখী ভাব এসেছে।

ওরা দেবি করে ঘুমোতে গেল গ্রিগোরিকে আঁকড়ে ধরে রইল আঙ্গিনিয়া চোখের নোনতা জলে আর স্তন থেকে উপছে পড়া বাড়তি দুধের ধারায় ভিজিয়ে দিল গ্রিগোরির জামা।

'মনের দুঃখে মরেই যাব একা একা কাটাও কেমন করে?'

'চিন্তা কোরো না,' উত্তরে গ্রিগোরি ফিসফিস করে বলল।

'একবার ভেবে দেখ, রাতগুলো কী বড় লাচাটা ঘুমোয় না তোমার কথা ভেবে ভেবে শুকিয়ে মবে যাব। ভেবে দেখ গ্রিশা - চার চারটে বছর।'

লোকে বলে আগেকার দিনে পাঁচিশ বছর কাজ করতে হত।'

‘মাথায় থাক আমার আগেকার দিন’

‘আচ্ছা, হয়েছে হয়েছে।’

‘তুলোয় যাক তোমার পলটনের চাকরী! মানুষকে পরিবার থেকে আলাদা করে নিয়ে যায় এ আবার একটা চাকরী।’

‘ছুটি নিয়ে বাড়ি আসব।’

‘ছুটি নিয়ে’ আর্ডস্বরে ওব কথার প্রতিধ্বনি করে উঠল আঞ্জিনিয়া। ফৌপাতে ফৌপাতে গায়ের জামায় নাক ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, তুমি যদিও আসবে তদিনে কোথাকার জল কোথায় গিয়ে গড়াবে কে জানে?’

‘প্যান প্যান করো না এ যে একেবারে বর্ষার বিষ্টি ঝরছে ত ঝরছেই।’

‘আমার মতো অবস্থায় পড়লে তুমি বুকেতে।’

ভোর হওয়ার আগে আগে গ্রিগোরি ঘুমিয়ে পড়ল আঞ্জিনিয়া বাচ্চাটাকে ঝাণ্ডায়, তারপর কনুইয়ে ভর দিয়ে নিষ্পলক চোখে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল গ্রিগোরির মুখের অস্পষ্ট হয়ে আসা কালো-কালো রেখাগুলোর দিকে গ্রিগোরিকে সে বিদায় জানান। তার মনে পড়ে গেল সেই রাতের কথা যে দিন সে তার নিজের শোবার ঘরে গ্রিগোরিকে পীড়াপীড়ি করেছিল তাকে নিয়ে কুবানে চলে যাবার জন্য সেই রাতেরও এমনি চাঁদ ছিল, জানলার বাইরে উঠোন এমনি কবেই জোছনার ফটফটে সাদা আলোর বানে ভেসে যাচ্ছিল

এমনই ছিল সব। আজকের এই গ্রিগোরিও - সেই গ্রিগোরি, অঞ্চ সে নয়। ওদের দু’জনের পেছনে পড়ে আছে বহু দিনের মাড়িরে আসা এক দীর্ঘ পথ

গ্রিগোরি পাশ ফিরল, অস্পষ্ট ভাবে বিড়বিড় করে বলল, ওলশ্যানসি গ্রামে তারপর আবার চূপ করে গেল।

আঞ্জিনিয়া ঘুমানোর চেষ্টা করল, কিন্তু বাতাসের মুখে পড়া ঝড়কুটোর মতো কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল তার চোখের ঘুম সকাল পর্যন্ত শূয়ে শূয়ে সে ভাবতে লাগল গ্রিগোরির অসংলগ্ন কথাগুলো নিয়ে, ঝুঁজে বার করার চেষ্টা করল কী তার মনে! জানলার গায়ের জামাট শিশিরকণার প্রলেপ ভেদ করে ভোবের সফেন আলো ঘরের ভেতরে ঢুকতে না ঢুকতে পাঙ্কলেই প্রকোফিয়েভিচের ঘুম ভেঙে গেল

‘গ্রিগোরি উঠে পড়। ভোর হয়ে আসছে।’

আঞ্জিনিয়া হাঁটু গেড়ে বিছানায় বসে ঘাগরাটা পরে নিল। দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে অনেকক্ষণ ধরে দেশলাই ঝুঁজতে লাগল

সকালের খাওয়া সাওয়া সেয়ে জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদ করতে করতে একেবারে ভোর হয়ে গেল। নীল রঙের আভা ছড়িয়ে খেলা কবতে লাগল ভোবের আলো

বরফের মধ্যে পরিষ্কার ঝকঝকে দাঁত বাহ করে দাঁড়িয়ে আছে আঙিনার বেড়া  
আকাশের স্নিগ্ধ বেগুনী আবছায়াকে আড়াল করে কালো হয়ে আছে আস্তাবলের ঢালা

পান্তলেই প্রকেফিয়েডিচ খোঁড়া যুততে বেরিয়ে গেল আঙ্গিনিয়ার কামনাবিহীন  
চুশন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে গ্রিগোরি বৃড়ো সশক এবং বাকি সকলের  
কাছ থেকে বিদায় নিতে চলল।

বাচ্চাটাকে কাপড়চোপড়ে ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে আঙ্গিনিয়া বিদায় জানানোর  
জন্য বাইরে এলো।

গ্রিগোরি মেয়ের ছোট্ট ভিজ়ে কপালে ঠোট ঝুইয়ে ঘোড়ার কাছে এগিয়ে গেল  
'স্নেজে এসে বোস' গাড়ি ছেড়ে দিতে দিতে বাপ চিৎকার করে বলল  
'না, আমি ঘোড়ায় চড়েই যাব।'

গ্রিগোরি মনে মনে হিশেব করে ধীরেসুস্থে জিনের কষি টেনে বাঁধল, তারপর  
ঘোড়ার পিঠে উঠে বসে লাগাম গুছিয়ে ধরল এদিকে আঙ্গিনিয়া আঙুল দিয়ে  
গ্রিগোরির পা হাতড়াতে হাতড়াতে ঘন ঘন বলতে লাগল 'গ্রিশা, দাঁড়াও  
কী যেন একটা কথা বলতে চাইছিলাম তোমাকে' তারপর বিহ্বল হয়ে কাঁপতে  
কাঁপতে ভুরু ঝুঁচকে মনে আনার চেষ্টা করতে লাগল কথাটা কী

'আচ্ছা চলি। বাচ্চাটাকে দেখো চলি দেখ না, বাবা এব মধ্যে কত  
দূর চলে গেছে।'

'ওগো লক্ষীটি, একটু দাঁড়াও! ' বাঁ হাতে ঠাণ্ডা রেকাব আঁকড়ে ধরে,  
ডান হাত দিয়ে আঁচলে জড়ানো বাচ্চাটাকে বুকে চেপে ধরে আঙ্গিনিয়া অতৃপ্ত  
নয়নে গ্রিগোরির দিকে তাকাল তার বিস্ময়িত সিম্পলক দুই চোখ দিয়ে বরবর  
করে জল ঝরতে লাগল, দুটো হাতই জোড়া থাকায় চোখের জল মোছার উপায়  
রইল না।

সদর দরজার সামান বেরিয়ে এলো ভেনইয়ামিন

'গ্রিগোরি, কস্তা ডাকছেন।'

গ্রিগোরি গালাগাল দিয়ে উঠল, হাতের চাবুকটা দোলল। উঠোন থেকে  
বেরিয়ে গেল ঘোড়া ছুটিয়ে উঠানে জড় হওয়া বরফের ছুপের মধ্যে ফেলট  
স্ট-পরা পা আটকে যেতে বারবার আনাড়ির মতো টেনে বার করে ঝুঁড়তে ঝুঁড়তে  
আঙ্গিনিয়া তার পেছন পেছন ছুটল

পাহাড়ের ঝুটিটার ওপরে এসে গ্রিগোরি বাপকে ধরে ফেলল। মনটা শক্ত  
করে নিয়ে পেছন ফিরে তাকাল বাচ্চাটাকে আঁচলে জড়িয়ে বুকে চেপে ধরে  
আঙ্গিনিয়া দাঁড়িয়ে আছে গোটের কাছে। বাতাসে কাঁধের ওপর লটপট করছে,  
ঘুরপাক খাচ্ছে মাথার লাল শালের প্রান্ত

প্রিগোরি বাপের স্নেহের পাশাপাশি ঘোড়াটাকে নিয়ে এলো। ধীর গতিতে চালাতে লাগল। পাশ্বেলেই প্রকোফিয়েভিচ ঘোড়ার দিকে পিছন ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'তার মানে বৌয়ের সঙ্গে ঘর করার কথা মোটেই ভাবহিস নে?'

'সেই পুরানো কাসুন্দি আর ঘেঁটে কী হবে?'

'তাহলে আর ভাবহিস নে। এই কথা ত?'

'হ্যাঁ, তা-ই।'

'শুনেনি, আশ্বহত্যে করতে গিয়েছিল?'

'শুনছি।'

'কান কাছ থেকে শুনলি?'

'কস্তাকে জেলা সদরে নিয়ে এসেছিলাম সেখানে আমাদের গাঁয়ের কিছু লোকজনের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়।'

'ভগবান নেই নাকি?'

'আসল কথাটা হল কি বাবা যা গেছে তা গেছেই।'

'ওসব শয়তানি কথা আমাকে শোনাতে আসিস নে। আমি তোকে তোর ভালোর জন্যেই বলছি,' পাশ্বেলেই প্রকোফিয়েভিচ দপ করে জ্বলে উঠল।

'দেখলেই ত আমার একটা বাচ্চা আছে আর কথা কেন? এখন আর কিছু করার নেই।'

'দেবিস, অন্য কারও বাচ্চাকে ত আবার খাওয়াচ্ছিস না?'

প্রিগোরির মুখ ফেকাশে হয়ে গেল বাপ তার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিয়েছে। আগ্নিনিয়ার কাছে, এমনকি নিজেকে নিজের কাছে গোপন করলেও বাচ্চাটার জন্মের পর থেকে এই সন্দেহটাই সর্বস্বণ মনের ভেতরে পোষণ করে প্রিগোরি কষ্ট পেয়ে আসছে। রাতের বেলায় আগ্নিনিয়া যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন অনেক সময়ই সে দেলনার কাছে এসে মেয়েটার গোলান্দী ছোপ ধরা তামাটে মুঠা ঝুটিয়ে ঝুটিয়ে দেখে, তার মধ্যে খোঁজে নিজের মুখের আদল। কিছু প্রতিবারই আগের মতো সেই একই অনিশ্চয়তা নিয়ে তাকে সরে যেতে হয়েছে। গাঢ় বাদামী প্রায় কালো চুল - সে ত স্বেপানেরও শিশুর পাতলা চামড়া ভেদ করে যে নীল শিরার জাল দেখা যাচ্ছে তার ভেতর দিয়ে ছুঁপিও কার যত চালান করছে কে বলতে পারে? সময় সময় তার মনে হয় মেয়েটা ফেন তারই মতো দেখতে, আবার কখন কখন মনে হয় স্বেপানের মতো, তখন মনে ব্যথা লাগে। আগ্নিনিয়া যখন গর্ভবজ্রণায় ছটকট করছিল সেই সময় গাড়ি করে তাকে মাঠ থেকে নিয়ে আসার মুহূর্তগুলোতে যে বিবৃপতা প্রিগোরির মনে জেগেছিল, তাছাড়া বাচ্চাটা সম্পর্কে আর কোন উপলব্ধি প্রিগোরির নেই। একবার আগ্নিনিয়া

বান্ধাঘরে কাজে বাস্তব থাকায় মেয়েটাকে দোলনা থেকে বার করতে হয় শ্রিগোবিন্দকে সেই সময় ভিজ্ঞ কাঁধা বদল করতে গিয়ে এক তীব্র জ্বালাধরা উদ্বেজনা অনুভব করে শ্রিগোবিন্দ সে চোরের মতো এদিক ওদিক তাকিয়ে কাঁধা আর কাপড়চোপড়ের ফাঁক দিয়ে বাচ্চার বেরিয়ে থাকা পায়ে লাল আঙুলটা দাঁতের ফাঁকে চেপে ধরেছিল।

বাপ নির্মম ভাবে তার সেই ব্যথার জায়গাটায় খোঁচা মেরেছে জিনের কাঠামোর ওপর হাত রেখে চাপা গলায় শ্রিগোবিন্দ বলল, 'যারই হোক না কেন, বাচ্চাটাকে আমি ফেলছি না।'

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ ঘাড় না ফিরিয়েই ঘোড়াগুলোর উদ্দেশ্যে চাবুক দোলাল

'মাতালিয়া ওর নিজেই চেহারাটাই নষ্ট করে ফেলেছে ঘাড়টা বঁকে গেছে পক্ষাঘাতের বুগীর মতো। বড় কোন একটা শিরা কেটে ফেলেছে, তাহলে ঘাড় কাত করে চলতে হয়।'

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ চুপ করে গেল স্নেহের তলাকার পাতদুটো কড়কড় আওয়াজ করে বরফের ওপর দিয়ে চলতে লাগল, শ্রিগোবিন্দ ঘোড়াটা লোহার নাল ঠুকতে ঠুকতে পায়ে পায়ে হেঁটে চলল

'তারপর এখন? এখন কেমন আছে?' বিশেষ মনোযোগ দিয়ে ঘোড়ার কেশরের তেতর থেকে চোরকাঁটা খুঁটে বার করতে করতে শ্রিগোবিন্দ জিজ্ঞাস করল

'কোন রকমে সামলে উঠেছে আর কি সাত মাস বিছানায় পড়ে ছিল। ট্রিনিটি পুরবের সময় ত যায় যায় অবস্থা ফাদার পান্ড্রাতি এসে ত প্রলেপ-ইলেপ মাখিয়ে শেষ কাজ করে চলে গেলেন কিন্তু তারপরই ভালো হয়ে উঠল আস্তে আস্তে উঠল, উঠে চলে ফিরে বেড়াতেও লাগল কান্টোটা বুকেই বসাতে গিয়েছিল, কিন্তু হাত কঁপে যাওয়াতে ফসকে পাশ কেটে চলে যায় নইলে নির্ঘাত শেষ হয়ে যেত '

'পাহাড়ের নীচের দিকে ঢালাও!' শ্রিগোবিন্দ চাবুক হাঁকাল, রেকাবের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে ঘোড়াটাকে দুলালি চালে ছুটিয়ে বাপকে ছাড়িয়ে চলে গেল। ঘোড়ার খুরের ঘায়ে ডেলা ডেলা বরফ উড়ে স্নেহের ওপর গিয়ে পড়ল

'মাতালিয়াকে আমরা নেব।' ছেলের নাগাল ধরার জন্য স্নেজ হাঁকাতে হাঁকাতে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ চৌচিয়ে বলল 'মেয়েটা বাপের বাড়িতে আর থাকতে চায় না এই সেদিন দেখা হয়েছিল। আমাদের বাড়িতে চলে আসতে বলেছি '

শ্রিগোবিন্দ কোন উত্তর দিল না প্রথম গ্রাম পর্যন্ত কেউ কোন কথা বলল না পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ এ প্রসঙ্গ আর উত্থাপনই করল না

সারা দিনে তারা চব্বিশ কোশ পথ পার হুল পরের দিন ঘর-বাড়িতে যখন সন্ধ্যার বাতি জ্বলছে সেই সময় এসে পৌঁছুল মনুকোভোয়।

‘ভিওশেনস্কায়ার লোকেরা কোন পাড়ায় আছে?’ প্রথম যে লোকটির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তাকে জিজ্ঞেস করল পাশ্বেলেই প্রকোফিয়েভিচ

‘বড় রাস্তা ধরে সোজা চলে যাও।’

নির্দেশমতো এসে যে বাড়িটা ওরা পেল দেখা গেল আরও পাঁচজন রঙবুট সেখানে এসে হাজির হয়েছে। সঙ্গে তাদের বাবারাও আছে।

‘কে কোন গ্রাম থেকে এসেছে?’ চালাব নীচে ঘোড়াগুলোকে রাখতে রাখতে পাশ্বেলেই প্রকোফিয়েভিচ জ্ঞানতে চাইল।

‘চির নদীর পার থেকে,’ উত্তরে অজ্ঞকারের ভেতর থেকে গমগম করে উঠল কয়েকটি কণ্ঠস্বর।

‘কিন্তু কোন্ গ্রাম?’

‘আমরা কেউ এসেছি কার্গিন থেকে, কেউ নাপোলভ থেকে, কেউ বা লিখভিনভ থেকে আপনারা কোথেকে?’

‘কোন্সিবাসা থেকে, ঘোড়াটার পিঠের জিন খুলে জিনের তলার ঘরাস্তা পিঠটা ছুঁয়ে দেখতে দেখতে জোরে হেসে বলল গ্রিগোরি

পরদিন সকালে জেলার কসাক-সর্দার দুদারেভ ভিওশেনস্কায়ার ছেলেনের ডাক্তারী পরীক্ষকমণ্ডলীর সামনে এনে হাজির করল। গ্রিগোরি তার গ্রামের সমবয়সী আরও সব ছেলের মেথা পেল সেখানে। মিতকা কোরশুনভ হালকা বাদামী রঙের একটা উঁচু ঘোড়ার পিঠে দিবি একটা নতুন বকবকে জিন চাপিয়ে, বুকে দামী চামড়ার ফিতে আব কানুকাঙ্ক-করা অন্যান্য সাজসজ্জা লাগিয়ে সকালবেলাতেই তার পিঠে চড়ে কুরোর দিকে যাবার পথে গ্রিগোরিকে মেখেতে পেল। গ্রিগোরি তখন যে বাড়িতে উঠেছে সেখানকার গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। মিতকা তাকে দেখে কোন রকম সম্ভাষণ না করে বাঁ হাত ঠেকিয়ে কাত-করে-পর মাথার টুপিটা সামলাতে সামলাতে পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

জেলার বিভাগীয় প্রশাসন দপ্তরের ঠাণ্ডা ঘরের মধ্যে একে একে সকলকে জামাকাপড় খুলতে হল সামরিক কেরানিরা আর জনৈক অ্যাসিস্টেন্ট পুলিশ অফিসার বাস্তবসম্মত হয়ে পাশ দিয়ে ছুটোছুটি করতে লাগল, প্রদেশের আত্মমানের এডজুটেন্ট চকচকে পালিশ-করা খাটো বুটজুতো পায়ে ঘন ঘন পাশ দিয়ে যাতায়াত করতে লাগল। তার আঙুলের কালো পাথর বসানো মহামূল্য আঙটি আর সুন্দর কালো চোবের গোলাপী আভাযুক্ত সামান্য স্ফীত সাদা অংশ তার দেহের ত্বক আর কাঁধ থেকে ঝোলা পদমর্যাদাবাহক রজ্জুগুচ্ছের শূভ্রতা আরও প্রকট করে

তুলছে ভেতরের ঘর থেকে ডাক্তারদের কথাবার্তা আর টুকরো টুকরো নানা  
মন্তব্য, ভেসে আসতে লাগল

‘উনসন্তর।’

‘পাভেল ইভানভিচ, বর্ণা-কলমটা দিন,’ দরজার খুব কাছে শোনা গেল ষোয়ারি  
জড়ানো ঘড়ঘড়ে গলার স্বর।

‘বুকের মাগ

‘হ্যাঁ হ্যাঁ বংশগত যে সে ত স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে।’

‘সিফিলিস নোট করে রাখুন।’

‘আরে অমন হাত দিয়ে ঢাকাটুকির কী আছে? মেয়ে নাকি?’

‘আহা গড়নের কী ছিরি

‘পুরো গ্রামটাই এই রোগের জিপো বিশেষ ব্যবস্থা না নিলে নয়। আমি  
ইতিমধ্যেই এ ব্যাপারে মহামান্যের কাছে রিপোর্ট পাঠিয়েছি।’

‘পাভেল ইভানভিচ এই নমুনাটির দিকে একবার চেয়ে দেখুন। এ কী গড়ন?’

‘হুম, তা ঠিক

চুকারিনস্কি গ্রামের এক কটা-চুল ঢাঙা ছোকরার পালে খিগোরি জামাকাপড়  
হাড়ছিল এমন সময় ভেতরের দরজা ঠেলে বেরিয়ে এলো এক কেরানি তার  
গায়ের আঁটোসাঁটো ফৌজী শাটের শেছন দিকটা কৌচকানো। বেরিয়ে এসেই স্পষ্ট  
গলায় সে ডাকল

‘পানফিলভ সেভাস্তিয়ান, মেসেখভ খিগোরি।’

‘শিগুগির।’ পায়ের মোজা টান মেরে খুলতে খুলতে লজ্জায় লাল হয়ে গিয়ে  
ভয়ার্ড কণ্ঠে ফিসফিস করে বলল খিগোরির পাশের ছেলেটা।

খিগোরি ভেতরে ঢুকল ঠাণ্ডায় কীটা কীটা ফুসকুড়িতে ছেয়ে আছে তার  
শিঠের চামড়া। তার তামাটে রঙের গাটা দেখাচ্ছে রোদ-জল-হাওয়া লাগানো ওক  
গাছের মতো। নিজের পা দু’খানার দিকে নজর পড়তে ঘন কালো লোমে ছেয়ে  
গেছে দেখতে পেয়ে সে বিব্রত হয়ে পড়ল ঘরের এক কোনায় ওজনযন্ত্রের  
ওপর উদ্যম হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল বেচপ ধরনের একটা ছেলে ডাক্তারের অ্যাসিস্টেন্ট  
বা ওরকমই কেউ একজন হবে, পাছার তার সরিয়ে সম্মান করে দিয়ে হাঁকল,  
‘এক তিরিশ। নেমে পড়’

ডাক্তারী পরীক্ষার অসম্মানজনক পদ্ধতি দেখে খিগোরি বিচলিত হয়ে পড়ল।  
সাদা আঙুরাখা পথা এক পাকাচুল ডাক্তার স্টেথোস্কোপ দিয়ে তার বুকে পরীক্ষা  
করল, আরেকজন তার বয়সটা একটু কম চোখের পাতা উলটে দেখল, জিভ  
দেখল তৃতীয় জন-শিশুর ড্রেসের চশমা চোখে-কন্ট্রী পর্যন্ত আন্তিন গুটিয়ে

হাত কচলাতে কচলাতে পেছনে ঘুরঘুর করতে লাগল।

পাল্লায় চাপ।’

খ্রিগোরি খাঁজ খাঁজ কাটা ঠাণ্ডা পাটাতনের ওপর উঠে দাঁড়াল

‘দুই বারো’ ষটখট করে লোহার ভার এক দিকে সবিয়ে দিয়ে হিসাব করে বলল শুষ্কনের লোকটা।

‘বলে কী তেমন লম্বাও ত নয় ’ খ্রিগোরির হাত ধরে তাকে এক পাক ঘুরিয়ে পাকাচুল ডাক্তার বিভবিড় করে বলল

অন্নবয়সী আরেকজন যে ডাক্তার ছিল সে বিষম বেয়ে গলা খাঁকারি দিয়ে বলল

‘ডাক্তার ব্যাপার।’

‘কত?’ টেবিলের ধারে যারা বসে ছিল তাদের ভেতর থেকে একজন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

‘দু’মন বারো সের’ ভুরুজোড়া যেমন ওপরে উঠে গিয়েছিল তেমনই অবস্থায় ‘রেখেই বুড়ো ডাক্তার জবাব দিল।

‘গাড় বাহিনীতে নিয়ে নেব নাকি?’ প্রবেশের মিলিটারি পুলিশ-অফিসার পাট করে আঁচড়ানো কালো চুলভর্তি মাথাটা কাত করে টেবিলে পাশের জনের দিকে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করল

গুণ্ডা গুণ্ডা চেহারা একেবারেই জংলী।’

‘এই যে শুনছ? পেছন ফের দেখি! পিঠে ওটা কী?’ অধীর হয়ে টেবিলের গায়ে আঙুল ঠুকতে ঠুকতে কর্ণেলের কাঁধ পটি লাগানো অফিসারটি টেটিয়ে বলল।

পাকাচুল ডাক্তার বিভবিড় করে কী বলল বোঝা গেল না খ্রিগোরি টেবিলের দিকে পিঠ করে দাঁড়াল। তার সর্বাস্থে সিরসির করে একটা কাঁপুনি খেলে গেল কোন রকমে নিজেসঙ্গে সামলে নিয়ে সে জবাব দিল, ‘বসন্তকালে ঠাণ্ডা লেগেছিল তাইতে ফুসকুড়ি হয়েছে।’

সব রকম মাপজোখ শেষ হয়ে গেলে অফিসাররা সেখানেই টেবিলের ধারে বসে বসে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে শেষকালে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করল

‘সাধারণ আর্মিতেই যাবে।’

‘বারো নম্বর রেজিমেন্ট, মেলেখভ শুনছ?’

খ্রিগোরি ছাড়া পেল। দরজার দিকে যেতে যেতে তার কানে এলো চোঁট বাঁকানো চাপা মন্তব্য

‘অ-স-ম-ভব একবার ভেবে দেখুন, অমন একখানা মুখ সম্রাটের চোখে পড়বে, তখন কী অবস্থাটা হবে? ওর কেবল চোখদুটোই

‘দো আঁশলা জাতীর পুর দেশের কোন জায়গার হবে।’



‘তাছাড়া গাটাও সাফসুতর নয়, ফুস্ফুড়িতে

গাঁয়ের ছেলেপুলেরা যারা তাদের পালার অপেক্ষায় ছিল, গ্রিগোরিকে ঘিরে ধরল

‘কী হল রে গ্রিশকা?’

‘কোথায় নিল রে তোকে?’

‘আতামান রেজিমেন্টে নিশ্চয়?’

‘ওজন কত হল?’

এক পায়ে ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে প্যান্ট গলিয়ে দাঁত দাঁত চেপে গ্রিগোরি উত্তর দিল

কেটে পড় দেখি চুলোয় যা সব। পেয়েছিস কী তোরা? কোথায় নিল?’

বারো নম্বর রেজিমেন্টে

‘কোবশুনভ দমিত্রি, কারাগিন ইভান,’ দরজার ফাঁক দিয়ে গলা বাড়িয়ে কেরানি হীক দিল।

চলতে চলতে ভেড়ার চামড়ার কোটে বোতাম লাগাল গ্রিগোরি দৌড়ে নেমে গেল ধাপ বয়ে

উষ্ণ বাতাসের নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে বরফ গলতে শুরু করে দিয়েছে জায়গায় জায়গায় রাস্তাটা বরফ গলে ন্যাড়া হয়ে গেছে, সেখান থেকে গরম ভাপ উঠছে কক কক করতে করতে মুরগীগুলো রাস্তাব এধাব থেকে ওধারে ছুটে বেড়াচ্ছে যেখানে জল জমে ডোবা হয়েছে তার গায়ে তেরছা হয়ে ছোট ছোট তরঙ্গ খেলে যাচ্ছে, ছপ ছপ করে জল ছিটিয়ে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে একপাল হাঁস তাদের পায়ের জোড়া লাগা গোলাপী পাতাগুলো জলের ভেতরে লাল আর কমলাবঙের আড়া মেলাতো দেখাচ্ছে - যেমন দেখায় হিমের ছোঁয়ার শরৎকালের গাছের মুহামান পাতাগুলো।

একদিন পরে ঘোড়াগুলো পরীক্ষার কাজ শুরু হল বারোয়ারিতলার অফিসাররা ব্যস্তসমস্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করতে লাগল খেটকোটের প্রান্ত পত্ত পত্ত করে উড়িয়ে একজন ঘোড়ার ডাক্তার আর তার সহকারী ঘোড়া মাণার কাঠি হাতে চলে গেল দেয়াল বরাবর লম্বা করে সার বেঁধে দাঁড় করানো হয়েছে নানা রঙের, নানা ধরনের ঘোড়া মাঠের মাঝখানে একটা ছোট টেবিল রাখা হয়েছে একজন কেরানি সেখানে বসে পরীক্ষা ও মাপজোখের ফলাফল লিখছে। ভিওশেন্‌স্কায়া জেলার আতামান দুদারেভ ওজনযন্ত্রেব কাছ থেকে পিছলে পড়ে হৌচট খেতে খেতে ছুটল সেই টেবিলটার দিকে মিলিটারি পুলিশ অফিসার এক তরুণ লেফটেন্যান্টকে কী যেন বোঝাতে বোঝাতে রাগত ভাবে পা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে পাশ দিয়ে চলে গেল

সংখ্যানুক্রমে একশ’ আটে গ্রিগোরির পালা আসতে সে তার ঘোড়াটাকে

ওজনযন্ত্রের কাছে নিয়ে এলো। ওরা ঘোড়াটির সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাপজোখ নিল, তার ওজন নিল পাটাতন থেকে নামতে না নামতেই ঘোড়ার ডাক্তার ফের তার স্বভাবসিদ্ধ কর্তৃত্বের ভঙ্গিতে ঘোড়ার ওপরের ঠেটিটা ধরে ফাঁক করে গলার ভেতরটা দেখল, খুব ভালো করে টিপে টিপে বুকের আগসপেশীগুলো দেখল। তারপর মাকড়সার পায়ের মতো শক্ত শক্ত আঙুল দিয়ে হাতডাতে হাতডাতে ঘোড়ার পায়ের কাছে চলে গেল।

হাঁটুর গাঁটের ওপর চাপ দিল, মোটা মোটা শিরার গোছার ওপর টোকা মারল, খুরের কাছাকাছি চুলের গোছার নীচেকার হাড়ে চাপ দিল।

ডাক্তার অনেকক্ষণ ধরে টেস্টিং করে। কান পেতে যে ভাবে পরীক্ষা করতে লাগল তাতে ঘোড়াটা সতর্ক ভঙ্গিতে কান খাড়া করে নইল। শেষকালে সাদা ওভারঅল লটপট করতে করতে চারখারে কার্বলিক এসিডের উগ্র গন্ধ ছড়িয়ে ডাক্তার জায়গা ছেড়ে চলে গেল।

ঘোড়াটা ব্যতিল হয়ে গেল। বড়ো সান্ধা যা আশা করেছিল তা হল না। যে গোপন বৃত্তের কথা বড়ো বলেছিল। পাকা ডাক্তারের ঠিকই 'স্বামতায়' কুলোল তা ধরে ফেলার।

গ্রিগোরি বড়ই বিচলিত হয়ে পড়ল, বাবার সঙ্গে পরামর্শ করে আশ্বস্তি বাদে মাক্‌খানে এক ফাঁকে পেত্রোর ঘোড়াটাকে ওজনযন্ত্রের সামনে এনে হাজির করল। ডাক্তার তেমন কোন পরীক্ষা না করেই এই ঘোড়াটাকে মঞ্জুর করল।

ওখানেই খানিকটা দূরে একটা শূকনোন্নতন জায়গা বেছে নিয়ে ঘোড়ার গায়ের ঢাকনা মাটিতে বিছিয়ে গ্রিগোরি তার ওপর যাবতীয় সরঞ্জাম বার করে রাখল। পাশ্বেলেই প্রকোফিয়েভিচ ছেলের পেছনে ঘোড়াটা ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করতে লাগল আরেক জন বড়োর সঙ্গে সে-ও এসেছে তার ছেলেকে বিদায় জানাতে।

হালকা ধূসর রঙের গ্রেটকোট আর বুপোন্সী ভেড়ার লোমের লম্বা টুপি মাথায় এক দীর্ঘকায় সাদাচুল জেনারেল তাদের পাশ দিয়ে চলে গেল। চলার সময় তার বাঁ পাটা আলতো ভাবে ওপরে উঠে যাচ্ছিল। সাদা দস্তানা পরা হাতটা দুলাছিল।

'প্রদেশের আতামান,' পেছন থেকে গ্রিগোরিকে ঠেলা মেরে ফিসফিস করে পাশ্বেলেই প্রকোফিয়েভিচ বলল।

'জেনারেল বুঝি?'

মেজর জেনারেল মাকেয়েভ বেরাড়া ধরনের কড়া মানুষ।

আতামানের পেছন পেছন দঙ্গল বেঁধে চলেছে রেজিমেন্ট ও বাটারি থেকে আগত অফিসাররা। একজন সাব-অল্টান কাঁধ আর উঁচু দুটো তার চওড়া,

গোলন্দাজ বাহিনীর উপি-পর। আত্মমান-রেজিমেন্টের বন্দিদের জনৈক দীর্ঘকয়ে সুদর্শন অফিসার সঙ্গীর সঙ্গে জোরে জোরে কথা বলছিল।

‘কী কাণ্ড! এস্তেনিয়ার গ্রাম, লোকজন বেশির ভাগই ফরসা, অথচ তাদেরই মধ্যে মেয়েটা কিনা বেখাপ্পা রকমের উল্টো! অকণ্য একা সেই মেয়েটাই যা বলি কেন। আমরা এই নিয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা শুরু করে দিলাম। শেষকালে জানা গেল বছর বিশেক আগে ’ গ্রিগোরি যেখানে ঘোড়ার গা ঢাকার চাদরের ওপর সাজসরঞ্জামগুলো গোছগাছ করে রাখছিল, অফিসার দু’জন ইতিমধ্যে সেই জায়গা ছেড়ে আরও দূরে এগিয়ে যাওয়ায় কথাগুলো হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে গেল - অনেক কষ্টে ওদের হাসির আডাল ভেদ করে গ্রিগোরি শুনতে পেল গোলন্দাজ বাহিনীর সাব-অলটার্ণের শেষ কথাগুলো ‘জানা গেল আপনাদের আত্মমান গার্ড রেজিমেন্টের একটা অংশ ওই গ্রামে ছাউনি ফেলেছিল ’

বেগনী রঙের লেবার কালিতে মাখামাখি কাঁপা কাঁপা আঙুলে ব্রক কোটের বোতাম আঁটতে আঁটতে একজন কেরানি ছুটে গেল, তার পেছন পেছন প্রদেশের মির্জিটারী পুলিশ অফিসারের সহকারী উত্তেজিত হয়ে চৌচিয়ে বলল, ‘তিন কপি লাগবে, বলি নি। বাছাখনকে ঘানি ঠেলতে পাঠাব, তখন টের পাবে!’

গ্রিগোরি কৌতুহলী হয়ে অফিসার আর কর্মচারীদের অচেনা মুখগুলো লক্ষ করতে লাগল। একজন এডজুটেন্ট পাশ দিয়ে যেতে যেতে একজোড়া ক্লাস্তিকর বাষ্পাক্ত চোখের স্থির দৃষ্টি মেলে তার দিকে তাকাল। কিন্তু গ্রিগোরির মনোযোগী চোখে চোখ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মুখ ঘুরিয়ে নিল। কোন কারণে দৃষ্টিভ্রান্ত এক বয়স্ক লেফটেন্যান্ট হলসে ছাতলা পড়া দাঁতে ওপরের ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে প্রায় দৌড়ে চলেছে এডজুটেন্টের পিছু পিছু। গ্রিগোরি লক্ষ করল লেফটেন্যান্টের বাদামী ভুবুর ওপর চোখের পাতা ঝুয়ে একটা শিরা দপ্ দপ্ করছে।

গ্রিগোরির পায়ের কাছে পড়ে আছে ঘোড়ার গায়ের ঢাকনা ঢাকনাটা সদা বার করা তার ওপর সে সাজিয়ে রেখেছে ঘোড়ার পিঠের জিন। জিনের নীচেকার কাঠের তক্তা সবুজ রঙ করা, ধাতুর কাঠামো দিয়ে বাঁধানো, জিনের সামনে আর পেছনে ঝোলানোর দুটো থলে, দুটো গ্রেটকোট, দুটো সালোয়ার, একটা উদ্দি দু’জোড়া বুটজুতো। ভেতরে পরার জামাকাপড়, পোয়া তিনেক লেডো বিন্দুট, এক টিন মাংস, কিছু সিদ্ধ করে খাবার উপযোগী শস্যাদানা এবং একজন ঘোড়সওয়ার-সৈন্যের উপযুক্ত পরিমাণ আরও সব খাবারদাবার জিনের খোলা থলের ভেতর থেকে দেখা যাচ্ছে ঘোড়ার চার পায়ের জন্য এক প্রস্ত নাগ, তেল মাখানো ন্যাঙ্কডায় জড়ানো কিছু পেরেক, সেলাইয়ের সরঞ্জাম দুটো ছুঁচ আর খানিকটা সুতো, একটা গামছা।

গ্রিগোরি শেষবারের মতো তার জিনিসপত্রের ওপর নজর বুলিয়ে নিল, উবু হয়ে বসে পড়ে জামার হাতা দিয়ে খালের বকলসের ধারে লেগে থাকা ময়লা ঘাবে ঘাবে তুলে ফেলল। যার যার ঘোড়ার ঢাকনার কাপড়ের পাশে সাজসরঞ্জাম রেখে সার বেঁধে অপেক্ষা করছে কসাকরা ব্যারোয়ারিতলার এক প্রান্ত থেকে এসে পরীক্ষকের দল ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে লাগল তাদের পাশ দিয়ে অফিসাররা আর আতামান মনোযোগ দিয়ে কসাকদের মালপত্র খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। তারা তাদের হালকা ধূসর বস্ত্রের গ্রেটকোটের কিনারা টেনে তুলে আলগোছে বসে ওদের খলে হাতড়ে দেখল, চুচসুতো দেখল, লেডো বিন্দুটের খলে হাতে নিয়ে আন্দাজে ওজন পরীক্ষা করল

‘একবার তাকিয়ে দেখ ভাই, ওই যে ওই ঢাঙটার দিকে’ গ্রিগোরির পাশের ছেলোটো এদেশের মিলিটারী পুলিশ অফিসারকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, ‘যেন একটা কুস্তা খট্টাশের খোঁড়লে খোঁড়াখুঁড়ি শুরু করে দিয়েছে।’

‘ইশ শয়তানের কাণ্ডখানা দেখ! খলোটো উল্টে দেখছে!’

‘কোন গোলমাল আছে বোধহয়, নইলে কি আর অমন ঝাড়াঝুড়ি করে।’

‘আরে নালের পেরেক গুনতে শুরু করেছে নাকি?’

‘শালা কুস্তা!’

কথাবার্তা আস্তে আস্তে খিতিয়ে পড়তে লাগল, পরীক্ষকের দলটা এখন আরও কাছে এগিয়ে এসেছে, আর মাঠ কয়েকজনের পরেই গ্রিগোরির পালা এদেশের আতামান বা হাতে দস্তানা বায়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, ডান হাতটা কনুইয়ের কাছে ভাঁজ না করে সোজা রেখা দোলাতে দোলাতে চলেছে। গ্রিগোরি নিজেকে ঠিকঠাক করে নিল, পেছনে বাবা গলা ঝাঁকারি দিল, বাতাসে ব্যারোয়ারিতলার ওপর দিয়ে ভেসে আসছে ঘোড়ার মূত আর গলা বরফের গন্ধ সূর্য অগ্রসর দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে, দেখে মনে হয় যেন নেশার জড়তা তার এখনও কাটে নি

অফিসারদের দলটা গ্রিগোরির পাশের জমেনের সামনে বেশ খানিকটা সময় নিল, তারপর একজন একজন করে এগিয়ে এলো তার কাছে

‘পদবী, নাম?’

‘মেলেক্সান্ড গ্রিগোরি’

মিলিটারী পুলিশ অফিসার কোমরের পেছনকার পটি ধরে গ্রেটকোটটা সামান্য তুলে ধরে ভেতরের কাপড় খুঁকে দেখল, এক ঝলক চোখ বুলিয়ে বোতাম-বকলস গুনে ফেলল, কর্ণেটের কাঁধপাটি লাগানো আরেকজন অফিসার সালোয়ারের টেকসই বনাত কাপড়টা দুই আঙুলে দলে মুচড়ে দেখল, অন্য আরেকজন এমন ভাবে ঝুঁকে পড়ে ধলেগুলো হাতড়াতে শুরু করল যে বাতাসে তার গ্রেটকোটের প্রান্তটা

বারবার উল্টে পিঠে এসে বাপটা খেতে লাগল। পুলিশ অফিসার তার বুডো আঙুল আর কড়ে আঙুলের ফাঁক দিয়ে এমন ভাবে সম্ভরণে পেরেক জড়ানো ন্যাকড়াটা ছুঁয়ে দেখল যে মনে হল বুঝি কোন গরম জিনিসে হাত পড়েছে। ঠোট নেড়ে বিভ্রিড় করে গুনে শেষকালে জিজ্ঞেস করল, 'নালের পেরেক তেইশটা কেন? এর মানে কী?' রেগে ন্যাকড়ার কোনা ধরে টান মারল সে।

'না হুজুর, তেইশটা ত নয়, চব্বিশটাই আছে।'

'আমি কি তাহলে কানা?'

ন্যাকড়ার এক পাশে একটা ভাঁজ পড়ে তার ডেতরে আরও একটা পেরেক ঢুকে গিয়েছিল। গ্রিগোরি চটপট ভাঁজ খুলতেই সেটা বেবিয়ে পড়ল। ভাঁজ খোলাব সময় তার খসখসে কালো আঙুলগুলো অফিসারের দুখাল সাদা আঙুলের সঙ্গে সামান্য লেগে যেতেই অফিসার এমন ভাবে ঝটকা মেরে হাতটা সরিয়ে নিল যে মনে হল বুঝি হুলের খোঁচা খেয়েছে। দূসর গ্রেটকোটের এক পাশে হাতটা মুছে ফেলে ঘৃণাতরে ভুরু কঁচকে দস্তানাটা হাতে পরল।

গ্রিগোরি ব্যাপারটা লক্ষ করল। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সে গা-জ্বালানো হাসি হাসল। চোখাচোখি হতেই অফিসারের দুই গালে লাল আভা ছড়িয়ে পড়ল, গলা চড়িয়ে সে বলল, 'এ কি তাকানোর ছিরি? তুমি কী রকম কসাক হৈ ছোকরা?'

কৌরকর্মের সময় অফিসারের গালের হাড়ের কাছটা কেটে গিয়েছিল। সেই শুকিয়ে যাওয়া কাটা দাগসম্মত গালটা আগাগোড়া গোলাপী হয়ে উঠল। আবাবও চোটপাট করে সে যোণ করল, 'জিনের থলের বক্সসগুলো ঠিকঠাক নেই কেন? এসব কী ব্যাপার, অ্যা? তুমি কি কসাক না গৈয়ো চাষা? বাপ কোথায়?'

পাশ্বেলেই প্রকোফিয়েভিচ ঘোড়ার মুখের লাগামে টান দিয়ে এক পা এগিয়ে গিয়ে খোঁড়া পায়ে জুতোর হিল ঠুকে আটেনশানের ভদ্রিতে দাঁড়িয়ে পড়ল। আগের দিন রাতে তাসের বাড়িতে হেরে যাওয়ার ফলে অফিসারের মেজাজ অমনিতেই খিচড়ে ছিল। পাশ্বেলেই প্রকোফিয়েভিচ কাছে আসতে তার ওপর সেই ঝাল রেড়ে সে বলল, 'কী ব্যাপার, পল্টনের নিয়মানুসার কিছু জান না নাকি?'

ততক্ষণে প্রদেশের আতামান কাছে চলে এসেছে। তাকে দেখে পুলিশ অফিসারটি চুপ কবে গেল। আতামান এসে জিনের গদিতে বুটজুতোর ডগা দিয়ে খোঁচা মারল, হিঁকা তুলে পরের জনের কাছে এগিয়ে গেল। গ্রিগোরি যে রেক্সিমেন্টে পড়েছে সেখানকার একজন অফিসার ভদ্র ভাবে গ্রিগোরির সব জিনিসপত্র এমন কি চুচসুতো পর্যন্ত টেনে টেনে বার করে দেখল। পিছু হটে হাওয়া আড়াল করে সিগারেট ধরাতে ধরাতে সে-ই সবার শেষে গ্রিগোরিকে ছেড়ে চলে গেল।

একদিন বাসে লাল রঙের কতকগুলো ভ্যানে এক পাল কসাক, তাদের ঘোড়া

আর রাসদ নিয়ে একটা ট্রেন চের্তকোভো স্টেশন থেকে লিঙ্গি ও ভারোনেজের দিকে যাত্রা করল।

ওই রকমই একটা ভ্যানের ভেতরে একটা কাঠের ডাবার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল গ্রিগোরি। ভ্যানের খোলা দরজার পাশ দিয়ে সরে সরে যাচ্ছে এক অচেনা সমতল ভূমি, দূরে ঘুরপাক খেতে খেতে চলেছে হাল্কা নীল বনভূমির

১৭৭

ষোড়াগুলো কচরমচর করে খড় চিবুচ্ছে, পায়ের নীচের সচল মেঝেটার ওপর সুস্থির হয়ে থাকতে না পেরে থেকে থেকে একবার এপায়ে আরেকবার ওপায়ে দেহের ভার রাখছে।

ভ্যানের মধ্যে স্তম্ভের গাছগাছালি, ষোড়ার ঘাম আর বসন্তের বরফ-গলার গন্ধ দূর দিগন্তে ঝিলঝিল করছে হ্রান সজ্জাতারার মতোই ভাবমণ্ড ও দূরধিগমা অস্পষ্ট নীল বনরেখা।

## তৃতীয় পর্ব

### এক

১৯১৪ সালের মার্চ মাস বসন্তের এক অনন্দমুখর দিন। বরফ গলতে শুরু করেছে এমনই এক দিনে নাতালিয়া ফিরে এলো ঋশুরবাড়ি। পাশ্বেলেই প্রকোফিয়েভিচ ময়ুরকণ্ঠী রঙের উইলোর মোটা ঝাড় কেটে এনে তাই দিয়ে যাঁড়ের গুতোয় ডাঙা বেড়াটা মেরামত করছিল। ছাদ থেকে সুপোলী বরফের কাঠি ঝুলছে, সেখান থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় জল গলে পড়ছে কান্নিশের গা বয়ে আগে যে জলের ধারা পড়েছিল এখন তার দাগ আলকাতরাব কালো কালো আঁচড়ের মতো দেখাচ্ছে

সূর্য আরও একটু লাল, আরও একটু উষ্ণ হয়ে উঠেছে, একটা আদুরে বাছুরের মতো বরফ-গলা টিলার গা ঘেঁসে আশ্রয় নিয়েছে মাটি জল পেয়ে সরস হয়ে উঠেছে, দনের ধারের টিলা থেকে ক্রমশ সরু হয়ে খড়মাটির ঢাক পড়া যে-সব অংশ জলের ভেতরে নেমে গেছে সেখানে এখনই সবুজ ঘাস গজিয়ে মালাকাইট পাথরের মতো দেখাচ্ছে

নাতালিয়ার চেহারা পালটে গেছে, সে যোগা হয়ে গেছে বিকৃত, বঁকা ঘাড়টা নীচু করে পেছন থেকে ঋশুরের কাছে এগিয়ে এসে সে বলল, 'কেমন আছেন বাবা, ডালো ত ?'

'আরে আমাদের নাতালিয়া মা যে ' এসো মা, এসো ' পাশ্বেলেই প্রকোফিয়েভিচ ব্যস্তসমস্ত হয়ে পড়ল বেড়া বোনার জন্য যে ডালটা সে নিয়েছিল সেটা হাত থেকে পড়ে গেল পড়ে পাকিয়ে তারপর সিঁধে হয়ে গেল। 'এতদিন যে দেখাই নেই? চল, ঘরে চল দেখবে, তোমার শাশুড়ী কী খুশিই না হয়

'বাবা, আমি এসেছি ' নাতালিয়া অনিশ্চিত ভাবে হাত বাড়িয়ে দিয়ে মুখটা ঘুরিয়ে নিল। 'আমাকে যদি আড়িয়ে না দেন তাহলে চিরকাল আপনার মের কাছেই থাকব '

'কী বললে মা? এ আবার একটা কথা হল তুমি কি আমাদের পর? এই

দেখ না, ত্রিগোণি চিঠিতে লিখেছে ও লিখেছে আমরা যেন তোমার খবর নিই।’

ওরা দু’জনে ঘরের দিকে চলল পাড়োলেই প্রকোফিরেভিচ বৃশিতে ডগমগ ও উত্তেজিত হয়ে, খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলল

নাভালিয়াকে জড়িয়ে ধরল ইলিনিচনা ইলিনিচনার গাল বয়ে ঘন ঘন গড়িয়ে পড়তে লাগল অশ্রুধারা। বৃকের সামনের কাপড়টায় নাক ঝেড়ে সে ফিসফিস করে বলল, ‘একটা বাচ্চাটাচ্চা হলে হাত তাহলে ও ঠিক আটকা পড়ে যেত। বোসো বোসো কিছু সরা পিঠে আছে, বার করে দিই?’

‘ভগবান আপনাদের মজল করুন মা। আমি আমি এসেছি’

দুনিয়াশকা ভোবের বাঙা আলোর মতো আগাগোড়া বলমল করেছে। খবর পেয়ে সে পেছনের উঠোন থেকে ছুটে এলো রান্নাঘরে ছুটে ছুটেই বাঁশিয়ে জড়িয়ে ধরল নাভালিয়ার হাঁটু

‘লজ্জা করে না তোমার। আমাদের কথা ভুলেই গেছ।’

‘আরে বেশে গেলি নাকি রে!’ বাপ ধমকানোর ভান করে মেয়ের ওপর চিৎকার করে উঠল।

‘ওঃ কী বড়ই না হয়ে গেছিস!’ দুনিয়াশকার বাবুবছন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে করতে তার মুকের দিকে তাকিয়ে নাভালিয়া বলল

সবাই একসঙ্গে হুড়োহুড়ি করে কথা বলতে শুরু ফরল, তারপর হঠাৎ একসময় চুপ করে গেল। ইলিনিচনা গালে হাত ঠেকিয়ে বিষাদভরে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল নাভালিয়াকে নাভালিয়া যে আর আগের নাভালিয়া নেই এই দেখে তার বড় কষ্ট হল

‘আমাদের কাছে একেবারে চলে এলে ত?’ নাভালিয়ার হাতদুটো ঘষতে ঘষতে দুনিয়াশকা জিজ্ঞাস করল

‘কে জানে

‘এ আবার বলার কী আছে? বেটার বৌ বলে কথা কোথায় আর থাকবে? আমাদের সঙ্গেই থাক,’ টেবিলের ওপর সরা পিঠে ভর্তি বাটিটা ছেলের বৌয়ের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে ইলিনিচনা তার হির সিদ্ধান্ত প্রকাশ করল।

অনেক ইতস্তত করার পর নাভালিয়া স্বশূরবাড়ি এসেছে বাপ তাকে ছাড়তে চায় নি। তাকে নিবৃত্ত করতে গিয়ে গালমন্দ করেছে, চোটপাটও করেছে তার ওপর কিন্তু সুস্থ হয়ে ওঠার পর নিজের বাড়ির লোকজনের মুখের দিকে তাকাতো ও তার কেমন যেন বাধো বাধো ঠেকতে লাগল, যে পরিবার কোন এক কালে তার নিজের বলে মনে হত সেখানে নিজেকে তার প্রার পর পর মনে হতে লাগল আত্মহত্যার চেষ্টা করার ফলে সে যেন তার আত্মীয়-স্বজন থেকে



দূরে সরে গেছে গ্রিগোরিকে ফৌজে পৌছে দিয়ে আসার পর থেকে পাশ্বেলেই প্রকোফিয়েভিচ বারবার তার মন গলানোর চেষ্টা করছিল সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছিল ছেলের বৌকে ঘরে নিয়ে এসে গ্রিগোরির সঙ্গে তার মিটমিট কবিয়ে দেবে

সেই দিন থেকে মেলেখভদের বাড়িতেই রয়ে গেল নাতালিয়া। দারিয়া বিরক্তির কোন লক্ষণ প্রকাশ করল না। পেত্রো বাড়ির একজন লোকের মতোই তার সঙ্গে মিষ্টি ব্যবহার করতে লাগল দারিয়া কখন সখন বাঁকা দৃষ্টি হানলেও নাতালিয়ার প্রতি দুনিয়াশ্কার প্রবল অনুরাগে আর বুড়োবুড়ির অপত্যস্নেহে তা পুষিয়ে যেত

নাতালিয়া শ্বশুরবাড়ি আসার পরদিনই পাশ্বেলেই প্রকোফিয়েভিচ মুখে মুখে বলে দুনিয়াশ্কারকে নিয়ে একটা চিঠি লেখাল গ্রিগোরির কাছে

‘পরম কল্যাণীয় শ্রীমান গ্রিগোবি পাশ্বেলেয়েভিচ চিরজীবন,

পত্রে আমার এবং তোমার মাতাঠাকুরানী ভাসিলিসা ইলিনিচ-নার আমাদের উভয়ের অন্তরের পরম স্নেহ-ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানিবে তোমার বাবা শিওতর পাশ্বেলেয়েভিচ ও তাহার স্ত্রী দারিয়া মাতভেয়েভনা তোমাকে শুভেচ্ছা জানাইতেছে, তোমার শারীরিক কুশল ও সাফল্য কামনা করিতেছে তোমার ভগিনী ইয়েভদোকেইয়া\* এবং বাড়ির আর আর সকলে তোমাকে আন্তরিক ভালোবাসা জানাইতেছে। ফেব্রুয়ারীর পাঁচ তারিখে লেখা তোমার চিঠি আমরা পাইয়াছি, তাহার জন্য তোমাকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

তুমি লিখিয়াছ চলিতে গিয়া ঘোড়াটির সামনের পা পিছনের পায়ের সহিত বাঁজিয়া যায় তেমন দেখিলে উহার সামনের পায়ে খুরের উপরকার অংশে চর্বি মাশিশ করিবে কেমন করিয়া করিতে হয় তাহা তুমি জান। পথঘাট যতক্ষণ শক্ত ববকে ঢাক্তা না পড়ে কিংবা পিছল না হয় ততক্ষণ উহার পিছনের খুরে নাল লাগাইবে না তোমার স্ত্রী নাতালিয়া মিরোনভনা আমাদের কাছেই আছে, কুশলে ও নিরাপদে আছে

তোমার মাতাঠাকুরানী তোমার জন্য কিছু শুকানো চেরী একজোড়া পশমী মোজা নানাবিধ মিষ্টদ্রব্য পাঠাইতেছেন তোমার অবগতির জন্য জানাই, আমরা সকলে সুস্থদেহে, কুশলে আছি, তবে দারিয়ার সন্তানটি মারা গিয়েছে। কয়েকদিন আগে আমি আর

\* দুনিয়াশ্কা, দুনিয়াশা বা দুনিয়ার ভালো নাম - অনুঃ

পেত্রো মিলিয়া গোলাঘরের চালাটি ছাইযাছি পেত্রো তোমাকে ঘোড়াটির পরিচর্যা ও বক্ষণাবেক্ষণ করিতে বলিয়াছে। গেম্বুগুলির বাছুর হইয়াছে আমাদের পুরানো মাদী ঘোড়াটি গর্ভবতী হইয়াছে, বাঁট শক্ত হইয়া উঠিয়াছে, লক্ষ করিলে দেখা যায় ছানাটি তাহার পেটের ভিতরে লাথি মারিতেছে জেলা সদরের ঘোড়াশাল হইতে দনেৎস নামক একটি তেজী ঘোড়া আনাইয়া উহাকে পাল ধরানো হইয়াছিল লেন্ট পরবের\* পঞ্চম সপ্তাহে প্রসব করিবে বলিয়া আশা করি তোমার কাজকর্মের জন্য উপরওয়ালাকে তুমি যে প্রসন্ন করিতে পারিয়াছ ইহা জানিয়া আমরা আনন্দিত। সঠিক ভাবে তোমার কর্তব্য পালন করিও মহামান্য জারকে সেবা করা কখনও বিফলে যায় না। নাতালিয়া কিন্তু এখন হইতে আমাদের সহিতই থাকিবে, তাহি এ ব্যাপারে তোমাকে ভাবিয়া দেখিতে বলি। আরও একটি দুঃসংবাদ জানাই - পিঠা পার্বেণের সম্মুখ নেকড়েতে আমাদের তিনটি ভেড়া মারিয়া ফেলিয়াছে যাহাই হউক, কুশলে থাকিও, ইশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, স্ত্রীকে ভালিও না তোমার প্রতি ইহাই আমার আদেশ সে বড়ই স্নেহশীল। বিধিমতে তোমার সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছে। বাপের কথা শুনিয়া সোজা পথে চলিবার চেষ্টা করিও

ইতি

তোমার জন্মদাতা পিতা,

মিনিয়র সার্জেন্ট

পান্তেলেই মেলেখভ

বুশ-অষ্ট্রিয়া সীমান্ত থেকে ক্রোশ দেড়েক দূরে বাদজিভিল্লোভো নামে একটা ছোট শহরে ঘাঁটি গেড়েছিল গ্রিগোরিদের রেজিমেন্ট, গ্রিগোরি বাড়িতে কালেভদ্রে চিঠি লিখত নাতালিয়া যে তাদের বাড়িতে বাবার কাছে এসে উঠেছে এই সংবাদ পেয়ে সে সংযত ভাষায় জবাবে নাতালিয়াকে তার শূভেচ্ছা জানানোর কথা লেখে। তার সমস্ত চিঠিরই বিষয়বস্তু সচরাচর হত ভাসা-ভাসা আর আসল কথা এড়িয়ে যাওয়া গোছের পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ তাই তার চিঠি পেয়ে দুনিয়াশকা

\* দিস্টারের অব্যবহিত পূর্ববর্তী ছয় সপ্তাহব্যাপী ব্রিটিশ পরবিশেষ এই সময়ে খানসাহেবে সংঘমব্রত পালনীয়। অনূঃ

বা পেট্রোকে দিয়ে বার কয়েক করে পড়িয়ে নিত, চিঠির প্রতিটি ছত্রের মধ্যে গ্রিগোরির কী রহস্যময় ভাবনা গোপন থাকতে পারে তাই নিয়ে গভীর ভাবে ভাবত। সিস্টারের ঠিক আগে লেখা চিঠিটায় পাণ্ডুলেই প্রকোফিয়েভিচ সরাসরি জানতে চেয়েছিল পল্টনের কাজ থেকে ফিরে আসার পর গ্রিগোরি নাভালিয়ার সঙ্গে ঘর করবে কিনা, নাকি আগের মতোই অক্সিনিরাকে নিয়ে থাকবে।

গ্রিগোরি উত্তর দিতে একটু দেরি করল। ট্রিনিটি পুরবের পর তার কাছ থেকে একটা সংক্ষিপ্ত চিঠি পাওয়া গেল। দুনিয়ানকা প্রতিটি শব্দের শেষে টোক গিলতে গিলতে দ্রুত চিঠিটা পড়ে গেল। তার ফলে চিঠির ভেতরকার অসংখ্য প্রশ্নাম ও এটা ওটা নানা প্রশ্নকে বাদসাদ দিয়ে তার অন্তর্নিহিত অর্থ উদ্ধার করতে পাণ্ডুলেই প্রকোফিয়েভিচ হিমসিম খেতে লাগল। চিঠির শেষে নাভালিয়ার প্রশ্ন উল্লেখ করে গ্রিগোরি লিখেছে

‘আপনি জানিতে চাহিয়াছেন নাভালিয়ার সহিত আমি ঘর করিব কিনা। কিন্তু আমি আপনাকে বলি কি, বাবা, ব্রুটি কাটিয়া টুকরা করিলে তাহা কি আর জোড়া লাগানো যায়? আপনি নিজেই জানেন আমার একটি সম্ভান আছে, সে অবস্থায় নাভালিয়াকে এখন আমি কী বলিতে পারি? আমি কোন কথাই দিতে পারি না, এ সম্পর্কে কোন কথা বলাই এখন আমার পক্ষে সীড়ামায়ক। কয়েক দিন আগে সীমাস্ত্রে এক চোরচালানকারী ধরা পড়ে লোকটাকে দেখিবার সুযোগ আমাদের ঘটে। কথায় কথায় সে জানাইল যে শীঘ্রই অস্ত্রিয়ার সহিত আমাদের যুদ্ধ হইবে। কোন্ জায়গা হইতে যুদ্ধ শুরু হইবে এবং কোন কোন জায়গা তাহার দখল করিবে তাহা দেখিবার জন্য তাহাদের জ্বর নাকি সীমাস্ত্রে আসিয়াছিলেন। যুদ্ধ বাধিয়া গেলে আমি হয়ত বাঁচিয়া নাও থাকিতে পারি, অতএব আগে হইতে কোন কিছু স্থির করা সম্ভব নহে।’

• • •

নিজের অজ্ঞাতে স্বামীব প্রত্যাবর্তনের আশায় আশায় বুক বেঁধে, ভয়ঙ্করদয়কে ঠেকা দিয়ে নাভালিয়া তার স্বপ্নব্যাড়িতে বাস করে, ঘরসংসার দেখাশোনা করে। গ্রিগোরিকে সে কোন চিঠি লেখে না, কিন্তু পরিবারে এমন আর একটি লোকও নেই যে তার মরে বেদনা আর ব্যাকুলতা নিয়ে গ্রিগোরির চিঠির প্রতীকায় থাকে

গ্রামের জীবনধারা বয়ে চলে তার চিরাচরিত অলঙ্ঘ্য নিয়মে। পল্টনে যে সমস্ত কসাকের কাজের মেয়াদ শেষ হয়েছে তারা বাড়ি ফিরে আসে। ধরাবীধা কাজের দিনগুলো দেখতে না দেখতে কোথা দিয়ে কাজের মধ্য দিয়ে কেটে যায় রোববার রোববার সবাই পরিবারসুদ্ধ দঙ্গল বেঁধে গির্জায় যায় - কসাকরা চলেছে উমি ঐটে ছুটির দিনের পোশাকী সালোয়ার পরে, মেয়েদের গায়ে কুঁচি মেওয়া ফোলানো হাতার বঙ্কিন জামা শক্ত করে কোমরে গৌজা বিচিত্রবর্ণের লম্বা বুল ষাধরার গ্রাস্ত খস খস শব্দে ধুলোয় লুটোতে লুটোতে তারা পথ চলছে কাঁঝাল মিটি মেয়েলি ঘামে তাদের জামার বগলের নীচে রঙ ছলে গেছে, ঘামের গন্ধ সরবের কাঁকের মতো নাকে এসে লাগছে, নাক সুড়সুড় করতে থাকে

বারোয়ারিতলার চারকোনা চত্বরটাতে আকাশেব দিকে জোয়াল তুলে খালি গাড়িগুলো পড়ে থাকে, ঘোড়াগুলো টিহি টিহি ডাকে, ব্যস্তসমস্ত হয়ে চলাফেরা করে নানা জাতের লোক দমকলের চাপাটির কাছে বুলগেরীয় সবজিওয়ালারা লম্বা লম্বা মাদুরের ওপর তাদের শাকসবজি সাজিয়ে রেখেছে বিক্রি করার জন্য। তাদের পেছনে একদল ছেলেপুলে এসে জুটেছে, হাঁ করে তাকিয়ে দেখছে কতকগুলো ছাড়া উট টুপির লাল ফিতে আর মেয়েদের মাথার বিচিত্র বর্ণের যুর্মালের সমাহারে উদ্বেলিত জনসমাগম আর বাজারের চত্বরটা ভাবিক্তি চালে নিরীক্ষণ করেছে উটগুলো। জল তোলার কলে নিত্যকার ঢাকা ঠেলার কাজ সেয়ে এখন তারা বিশ্রাম করতে করতে মুখের ফেনা তুলে জাবর কাটছে, দেখতে দেখতে নিদ্রার সবুজাত রাং ঝালাই পড়ে তাদের দুষ্টি স্থির হয়ে আসতে লাগল

সন্ধ্যাবেলায় দুমদাম পায়ের শব্দে আর্ডেনাদ করতে থাকে রাস্তাঘাট অ্যাকর্ডিয়ান সঙ্গতের তালে তালে ছিটকে ওঠে নাচ আর গানের প্রবল উজ্জ্বাস। কেবল গভীর রাত্রে গ্রামের শেষপ্রান্তে ঈষদুষ্ট শূঙ্খ বাতাসের মধ্যে থিকিথিকি করে ছলতে ছলতে নিঃশেষে মিলিয়ে বার শেষ গানের রেশ

নাভালিয়া এই সব সাহা আড্ডায় যায় না, খুশিমনে দুনিয়াশকার মুখে সাদামাঠা গল্প শোনে দুনিয়াশ্কা সবার অলঙ্ঘ্য এক ছিমছাম সুন্দর গড়নের মেয়ে হয়ে উঠেছে, তার একটা নিজস্ব সৌন্দর্য আছে। বয়সের তুলনায় একটু আগেই যেন বেড়ে উঠেছে, অনেকটা অকালে-শাকা আপেলের মতো। এই কিছুদিন আগেও যে সে কিশোরী ছিল, তার চেয়ে বয়সে বড় বাজবীরা সে-কথা তুলে গিয়ে এই বছর তাকে নিজেদের মহলে গ্রহণ করেছে। দুনিয়াশকা হয়েছে বাপের বেটী সেই রকমই খাটো আর শক্তসমর্থ গড়নের, গোড়া গায়ের রঙ

পনেরোয় পা দিয়েছে সে, কিন্তু তার লাজুক-লাজুক তব্বী চেহারা এখনও গোলাগাল হয়ে ওঠে নি আর মধো যেন কৈশোর আর উদ্ভিন্ন যৌবনের

বয়সসন্ধিকালের এক কবুণা ও সরলতার মিশ্রণ ঘটেছে মুঠির আকারের ছোট ছোট স্তনদুটো পুষ্ট হয়ে জামার ভেতর থেকে যে ভাবে ঠেলে উঠেছে তা চোখে পড়ার মতো, কাঁধদুটো ভারী হয়ে উঠেছে কিন্তু তার টানাটানা, টেরা ছাঁদের দু'চোখের নীলাভ পটলচেরা সামান্য অংশের মধ্যে এখনও স্থলস্থল করে লজ্জা আর দুইমিডরা কালো দুটি তারা সজ্জার পর বাইরে থেকে ঘুরে এসে সে সরলমনে নাতালিয়াকে একান্ত তার গোপন কথাগুলো বলে।

‘বৌদি গো একটা কথা বলতে চাই তোমাকে

‘বেশ ত, বল না।’

‘কাল না মিশকা কলোভয় সারাটা সঙ্গে দোকানের কাছে গাছের গুঁড়ির ওপব আমার পাশে বসে ছিল।’

ওকি অমন লাল হয়ে উঠলি কেন রে?’

‘মোটাই না।’

‘আয়নায় দ্যাখ গিয়ে মুখখানা একেবারে আগুন-রাঙা হয়ে উঠেছে।

‘দাঁড়াও, দাঁড়াও। আরে তুমিই ত আমাকে লজ্জা পাইয়ে দিলে।’

‘আচ্ছা বলে যা, আমি আব কিছু বলব না তোকে।’

তেতে-ওঠা গালদুটো হাতের তামাটে চোটোয় ঘষল দুনিয়াশকা হাতের আঙুল দিয়ে দু'পাশের রং টিপে ধরল, অকারণ পুলকে ঝিলঝিল করে বেজে উঠল তার কচি গলার হাসি

‘আমাকে বলে কি, তুমি হলে ছোট একটা মল্লিকা

‘তারপর, তারপর?’ নিজের পতিত ও পদদলিত সুখের কথা ভুলে গিয়ে অনেক সুখে সুখী হয়ে উৎসাহ দেয় নাতালিয়া।

‘আমি ওকে বললাম, ‘মিছে কথা বলো না মিশকা’ ও কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দিবা গালল।’ দুনিয়াশকা মাথা নাড়তে নাড়তে ঘরঘর খঞ্জনিব সুরেব মতো হাসি ছড়িয়ে দিল শব্দ করে বাঁধা কালো চুলের বিনুনিগুলো সাপের মতো কিলঝিল করতে লাগল তার পিঠে আর ঘাড়ে

‘আরও কী বলল তোকে?’

‘বলল, তোমার একটা চিহ্ন কাছে রাখতে চাই বুঝলটা নাও না।’

‘দিলি?’

‘নাঃ বললাম, ‘দেব না যাও না তোমার সঙ্গে যাব অত পিরীত তার কাছ থেকে চেয়ে নাও।’ ইয়েরোকেয়েভের ছেলের বৌয়ের সঙ্গে ওর স্বামী কিনা পল্টনের কাজে বাইরে আছে, এখন তাই ফুটি করে বেড়াচ্ছে।’

‘ওই ছেলের কাছ থেকে তুই দূরে দূরে থাকিস কিন্তু।’

‘আমি অমনিতেই দূরে আছি’ দুনিয়াশকার মুখে আরেকটু হলেই যে হাসিটা ফুটে উঠছিল অতি কষ্টে সেটাকে চাপা দিয়ে সে গল্প করে যায়, সন্দের সময় হৈ-হুল্লার পর আমরা বাড়ি ফিরে আসছি আমরা তিনটি ঘোরে এমন সময় খাতাশ বড়ো মিথৈই আমাদের থাওয়া করল, চোলাচেন্নি করতে লাগল বলে কি, ‘ওগো আমার মিটি ঘেরেরা চুমু খাও, আমি তোমাদের দুটো করে কোপেক দেব’ আমাদের ওপর হামলা করে আর কি, ঠিক সেই সময় নুরকা একটা গাছের ডাল দিয়ে কপালের মাঝখানটায় বসিয়ে দিল এক ঘা। আমরা ছুটে পালিয়ে এলাম।’

প্রথম গ্রীষ্ম খিকিখিকি জ্বলছে চারিধার গ্রামের সামনে দনের বৃকে চড়া পড়ে আসতে লাগল আগে যেখানে খরশ্রোত ছিল, শ্রোত ছিল দ্রুত আর দূরন্ত, এখন সেখানে হুটুজ্বল পিঠ না ভিজিয়ে অক্লেশে পার হয়ে যায় গোলুবাছুর রাতের বেলায় টিলার মাথা থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে গ্রামের বৃকে নেমে আসে একটা তবল গুমেটি ভাব বাতাস ভারী হয়ে ওঠে পোড়া ঘাসেব কটু গন্ধে কাঠ কাটার জন্য আলাবা করে রাখা জঙ্গলের এক অংশে শুকনো কাঠকুটো জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাইতে দনের তটতুমির ওপর অদৃশ্য চানরের মতো খুলতে থাকে মিটি গন্ধ ছড়ানো মরীচিকা। রাতে দনের ওপাবে ঘন হয়ে জঙ্গতে থাকে কালো মেঘ, অসার গুরু গুরু গর্জনে বাজ ফেটে পড়ে, কিন্তু স্বরতপ্ত ধরনীর জ্বালা মেটাতে এক ফেটিঙ বৃষ্টি ঝরে পড়ে না কোনোচে কোনোচে নীল টুকরোয় আকাশ ফালা ফালা করে দিয়ে শূন্যগর্ভ বিদ্যুৎ চমকায়।

রোজ রাতে গির্জার ঘণ্টামিনারের মাথার ওপর বসে একটা পৈঁচা তারস্বরে ডাকে। তার সেই কাঁপা কাঁপা ভয়ঙ্কর টিংকার গ্রামের বৃকে ছড়িয়ে পড়ে, ঘণ্টামিনার থেকে সে উড়ে গিয়ে বসে ছাড়া বাছুরগুলোর খুরের দাঁপাদাঁপিতে লম্বডল কবরবানার ওপর ঘাস-গজানো কবরগুলোর বাদামি টিবির মাথার ওপর কাতর ডাক ছাড়ে

কবরখানা থেকে পৈঁচার ডাক শুনে বড়েরা ভবিষ্যদ্বাণী করে

‘লক্ষণ খারাপ’

‘বৃদ্ধ আসছে।’

‘ভূকী যুদ্ধের আগে আগেও এমনি ডাক শোনা গিয়েছিল

‘আবার ওলাউঠা মহামারী নয় ত?’

‘ভালো কিছু আশা কোরো না হে গির্জা থেকে উড়ে গেল কিনা সোজা মড়াদের কাছে’

‘হে পরিত্রাতা সাধু নিকোলা নয়্য কর’

নুলো আলেক্সেইয়ের ডাই, শুমিলিনদের বাড়ির মার্ভিন দু'রাত ধরে কবরখানার পাঁচিলের কাছে কাছে অপয়া পাখিটার ওপর নজর রাখল। কিন্তু গ্রহসাজনক পেঁচাটা অদৃশ্য থেকে নিঃশব্দে তার মাথার ওপর মিয়ে উড়ে গিয়ে কবরখানার আরেক প্রান্তের একটা ক্রসের ওপর বসে নিদ্রাচ্ছর গ্রামের ওপর তার ভীতিকর চিৎকার ছড়িয়ে যেতে লাগল। এক খণ্ড মেঘ উড়ে যেতে দেখে মার্ভিন যা নয় তাই বলে মুখ খারাপ করতে করতে সেটার কুলন্ত কালো পেট লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ে সেখান থেকে প্রস্থান করল। মার্ভিনের বাড়ি ওই কবরখানারই কাছে পিঠে। মার্ভিনের বৌ - একটু ভীতু ধরনের, কুণ্ণ মেয়েমানুষ, যদিচ থরগোসের মতোই বংশবৃদ্ধিকারিণী - বছর বছর বাচ্চা বিয়োয় - স্বামীকে বকাবকি করতে থাকে।

'গাধা, একটা আস্ত গাধা তুমি ও তোমার কোন পাকা ধানে মই দিয়েছে, হতচ্ছাড়া? ভগবান যদি আমাদের শাস্তি দেন এর জন্যে? এই আমার শেষ মাস চলছে, এখন সেব দেখি ডেকরা মিনসে, তোমার এই অলঙ্করণে কাণ্ডের জন্যে যদি আমি ঠিকমতো বিয়োতে না পারি?'

'চোপ্ রও! বিয়োবি ঠিকই পাগলা ঘোড়ার মতো অমন ক্ষেপে উঠলে কেন? হুরামজাদাটা তাই বলে এখানে বসে বসে হা-হুতাশ করতে থাকবে নাকি? আমাদের সর্বনাশ ডেকে আনবে। লড়াই যদি বাধে তাহলে পলটনে আমার ডাক পড়বে, এদিকে তুমি ত একগাদা আশাবাচ্চা বিইয়ে বসে আছ।' বলতে বলতে হাত বাড়িয়ে মার্ভিন ঘরের কোনটা দেখিয়ে দিল। সেখানে একটা পাটির ওপর গাদা ঘেরে পড়ে ঘুমোচ্ছিল এক পাল ছেলেমেয়ে, তাদের নাকের ভোসভোস ডাকের সঙ্গে এসে মিশছিল ইঁদুরের কিচকিচ আওয়াজ।

ময়দানে গ্রামের বুড়োদের সঙ্গে আলোচনার সময় পাঙ্কোলেই মেলেবড গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎপ্রমাণ দিয়ে বলে

'আমাদের শ্রিগোত্রি লিখে যে অস্ত্রিয়ান জার সীমান্তে এসেছিল, তার সব কৌজকে এক জায়গায় জড় হয়ে মস্কো আর সেন্ট পিটার্সবুর্গের দিকে এগোবার কুকুম দিয়েছে।'

অতীতের নানা যুদ্ধের কথা মনে করে বুড়োরা নিজেদের মধ্যে নানা রকম জল্পনা-কল্পনা করতে থাকে

'যুদ্ধটুকু হবে না, ফসল দেখেই বোঝা যায়।'

'ফসলের সঙ্গে যুদ্ধের কী যোগ আছে?'

'ছাত্তরবা বত গোলমাল পাকাচ্ছে মনে হয়।'

'স্বরটা আমরা জানতে পারব সকল পরে।'

'জাপানের সঙ্গে লড়াইয়ের বেলায় যেমন হয়েছিল।'

‘ছেলেকে ঘোড়া কিনে দিয়েছ ত ?’

‘অত তাড়া কিসের ?’

‘যতসব আজীবনে কথা ।’

‘কার সঙ্গে লড়াইটা হবে ?’

‘কার সঙ্গে আবার ? সাগরপারের তুর্কীদের সঙ্গে । সমুদ্রের কিছুতেই ভাগাভাগি করা যায় না যে ।’

‘এ আর এমন একটা কি শক্ত কাজ ? আমরা যেমন জমি ভাগাভাগি করি তেমনি আল দিয়ে ভাগাভাগি করে নিলেই ত ল্যাঠা চুকে যায় ।’

কথারার্ভা শেষকালে হাসিঠাট্টার পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ায় বুড়োরা যে যার কাজে চলে যায় ।

বেশ কিছু জরুরী কাজ পড়ে আছে দনের ওপারের দুর্বাঘাসের জমি ভাগাভাগি পেকে শুকিয়ে যাচ্ছিল বলে আশু কাটার দরকার হয়ে পড়ল ওবানকার ঘাস স্তপের ঘাসের মতো নয়, রোগা রোগা, গন্ধহীন । একই মাটি, কিন্তু ঘাস রস পায় আলাদা আলাদা । টিলার ওপারে স্তপের জমি কালো, বাঁই পোড়া - ঘোড়ার পাল চলে গেলেও তার বৃকে খুরের দাগ বসে না । শক্ত জমি, তাই তার ওপর যে ঘাস গজায় তাও সতেজ, গন্ধবহু, ঘোড়ার বৃক পর্যন্ত উঁচু । কিন্তু দনের কাছেও এবং ওপারের জমি ভিজে সৈতসৈতে, আলগা আলগা, তাই সেখানে ঘাস গজায় নিস্তেজ নিরানন্দ, সে ঘাস কারও কোন কাজে লাগে না, কোন কোন বছর গোবুবাছুর পর্যন্ত কিরেও তাকায় না তার দিকে ।

গ্রামের সর্বত্র কান্তে শানানো হচ্ছে, মাঠ থেকে ঘাস জড় করার জন্য বিদা বানানো ও মেরামতের কাজ চলছে, মেয়েরা সব ঘেসড়ের আঙ্গামের জন্য কুন্ডাস তৈরির আয়োজন করছে, এই সময় এমন একটা ঘটনা ঘটল যাতে গ্রামের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত সকলে চমকে উঠল । একজন তদন্তকারী ইনস্পেক্টর এবং কালো দাঁতওয়ালা লাগাবেগে চেহারার এক অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে এসে হাজির হল ধানার দারোগা ওই অফিসারটির গায়ে যে উর্দি ছিল তেমন উর্দি এ গ্রামের কেউ কোনদিন চোখে দেখে নি তারা এসেই মোড়লকে ডেকে পাঠাল, ডেকে ডেকে সাক্ষীসাবুদ জড় করল, তারপর সোজা চলল টাঙ্গা লুকেশ্কার বাড়ির দিকে

তদন্তকারী পুলিশ ইনস্পেক্টরটি তার পদযথাচারিত্র লাগানো ক্যাবিসের টুপিটা হাতে বয়ে নিয়ে চলল দলটি রাস্তার বাঁ পাশের বেড়ার ধার ধরে হাঁটতে লাগল মোড়ল মোরগের মতো গটিগটি করে আগে আগে চলল । বেড়ার ফাঁক ফাঁক বুনুনির ভেতর দিয়ে রাস্তার জায়গায় জায়গায় বিন্দু বিন্দু সূর্যের আলো এসে



পড়েছে, ইন্সপেক্টর তার ধূলিধূসরিত বুট দিয়ে সেগুলো মাড়িয়ে যেতে যেতে মোড়লকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগল

‘সেই যে স্টকমান আপনাদের এখানে এসেছিল সে কি বাড়িতে আছে?’

‘হ্যাঁ হুজুর।’

‘কী কাজ করে সে?’

‘মিস্ত্রির কাজ করে বলেই ত জানি সব সময় এটা ওটা করাত দিয়ে কাটছে, চাঁচাছোলা করছে।’

‘তার সম্পর্কে সন্দেহ করার মতো কিছু নজবে পড়েছে কি?’

‘না হুজুর।’

থানার দারোগা চলতে চলতে দুই ভুবুৰ মাথাখানের ফুসকুড়ি গালল। বনাড়ের উদীর ভেতরে গলদঘর্ম হয়ে সে হাঁসফাঁস কবছিল। লাগবেগে ছোটখাটো চেহারার কালোদাঁতওয়ালা অফিসারটি বড়কে দিয়ে দাঁত খোঁচাতে খোঁচাতে চোখে চারপাশের তুলতুলে লাল ভাঁজগুলো কৌচকাল

‘ওর এখানে কার কার যাতায়াত আছে?’ মোড়ল তড়বড় কবে আগে আগে চলে যাচ্ছে দেখে হাত দিয়ে তাকে আটকে প্রশ্ন করল তদন্তকারী ইন্সপেক্টর

‘কিছু লোকের যাতায়াত আছে ঠিকই কখন-সখন তাস খেলে।’

‘তারা কারা?’

‘বেশির ভাগই আটকাল থেকে। মজুর।’

‘ঠিক কারা কারা?’

‘মেশিনের লোক, কয়াল, মিলমজুর দাভিদকা, এ ছাড়া আমাদের কসাকদেরও কেউ কেউ যায়।’

অফিসার পেছনে পড়ে গিয়েছিল তদন্তকারী ইন্সপেক্টর থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। টুপি দিয়ে নাকের খাঁজের ঘাম মুছল। অফিসার কাছে আসতে তার উদীর একটা বোতাম আঙুলে পাকাতো পাকাতো তাকে কী যেন বলল, তারপর ইশাবায় মোড়লকে কাছে ডাকল। মোড়ল জুতোর ডগার ওপর ভর দিয়ে উর্ধ্বাশ্বাসে ছুটে এলো তার ঘাড়ের ওপর শিরায় জড়ানো গাটি ফুলে উঠে কাঁপতে লাগল

তোমরা দু’জন পেয়াদাকে নিয়ে গিয়ে ওদের থেংথার করে ফেল ধরে কাছারিতে নিয়ে এসো। আমরা এন্ফনি আসছি বুকেছ?’

মোড়ল সিঁধে হয়ে দাঁড়াতে গিয়ে তার শরীরের উর্ধ্বাংশটা এমন ভাবে সামনের দিকে ঝুলিয়ে দিল যে তার ঘাড়ের সবচেয়ে মোটা শিরটি একটা নীল

মোটা দড়ির মতো উর্দির খাড়া কলারের গায়ে লেগে রইল। মুখ দিয়ে একটা অশ্রুট আওয়াছ করে সে তুরন্ত উলটো দিকে পা বাড়াল।

ভেতরে পরার একটা বোতামখোলা জামা গায়ে দরজার দিকে পিছন ঘিরে স্টকমান গেটের সামনে বসে একটা হাত-করাত দিয়ে প্লাইউড ফেটে একটা নম্রা বানাচ্ছিল।

‘কষ্ট কবে একটু উঠে দাঁড়ান। আপনাকে স্নেপ্তার করা হল।’

‘কী ব্যাপার?’

‘আপনি দুটো কামবা নিয়ে থাকেন?’

‘হ্যাঁ’

‘আমরা আপনার এখানে খানাতল্লাসি চালাব।’ জুতোয় কাঁটা দরজার সামনে পাপোবের সঙ্গে বেধে যেতে একটু হৌচটমতন খেয়ে অফিসার ছোট টেবিলটার দিকে এগিয়ে গেল। প্রথমেই যে বইটা চোখে পড়ল, তুর কুঁচকে সেটা তুলে নিল।

‘এই ট্রাক্টার চাবি চাই।’

‘কিসের জন্য আমি আপনার কাছে বাধিত, জানতে পাবি কি ইন্সপেক্টর মশাই?’

‘আপনার সঙ্গে কথা বলার আরও সময় পাব আমরা। এই যে কোথায় গেল, খানাতল্লাসের সাক্ষী।’

অন্য ঘর থেকে স্টকমানের বৌ উঁকি মেয়ে দরজাটা ফাঁক রেখেই সরে গেল। তদন্তকারী ইন্সপেক্টর এবং তার পেছন পেছন কেবরানিও সেখানে গিয়ে ঢুকল।

এটা কী?’ হলদে মলাটেব বইখানা হাতে নিয়ে সামনের দিকে বাড়িয়ে ধবে শান্ত গলায় অফিসার ডিক্লেস করল।

‘বই।’ স্টকমান কিছু না বোঝার ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল।

‘ওসব রসিকতার আরও ঢের জায়গা পাবে, আপাতত ওগুলো তুলে বাখ। আমি তোমার কাছ থেকে আমার প্রশ্নের অন্য রকম উত্তর চাইছি।’

স্টকমান মুখের বাঁকা হাসি চেপে উনুনের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। দারোগা অফিসারের কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি মেয়ে স্টকমানের দিকে চোখ ফেরাল।

‘চটা করেন বুঝি?’

এ বিষয়ে একটু আধটু আগ্রহ আছে আমার,’ একটা ছোট চিবুনী দিয়ে কালো দাড়ি সমান দু’পাট করে আঁচড়ে শুকনো গলায় স্টকমান জবাব দিল।

‘আ-চ-ছা।’

কয়েকটা পৃষ্ঠা উলটে পালটে অফিসার বইটা ছুঁতে ফেলে দিল টেবিলের ওপর। ঝটপট দ্বিতীয় আরেকখানার ওপর চোখ বুন্নিয়ে নিল সেটা একপাশে।

সরিয়ে রেবে তৃতীয় আরেকখানার মলাটের লেখাটা পড়ে স্টকমানের দিকে ঘুরে দাঁড়াল

‘তোমার এ ধরনের সব বইপুঁথি আর কোথায় আছে?’

স্টকমান বাঁ চোখ কৌচকাল, মনে হল যেন সে লক্ষ্যসন্ধান করছে।

‘যা যা থাকার সবই এখানে আছে’

‘মিছে কথা!’ বইটা নাচাতে নাচাতে অফিসার সাফ বলল

‘আমি চাই

‘তল্লাশি করুন’

তলোয়ারখানা আঁকড়ে ধরে দারোগা ভোরঙটার দিকে এগিয়ে গেল। মুখে বসন্তের দাগওয়ালা কসাক পেয়াদাটি ভোরঙের ভেতরে পোশাক পরিচ্ছদ ও অন্যান্য কাপড়চোপড় ঘাঁটাঘাঁটি শূন্য করে দিয়েছিল। বোঝাই যচ্ছিল এহেন পরিস্থিতিতে সে ভীত সম্ভ্রম করে পড়েছে।

‘আমি চাই ভদ্র ব্যবহার,’ কৌচকান চোখ দিয়ে অফিসারের নাকের খাঁজটা তাক করে স্টকমান তার বক্তব্য শেষ করল

‘চুপ করুন!’

বাকি যে অর্ধেকটাতে স্টকমান আর তার স্ত্রী থাকত সেখানে যা যা ওলটপালট করে দেখা সম্ভব সবই ওলটপালট করে দেখল ওরা। ওয়ার্কলপটাও বাদ গেল না উৎসাহী দারোগা আঙুল বাঁকিয়ে দেয়ালে টোকা মেরে পর্যন্ত দেখল

স্টকমানকে কাছারিতে নিয়ে যাওয়া হল গায়ে তার পুরানো কোট পেয়াদার আগে আগে সে রাস্তার মাঝখান দিয়ে চলেছে। কোটের বক্ষঃপ্রান্তের ভেতবে একটা হাত গলিয়ে দিয়েছে, আরেকটা হাত এমন ভাবে নাড়ছে যে দেখে মনে হয় যেন আঙুলে লেগে থাকা নোংরা ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করছে বাদবাকিরা বেড়ার ধার দিয়ে সূর্যের বিন্দু বিন্দু আলোয় ছাওয়া পায়-চলা-পথ ধরে চলেছে তদন্তকারী ইনস্পেক্টরের পায়ের বুটজুতো ঘাসপাতার ঘষটানিতে সবুজ হয়ে উঠেছে এবারেও সে আগের মতোই আলোর বিন্দুগুলো মাড়িয়ে মাড়িয়ে চলেছে, তবে এবারে চুপিটা আর তার হাতে নেই, ফেকাসে রঙের কানের নরম তুলতুলে হাড়ের ওপর ভালো করে ঠেলে মাথায় পরেছে

স্টকমানকে জেরা করা হল সবার শেষে। ইডান আলেক্সেয়েভিচ হাতের কালিঝুলি পর্যন্ত ঘোয়ার অবকাশ পায় নি, দাভিদকার মুখে সেই আনাড়ির হাসি, গোলামের কৌধের ওপব কোটটা ফেলা, তাদেব সঙ্গে আছে মিখাইল কশেভয় এদের সকলকেই ইতিমধ্যে জেরা করা হয়েছে, এখন পেয়াদাদের পাহারায় কাছারির সামনের ঘরে গাদাগাদি করে বসে আছে

ভেতরের ঘরে ডেস্কের ওপাশে স্টক্‌ম্যান দাঁড়িয়ে, এপাশে বসে গোলার্ণী  
রঙের একটা ফাইল ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে তদন্তকারী ইন্স্পেক্টর তাকে জিজ্ঞেস করল

‘আটকলে খুনের ব্যাপারে আপনাকে যখন প্রশ্ন করেছিলাম আপনি ব্লু  
সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক প্রমিক পার্টির সদস্য কিনা তখন আপনি গোপন করেছিলেন  
কেন?’

স্টক্‌ম্যান কোন কথা না বলে ইন্স্পেক্টরের মাথা ছাড়িয়ে উর্ধ্ব দিকে তাকিয়ে  
রইল।

‘এর প্রমাণ পাওয়া গেছে। আপনার কাজের সমুচিত দণ্ড আপনি পাবেন,  
স্টক্‌ম্যানের নীরবতায় তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে ইন্স্পেক্টর বলল

‘দয়া করে জিজ্ঞেসবাদ শুরু করুন বিরসকণ্ঠে স্টক্‌ম্যান বলল। সামনে একটা  
খালি টুল দেখতে পেয়ে আড়চোখে সেই দিকে তাকিয়ে ইশারা করে বসার  
অনুমতি চাইল।

ইন্স্পেক্টর কোন উত্তর না দিয়ে বস্ বস্ করে কাগজ নাড়াচাড়া করতে  
লাগল, স্টক্‌ম্যানকে শাস্ত ভাবে টুলে বসে পড়তে দেখে ভুকুটি করে তার দিকে তাকাল

‘আপনি কবে এসেছেন এখানে?’

গত বছর।’

‘আপনার সংগঠনের নির্দেশে?’

‘কোন রকম নির্দেশ-টির্দেশ ছাড়াই

কতদিন হল আপনি আপনার পার্টির সদস্য?’

‘কী সব বলাছেন?’

‘আমি জিজ্ঞেস করছি,’ ইন্স্পেক্টর ‘আমি’ কথাটার ওপর বিশেষ জোব দিয়ে  
বলল, ‘কত দিন হল আপনি ব্লু সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক প্রমিক পার্টির সদস্য?’

‘আমার মনে হয় যে

‘আপনার কী মনে হয় তা জ্ঞানার বিন্দুমাত্র আগ্রহ আমার নেই। আমার  
প্রশ্নের উত্তর দিন গোপন করে লাভ নেই, বরং ক্ষতিই হবে।’ ফাইল থেকে  
একটা কাগজ আলাদা করে নিয়ে টেবিলের ওপর তর্জনী দিয়ে চোখে ধরে  
ইন্স্পেক্টর বলল, ‘এই যে রপ্তোভ থেকে এই রিপোর্টটা আমরা পেয়েছি - যে  
পার্টির উল্লেখ করেছি আপনি যে তার একজন সদস্য এখানে তার প্রমাণ আছে।’

স্টক্‌ম্যান চোখ সবু করে সাদা ধবধবে কাগজের টুকরোটোর ওপর অনুসন্ধানী  
দৃষ্টি বুলাল, মুহূর্তের জন্য তার ওপর দৃষ্টি আটকে গেল, শেষকালে হাঁটতে হাত  
বুলাতে বুলাতে অবিচলিত ভাবে বলল, ‘উনিশ শ’ সাত সাল থেকে।’

‘বটে আপনি স্বীকার করতে চান না যে পার্টি আপনাকে এখানে পাঠিয়েছে?’

‘হ্যাঁ, স্বীকার করি না।’

‘তাহলে বঙ্গুদ, আপনি এখানে কেন এলেন?’

‘এখানে মিত্তিরির চাহিদা আছে বলে।’

‘ঠিক এই জায়গাটাই কেন বেছে নিলেন?’

‘ওই একই কারণে।’

‘আপনার সংগঠনের সঙ্গে আপনার যোগ আছে কি, কিংবা যত দিন এখানে আছেন সেই সময়ের মধ্যে কোন যোগাযোগ ছিল কি?’

‘না।’

‘সংগঠনের লোকেরা জানে কি যে আপনি এখানে আছেন?’

‘সম্ভবত জানে।’

মুক্তাবসানো পেলিল-কাটা ছুরি দিয়ে পেলিলের শিস চোখা করতে করতে স্টকমানের দিকে না তাকিয়ে ঠোঁটদুটো উল্টে সবু করে পাকিয়ে জিজ্ঞেস করল

‘আপনার সংগঠনের কারও সঙ্গে চিঠিপত্রে আপনার যোগাযোগ আছে?’

‘না।’

‘তাহলে খানাতল্লাসের সময় এই যে চিঠিটা পাওয়া গেল, এটা কী?’

‘এটা আমার এক বন্ধুর চিঠি, তাব সঙ্গে সম্ভবত কোন বিপ্লবী দলের কোন সম্পর্ক নেই।’

‘রস্তোভ থেকে আপনি কোন নির্দেশ পেয়েছেন কি?’

‘না।’

‘আটাকলের মজুরেরা কী উদ্দেশ্যে জমায়েত হত আপনার ঘরে?’

স্টকমান কাঁধদুটো ঝাঁকাল, যেন প্রশ্নটা এমনই উদ্ভট যে সে অবাধ হয়ে গেছে।

‘শীতকালের সন্ধাতে অমনি জমায়েত হত। শ্রেষ্ট সময় কাটাতে আসত আমরা তাস খেলতাম।’

‘বে-আইনী বই পড়তেন,’ ইন্স্পেক্টর যেন বাকি কথাটা যুগিয়ে দিল

‘না। ওরা কেউই তেমন শিক্ষিত নয়।’

‘আটাকলের মেশিন চালানোর মজুব আর বাকি সকলেও কিন্তু এই তথ্যটা অস্বীকার করে নি।’

‘এটা সত্যি নয়।’

‘আমর মনে হয় আপনার আসলে এই সাধারণ বোধটুকু পর্যন্ত নেই যে ইন্স্পেক্টরের কথায় এই জায়গায় স্টকমান হেসে ফেলতে কথায় খেই হারিয়ে ফেলে রাগ চেপে রেখে শেষকালে সে যোগ করল। ‘আসলে সুস্থবুদ্ধির লোক আপনি নন। এই ভাবে অস্বীকার করে আপনি নিজেরই ক্ষতি করছেন। কসাকদের মধ্যে

ভাঙন সৃষ্টির জন্য সরকারের হাতের মুঠি থেকে তাদের জিনিয়ে নেবার জন্য আপনার পাটি যে আপনাকে এখানে পাঠিয়েছে একথা বুঝতে এতটুকু অসুবিধে হয় না। আমি বুঝতে পারছি না এসব ছলচাতুরি করে কী লাভ? যত যা-ই কবুন না কেন, আপনার অপরাধ এতে এতটুকু হালকা হবে না।

এ সবই আপনার অনুমানমাত্র সিগারেট খেতে পারি কি? খনাবাদ তাছাড়া এসব অনুমানের কোন ভিত্তিই নেই।’

‘আচ্ছা এবারে বলুন ত, আপনার কাছে যে-সব মজুর আসত তাদের আপনি এই যে এই বইটা পড়ে শোনাতেন?’ এই বলে ইন্স্পেক্টর একটা ছোট্ট বইয়ের ওপর হাত রাখল, তাতে বইয়ের নামটা ঢেকে গেল ওপর দিকে সাদার ওপর কালো কালিতে কাঠকয়লায় লেখার মতো চোখে পড়ল ‘প্রেক্ষানভ’ নামটা।

‘আমরা কবিতা পড়তাম দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে হাড়ের রিং তৈরি সিগারেট-হোল্ডার আঙুলের ফাঁকে শক্ত করে চেপে ধরে একটা টান দিল স্টকমান

পরদিন সকালে আকাশ যখন মেঘলা বুগুণতায় ছেয়ে গেছে সেই সময় দুই ঘোড়ায় টানা একটা ডাকগাড়ি গ্রাম থেকে ছাড়ল। শেহনের আসনে ওভারকোটের তেলচিটে খাটো ফলারে দাড়ি ঢেকে বসে বসে ঝিমঝিম স্টকমান তার দু’পাশে ঘেসাঘেসি করে বসেছে তলোয়ার হাতে দুই পেয়াদা। ওদের একজন, যাব মুখে বসন্তের দাগ, মাথার তুল কৌকড়া, সাদা ডেলা-বার-করা আডচোখে ভীতসন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে স্টকমানের দিকে তাকাতে তাকাতে গটিপড়া নোংরা আঙুলগুলো দিয়ে তার কনুই শক্ত কবে চেপে ধরে রইল, বাঁ হাতে আঁকড়ে ধরে রইল তলোয়ারের চটা-ওঠা খাপ।

গাড়ি ধুলো উড়িয়ে দ্রুত ছুটতে লাগল রাস্তা ধরে। মেলেবন্দের বাড়ির উঠানের বাইরে, মাড়াই-উঠানের বেড়ার গায়ে হেলান দিয়ে, শাল মুড়ি দিয়ে গাড়িটার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল ছোটখাটো গড়নের একজন ব্রীলোক তার মুখটা চোখের জলে ধুয়েমুছে গেছে একটা ঘষা মুদ্রার মতো, অশ্রুসঞ্জন চোখের শূন্য দৃষ্টি তার মুখের ওপর সববুণ পাখুর ও আঠাল প্রলেপ লাগিয়ে দিয়েছে

গাড়িটা পাশ দিয়ে ছুটে যেতেই ব্রীলোকটি বকের ওপর হাতদুটো চেপে তার পিছু পিছু ছুটল।

‘ওসিয়া ওসিপ দাভিদভিচ ওঃ কী হবে আমাব, বল?’

স্টকমান হাত নাড়তে গেল, কিন্তু বসন্তের দাগওয়ালা পেয়াদাটা সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে নোংরা আঙুলগুলো দিয়ে সাঁড়াশীর মতো শক্ত করে তার হাত চেপে ধরল। তারপর ভয়ঙ্কর কর্কশ গলায় চৈচিয়ে উঠল, ‘বসে থাক।’ নইলে কেটে ফেলব কিন্তু

পেয়াদাটা তার সহজ সবল জীবনে এই প্রথম একজন মানুষকে দেখছে যে  
জারের বিরুদ্ধে বেতে সাহস করে

## দুই

পেছনে কোথায় যেন ঘুসর পিছিল কুয়াশার মধ্যে পড়ে রইল মান্‌কোভো  
বসতি থেকে ছোট্ট শহর রাদজিভিল্লোভো পর্যন্ত সুদীর্ঘ পথটি। পেছনে ফেলে  
আসা পথ গ্রিগোরি মনে আনার চেষ্টা করে, কিন্তু শুধু আবছা আবছা মনে পড়ে  
স্টেশনের লাল দালানকোঠা, কামরার দোলে খাওয়া মেঝের নীচে রেলের চাকার  
ঘর্ষের আওয়াজ, ঘোড়ার মাদ আর খড়ের গন্ধ, ইঞ্জিনের তলা দিয়ে অপসূরমাণ  
রেললাইনের সীমাহীন রেখা, ক্ষণে ক্ষণে ভানের খোলা দরজা দিয়ে গলগল করে  
ভেতরে ঢুকে পড়া ঘোঁষা, তরোনেজে না কিষেভে কোথায় যেন থ্রাটফর্মে দাঁড়িয়ে  
থাকা এক মিলিটারি পুলিশের গুঁফা যুঝ

একটা ছোট স্টেশনে তাদের নামতে হল সেখানে ছাইরঙা লম্বা কোট গায়ে,  
নিখুঁত দাড়ি গোঁফ কামানো কোথাকার কতকগুলো লোক আর কিছু অফিসার  
ভিড় করে এসে দাঁড়াল তারা অন্য ভাষায় কথা বলছিল, গ্রিগোরি বুঝতে  
পারছিল না তাদের ভাষা ভানের গায়ে কাত করে পাটাতন ল্যাগিয়ে ঘোড়াগুলোকে  
বার করে আনতে অনেক সময় লেগে গেল। সামরিক পরিবহণ লাইনের অ্যাসিস্টেন্ট  
কম্যান্ডার ঘোড়াগুলোর পিঠে জিন চাপানোর হুকুম দিল, তিন শরৎ বেশি  
কসাককে পশু-হাসপাতালে নিয়ে হাজির করল দীর্ঘ সময় ধরে ঘোড়াগুলোর  
পরীক্ষাপর্ব চলল। তারপর মল ভাগ করার পালা সার্জেন্ট আর সার্জেন্ট-মেজরদের  
যত্নসমস্ত ছোট্টাছুটি। প্রথম দলে গেল হালকা বাদামী রঙের ঘোড়া, দ্বিতীয়  
দলে ছাইরঙা আর মেটে, তৃতীয় দলে গাঢ় বাদামী গ্রিগোরি পড়ল চতুর্থ  
দলে - সেখানে নেওয়া হয়েছিল সাধারণ বাদামী আর সোনালী ঘোড়া। পঞ্চম  
দলটা হল হালকা কটা দিয়ে, বষ্টটা কুচকুচে কালো ঘোড়া দিয়ে সার্জেন্ট-মেজররা  
এর পর কসাকদের আলাদা আলাদা টুপে ভাগ করে নানা জমিদারীতে ও পরীতে  
ছড়ানো-ছিটানো স্কেয়াড্রনে নিয়ে গেল

সার্জেন্ট-মেজর কাশ্গিনের চেহারা পৌরুষদীপ্ত, চোখদুটো তার ড্যানডেবে  
তার উর্দির হাতায় সেলাই করা পটিগুলো সুদীর্ঘকাল সামরিক চাকবীর সাফা বহন  
করছে। ঘোড়ায় চড়ে গ্রিগোরির পাশ দিয়ে যেতে যেতে সে প্রশ্ন করল

‘কোন জেলা থেকে?’

‘ভিওশেনস্কায়া।’

‘লেজ-কাটা ?’

অন্যান্য জেলার কসাকরা একথায় মুখ টিপে হাসল। নীরবে অপমানটা হজম করা ছাড়া গ্রিগোরির আর কোন উপায় রইল না।

পথ চলে গেছে শূন্য। সদর রাস্তার ওপর দিয়ে দল অঞ্চলের ঘোড়াগুলো এর আগে আর কখনও পাকা রাস্তা দেখে নি, তাই তারা প্রথম প্রথম নাক দিয়ে ঘড়ঘড় আওয়াজ করতে করতে কান বাড়ি করে এমন ভাবে চলতে লাগল যেন কোন বরফে ঢাকা নদীর বুকে পা ফেলছে। পরে অভ্যস্ত হয়ে আসতে যবা না খাওয়া, সদা-লাগানো নালের খট খট আওয়াজ তুলে দিবি চলতে লাগল জায়গায় জায়গায় অবাড়ন্ত গাছপালার ফাঁকা ফাঁকা ছঙ্গলে ফালা ফালা এই অপরিচিত শোলাও ভূমি উক মেঘলা দিন ভাপসা গরম উঠছে এখনকার সূর্যও যেন দনের সেই সূর্য নয়, ঘন কালো মেঘের ঝাঁলরের আড়ালে কোথায় যেন চলেফিরে বেড়াচ্ছে।

স্টেশন থেকে ক্রোশ দেডেক দূরে রাশ্জিভিল্লোভো তালুক। দ্রুত দুলকি চালে ঘোড়া ছুটিয়ে সামগ্রিক পরিবহন লাইনের অফিসার এবং তার আদালি অধেক পথে কসাকদের নাগাল ধরে ফেলল। আশঘরটা লাগল তালুকে পৌঁছতে

এটা কোন গাঁ ?’ একটা বাগানের এক রাশ গাছপালার ন্যাড়া মাথার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে মিতিয়াকিনস্কায়া জেলার এক ছেলেমানুষ কসাক সার্জেন্ট মেজরকে জিজ্ঞেস করল

‘গাঁ ? ও সব গাঁ-টা ভুলে যাও হে বোকা ! এ তোমার দল যৌজের এলাকা নয় ’

‘তাহলে এটা কী চাচা ?’

‘আমি আবার তোমার চাচা হলাম কবে থেকে ? ঠুঃ, কোথাকার আমার ভাইপো এলো রে !’ আরে এ হল বেগমসাহেবা উরুসভার তালুক। এখানেই আমাদের চার নম্বর স্কোয়াড্রনের ঘাঁটি।’

গ্রিগোরির মনটা দমে গেল। রেকাবের ওপর চাপ দিয়ে সামান্য উঠে দাঁড়িয়ে হাত বুলিয়ে ঘোড়াটার ঘাড়ের লোম পাট কবতে করতে নিশ্চিত তৈরি দোতলা বাড়িটা, কাঠের বেড়া আর বার-বাড়িতে গেরস্থালির অক্লান্ত ধরনের দালানকোঠাগুলো তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। বাগানের পাশ দিয়ে যেতে যেতে কানে এলো

\* প্রতিটি জেলার একটি করে ডাক-নাম থাকত। ভিওশেনস্কায়ার ডাক-নাম ছিল ‘কুস্তা’। (টীকা লেখকের)



বাতাসের সঙ্গে উল্লস গাছপালার কানাকানি - সেই একই ভাষা, যেমনটি শোনা যায় তাদের ফেলে আসা সুদূর দূর দেশে

শুণ্য হল এক ক্লান্তিকর, অবসাদগ্রস্ত জীবন অল্পবয়সী কসাকরা নিজেদের স্বাভাবিক কাজের দ্বারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় প্রথম প্রথম করার মতো কিছু না পেয়ে অবসর সমর্যটুকতে গল্পগুজব করে নিজেদের মনের ভার হাল্কা করতে লাগল। টালির ছাদ দেওয়া বড় সদর দলানটাতে ক্লোয়াড্রনের ধাক্কা জায়গা হয়েছে ঘরের ভেতরে জানলার ধারে ধারে তক্তার তাক - সেখানে সকলের ঘুমানোর জায়গা গ্রিগোরির তাকের পাশের জানলায় একটা ফোকর যে কাগজের গৌজ দিয়ে বন্ধ করা সেটা খানিকটা উঠে এসেছে, রোজ রাতে সেই ফাঁক দিয়ে বহুদূর থেকে রাখালের বাজানো শিঙার মতো গুনগুন আওয়াজ ওঠে শুয়ে শুয়ে বহুজনের সম্মিলিত নাসিকাগর্জনের মধ্যে সেই আওয়াজ কান পেতে শুনতে শুনতে গ্রিগোরির মনে হয় যেন পাথরের মতো এক ভারী বিষণ্ণতার চাপে পড়ে সে সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হয়ে আসছে তীক্ষ্ণ কাঁপা কাঁপা গুঞ্জন তার হৃৎপিণ্ডের কাছাকাছি কোথায় যেন সাঁড়শীর মতো চেপে ধরে, বুকটা মোচড় দিয়ে ওঠে, সেই সব মুহূর্তে তার দুর্বল আকাঙ্ক্ষা জাগে বিছানা ছেড়ে উঠে আস্তাবনে গিয়ে বাদামী ঘোড়ার পিঠে জিন চাপায়, স্নাপাব মতো তাকে ছুটিয়ে নিয়ে যায়। এই অবনুণ মাটির বুকে ঘোড়ার শরীরের পুঞ্জ পুঞ্জ ঘামের ফেনা ছড়াতে ছড়াতে ষত দিন না সে তার বাড়ি গিয়ে পৌঁছোয়।

ভোর পাঁচটাব সময় ওদেব ঘুম ভাঙিয়ে দেওয়া হয়। তখন ঘোড়াগুলোব পরিচর্যা করতে হয়, তাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে হয় যে আধঘন্টাখানেক সময় ওরা ঘোড়াগুলোকে দানাপানি খাওয়ায় সেই সামান্য অবসরে টুকরো-টাকরা কথাবার্তা চালাচালি হতে থাকে ওদেব নিজেদের মধ্যে

‘কী বিল্লী জায়গা রে ভাই’

‘আর পারি নে’

‘আব সার্জেট-মেজরটা শালা শুরোবের বাচ্চা ঘোড়াব খুব পর্যন্ত ধুইয়ে ছাড়ে’

‘আহা বাড়িতে এখন সরা-পিঠে ভাজা হচ্ছে পিঠে পরব’

‘এঃ এখন একটা মেয়ে-টেয়ে হাতের কাছে পেলে বেশ হত’

‘আমি ভাই গত রাতে স্বপ্ন দেখেছি যেন বাবার সঙ্গে মাঠে ঘাস কাটিছি, চারধারে ছড়িয়ে আছে লোক আর লোক - মাড়াইয়ের জায়গার পেছনে ডেইজী ফুলের মতো,’ বলতে বলতে গোবেচারা প্রোখর জিকন্ডের বাজুরের মতো বড় বড় স্নিগ্ধ চোখদুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল ‘আমরা ঘাস কাটিছি, কান্তের ঘায়ে ঝুপ ঝুপ কবে ঘাস মাটিতে শুয়ে পড়ছে। ওঃ, আমার ভেতরটা নেচে ওঠে’

‘বৌ নিশ্চয় বলছে ‘আমার মিকোলা এখন কী করছে তাই ভাবছি।’

‘ওঃ-হো-হো সে হয়ত ভাই এখন তার স্বশুরঠাকুরের সঙ্গে পেট ঘষাঘষি খেলা খেলছে।’

‘যাঃ কী যে বলিস সব ’

‘আরে এমন কোন মামী আছে যে কিনা স্বামী আড়াল হলে এখানে ওখানে মুখ দিতে ছাড়বে?’

‘অত দুঃখ করার কী আছে ভাই? মেয়েমানুষ হল গিয়ে দুধের জালা পলটন থেকে ফেরার পর আমরাও তার ভাগ পাব ’

স্কোয়াড্রনের মধ্যে সবচেয়ে চটুল স্বভাবের, ইতর ও নির্লজ্জ গোছের হল ইয়োগোর জারকোভ। কোন কথাই তার জিতে আটকায় না। এবারে সে ওদের কথাবার্তার মাঝখানে নাক গলাল। একটা অর্থবহ নোংরা হাসি হেসে চোখ টিপল সে।

‘ব্যাপারটা বুঝতে আর থাকি নেই তোমার বাপ ছেলের বৌকে হাতছাড়া করবে না খাঁটি মদ্য কুকুর বলতে হবে। একবার হয়েছিল কি জানিস ’  
শ্রোতাদের মুখের ওপর নজর বুলিয়ে নিয়ে কৌতুকভরে চোখ নাচাতে নাচাতে সে বলল এই বকম এক বুড়ো মদ্য ত তার ছেলের বৌয়ের পেছন পেছন ছৌক ছৌক করে বোড়ায়, কিছুতেই তাকে সোয়াস্তি দেয় না। এদিকে ছুঁড়ির স্বামীটা বুড়োর পথের কাঁটা বুড়ো তখন কী ফন্দি আঁটল জানিস? একদিন রাতে ঘর থেকে বেরিয়ে ইচ্ছে করে গোয়ালের দরজা বুলে দিল যাতে সব গোবুবাছুর উঠানে বেরিয়ে আসে। তারপর ছেলেকে যা-নয় তাই বলে বকাবকি করে বলল। ‘তুই কী বকম দরজা বন্ধ করেছিলি? দ্যাখ গে সব গোবুবাছুর বেরিয়ে পড়েছে। লিগনির যা ওগুলোকে খেদিয়ে গোয়ালে তুলে গে’ ব্যাটা ভেবেছে কি, ছেলে একবার বেরোলেই হল, সেই সুযোগে ছেলের বৌকে নিয়ে মজা লুটবে। এদিকে ছেলের বড় কুঁড়েমি, সে তাই ফিসফিস করে বৌকে বলল, ‘যাও দেখি গোবুবাছুরগুলোকে গোয়ালে তুলে এসো।’ বৌ গেল। বিছানায় শুয়ে কইল ছেলে। শুয়ে শুয়ে সে কান পেতে শুনতে লাগল। বাপ চুল্লীর ওপরকাব বিছানা থেকে নেমে হাঁটু ঘষটাতে ঘষটাতে তাদের বিছানার কাছে আসতে লেগেছে ছেলেও নেহাৎ বোকা নয়। বেক থেকে বেলন তুলে নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। বাপ যেই বিছানায় উঠে চারধারে হাতড়াতে শুরু করবে, অমনি ছেলেও থাই কবে তার টাকের ওপর তাক করে বসিয়ে দিল বেলনের এক বাড়ি টেঁচিয়ে বলল। ‘দূর হ হতভাগ্য। বিছানার চাদর চিবানোর এ কী ছাই বমভ্যাস হয়েছে তোমার ’  
এদিকে ব্যাপারটা হয়েছে কি জানিস। ওরা বাছুরটাকে রাস্তিবে নিজেদের ঘরে রাখত, সেটা আবার সুযোগ পেলেই বিছানার চাদর চিবুত ছেলে তাই যেন

বাহুরটাকেই বকাবকি করছে এই রকম ভান করে বাপকে এক ঘা মসিরে দিয়ে চুপচাপ শূয়ে আছে। এদিকে বুড়ো কোনরকমে হামা দিয়ে চুন্নীর ওপরকার বিছানায় গিয়ে উঠে শূয়ে পড়ল, শূয়ে শূয়ে মাথার ফেলা জায়গাটা টিপে টিপে দেখে, একটা আশু আলুর মতো কুলে উঠেছে জায়গাটা। শূয়ে থাকতে থাকতে কিছুক্ষণ পরে সে ডাকল, 'ইতান, অ ইতান?' 'কী বাবা?' 'এই মাস্তর তুই কাকে অমন পেটালি রে?' কাকে আবার? বাহুরটাকে,' ছেলে বলল। বুড়ো তখন চোখের জল ফেলতে ফেলতে কান্নাভরা গলায় তাকে বলল, 'গোবুবাচুরের ওপর যদি অমন মারধোর করিস তাহলে কিসের ছাই গেরুই হবি রে তুই হতভাগ্য?'

'ওঃ তুই বানাতেও পারিস বটে!'

'তোকে শেকল দিয়ে বেঁধে না রাখলে রোধে সাহায্য কার?'

'এসব কী হচ্ছে অ্যাঁ? এ যে একেবারে হাট-বাজার বসে গেছে। যে যার কাজে চলে যাও।' সার্জেন্ট-মেজর এগিয়ে আসতে আসতে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করল, কসাকরাও সঙ্গে সঙ্গে হাসতে হাসতে, নিজেদের মধ্যে হাসিঠাট্টা কবতে করতে যে যার ঘোড়ার কাছে চলে গেল চাপানের পর কুচকাওয়াজে যেতে হয়, সার্জেন্টরা তখন ওদের ভেতর থেকে বাড়ির যত অভ্যাস ঝেড়ে বার করার জন্য উঠে পড়ে লেগে যায়।

'এই হতভাগা শূয়োর, ঝুঁড়িটা টেনে তোল হে!'

'রাইট ড্রেস। কইক মার্চ!'

'টুপ. হন্ট!'

'মার্চ!'

'এই, এই যে বা পাশে, তুমি, হারামজাদা, এ কী দাঁড়ানোর ছিঁরি.'

নবাবজাদা অফিসাররা সব একপাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পেছনের চওড়া আঙিনার ওপর কসাকদের দৌড়ঝাঁপ করানোর ওপর নজর রাখে, তারা ভ্যামাক টানে মাঝে মাঝে সার্জেন্টদের হুকুমের মধ্যে হস্তক্ষেপ করে।

হালকা ছাই রঙের ছিমছাম হেটকেট আর সুন্দর ফিটফাট উর্দি পরা এই সব অফিসারদের টানটান, তেলচুকচুকে শরীরের দিকে তাকিয়ে গ্রিগোরির মনে হয় ওদের আর তার মধ্যে এক অদৃশ্য প্রাচীরের দুর্লভ্য ব্যবধান আছে। ওধারে ওদের ওই জীবন কসাকদের এই জীবনের ধারা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, সুনিয়ন্ত্রিত ধারায় স্পন্দিত হয়ে চলেছে তাদের সেই কেতাদুরস্ত জীবন, সেখানে জলকান্দা নোরো লাগার ভয় নেই, উকুনের উৎপাত নেই, সার্জেন্ট-মেজররা প্রায়ই যেমন তাদের ওপর দাঁত মুখ ঝিচোয় সে ভয়ও নেই

তালুকে পৌছানোর তৃতীয় দিনে এমন একটা ঘটনা ঘটল যা গ্রিগোরির, শূধু

গ্রিগোরির কেন, তবুও কসাকদের সকলের মনে বেদনাদায়ক ছাপ ফেলে গেল সেদিন তাদের ঘোড়ার চড়ে কুচকাওয়াজের কায়দাকানুন শেখানো হচ্ছিল। ওদের দলে ছিল প্রাথমিক জিকভ ছোকবার চোখদুটো বাছুরের মতো বড় বড়, কবুণ প্রায়ই সে স্বপ্নে দেখতে পেত তার ছেড়ে আসা সুদূর দেশ যেন তাকে ইশারায় ডাকছে। এই প্রাথমিক বোখা, বোঝাডাগোছের ঘোড়াটা সেদিন তালিমের সময় সার্জেন্ট-মেজরের পাশ দিয়ে ছুটে যেতে যেতে তার ঘোড়ার গায়ে বোম্বা একটা চিট মেরে বসল। লাথিটা তেমন জোরাল ছিল না। সার্জেন্ট-মেজরের ঘোড়ার বাঁ পায়ের ওপরের অংশের চামড়া সামান্য ছড়ে গেল। সার্জেন্ট-মেজর সঙ্গে সঙ্গে সশাং করে চাবুক কষিয়ে দিল প্রাথমিকের মুখে, সোজা তার গায়ের ওপর ঘোড়া চালিয়ে দিয়ে ডিঙকার করে উঠল। 'কোথায় যাচ্ছ দেখতে পাও না? চোখে দেখতে পাও না নাকি? না-না। শুরোরের বাচ্চা, তোমার মজাটা আমি দেখাচ্ছি। দিন তিনেকের বেগার খাটিয়ে ছাড়ব। তখন টের পাবে।'

স্কোয়াড্রন-কমান্ডার সেই সময় টুপ-অফিসারকে কিছু নির্দেশ দিচ্ছিল। দৃশ্যটি তার চোখে পড়েছিল ঠিকই, কিন্তু তলোয়ারের বাঁটে হাত বুলোতে বুলোতে বিরস বদনে একটা লম্বা হাই তুলে সে মুখ ঘুরিয়ে নিল। প্রাথমিকের চোঁটদুটো পরখর করে কাঁপতে লাগল। ফুলে ওঠা গাল থেকে যে রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়ছিল তা সে ঐটুকোটের হাতায় মুছে ফেলল।

গ্রিগোরি তার ঘোড়াটাকে সকলের সঙ্গে এক সারিতে দাঁড় করাতে গিয়ে অফিসারদের দিকে তাকাল, কিন্তু তারা তখন এমন ভাবে গল্প করে চলছিল যেন কিছুই হয় নি। এই ঘটনার দিন পাঁচেক পরে একদিন ঘোড়াকে জল খাওয়াতে গিয়ে গ্রিগোরির হাত থেকে লোহার বালতিটা কুয়োর ভেতরে পড়ে গেল। সার্জেন্ট-মেজর সঙ্গে সঙ্গে ঘুসি পাকিয়ে বাজপাখির মতো ছৌঁ মারার ডঙ্কিতে তার দিকে তেড়ে গেল।

'গায়ে হাত দেবে না বলছি। কুয়োর তলায় জলে যে তরঙ্গ উঠেছে উঁকি মেরে তা দেখতে দেখতে চাপা গলায় গ্রিগোরি ফুসে উঠল।

'কী? নাম শালা হারামজাদা, তুলে নিয়ে আয়। মেরে বদন বিগড়ে দেব।'

'তুলে আনব। কিন্তু গায়ে হাত দেবে না।' মাথা না তুলেই ধীরে ধীরে টেনে টেনে গ্রিগোরি বলল।

কুয়োতলায় যদি অন্য কসাকরা থাকত তাহলে কিছু ব্যাপারটা অনারকম চেহারা নিত। সেসকলে সার্জেন্ট-মেজর নির্বাণ গ্রিগোরিকে ওখানেই মেরে বসত। কিন্তু অনোর। ধারা ঘোড়ার পরিচর্যা করছিল, লীড়িয়ে ছিল বেড়ার ধারে। তাই তারা ওদের কথাবার্তা শুনতে পায় নি। সার্জেন্ট-মেজর গ্রিগোরির আরও কাছে

এগিয়ে এসে ওদের দিকে ফিরে তাকাল, রাগে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে হিংস্র চোখজোড়া পাকিয়ে গরগর করে উঠল

‘তুই আমার কোথাকার কে এলি রে ? ওপরওয়ালার মুখের ওপর এই ভাবে কথা ?’

‘ভালো চাও ত গোলমাল পাকিও না সেমিওন ইয়েগোরভ !’

‘কী ? ভয় দেখাচ্ছিস ? আমি তোকে মেরে হালুয়া বানিয়ে ছাড়ব !’

‘তাহলে শূনে রাখ’ গ্রিগোরি এবারে কুর্যোর ওপর থেকে মাথা তুলে নিয়ে বলল ‘আমার গায়ে একবার হাত তুলেই দেখ না খুন হয়ে যাবে সঙ্গে সঙ্গে’ বুকেছ ?’

সার্জেন্ট-মেজর থ মেরে গেল, কাউলো মাছের মতো বিরাট চারকোনা হাঁ খুলে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল, তার মুখে কোন উত্তর যোগাল না গ্রিগোরিও ওপর এক চোট দেওয়ার মুহূর্তটা হাতছাড়া হয়ে গেল গ্রিগোরির মুখ যেমন চুনের মতো সাদা হয়ে গেছে তাতে ভালো কিছুই আভাস পাওয়া যাচ্ছিল না। তাই সার্জেন্ট-মেজর হতবুদ্ধি হয়ে গেল। ঘোড়ার দানাপানি দেওয়ার জন্য কাঠ কুন্ডে তৈরি গামলায় জল ঢালার সবু নালার কাছটা জল কাদায় পিছলে হয়ে ছিল। তারই ওপর দিয়ে পা টিপে টিপে সার্জেন্ট-মেজর কুর্যোর কাছে থেকে সরে গেল সেখান থেকে সরে যাওয়ার পর ফিবে তাকিয়ে দূর থেকে কাম্যারের হাতুড়ির মতো ঘূঁষটা নাড়তে নাড়তে বলল, ‘স্কোয়াড্রন-কম্যাণ্ডারকে বলব দাঁড়াও না, স্কোয়াড্রন-কম্যাণ্ডারের কাছে রিপোর্ট করব।’

কিন্তু কী কারণে কে জানে। স্কোয়াড্রন-কম্যাণ্ডারের কাছে রিপোর্ট সে কবল না তবে পরের দু’সপ্তাহ সে গ্রিগোরিকে দৌড়বাপ করিয়ে ছাড়ল, ছোটখাটো প্রতিটি ব্যাপারে তার খুঁত ধরতে লাগল, তার পাল্লা না এলেও তাকে সাত্তীর ডিউটিতে পাঠাল, যদিও তার চোখের সরাসরি দৃষ্টি সে এড়িয়ে গেল।

ক্রান্তিকর একঘেয়ে ধরাবাঁধা জীবন প্রাণের সমস্ত সরসতা নিংড়ে বার করে ফেলতে লাগল। সারা দিন সেই সঙ্কীর্ণ পর্যন্ত, যতক্ষণ না শিঙাবাদক শিঙা বাজিয়ে দিনের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করছে, ততক্ষণ পায়ে হেঁটে বা ঘোড়ায় চড়ে কুচকাওয়াজ করতে হয়, ঘোড়াগুলো যখন খোঁটার বাঁধা থাকে তখন তাদের দলাইমলাই ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে হয়, খাওয়াতে হয়, গুচ্ছের কতকগুলো হাবিজাবি ‘নিয়মকানুন’ মুখস্থ করতে হয় কেবল রাত দশটার সময় হাজিরা মেলাতো সাত্তীর ডিউটি ঠিক হওয়ার পর প্রার্থনার জন্য সকলে সার বোঁধে দাঁড়ায় সার্জেন্ট-মেজর তখন ভাঁটার মতো গোল গোল চোখ পাকিয়ে সারিবদ্ধ সকলের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে তার স্বভাবসিদ্ধ খসখসে গলায় গাইতে শুরু করে ‘হে মোদের পিতঃ

সকাল থেকে শুরু হয় সেই একই একটানা ধরাবাঁধা ৭২ দিন চলে যায়

একের পর এক, অথচ একটার সঙ্গে আরেকটার কোন তফাত নেই, সবগুলোই চুবুড়ি এক বকমের

গোটা তালুকে নায়েবের বুড়ি স্ত্রী ছাড়া মেয়েমানুষ বলতে ছিল আর মাত্র একজন সে হল নায়েবের সুন্দরপানা যুবতী কি ফ্রানিয়া নামে একটা পোলিশ মেয়ে। স্কোয়াড্রনের সকলের, মায় অফিসারদের পর্যন্ত নজর ছিল তার ওপর ফ্রানিয়া ঘন ঘন ঘর থেকে ছুটে আসে রান্নাঘরে যেখানে আধিপত্য করত এক ভুবুহীন বুড়ো কানুচি।

টুপে টুপে ভাগ হয়ে মার্চ করতে করতে স্কোয়াড্রনের সকলে ছাইরঙা ঘাঘবার খস খস আওয়াজ তুলে ফ্রানিয়াকে যেতে দেখলে সেই দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চোখ টোপে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে। ফ্রানিয়া তার মেহের ওপর কসাক সৈন্য আর অফিসারদের নিরস্তুর লুন্ড দৃষ্টি উপলব্ধি করে 'তিন শ' চোখের বিচ্ছুরিত লালসার প্রবল ধারায় স্নাত হয়ে সে যেন ওদের তাকিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে ইচ্ছে কবেই উবুদুটো দোলাতে দোলাতে বাড়ি আর রান্নাঘরের মাঝখানে ইতস্তত ছুটোছুটি করে বেড়ায় এক এক করে প্রতিটি টুপের দিকে, এবং আলাদা আলাদা করে গণ্যমানা অফিসারদের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসে। তার কৃপাদৃষ্টি লাভের জন্য সকলেই আগ্রহী, কিন্তু গুজব এই যে কৌকড়া চুল এবং সারা গায়ে ঘন লোমওয়ালা কোন এক লেফটেন্যান্টই নাকি শুধু তাকে বাগাতে পেয়েছে

বসন্তের ঠিক আগে আগেই ঘটল ঘটনাটা। সেদিন আস্তাবলে ডিউটি ছিল গ্রিগোরির বেশির ভাগ সময়টাই তাকে কাটাতে হচ্ছিল আস্তাবলের এক কোণে, যেখানে এক মাদী ঘোড়ার সাম্নিধে এসে অফিসারদের ঘোড়াগুলো আর হির থাকতে পারছিল না দুপুরের খাবারের ছুটি হয়েছে। গ্রিগোরি সবে মেজরের সামা-পাওয়ালা ঘোড়াটাকে চাবুক মেরে শায়েস্তা করে তার নিজের ঘোড়ার পিঞ্জরার ভেতরে ঊকি মেরে দেখল। ঘোড়াটা মুখের ভেতরে শুকনো খড় পুরে লালায় ভিজিয়ে কচবমচব করে চিবুতে চিবুতে গোলাপী রঙের চোখদুটো ঘোরাতে ঘোরাতে টেরিয়ে তার প্রভুর দিকে তাকাল, তলোয়ার নিয়ে কসরত করার সময় তার পেছনের যে পাটা ছড়ে গিয়েছিল সেটা সামান্য গোটাল ঘোড়াটার গলার লাগামে ঠিক করে দিতে গিয়ে গ্রিগোরি আস্তাবলের অঙ্ককার কোনার মধ্যে একটা ধ্বস্তাধ্বস্তি আর চাপা কান্নার আওয়াজ শুনতে পেল এই অস্বাভাবিক আওয়াজে একটু অবাক হয়ে সে তাড়াতাড়ি পিঞ্জরাগুলো পার হয়ে গেল। আস্তাবলের দরজাটা হঠাৎ দড়াম করে বন্ধ হয়ে যেতে একটা পিচ ঢালা গাড় অঙ্ককার তাব চোখের ওপর নেমে এলো। দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে গ্রিগোরি শুনতে পেল কার যেন চাপা গলার চিংকার

‘তাত্তাতি, তাত্তাতি চলে এসো সবাই’

গ্রিগোরি পায়ের গতি বাড়িয়ে দিল

‘কে, কে ওখানে?’

সার্জেন্ট পপোভ হাতড়ে হাতড়ে দরজার দিকে এগোচ্ছিল, গ্রিগোরি এসে পড়ল তার ঘাড়ের ওপর

‘কে, গ্রিগোরি নাকি?’ গ্রিগোরির কাঁধে খাবড়া মেরে সে ফিসফিস করে বলল

‘দাঁড়াও এখানে হচ্ছে কী এসব?’

সার্জেন্ট কাচুমাচু হয়ে বিকথিক করে হাসতে হাসতে গ্রিগোরির জামাব আঙ্গিন চেপে ধরল।

‘এই দাঁড়াও দেখি, যাচ্ছ কোথায়?’

গ্রিগোরি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে দরজাটা হাট করে খুলে দিল উঠোন জনমানবশূন্য হয়ে পড়েছে। বিচিত্রবর্ণের একটা লেজকাটা মুরগী সেখানে পাখচাষি করতে করতে গোবরগান্ডার মধ্যে ঘটিঘটি করতে আর কোথায় ডিম পাড়া যেতে পারে এই নিয়ে চিন্তা করতে করতে থেকে থেকে কঁক কঁক ডাক ছাড়ছে রীথুনি যে আগামীকাল তাকে দিয়ে নায়েব মশাইয়ের জন্য সুপ রান্নার মতলব আঁটিছে এ বিষয়ে সে সম্পূর্ণ অচেতন।

আলোর ঝলকে মুহূর্তের জন্য গ্রিগোরির চোখে ধাঁধা লেগে গেল সে হাত দিয়ে চোখ আড়াল করল, তারপর আন্তাবলের অন্ধকার কোণ থেকে আরও বেশি গোলমাল শুনতে পেয়ে সেই দিকে ঘুরে দাঁড়াল দেয়াল হাতডাতে হাতডাতে সে সেই দিক লক্ষ্য করে চলতে লাগল। দেয়ালের গায়ে আর দরজার মুখোমুখি জীবনের পাত্রগুলোর ওপর সূর্যের আলোর প্রতিফলন নাচছে। আলোয় চোখে ছালা ধরিয়ে দিচ্ছিল, গ্রিগোরিকে তাই চোখ কুঁচকে চলতে হচ্ছিল চলতে চলতে তার ঠোকাঠুকি হয়ে গেল জারকোভ নামে ছাবলাটার সঙ্গে তার সালোয়ারটা কোমর থেকে বসে পড়ছে, মাথা বাঁকাতে বাঁকাতে চলতে চলতে সে সামনের বোতাম আঁটিছে

‘কী ব্যাপার? তোরা এখানে কী করছিস?’

‘শিগিরি যা গ্রিগোরির মুখের ওপর বাসী মুখের পুতিগন্ধময় নিশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে ফিসফিস করে বলল জারকোভ, ‘ওই যে ওই ওখানে, অন্ধুত কাণ্ড আমাদের ছেলেরা ফ্রানিয়াকে ওখানে টেনে এনেছে চিত করে ফেলেছে গ্রিগোরি তাকে এক দাঁতায় আন্তাবলের দেয়ালের গায়ে ছিটকে ফেলে দিল। কাঠের গুঁড়ির দেয়ালের সঙ্গে দৃম করে পিঠ ঠুকে যেতে জারকোভের মুখের হাসি আচমকা বন্ধ হয়ে গেল। ধনাত্মকতার আওয়াজটা যেদিক থেকে আসছিল

সেই দিক লক্ষ্য করে খিগোরি ছুটল। অন্ধকারে অভ্যস্ত-হয়ে আসা তার চোখদুটো বিম্বদ্রিত হয়ে গেল। আতঙ্কে ফেকাসে হয়ে উঠল সে দেখতে পেল কোনায় যেখানে ঘোড়ার ঢাকনার কাপড়গুলো পড়ে থাকে, সেখানে কসাকদের একটা জমাট ভিড় এক নম্বর টুপের সকলে হুড়োহুড়ি লাগিয়ে দিয়েছে। খিগোরি তাদের ঠেলে সরিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে গেল দেখতে পেল মেঝের ওপর নিশ্চন্দ হয়ে ফ্রানিয়া পড়ে আছে, ঘোড়া ঢাকার কাপড় দিয়ে তার মাথাটা ঢাকা, ঘাঘরাটা ছিন্নভিন্ন, বুকের ওপর টেনে তোলা, অন্ধকারের মধ্যে নির্লব্ধের মতো, বীভৎস ভাবে ফাঁক হয়ে আছে, সাদা ধবধব করেছে তার পাদুটো। একজন কসাক সবমাত্র তার ওপর থেকে উঠে এলো, সঙ্গীদের করণ দিকে না তাকিয়ে পাক্কা মা মুঠো করে ধরে কেমন যেন একটা বাঁকা হাসি হেসে মেয়ালের দিকে সরে গিয়ে পরের জনের জন্য জায়গা করে দিল খিগোরি পিছন ফিরে দরজার দিকে ছুটল চিৎকার করে ডাকল, 'সার্জেন্ট-মেজর'।

অন্য কসাকরা পিছন থেকে ছুটে এসে দরজার ঠিক সামনেই তাকে ধরে ফেলল, মুখে হাত চাপা দিয়ে শেছনে ঠেলে দিল খিগোরি ইতিমধ্যে একজনের গায়ের ফৌজী শার্ট কলার থেকে নীচ পর্যন্ত টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে, আরেকজনের পেটে লাথি কবিয়ে দিয়েছে, কিন্তু তাহলে কী হবে, সকলে মিলে শেষকালে তাকে কাবু করে ফেলল, তারও দশা হল ফ্রানিয়ার মতো ঘোড়া ঢাকার কাপড় দিয়ে মাথা ঢেকে দিল, দু'হাত পিছমোড়া করে বৈধে ফেলল তারপর গলার স্বরে কাউকে যাতে চিনতে না পারে সেই জন্য নিঃশব্দে, টু শব্দটি না করে তাকে ধরাধরি করে ছুঁড়ে ফেলে দিল জাব-দেওয়ার একটা খালি গামলার মধ্যে। পুতিগন্ধময় পশমী ঢাকনার কাপড়টার মধ্যে খিগোরির দম বন্ধ হয়ে আসছিল, সে চিৎকার করার চেষ্টা করল, কাঠের বেড়াটার গায়ে বৃথাই লাথি ছুঁড়ল কোনাব দিক থেকে ফিসফিস শব্দ আর কসাকদের আসা-যাওয়ায় দরজা খোলা-বন্ধের কাঁচকৌঁচ আওয়াজ ওর কানে আসতে লাগল। মিনিট কুড়ি বাদে ওর বাঁধন খুলে দেওয়া হল দরজার সামনে তখন সার্জেন্ট-মেজর এবং অন্য টুপের দু'জন কসাক দাঁড়িয়ে

'তুমি চুপ করে থাক' তার চোখে চোখে না তাকিয়ে ঘন ঘন চোখ পিটপিট করতে করতে সার্জেন্ট-মেজর বলল।

'ভুলেও কোন কথা নয়। বোকাব মতো ফাঁস করেছে কি কান টেনে ছিঁড়ে ফেলব,' দুবোক নামে অন্য টুপের কসাকটি মুচকি হেসে বলল।

খিগোরি দেখতে পেল দু'জন কসাক মিলে ছাইরঙা পুটলির আকারে দলা পাকানো ফ্রানিয়াকে তুলে ঘাঘরার নীচ থেকে সূক্ষ্মকোণ রচনা করে তার পাদুটো



নিষ্পন্দ ভাবে ঝুলে ছিল) ধরে একটা জাকনার গামলার ওপর উঠে দেয়ালের বে-জায়গায় কতকগুলো তক্তা নড়বড়ে হয়ে শেষ পর্যন্ত ঝসে পড়ে গিয়েছিল সেই ফাঁক দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিল দেয়ালটা ছিল বাগানের দিকে। প্রতিটি শিকারীর মাথায় একটা করে ঝুলকালিমাথা ছোট্ট মোংরা ঘুলঘুলি। নীচে পড়ার পর ঝানিয়া কী করে দেখার জন্য কসাকরা জুতোর খট খট আওয়াজ ভুলে কাঠের বেড়ার ওপর উঠে পড়ল, কেউ কেউ আবার দেখার জন্য প্রস্তুত আশ্চর্যের বাইরে চলে গেল।

একটা পার্শ্বিক কৌতূহল পেয়ে বসল গ্রিগোরিকে একটা আডকাঠ আঁকড়ে ধরে শেষকালে একটা ঘুলঘুলির কাছে এলো, সুবিধামতন একটা জায়গা খুঁজে পা রেখে সে বাইরে নীচের দিকে উঁকি মারল। ডজন কয়েক চোখ ঝুলকালি পড়া ঘুলঘুলির ভেতর দিয়ে দেয়ালের ধারে পড়ে থাকা মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইল। মেয়েটি চিং হয়ে পড়ে আছে, পাদুটো কীটির ফলার মতো একবার জুড়ে যাচ্ছে, আবার ফাঁক হচ্ছে, আঙুল দিয়ে দেয়ালের পার্শ্বের আখণ্ড বরফ খিমচে ধরছে। গ্রিগোরি এর খুঁচটা দেখতে পাচ্ছিল না, কিন্তু অন্য ঘুলঘুলিগুলোর কাছে ডিড় করে দাঁড়ানো কসাকদের চাপা ফৌঁস ফৌঁস আওয়াজ আর তাদের পায়ের তলায় খড় মাড়ানোর মৃদু ও মধুর মচমচ শব্দ তার কানে আসছিল।

ঝানিয়া এই ভাবে অনেকক্ষণ ওখানে পড়ে রইল। তারপর চার হাত পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল। তার হাতদুটো পরধর করে কাঁপছে, দেহের ভর রাখতে পারছে না। গ্রিগোরি এটা স্পষ্ট দেখতে পেল। টলতে টলতে দু'পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। আলুখালু চেহারা অদ্ভুত দেখাচ্ছে তাকে। দেখে চেনার উপায় নেই। বেশ ঝনিকক্ষণ ধরে সে ঘুলঘুলিগুলোর ওপর চোখ বুলাল।

তারপর এক হাতে লতার ঝোপ আঁকড়ে ধরে অন্য হাতে দেয়ালে ভর দিয়ে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে সে এগোতে লাগল।

গ্রিগোরি এক লাফে কাঠের পার্টিশন থেকে নেমে পড়ল, হাত দিয়ে গলার কাছটা ঘষতে লাগল, তার মনে হল যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে।

সে যখন দরজার কাছে এলো তখন কে যেন - পরেও সে বুঝতে পারে নি কে সরাসরি, স্পষ্ট ভাষায় তাকে জানিয়ে দিল, 'কারও কাছে মুখ খুলেছ কি যিশুর দিবি। পুন করে ফেলব বুঝেছ?'

কুচকাওয়াজের সময় গ্রিগোরির ঐটেকোটের একটা বোতাম হেঁড়া দেখে টুপ-অফিসার জিজ্ঞেস করল, 'কার সঙ্গে মারপিট বেধেছিল, শুনি? এ আবার কোন নতুন ঢং?'

গ্রিগোরি নীচের দিকে তাকিয়ে দেখল বনাতের ওপর হেঁড়া বোতামের

জায়গায় একটা গোল ফুটো ঘটনার স্মৃতি মনে আগতে সে এমন আঘাত পেল যে বহুকাল পরে এই প্রথম সে প্রায় কঁদে ফেলল।

## ডিন

স্টেপ তৃণভূমির বুকে পীতাম্ব রোদের প্রখর তাপ জড়িয়ে পড়েছে ক্ষেতের পাকা গম এখনও কাটা হয় নি। সোনালি ক্ষেতের ঢেউগুলো থেকে উড়ছে ধোঁয়া ধোঁয়া হলুদ ধুলো। ফসলকাটা কলের লোহার অংশগুলো এত গরম যে হাত দিয়ে ছোঁয়া যায় না আকাশের নীলচে-হলুদ রঙের চাঁমোয়াটা ভেত্রে এমন গনগনে হয়ে উঠেছে যে মাথা তুলে ওপরের দিকে তাকানো যায় না গমের ক্ষেত যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে বুনো শূটিক্কাভীষ গাছে জাফবানি ফুলের সমারোহ

এখন রাই কাটার সময়। গোটা গ্রামটা উঠে এসেছে স্তেপে ফসলকাটা কলে জুতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঘোড়াগুলোকে হসরান কবে ফেলেছে, ঝাঁঝালো ধুলোর গুমোটে, গরমে সকলের দম আটকে আসছে, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে দনের বুক থেকে ক্ষণে ক্ষণে বায়ুতরঙ্গ ভেসে এসে ধুলোর চাদরের খাঙ্কটা নাড়া দিচ্ছে একটা মর্দাটিকার মতো অবগুণ্ঠনজালে ঢেকে দিচ্ছে ছুঁ-ফোটানো সূর্যটাকে।

পেত্রো ফসলকাটার কল থেকে ফসল ঝেড়ে বার করছে। সকাল থেকে সে বালতিখানেক জল বেয়ে ফেলেছে। গরম, বিশ্বাস জল, খাবার মিনিটখানেকের মধ্যে আবার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায় তার শাট আর প্যান্ট ভিজ্ঞে জবজব করছে, মুখ বেয়ে ঘাম করছে। একটা অবিরাম গুনগুন শব্দে কানের ভেতরটা ভৌ ভৌ করছে, গলাব ভেতরে যেন ডেলা আটকে রয়েছে - মুখে কোন কথা বেরোচ্ছে না দারিয়া মাথার বুঝলে মুখ জড়িয়ে নিয়েছে, তার ওপরের জামার বোতাম খোলা ফসল আঁচি করে বাঁধছে সে। তার বোদে তেত্রে-ওঠা তামাটে স্তনযুগলের মাঝখানের নাবালে দানার মতো বিন্দু বিন্দু ধূসর ঘাম জমে উঠছে ফসলকাটা কলের সঙ্গে জোতা ঘোড়াদুটোকে চালাচ্ছে নাভালিয়া তার গালদুটো রোদে পুড়ে বীটের মতো লালচে হয়ে উঠেছে, রোদের তাপে চোখে জল ভরে উঠছে। পাশ্বেলেই প্রকোফিয়েভিচ কাটা ফসলের সারিগুলোর ওপর দিয়ে হাঁটছে, দেখে মনে হচ্ছে যেন এইমাত্র নেয়ে উঠল। ঘামে ভেজা জামাটা শুকানোর অবকাশ পাচ্ছে না, গায়ে ছালা ধরিয়ে দিচ্ছে। দাড়ি ত নয় তার মুখ থেকে যেন বুকের ওপর গলে গলে গড়িয়ে পড়ছে গাড়ির চাকার কালো তেলকালি।

'যেমে একেবারে সেয়ে উঠেছ যে প্রকোফিচ!' পাশ দিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে যেতে যেতে প্রিন্সোনিয়া চিৎকার করে বলল।

‘হ্যাঁ, ভিক্ষে সপসপে।’ প্রকোফিয়েভিচ হাল ছেড়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে হাত নাড়ল, তারপর পেটের ওপর যেখানটা ভিক্ষে উঠেছিল গায়ের জামার খুঁট দিয়ে সেই জায়গাটা মুছে ফেলে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে চলল

‘পেত্রো, দারিয়া চোঁচিয়ে বলল, ‘ওঃ আর পারি নে এবারে শেষ কর।’

‘দাঁড়াও, এই খেপটা শেষ করে নিই ’

‘রোসের ডাপটা যতক্ষণ না কয়ে ততক্ষণ অপেক্ষা করি আমি কিন্তু ছেড়ে দিচ্ছি।’

নাতালিয়া ঘোড়াদুটোকে খামিয়ে দিল। সে এমন ভাবে হাঁপাতে লাগল যে ঘোড়ার বদলে সে নিজেই বুঝি কাটির কল টানছিল। কাটা ফসলের ওপর বীড়ে বীড়ে পা ফেলে ফেলে দারিয়া সেই দিকে এগিয়ে গেল। বুটের ঘষা লেগে তার পা ছুড়ে গেছে, কালো হয়ে গেছে

‘ওগো, এখন থেকে পুকুরটা খুব একটা দূরে হবে না বোধহয়।’

‘কুঃ, দূর নয় আবার এক কেশ মতন হবে ’

‘চান করতে পারলে বেশ হত।’

‘ওখানে ছোট গিয়ে ফিরতে ফিরতেই ত নাতালিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

‘হাঁটতে যাব কোন দূরত্বে? ঘোড়া খুলে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে চেপেই ত যেতে পারি ’

পাছলেই প্রকোফিয়েভিচ একটা আঁটি বাঁধছিল পেত্রো ভয়ে ভয়ে বাপের দিকে একবার তাকাল, তারপর হাত বাঁকিয়ে বলল, ‘যাও তাহলে ঘোড়াদুটো খুলেই ফেল গে ’

দারিয়া দড়িদড়া খুলে ফেলে বেগবোয়া ভঙ্গিতে লাফিয়ে উঠে বসল মাদী ঘোড়াটার পিঠে নাতালিয়া ফাটা ঠোঁটদুটো সজ্জিত করে মুখে ঈষৎ হাসি ফুটিয়ে তুলে ঘোড়াটাকে ফসলকাটা কলের কাছে টেনে এনে কলে বসার আসনের ওপর পা রেখে ঘোড়ার পিঠে ওঠার চেষ্টা করল।

‘দাও এই পাটা আমি তুলে দিচ্ছি,’ এই বলে পেত্রো তাকে উঠতে সাহায্য করল।

ওরা চলল, দারিয়া বসেছে নখ হাঁটুর ওপর ঘাঘরা গুটিয়ে, তার মাথার ওড়নাটা খসে পড়েছে পেছন দিকে। সে চলেছে আগে আগে ঘোড়ার পিঠে বসেছে কসাক কায়দায় পেত্রো শেষ পর্যন্ত সামলাতে না পেরে চোঁচিয়ে বলল, ‘দেখো ঘষা লেগে পা যেন ছুড়ে না যায়।’

‘বয়েই গেল ’ দারিয়া তার কথায় কোন আমল না দিয়ে হাত ঝুড়ে বলল।

ওরা যখন ছোট রাস্তাটা পেরিয়েছে, এমন সময় বাঁ দিকে তাকাতে পেত্রো দেখতে পেল দূরে সদর রাস্তার ধূসর বুক বয়ে গ্রামের দিক থেকে দ্রুত এগিয়ে আসছে একটা ধুলোর ঘূর্ণিঝাল

‘কে যেন ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে’ পেত্রো চোখ কৌচকল

‘বেশ জোরে ছোঁটাচ্ছে ওঃ কী ধুনো উড়ছে দেখ’ নাতালিয়া অবাক হয়ে বলল

‘কী ব্যাণার গো? আঁ?’ দারিয়া আগে আগে ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছে দেখে তাকে চিৎকার করে ডেকে পেত্রো বলল, ‘দাঁড়াও একটু দেখে নি কে ওটা’

ধুলোর মেঘটা একটা নাবালের ভেতরে পড়ে গেল, সেখান থেকে যখন উঠে এলো তখন তাকে দেখতে হল একটা শিপড়ের সমান

দেখতে দেখতে ধুলোর মেঘের ভেতর থেকে ফুটে উঠতে থাকে ঘোড়সওয়ারের মূর্তিটা। মিনিট পাঁচেক বাদে স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয় পেত্রো ক্ষেতে কাজ করার টোকার কানায় নোংরা হাতটা ঠেকিয়ে নিরীক্ষণ করতে থাকে

‘পড়িমরি করে ছুটছে যে এ ভাবে ছুটলে ঘোড়াটার মফা রফা হতে আর বেশি দেবি নেই।’

ভুবু কুঁচকে সে টুপি়র কান্না থেকে হাত নামাল একটা হতভম্ব ভাব তার মুখের ওপর দিয়ে বেলে গিয়ে ওপরে তোলা দুই ভুয়র মাঝখানের খাঁজে আটকে রইল।

এবারে বেশ স্পষ্ট দেখা গেল ঘোড়সওয়ারকে। বাঁ হাতে টুপি ধরে জোঁর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে সে। তার ডান হাতে সামান্য পত্ পত্ করে উড়ছে একটা ধুলোমাঝা ছোট্ট লাল পতাকা

পেত্রো সবে ঘোড়া ছুটিয়ে সদর রাস্তা থেকে নেমে এসেছে এমন সময় লোকটা তার এত কাছ ঘেঁষে ছুটে গেল যে ঘোড়াটার ফুসফুস ডেরে তপ্ত বাতাস টেনে নেওয়ার চাপা ঘডঘড আওয়াজ পেত্রোর কানে এসে বাজল। পাশ দিয়ে যেতে লোকটা ধূসর পাথরের চাঁইয়ের মতো চারকোনা হাঁ করে দাঁত বার করে ঠেঁচিয়ে বলল

‘ইশিয়ার সামনে বিপদ।’

ধুলোমাটির বৃক্বে ওপর লোকটার ঘোড়ার খুরের চাপে তৈরি গর্তের মধ্যে উড়ে এসে পড়ল এক দলা হলদেটে ফেনা পেত্রো দৃষ্টি দিয়ে ঘোড়সওয়ারকে অনুসরণ করল পেত্রোর স্মৃতিতে চিরকালের জন্য গাঁথা হয়ে বইল অবসন্নপ্রায় ঘোড়াটার ভাবী নিখাসের ফৌস ফৌস আওয়াজ আব ইম্পাতের মতো চকচকে, ঘামে ভেজা তার পেছনটা। যেটুকু সে দেখতে পেয়েছিল অপসূরমাণ মূর্তিটার দিকে ফিরে তাকাতো।

যে দুর্ভাগ্য নেমে এলো তার স্বরূপ যে কী সেটা তখন পর্যন্ত সম্যক উপলব্ধি করতে না পেরে পেত্রো ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল ধুলোর ওপর ছিটকে পড়ে তিরতির করে কাঁপছে ফেনার টুকরোটা, তারপর চোখ ফেরাল গ্রামের দিকে, যেখানে ঢালু হয়ে গড়িয়ে নেমে গেছে তরঙ্গায়িত স্তম্ভভূমি, ফসল

কাটার পর মাঠের বুকে সোনালি রঙের খোঁচা খোঁচা গোড়াগুলি লেগে রয়েছে, তারই ওপর দিয়ে চারপাশ থেকে কসাকরা ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে গ্রামের দিকে স্তম্ভেব সর্বত্র, আবছা হলুদের ধোঁয়ায় ঢাকা দূরের সেই যে টিলাটা চোখে পড়ে কি পড়ে না, সেখানে পর্যন্ত ঘোড়ার খুরে খুরে ধুলি উড়ছে। আর যেখানে ঘোড়সওয়াররা সদর রাস্তায় এসে পড়ে দম্ভল বোধে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে সেখান থেকে গ্রাম পর্যন্ত সোজা চলে গেছে এক দীর্ঘ ধূসর ধুলিরেখা মিলিটারী সার্ভিসে নাম-লেখানো প্রত্যেকটি কসাক মাঠের কাজ ছেড়েছুড়ে ফসলকাটার কল থেকে ঘোড়া ছাড়িয়ে নিয়ে উর্ধ্ব্বাসে ছুটিয়ে চলল গ্রামের দিকে পেত্রো দেবতে পেল খ্রিস্তোনিয়া তার গার্ডবাহিনীর ঘোড়াটাকে গাড়ির জোয়াল থেকে খুলে নিয়ে লম্বা লম্বা দুই ঠাণ্ড ছড়িয়ে ঘোড়াব পিঠে চড়ে বসে পিছন ফিরে পেত্রোর দিকে তাকাতে তাকাতে পুরোদমে ছুটিয়ে দিয়েছে সৈটাকে

এ কী ব্যাপার? ভয়াভ চোখে পেত্রোর দিকে তাকিয়ে নাতালিয়া আর্দনাদ কবে উঠল নাতালিয়ার সেই দৃষ্টি শিকারীর লক্ষ্যের সামনে খরগোশের দৃষ্টি পেত্রোর সংবিত্ত কিরিয়ে দিল

স্কেভের চালার দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল সে। ঘোড়াটা থামার আগেই তার পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়ল পুরোদমে কাজ চলতে থাকায় সালোয়ারটা সে খুলে রেখেছিল এখন চটপট সৈটা পরে নিয়ে বাপের উদ্দেশ্যে হাত নাড়াতে নাড়াতে মিলিয়ে গেল একটা ধুলোর মেঘের আড়ালে বৌদ্ধদম্ভ স্তম্ভের বুকে ততক্ষণে ধিকিধিকি জ্বলে উঠেছে রাশি রাশি ধূসর ফুটকির এক বন্যাস্রোত

## চার

বারোয়ারিতলায় ধূসর ঘন হয়ে লোকজনের ভিড় জমছে সারিগুলোর মধ্যে চোখে পড়ছে কসাকদের নানা সাজসরঞ্জাম, ঘোড়া, উর্দি আব বিভিন্ন রেজিমেন্টের চিহ্নসূচক নানা বকমের কাঁধপাট সাধারণ রেজিমেন্টের কসাকদের চেয়ে একমাথা উর্টু আতামান বন্দিদের সৈন্যরা হালকা নীল রঙের টুপি মাথায় দিয়ে গৃহস্থের পোষা হাঁসমুরগীদের মাঝখানে বুনো রাজহাঁসের মতো পায়েচাষি করে বেড়াচ্ছে

সবাইখানা বন্ধ। মিলিটারী পুলিশ অফিসার বিষয়, তাকে উদ্ভিন্ন দেখাচ্ছে রাস্তার ধারে বেড়াগুলোর পাশে গ্রামের বৌকিরা সব দাঁড়িয়ে আছে পরবের জামাকাপড় পরে। পাঁচমিশালী জনতার সকলের মুখেই এক কথা যুদ্ধের যোগাড়যন্ত্র চলছে। মদের নেশাধরা উত্তেজিত সব মুখ ঘোড়াগুলোর মধ্যেও উদ্বেগ সঞ্চারিত হয়েছে মারামারি কাতর চিংকার ক্রুদ্ধ চিহ্নিহি ডাক। বারোয়ারিতলায়

গড়াগড়ি যাচ্ছে ভোদকার খালি বোতল, শস্তা দামের মিঠাইয়ের মোড়ক, মাথার ওপর নীচু হয়ে ঝুলছে ধূলিজাল

পেত্রো তার জিন-চাপানো ঘোড়াটাকে মুখের সামনের বাস ধরে টেনে নিয়ে চলেছে। একটা বেড়ার ধারে দশাসই চেহারার এক কালো-চুল আতামান রক্ষী সৈনিক ঝকঝকে সাদা দীত বার করে যদু হাসতে হাসতে পরনের বিশাল চওড়া নীল সালায়্যারের বোতাম আঁটছে, তার পাশে বৈটেখাটো গড়নের এক কসাক স্ত্রীলোক ভাব স্ত্রী কিংবা প্রেমিকা একটা ছাইরঙা তিতিরপাখির মতো কিচিমিচির করে কী সব বলে যাচ্ছে

ওই খানকী মাগীর সঙ্গে ফটিনটি করার মজা আমি টের পাওয়ার। ব্যাটা মেরে ভূত ছাড়াব কসাক-স্ত্রীলোকটি দিবি্য করে বলছিল

মদের নেশা তাকে ধরেছে, আলুথালু চুলের ভেতরে সূর্যমুখী বীচির খোসা লেগে আছে, গায়ের চিত্রবিচিত্র ছোট শালটার দুই প্রান্ত স্থলিত হয়ে দু'দিকে ঝুলে পড়েছে আতামান রক্ষিদলের সৈনিকটি কোমরবন্ধনী কষে বাঁধতে গিয়ে হাসতে হাসতে উবু হয়ে বসার ভঙ্গিতে পাদুটো এমন ভাবে ফাঁক করল যে তরঙ্গিত সালায়্যারের তলা দিয়ে একটা এক বছরের খাড়ি বাছুর অবলীলাক্রমে গলে যেতে পারে।

‘ওসব ছাড়ান দাও দেখি মাশকা।’

‘খালি কুকুরের মতো ছৌকছৌক মেয়েবাজ আর কাকে বলে

‘বেশ ত ভাবপর?’

চোখের পরদা বলে কিছু নেই। বেহায়া।’

এদিকে ওদের পাশে বাদামী দাড়ির ফ্রেমে মুখ বাঁধানো এক সার্জেন্ট-মেজর এক গোলন্দাজের সঙ্গে তর্ক করে চলছে

‘কিছুই হবে না এক আধদিনের ব্যাপার তারপর আমরা ঘরের ছেলে আবার ঘরে ফিরে আসব।’

‘কিন্তু ধর যদি লড়াই বেধে যায়?’

‘শুৎ, কী যে বল দুনিয়ায় কার এমন হিম্মৎ আছে যে আমাদের সামনে দাঁড়াতে পারে?’

পাশে কিছু কিছু অসংলগ্ন ভাসা-ভাসা কথাবার্তা চলছে বরফগোছের একজন সুপুরুষ কসাক রাগে উত্তেজিত হয়ে বলেছে

ওদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা কী? ওরা লড়াই করতে চায় কনুক, কিন্তু আমাদের ফসল এখন পর্যন্ত তোলা হল না যে।’

‘কী বিপদ দেখ দেখি দুনিয়াসুস্থ সবাইকে নিয়ে জুড় করেছে এদিকে এমন

একটা দিন, যখন সারা বছরের খাবার মতো ফসল ঘরে তোলা যেত।’

‘আটিগুলো সব গোবুবাছুরে নষ্ট করবে

‘আমরা এই সবে যব কাটতে শুরু করেছিলাম।’

‘তাহলে বলছ অস্থিগায় জারকে খতম করে দিয়েছে?’

‘তার ওয়ারিশকে’

‘তুমি কোন রেজিমেন্টে আছ ভাই?’

‘আরে বন্ধু, তোমার হল কী ছাই? সাপের পাঁচ পা দেখেছ নাকি?’

‘আরে এ যে ক্ষেত্রকা দেখছি কোথেকে এলি বাপ?’

‘আত্মমান ত বলছিল যদি কোন বিপদ আপদ ঘটে এই জন্যে নাকি আগে থেকে আমাদের এনে জড় করেছে।’

‘সামান, কসাক-ভাইরা!’

‘আর একটা বছর কাটিয়ে দিতে পারলেই তৃতীয় দফার রিজার্ভের দল থেকে বেরিয়ে যেতে পারতাম’

‘তুমি দাদু এখানে কেন? তোমার চাকরীর মেয়াদ এখনও শেষ হয় নি নাকি?’

‘একবার লোকজনকে ধরে কচুকাটা করতে শুরু করুক না তারপর বুড়োদেরও পালা আসবে’

‘মদের দোকান বন্ধ করে দিয়েছে।’

‘যত সব বাচাল আমাদের মার্কুতকার কাছে চাইলে একুনি গোটা পিপে কিনতে পারা যায়।’

সামরিক কমিশন ইন্সপেকশন শুরু করে দিল তিনজন কসাক এক মদে-চুর বক্তৃতা কসাককে কাজরিঘবে ধরে নিয়ে এলো। লোকটা পেছন দিকে হেলে পড়ে নিজের গায়ের জামা ছিড়তে লাগল, কালমিক ছীচের খুদে খুদে চোখদুটো পাকিয়ে গরগর করতে করতে বলল

‘চাষাগুলোর সব ক’টার ঝ-র-স্ত চাই দন-কসাককে চেনো নি এখনও’

চারপাশের লোকজন সরে দাঁড়াল, তাকে সাম দিয়ে মুচকি হাসল, সমবেদনার সুরে বলল, ‘ঠিক কথা, এক হাত নিয়ে নাও ওদের’

ওকে গ্রহণ করে বাঁধা হয়েছে কেন?’

‘একজন চাবাকে মেরে তুলোধুনো করেছে, তাই।’

‘ওদেব অমনই হওয়া উচিত’

‘আমরা ওদের আরও বেশ কিছু লাগাব’

উনিশ শ’ পাঁচ সালে ওদের ঠাণ্ডা করার সময় যে দলটা পাঠানো হয়েছিল আমি, ভাই, তার মধ্যে ছিলাম ওঃ সে যা মজার কাণ্ড’

‘লড়াই বাধলে আবার আমাদের পাঠাবে ঠাণ্ডা করার কাজে।’

‘যেতে আমাদের বয়েই গেছে বাইরে থেকে লোক ভাড়া নিক না। পুলিশ পাঠাক ওসব আমাদের কাজ নয় বাপু।’

মোখভের দোকানের সামনে লোকের ভিড় ঠেলাঠেলি গুতোগুতি চলছে ইভান তোমিলিন মদের ঘোরে মালিকদের সঙ্গে ঝগড়া লাগিয়ে দিয়েছে বোদ সেগেই প্রাতোনভিচ দু’হাত ছড়িয়ে তাকে আটকে রেখে বোঝানোর চেষ্টা করছে, তার অংশীদার ‘তসাতসা’ নামে পরিচিত ইয়েমেলিয়ান কনস্তানভিনভিচ আতিওপিন একপা দু’পা করে দরজার দিকে পিছু হটছে।

‘এতসব কী বেপার?’ তসতি বলতে গেলেন কি এ যে আইন-হসিংখলা ভাঙা এই তসোকরা, এক তসুটে যা ত রে বাবা, মোড়লকে ডেকে আন।’

সেগেই প্রাতোনভিচ ডুবু কঁচকিয়ে ছিল তোমিলিন সালামারের গায়ে ঘরান্ড হাতের চোটো মুছতে মুছতে বুক চিত্তিয়ে এগিয়ে গেল তার দিকে

‘শালা শূয়োরের বাচ্চা বড় লিবিয়ে নিয়ে তাই দিয়ে শুষে খাচ্ছিস, আর এখন কিনা মিনমিন করা হচ্ছে। হুঁ হুঁ আমার কাছ থেকে আদায় করার চেষ্টা করে দাখ না দেব না বদন বিগড়ে। আমাদের কসাকদের সমস্ত ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিস পাজীর পা ঝাড়া হারামজানা।’

গ্রামের মোড়লের চারপাশে ইতিমধ্যে ভিড় করে এসে জুটেছে যত কসাক মোড়ল তাদের কানে মধু বর্ষণ করে চলেছে

‘যুদ্ধ? না না, যুদ্ধটুকু হবে না। মিলিটারী পুলিশের কস্তামশাই বলেছেন এটা শুধু অমানি লোক-দেখানোর জন্যে নিশ্চিন্ত থাকতে পার তোমরা

‘সে হলে ত ভালোই ঘরে ফিরেই আবার মাঠে নামব।’

‘হ্যাঁ, কাজটা ত পড়ে রইল।’

‘আচ্ছা, যদি কিছু মনে না কর একটা কথা জিজ্ঞেস করি ওপবওয়ালারা কী ভেবেছে বল দেখি? আমার যে আটশ বিঘারও ওপরে চাষের জমি।’

‘তিমোশ্কা আমাদের লোকজনকে বলে রাখিস কাল ফিরছি।’

‘আচ্ছা হুই যে লুটিশটা দেখা যাচ্ছে ওটা পড়ে দেখলে হয় না? ওরে চল চল পড়ে দেখা যাক।’

অনেক রাত পর্যন্ত গমগম করতে লাগল বারোয়ারীতলা।

\* \* \*

চারদিন পরে লালরঙের মালগাড়ির ওয়াগনে চাপিয়ে কসাকদের রেজিমেন্ট আর ব্যাটারীগুলোকে নিয়ে যাওয়া হল বুশ-অস্ত্রিয়া সীমান্তের দিকে



যুদ্ধ !

ওয়াশনের পিজরাগুলোর ভেতর থেকে ভেসে আসছে ঘোড়াগুলোর ফৌসফৌসানি আর ঘোড়ার নাদের বাঁঝাল গন্ধ। গাড়ির ভেতরে বাছের ওপর শুয়ে আছে লোকজন - সেখান থেকে ভেসে আসছে একই রকমের টুকরো টুকরো কথাবার্তা আর গান বেশির ভাগ সময়ই এই গানটা

উঠছে ফুসে টপবগিয়ে,  
ধর্মভীরু শান্ত দন  
রাজার আদেশ মাথায় নিয়ে  
ষাডবে আগে, এমন পণ

স্টেশানে স্টেশানে কসাকদের সালোয়ারের দু'পাশে সেনাই-করা চওড়া লাল ডোরার ওপর লোকজন সসজ্জমে কৌতূহলী চোখের দৃষ্টি বুলায়। মাঠের কাজ কবে কবে ওদের মুখের ওপর যে গাঢ় তামাটে ছোপ পড়েছিল তা এখনও মুছে যায় নি যুদ্ধ !

পত্রপত্রিকায় প্রচণ্ড হাঁকডাক, সোরগোল।

প্রতিটি স্টেশানে মেয়েরা হাসিমুখে কসাক সৈন্যদলে বোঝাই গাড়িটার উদ্দেশে মাথার ওড়না খুলে নাড়তে থাকে, সিগারেট আর মিঠাই ছুঁড়ে দেয় ওদের দিকে। একটা কামরার মধ্যে আরও তিরিশজন কসাকের সঙ্গে পেরো মেলেবডও গুমোট গরমে সেক্ষ হচ্ছিল। কেবল ডরোনেজে গাড়িটা আসার পরই ঈষৎ পানোদ্রুত একজন বুড়োমতন রেলের লোক ওদের কামরার ভেতরে উঁকি মেরে সব নাকটা গদিক গদিক নাড়িয়ে নিশ্বাস নিতে নিতে জিজ্ঞেস করল, 'চলেছে বুঝি বাবারা ?'

'উঠে পড় দাদু, আমাদের সঙ্গে এসে বোস সকলের হয়ে ওদের মধ্য থেকে একজন উত্তরে বলল

'আহা রে গোবুর মাংস চলেছে বোঝাই হয়ে ' যেন ওদের তিরস্কার করেই অনেকক্ষণ ধবে ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লোকটা মাথা নাড়তে লাগল।



জুনের শেষাংশে গ্রিগোরিদের রেজিমেন্টের সাময়িক মহড়া শুরু হয়ে গেল ডিভিশনের সময় দপ্তরের নির্দেশে ওরা মাট করে পৌঁছল রোভনো শহরে। শহরের উপকণ্ঠে তখন দুটো পদাতিক ডিভিশন এবং ঘোড়সওয়ারদের কিছু ইউনিট ছোট

ছোট দলে ছড়িয়ে পড়ছে। চার নম্বর স্কোয়াড্রনটাকে বাঁটি গেড়ে ভূলাদিয়াভকা গ্রামে বেধে দেওয়া হল

সপ্তাহ দুয়েক বাদে, দীর্ঘ সামরিক মহড়ার পর স্কোয়াড্রনটা নাকাল হয়ে যখন জাবরন নামে মফস্বল শহরে আস্তানা নিয়েছে, সেই সময় রেজিমেন্টের সদর দপ্তর থেকে ঘোড়া হাঁকিয়ে সেখানে এলো স্কোয়াড্রন-কম্যান্ডার, সার্জেন্ট-মেজর পলকোভ-নিকোভ গ্রিগোরি তার টুপের আর সব কসাকদের সঙ্গে ছাউনিতে গড়িয়ে নিচ্ছিল। সে দেখতে পান্ছিল ফিতের মতো সবু রাস্তাটা ধরে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে স্কোয়াড্রন-কম্যান্ডার, ঘোড়াটার গা থেকে ফেনা বরছে

উঠানে কসাকদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল।

‘আবারও মহড়ায় নামতে হবে নাকি?’ প্রোধের জিকত সন্দেহ প্রকাশ করল, কী বলে শোনার জন্য কান পেতে রইল।

টুপ-সার্জেন্ট টুপির আস্তরের ভেতরে ঝুঁচটা গুঁজে রাখল (সালোয়ারটা ছিঁড়ে যাওয়ায় সে তখন রিবু করছিল),

‘নির্ঘাত মহড়া

‘হারামজাদাদের জ্বালায় একটু জিরোনোরও উপায় নেই।’

সার্জেন্ট-মেজর বলেছিল গ্রিগেড-কম্যান্ডার নাকি আসবে।’

এমন সময় ‘ভ্যা-পো-পো’ শব্দে বিউগল বাজিয়ে বিপদ সংকেত জানানো হল

সঙ্গে সঙ্গে কসাকরা লাফিয়ে উঠল।

‘আরে আমার ডামাকের ঝটুরাটা গেল কোথায়?’ প্রোধের হনো হয়ে ঝুঁজতে ঝুঁজতে বলল

‘জিন চাপাও।’

‘চুলোয় যাক তোমার ডামাকের ঝটুরা।’ ছুটে বেরিয়ে যেতে যেতে চেষ্টায়ে বলল গ্রিগোরি

ছুড়মুড় করে উঠানে এসে ঢুকল সার্জেন্ট-মেজর। কোমরে বাঁধা তলোয়ারটা হাত দিয়ে চেপে ধরে সামলাতে সামলাতে গটগট করে এগিয়ে গেল ঝুঁটিতে বাঁধা ঘোড়াগুলোর দিকে। নিয়মমাফিক সময়ের মধ্যে ঘোড়াগুলোর পিঠে জিন চাপানো হয়ে গেল গ্রিগোরি তাঁবুর ঝুঁটিগুলো ওপড়াচ্ছিল। ঠিক তখনই টুপ সার্জেন্ট ফিসফিস করে তাকে বলল

‘লড়াই শুরু হয়ে গেল হে ছোকরা।’

‘পুল দিচ্ছ?’

‘মাইরি, ভগবানের দিবি। সার্জেন্ট-মেজর নিজে বলেছে।’

তাঁবু তুলে নিয়ে স্কোয়াড্রনের সকলে রাস্তায় সার বৈধে দাঁড়াল।

স্কোয়াড্রন-কমান্ডার উত্তেজিত ঘোড়ার পিঠে চড়ে সৈন্যদের সারির সামনে ঘুরপাক খেতে লাগল

‘টুপে টুপে সার বাঁধ! সারিগুলোর মাথার ওপর ভেসে উঠল তার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর

ঘোড়ার খুরে খুরে খটখট আওয়াজ উঠল স্কোয়াড্রনটা ছাউনির জায়গা ছেড়ে দুলকি চালে ঘোড়া চলাচলের সান্তার ওপর গিয়ে উঠল। কুস্তেন গ্রাম থেকে এক নম্বর এবং পাঁচ নম্বর স্কোয়াড্রনও কখনও দ্রুত, কখনও বা মাঝারি চালে ঘোড়া ছুটিয়ে চলল ছোট রেল স্টেশনটার দিকে

একদিন পরে অস্ট্রিয়ার সীমান্তের বাগো ক্রোশ এদিকে ভেরবা স্টেশনে আসার পর রেক্সিমেন্ট ট্রেন থেকে নামল। স্টেশনের কাছে বার্চগাছগুলোর পেছনে তখন প্রভাতের আভাস দেখা দিয়েছে সুন্দর একটা সকালের প্রতিভূতি পাওয়া যাচ্ছে একটা রেল ইঞ্জিন ঘর্ষর শব্দে পাশ দিয়ে চলে গেল সাইডিং-এ একটা শাফিং ইঞ্জিন হুসহুস করতে করতে সামনে-পেছনে চলছে। শিশির-ভেজা রেললাইনগুলো চকচক করছে, ঘন পালিশ লাগানো হয়েছে নাক দিয়ে ঘড়ঘড় আওয়াজ করতে করতে কাঠের পাটাতন বরে গাড়ির ভ্যান থেকে নেমে আসছে ঘোড়াগুলো। জলের পাশ্শঘরের ওপাশ থেকে শোনা যাচ্ছে নানা কণ্ঠের ডাকাডাকি, ভারী গলাব নানা সামরিক নির্দেশ। চার নম্বর স্কোয়াড্রনের কমান্ডার তাদের ঘোড়াগুলোকে সেন্ডেল-ক্রসিং-এর ওধারে নিয়ে চলল বেগনী রঙের খুরখুরে অঙ্গকারের মধ্যে কণ্ঠস্বরগুলো কেমন যেন জড়িয়ে জড়িয়ে ভেসে আসছে লোকজনের মুখ অস্পষ্ট নীল-নীল দেখাচ্ছে, অঙ্গকারের বৃকে মিলিয়ে যাচ্ছে ঘোড়াগুলোর দেহরেখা

‘কোন স্কোয়াড্রন?’

‘তুমি আবার কোথাকার কে এলে হে?’

‘ডবে রে ইতর্ মজাটা টের পাওয়াচ্ছি অফিসারের সঙ্গে কী ডাবে কথা বলতে হয় জানিস নে?’

‘অপরোধ হয়ে গেছে হুজুর ঠিক চিনতে পারি নি আপনাকে’

‘যাও যাও, এগিয়ে যাও’

‘গা ছেড়ে দিয়ে চলছ যে বড়? দেখছ না ওই ওখানে, একটা রেল-ইঞ্জিন আসছে? চটপট আগে বাড়!’

‘তোমার তিন নম্বর টুপ কোথায় গেল সার্জেন্ট-মেজর?’

‘স্কোয়াড-রন! ঘন হয়ে চল!’

এদিকে সৈন্যদের সারির মধ্যে চাপা ফিসফিস

‘হুং, ঘন হয়ে চলবে না কহু! দু’রাত ঘুম হয় নি।’

‘সিওমুকা, দে ভাই, একটা টান দিই, সেই গতকাল সঙ্গে থেকে একটাও সিগারেট টানি নি।’

‘ঘোড়াটাকে টান বরং

‘টানার দড়িটা চিবিয়ে কেটে ফেলেছে বজ্রাতটা।’

‘আমারটার সামনের একটা পায়ের নাল খুলে গেছে।’

আরেকটা স্কোয়াড্রন রাস্তার মোড় ঘুরতে থাকায় চার নম্বর স্কোয়াড্রনের পথ আটকে গেল

সাদা ধবধবে নীলাভ আকাশের পাটে ঘোড়সওয়ারদের দেহরেখাগুলো স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল যেন ভূষা কালিতে আঁকা ছবি। একে একে সারিতে চারজন করে চলেছে তাদের হাতের বর্শাগুলো ডাঁটার মাথায় পাতাইীন সূর্যমুখী ফুলের মতো দুলছে। মাঝে মাঝে রেকাবের ঝনঝন জিনের কাঁচকোঁচ আওয়াজ উঠছে

‘ও ভাই কোথায় চললে তোমরা?’

‘যম্ব বাপেব কাছে ডাক পড়েছে গো, দীক্ষে নিতে হবে যে।’

‘হা-হা-হা!’

‘চোপ রও! এসব কী কথা?’

প্রোধর ক্রিকড জিনের খাতব কাঠামোটা হাত দিয়ে চেপে ধরে গ্রিগোরির মুখ নিরীক্ষণ করতে করতে কিসকিস করে বলল, ‘আচ্ছা, তোমার ভয় করছে না মেলেকড?’

‘কিসের ভয়?’

‘বাঃ ভয় করবে না? এখনি হয়ত আমাদের লড়াইয়ে নামতে হতে পারে।’

‘হোক না।’

‘আমার কিছু ভয় করছে,’ শিলির-ভেজা পিছলে লাগামটা হাতের আঙুলে অস্থির ভাবে নাড়াচাড়া করতে করতে সে স্বীকার করে ‘কাল সারা রাত গাড়িতে একবারের জন্যেও চোখের দু’পাতা এক করতে পারি নি। কিছুতেই ঘুম এলো না - তা সে মেরেই ফেল আর কেটেই ফেল।’

স্কোয়াড্রনের সামনের দিকটা এবারে নড়েচড়ে উঠল, ধীরে ধীরে এগোতে লাগল তিন নম্বর টুপে গতি সঞ্চারিত হল ঘোড়াগুলো মাপা মাপা পা ফেলে চলল, ঘোড়সওয়ারদের পায়ের কাছে উঁচিয়ে থাকা বর্শার ফলাগুলো শূন্যে দোল খেতে লাগল, হাওয়ায় ভাসতে লাগল

গ্রিগোরি ঘোড়ার লাগাম ছেড়ে দিয়ে বিমুতে শূন্য করে। তার মনে হচ্ছিল স্প্রিংয়ের মতো সামনের দু’পা ফেলে চলতে চলতে ঘোড়াটা জিনের ওপর তাকে দোলাচ্ছে না, সে নিজেই যেন হেঁটে চলেছে কালিমায় ঢাকা এক উষ্ণ পথ

ধরে - কী সহজই না লাগছে তার হাঁটতে. কী আনন্দই না হচ্ছে

প্রোথর ওর কানের কাছে কী যেন বলে চলেছে, কিছু যে চিন্তামূল্য কিছুনি গ্রিগোরিকে এখন আচ্ছন্ন করে রেখেছে তাতে তার কোন ব্যাঘাত ঘটল না. জিনেব মচমচ আর ঘোড়ার বুকের খটখট শব্দের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে প্রোথরের কণ্ঠস্বর।

সকলে চলেছে গ্রামের কাঁচা বাস্তা ধরে নিমন্ত্রিতা যেন ঘুমপাড়ানি গানের মতো কানে এসে বাজে। পথের পাশে ক্ষেতের জই পেকে উঠেছে, শিলিরে ভেজা পাকা ফসলের শিব থেকে ধোঁয়া উঠেছে ঘোড়াগুলো সওয়ারের হাত থেকে হেঁচকা টানে লাগাম খসিয়ে নুয়ে পড়া ফসলের ঝাড়ের দিকে মুখ বাড়িয়ে গ্রিগোরির বিনিম্র চোখের ফোলা পাতার ফাঁক দিয়ে দ্বিধা আলো গড়িয়ে পড়ছে সে মাথা তুলল, আবার শুনতে পেল গোবুর গাড়ির চাকার কাঁচ কাঁচ আওয়াজের মতো প্রোথরের সেই একঘেয়ে কণ্ঠস্বর।

দূরের জই ক্ষেতের ওপর থেকে একটা গম্ভীর গুরু গুরু গর্জনে আচমকা তার ঘোর কেটে গেল

কামান দাগছে প্রোথর প্রায় চিংকার করে উঠল

তার বাছুরের মতো চোখদুটো আতঙ্কে ঘোলাটে হয়ে উঠল গ্রিগোরি মাথা তুলে তাকাল তার সামনে ঘোড়ার পিঠের ওঠা-নামার তালে তালে টুপ-সার্জেন্টের ধূসর গ্রেটকোটটা উঠেছে নামছে একপাশে দেখা যাচ্ছে টুকরো টুকরো ফসলের ক্ষেত ফসল কাটা হয় নি ক্ষেতের মাথার ওপর টেলিগ্রাফের ঝুঁটিসমান উঁচুতে উড়ছে একটা চাতক পাখি। স্কোয়াড্রনটা চঞ্চল হয়ে উঠল. কামানের গর্জন তার ওপর দিয়ে যেন তড়িৎস্পর্শ খেলিয়ে চলে গেল সব অলটার্ণ পল্কোভ্‌নিকভ গোলায় শব্দ কবাহত ঘোড়ার মতো চমকে উঠে স্কোয়াড্রনটাকে জোর কদমে ছুটিয়ে দিল গ্রামের অনেকগুলো কাঁচা বাস্তা যেখানে এসে মিশেছে সেখানে তারা দেখতে পেল একটা পরিত্যক্ত সরাইখানা, এর পর থেকে তাদের চোখে পড়তে লাগল ঘরবাড়ি ছেড়ে গাড়ি করে লোকজন পালানোর দৃশ্য সুন্দর সাজসজ্জা পরে ড্রাগুন সৈন্যদের\* একটা স্কোয়াড্রন পাশ দিয়ে চলে গেল ড্রাগুন সৈন্যদের কোম্পানি-ক্যাপ্টেনের দু'ধারের জলপি বাদামী রঙের বসে আছে একটা লালচে বাদামী রঙের বান্দী ঘোড়ার পিঠে কসাকদের দলটার দিকে একবার বিদ্রূপভরা চোখে তাকিয়ে সে তার পায়ে অস্ত্রতাড়নী দিয়ে ঘোড়ার শেটে খোঁচা মারল কিন্তু দূরে নাবালের মধ্যে জলায় আর পাকে আটকে পড়েছে হাউটসার

\* ড্রাগুন গুরুত্বার বর্ম ও অস্ত্র সজ্জিত অশ্বারোহী সৈনিক - অনুঃ

কামানের একটা ব্যাটারী তোপের গাড়ির চালকেরা ঘোড়াগুলোকে জোর পেঁটাচ্ছে, আর সব গোলন্দাজেরা ব্যস্তসমস্ত হয়ে চাকা ধরে টানাটানি করছে। মুখে বসন্তের দাগ, দশাশই চেহারা একজন গোলন্দাজ দৃষ্টিতে তবু সরাইখানার কাছ থেকে তক্তা বয়ে নিয়ে এলো - খুব সম্ভব সরাইখানার বেড়া ভেঙে আনা হয়েছে তক্তাগুলো।

ওদের স্কোয়াড্রনটা একটা পদাতিক রেজিমেন্টকে ছাড়িয়ে চলে গেল সৈন্যরা দ্রুত মার্চ করে চলেছে, তাদের গ্রেটকোটগুলো গোল করে পাকিয়ে গলায় ঝুলানো সূর্যের আলো তাদের ঝকঝকে মাজা ফৌজী বাসনগুলোর ওপর ঝলমল করছে, ঠিকরে পড়ছে বেয়েনেটের ফলা থেকে শেষ কোম্পানির একজন কর্পোরাল বৈটেখাটো, তবে ডাকাঝুকা গোছের লোকটা - গ্রিগোরির দিকে একতাল কাঁদা ছুঁড়ে নিয়ে বলল, 'এই যে ধর অষ্ট্রিয়ানদের ছুঁড়ে মার

কানার ডেলাটা শূন্যপথেই চানুকের ঘায়ে টুকরো টুকরো করে দিয়ে গ্রিগোরি বলল, 'অমন কাজলামি মেরে কাজ নেই হে ফচকে!'

'ওহে কসাকের পো, আমাদের সেলাম জানিও ওদের।'

'শিগগিরই তোমরা নিজেরাই দেখা পাবে।'

সামনের সারিব সকলে মহা উৎসাহে জোর গলায় একটা লোচ্চা ধরনের গান ধরেছে মেয়েমানুষের মতো দেখতে, স্থূলনিতম্ব একজন সৈন্য উলটো দিকে মুখ করে পায়ের খাটো বুটজুতোর গায়ে তালি বাঁধিয়ে নাচতে নাচতে চলেছে সারিটার পাশে পাশে। অফিসাররা মুখ টিপে হাসছে আসন্ন বিপদের এক ঝলক উগ্র গজ টের পেয়ে তারা যেন আজ সাধারণ সৈন্যদের কাছাকাছি চলে এসেছে, তাদের বেশ প্রস্রাবও দিচ্ছে।

সরাই থেকে গরভিস্কুক গ্রামে যাওয়ার পথে দেখা যেতে লাগল পদাতিক সৈন্যদের ইউনিট, রসদের গাড়ি, সারি সারি কামান আর ফিল্ড হাসপাতালের গাড়ি একের পর এক এগিয়ে চলেছে শূর্যোপোকার মতো আকাশ-বাতাসে আসন্ন যুদ্ধের সারাস্বক নিশ্বাস ছড়িয়ে পড়েছে

বেরেস্তেচকো গ্রামের কাছাকাছি আসতে রেজিমেন্টের কমান্ডার কালেদিন চার নম্বর স্কোয়াড্রনকে ছাড়িয়ে চলে গেল তার পাশাপাশি চলছিল একজন কসাক সেনাপতি ওরা পাশ দিয়ে চলে যাওয়ার সময় কর্ণেলের সুগঠিত মূর্তিটা দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করতে করতে গ্রিগোরি শুনতে পেল কসাক সেনাপতি উত্তেজিত হয়ে কর্ণেলকে বলছে

'এক কোশের ম্যাপে এই ছোট গাঁটা দেখানো হয় নি ভাসিলি মক্সিমভিচ আমরা কিন্তু কেসাদে পড়ে যেতে পারি।'

কর্ণেলের উত্তরটা খ্রিগোরি শুনতে পেল না। একজন এডজুট্যান্ট ঘোড়া ছুটিয়ে তাদের পাশ দিয়ে চলে গেল ঘোড়াটার পেছনের বাঁ পা খোঁড়াছিল। এডজুট্যান্টের ঘোড়াটা যে কতদূর নির্ভরযোগ্য হতে পারে খ্রিগোরি যন্ত্রচালিতের মতো মনে মনে তার একটা হিসাব নেওয়ার চেষ্টা করল।

দূরে, গড়িয়ে নেমে যাওয়া ঢালটার নীচে দেখা গেল গ্রামের ছোট ছোট কুঁড়েঘর বেজিমেন্ট কখনও মাঝারি কখনও বা দ্রুত চলে চলতে লাগল। দেখাই যাচ্ছিল ঘোড়াগুলো বেশ ঘেমে উঠেছে। খ্রিগোরি তার ঘোড়ার ঘাড়ে হাত বুলিয়ে দেখল ঘোড়াটার ঘাড় ঘামে ভিজ্ঞে কালো হয়ে উঠেছে তারপর সে ভালো করে চারধারে চোখ বুলিয়ে নিল। গ্রামের পেছনে সুনীল নভোমণ্ডল ভেদ করে উঠেছে বনভূমির শামল গাছপালা। বনের মাথা চোখে পড়ে। বনের পেছন থেকে কামানের আগুয়াজ ভেসে এলো। এবারে আগুয়াজটা ঘোড়সওয়ারদের কানে তাল ধরিয়ে দিল ঘোড়াগুলো কান খাড়া করল কামানের আগুয়াজের ফাঁকে ফাঁকে রাইফেলের গুলির আগুয়াজও ঘন ঘন হতে লাগল। ফটা গোলায় ধোঁয়া বনের ওধারে দূর আকাশের গায়ে মিলিয়ে যেতে লাগল, রাইফেলের বলকগুলো খানিকটা ডান দিকে কোথায় যেন ভাসতে ভাসতে চলে গেল কখনও স্তব্ধ হয়ে আসে কখনও বেড়ে ওঠে।

খ্রিগোরি প্রতিটি শব্দ উৎকর্ষ হয়ে শুনতে থাকে তার স্নানুগুলোর ওপর ক্রমেই যেন বেশি করে চাপ পড়তে থাকে প্রোখর জ্বিকভ জিনের ওপর বসে উসখুস করতে থাকে, তার বকবকানি আর থামে না।

'গুলিগোলায় শব্দগুলো শূনে দ্যখ খ্রিগোরি মনে হয় যেন ছেলেপুলেরা কক্ষির বেড়ার গায়ে লাঠি পিটুচ্ছে। তাই না?'

ধামলি তুই, বাকবাকীশ।'

স্বেয়াড্রন গ্রামের ভেতরে গিয়ে ঢুকল। বাড়িঘরের উঠোন জুড়ে থিকথিক করছে সৈন্যদল, এদিকে কুটিরগুলোর ভেতরে ছুটোছুটি হুড়োহুড়ি গেরস্থরা ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার উদ্যোগ করছে। সর্বত্র গ্রামের লোকজনের মুখের ওপর নজরে পড়ে বিহ্বলতা ও বিমূঢ়তার ছাপ। ঘোড়া চালিয়ে একটা আঙিনার ওপর দিয়ে যেতে যেতে খ্রিগোবি দেখতে পেল সৈন্যরা একটা চালায় আগুন লাগাচ্ছে, এদিকে তার মালিক - লম্বা, পাকাচুল এক বেলোদুগী - আকস্মিক বিপদে এমনই হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে যে সেদিকে একবারও ফিরে না তাকিয়ে পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে খ্রিগোরি দেখল লোকটার পরিবারের আর সকলে মিলে লাল ওয়াড়-দেয়া বালিশ এবং ভাঙাচোরা আরও সব নানা জিনিস ঝুড়ে ঝুড়ে ফেলে গাড়ি বোঝাই করছে। লোকটা সমস্ত গাড়ির চাকার একটা ভাঙা বেড় বয়ে নিয়ে

চলেছে, সেটা কারও কোন কাজে লাগার কথা নয়। হরত বা গত বছর দশেক হল উঠোনের কোন এক ধারে পড়ে ছিল।

মেয়েরা দামী দামী কাপড়ের জিনিসপত্র বাড়িতে ফেলে রেখে রাজ্যের যত রাস্তাচও হাঁড়ি আর বিগ্রহ বার করে এনে তাই নিয়ে গাড়ি বোকাই করছে। ওদের বুদ্ধির বহর দেখে খিগোরি অবাক হয়ে যায়। পালকের ভ্রাত্যক ফেড়ে কে যেন ভেতরকার পালকগুলো রাস্তায় ফেলে দিয়েছে, এখন সেগুলো রাস্তার ওপর ছড়িয়ে পড়ে তুবার-ঝাড়ের মতো পাক খাচ্ছে চারধারে পোড়া কুলকালি আর বহুকাল চাপা-পড়ে-থাকা জিনিসপত্রের পাচা চিমসে গন্ধ। গ্রাম থেকে বেরোবার পথে এক ইহুদী ছুটতে ছুটতে এসে তাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ল লোকটা হাঁ করে পরিত্রাহি ডাক ছেড়ে চলেছে

‘কোসাক মশাই! কোসাক মশাই! আঃ, হা ভ-গ-বান!’

তার মুখের সবু ফোকরটা দেখে মনে হচ্ছিল যেন তলোয়ার দিয়ে কাটা।

ছোটখাটো গড়নের একজন কসাক, মাথাটা তার গোল, ইহুদীর চোঁচামেটির দিকে কোন আমল না দিয়ে চাবুক দোলাতে দোলাতে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে।

‘থাম’ শুনধর স্কোয়াড্রনের সাব-অলটার্ণ চিৎকার করে বলল তাকে

কসাক তার জিনের কাঠামোর ওপর ঝুঁকে পড়ে ঘোড়াটাকে টুপ করে ঢুকিয়ে দিল একটা গলিব মধ্যে।

‘থাম থাম বলছি হতভাগা কোন্ রেজিমেন্ট?’

কসাকের গোল মাথাটা এবারে ঘোড়ার ঘাড়ের সঙ্গে লেপটে গেল, ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মতো সে তার ঘোড়াকে স্কেনিয়ে তুলে ঝড়ের বেগে ছুটিয়ে দিল। সামনে একটা উঁচু বেড়া পড়তে লাগাম কষে ঘোড়াটাকে পেছনের দু’পায়ে খাড়া করিয়ে কায়দা করে চালিয়ে বেড়া পার হয়ে ওপাশে অদৃশ্য হয়ে গেল

‘এখানে নয় নম্বর রেজিমেন্টের ছাউনি পড়েছে হুজুর ওদের কেউ হবে, সাব-অলটার্ণকে রিপোর্ট করল সার্জেন্ট-মেজর

‘চলোয় যাক।’ সাব-অলটার্ণ ভুরু কোঁচকাল, তারপর ইহুদীটি রেকাব আঁকড়ে ধরতে তার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, ‘ও তোমার কী নিয়েছে?’

‘হুজুর, আমার ঘড়ি আমার ঘড়ি নিয়েছে হুজুর’ অন্য অফিসাররা ততক্ষণে এগিয়ে আসতে ইহুদী তার সুন্দরপানা মুখটা তাদের দিকে ফিরিয়ে খন ঘন চোখ পিঁটিপিঁট করতে লাগল

সাব-অলটার্ণ লাথি দিয়ে পায়ের রেকাব ছাড়িয়ে নিয়ে সামনে এগিয়ে গেল।

‘জার্মানরা এলে অমনিতেই তুমি ওটা খোয়াতে,’ যেতে যেতে গৌফের ফাঁকে মুচকি হেসে সে মন্তব্য করল।



ইহুদী হতভম্ব হয়ে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইল তার মুখের পেশীগুলো থেকে থেকে কাঁপতে লাগল

‘পথ দাও গো ইহুদীমশাই’ কঠিনস্বরে হুক দিয়ে এই কথা বলে স্কোয়াজনের কম্যাণ্ডার ঝট করে চাবুক ওঁচাল।

বেড়ার খুরের ঝট ঝট আর জিনের মচমচ আওয়াজ তুলতে তুলতে চার নম্বর স্কোয়াজনটা তার পাশ দিয়ে চলে গেল পাশ দিয়ে যাবার সময় কসাকরা বিদ্রূপের ভঙ্গিতে হতচকিত ইহুদীর দিকে চোখ টেরিয়ে তাকাতে তাকাতে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল ‘আমাদের জাতটাই ভাই এমন যে হাত সাফাই না করতে পারলে তার সোয়াস্তি নেই’

‘কসাক কি আর কোন মাল হাতছাড়া করতে পারে?’

‘নিক নিক, জিনিস পড়ে থাকতে দেওয়া কোন কাজের কথা না।’

‘ওঃ কী চটপটে! কী চটপটেই না

‘ওঃ একটা শিকারী কুস্তার মতো বেড়ার ওপর দিয়ে কী লাফটাই দিল।’

সার্জেন্ট-মেজর কার্গিন স্কোয়াজন থেকে ঝান্ধকটা পেছনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে হাতের বশীর্টা নীচু করে গর্জে উঠল, পালা বলছি, নইলে বিধিয়ে দেব।’

কসাকদের সারিগুলোর মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে হাসির হুল্লোড় উঠল। ভয়ে ইহুদীর মুখ হাঁ হয়ে গেল সে ছুট দিল। সার্জেন্ট-মেজর তাকে ধাওয়া করে পেছন থেকে সপাং করে চাবুক কষিয়ে দিল। গ্রিগোরি দেখতে পেল লোকটা হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল, করতলে মুখ ঢেকে সার্জেন্ট-মেজরের দিকে ফিরে তাকান তার হাতের সব সব আঙুলের ফাঁক দিয়ে পিচকিরির মতো ধারায় ছিটিয়ে পড়ছে রক্ত

‘কী অপরাধ করেছি আমি?’ ফৌপাতে ফৌপাতে সে টেঁচিয়ে বলল

সার্জেন্ট-মেজরের বাজপাখির মতো হিংস গেল গেল ভাটা-চোখদুটো হাসিতে চকচক করে উঠল সরে যেতে যেতে সে উত্তর দিল ‘যেখানে সেখানে মাথা গলাতে যাবি নে, ব্যাটা মুখ্য’

গ্রামটা ছাড়িয়ে হলুদ রঙের শালুক জাতীয় ফুল আর নলখাগড়ার ঘন জঙ্গলে ঢাকা একটা নাবাল জায়গায় কিছু সাপার একটা চওড়া সেতু তৈরির কাজ শেষ করছে কিছু দূরে একটা মোটরগাড়ি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইঞ্জিনের গুঞ্জন তুলছে আর থরথর করে কাঁপছে। গাড়ির সামনে তার ড্রাইভার ব্যস্তসমস্ত হয়ে ছুটোছুটি করছে পেছনের আসনে অর্ধশায়িত ভঙ্গিতে গা এলিয়ে পড়ে আছে এক মোটাসোটা পাকাচুল জেনারেল। জেনারেলের গালদুটো থলির মতো ঝুলে পড়া, মুখে ফ্রেন্ধকাট দাড়ি বারো নম্বর ব্রেজিমেস্টের কম্যাণ্ডার কর্ণেল কালেদিন আর সাপার-ব্যাটেলিয়নের একজন ইঞ্জিনিয়ার পাশেই টুপিতে হাত ঠেকিয়ে অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে

ম্যাপ-কেসের স্ট্যাপ হাত দিয়ে টানাটানি করতে করতে জেনারেল ক্রুদ্ধ স্বরে ম্যাপার-অফিসারের উদ্দেশ্যে গর্জন করে উঠল। ‘আপনার ওপরে হুকুম ছিল গতকালের মধ্যেই কাজটা শেষ করে ফেলার। চোপ তৈরি করার মালমশলা যাতে ঠিক ঠিক আসে সে ব্যাপারে আরও আগে আপনার মাথা ঘামানো উচিত ছিল। চোপ।’ অফিসারটি ততক্ষণে মুখ বন্ধ করে ফেলেছে, কেবল তার ঠোঁটদুটো ধরতর করে কাঁপছে কিন্তু তা সত্ত্বেও জেনারেল ফের বজ্রহুঙ্কার দিয়ে বলল, ‘এখন আমি ওপারে যাই কী করে? আপনিই বলুন ক্যাপ্টেন কী করে যাই?’

তার বাঁ পাশে বসে ছিল এক কালো-গোঁফওয়ালা যুবক জেনারেল সে যুদু হেসে ফস করে দেশলাই জ্বালিয়ে একটা চুরুট ধরাল। ম্যাপার-ক্যাপ্টেন ঝুঁক পড়ে সেতুর দিকে কী ফেন দেখাল। স্কোয়াড্রনটা পাশ দিয়ে চলে গেল, সেতুর কাছাকাছি এসে নাবালের ভেতরে নেমে গেল। ঘোড়াগুলোর পা হাঁটু ছাড়িয়ে বাদামী-কালো কাদায় ডুবে গেল। এদিকে সেতুর গা থেকে কসাকদের মাথার ওপর পালকের মতো উড়ে উড়ে ছড়িয়ে পড়তে লাগল পাইন কাঠের সামা সামা চীচনি।

দুপুরবেলা তারা সীমান্ত পার হল। ঘোড়াগুলো সীমান্ত ঘাঁটির উপড়ে ফেলা ভোরা-কাটা খুঁটিগুলো লাফিয়ে পার হয়ে গেল। ডান দিক থেকে কামানের গুরু গুরু গর্জন কানে আসতে লাগল। দূরে একটা অস্ট্রিয়ান খামারবাড়ির লাল টালির ছাদ চোখে পড়ে। সূর্য ঝাড়া হয়ে মাটিতে কিরণ ফেলছে। একটা বিস্ত্রী ধুলোর মেঘ সর্বত্র এসে জমছে। রেজিমেন্টের কমান্ডার একটা আগুয়ান টহলদার দল পাঠানোর হুকুম দিল। চার নম্বর স্কোয়াড্রন থেকে টুপ-অফিসার লেফটেন্যান্ট সেমিওনভের অধীনে তিন নম্বর টুপ এই কাজে বেরিয়ে পড়ল। পেছনে ধূসর ধুলোর কুহেলী-অবগুষ্ঠনের নীচে পড়ে রইল কয়েকটা স্কোয়াড্রনে বিভক্ত রেজিমেন্টটা। জনাবিশেক কসাকের একটা ছোট বাহিনী গাড়ির চাকার মাগে ক্ষতবিক্ষত এবড়োখেবড়ো রাস্তার ওপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে খামার-বাড়িটা পার হয়ে চলে গেল।

অফিসার তার টহলদার দলটাকে জেলখানেক এগিয়ে নিয়ে গিয়ে ম্যাপের সঙ্গে নিজেদের পজিশনটা মিলিয়ে দেখার জন্য থামল। কসাকরা তামাক টানার জন্য এক জায়গায় জড় হল। জিনের কবি টিলে করার উদ্দেশ্যে গ্রিগোরি ঘোড়ার শিঠ থেকে নামতে গেল। সার্জেন্ট-মেজরের চোখদুটো সঙ্গে সঙ্গে ঝলকে উঠল। চোখ পাকিয়ে গ্রিগোরির দিকে তাকিয়ে সে চটেচিয়ে বলল

‘তবে রে হাবামজাদা! শিগগির ঘোড়ায় উঠে বোস।’

লেফটেন্যান্ট একটা সিগারেট ধবাল। খাপ থেকে সে দূরবীন বার করেছিল। অনেকক্ষণ ধরে সেটার কাচ মুছল। তাদের সামনে পড়ে আছে মধ্যাহ্নের প্রচণ্ড তাপে দগ্ধ এক সমভূমি। ডান দিকে একসারি দীন্তের মতো মাথা উঁচিয়ে আছে

বনভূমির প্রান্তরেখা তার বুক চিরে তুল ফুটিয়ে চলে গেছে একটা সুন্দর পথরেখা তার আধক্রোশখানেক দূরে চোখে পড়ে ছোট্ট একটা গ্রাম গ্রামের পাশে ঐটেল জমির বুক চিরে বেরিয়ে গেছে একটা ছোট বরজোতা নদীর খাড়া খাত। নদীর জল কাকচকুর মতো স্বচ্ছ, বিন্দু। লেফটেন্যান্ট তার দূরবীন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অনেকক্ষণ ধরে নিঃসাড়, নির্জন রাস্তাঘাটগুলো ভালো করে দেখতে লাগল, কিন্তু গ্রামটা খাঁ খাঁ করছে - ঠিক যেন কবরখানার নিস্তব্ধতা সেখানে। নদীর নীল জলধারা প্রলোভন জাগিয়ে তুলছে, হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

‘করোলিওত্কা বলেই মনে হচ্ছে যেন?’ লেফটেন্যান্ট গ্রামটার দিকে চোখের ইশারা করে বলল

মার্জেন্ট-মেজর কোন উত্তর না দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে তার কাছাকাছি এলো কোন কথা ছাড়াই তার মুখেব ভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠল। যেন বলতে চায়, ‘সে আপনিই ভালো জানেন, আমাদের কাজ ত নগণ্য।’

‘ওখানেই যাওয়া যাক,’ দূরবীন সরিয়ে রেখে অনিশ্চিত ভাবে বলল লেফটেন্যান্ট এমন ভাবে ভুবু কৌটকাল যেন তার দাঁতে ব্যথা হয়েছে

‘আমরা সরাসরি ওদের ঝগরে পড়ে যাব না ত হুজুর?’

‘আমরা খুব সাবধানে যাব। আচ্ছা চলা যাক।’

প্রোখর জিকভ গ্রিগোরির আরও কাছে ঘেঁসে এলো ওদের দু’জনের ঘোড়া পাশাপাশি চলেছে। বেশ ভরে ভরে সকলে একটা জনহীন রাস্তার মধ্যে এসে ঢুকল প্রতিটি জানলা যেন আঘাত হানার জন্য বন্ধপরিবর। যে কোন খোলা দরজার দিকে তাকালেই একটা নিঃসঙ্গতার অনুভূতি মনে জাগে, সঙ্গে সঙ্গে নিরদোষ হয়ে নামতে থাকে একটা অস্বস্তিকর কৌপুনি বেড়া আর নালানর্দমাগুলো চুম্বকের মতো সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে লাগল। তারা এসে ঢুকল একদল হিংস্র শিকারী জন্তুর মতো - ঘেমন ভাবে শীতের নীল হিমেল রাতে গৃহস্থবাড়ির সামনে নেকড়েদের দেখা যায়। কিন্তু পথঘাট জনমানবশূন্য জমাট নিস্তব্ধতায় মাথা ঝিম ঝিম করতে থাকে। একটা বাড়ির হী-করা জানলা দিয়ে দেয়াল ঘড়ির ঘণ্টা বাজার নেহাৎই নির্দোষ আওয়াজ ভেসে এলো, কিন্তু সকলের কানে যেন গুলির আওয়াজের মতো ফেটে পড়ল লেফটেন্যান্ট সবার আগে আগে যাক্জিল। গ্রিগোরি স্পষ্ট দেখতে পেল আওয়াজটা কানে যেতে সে চমকে উঠল, মৃগীরোগীর মতো কৌপতে কৌপতে চেপে ধরল রিভল্ভারের খাপটা।

গ্রামে জনমানবের কোন চিহ্ন নেই টহলদার দলটা ঘোড়ায় চড়েই ছোট নদীটা পার হতে লাগল জল ঘোড়াগুলোর পেটে এসে ঠেকল। তারা মহা উৎসাহে জলে নামল, চলতে চলতে জল খেল সওয়াররা তাদের মুখের লাগাম

টেনে সমানে হৈ-হাই করে তাড়া দিতে লাগল। গ্রিগোরি মথিত জলের দিকে গভীর সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে রইল। এত কাছে, অথচ নাগালের বাইরে দুর্নিবার আকর্ষণে সে জল তাকে কাছে টানতে লাগল। পারলে সে জিন থেকে লাফিয়ে পড়ে, জামাকাপড় না ছেড়েই ফিসফিস ঘুমপাড়ানি জলধারার তলায় গা এলিয়ে পড়ে থাকে, যতক্ষণ না তার ঘামে-ভেজা-বুক আর পিঠ ঠাণ্ডায় জুড়িয়ে গিয়ে শেষকালে ঠকঠক করে কাঁপতে থাকে।

গ্রামের পেছনের একটা টিলার ওপর থেকে দেখা গেল একটা শহর চৌকো আকারের সমস্ত মহল্লা, ইটের দালান কোঠা, মাঝে মাঝে বাগ-বাগিচা আর শোলীয়া ক্যাথলিক গির্জার ঝুঁচাল চূড়া।

লেফটেন্যান্ট টিলার থাবড়া চূড়ার ওপর উঠে গিয়ে দূরবীন চোখে লাগাল।

‘ওই যে এখানে আছে ওরা! বাঁ হাতের আঙুলগুলো নাড়াতে নাড়াতে সে বলল।

প্রথমে সার্জেন্ট-মেজর, তার পেছন পেছন এক এক করে কসাকরা রোসে-পোডা টিলার মাথার ওপর উঠে গিয়ে ভালো করে দেখতে লাগল। এখান থেকে ছোট ছোট দেখাচ্ছে বাস্তবগুলো। বাস্তব কতাবে কতাবে লোকজন, অলিতে-গলিতে গাড়িঘোড়ার অবরোধ, ঘোড়সওয়াররা ইতস্তত ঘোড়া ছুটিয়ে বেড়াচ্ছে। গ্রিগোরি চোখ কুঁচকে হাতের আঙুল দিয়ে দেখতে লাগল, সৈন্যদের উর্দির অপরিচিত ধূসর রঙ পর্যন্ত সে তফস্বত করতে পারল। শহরের কাছেই বাদামী রঙের সদা-বোঁড়া পরিখা। বন্য জন্তুর ডেরার মতো হাঁ করে আছে, সেগুলোর ওপর লোকজন গিজগিজ করছে।

‘ওঃ, কত লোক রে বাবা!’ প্রোখর অবাক হয়ে বলল।

আর সকলে যেন ওই একই উপলব্ধির শব্দ মুঠোর মধ্যে পড়ে চূপ করে রইল। গ্রিগোরির ছত্ৰপিণ্ড ঘন ঘন ওঠা-পড়া করতে লাগল (তার মনে হচ্ছিল বুকের বাঁ পাশে ছোট অথচ ভারী মতন কেউ যেন একই জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুপদাপ করে চলেছে), কান পেতে সেই আওয়াজ শুনতে শুনতে সে স্বপ্নতে পারল সাময়িক মহড়ার সময় ‘শত্রুপক্ষকে’ দেখে যে উপলব্ধি তার হত আজ এই অপরিচিত লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে তার চেয়ে সম্পূর্ণ অন্য ধরনের এক উপলব্ধিতে যেন সে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে।

লেফটেন্যান্ট তার বোঁজী নোটবুকে পেন্সিল দিয়ে কী সব লিখল। সার্জেন্ট-মেজর টিলা থেকে কসাকদের তাড়া দিয়ে নীচে নামাল, তাদের ঘোড়ার পিঠ থেকে নামতে বলল, তারপর লেফটেন্যান্টের কাছে উঠে গেল। লেফটেন্যান্ট কিছুক্ষণ বাবে আঙুল দিয়ে ইশারা করে গ্রিগোরিকে ডাকল।

‘মেনেখভ!’

হুসুর

খ্রিগোরি তার টাটানো পায়ের আড় ভেঙে সহজ হওয়াব চেষ্টা করতে করতে হেঁটে টিলায় গিয়ে উঠল। লেফটেন্যান্ট চার ভাঁজ করা এক টুকরো কাগজ তাব হাতে তুলে দিল।

তোমার ঘোড়াটা আর সকলেরগুলোর চেয়ে ভালো। এক্ষুনি টগবগিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যাও রেজিমেন্টের কম্যান্ডারের হাতে এইটে দেবে।

খ্রিগোরি তার বুক পকেটে কাগজটা লুকিয়ে রাখল, টুপির ফিতেটা খুঁতনির নীচে ঠেলে দিতে দিতে ঘোড়ার কাছে নেমে এলো।

লেফটেন্যান্ট দৃষ্টি দিয়ে তাকে অনুসরণ করল। খ্রিগোরি ঘোড়ায় না চাপা পর্যন্ত অপেক্ষা করল। তারপর দৃষ্টি ফেরাল হাতঘড়ির দিকে।

খ্রিগোরি বখন বার্তা নিয়ে পৌঁছুল রেজিমেন্ট তখন করোলিওভকার দিকে এগিয়ে গেছে।

কর্ণেল কালেদিন তার এডজুট্যান্টকে নির্দেশ দিল, এডজুট্যান্টও সঙ্গে সঙ্গে ধুলোর ঝড় তুলে এক নম্বর স্কোয়াড্রনের কাছে ছুটে গেল।

চার নম্বর স্কোয়াড্রন বন্যাসোভের মতো কবোলিওভকার ওপর দিয়ে চলল, এত দ্রুত গ্রামের আশেপাশে ছড়িয়ে পড়ল যে মনে হয় যেন মহড়ায় চলেছে। টিলা থেকে তিন নম্বর টুপের অন্যান্য কসাকদের নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে নেমে এলো লেফটেন্যান্ট সেমিওনভ।

স্কোয়াড্রন সার বাঁধল। ডাঁশের কামড়ে অস্থির হয়ে ঘোড়াগুলো মাথা ঝাঁকতে লাগল, তাদের লাগামের সাজগুলো টুংটাং আওয়াজ তুলতে লাগল। গ্রামের শেষ বাড়িগুলোর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় এক নম্বর স্কোয়াড্রনের ঘোড়ার খুরের ভারী আওয়াজ দুপুরের নিস্তব্ধতাকে খানখান করে দিয়ে গেল।

সারির আগে আগে একটা সুন্দর গড়নের টগবগে ঘোড়ার পিঠে নাচতে নাচতে চলেছে সাব অলটার্ণ পলুকোভনিকভ। তলোয়ারের হাতলের ভেতরে হাতটা গলিয়ে দিয়ে শক্ত মুঠোয় সে জড়িয়ে রেখেছে ঘোড়ার লাগাম। খ্রিগোরি বুদ্ধাশাসে নির্দেশের প্রতীক্ষা করতে লাগল। এক নম্বর স্কোয়াড্রন ঘুরে গিয়ে পজিশন নিতে থাকলে সারিটার বাঁ পাশে একটা চাপা দুন্দাড় আওয়াজ শোনা গেল।

সাব-অলটার্ণ ঝট করে বাপ থেকে তলোয়ার খুলে নিল। মৃদু নীল বলক দিয়ে উঠল তলোয়ারের ফলটা।

‘স্কো-য়া-ড-রন’ তলোয়ার প্রথমে ডান দিকে হেলল, তারপর বাঁ দিকে, অবশেষে ঘোড়ার খাড়া দুই কানের বানিকটা ওপরে শূন্যে উঠে স্থির হয়ে রইল। ‘আক্রমণের জন্য তৈরি হয়ে ছড়িয়ে পড়ে এগোও’ সাব-অলটার্ণ মুখে উচ্চারণ

না করলেও তার অকথিত নির্দেশটা গ্রিগোরি মনে মনে পড়ল। 'বর্শা বাগিয়ে ধর, তালোয়ার খোল অ্যাটাক। মার্চ, মার্চ' কনস্টেন খাপছাড়া ভাবে তার নির্দেশ শেষ করে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

অসংখ্য ঘোড়ার খুরের নীচে পিষ্ট হয়ে চাপা আউমান করে উঠল মাটি। গ্রিগোরি তার বর্শাটা তাক করে ধরতে না ধরতে (সে পড়েছিল প্রথম সারিতে), অন্য ঘোড়াগুলোর চলার প্রবল স্রোতের মধ্যে পড়ে গিয়ে তার ঘোড়াটাও দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে ঝড়ের বেগে ছুট দিল। সামনে ধূসর মাঠের পটভূমিকায় সাব-অল্টার্ন পলকোভনিকভকে দেখা যাচ্ছে ট্রেউয়ের মতো দোল খাচ্ছে। এক চুকরো কালো চষা জমি দুনিবাব গতিতে ছুটে আসছে তাদের দিকে। এক নম্বর কোয়াজুন একটা অস্তির কাঁপা কাঁপা হুঙ্কার তুলল। চার নম্বর তার ধূয়া ধরল। ঘোড়াগুলো চার পা এক করে একেক লাফে অনেকটা কবে পেছনে ফেলে আসতে লাগল। বাতাসের শিশ গ্রিগোরির কানে তাল ধরিয়ে দিল। দূরে হলেও তারই মধ্যে সে শুনতে পেল গুলিগোলার গুমগুম আওয়াজ। প্রথম গুলিটা মাথার ওপরে অনেকখানি উঁচু দিয়ে সাঁ করে চলে গেল, আকাশের অস্পষ্ট কাচের গা চিরে দিল তার তীক্ষ্ণ শিশ। গ্রিগোরি বর্শাব গরম বাঁটটাকে এত জোরে চেপে ধরল যে হাতটা ব্যথায় টনটন করে উঠল, তার হাতের চেটো ঘেমে উঠল - মনে হল যেন কোন চটচটে জলীয় পদার্থে মাখামাখি হয়ে গেছে। উড্ডম গুলির শিশ শূনে ঘোড়ার ঘামে-ভেজা ঘাড়ের ওপর মাথা নোয়াতে ইচ্ছা তাকে ফলে ঘোড়ার ঘামের ঝাঁঝাল গন্ধ নাকে এসে চুকতে লাগল। যেন কুয়াশায় ঝাপসা হয়ে ওঠা দূরবীনের কাচের ভেতর দিয়ে সে দেখতে পেল ট্রেঙ্কের সারি সারি বাদামী মাটির ঢিবি, শহরের দিকে লোকজনের পালানোর দৃশ্য, তাদের ধূসর মূর্তি। মেশিনগান অবিরাম একটা পাখার মতো ঘুরে ঘুরে কসাকদের মাথার ওপর প্রবল শব্দে গুলিবর্ষণ কবে চলছে, সামনে আর ঘোড়ার পায়ের নীচে ধুনো তুলোর মতো ছিন্নভিন্ন হয়ে উড়তে লাগল ধূলিজাল।

আক্রমণে নামার আগে পর্যন্ত গ্রিগোরির বুকের পাঁজরের মাঝখানে যে জিনিসটা এত ছটফটিয়ে বেরিয়েছিল, তাব রক্তপ্রবাহ টগবগিয়ে তুলেছিল এখন সেটা অনুভূতিহীন এক জমাট পিণ্ডে হয়েছে। কানের ভেতরকার ভৌ ভৌ আওয়াজ আর বাঁ পায়ের ব্যথাকা ছাড়া আর কিছুই এখন সে উপলব্ধি করতে পারছে না। আতঙ্কে তার চিন্তাশক্তি লোপ পেয়েছে, মাথার ভেতরকার চিন্তাভাবনাগুলো জমাট বেঁধে ভারী হয়ে জট পাকিয়ে গিয়েছে।

ঘোড়া থেকে প্রথম পড়ল কর্ণেট লিয়াখভস্কি। তার ঘাড়ের ওপর ঘোড়া ছুটিয়ে এসে পড়ল প্রোখর।

পেছনে তাকাতে খ্রিগোরি এক ঝলক যে দৃশ্য দেখতে পেল সেটা তার মনে গাঁথা হয়ে রইল। কণ্ঠে হাত পা ছড়িয়ে মাটিতে পড়ে আছে, প্রোখরের ঘোড়াটা তার ওপর দিয়ে লাফিয়ে পার হয়ে দৌঁট বিচিয়ে ঘাড় ঝুঁজে পড়ে গেল। প্রোখর সেই ধাক্কায় জিন থেকে ছিটকে পড়ল। প্রোখরের ঘোড়াটাব শোলাপী রঙের মাড়ী। তার বার করা দাঁতের পাটি, প্রোখরের হুমড়ি খেয়ে পড়া, পেছন থেকে ছুটে আসা ঘোড়াগুলোর খুবের নীচে তার চেপটে যাওয়া কাচের ওপর কেটে-বসা হীরের দাগের মতো মুহূর্তের এই দৃশ্যটা খ্রিগোরির স্মৃতিতে কেটে বসে গেল, অনেক কালের জন্য আঁকা হয়ে রইল। খ্রিগোরি কোন চিৎকার শুনতে পেল না, কিছু প্রোখরের মাটির সঙ্গে লেপটে থাকা মুখ, তার মুখের বিকৃত হাঁ আর কোটির থেকে ঠিকরে পড়া বাছুরের মতো চোখ দেখে খ্রিগোরির বুঝতে বাকি রইল না সে অমানুষিক চিৎকার করছে। আরও অনেকে ধপাধপ পড়তে লাগল। যেমন কসাকরা তেমনি তাদের ঘোড়াগুলোও বাতাসের ঝাপটায় খ্রিগোরির চোখে ঝল এসে যাচ্ছিল। তারই ভেতর দিয়ে দৃষ্টি চালিয়ে সে দেখতে পেল উথলে পড়ছে মূর ফেনারশি অস্ট্রিয়ানরা ট্রেক ছেড়ে পালাচ্ছে।

যে স্কোয়াড্রনটা বেশ সম্ভবত্ব ভাবে আক্রমণের জন্য তৈরি হয়ে ছড়িয়ে পড়ে গ্রাম থেকে ছুটে আসছিল সেটা এখন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। খ্রিগোরি সমেত, সামনে যারা ছিল তারা সকলে ততক্ষণে ট্রেকের কাছাকাছি চলে এসেছে, বাদবাকিরা পেছনে কোথায় যেন পড়ে থেকে ঘোড়া দাবড়াচ্ছে।

লম্বা সাদা চুবু এক অস্ট্রিয়ান মাথার টুপিটা চোখের কাছে টেনে নামানো হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে একেবারে কাছ থেকে প্রায় সরাসরি লক্ষ্য করে খ্রিগোরিকে গুলি করল। সীসের তাপে ঝলসে গেল খ্রিগোরির গালটা। প্রাণপণে ঘোড়ার রাস টেনে ধরে সে বর্শাটা চালিয়ে দিল তার দিকে। আঘাতটা এত জোর হল যে অস্ট্রিয়ানটা লাফিয়ে উঠে দৌঁড়াতে না দৌঁড়াতে বর্শা তার শরীরে বিধে একেবারে অর্ধেক চুকে গেল। খ্রিগোরি বর্শাটা টেনে বার করার অবকাশ পেল না। দেহটা ধরাশায়ী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার ভাবে খ্রিগোরির হাত থেকে বর্শা পড়ে গেল, কেবল বর্শাব ডাণ্ডটার গায়ে অনুভব করল ধবধরে কাঁপুনি আর লোকটার শরীরের বিচুনি, দেখতে পেল অস্ট্রিয়ান সৈন্যটির পুরো শরীর পেছনে বেকে গেছে (না-কামানো খোঁচা খোঁচা দাড়ি ভর্তি তার পুতনির হুঁচালো প্রান্তটা শুধু চোখে পড়ছে), কঁকড়ে যাওয়া আঙুলগুলো দিয়ে সে ডাণ্ডটা হাতড়াচ্ছে, খিন্নে ধরার চেষ্টা করছে। খ্রিগোরি হাতের মুঠো শিথিল করে বর্শাটা ফেলে দিল। খিন্ন ধরা হাতে তলোয়ারের বাঁট চেপে ধরল।

অস্থিরানরা শহরের উপকণ্ঠের রাস্তার ভেতর ঢুকে পড়ে পালাতে লাগল তাদের জড়াজড়ি-করা ধূসর উদ্ভিগুলোর ওপর সামনের দু'পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠেছে কসাক ঘোড়সওয়ারদের ঘোড়াগুলো।

বর্ণাটা হাত থেকে পড়ে যাওয়ার পর মুহূর্তেই গ্রিগোরি কিছু না বুঝে শুনেই কেন যেন ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে দিল তার চোখে পড়ল সার্জেন্ট-মেক্সর দাঁত মুখ খিচিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে তার পাশ দিয়ে চলে গেল গ্রিগোরি তলোয়ারের ঢেপটা দিক দিয়ে ঘোড়াটাকে ঘা মারল। ঘোড়া ঘাড় বাঁকিয়ে তাকে নিয়ে ছুটল রাস্তার ওপর দিয়ে।

একটা বাগানের লোহার রেলিংয়ের ধার দিয়ে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে টলতে টলতে ছুটে চলেছে এক অস্থিরান সঙ্গে কোন রাইফেল নেই, হাতে চেপে ধরে আছে টুপিটা গ্রিগোরির চোখে পড়ল তার মাথার পেছন দিকটা - মুড়ি দেওয়া জিঞ্জ কলারের ওপর, ঘাড়ের কাছে উঁচিয়ে আছে গ্রিগোরি তাড়া করে অস্থিরানটাকে ধরে ফেলল। চারপাশে যে তাণ্ডবলীলা চলছে তার ফলে উত্তেজিত হয়ে ক্ষেপে গিয়ে সে তলোয়ার ওঁচাল। অস্থিরান সৈন্যটি রেলিংয়ের ধার ঘেঁষে ছুটছে, গ্রিগোরি জুতসই কোপ বন্দিয়ে তাকে দু'আধলা করতে পারছে না। তাই সে জিনের ওপর ঝুকে পড়ে তলোয়ারটা কাত করে চেপে ধরে অস্থিরানের কপালের রগ লক্ষ্য করে তলোয়ার বসিয়ে দিল লোকটা একটাও চিৎকার না করে আহত জায়গাটা হাত দিয়ে চেপে ধরে তৎক্ষণাৎ রেলিংয়ের দিকে পিঠ করে ঘুরে গেল গ্রিগোরি রাশ টেনে ঘোড়া থামাতে না পেরে তাকে পেরিয়ে চলে গেল, তারপর আবার দলকি চলে ছুটিয়ে ঘুরে এলো অস্থিরানটার চারকোনা মুখখানা আতঙ্কে লম্বাটে হয়ে গেছে, ঢালাই লোহার মতো কালো হয়ে উঠেছে। হাতদুটো প্যাণ্টের লম্বা সেনাই বরাবর ঝুলে আছে, ছাইরঙা ঠোঁটজোড়া ঘন ঘন কাঁপছে রংগের কাছটার তলোয়ারের কোপ পিছলে যাওয়ার সেখান থেকে খানিকটা চামড়া খসে গেছে, গালের ওপরে লাল একটা ছিলকে ঝুলঝুল করছে। গায়েব উদ্দির ওপর আঁকাবাকা ধারায় রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

অস্থিরানটার চোখে চোখ পড়ল গ্রিগোরির মৃত্যুর আতঙ্কমাখা চোখদুটি তার দিকে নিম্প্রাণ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে লোকটার হাঁটুজোড়া ধীরে ধীরে ভেঙে পড়ছে। তার গলার ভেতরে একটা ঘড়ঘড় আওয়াজ উঠল। গ্রিগোরি চোখ কঁচকে তলোয়ারের কোপ মারল। টেনে মারা বিপুল সেই কোপে মাথার খুলিটা দু'ফাঁক হয়ে গেল। অস্থিরানটা দু'হাত ছড়িয়ে পড়ে গেল দেখে মনে হল যেন পা পিছলে পড়ল তার মাথার খুলির দুটো আধখানা সদর রাস্তার পাথরের ওপর ধপ করে আছড়ে পড়ল গ্রিগোরির ঘোড়াটা একটা লাফ মারল, নাক



দিয়ে আওয়াজ তুলে তাকে বয়ে নিয়ে গেল রাস্তার একেবারে মাঝখানে

রাস্তার মাঝে মাঝে গুলিগোলাব আওয়াজ শোনা যাচ্ছে সারা শরীরে ঘামের ফেনা তুলে একটা ঘোড়া এক মৃত কসাককে টানতে টানতে নিয়ে গেল গ্রিগোরির পাশ দিয়ে। লোকটার একটা পা রেকাবে বেধে আছে, ক্ষতবিক্ষত অর্ধ-উলঙ্গ দেহটা রাস্তার পাথরের গায়ে ঠোঁকর খাচ্ছে।

গ্রিগোবি শুধু দেখতে পেল প্যাণ্টের দু'পাশের লাল ডেরা আর গায়ের ছিন্নভিন্ন সবুজ ফৌজী শার্টটা - সেটা দলা পাকিয়ে মাথার ওপর উঠে গেছে

গ্রিগোরির মাথার ভেতরে যেন গলা সীসের স্রোত বয়ে গেল সব কিছু গুলিয়ে গেল সে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল, মাথা ঝাঁকাল। তিন নম্বর স্কোয়াড্রনের কসাকরা, যারা ঠিক সময়ে এসে পৌঁছেছে, তার পাশ দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল। গ্রেটকোটের ওপর শূইয়ে একজন আহতকে ওরা বয়ে নিয়ে গেল এক দঙ্গল অস্ত্রিয়ান বন্দীকে ডবল মাঠ করিয়ে ভাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। গাদাগাদি করা ছাইরঙের একপাল পশুর মতো তারা ছুটেছে, লোহার নাল দেওয়া বৃটজুতোর নিদারুণ বিষম খটখট আওয়াজ উঠছে। গ্রিগোরির চোখে তাদের মুখগুলো মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল একটা মাটিরঙের থলথলে পিণ্ডে পরিণত হল লাগামটা হাত থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কেন, কিসের জন্য চলেছে তা না বুঝে শূনেই সে হেঁটে এগিয়ে গেল তারই হাতে কাটা-পড়া অস্ত্রিয়ান সৈন্যটার দিকে লোকটা সেখানেই, সুন্দর পাকে পাকে জড়ানো জাফরি কাটা রেলিংয়ের কাছে পড়ে আছে, বাদামী রঙের নোংরা হাতের চেটোটা এমন করে বাড়িয়ে দিয়েছে যেন ভিক্ষে চাইছে গ্রিগোবি তার মুখের দিকে তাকাল ঝোলা গৌফ, বৃক্ষ ঠোঁটদুটো যন্ত্রণা-বিকৃত সে-যন্ত্রণা এখনকার হতে পারে, আবার আগেকার নিরানন্দ জীবনযাত্রার জন্যও হতে পারে - এসব সম্বন্ধে মুখখানা গ্রিগোরির বেশ ছোটখাটো এমন কি প্রায় ছেলেমানুষী বলেই মনে হল

এই ওখানে কী হচ্ছে? একজন অজানা কসাক অফিসার রাস্তার মাঝখান দিয়ে যেতে যেতে টেঁচিয়ে বলল।

গ্রিগোরি অফিসারের ধূলিধূসরিত সাদা টুপির চূড়ার দিকে মুখ তুলে তাকাল, তারপর হেঁচট খেতে খেতে নিজের ঘোড়াটার দিকে ফিরে চলল সীসের মতো ভারী পাদুটো জড়িয়ে আসছে, যেন পিঠে সে কোন বেকায় ভারী বোঝা বইছে। একটা প্রবল বিতৃষ্ণা আর বিমূঢ়তা তার বৃকের ভেতরে ডেল্যা পাকিয়ে উঠছে। সে রেকাব হাতে চেপে ধরল, কিছু পাটা এত ভারী হয়ে গেছে যে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ওঠাতেই পারল না

তাত্ত্বিকি আর তার আশেপাশের গ্রামের যে-সব কসাক দ্বিতীয় দফার সংরক্ষিত দলে ছিল, বাড়ি ছাড়ার পর দ্বিতীয় দিনে তারা রাতটা কাটাল এইয়া গ্রামে তাত্ত্বিকি গ্রামের ভাটি অঞ্চলের কসাকরা সৈন্যনকার উজ্ঞানের কসাকদের থেকে আলাদা হয়ে রইল। তাই পেন্ত্রো মেলেখভ, আনিকুল্কা, ত্রিস্তোনিয়া, স্তেপান আন্তাখভ ইভান তোমিলিন এবং আরও কয়েকজনকে থাকতে হল একই বাড়িতে বাড়ির মালিক এক লম্বা ধুতুড়ে বুড়ো তুর্কীদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল ওদের সঙ্গে গজগুজব শুরু করে দিল কসাকরা ততক্ষণে রান্নাঘরে ও ভেতরের বড় ঘরে চানর বিছিয়ে শূয়ে পাড়েছে, ঘুমোনার উদ্যোগ করছে, কেউ কেউ ঘুমোতে যাওয়ার আগে শেন্নবারের মতো তামাক টানছে

‘তাহলে লড়াইয়ে চললে বুঝি সেপাইরা?’

‘হ্যাঁ দাদু লড়াইয়ে চললাম।’

‘দেখেশুনে মনে হচ্ছে এ লড়াই যেন তুর্কীদের সঙ্গে লড়াইয়ের মতন হবে না? আজকাল যা সব অস্ত্রশস্ত্র হয়েছে’

একই রকম। হরেন্দরে ওই একই তুর্কীযুদ্ধের সময় যেমন বহু লোক সাফ হয়েছিল এবারেও তেমনি হবে,’ তোমিলিন গজগুজব করে বলল কার ওপর খাপ্পা হল বোঝা গেল না।

‘তুমি বাছা সেরেফ বাজে বকছ এবারের লড়াইটা হবে অন্য রকম।’

‘হ্যাঁ তা ত ঠিকই,’ আঙুলের নখ দিয়ে সিগারেট চেপে নিভোতে নিভোতে আলস্যভাবে হাই তুলে তার সমর্থন জানাল ত্রিস্তোনিয়া।

‘আমাদের যতটুকু লড়াই করার করব,’ পেন্ত্রো মেলেখভ হাই তুলে মুখের সামনে ক্রুশচিক আঁকল, তারপর গ্রেটকোটটা গায়ে মুড়ি দিল

‘আমি, বাছারা, তোমাদের একটা কথা বলি বুঝি জবুরী কথাটা মনে রাখবে কিন্তু,’ বুড়ো বলল

পেন্ত্রো গায়ে মুড়ি দেওয়া গ্রেটকোটের কানাটা গুটিয়ে তুলে কান পাতল

একটা কথা মনে রাখবে - প্রাণে যদি বাঁচতে চাও, এই মারামারি কাটাকাটির ভেতর থেকে যদি আস্ত বেবিরে আসতে চাও তাহলে মানুষের যা ন্যায়ধর্ম সেটা মেনে চলবে।’

‘সেটা কী রকম?’ স্তেপান আন্তাখভ সারির এক প্রান্তে শূয়ে ছিল। সে-ই প্রশ্নটা করল মুখে তার অবিশ্বাসের হাসি যেদিন থেকে সে যুদ্ধের কথা শুনছে সেদিন থেকে সে আবার হাসতে শুরু করেছে। যুদ্ধ তাকে ইশারায় ডাকছে

সর্বসাধারণের হতাশা ও উদ্বেগের মধ্যে অন্যের ব্যথা-যন্ত্রণার মধ্যে নিজের বেদনার সাক্ষ্যনা ধুঁছে পারি সে।

কী রকম? তাহলে বলি - ঘুছে অন্যের জিনিস নেবে না এ হল প্রথম কথা। মেয়েমানুষ কখনও ছোঁবে না, ভগবানের দোহাই 'তাহাজা দু'-একটা মস্তুর শিখে রাখবে।'

কসাকরা নড়েচড়ে উঠল সবাই একসঙ্গে কথা বলে উঠল।

'অন্যেরটা ছোঁয়ার চেয়ে এখানে নিজের ঘোঁটা আছে তা না খোঁয়ানোটাই বড় কথা '

'আচ্ছা, মেয়েমানুষ না ছোঁয়া - সেটা কেমন কথা হল? কেউ যদি বলে গৌয়ার্জুনি খাটাতে বেয়ো না তা না হয় বুঝলাম, কিন্তু যদি পটিয়ে-পটিয়ে নিতে পারি?'

'কিন্তু লোভ সামলানো কি আর চাট্টিখানি কথা?'

'ঠিক ঠিক, কথাটা ত সেইখানেই।'

'আচ্ছা, যে মস্তুরের কথা বললে সেটা কী?'

বুড়ো কটমট করে স্থিরদৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকাল, তারপর এক নিশ্বাসে সকলের কথার উত্তর দিয়ে বলল, 'মেয়েমানুষ ছোঁয়া কোনমতে চলবে না। একেবারে না।' লোভ যদি সামলাতে না পার তাহলে হয় গর্দান যাবে নয়ত ক্ষতম হবে পরে টের পাবে, কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে যাবে প্রার্থনা আমি তোমাদের বলব পুরো তুর্কীয়ুকে লাড়োছি, যমকে কাঁধে করে নিয়ে বেড়িয়েছি সমগ্রী ঝোলার মতো, কিন্তু জ্যাক্স ফিরে এসেছি শুধু এই মস্তুরের জোরে।'

ভেতরের বড় ঘরটায় চলে গেল সে। বিগ্রহের কুন্ডলির তলায় হাতড়ে সেখান থেকে বহুকালের পুরনো, বাদামী রঙ ধরা ছেঁড়াবোঁড়া কাগজের একটা টুকরো বাব করে আনল।

'এই যে ওঠো সব, টুকে নাও কাল কাক ডাকার আগেই হয়ত বেরিয়ে পড়তে হবে তোমাদের '

মুড়মুড়ে পাতাটা হাত দিয়ে টেবিলের ওপর পাট করে রেখে বুড়ো সবে দাঁড়াল প্রথমে বিছানা ছেড়ে উঠল আনিকুশকা জানলার ফাঁক দিয়ে বাতাস ভেতরে ঢুকে আগুনের শিখা কাঁপিয়ে তুলছিল তারই অহির ছায়া আনিকুশকার মেয়েলি ঘাঁচের মাকুল মুখের ওপর পড়ে নাচতে লাগল স্তোপান ছাড়া আর সকলেই বসে বসে লিখতে লাগল সবার আগ লেখা শেষ করল আনিকুশকা লেখা শেষ হতে খাতা থেকে ছিড়ে নেওয়া পাতাটা ডেলা পাকিয়ে বুকে ঝোলানো ক্রসের খানিকটা ওপরে বেঁধে রাখল স্তোপান পা নাচাতে নাচাতে টিলনী কেটে বলল, 'উকুনের চমৎকার বাসা হল ক্রসের সুতোয় ওদের বাসা বাঁধায় অসুবিধে আছে কিনা, তাই তুই ওদের জন্যে কাগজের বাসা বানিয়ে দিলি। ঠুং।'

‘ওহে ছোকরা, বিশ্বাস না করলে চূপ করে থাক’ তাকে বাধা দিয়ে কড়া গলায় বুড়ো বলল ‘লোকের কাছে বাধা দিতে এসো না. লোকের ধর্মবিশ্বাস নিয়ে হাসিঠাট্টা করো না. লজ্জার কথা, এ হল পাপ’

স্বেপান চূপ করে গেল, মিটিমিটি হাসতে লাগল. অস্বস্তিকর পরিস্থিতিটাকে সহজ করে তোলার উদ্দেশ্যে আনিকুশ্কা বুড়োকে জিজ্ঞেস করল, ‘মন্তরে যে বল্লম আর তীরধনুকের কথা আছে সেটা কেন?’

‘অক্রমণ হানার মন্ত্রের কথা বলছি ত? বাঁধা হয়েছে কবে দেখতে হবে ত? আমাদের সময়কাল নয় যে আমার স্বর্গীয় ঠাকুর্দা এটা পেয়েছিলেন তাঁর ঠাকুর্দার কাছ থেকে. বুঝতেই পারছি, হয়ত তারও আগের। সৈকালে লোকে লড়াই করতে যেত শরকি-বল্লম তীরধনুক আর তৃণ সঙ্গে নিয়ে।’

তিনটে প্রার্থনার মধ্যে যার যেটা খুশি বেছে টুকে নিল

## আগ্নেয়াস্ত্র হইতে উদ্ধারের মন্ত্র

হে প্রভু, আমাদেরকে আশীর্বাদ কর. ঘোটকের তুল্য এক প্রস্তরখণ্ড পর্বতের উপর বহিয়াছে। বারিকণা যেমন উহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না, তেমনি কোন তীর, কোন আগ্নেয়াস্ত্রের গুলি যেন ঈশ্বরের দাসানুদাস আমাকে, আমার যাহারা সঙ্গী তাহাদিগকে এবং আমার ঘোটককে বিদ্ধ করিতে না পারে। হাতুড়ী যেমন নিহাই হইতে ছিটকাইয়া ওঠে তেমনি গুলিও যেন আমার দেহে আঘাত খাইয়া ছিটকাইয়া যায়, পেষণযন্ত্র যেমন ঘূর্ণিত হয় তীরও যেন তেমনি হইয়া আমার নিকট হইতে ফিরিয়া যায়। রবি ও শশী উজ্জ্বল, ঈশ্বরের দাসানুদাস আমিও যেন তাহাদের দ্বারা শৌর্যবান হইতে পারি. পর্বতের অপর পারে এক দুর্গ বহিয়াছে উহার কপাট বুদ্ধ। চাবির গোছা আমি নিক্ষেপ করিব সমুদ্রে আলতর নামক স্বেত বহ্নিশিখায়ুক্ত প্রস্তরখণ্ডের নীচে, যাহাতে মায়াকী অথবা মায়াকিনী, সন্ন্যাসী অথবা সন্ন্যাসিনী কেহই উহাকে দেখিতে না পায়, সাগর-মহাসাগর হইতে বারিরাশি অন্তর্ধান করে না, পীত বালুকারণি গণনা করা যায় না, তদ্রূপ ঈশ্বরের দাস আমিও সর্বক্ষেত্রে অপরাধেয়। পরম পিতা, তাঁহার পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে দিব্য তথাক্ত।

## আক্রমণ হইতে উদ্ধারের মন্ত্র

এক বিশাল মহাসাগর রহিয়াছে সেই মহাসাগরে রহিয়াছে আলতর নামক এক ষ্ঠে প্রস্তরখণ্ড, সেই প্রস্তরখণ্ডের উপর রহিয়াছে দুই গুণ চতুর্দশ পুরুষের এক পাবাণপুরুষ ঈশ্বরের দাসানুদাস আমাকে এবং আমার যাহারা সঙ্গী তাহাদিগকে সুতীক্ষ্ণ অসি ও খড়্গা হইতে কাব্যকার্যচিহ্নিত ইম্পাতের তরবারি ও কশার ফলা হইতে, পবিপক্ক লৌহের ও অপরিপক্ক লৌহের ভন্ন হইতে, ছুরিকা ও কুঠারাঘাত, পরন্তু কামান-যুদ্ধ হইতে, সীসার গুলি ও যাবতীয় লক্ষ্যভেদী অস্ত্র হইতে, শ্যেনপক্ষী, মরাল, রাজহংস, সারস, ক্রৌঞ্চ অথবা বায়সপক্ষীর পালকশোভিত সর্ববিধ তীর হইতে, তুর্কী আক্রমণ হইতে, ক্রিমীয় অস্ট্রীয় তথা আক্রমণকারী বৈরী হইতে, তাতার, লিথুয়ানীয়, জার্মান, সাইবেরীয়, কালমিক জাতি হইতে, পূর্ব হইতে পশ্চিমে, ধরণী হইতে গগনমণ্ডল পর্যন্ত পাবাণ আবরণে আচ্ছাদন করিয়া দাও পবিত্র পিতৃবর্গ ও স্বর্গীয় শক্তি ঈশ্বরের দাসানুদাস আমাকে রক্ষা কর। তথাহু

## আক্রমণ হানিবার মন্ত্র

পুণ্যময়ী ত্রিলোকেশ্বরী পবিত্র দেবজননী এবং আমাদিগের প্রভু যিশু খ্রীষ্ট ঈশ্বরের দাসানুদাস আমাকে এবং আমার সহিত আমার সঙ্গীরা যাহারা যুদ্ধে চলিয়াছে, তাহাদিগকে মেঘের দ্বারা আবৃত কর, তোমার স্বর্গীয় পবিত্র প্রস্তরখণ্ড দ্বারা শিলাবাণী দ্বারা তাহাদিগকে রক্ষা কর। হে সালোনিকার সন্ত দমিত্রি, ঈশ্বরের দাসানুদাস আমাকে এবং আমার সঙ্গীদিগকে চতুষ্পার্শ্ব হইতে আড়াল কর কোন দূর্বৃত্ত যেন আমাদিগকে বিদ্ধ না করে, বর্শা দ্বারা আঘাত না করে, খড়্গ দ্বারা ছেদন না করে, আঘাত না করে, লগুড়াঘাতে ধরাশায়ী না করে, কুঠারাঘাতে ঋণ না করে তরবারি দ্বারা ছেদন না করে, আঘাত না করে, ছুরিকা দ্বারা আঘাত না করে, ছিন্ন না করে, বৃদ্ধ কিংবা যুবা তাম্রবর্ণ কিংবা কৃষ্ণবর্ণ, প্রচলিত ধর্মবিরোধী কিংবা মায়াবী, অথবা যে-কোন ঐশ্বরজালিক যেন সক্ষম না হয় ঈশ্বরের দাসানুদাস আমার সম্মুখে এক্ষণে সকলই পড়িয়া রহিয়াছে তোমার

বিচারের অপেক্ষায় উন্মুক্ত ও পরিতাপ্ত। মহাসাগরের মধ্যে সাগর, তাহার মধ্যে বৃহদায় দ্বীপ। সেই দ্বীপে রহিয়াছে এক লৌহস্তম্ভ। সেই লৌহস্তম্ভের মাথায় লৌহ ষষ্টির উপর ভর দিয়া রহিয়াছে এক লৌহমানব, সে লৌহ, ইস্পাত ও দস্তা, সীসা এবং সর্বপ্রকার অত্মনিক্ষেপকারীকে মস্ত্রে বশীভূত করে 'হে লৌহ, তুমি ঈশ্বরের দাসানুদাস আমার নিকট হইতে, আমার সঙ্গীদিগের ও আমার ঘোটকের নিকট হইতে তোমার গর্ভধারিণী জননী বসুমতীর গর্ভে গিয়া প্রবেশ কর। বৃক্ষের কাষ্ঠনির্মিত তীর অরণ্যে গমন কর, পালক পক্ষী-জন্য নিকট গমন কর, আঠা মৎস্যের নিকট গমন কর।' ঈশ্বরের দাসানুদাস আমাকে তরবারির ফলা ও গুলিগোলা হইতে, কামানের গোলা ও অগ্নি এবং বহ্নয় ও ছুরিকার আঘাত হইতে স্বর্ণময় ঢাল দ্বারা রক্ষা কর বর্ম হইতেও কঠিন হইয়া উঠুক আমার দেহ। তথাহু

কসাকরা লেখা মন্ত্ৰগুলো তাদের ফতুয়ার তলায় রাখল সঙ্গে করে বয়ে নিয়ে গেল। ওগুলো তারা গলায় ঝোলানো ক্রসের সুতো আর মাঘের দেয়া আলীবাধীর সঙ্গে এবং সঙ্গে করে বয়ে আনা একেক খামচা দেশের মাটির ছোট ছোট শূটলির সঙ্গে বেঁধে নিল কিন্তু যারা মন্ত্ৰ বয়ে নিয়ে বেড়াল, মৃত্যুর হাত থেকে তারাও রেহাই পেল না

গালিসিয়া\* ও পূর্ব প্রাশিয়ার প্রান্তরে প্রান্তরে কার্পাথিয়ার পর্বতে, রুমিনিয়ায় - যেখানে যেখানে বৃক্ষের দাবানল জ্বলে উঠেছিল, কসাকদের ঘোড়ার খুরের ছাপ পড়েছিল, সেখানেই পড়ে পড়ে পচতে লাগল মৃতদেহের স্তুপ।



দনেৎস প্রদেশের উজানের জেলা ইয়েলান্‌স্কায়া, ভিওশেন্‌স্কায়া, মিগুলিন্‌স্কায়া ও কাছান্‌স্কায়ার কসাকদের সচরাচর এগারো নম্বর ও বারো নম্বর কসাক আর্মি রেজিমেন্টে এবং আত্মমান রক্ষিবাহিনীতে নেওয়া হত

\* গালিসিয়া - পশ্চিম ইউক্রেনিয়া ও পোলভুয়ারিয়ার একটি অংশের প্রাচীন নাম। ১৯১৪ সালে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্টে রুশ বাহিনী গালিসিয়া ও পোল্যান্ডের ওপর চতুর্থ অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় আর্মির আঘাত চেকিয়ে সান ও বুনায়েৎস নদীর ওপারে তাদের সরিয়ে নিলে হাঙ্গেরির পক্ষে সমূহ বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অনুঃ

কিন্তু ১৯১৪ সালে ডিওশেনস্বায়া জেলা থেকে পুরোদস্তুর সেনাবাহিনীতে যোগদানকারী কসাকদের একটা অংশকে কেন যেন জুড়ে দেওয়া হল ইয়েরমাক তিমকেয়েভিচ রেজিমেন্ট নামে পরিচিত তিন নম্বর দল কসাক রেজিমেন্টের সঙ্গে, যেটা বলতে গেলে পুরোপুরি উক্ত-মেদভেদিৎসা প্রদেশের কসাকদের নিয়ে তৈরি। অন্যদের সঙ্গে মিত্রতা করশুনভও গিয়ে পড়ল এই তিন নম্বর রেজিমেন্টে,

তিন নম্বর ঘোড়সওয়ার ডিভিশনের কিছু ইউনিটের সঙ্গে রেজিমেন্টটা ভিলনোয় ছাউনি ফেলল। তখন জুন মাস বিভিন্ন স্কোয়াড্রন শহর থেকে বেরিয়ে পড়ল ঘোড়া চড়ানোর মাঠে

একে গরমকাল, তায় দিনটা মেঘলা, বেশ গুমোট হয়ে উঠেছে। হাল্কা মেঘের দল আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে, সূর্যকে আড়াল করে দিয়েছে। রেজিমেন্ট মার্চ করে চলেছে। গমগম শব্দে রেজিমেন্টের ব্যাণ্ড বাজছে গরমকালের উপযুক্ত টুপি মাথায়, হাল্কা ফৌজী শার্ট গায়ে অফিসাররা দল বৈধে ঘোড়ার চড়ে চলেছে তাদের মাথার ওপর উড়ছে সিগারেটের হাল্কা নীল ধোঁয়া।

কাঁচা রাস্তার দু'পাশে চাষীরা আর সুন্দর সাজগোজ করা মেয়েরা ঘাস কাটছিল। তারা হাত দিয়ে চোখের রোদ আড়াল করে কসাকদের সারিগুলো দেখতে লাগল।

ঘোড়াগুলো রীতিমতো ঘেমে উঠেছে তাদের কঁচকির কাছে জমে উঠেছে হলদেটে ফেনা। মৃদুমন্দ দক্ষিণ-পূর্ব বায়ুতে তাদের ঘাম শুকায় না। ডোপসা গরমটা আরও বেড়েই চলে।

গভ্রবাহুলের অর্ধেক রাস্তায় কোন একটা ছোট গ্রামের কাছে ওরা যখন চলে এসেছে তখন একটা বাচ্চা ঘোড়া কোথা থেকে যেন ঘুরতে ঘুরতে পাঁচ নম্বর স্কোয়াড্রনের কাছে এসে পড়ল বাচ্চাটা একলাফে একটা বেড়া ডিঙিয়ে এলো, একটা বিশাল ঘোড়ার দল সামনে দেখতে পেয়ে আনন্দে চি-হি-হি করে উঠে সোজা সেদিকে ছুটল ছোট বাচ্চা বলে তার লেজের ফুরফুরে লোম এখনও কর্কশ হয়ে ওঠে নি। লেজটা একপাশে হেলে আছে, বিনুকের খোলের মতো ধারাল খুরের নীচ থেকে ধূসর বৃদ্ধ তুলে কুণ্ডলী পাকিয়ে ধুলো উড়ছে, ধীরে ধীরে থিতিয়ে পড়ছে পারের তলায় নিষে যাওয়া সবুজ ঘাসের ওপর আগে আগে যে টুপিটা যাচ্ছিল বাচ্চাটা ছুটতে ছুটতে সেদিকে এগিয়ে এসে আনাড়ির মতো সার্জেন্ট-মেজরের ঘোড়ার দু'পায়ের মাঝখানে মাথাটা ঢুকিয়ে দিল ঘোড়াটা এক ঝটকায় পেছনে হটে গেল, কিন্তু চাঁট মারল না, মনে হয় বাচ্চাটাকে দেখে তার মায়া হয়েছে

‘হুস্, হুদা কোণাকার!’ সার্জেন্ট-মেজর চাবুক তুলল

ঘোড়ার বাচ্চাটার সামান্যিধে পোষা জন্তুর মতো হালচাল আর মিষ্টি চেহারা দেখে কসাকরা বেশ মজা পেল। তারা হেসে উঠল। কিন্তু তারপরই যা ঘটল সেটার জন্য কেউ প্রস্তুত ছিল না। বাচ্চাটা লাজলজ্জার মাথা বেয়ে টুপের সারিগুলোর ভেতরে গলে গেল তার ফলে টুপ ভেঙে পড়ল, এর আগে টুপের যেমন নিবিড় ঘনবস্ত্র ভাব ছিল এখন আর তা রইল না কসাকরা হীকডাক করে চালানোর চেষ্টা করলে কী হবে তাদের ঘোড়াগুলো ইতস্তত করে একই জায়গার পা চালাতে লাগল কসাকদের ঘোড়ার চাপে পড়ে কোণঠাসা হয়ে বাচ্চাটা এবার একপাশ হয়ে চলতে লাগল, পাশে যে ঘোড়াকে পেল তাকে কামড়ে সেবার চেষ্টা করল

স্কোয়াজনের কন্ডাক্টর ঘোড়া ছুটিয়ে এলো।

‘কী হচ্ছে এখানে?’

আহতমক বাচ্চা ঘোড়াটা যেখানে ঢুকে পড়েছে সে জায়গাটার কসাকদের ঘোড়াগুলো একপাশে কাত হয়ে চলছে, নাক দিয়ে ঘড় ঘড় আওয়াজ করছে, কসাকরা হাসতে হাসতে তার পিঠে চাবুক মারছে। টুপ ছড়াল হয়ে ছড়িয়ে পড়ে চারপাশে খিকখিক করছে, পেছন থেকে বাকি টুপগুলোর চাপ এসে পড়ছে, রাস্তার পাশে স্কোয়াজনের লেজের দিক থেকে একজন টুপ-অফিসার ক্রিপ্ত হয়ে ধোড়া ছুটাতে ছুটাতে আসছে।

ঘোড়াটাকে জটিলার মাঝখানে চালিয়ে দিতে দিতে স্কোয়াজনের কন্ডাক্টর গর্জন করে উঠল, ‘এসব কী হচ্ছে?’

‘এই যে এখানে একটা বাচ্চা ঘোড়া’

‘আমাদের মাঝখানে ঢুকে পড়েছে’

‘ভাদিড়টাকে তাড়ানো বাচ্ছে না।’

‘আরে চাবুক হীকাও না অত মায়া করার কী আছে?’

কসাকরা মুখ কাচুমাচু করে হাসল। যার যার ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে উত্তেজিত ঘোড়াগুলোকে সামলাতে লাগল

‘সার্জেন্ট-মেজর! এসব কী হচ্ছে ছাই, লেফটেন্যান্ট? আপনার টুপ গুছিয়ে আনুন। সব কিছুরই একটা সীমা আছে’

স্কোয়াজন-কন্ডাক্টর ঘোড়া ছুটিয়ে এক পাশে সরে গেল। তার ঘোড়াটা সঙ্গে সঙ্গে হৌচট খেল। ঘোড়াটার পেছনের দুই পা রাস্তার পাশের নালার ভেতরে ফসকে পড়ে গেল। কন্ডাক্টর বৃটের কঁটা দিয়ে পেটে খোঁচা মারতে ঘোড়াটা নালার ওপাশে জংলা শাকপাতা আর রান্ধি রান্ধি হলুদ মাথা ডেইজী ফুলের ঝাড়ে ভর্তি একটা উঁচু জায়গার ওপর গিয়ে উঠল। দূরে অফিসারদের একটা দল



দাঁড়িয়ে ছিল দীর্ঘদেহী এক লেফটেন্যান্ট কর্ণেল মাথাটা পেছন দিকে হেলিয়ে  
 তাক থেকে কিছু পান করছে, তার আরেকটা হাত দরদভরে স্পর্শ করে আছে  
 জিনের সুন্দর কাঠামোটা।

সার্জেন্ট-মেজর টুপটাকে ভেঙে দিল, স্কেপে গিয়ে তোড়ে গালাগাল করতে  
 করতে ঘোড়ার বাচ্চাটাকে সান্ত্বনা ওপারে তাড়িয়ে নিয়ে গেল। টুপ এর পর  
 আবার দলবদ্ধ হল। 'দেডশ' জোড়া চোখ চেয়ে চেয়ে দেখল সার্জেন্ট-মেজর  
 রেকাবের ওপর ডর দিয়ে দাঁড়িয়ে বাচ্চাটার ওপর জোর কন্ঠে ঘোড়া চালিয়ে  
 দিল। এদিকে বাচ্চাটা কখনও নাদ শুনিয়ে চচ্চে নোংরা পাঁজরাটা সার্জেন্ট-মেজরের  
 হাত তিনেক উঁচু ঘোড়াটার গায়ে ঠেকিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ছে, কখনও বা  
 লেফটাকে সোজা করে ফের ঝটকা মেরে পালাচ্ছে - সার্জেন্ট-মেজরের চাবুক  
 কিছুতেই তার পিঠের নাগাল পাচ্ছে না, বার বার গিয়ে পড়ছে লেজের ঝাড়ুটার  
 ওপর ঝাড়ুর ওপর বাড়ি মারলে যেমন হয় লেফটাও তেমনি নীচে নেমে যাচ্ছে,  
 কিছু পর মন্থতাই আবার মহা দাপটে বাতাসে ধ্বজার মতো উড়তে থাকে।

স্কোয়াড্রনের সবাই হাসতে থাকে। অফিসাররাও হাসে। এমন কি মেজর যে  
 মেজর, যে মুখ গোমড়া করে থাকে তার মুখেও বাঁকা হাসির মতো একটা রেখা  
 ফুটে উঠল

সকলের আগে প্রধান যে টুপটা যাচ্ছিল তার তৃতীয় সারিতে চলেছে মিত্কা  
 কোরশুনড আর ভিওশেনস্কায়া জেলার কারাগার গ্রামের এক কসাক মিখাইল  
 ইভানকভ তাদের সঙ্গে উল্-বোপিওরস্কায়ার কোজমা ক্রিউচকোভও আছে  
 চণ্ডা-মুখ, চণ্ডাকাঁধ ইভানকভের মুখে একটাও কথা নেই মুখে দু'একটা  
 বসন্তের দাগ, কোলকুজো ধরনের কসাক ক্রিউচকোভকে সকলে 'উট' বলে ডাকে।  
 সে কিছু পদে পদে মিত্কার দোষ ধরতে লাগল। ক্রিউচকোভ হল একজন  
 'মুরুকি', অর্থাৎ পুরোনত্বের পলটনের কাজে এই তার শেষ বছর চলছে রেজিমেন্টের  
 অলিখিত নিয়ম অনুযায়ী যে কোন 'কসাক-মুরুকির' মতো সেও অল্প বয়সীদের  
 তড়না করার ও কঠিন নিয়মকানুন শিক্ষা দেওয়ার এবং ছোটখাটো যে কোন  
 ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য ঘোড়ার বকলস মারার অধিকার রাখে ১৯১৩ সালে যে সব  
 কসাক পলটনে ঢুকেছে তারা অপরাধ করলে বকলসের তের ঘা, আর ১৯১৪  
 সালে যারা ঢুকেছে তাদের ক্ষেত্রে চৌদ্দ ঘা এ ই ছিল নিয়ম। সার্জেন্ট-মেজর  
 আর অফিসাররা এই প্রথার উৎসাহী সমর্থক ছিল, কেননা তাদের ধারণায় এর  
 ফলে পদমর্যাদার দিক থেকে যারা বড় তাদের প্রতি ত বটেই, বয়োজ্যেষ্ঠ  
 গুরুজনদের প্রতিও একটা প্রজ্ঞাবোধ কসাকদের মনে বদ্ধমূল হয়।

ক্রিউচকোভ সম্প্রতি কর্পোরালের পদমর্যাদাসূচক স্ট্রাইপ পেয়েছে সে তার

শোলা কাঁধদুটো পাখির মতো ঝুকিয়ে কোলকুজো হয়ে জিনের ওপর বসে আছে। পীনোরত বন্ধুদেশের সমান একখণ্ড ধূসর মেঘের দিকে চোখ কঁচকে তাকান সে, তারপর স্কোয়াড্রনের লম্বা চণ্ডা চৈহারের মেজর পপোভের কণ্ঠস্বর নকল করে মিতকাকে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা ব্যালো দেখি আমাদের কাম্যাতারের ন্যামটা কী?'

মিতকাকে তার গৌয়ার্জুমি ও অবাধাতার স্কন্য বেশ কয়েকবার বকলসের ঘা খেতে হয়েছে। মুখে জোর করে একটা শ্রদ্ধার ভাব ফুটিয়ে তুলে সে বলল, 'মেজর পপোভ, মুবুকিমশাই।'

'ক্যা?'

'মেজর পপোভ, মুবুকিমশাই।'

'আমি সে কাথা জিজ্ঞেস করারছি নে। তুমি আমাকে ব্যালো, আমাদের ক্যাসাকদের মাঝে তাকে কী নামে ডাকা হয়।'

ইভানকভ সতর্ক করে দেওয়ার ভঙ্গিতে মিতকার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল, তার ওপরের কাটা ঠোঁটটা মৃদু হাসিতে ন্যূরিত হয়ে উঠল।

মিতকা পেছন ফিরে তাকাতে দেখতে পেল মেজর পপোভ পেছন পেছন ঘোড়ায় চড়ে আসছে।

'অ্যাও, জাবাব দাও।'

'মেজর পপোভ বলেই তাকে সকলে ডাকে কস্তা।'

'চান্দটা ব্যাকলেসের ঘ্যা ব্যাল্ হ্যারামজ্যাদা।'

'জানি না কর্ণরাল মশাই।'

'আচ্ছা, ঘোড়া চরানোর মাঠে আমক্য আসিই না আগে,' এবারে ক্রিউচকোভ তার নিজস্ব কণ্ঠস্বরে বলল 'তোমাকে আমি আচ্ছা করে খেলাই দিয়ে ছাড়ব। তোমাকে জিজ্ঞেস করছি, উত্তর দাও।'

'জানি না।'

'জানিস না কেন শালা শুরোরের ব্যাচ্চা? লোকে ওকে আড়ালে কী বলে ডাকে জানিস নে?'

মিতকার কানে এলো পেছনে চোরের মতো সম্ভর্পনে পা ফেলে এগিয়ে আসছে মেজরের ঘোড়াটা, তাই সে চুপ করে রইল।

'কী হল? ক্রিউচকোভ ক্রুদ্ধ হয়ে চোখ কৌচকাল।

পেছনকাব সারিগুলোতে যারা ছিল তাদের মধ্যে একটা চাপা হাসির রোল পড়ে গেল হাসির কারণটা কী হতে পারে বুঝতে না পেরে ক্রিউচকোভ সেটাকে নিজের গায়ে মাখল তাই তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল।

‘কোরশুনভ, মজাটা টের পাইয়ে দেব দাঁড়াও না, আগে জায়গায় পৌছে  
নিই পঞ্চাশ ঘা ঝাড়ব!’

মিত্রকা কী করবে বুঝতে না পেরে কাঁধ ঝাঁকাল শেষ কালে বলেই ফেলল,  
‘খেড়রা!’

‘এই তো বেশ লক্ষ্মী ছেলের মতো কথা বাবা!’

‘ক্রি-উচ-কোভ!’ পেছন থেকে গর্জন উঠল।

মুঝুঝি চমকে উঠে শিরাগুলো টানটান করে অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে জিনের  
ওপর নড়েচড়ে বসল।

‘এ স্যাব কী হ্যাঞ্চে এখানে. হ্যাডভ্যাগা?’ নিজের ঘোড়াটাকে ক্রিউচকোভের  
খোড়ার পাশাপাশি আনতে আনতে মেজর পপোভ বলল। ‘অ্যান্সবয়সী ক্যাসাকদের  
শিক্ষে দ্যাওয়ার এই বুকি ধারা?’

ক্রিউচকোভ আধবোজা চোখদুটো পিটপিট করতে লাগল লাল টকটকে হয়ে  
উঠল তার দুই গাল পেছনে সকলে হি-হি করে হাসতে লাগল।

‘গ্যাত ব্যাছর কাকে অ্যামি শিক্ষাটা দিয়্যাছিল্যাম?’ অ্যাই অ্যাডুলের নখটা  
কাঁর বদনে মানতে গিয়ে ভেঙেছিল্যাম?’ মেজর তার কড়ে অ্যাডুলের ছুঁচাল  
লম্বা নখটা ক্রিউচকোভের নাকের কাছে এনে গোর্ফ নাচিয়ে বলল। ‘অ্যামন য়ান  
অ্যার ক্যাক্সনও ন্যা শূনি. বুঝল্যা হে?’

‘ঘে আক্সে, হুজুর, বুঝেছি।’

মেজর একটু বিলম্ব করে তারপর সরে গেল, রাশ টেনে ঘোড়া ধামিয়ে  
স্কোয়াড্রন যাবার পথ করে দিল চার নম্বর ও পাঁচ নম্বর স্কোয়াড্রন দুলকি চালে  
ঘোড়া ছুটিয়ে চলল

‘স্কোয়াড্রন, ঘোড়ার চাল ঠিক রাখ’

ক্রিউচকোভ তার কাঁধের বেলট ঠিকঠাক করে নিল, পেছন ফিরে তাকিয়ে  
ঘবন দেখতে পেল মেজর অনেকটা দূরে পড়ে গেছে তখন বর্শাটা জুত করে  
ধরতে ধরতে হতবুদ্ধি হয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, ‘এই হল গিয়ে তোমার খেড়রা।  
কোথেকে এসে উদয় হল।’

হাসতে হাসতে ইডানুকভের সর্বাক্ষে তখন ঘাম ঝরছে সে বলল, ‘অনেকক্ষণ  
হল আমাদের পেছন পেছন আসছিল। সব শূনেছে ঠিক টের পেয়েছে কী নিয়ে  
কথা হচ্ছে।’

‘আরে হাঁদারাম, অস্তত চোখ টিপতে হয় ত’

‘কোন দূরখে?’

‘কোন দূরখে? তবে বে, ন্যাংটো করে চৌদ্ধটা বাড়ি মারব’

স্কোয়াড্রনগুলোকে ভেঙে আশেপাশের বিভিন্ন জমিদারের তালুকে তালুকে পাঠিয়ে দেওয়া হল। দিনের বেলায় সকলে জমিদারদের জন্য ঘাস আর খড় কাটল। রাতের বেলায় ঘোড়াগুলোকে পা ছেঁদে তাদের জন্য নির্দিষ্ট মাঠে চড়তে ছেড়ে দিল। মাঠে আগুন জ্বালিয়ে ধূনির আঁচে তাস খেলতে লাগল। নানারকম গল্পগুজব আর ইয়ারকি ফাজলামি করে সময় কাটাল।

হয় নম্বর স্কোয়াড্রনটা শ্বেইডার নামে এক বড় পোল জমিদারের তালুকে স্বেচ্ছামুকুরী করছিল। অফিসারদের থাকার জায়গা হল সদর দালানে। তারা সেখানে তাস পিটোতে লাগল, মদ খেয়ে মাতলামি করতে লাগল, সকলে মিলে নামেবের স্নেয়োটার মন পাওয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেল। কসাকরা জমিদার বাড়ি থেকে ক্রোশখানেক দূরে ছাউনি ফেলে রইল।

রোজ সকালে একটা চার চাকার দৌড়ের ঘোড়ার গাড়িতে চেপে নামেবমশাই তাদের কাছে আসে। মোটাসোটা, সম্ভ্রান্ত চেহুরার পোল ভদ্রলোকটি তার কিম্বদন্তি মেদবহুল পাদুটো টান করে জড়তা ভাঙতে ভাঙতে গাড়ি থেকে নেমে পড়ে, তারপর চকচকে সাদা টুপিটা হাতে করে নাড়াতে নাড়াতে যথার্থি 'কোসাকদের' অভ্যর্থনা জানায়।

‘আমাদের সঙ্গে চলে এসো কর্তা। একটু ঘাস-টাস কাটো’

গায়ের চর্বি একটু ঝেঁড়েঝেঁড়ে কেলুন।’

‘কান্তে ধব, নইলে অধব হয়ে পড়বে।’ সাদা শার্ট পরা কসাকদের সারিগুলোব ভেতর থেকে চিংকার শুটে

কর্তা নিম্পুহের মতো হাসতে থাকে। সুন্দর পাড লাগানো বুয়াল দিয়ে সূর্যাস্তের গোলাপী আভা মেশানো টাকটা মুছতে মুছতে এবাবে কোন জমিতে ঘাস কাটতে হবে সার্জেন্ট-মেজরকে সেটা দেখানোর জন্য সঙ্গে করে নিয়ে যায়।

দুপুরে গাড়ি করে খাবার আসে। কসাকরা হাত পা ধুয়ে খেতে বসে যায়।

সকলে চূপচাপ মুখ বুজে খেয়ে চলে। তবে দুপুরের খাওয়ারদাওয়ার পর আধ ঘণ্টার যে অবসরটা পাওয়া যায় সেই সময় সকলের মুখের আগল খুলে যায়।

‘এখানকার ঘাসগুলো বিচ্ছিরি। আমাদের স্ত্রোপের ঘাসের সঙ্গে কোন তুলনাই হয় না।’

‘দুবো ঘাস বলতে প্রায় কিছুই নেই।’

‘আমাদের দন এলাকায় এতদিনে ঘাসকাটা শেষ হয়ে গেছে।’

‘আমরাও লিগ্গিরই শেষ করব। গতকালে একাদশী গেছে, বিষ্টির জল পড়ার অপেক্ষা।’

‘পোল বাটা হাড় কেমন। বাটাখাটনির জন্যে আমাদের এই হতভাগাগুলোকে  
যদি একটা বোতলও দিত।’

‘হুঃ তাহলেই হয়েছে।’ একটা বোতলের জন্যে হাড়িকাটে প্রাণ দিয়ে দেবে না।’

‘তাহলেই দ্যাখ ভাই, দাঁড়াচ্ছে এই যে যত বড়লোক তত কেমন, তাই না?’

‘একটা জারকে গিয়েই করিস বরং।’

‘আচ্ছা, জমিদারের মেয়েটাকে দেখেছিস?’

‘কেন বল ত?’

‘ওঃ গারে কী মাংস মেয়েটার।’

‘দস্তুর মতো একটা ভেড়া, কী বলিস?’

‘ঠিক, ঠিক      যা বলেছিস।’

‘কড়া মাল থাকলে তার সঙ্গে দিবা সন্ধ্যায় দেওয়া যেত।’

‘আচ্ছা, শুনলাম জারের বক্সসম্পর্কের কে একজন নাকি ওকে বিয়ে করতে  
চেষ্টাছিল - কথটা কি সত্যি?’

‘আরে অমন রসাল মাল কি আর সাধারণ লোকের ভাগ্যে জুটবে?’

‘সেদিন একটা গুজব শুনলাম রে রাজতরফের কেউ নাকি আমাদের  
ইনস্পেকশন করার জন্যে আসছে।’

‘মোটো বেড়ালের আর ত কিছু করার নেই, তাই

‘আচ্ছা, রাখ দেখি তুই, তারাস।’

‘আরে একটু টানতে দে না।’

‘শরতান, খালি অনোর হাড় ভাঙার তাল। যা না, তোর এই লম্বা হাতখানা  
নিয়ে গির্জার দোবে গিয়ে ভিখ মাঙ গে।’

‘দ্যাখ দ্যাখ রে ভাই, কেনোতকাটা টানতে কেমন ওস্তাদ। ভেতরে টানার  
কিছু নেই, তবু টানছে ত টানছেই।’

‘ধাকার মধ্যে আছে শুধু ছাই।’

‘হুঁ হুঁ ভাই, হুঁশিয়ার হয়ে চোখ বুলেই দেখ না, আগুন যথেষ্ট আছে তেমন  
মাগী হলে তার আগুন কী আর সহজে যায়।’

ওরা সকলে পেটের ওপর ভর দিয়ে শূয়ে শূয়ে তামাক টানতে থাকে  
ওদের খালি পিঠগুলো রোদের তাপে পুড়ে ভাজা ভাজা হতে থাকে। এক পাশে  
পাঁচজন মুরকি কসাক নতুন রিক্রুট করা একজনকে প্রশ্ন করছে, ‘কোন জেলা  
থেকে এসেছ?’

‘ইয়েলানক্সা।’

‘যাকে আমরা ছাগল বলি, তাই ত?’

‘হ্যাঁ হুজুর।’

‘আচ্ছা তোমাদের ওখানে নুনের গ্যাড়ি কিসে টানে?’

ঝানিকটা দূরে ঘোড়ার গা ঢাকা কাপড়ের ওপর শুয়ে ছিল কোজ্জা ক্রিউচকোভ।  
বড় একঘেয়ে লাগছে তার। সে তার কচি পাতলা গায়ে আঙুলে জড়াতে থাকে।

‘ঘোড়ায় টানে,’ ছেলেটা বলে

‘আরও কিসে?’

‘বলদে।’

‘আচ্ছা, জিনিয়া থেকে মাছ কিসের পিঠে বয়ে আনে? জান। এমন বলদ  
ষাদের পিঠে কুঁজ আছে, যারা কটিগাছ বায় কী নাম বল ত?’

‘উট।’

‘ও হো-হো-হা-হা।’

ক্রিউচকোভ আলস্যভরে উঠে দাঁড়াল। উঠের মতো কুঁজো হয়ে কঠমণি বার  
করা, রোদে পোড়া জাফরান রঙের গলাটা সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে অপরাধীর  
কাছ থেকে জরিমানা আদায় করার জন্য পা বাড়ায়। চলতে চলতে কোমরের  
বেল্ট খুলতে থাকে

‘শুয়ে পড়।’

রোজ সন্ধ্যায় জুন মাসের রোদ যখন পড়ে আসে, যখন মাঠে অন্ধকার  
ঘনিয়ে আসে সেই সময় কসাকরা আগুন জ্বলে তার চারপাশে বসে গান ধরে

জনমের মতো ভিটেমাটি ছেড়ে

কসাক চলেছে দূর ভিন্ন দেশে,

মিশ্রমিশ্র কালো জেজী ঘোড়া চড়ে।

চড়া গলার একটা সুর বুপোলি ঢেউ তুলে কান্নায় ঝরে পড়ে, পরক্ষণেই  
কতকগুলো খাদের গলা ছড়িয়ে দেয় বিষাদঘন কোমল সুর

আসবে না ফিরে যাত্রার শেষে

উঁচু পর্দায় ধরা গলাটা ধাপে ধাপে আরও চড়ায় ওঠে, সবচেয়ে নখ সত্যটা  
প্রকাশ করে

মিছেই যুবতী বধুটি তাহার

সন্ধ্যাসকালে চেরে উত্তরে

ভাবে গ্রাণনাথ হবে যে আবার  
এই পথে আসে ঘরে

সেখতে দেখতে বহুকণ্ঠ এই গানের সঙ্গে গলা মেলায়, ফলে গানটা হয়ে  
ওঠে গাঁজানো তাড়ির মতো গাঢ় আর নেশা-ধরানো।

পাহাড় ছাড়িয়ে শীতের হাওয়ায়  
শন শন দোলে পাইন আর ফার,  
সেখানে শায়িত চিরনিদ্রায়  
তুষারের নীচে, কসাকের হাড়

কণ্ঠগুলো কসাক জীবনের সাদামাঠা কাহিনী বলে চলে, সেই চড়া গলাটা  
এপ্রিলের বরফগলা মাটির মাধুর ওপর ঘুরপাক খাওয়া ভরত-পাবির মতো গানের  
ধূয়ো ধরে রাখে। সূরে বাজতে থাকে

অরণ্যের কালে বলেছিল ডেকে  
শিয়রের কাছে ঢিবি গড়ে দিতে

তার সেই কণ্ঠের সঙ্গে কবুণসূরে বাজতে থাকে বান্দের কণ্ঠগুলো

গুঁতে নিতে গাছ, এনে দেশ থেকে  
যায় ফুল হবে লাল গনগনে

আরেকটা ধূনির কাছে লোকজন সেই তুলনায় কম, সেখানে গানও চলে  
অনা ধরনের

আহা দুষ্টর পারাবার থেকে, আচ্ছত সাগর থেকে  
চলেছে তরঙ্গী পাল তুলে মনে।  
সেই তরঙ্গীতে গৃহপানে ফেরে  
তবুও কসাক-বীর, আতামান

খানিকটা দূরে, আরও একটা আগুনের ধারে স্ফোয়াজনের একজন কথক  
ধোঁয়ায় কাশতে কাশতে জটিল কল্পনা মেশানো এক গল্পের জাল বুনে চলে।  
সকলে অবশু মনোযোগে তার গল্প শোনে কেবল মাঝে মাঝে গল্পের নায়ক  
যখন বেশ চালাকি খাটিয়ে মস্তক আর ডাকিনী-যোগিনীদের পাতা বড়বড়জাল

ভেন্স করে বেরিয়ে আসে একমাত্র তখনই পায়ের বুটে চাপড় মারতে গিয়ে কারও হাত হয়ত আগুনের শিখায় বলক মেতে ওঠে, তামাকের ধোঁয়ায় খনখনে কারও গলা উল্লাসে চিৎকার করে ওঠে

‘আহা, এই ত চাই দাবুণ দিয়েছে।’

তার পরই জ্বাবার বয়ে চলে কথকের সেই একটানা কঠোর কথকতা

রেজিমেন্ট ঘোড়া চরানোর জমিতে আসার এক সপ্তাহ পরে মেজর পপোভ একদিন স্কোয়াড্রনের কামার আর সার্জেন্ট-মেজরকে ডেকে পাঠাল

‘ঘোড়াগুলোয় অবস্থা কামান?’ সার্জেন্ট-মেজরকে সে জিজ্ঞেস করল

‘মন্দ নয় হুজুর, এমন কি বেশ ভালোই বলতে হবে। শিঠের টোলগুলো ভরাট হয়ে উঠেছে। গায়ে গতরে লাগছে।’

মেজর তার কালো গোর্কটা পাকিয়ে কাঠির মতো সবু করল, এই কালো গোর্কের জন্যেই লোকে তাকে আড়ালে ‘খেঙরা’ বলে), তারপর বলল

‘রাজিমেন্টের ক্যাম্যাডারের ক্যাহ খ্যাকে হুকুম অ্যাসেছে - ঘোড়ার মুখ্যায় কড়া আর রেকাব-টেকাব য্যান র্যাঙ ঝালাই দিয়ে চ্যাকচ্যাকে করে রাখা হয় র্যাজিমেন্টের র্যাজকীয় পরিদর্শন হবে স্যাব য্যান চ্যাকচ্যাকে থাকে জিন আর ব্যাদবাকি স্যাব ক্যাসাকদের দিকে ত্যাকালে য্যান মনটা খুশিতে ভরে ওঠে কবে ন্যাগাদ তৈরি হতে প্যারবে ডাই?’

সার্জেন্ট-মেজর কামারের দিকে তাকাল কামার সার্জেন্ট-মেজরের দিকে তাকাল। তারপর দু’জনেই তাকাল মেজরের দিকে।

‘রবিবারের মধ্যে হলে কেমন হয় হুজুর?’ এই কথা বলে সার্জেন্ট-মেজর সসম্মুখে তামাকের ধোঁয়ার ছাতাধরা সবজের টে গোর্কে আঙুল ঠেকাল

‘ন্যাখে, ঠিক খ্যাকে য্যান।’ মেজর কঠোর স্বরে তাকে সতর্ক করে দিল।

এর পর সার্জেন্ট-মেজর আর কামার দু’জনেই সেখান থেকে প্রস্থান করল।

সেই দিন থেকে রাজকীয় পরিদর্শনের জন্য তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল মিখাইল ইভানুকভ কার্গিন্সকির এক কামারের ছেলে, নিজেও সে কামারের কাজকর্ম বেশ জানেশোনে ঘোড়ার রেকাব আর কড়িয়ালের ওপর রাংয়ের গিলটি লাগাতে সে সাহায্য করল অন্যেরা ঘোড়াগুলোকে প্রয়োজনেরও বেশি ঘসেমেজে সাফ করল মুখের লাগায় পরিষ্কার করল, ঝামা দিয়ে ঘসে ঘসে বল্গার আঙটা এবং ঘোড়ার সাজসজ্জার অন্যান্য ধাতব অংশ পালিশ করল।

সপ্তাহের শেষে পুরো রেজিমেন্টটা টাকশালের নতুন চাঁদির টাকার মতো ঝকঝক করতে লাগল। ঘোড়ার খুর থেকে কসাকদের মুখ পর্যন্ত সব কিছু



ঝলমলে। শনিবার দিন রেজিমেন্টের কমাণ্ডার কর্ণেল থেকভ রেজিমেন্ট দেখে গেল, উৎসাহদীপ্ত প্রত্নুতি আর চমৎকার চেহারা দেখে অফিসার আর কসাকদের ধন্যবাদ জানাল।

পরতে পরতে খুলে যেতে লাগল জুলাইয়ের গাঢ় নীল দিনগুলো। ভালো দানাপানি খেয়ে ঘোড়াগুলোর চেহারা খোলতাই হয়ে উঠতে লাগল উস্খুস করতে লাগল শূধু কসাকরা, নানা সন্দেহ আর অনুমানে তাদের মন ভারাক্রান্ত রাজকীয় পরিদর্শনের কোন নামগন্ধ নেই। জরানা-কল্পনার ঘূর্ণাবর্ত, দৌড়ঝাঁপ আর প্রত্নুতির মধ্যে দেখতে দেখতে একটা সপ্তাহ কেটে গেল এমন সময় যিনা মেঘে বজ্রপাত! - হুকুম হল, ভিলনোয় যাত্রা করতে হবে

সন্ধ্যায় তারা সেখানে ফিরে এলো। তারপরই স্কোয়াড্রনে স্কোয়াড্রনে জারি হল আরও একটি নির্দেশ কসাকদের সমস্ত মালপত্রসমেত বাজ্ঞপাট্টরা মালগুদামে জমা দিয়ে মাঠে নামার সজ্জাবনার কথা মনে রেখে তৈরি থাকতে হবে

‘এসব আবার কী হুজুর?’ টুপ অফিসারদের কাছ থেকে সত্য বার করার চেষ্টায় কসাকরা কাতরকণ্ঠে জিজ্ঞেস কবল।

অফিসাররা কৌধ ঝাঁকাল তারা বলবে কি? নিজেরাই যে জানার জন্যে হয়ে হয়ে ঘুরছে।

‘জানি না’

‘মহামান্য রাজাবাহাদুরের সামনে যুদ্ধের মহড়া হবে কি?’

‘এখনও জানা যায় নি’

কসাকদের মনস্ত্বুটির জন্য এই হল অফিসারদের উত্তর উনিশে জুলাই সন্ধ্যায় আগে আগে ছয় নম্বর স্কোয়াড্রনের প্রিভিন নামে একজন কসাক যখন আন্তাবলে ডিউটি সিঙ্কিল, সেই সময় তারই এক বন্ধু, রেজিমেন্ট-কমাণ্ডারের জনৈক বার্তাবহ এক ফাঁকে চুপি চুপি তাকে জানিয়ে গেল

‘লাড়াই বেধে গেছে হে’

‘কী সব আবোল-তাবোল বকছ?’

‘মাইরি ভগবানের দিবা কিন্তু যা বললাম, বাইবে চাওড় করো না’

পরদিন সকালে রেজিমেন্টটাকে ডিভিশন অনুযায়ী সাজিয়ে ব্যারাকের সামনে দাঁড় করানো হল ধুলোর প্রলেপ পরা থাকলেও তারই মধ্যে অস্পষ্ট চকচক করছে ব্যারাকের জানলার শাশিগুলো। রেজিমেন্ট ঘোড়ায় চড়ে তৈরি হয়ে কমাণ্ডারের অপেক্ষা করতে লাগল।

ছয় নম্বর স্কোয়াড্রনের সামনে একটা সুন্দর বাছাই করা ঘোড়ার পিঠে চড়ে আছে মেজব পপোভ। সাদা দস্তানা পরা বাঁ হাতে টেনে ধরে রেখেছে ঘোড়ার

মুখের লাগাম। ঘোড়াটা তার চাকার মতো বিশাল ঘাড়টা বাঁকিয়ে এক পাশে করে রেখেছে, বুকের ডুমো ডুমো মাংসপেশীর ওপর মুখ ঘসছে

বারাক-বাড়ির কোনো ঘুরে ঘোড়ায় চড়ে এসে দাঁড়াল রেজিমেন্টের কর্ণেল। রাখ টেনে সারির সামনে এক পাশ করে ঘোড়াটাকে দাঁড় করাল এডজুট্যান্ট সুললিত ভঙ্গিতে কড়ে আঙুল উঁচিয়ে বুঝাল বার করে তুলে ধরল, কিন্তু নাক ঝাড়ার অবকাশ পেল না অস্বস্তিকর, গভীর নিস্তব্ধতায় কর্ণেল ছুঁড়ে দিল তার কণ্ঠস্বর

‘কসাক সব।’ সঙ্গে সঙ্গে সকলের মনোযোগ কেড়ে নিল

‘এই যে এখুনি’ সবাই মনে মনে ভাবল। অধীর উত্তেজনার এই বুঝি ফেটে পড়ে ওরা মিতকা কোরশুনভের ঘোড়াটা এক পা থেকে আরেক পায়ে ওপর দেহের ভর রাখছিল, বিরক্ত হয়ে জুতোর গোড়ালি দিয়ে সে তাই ঘোড়ার পেটে একটা লাগি কষিয়ে দিল তার পাশে ঘোড়ার পিঠে মূর্তির মতো স্থিৎ হয়ে বসে আছে ইভানকভ। ওপরের ঠোঁটটা মাঝখানে কাটা কথা গেলার জন্য হাঁ করে আছে, তাইতে মুখের ভেতরকাব এবড়োখেবড়ো কালো দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়েছে। তার পেছনে চোখ কঁচকে কঁজো হয়ে বসে আছে ক্রিউচকোভ আরও দূরে লাপিন - কানের নরম হাড় খাড়া করে রেখেছে ঘোড়ার মতো তার পেছনে চোখে পড়ছে স্টেগলকোভের কণ্ঠমণিটা খুরের কাটা দাগে ক্ষতবিক্ষত

জার্মানী আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে

সুন্দর সাজানো সারিগুলোর ওপর খসখস আওয়াজ উঠল, যেন পাকা যব ক্ষেতের ওপর দিয়ে বাতাস চেউ খেলিয়ে চলে গেল একটা ঘোড়া হুঁসখনি করে উঠল কানে এসে বিধল তার সেই চিৎকার গোলগোল চোখ আর হাঁ করা মুখের চারকোনা কালো গহ্বরগুলো ফিরে তাকাল এক নম্বর স্কোয়াড্রনের দিকে সেখানে স্বী পাশ থেকে ডেকে উঠেছিল ঘোড়াটা।

আরও অনেক কথা বলল কর্ণেল যেখানে যেমন যেমন শব্দ দরকার বেছে বেছে সাজিয়ে কথাগুলো বলে সে সকলের মনে জাতীয় গর্বের উপলব্ধি জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করল কিন্তু হাজার কসাকের চোখের সামনে যে দৃশ্য ভেসে উঠল তা তাদের পায়ে নীচে খসখস শব্দে লুটিয়ে পড়া রেশমী কাপড়ের বিদেশী খাতা নয় তা হল তাদের স্ত্রী, সন্তান, প্রেমিকা, না তোলা ফসল, ছয়ছাড়া গ্রামগঞ্জ যা কিছু তাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার অঙ্গ, যাব সঙ্গে তাদের রক্তের সম্পর্ক আছে সে সবই পতপত করে উড়তে উড়তে তাদের ডাকতে লাগল, সরব প্রতিবাদ জানাতে লাগল

‘দৃষ্টান্ত মতো টেনে চাপতে হবে।’ একমাত্র এই কথাটাই সকলের মনে গাঁথা হয়ে বসে গেল

কিছু দূরে ভিড় করে দাঁড়িয়ে রয়েছে অফিসারদের স্ত্রীরা। তারা বুঝলে মুখ গুঁজে কাঁদছে। কসাকরা দলে দলে ব্যারাকের দিকে ছুটছে। লেফটেন্যান্ট খেপ্রোভকে তার বাদামী চুল, অন্তঃসত্ত্বা পোল স্ত্রীটিকে প্রায় কোলে করে নিয়ে ঘরে রেখে আসতে হল।

গান গাইতে গাইতে রেজিমেন্ট চলল স্টেশনের দিকে ব্যাণ্ডের আওয়াজ ডুবে গেল ওদের গানে, মাঝপথে এক সময় হকচকিয়ে গিয়ে থেমে গেল ব্যাণ্ডের বাজনা। অফিসারদের স্ত্রীরা ঘোড়ার গাড়ি চেপে চলল ফুটপাথের ওপর উপচে পড়ল রঙ-বেরঙের লোকের ভিড়, ঘোড়ার খুরে খুরে রাস্তার খোয়া পাথর ভেঙে ধুলো ছড়িয়ে পড়তে লাগল রেজিমেন্টের মূল গায়ের গান গাইতে গাইতে বাঁ কাঁধটা এমন ভাবে নাচাতে লাগল যে তার কাঁধের নীল পটিটা ভীষণ ভাবে দুমড়ে মুচড়ে ঝুঁকড়ে যেতে লাগল। নিজের আর অন্যদের দুঃখকে নিয়ে তামাসা করতে করতে মুখ থেকে সে অনর্গল উগড়ে দিচ্ছে একটা অশ্লীল কসাক গানের গুচ্ছের খেদোক্তিসূচক কলি

সুন্দরী গো কোন বা-লেকে ধরলে-ওরা মাছটি ?

স্কোয়াড্রনের সকলে ইচ্ছে করে একটি কথার সঙ্গে আরেকটা কথা জড়িয়ে সদ্য নাল পরানো ঘোড়ার খুরের তালে তালে গান গাইতে গাইতে চলল স্টেশনের লাল রঙা ভানগুলোর দিকে আপাতত সেগুলোই তাদের শিবির।

মাছটি পেয়ে সুন্দরী হয় আল্লাদে আটখান-কি ?

আল্লাদে আটখান-কি ?

আহ, আল্লাদে আটখান-কি ?

স্কোয়াড্রনের শেষ প্রান্ত থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে গাইয়েদের সামনে এসে হাজির হল রেজিমেন্টের এডজুট্যান্ট হকচকিয়ে গিয়ে আনাড়ির মতো হাসছে সে তার চোখেমুখে রক্তোচ্ছ্বাস, মূল গায়ের ঘোড়ার পিঠে বসে থেকে সেই অবস্থাতেই হাতের লাগাম ঝট করে ছুঁড়ে ফেলে দিল ফুটপাথে কসাকদের বিদায় জানানোর জন্য ঘন ভিড় করে এসে জুটেছে যে সব মেয়েরা তাদের দিকে সে অবজ্ঞাভরে তাকিয়ে চোখ টিপল, লোকটার ব্রোঞ্জের মতো পোড়ামাটি রঙের গাল বয়ে তার কালো কুচকুচে গোঁফের ওপর বা গড়িয়ে পড়তে লাগল তা ঘাম নয়, যেন তিস্ত কোন আরক।

রেল লাইনের ওপর সীম নিতে নিতে একটা ইঞ্জিন গভীর গর্জন করে উঠে সকলকে স্তব্ধ করে দিল।

টুপ বহন করার জন্য সারি সারি ট্রেন আর ট্রেন অগণিত ট্রেন আর ট্রেন  
উদযান্ত রাশিয়া রক্ত নিক্ষেপন করে ধূসর গ্রেটকোট মুড়ে দেশের শিবা  
উপশিবার মধ্য দিয়ে, রেল লাইনের ওপর দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছে তার পশ্চিম সীমান্তে।

## আট

ভজ্জোক নামে একটা ছোট শহরে আসার পর বেজিমেন্টটাকে কয়েকটা  
স্কোয়াড্রনে ভেঙে আলাদা আলাদা করা হল। ডিভিশনের সদর দপ্তরের নির্দেশের  
ভিত্তিতে ছয় নম্বর স্কোয়াড্রনকে তিন নম্বর আর্মির পদাতিক কোল-এর হেফাজতে  
পাঠিয়ে দেওয়া হল। এই স্কোয়াড্রনটি শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে মার্চ করে এসে শৌখুল  
পেলিকালিয়ে নামে আরেকটা ছোটখাটো শহরাঞ্চলে সেখানে তারা চৌকি বসাল।

সীমান্ত তখনও রক্ষা করছে বুশ সীমান্ত-ইউনিটগুলো। গোলন্দাজ ও পদাতিক  
ইউনিটদের সামনে নিয়ে আসা হচ্ছে। চব্বিশে জুলাই তারিখের সন্ধ্যানাগাদ ১০৮  
নম্বর প্লেবড বেজিমেন্টের একটা ব্যাটেলিয়ন ও একটা ব্যাটারী সেখানে এসে  
উপস্থিত কাছে আলেক্সান্দ্রভস্কি নামে যে খাস জমিদারিটি আছে সেখানে একজন  
টুপ সার্জেন্টের নেতৃত্বে নয় জন কসাকের একটা চৌকির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ছব্বিশ তারিখে রাতে মেজর পপোভ সার্জেন্ট-মেজর এবং আন্তাবড নামে  
একজন কসাককে ডেকে পাঠাল।

আন্তাবড যখন টুপে ফিরে এলো ততক্ষণে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। মিতকা  
কোরশুনড সবে জ্বল খাইয়ে তার ঘোড়াটাকে নিয়ে ফিরেছে

‘আন্তাবড নাকি?’ মিতকা ডাক দিল

‘হ্যাঁ। ক্রিউচকোভ আর অন্যেরা সব গেল কোথায়?’

‘ওই ওখানে ঘরের ভেতরে।’

আন্তাবড বেশ বড়সড় ভারী চেহারা কসাক মাথার চুল তার কানো  
অন্ধকারে চোখে ভালোমতো দেখতে পাচ্ছিল না বলে চোখ কঁচকে ঘরের ভেতরে  
গিয়ে ঢুকল টেবিলের ধারে একটা কুপির আলোয় চামড়া সেলাইয়ের সুতো  
দিয়ে ঘোড়ার লাগামের একটা দড়ি সেলাই করছিল শ্বেগন্দকোভ। ঘরের মধ্যে  
বিছানায় শুয়ে ছিল বাড়ির মালিক, একজন পোল লোকটা শোথরোগে কষ্ট  
পাচ্ছে ক্রিউচকোভ হাতদুটো পেছন করে চুমির পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইতানকতকে

চোখ টিপে সেই দিকে কী যেন ইঙ্গিত করছিল দু'জনের মধ্যে এইমাত্র কোন একটা প্রসঙ্গ নিয়ে একচোট হাসাহাসি হয়ে গেছে, ইভানকভের গোলাপী গালদুটো তখনও হাসির দমকে নাচছে

ওহে শোন সকলে, কাল ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে আমাদের বেরিয়ে পড়তে হবে, যেতে হবে একটা টৌকির জায়গায়।'

'কোথায় সেটা?' স্কেগলকোভ জিজ্ঞেস করল সে তখন সুতোটা দিয়ে একটা ফোর্ড লাগানোর চেষ্টা করছিল অন্যমনস্ক হয়ে আস্তাবলের দিকে তাকাত্তে গিয়ে তার হাত থেকে ছুঁচটা পড়ে গেল

'ল্যাবড নামে একটা জায়গায়।'

'কে কে যাবে?' ঘরে ঢুকতে গিয়ে টৌকাটের কাছে জল তোলার বালতিটা নামিয়ে রেখে মিতকা কোরশুনভ জিজ্ঞেস করল

'আমার সঙ্গে যাবে স্কেগলকোভ ক্রিউচকোভ বভাচোভ পপোভ আব তুমি ইভানকভ '

'আব আমি?'

'তুমি এখানে থাকবে মিত্রি

'তাহলে গোমায় যাও তোমরা।'

ক্রিউচকোভ চুল্লির কাছ থেকে সরে এসে মটমট আওয়াজ করে হাতপায়ের আড় ভাঙতে ভাঙতে গৃহকর্তাকে জিজ্ঞেস করল, 'ল্যাবড জায়গাটা এখান থেকে কত দূর? কত কোশ হবে?'

'চার মাইল '

'কাছেই, বলতে বলতে বেঞ্চের ওপর বসে পড়ে পায়ের জুতো খুলল আস্তাবল, তারপর জিজ্ঞেস করল 'জুতোর ভেতরকার ন্যাতিগুলো এখানে কোথায় শূকোতে দেওয়া যায় বল ত?'

খুব ভোরে ওরা বেরিয়ে পড়ল রাস্তার ধারের এক কুয়োতলায় একটা মেয়ে খালি পায়ে দাঁড়িয়ে কুয়ো থেকে বালতি করে জল তুলছিল ক্রিউচকোভ তার ঘোড়াটা রাম টেনে ধামাল।

একটু জল দাও গো।'

হাতে বোনা মোটা কাপড়ের ঘাঘরাটা আলতো করে তুলে ধরে গোলাপী রঙের পায়ে ছপর ছপর করতে করতে কুয়োতলায় জমা জলের ওপর দিয়ে এগিয়ে এলো মেয়েটা। চোখের পাতার ঘন নরম লোমের ভেতর দিয়ে ধূসর দু'চোখে হাসতে হাসতে সে বালতিটা তার হাত তুলে দিল ক্রিউচকোভ বালতি থেকে জল খেতে লাগল, ভারী বালতিটা অজগা করে এক হাতে ধরে রাখায়

তার ভারে হাতটা কাঁপতে লাগল, জলের ফোঁটা ছলকে ছিটকে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল ক্রিউচকোভের প্যান্টের খারের লাল ডোরা বয়ে।

‘ট্রীট তোমাকে রক্ষা করুন সুন্দরী!’

‘ভগবান যিশুর দয়া হোক

সে বালতিটা ফেরত নিয়ে সরে গেল, তারপর পেছন ফিবে তাকিয়ে দেখে হাসল

‘দাঁত বার করছ কেন গো? চল তোমাকে তুলে নিয়ে যাই!’ ক্রিউচকোভ

যেন ওর বসার জায়গা কবে দেওয়াব জন্যই ক্রিনের ওপর নড়েচড়ে বসল।

এগোও এগোও’ আন্তাখভ যেতে যেতে টেঁচিয়ে বলল।

রডাচোভ বিদ্রূপের ভঙ্গিতে ক্রিউচকোভের দিকে চোখ টেরিয়ে তাকাল।

‘কি দেখে দেখে আব আশ মেটে না বুঝি?’

‘ওর পাগুলো হাঁসের ঠ্যাঙের মতো লাল’ ক্রিউচকোভ হেসে উঠল। ওর কথার সঙ্গে সঙ্গে সকালে একসঙ্গে এমন ডাবে ঘাড় কিরিয়ে তাকাল যেন ওটা কোন দৌলীজী কম্যাণ্ড।

মেয়েটা কুয়েব পাডেব ওপর ঝুঁকে পড়েছে, তার গোলাপী রঙের পুবুট পায়ের গুলি দেখা যাচ্ছে, পাদুটি ছড়িয়ে আছে দু’দিকে, ঘামরায় টান পড়তে শব্দ হয়ে উঠেছে নিতম্বর মাঝখানের ভাঁজটা

‘আহা, খাসা হত বিয়ে করতে পারলে’ পপোভ দীর্ঘশ্বাস ফেলল

দাঁড়া, আমি চাবকে তোর বিয়ের ভূত ভাঙাচ্ছি,’ আন্তাখভ বলল

‘চাবকে কি আর’

‘বড় বেশি চুলবুলুনি দেখছি’

‘যাব জন্য ওর অত চুলবুলুনি সেটা টেনে ছিঁড়ে ফেলতে হয়

‘আমরা ওকে খাসি করার বলদ বানিয়ে ছাড়ব,

কসাকরা নিজেদের মধ্যো হাসাহাসি করতে করতে ঘোড়া ছুটিয়ে চলল কাছেই যে টিলাটা পড়ল সেখান থেকে চোখে পড়ে টিলার গায়ে একটা নাবাল উপত্যকা জুড়ে লাবড নামে ছোট শহরটা কসাকদের দলটার পেছনে, টিলার আড়াল থেকে সূর্য উঠছে। এক পাশে টেলিগ্রাফের ঝুটির মাথায় ইনসুলেটরের ওপর দিয়ে পাক খেতে খেতে গলা ছেঁড়ে গান গেয়ে চলেছে একটি চাতকপাখি।

আন্তাখভ সবে একটা সাময়িক শিক্ষাক্রম শেষ করেছে, তাই তাকে নতুন চৌকির প্রধান কবে দেওয়া হয়েছে শহরের শেষপ্রান্তে, সীমান্ত ঘেঁসে যে বাড়িটা ছিল সেটা সে তার লোকজন থাকার জন্য বেছে নিল বাড়ির কতটা এক দাড়িগোঁফ চাঁছা, বাঁকা-পা পোল মাথায় তার সাদা ফেল্টের টুপি কসাকদের সে একটা চলাঘরের কাছে নিয়ে এসে দেখিয়ে দিল কোথায় ঘোড়া রাখতে

হবে। চালার পেছনে একটা ছাড়া ছাড়া ডালপালার বেড়া, তার ওপারে একটা সবুজ ঘাসের জমি টিলামতন জমিটা গড়িয়ে চলে গেছে কাছের এক বনে, তারও পরে সাদা বকবক কবছে ফসলক্ষেত, মাঝখান দিয়ে কেটে চলে গেছে রাস্তা। তারপর ফের নরম ঘাসের চকচকে সবুজ জমির কতকগুলো ফলি। চালার পেছনকার নালার কাছ থেকে পালা করে দূরবীন চোখে লাগিয়ে কসাকরা ওপারে নজর রাখতে লাগল। বাকিরা ঠাণ্ডা চালার নীচে শুয়ে বিশ্রাম করতে লাগল। বহুকালের পড়ে থাকা ফসল ঝাড়াই করা ফসলের ঝুঁড়ে, হুঁদুরের নামি আর বুঝে মাটিব সৌদা সৌদা মিষ্টি গন্ধে জায়গাটা ভরপুর

ইভানকভ অঙ্ককার একটা কোণে একটা লাঙলের পাশে জায়গা করে নিল, সঙ্গে পর্যন্ত সেখানে পড়ে পড়ে ঘুমাল। সূর্য যখন পশ্চিমে চলে পড়েছে তখন অন্যেরা এসে ওর ঘুম ভাঙাল। ক্রিউচকোভ ওর ঘাড়ের চামড়া বিষচে ধরে টান মেরে বলল, 'সরকারী খাঁটি খেয়ে কেমন ঘাড়ে-গর্দানে হয়েছে দেখ। আহা! যেন খোদার বাসী উঠে পড় হে ঝুঁড়ের বাদশা, জার্মানদের ওপর নজর রাখতে হবে।'

'কি ইয়াকি হচ্ছে যে কোজ্‌মা ভান্নায়ে না বাপু.'

'উঠে পড়।'

'ছাড় বলছি ইয়াকি মারবি না। একুনি উঠছি.'

ইভানকভ উঠে পড়ল ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তার চোখ মুখ ফুলে গেছে, লাল টসটিস করছে চণ্ডা কাঁধের সঙ্গে খাটো ঘাড় দিয়ে বেশ পোক্ত করে আঁটা বয়লারের মতো তার মাথাটা সে এসিক ওমিক ঘোরাল, ফৌস ফৌস করে নাক টানল (সাঁতসেতে ভিজ়ে মাটিতে শোয়ার ফলে তার ঠাণ্ডা লেগেছে), কার্ভুজের বেলটা ভালো করে কাঁধে বৈধে নিয়ে রাইফেলটা ছেঁচড়ে টানতে টানতে চালাঘরের বাহিরে পা বাড়াল। স্টেগলকোভকে ডিউটি থেকে ছেড়ে দিয়ে তার জায়গায় গিয়ে সে দূরবীন চোখ রাখল, অনেকক্ষণ ধরে উত্তর পশ্চিমে বনের দিকটাতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল।

সেখানে বাতাসে দোল খাচ্ছে ধবধবে সাদা বিস্তীর্ণ ফসলক্ষেত, আলুডার গাছের শ্যামল মাথার ওপর সেমেছে অস্তগামী সূর্যের গাঢ় লাল আলোর ঢল।

শহর ছাড়িয়ে সুন্দর নীল ধনুকের আকারে একটা ছোট নদী দেখা যাচ্ছে পাড়ার যত ছেলের মল নদীর জলে স্নান করছে, চিংকার চৈচামেচি করছে কানে ভেসে এলো এক নারীকণ্ঠের মিহি ডাক পোলিশ ভাষায় তার বাচ্চটাকে ডাকছে, 'স্তাসিয়া, স্তাসিয়া, এদিকে আয়।' স্টেগলকোভ একটা সিগারেট পাকাল, জায়গাটা ছেড়ে চলে যেতে যেতে বলল

'পড়ন্ত সূর্যের আলোটা কেমন লাল গনগনে হয়ে উঠেছে জোর হাওয়া উঠবে.'

‘হ্যাঁ, তাই তু মনে হচ্ছে’ ইভানকভ সাম মিল

রাতে ঘোড়াগুলোকে জিন-খোলা অবস্থায় রাখা হল শহরের সব আলো নিভে গেল, কোলাহল স্তব্ধ হয়ে গেল। পর দিন সকালে ক্রিউচকোভ চালাঘর থেকে ইভানকভকে ডেকে পাঠান।

‘চল, শহরের ভেতরটাতে যাওয়া যাক।’

‘কেন? কী দরকার?’

‘কিছু খাওয়াদাওয়া পাওয়া যেতে পারে, গলায় ঢালার মতো কিছু জুটে গেলেও যেতে পারে

‘বিশেষ সম্ভাবনা নেই, ইভানকভ সন্দেহ প্রকাশ করল।

‘যা বলছি শোনোই না বাড়ির কর্তাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম। ওই যে ওই ছোট বাড়িটাতে, দেখতে পাচ্ছ খোলায় চালাটা?’ ক্রিউচকোভ লম্বা কালো নখওয়ালা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল। ‘ওখানে ঝুড়ির কাছে বীয়ার আছে চলো যাই, কী বল?’

ওরা দু’জনে চলল। চালাঘরের দরজার ভেতর থেকে উঁকি মেবে ওদের দেখতে পেয়ে হাঁক পাড়ল আস্তাবত

‘তোমরা কোথায় চললে?’

ক্রিউচকোভ পদমর্যাদায় আস্তাবতের উর্ধ্বতন, তাই ওর কথায় কোন আমল দিল না

‘একটুনি কিরে আসছি আমরা।’

‘যেয়ো না, চলে এসো বলছি।’

‘ঘেউ ঘেউ করবি নে।’

ধুড়ি লোকটা এক বুড়ো ইহুদী ইহুদীদের ধর্মগুরুর মতো তার মাথার দু’পাশে রঙের চুলের গোছা লম্বা লম্বা হয়ে ঝুলছে। চোখের পাতা ওলটানো বুড়ো আঙুলি নত হয়ে কসাক দু’জনকে অভ্যর্থনা জানাল

‘বীয়ার আছে?’

‘আর নেই কোসাকমোশাই, ফুরিয়ে গেছে।’

‘আমরা দাম দেব।’

যিশু-মারিয়ার দিবি, থাকলে কি আমি আর আমি একজন সৎ ইহুদী হুজুর, বিশ্বাস করুন, বীয়ার নেই।’

‘বাজে কথা বলছিস তুই ইহুদীর বাচ্চা।’

‘কিন্তু হুজুর বললুম যে নেই।’

যা বলি শোনো।’ রঙটো মনিব্যাগটার জন্য সালোয়ারের জেবের ভেতরে



হাত গলিয়ে দিয়ে বিরক্ত হয়ে লোকটার কণ্ঠের মাঝখানে ক্রিউচকোড বলে উঠল  
'ভালোয় ভালোয় বার করে দাও বলছি, নইলে তুলকালাম কাণ্ড শুরু করে দেব '

ইহুদী কড়ে আঙুল দিয়ে হাতের তালুর ওপর ক্রিউচকোডের দেওয়া মুদ্রাটা  
চোখে ধরল, চোখের গোটানো পাতা নামাল, তারপর বারান্দায় চলে গেল।

মিনিটখানেক বাদে সে এক বোতল ভোদকা নিয়ে উপস্থিত হল। বোতলের  
গাঁটা ভিজে, চারধারে ঘরের কুঁড়ো লেগে আছে।

'তবে? এই যে বললে নেই? এ কেমন ধারা কথা বাপ।'

'আমি বলেছিলাম বীয়ার নেই।'

'সঙ্গে খাওয়ার মতো কিছু চাট দেবে ত '

ক্রিউচকোড ফটাস করে ঝিপিটা খুলে ফেলল, পেয়ালার ডাঙা কানা অবধি  
ট্টেট্টুর কবে ভোদকা ঢালল।

ওরা যখন বেরিয়ে এলো তখন প্রায় মাতাল ক্রিউচকোড নাচতে নাচতে  
চলল জানলার ফালো কোটরে বসা চোখগুলো ডাবডাব করে চেয়ে আছে  
দেখে সেই দিকে মুঠি উচিয়ে শাসাল

চালার ভেতরে আস্তাখন্ড তখন বসে বসে হাই তুলছে। দেয়ালের ওপাশে  
ঘোড়াগুলো মুখের লালায় ডিজিয়ে কচরমচর করে বিচুলি চিবুচ্ছে

সন্ধ্যাবেলায় একটা রিপোর্ট নিয়ে পপোড চলে গেল। দিনটা স্রেফ আলসেমি  
করে কেটে গেল।

সন্ধ্যা রাত্রি অনেক উচুতে, মাথার ওপর ফুলছে হলদে এক ফালি চাঁদ।

থেকে থেকে বাড়ির পেছনের বাগানে আপেল গাছ থেকে ধূপধাপ বসে  
পড়ছে পাকা আপেল। মাঝরাত্রির কাছাকাছি ইভানকভ শহরের বাস্তায় ঘোড়ার  
খুরের খটখট আওয়াজ শুনতে পেল। দেখার জন্য সে হামাগুড়ি দিয়ে খানা  
থেকে উঠে এলো, কিন্তু এমন সময় চাঁদ মেঘে ঢাকা পড়ে গেল সূচীভেদ্য  
ঘূসর অঙ্ককারের মধ্যে দৃষ্টি চালিয়েও কিছু দেখা গেল না

চালারঘরে ঢোকান মুখটাতে ক্রিউচকোড ঘুমোচ্ছিল ইভানকভ তাকে ঠেলে  
জাগাল।

'কোজ্জা ঘোড়ায় চড়ে কারা যেন আসছে। উঠে পড় '

'কোথেকে?'

'শহরের ওপর দিয়ে '

দুজনেই বেরোল বাস্তায় 'শ' দেড়েক হাত দূরে ঘোড়ার খুরের খটখট,  
বসন্তস আওয়াজ স্পষ্ট কানে এসে বাজছে

'চল একছুটে বাগানে যাই 'ওখান থেকে আরও ভালো করে শোনা যাবে।'

বাড়ির পাশ দিয়ে ছুটে ওরা দু'জনে বাগানের ভেতরে গিয়ে ঢুকল। বেড়া ঘেঁসে শূরে পড়ল। অস্পষ্ট কথাবার্তা রেকাবের টুং টাং। জিনের মচমচ শব্দ। আরও কাছে এগিয়ে আসছে। এবারে ঘোড়সওয়ারদের আবছা দেহরেখা চোখে পড়ছে পাশাপাশি চারজন করে সার বেঁধে চলেছে।

‘কে যায়?’

‘কালেক্টর চাই তোমার শূনি?’ সামনের সারি থেকে কে একজন উত্তর দিল।

‘কে যায়? গুলি চালাব কিন্তু!’ ক্রিউচকোভ খটাং করে রাইফেলের ছিটকিনি টানল

‘রোসো, রোসো!’ ঘোড়সওয়ারদের মধ্যে একজন তার ঘোড়া থামিয়ে বেড়ার দিকে এগিয়ে গেল ‘আমরা সীমান্তরক্ষী এটা বর্ডার পোস্ট নাকি?’

‘বর্ডার পোস্ট’

‘কোন রেজিমেন্টের?’

‘তিন নম্বর কসাক রেজিমেন্টের’

‘কার সঙ্গে কথা বলছ ত্রিশিন?’ অন্ধকারের ভেতর থেকে একজন জিজ্ঞেস করল যে লোকটা এগিয়ে এসেছিল সে উত্তর দিল

এটা একটা কসাকটোকি হুজুর।

আরও একজন এগিয়ে এলো বেড়ার কাছে

‘কী খবর হে কসাকরা?’

‘ভালো,’ একটু ইতস্তত করে শেষে বলল ইভানকভ

‘তোমরা কবে থেকে এখানে আছ?’

‘গতকাল থেকে।’

দ্বিতীয় যে ঘোড়সওয়ার এগিয়ে এসেছিল সে দেশলাই জ্বালিয়ে সিগারেট ধরাতে ক্রিউচকোভ তার আলোয় উদ্দি দেখে বুঝতে পারল লোকটা সীমান্তরক্ষিবাহিনীর একজন অফিসার

‘আমাদের বর্ডার রেজিমেন্ট সীমান্ত থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে,’ সিগারেট ধরাতে ধরাতে অফিসার বলল। ‘খেয়াল রাখবে, এখন তোমরাই কিন্তু সীমান্তের সবচেয়ে কাছে আছ শত্রুপক্ষ হয়ত কালই এখানে এগিয়ে আসবে।’

‘আপনারা এখন কোথায় চললেন হুজুর?’ ক্রিউচকোভ জিজ্ঞেস করল। তখনও সে আঙুলে ট্রিগার চেপে রেখেছে

এখান থেকে ক্রোশখানেক দূরে আমাদের যে স্কোয়াড্রন আছে তার সঙ্গে যোগ দিতে যাচ্ছি আমরা ওই চল, চল সব এগোও আজ্ঞা চলি হে কসাকরা, তোমাদের ভালো হোক’

‘আপনারাও ভালোর ভালোয় গিয়ে পৌছোন।’

দমকা হাওয়ায় চাঁদের ওপর থেকে মেঘের পর্দাটা ছিঁড়ে গেল, জায়গাটার সর্বত্র, বাগানের গাছপালার মাথা, বাড়ির খাড়া চালের ঝুঁটি আর টিলার ওপর উঠতে থাকে ঘোড়সওয়ারদের বাহিনীর ওপব ছড়িয়ে পড়ল ফেকাসে হলদে আলোর বন্যা।

পর দিন সকালে স্কয়ারড্রেনের জন্য রিপোর্ট নিয়ে বেরিয়ে পড়ল বৃত্তাচোভ। আশ্চর্যত বাড়ির কর্তার সঙ্গে কথাবার্তা বলে যৎসামান্য দাম দিয়ে ঘোড়াগুলোর জন্য ঘাসজমি থেকে কিছু ঘাস কাটার অনুমতি আদায় করল। সেই রাতে ঘোড়াগুলোকে জ্বিন লাগিয়েই রেখে দেওয়া হল। শত্রুর মুখোমুখি তাদের রেখে দেওয়া হয়েছে, এই কথা ভেবে কসাকরা শঙ্কিত। এর আগে যতদিন তারা জানত যে সামনে সীমান্তরক্ষীদের প্রহরা আছে, ততদিন এরকম বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার বা নিঃসন্ত্রস্ততার কোন উপলব্ধি তাদের ছিল না। সীমান্ত অরক্ষিত। এই সংবাদটা তাদের ওপর আরও তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল।

গৃহকর্তার চাবের ক্ষেত চালা থেকে খুব বেশি দূরে নয়। ইভানকভ অব শেগলকোভকে ঘাস কাটার কাজে লাগিয়ে দিল আশ্চর্যত গৃহকর্তা ওদের সঙ্গে করে নিয়ে চলল তার জমিতে। চলার সঙ্গে সঙ্গে তার মাথার ফেজট-টুপির চূড়োটা ভাঁটুই ফুলের মতো দুলাতে লাগল। শেগলকোভ ঘাস কাটতে লাগল, ইভানকভ ভিজে ভারী ঘাসগুলো বিদা দিয়ে টেনে টেনে এক জায়গায় জড় কবে আঁটি বাঁধতে লাগল। এই সময় আশ্চর্যত দূরবীন দিয়ে সীমান্তের দিককার রাস্তার ওপর নজর রাখছিল। দেখতে পেল একটা বাচ্চা ছেলে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ থেকে ছুটে ছুটে আসছে। ছেলেটা বাদামী রঙের একটা তাড়া খাওয়া খরগোসের মতো টিলা থেকে প্রায় গড়াতে গড়াতে ছুটে আসছে। দূর থেকেই কোর্তার লম্বা হাতটা মেলাতে সোলাতে সে চৈচাতে লাগল। ওদের সামনে চলে আসার পর হাঁপাতে হাঁপাতে চোখ গোল গোল করে ঘোরাতে ঘোরাতে সে চিৎকার করে বলল

‘কোসাক, কোসাক, জের্মানরা আসি গিছে। জের্মানরা আসি গিছে ইথেনে।’

ছেলেটা তার লম্বা চলাচলে হাতটা শূঁড়ের মতো করে বাড়িয়ে দেখিয়ে দিল। আশ্চর্যত দূরবীন চোখে লাগিয়ে গোল কাচের ভেতর দিয়ে দূরে ঘন একদল ঘোড়সওয়ার দেখতে পেল। দূরবীন থেকে চোখ না সরিয়েই সে হাঁক ছাড়ল, ‘ক্রিউচকোভ।’

ক্রিউচকোভ এক লাফে চালারয়ের বাঁকাচোরা দরজার খোলা পালায় ভেতর দিয়ে বাইরে ছুটে এলো, চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে দেখতে লাগল

‘ছুটে যাও দেখি আমাদের সবাইকে চেষ্টায়ে ডাক। জার্মানরা আসছে।’ একটা জার্মান টহলদার দল দেখা যাচ্ছে।’

ক্রিউচকোভ ছুট দিল আন্তাখভ শুনতে পেল তার পায়ের খটখট আওয়াজ। এবারে সে দূরবীনের ভেতর দিয়ে স্পষ্ট দেখতে পেল বাদামী রঙের ঘাসের জমির ওপর থেকে ধেয়ে আসছে ঘোড়সওয়ারদের একটা দল।

এমন কি ঘোড়াগুলোর লালচে বাদামী রঙ আর ঘোড়সওয়ারদের উঁদীর গাঢ় নীল ছোপও সে আলাদা আলাদা করে চিনতে পারছে। সংখ্যায় ওরা বিশজনেরও বেশি। শৃঙ্খলার কোন বলাই না রেখে গায়ে গায়ে লাগালাগি হয়ে ছটলা পাকিয়ে ওরা ঘোড়া ছোটোচ্ছে, আসছে ওরা দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে। অথচ ওদের আশা করা গিয়েছিল কিনা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে। ওরা রাস্তা পার হয়ে গেল। ল্যুবত শহরটা যেখানে রয়েছে সেই উপত্যকা ধরে কোনাকুনি ডাবে টিলার ওপর দিয়ে চলতে লাগল।

ধকলের চোটে ফৌসফৌস নিশাস ছাড়তে ছাড়তে, ঠোঁট কুঁচকে জিভের ডগা দাঁতে চেপে ইভানকভ তখন এক গাদা ঘাস বেঁধে আঁটি করছিল। তার পাশে পা বাকা পোল-চাষীটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাইপ টানছিল। বেল্টের ভেতরে হাত গুঁজে ভুরু কুঁচকে টুপি কানার নীচ থেকে সে স্টেগলকোভের ঘাসকাটা নিরীক্ষণ করছিল।

‘আরে ছোঃ এটা কি একটা কাস্তে হল?’ স্টেগলকোভ রেগেমেগে খেলনাব আকারের হোট কাস্তেটা নাড়াতে নাড়াতে গালাগাল দিয়ে বলল। ‘এই দিয়ে তুমি ঘাস কাট নাকি?’

‘কাটব না কেন?’ পাইপের চিবানো ডগাটা জিভে ঝড়তে ঝড়তে উত্তরে এই কথা বলে বেল্টের ভেতর থেকে একটা আঙুল টেনে বার করল পোল-চাষীটি।

‘তোমার এই কাস্তে কেবল মেয়েছেলেদের একটা জারগাটাতেই চালানো যায়।’

‘হু-হুম্’ পোল সায় দেবার ভঙ্গিতে বলল।

ইভানকোভ ফিক করে হাসল। সে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু কিছু ফিরে তাকাতে দেখতে পেল ক্রিউচকোভ মাঠের ওপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে আসছে। চবা জমির মাটির ডেলার ওপর দিয়ে ছুটতে গিয়ে তার পা ফসকে যাচ্ছে, তলোয়ারের হাতলটা হাতের মুঠিতে ধরে সামান্য উঁচিয়ে রেখেছে।

‘কাজ বন্ধ কর।’

কী হল আবার?’ কাস্তের ডগাটা মাটিতে বিধিয়ে রেখে স্টেগলকোভ জিজ্ঞেস

‘জার্মানরা আসছে।’

ইডানকডের হাত থেকে বাঁধা আঁটিটা পড়ে গেল। গেরস্ মাথা নীচু করে দু'হাত প্রায় মাটিতে ঠেকিয়ে এমন ভাবে বাড়ির দিকে ছুটল যেন তার মাথার ওপর দিয়ে সঁ সঁ করে গুলিগোলা ছুটছে।

ওরা সকলে সবে চালাঘরে পৌঁছে হাঁপাতে হাঁপাতে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসেছে, এমন সময় দেখতে পেল পেলিকালিয়ে'র দিক থেকে ব্রশ সৈন্যদের একটা কোম্পানি শহরটায় এসে ঢুকছে। কসাকরা ঘোড়া ছুটিয়ে তাদের মুখোমুখি হল। আন্তাখভ কোম্পানির কমান্ডারকে রিপোর্ট দিল যে শহর ঘুরে টিলার ওপর দিয়ে জার্মানদের একটা ট্রলার দলকে যেতে দেখা গেছে। ক্যাপ্টেন কটমট করে তার নিজের পায়ের জুতোর দিকে তাকাল, ধুলোব পাতলা প্রলেপ লাগা হাইবুটের ডগার ওপর দৃষ্টিপাত করে জিজ্ঞেস করল 'কতজন আছে ওদের দলে?'

'বিশ জনেরও বেশি।'

'যাও, গিয়ে ওদের পথ আটকাও তোমরা। আমরা এখান থেকে গুলি ছুঁড়ব ওদের ওপর।' এই বলে সে তার কোম্পানির দিকে মুখ ঘোরাল, কোম্পানিকে সার বাঁধার হুকুম দিয়ে দ্রুত মাঠ করিয়ে সৈন্যদের এগিয়ে নিয়ে চলল।

কসাকরা যখন চূড়ায় গিয়ে উঠল, জার্মানরা ততক্ষণে তাদের ছাড়িয়ে চলে গেছে, দুলকি চালে ঘোড়া ছুটিয়ে পেলিকালিয়ে যাবার রাস্তা পাব হচ্ছে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, সকলের আগে আগে একটা সৈজ-ছাঁটা হালকা বাদামী রঙের ঘোড়ার পিঠে চলেছে এক অফিসার।

'তাড়া কর ওদের। আমরা ওদের দু'নম্বর পোস্টে তাড়া করে নিয়ে যাব।' আন্তাখভ নির্দেশ দিল।

শহরে ওদের সঙ্গে যে সীমান্তরক্ষী ঘোড়সওয়ারটি এসে যোগ দিয়েছিল সে পেছনে পড়ে বইল।

'তোমার কী হল? দম ফুরিয়ে গেল নাকি ভাই?' পেছন ফিরে তাকিয়ে আন্তাখভ চৈতাল।

সীমান্তরক্ষীটি হতাশ ভঙ্গিতে হাত নাড়ল, তারপর এক কদম দু'কদম করে এগোতে লাগল শহরের দিকে। কসাকরা দ্রুত দুলকি চালে ঘোড়া ছুটিয়ে চলল। এখন খালি চোখেই জার্মান ড্রাগুনদের নীল উর্দি স্পষ্ট চোখে পড়ে শহর থেকে ক্রোশখানেক দূরে যেখানে দু'নম্বর ঘাঁটিটা আছে, তারা ঠিক সেদিকেই চলেছে, যেতে যেতে কসাকদের দিকে ফিরে তাকাচ্ছে। দুই দলের মধ্যকার ব্যবধান সমানেই কমে আসছে।

'এবারে গুলি চালাও।' জিন থেকে লাফিয়ে নামতে নামতে ভাঙা গলায় আন্তাখভ বলল।

কসাকরা টুপটাপ নেমে পড়ল, মীড়ানো অবস্থায় ঘোড়ার মুখের লাগাম হাতে জড়িয়ে ধরে তাবা গুলি ছুঁড়ল ইভানকভের ঘোড়াটা পেছনের দু'পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, ইভানকভ মাটিতে পড়ে গেল পড়তে পড়তে সে দেখতে পেল জার্মানদের মধ্যে একজন ঘোড়া থেকে গড়িয়ে পড়েছে লোকটা প্রথমে অসঙ্গত ভাবে একদিকে কাত হয়ে পড়ল, তারপর হঠাৎ দু'হাত শুনো ছুঁড়ে পড়ে গেল। ওদেব দলের অন্যেরা থামল না, খাপ থেকে ক্যারাবিন বন্দুকও খুলল না। গতিবেগ বাড়িয়ে দিল ওরা এখন আরও ফাঁক ফাঁক হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে তাদের বর্শার গায়ের ছোট ছোট কাপড়ের নিশানগুলো বাতাসে পতপত করছে আস্তাখভই প্রথম ঘোড়ায় চাপল, তার দেখাদেখি আব সকলে ওরা জোর চাবুক কসাতে লাগল। জার্মান টহলদার দলটা হঠাৎ গোল্ডা মেয়ে বাঁ দিকে ঘুরে গেল কসাকরা তাদের পেছনে তাকা করতে করতে পড়ে থাকা জার্মানটার শ' খানেক হাত দূর দিয়ে চলে গেল এরপর সামনে চলে গেছে উঁচুনিচু জায়গা, অসংখ্য অগভীর নালায় ক্ষতবিক্ষত, বলিরেখা আঁকা ছোট ছোট গর্ত হাঁ করে আছে জার্মানরা নালাটা পেরিয়ে যেই ওপরে উঠতে লাগল। অমনি কসাকরা ঘোড়া থেকে নেমে তাদের ওপর এক ঝাঁক গুলি চালাল। দু'নম্বর ঘাঁটির মুখে আরও একজন জার্মান গড়িয়ে পড়ল

'পড়েছে, পড়েছে!' ব্রেকাবে পা গলাতে গলাতে উল্লাসে চৈচিয়ে বলল ফ্রিউচকোভ

'খামারবাড়ি থেকে একুনি এসে পড়বে আমাদের লোকজন' ওখানে আমাদের দু'নম্বর ঘাঁটি 'তামাকের হলুদ ছোপধরা আঙুলে রাইফেলের কার্তুজের খোপে নতুন কার্তুজের ফ্রিপ ঠাসতে ঠাসতে আস্তাখভ বিভ্রিড় করে বলল

জার্মানরা এবারে সমান তালে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে যেতে যেতে তারা একবার খামারবাড়িটার দিকে তাকাল। কিছু প্রাঙ্গন জনমানবশূন্য, সূর্যের লেলিহান শিখা ঘরবাড়ির খেলার চালাগুলোকে অবিরাম লেহন করে চলেছে আস্তাখভ ঘোড়ার ওপর থেকেই গুলি চালাল। একটা জার্মান একটু পেছনে পড়ে ছিল সে সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঝাঁকিয়ে জুতোর কাঁটা দিয়ে ঘোড়ার পেটে দাবড়ানি মারল

পরে জানা গিয়েছিল খামারবাড়ি থেকে সিকি কোশটাক দূরে জার্মানরা টেলিগ্রাফের তার কেটে দিয়েছে জানতে পেরে আগের মিন রাতেই কসাকরা দু'নম্বর ঘাঁটি ছেড়ে চলে যায়।

ওদেব তাড়িয়ে এক নম্বর ঘাঁটিতে নিয়ে ফেলব' বাকিদের দিকে ফিরে তাকিয়ে আস্তাখভ চিৎকার করে বলল

ঠিক তখনই ইভানকভ লক্ষ করল আস্তাখভের নাকের ছালচামড়া উঠে গেছে,

নাকের ফুটার কাছে পাতলা চামড়া ঝুলঝুল করছে।

‘ওরা নিজেদের বাঁচানোর জন্যে বুখে দাঁড়াচ্ছে না কেন?’ পিঠের রাইফেলটা ঠিক করে নিতে নিতে উদগ্রীব হয়ে সে জিজ্ঞেস করল

‘আরে যোসো না একটু’ হাঁপধরা ঘোড়ার মতো ঘড়ঘড় করে নিশ্বাস নিতে নিতে স্টেগলকোভ বলল

প্রথম যে নাবালটা পড়ল জার্মানরা সৈটার ভেতরে নেমে গেল একবারও পিছন কিয়ে তাকাল না। ওপাশে চাষের জমি কালো চাপ বেঁধে আছে, এ পাশে খোঁচা খোঁচা আগাছা আব পাতলা ধোপঝাড়। আস্তাখভ ঘোড়াটাকে থামাল। মাথার টুপি পেছনে ঠেলে দিল, হাতের পিঠ দিয়ে কপালের বিন্দু বিন্দু জমা ঘাম মুছল অন্যদের দিকে কিয়ে তাকাল এক দলা ধুধু ফেলে বলল, ‘ইভানকভ খাতটার ভেতরে নেমে গিয়ে দেখ দেখি ওরা কোথায় গেল’

ইটের মতো পাটকিলে হয়ে উঠেছে ইভানকভের মুখটা, পিঠে ঘাম জমে উঠেছে, শুকনো চড়চড়ে তৃষ্ণার্ত ঠোঁটদুটো চেটে নিয়ে সে এগিয়ে গেল।

‘একটু তামাক টানতে পারলে হত, চাবুক দিয়ে ডাঁশ তাড়াতে তাড়াতে ক্রিউচকোভ বলল।

ইভানকভ এক কদম দু’কদম করে ঘোড়া চালিয়ে এগোতে লাগল, রেকালে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ষাতের ভেতরে উঁকি মারল প্রথমে সে দেখতে পেল বর্শার ঝকঝকে ফলাগুলো নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে, তারপর আচমকা আবির্ভাব ঘটল জার্মানদের। ওবা চট করে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ঢাল থেকে ওপরে উঠে আসতে লাগল আক্রমণ করার জন্য ছবির মতো তলোয়ার উঁচিয়ে আগে আগে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে একজন অফিসার ঘোড়াটার মুখ ঘোরাতে যে মুহূর্তমাত্র সময় লেগেছিল তারই মধ্যে অফিসারের দাড়িগোঁফচাঁছা গম্ভীর মুখখানা আর সুন্দর বসার ডাবিটি ইভানকভের স্মৃতিতে আঁকা হয়ে গেল। জার্মানদের ঘোড়ার খুরের খট খট শব্দ শিলাঝড়ের মতো বুকের ওপর দিয়ে ছব্বা পিটিয়ে গেল। ইভানকভের মনে হল তার শিরদাঁড়া বয়ে যেন চিনচিন করে খেলে গেল মৃত্যুর হিমশীতল যন্ত্রণা। ঘোড়াটাকে এক ঝটকায় ঘুরিয়ে নিয়ে নিঃশব্দে সে উল্টো দিকে ছুট দিল

আস্তাখভ তামাক বার করেছিল সে তার তামাকের বাঁটুটা বদ্ধ করারও অবকাশ পেল না, জেবেব ভেতরে রাখতে গিয়ে সেটা পাশ দিয়ে গলে পড়ে গেল

ইভানকভের পেছন পেছন জার্মানরা তাড়া করে আসছে দেখে ক্রিউচকোভই প্রথম সামনের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। জার্মানদের সারির ডান পাশ থেকে সৈন্যরা এগিয়ে এসে আড়াআড়ি ইভানকভের পথ আটকানোর চেষ্টা করল তারা অবিশ্বাস দ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে তাকে প্রায় ধরে ফেলল ইভানকভ পেছন

ফিরে তাকাতো তাকাতো ঘোড়ার পিঠে চান্দ্রক আছড়াতে লাগল তার মুখ ছাইয়ের মতো ফেকাসে হয়ে গেল, মুখ বেকে গেল, মুখের মাংসপেশীতে খিচ ধরল, কোটর থেকে ঠেলে বেরিয়ে এলো দু'চোখ। জিনের কাঠামোর ওপর ঝুঁকে পড়ে ঘোড়া ছুটিয়ে আগে আগে আসছে আত্মবিস্ত। ক্রিউচকোভ আর স্কেগলকোভের পেছনে উড়ছে ধুলোর ঘূর্ণিবাদ।

ধরে ফেলল। এই বুঝি ধরে ফেলল ওরা আমাকে।' এই একটি চিঙাই ইভানকভকে এখন পেয়ে বসেছে, তাই আশ্চর্য্যের কোন কথাই তার মনে জাগল না, বিশাল নখর শরীরটাকে গুটিয়ে ডেলা পার্কিয়ে ঘোড়ার কেশরে মাথা ঠেকিয়ে বইল সে।

একটা লম্বা চওড়া কটা চুল জার্মান তার নাগাল ধরে ফেলল। বর্ষার আঘাত করল তার পিঠে ফলাটা কোমরের বেলট ঝুঁড়ে তেরছা ভাবে শরীরের ভেতরে আধ আঙুলখানেক বসে গেল।

'তাই সব, পেছনে কের।' ইভানকভ ঝটিতি ঝপ থেকে তলোয়ার খুলে নিয়ে বিকারগ্রস্তের মতো চিৎকার করে উঠল পাশ থেকে আরও একটা আঘাত তাকে লক্ষ্য করে উঠছিল, সেটাকে সে ঠেকিয়ে দিল, তারপর বাঁ দিক থেকে এক জার্মান ছুটে আসছে দেখে রেকাবে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে তার পিঠে এক কোপ বসিয়ে দিল। কিন্তু দেখতে দেখতে জার্মানরা তাকে ঘিরে ফেলল। জার্মানদের একটা লম্বা চওড়া ঘোড়া বুক দিয়ে তার ঘোড়ার পাজরে খাক্সা মারল, তাতে ঘোড়াটা টাল খেয়ে পড়ে যেতে যেতে দাঁড়িয়ে বইল কাছে, একেবারে সামনাসামনি ইভানকভ জম্পষ্ট ভাবে দেখতে পেল একটা ভয়ঙ্কর, বিজ্ঞাতীয় মুখ।

প্রথমে এসে পড়ল আত্মবিস্ত তাকে এক থাকায় এক পাশে হটিয়ে দিল ওরা জিনের ওপর বনবন করে ঘুরতে ঘুরতে সে তলোয়ার ঘুরিয়ে ওদের দ্বুখতে লাগল, তার দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ল, মুখখানা বিকৃত হয়ে উঠল মড়ার মুখের মতো। একটা তলোয়ারের ডগা ইভানকভের ঘাড়ের একটা পৌচ বুলিয়ে চলে গেল। তার বাঁদিকে কোথা থেকে যেন এসে হাজির হল এক ড্রাগুন, লোকটার তলোয়ার শূন্যে ঝলক দিয়ে উঠল। ইভানকভ তলোয়ার দিয়ে সে আঘাত ঠেকাল, ইম্পাতে ইম্পাতে ঠোকাঠুকি লেগে ঝনঝন আওয়াজ বেজে উঠল পেছন থেকে একটা বর্ষা তার কাঁধপটিতে এসে বিধল, পটিটা কাঁধ থেকে ছিড়ে বেরিয়ে আসার উপক্রম হল একটা ঘোড়া মাথা পেছনে হেলিয়ে এগিয়ে এলো, তার মাথার পেছনে দুলছে এক বয়স্ক জার্মানের মেচেতা পড়া, ঘর্মাক্ত উত্তেজিত মুখ লোকটার ঝুলে পড়া চোয়ালটা থরথর করে কাঁপছে, ইভানকভের বুকো ঘা বসানোর



উদ্দেশ্য নিয়ে সে এলোপাতাড়ি তলোয়ার ঘুরিয়ে যাচ্ছে কিন্তু তলোয়ার দিয়ে কোন সুবিধা করতে না পারায় জার্মানিটি শেষ পর্যন্ত তলোয়ার ফেলে দিল। ইভানকভের মুখের ওপর থেকে দৃষ্টি না সরিয়ে জিনের লাগোয়া হলদে খাপ থেকে হ্যাঁচকা টানে কারাবিন বন্দুকটা বার করল। জার্মানিটার খয়েরি চোখদুটিতে ফুটে উঠল আতঙ্কের চিহ্ন, সে ঘন ঘন চোখ পিটিপিটি করতে লাগল। কিন্তু সে খাপ থেকে বন্দুক বার করতে না করতে ঘোড়ার ওপর দিয়ে ক্রিউচকোভের বর্শা এসে তাকে বিধে ফেলল, জার্মানিটার গাঢ় নীল উর্দির বুকের কাছটা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল, পেছনে মাথা হেলিয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়তে পড়তে ভয়ে বিন্ময়ে সে আর্তনাদ কবে উঠল, ‘মাইন্ গট’\*।

এক পাশে জনা আষ্টেক ড্রাগুন সৈন্য ক্রিউচকোভকে ঘিরে ধরেছে তারা ওকে জ্যান্ত ধরার তাল করছে কিন্তু ক্রিউচকোভ ঘোড়াটাকে পিছনের দু’পায়ে ঝাড়া করিয়ে সর্বান্ত দোলাতে দোলাতে তলোয়ার নিয়ে আক্রমণ ঠেকিয়ে যেতে লাগল। শেষকালে তলোয়ার হাত থেকে খসে পড়ে যেতে কাছের এক জার্মানের কাছ থেকে বর্শা ছিনিয়ে নিয়ে সেটাই এদিক ওদিক চালিয়ে যেতে লাগল, তালিমের সময় তাদের যেমন করতে হত

হটে যেতে বাধা হয়ে জার্মানরা তলোয়ার দিয়ে বর্শার গায়ে খৌঁচা মারতে লাগল। ধমধমে ভাব জাগানো, ছোট এক ফালি কাদা কাদা চষা জমির ওপর বুক বুক ঠেকিয়ে, ফুঁসে ফুঁসে, দুলতে দুলতে তারা যেন মত্ত হাওয়ায় তালে তালে সশ্চর্যে মেরে উঠল। আতঙ্কে দিম্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে কসাক আর জার্মানরা পিঠ, হাত, ঘোড়া, হাতিয়ার বা কিছু সামনে পেল তারই ওপর মর্চা মারতে লাগল, কোপ মারতে লাগল। মৃত্যুর আতঙ্কে কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হয়ে ঘোড়াগুলো যখন তখন উলটোপালটা এ ওর গায়ে ধাক্কা লেগে ছিটকে পড়তে লাগল। লম্বা মুখ ফেঁকাসে চুল এক ড্রাগুন সৈন্য ইভানকভকে কোণঠাসা করে ফেলেছিল। কিছুটা সামলে উঠে ইভানকভ বার কয়েক তার মাথায় ঘা মারার চেষ্টা করল। কিন্তু হেলমেটের ইম্পাক্টের গায়ে লেগে তলোয়ার বারবার পিছলে যেতে লাগল।

আস্ত্রাখভ চক্রবুহ ভেদ করে বেরিয়ে এলো। দরদর করে রক্ত পড়ছে তার। পেছন পেছন ত্যাগ করল জার্মান অফিসারটি। কাঁধ থেকে রাইফেল খুলে নিয়ে প্রায় সরাসরি নিশানায় তাকে গুলি করে মেরে ফেলল। আস্ত্রাখভ এর ফলে সঙ্গে সঙ্গে লড়াইয়ের মোড় ঘুরে গেল জার্মানরা সকলে এলোপাতাড়ি আঘাতে

\* মাই গট (জার্মান)

ক্ষতবিক্ষত হয়ে, তাদের অফিসারকে হারিয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল পিতু ইটতে বাধ্য হল কসাকরা ওদের আর তাড়া করল না। পেছন থেকে গুলিও করল না ওদের লক্ষ্য করে তারা সোজা ঘোড়া ছুটিয়ে চলল পেলিকালিয়েতে তাদের স্কোয়াড্রনের কাছে জার্মানরা তাদের আহত সঙ্গীকে ভুলে নিয়ে সীমান্তের দিকে প্রস্থান করল।

সিকি ফ্রেশ খানেক ঘোড়া ছুটিয়ে চলার পর ইতানকড জিনের ওপর টলতে লাগল।

‘আমার অবস্থা কাহিল আমি পড়ে যাচ্ছি।’ এই বলে সে ঘোড়া খামিয়ে দিল কিন্তু আস্তাখড তার লাগামে টান মারল।

‘চলতে থাক’

মুখে হাত বুলাতে গিয়ে ক্রিউচকোভের সারা মুখ বন্ধে মাখামাখি হয়ে গেল সে হাত দিয়ে বুক টুয়ে দেখল তার ফৌজী শার্টের ওপর ভিজ়ে ভিজ়ে লাল দাগ ফুটে উঠেছে।

যে খামারবাড়িতে দু’নম্বর ঘাঁটি ছিল সেখানে আসার পর তারা দু’ভাগে ভাগ হয়ে গেল।

আঙিনার পেছনে এলডার বনের ভেতরে ছবির মতো ঝলমল করছিল সবুজ ঘাসে ঢাকা একটা জলা জমি।

সেই দিকে আঙুল নির্দেশ করে আস্তাখড বলল ডান দিকে যেতে হবে।

না, বাঁ দিকে ক্রিউচকোভ জোর দিয়ে বলল।

ফলে ভাগ হয়ে গেল তারা আস্তাখড আর ইতানকড একটু দেরি করে শহরে এসে সৌভুল শহরের সীমান্ত তাদের স্কোয়াড্রনের কসাকরা অপেক্ষা করছিল তাদের জন্য।

ইতানকড হাতের লাগাম ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে জিন থেকে লাফিয়ে নামল, তারপর টলতে টলতে পড়ে গেল তার হাতের আড়ট আঙুলগুলো থেকে তলোয়ার ছাড়াতে ওদের বেশ বেগ পেতে হল।

এক ঘণ্টা পরে স্কোয়াড্রনের প্রায় সকলে ঘোড়া ছুটিয়ে গেল জার্মান অফিসারটা যেখানে মরে পড়ে ছিল সেই জায়গায় কসাকরা তার জুতো, জামাকাপড় আর অস্ত্রশস্ত্র খুলে নিল তারা সকলে ভিড় করে দাঁড়িয়ে নিহত লোকটার ভুবু কৌচকানো কচি মুখখানা ঝুটিয়ে ঝুটিয়ে দেখতে লাগল মুখটা ততক্ষণে পাতুর হয়ে এসেছে উত্ত-খোপিওরস্কায়ার তারাসড এরই মধ্যে নিহত অফিসারের সুপোর হাতঘড়িটা চটপট খুলে নিয়েছে ওখানেই সে ওটা বেচে দিল একজন টুপ-সার্জেন্টের

কাছে। লোকটার মনিবাণের ভেতরে পাওয়া গেল গোটা কয়েক টাকা। একটা চিঠি, একটা খামের মধ্যে একগোছা কিনকিনে ফেকাসে রাঙের চুল, একটি মেয়ের কোটো তার ঠোঁটের কোনায় লেগে আছে সদৰ্প হাসি

## নয়

এই ঘটনা পরে একটা কীর্তি বলে জাহির হল। স্কোয়াড্রন-কমান্ডারের ত্রিষপাত্র ক্রিউচকোভ, তার সুপারিশক্রমে সে সেন্ট জর্জ ক্রস পেয়ে গেল তার সঙ্গীরা আড়ালে ঢাকা পড়ে রইল। বীৰপুরুষটিকে পাঠিয়ে দেওয়া হল ডিভিশনের সদর দপ্তরে, যুদ্ধ যত দিন শেষ না হল ততদিন সে সেখানে শূন্যে বসে কাটাল। শূন্য তাই নয়, পেরোখাদ আর মস্কো থেকে প্রভাবশালী মহিলা আর হোমরা-চোমরা অফিসাররা তাকে দেখতে আসতে থাকায় সেই সুবাদে আরও তিনটে ক্রস পেল। মহিলারা বিশ্বয়ে হাঁ হয়ে যান, ঘনের এই কসাকটিকে তাঁরা দামী দামী সিগারেট আর মণ্ডামিঠাই দিয়ে আপ্যায়ন করেন। প্রথম প্রথম সে তাঁদের অজস্র শাপ-শাপান্ত করত। কিন্তু অফিসারের পদমর্যাদাচিহ্নধারী যে সব মোসাহেব সদর দপ্তরে ছিল তাদের শূভ প্রভাবে পরে সে এটাকে বেশ একটা লাভজনক জীবিকা বানিয়ে ফেলল। সে ভালো করে রঙ চড়িয়ে, ফলাও করে তার ‘কীর্তিকাহিনী’ বলতে লাগল। মিথ্যে বলতে তার এতটুকু বিবেকে বাধত না। মহিলারা তার কাহিনী শুনে পুলকিত হতেন, যুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন কসাক বীরের বসন্তের দাগগুয়লা ডাকাডাকা মুখের দিকে। এতে সবাই সজুট, সবাই খুশি।

জার এলেন আর্মির হেড কোয়ার্টার দেখতে, ক্রিউচকোভকে নিয়ে যাওয়া হল দর্শনীয় বস্তু হিসেবে। কটাগোছের চুল সম্রাট তাঁর ঢুলু ঢুলু চোখের দৃষ্টি বুলিয়ে এমন ভাবে ক্রিউচকোভকে দেখলেন যেন ও একটা ঘোড়া। থলথলে ভারী চোখের পাতাদুটো মিটমিট করে তিনি ওর পিঠ চাপড়ালেন।

‘সাবাস কসাক’ তারপর অনুচরবৃন্দের দিকে ফিরে বললেন, ‘আমাকে একটু ‘হজমি পানি’ দিন’

ক্রিউচকোভের ঝুটিমাথা খবরের কাগজ আর পত্রিকার পাতায় যেন পাকাপোক্ত জায়গা করে নিল। ক্রিউচকোভের ছবি নিয়ে সিগারেটও বেরোল বাজারে। নিজনি-নোভগরদের ব্যবসায়ীরা তাকে সোনার কাজ করা একটা তলোয়ার উপহার দিল।

যে জার্মান অফিসারকে আন্তাখভ মেরেছিল তার গা থেকে সেই যে উর্দিটা খুলে নেওয়া হয়েছিল সেটা প্রাইভেডের একটা বেশ চওড়া টুকরোর ওপর সঁটি

হল। তারপর জেনারেল ফন রেনেনকামফ\* তার এডজুটেন্ট আর ইভানকভকে ওই বোর্ডে আটা প্রদর্শনী-বস্তুটা সমেত একটা মোটরগাড়িতে চাপিয়ে রণজয়ের সমুখ সারিতে পাঠানোর জন্য প্রস্তুত বাহিনীর সামনে দিয়ে গাড়ি চড়ে যেতে যেতে গার্ড অব অনার নিলেন এবং জ্বালাময়ী আনুষ্ঠানিক ভাষণ দিলেন।

অথচ আসলে যা ঘটেছিল তা সম্পূর্ণ অন্য রকম আসলে এমন কিছু লোকের মধ্যে সম্ভব ঘটেছিল মৃত্যুর প্রান্তরে। যারা তখন পর্যন্ত তাদেরই মতো জীবকে হত্যা করার বিন্যা ঠিক আয়ত্তে আনতে পারে নি, তারা মুখোমুখি সম্মুখ পড়ে, হোট্ট শেয়ে পড়ে গিয়ে পশুর মতো আতঙ্ক-বিহ্বল হয়ে পড়েছিল। তাই অজ্ঞের মতো এ ওকে আঘাত করেছিল, নিজেদের অজ্ঞহানি ঘটিয়েছিল, ঘোড়াগুলোরও অজ্ঞহানি ঘটিয়েছিল। গুলির শব্দ শুনে সেই গুলিতে তাদের একজন মারা যেতে তারা ভয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। পালিয়ে গিয়েছিল তাদের মনোবল ভেঙে যেতে।

এরই নাম হল কীর্তি, এরই নাম বীরত্ব



ফ্রন্ট তখনও বহু যোজনব্যাপী এক অবাধ্য কুটিল সাপের আকার ধারণ করে নি। সীমান্তে থেকে থেকে দু'পক্ষের ঘোড়সওয়ার বাহিনীর মধ্যে সম্মুখ আর লড়াই বাধছে। যুদ্ধ-ঘোষণার পবে প্রথম কয়েকদিন জার্মান সেনাপতিমণ্ডলী বিরুদ্ধপক্ষের হালচাল বোঝার জন্য শত্রু ধরনের টহলদার অস্বারোহী দল নামিয়েছিল। ওদের সেই টহলদারেরা আমাদের টৌকিগুলোর পাশ দিয়ে গলে গিয়ে গোপনে সামরিক ইউনিটগুলোর সংখ্যা ও অবস্থানস্থল সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য জেনে নেওয়ার ফলে আমাদের বিশেষ উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ব্রুসিলোভের আট নম্বর আর্মির ফ্রন্টের আশে সামলাচ্ছিল জেনারেল ফাল্কেদিনের নেতৃত্বে বারো নম্বর ঘোড়সওয়ার ডিভিসন। তার খানিকটা বাঁয়ে এগারো নম্বর ঘোড়সওয়ার ডিভিসন অস্ট্রিয়ার সীমান্ত পার হয়ে এগিয়ে চলছিল। ডিভিসনের ইউনিটগুলো যুদ্ধে লেন্সনিউড ও ব্রোডি দখল করে নেওয়ার পবে এখন এক জায়গায় থিতু হয়ে

\* প্যাভেল কার্লভিচ রেনেনকামফ (১৮৫৪-১৯১৮) রুশ অস্বারোহী বাহিনীর জেনারেল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে আর্মির কমান্ডে ছিলেন। পূর্ব প্রাশিয়া অপারেশনে পরাজয়ের জন্য যারা দোষী সাব্যস্ত হন তাঁদের একজন। অনুঃ

গেছে এদিকে অস্ট্রীয়দের শক্তিবৃদ্ধি পেয়েছে, আর হাঙ্গেরীয় ঘোড়সওয়ার সৈন্যরা সরাসরি আমাদের ঘোড়সওয়ারদের ওপর এসে চড়াও হচ্ছে, আমাদের পর্ব্বদন্ত করে দিয়ে ব্রোডির দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

লেশনিউভের উপকণ্ঠে সেই প্রথম লড়াইয়ের শর গ্রিগোরি মেনেখভ ভেতরে ভেতরে এক অসহ্য ক্রান্তিকর মানসিক যন্ত্রণায় ভুগতে লাগল। সে চোখে পড়ার মতো শুকিয়ে গেল তার ওজ্বল কন্মে গেল। সামরিক অভিযানে যাত্রার পথে বিজ্ঞানের সময়, ঘুমের ঘোরে স্বপ্নে অর্থজ্ঞানর অবস্থায় ঘন ঘন তার চোখের সামনে ভেসে উঠতে থাকে সেই অস্ট্রীয় সৈনিকটির চেহারা যাকে সে লোহার রেলিংয়ের ধারে সেদিন কুপিয়ে মেরে ফেলেছিল। বারবার ঘুরে ফিরে স্বপ্নের মধ্যে দেখা দিতে থাকে প্রথম লড়াইয়ের সেই বেদনাদায়ক দৃশ্য, এমন কি ঘুমের ঘোরে সেই স্মৃতির অসহনীয় ভারে সে জর্জরিত হয়ে পড়ে, সে যেন অনুভব করতে পারে বর্ষার ডাঙা মুঠো করে ধরা ডান হাতের খবখর কাঁপুনি ঘুম ভেঙে চেতনা ফিরে পেয়ে জোর করে স্বপ্নকে তাড়ানোর চেষ্টা করে দু'হাতে চোখ ঢাকবে বেশি জোরে কোঁচকানোর ফলে বাথায় টনটন করতে থাকে তার দু'চোখ।

ক্ষেতের ফসল পেকে উঠেছে এই সময় পাকা ফসলের ক্ষেত মাড়িয়ে চলে গেল ঘোড়সওয়ার দল ক্ষেতের ওপর পড়ে বইল ঘোড়ার নালের ধারাল কাঁটার চিহ্ন দেখে মনে হয় যেন গোটা গ্যালিসিয়া ভূমির ওপর দিয়ে শিলাবৃষ্টির ছব্বা ছিটিয়ে পড়েছে। সৈন্যদের ভারী ভারী বুটগুলো রাস্তাঘাটের ওপর দিয়ে দুরমুশ পিটিয়ে চলে গেল, বড় রাস্তার জায়গায় জায়গায় বীধানো শান খসে গেল। আগস্টের জলকাদা ময়ন করে তুলল।

যেখানে যুদ্ধ চলছে সেখানে ধরিত্রীর বিষম মুখখানা গুলিগোলায় গর্ত গর্ত হয়ে বসন্তের দাগের মতো দেখাচ্ছে, লোহা আর ইস্পাতের ভাঙা টুকরোগুলো সেখানে বসে গিয়ে জং ধরছে, মানুষের রক্তের জন্য আকুলি-কিকুলি করছে রাত্রি রক্তিম উষাব আভা নিগন্ত ছাড়িয়ে আকাশের দিকে দীর্ঘ বাহু মেলে ধরে গ্রামগঞ্জ নগর পল্লী সব বিদ্যুৎশিখার মতো দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে আগস্ট যখন ফল পাকে, ক্ষেতের ফসলে পাক ধরে, তখন আকাশ তার মুখের হাসি ঘুটিয়ে ধূসর হয়ে ওঠে, কচিৎ দেখা পাওয়া সুন্দর দিনগুলো ভ্যাপসা গরমে হয়ে ওঠে ক্রান্তিকর।

আগস্ট প্রায় শেষ হয়ে এলো। বাগানের গাছপালার পাতায় পাতায় গাঢ় হলুদ রঙের প্রলেপ পড়েছে ডালে ডালে মৃত্যুযন্ত্রণাকাতব বস্ত্রবর্ণের বান ডেকেছে দূর থেকে মনে হয় গাছপালাগুলো যেন আঘাতে আঘাতে ক্ষতবিক্ষত আর সেই সমস্ত ক্ষতস্থান থেকে গলগল করে ঝরছে প্রবল রক্তের ধারা।

গ্রিগোরি আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ করল যে স্কোয়াড্রনের অন্যান্য সঙ্গীদের মধ্যে পরিবর্তন ঘটেছে প্রাথর জিকভ গালের ওপর ঘোড়ার মালের কাটা চিহ্ন নিয়ে সামরিক হাসপাতাল থেকে ফিরে এলো, এখনও তার ঠোঁটে কোনো বেদনা আর বিশ্বয়ের ভাব লুকানো বাছুরের মতো বড় বড় মমতাভরা চোখদুটি আরও ঘন ঘন মিটমিট করে। ইয়েগোর জারকোভ সুযোগ পেলেই অসহ্য নোংরা খিঁচি করে, আগের চেয়েও বেশি মাত্রায় অশ্লীল গালিগালাজ করে। দুনিয়ার সব কিছুর শাপ-শাপাণ্ড করে গ্রিগোরির একই গ্রাম থেকে এসেছে ইয়েমেলিয়ান প্রোশেভ। গভীর প্রকৃতির কসাক, বেশ কাজের লোক। ইসানী আগাগোড়া পুড়ে যেন কয়লাব মতো কালো হয়ে গেছে, বোকাব মতো যখন তখন হি হি কবে হাসে বোঝাই যায় হাসিটা তার চোঁকাত, বিষয় ধরনের। প্রত্যেকেরই চোখেমুখে পরিবর্তনের ছাপ পড়েছে, যুদ্ধ তাদের মধ্যে যে বীজ বপন করেছে প্রত্যেকে যে যার মতন কবে সেই বীজ অস্তুরে অস্তুরে বহন লালনপালন করতে লাগল।

তিনদিনের বিশ্রামের জন্য রেজিমেন্টটাকে ব্রস্ট লাইন থেকে সরিয়ে আনা হয়েছে। ঘন অঞ্চল থেকে যে সেনাবল এসেছে তাই দিয়ে রেজিমেন্টের শক্তিবৃদ্ধি করা হবে। গ্রিগোরিদের স্কোয়াড্রনের সকলে সবে জমিদারবাড়ির পুকুরে স্নান করতে যাবে বলে তোড়জোড় করছে, এমন সময় তালুকের ক্রোশখানেক দূরের একটা স্টেশন থেকে ঘোড়সওয়ারদের একটা বেশ বড়সড় দলকে বেরিয়ে এদিকে আসতে দেখা গেল।

চার নম্বর স্কোয়াড্রনের কসাকরা যখন পায়ে হেঁটে বাঁধের কাছে গিয়ে হাজির হল ততক্ষণে বাহিনীটা স্টেশন থেকে বেরিয়ে টিলার গা বয়ে নীচে নেমে পড়েছে, তখন দেখে বোঝা গেল ওটা একটা কসাক ঘোড়সওয়ার প্রাথর জিকভ বাঁধের ওপরে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে গায়ের ফৌজী শার্ট খুলছিল মাথাটা জামার ভেতর থেকে ছাড়ানোর পর সে ভালো করে দেখে বলল, 'আমাদের দনের ঘোড়সওয়ার দল'।

সারিটা সাপের মতো একেবেকে এই জমিদারীটার ভেতরেই এসে ঢুকছে 'রিজার্ভ ফৌজ চলেছে।'

'আমাদের দল ভাবী করার জন্যে আসছে বোধহয়'।

'পরের আরেক খেপের লোকজন যোগাড় করতে আসছে বলে মনে হচ্ছে।'

'আরে দাখ দাখ স্তপান আস্তাখভ না? ওই যে তিনের সারিতে।' ভাঙা ভাঙা গলায় সামান্য হেসে চোঁচিয়ে বলে উঠল প্রোশেভ।

'যাদের পলটনের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে সেই সা বুডো হাবডাদেরও ওরা যোগাড় কবে তুলে নিচ্ছে।'

‘আর ওই যে আনিকুশকা।’

‘শ্রিশকা! মেলোখড ওই যে তোর দাদা দেখতে পাচ্ছিস?’

‘দেখেছি।’

‘ওরে অকম্বার খাড়ি তোর কাছে খাওয়া পাওনা রইল আমিই আগে দেখতে পেয়েছি।’

গ্রিগোরির দুই গালের হাড়ের ওপরকার চামড়ার ভাঁজগুলো কঁচকে উঠল। পেত্রোর ঘোড়াটাকে সে চেনার চেষ্টা করল মনে মনে ডাকল, ওরা নিশ্চয়ই নতুন একটা কিনে দিয়েছে ওকে।’ দাদার মুখের ওপর দৃষ্টি ফেরাতে মনে হল বহুদিন আগে তাদের সেই যে শেষ দেখা হয়েছিল তার পর থেকে দাদার চেহারাটা যেন অজুত রকম পালটে গেছে - বুখটা রোমে পুড়ে গেছে, সোনালি রঙের গৌকজোড়া ছোট করে ছাঁটা ছবুজোড়া রোমে পুড়ে নুপোলি বর্ণ ধারণ করেছে মাথার টুপিটা খুলে হাতে নিয়ে যন্ত্রচালিতের মতো নাড়াতে নাড়াতে সে দাদার দিকে এগিয়ে গেল। দেখে মনে হচ্ছিল যেন সে যুদ্ধের মহড়া দিচ্ছে তার পেছন পেছন বুনো লতাপাতার ফাঁপা কচি ডাঁটা আর বহুকালের খুরখুরে চোরকাটার ঘোণ ভাঙতে ভাঙতে বাঁধের ওপর থেকে হুড়হুড় করে ছুটল অর্ধনগ্ন কসাকের দল।

রিজার্ড স্কোয়াড্রনটা বাগান ঘুরে এসে ঢুকল রেজিমেন্ট যেই জমিদারবাড়িতে ছিল। সেখানকার আঙিনায়। ওদের চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল ভারী চেহারার একজন শ্রবীণ মেজর। লোকটার মাথা সদা কামানো, তার নিখুঁত কামানো কর্তৃত্ববাঞ্জক মুখের চারধারে কাঠের মতো কঠিন রেখা।

‘বাটা নির্ঘাত গাঁক গাঁক করে কথা বলে, আর পাজীও হবে,’ দাদার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে মেজরের শব্দসমর্থ সোজা মূর্তিটার ওপর এক বলক দৃষ্টি পড়তে গ্রিগোরি মনে মনে ভাবল মেজরের ঘোড়াটার নাক বাঁকা, দেখে মনে হয় কালমিক জাতের।

‘স্কোয়াড্রন।’ কান্নার মতো ধনবন করে বেজে উঠল মেজরের চাঁছাছোলা গলা ‘টুপে টুপে সার বেঁধে বাঁয়ে মোড়। সামনে এগো মাচ।’

‘এই যে দাদা, দাদা গো।’ আনন্দে উজ্জ্বলিত হয়ে গ্রিগোরি চৌচৌয়ে উঠল পেত্রোর দিকে চেয়ে মৃদু হাসল।

‘জয় ভগবান তোদের কাছে এলাম তাহলে কেমন চলাছে?’

‘মন্দ নয়।’

‘বৈচে বর্তে আছিস তাহলে?’

‘এখন পর্যন্ত ত আছিই।’

‘বাড়ির সকলের ভালোবাসা জানিস।’

কেমন আছে সবাই?’

‘ভালোই আছে।’

হালকা বাদামী লোমে ঢাকা বলিষ্ঠ ঘোড়ার পাছার ওপর হাত ঠেকিয়ে পেত্রো গোটা শরীরটা পেছনে ঘুরিয়ে হাসি হাসি চোখের দৃষ্টি বুলাল খ্রিগোরির ওপর, তারপর ঘোড়া ছুটিয়ে দিল সামনের দিকে জানা-অজানা আরও সব কসাকের খুলিখুলিরিত পিঠেব আড়ালে সে ঢাকা পড়ে গেল।

‘আরে মেলেন্ড যে! গায়ের সকলের শুভেচ্ছা!’

‘তুইও আমাদের এখানে এলি নাকি?’ সোনালি রঙের ঘন চুলের ঝুটি দেখে মিশকা কশেভয়কে চিনতে পেরে দাঁত বার করল খ্রিগোরি।

‘হ্যাঁ এলাম আমরা হলেম গিয়ে মুরগীর মতো। যেখানে খুদকুডো আমরাও সেখানে।’

‘এখানে ঠোকরানোর মতো অনেক খুদকুডো পাবি হয়ত শেষ অবধি তোকেই ঠোকরায়ে।’

‘তা আর বলতে।’

বঁধের ওপর থেকে গায়ে একটিমাত্র জামা সঞ্চল করে এক পায়ে ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে ছুটে এলো ইয়েগোর জাবকোভ সালোয়ারটা ঢলঢল করছে দু’পা দু’দিকে ছড়িয়ে এক দিকে কাত হয়ে সে ধস্তাধস্তি করে ভেতরে পা গলানোর চেষ্টা করতে লাগল।

‘এই যে কসাকরা কী স্ববর?’

‘আরে। এ যে ইয়েগোর জাবকোভ দেখছি।’

এই যে বাপু তিড়িংবিড়িং ঘোড়ার ছুনা, কী মনে করে? পায়ে ছাঁদন দিতে হল নাকি?’

‘মা কেমন আছে?’

‘বঁচে আছে।’

‘আশীর্বাদ জানিয়েছেন কিছু জিনিসপত্র পাঠাতে চেয়েছিলেন নিতে পারি নি অমনিতেই বজ্র ভারী হয়ে গেছে।’

ইয়েগোর অতি গভীর মুখে উত্তরটা শুনল, তারপর ন্যাংটো পাহাতেই ঘাসের ওপর বসে পড়ল মুখের বিহ্বল ভাবটা লুকানোর চেষ্টা করতে কবতে তখনও সে ধরধর কাঁপা পা-টা প্যাটের ভেতরে গলানোর জন্য ধস্তাধস্তি করতে লাগল।

অর্ধনগ্ন কসাকরা সবাই নীল রঙ করা বেড়াটার ধারে সার বৈধে দাঁড়িয়ে পড়ল এদিকে দু’ধারে বাদামগাছের সারি দেওয়া পথের ওপর দিয়ে ওপাশ



থেকে দল ভারী করার জন্য আঙিনায় এসে জুটতে লাগল দনের স্কোয়াড্রনটা  
কী খবর দেশ-ভাই ?

‘আরে আমাদের কুটুম আলেক্সান্দর না ?’

‘হ্যাঁ ঠিকই খবরছ

‘আলেক্সেইয়ান’ ওরে কুলোপানা কান শয়তান আলেক্সেইয়ান। চিনতে পারছিস না ?’

‘ওহে সেপাইকী, তোমার বৌ তোমাকে ভালোবাসা জানিয়েছে ’

‘যিশু খ্রীষ্ট রক্ষা করুন তোমাকে

‘আচ্ছা বরিস বেলোভ কোথায় বসতে পার ?’

‘কোন স্কোয়াড্রনে ছিল ?’

‘যদূর মনে হয় চার নম্বরে ’

‘কোথাকার লোক সে ?’

‘ভিওশেনস্কায়্যা জেলাব জাতোনের ।’

‘কী দরকার শুনতে পাবি কি ? দু’জনের দ্রুত কথাপকথন তৃতীয় আরেকজনের  
কানে উড়ে আসতে সে জিজ্ঞেস করল

‘দরকার আছে বলেই না খুঁজছি চিঠি আছে তার নামে ’

এই সেদিন রাইব্রোডিতে মাঝা গেছে ভাই ’

‘বল কি ’

‘মাইরি বলছি। আমার চোখের সামনে। বাঁ দিকের বুকের ঠিক চুচির নীচে  
গুলিটা লাগল ।’

‘তোমাদের এখানে চোরনায়্যা রেচকার কেউ আছে ?’

‘না নেই চল এগিয়ে চল ।’

স্কোয়াড্রন তার লেজ গুটিয়ে এনে আঙিনার মাঝখানে সার বৈধে দাঁড়াল  
কসাকরা স্নান করতে ফিরে গেলে বাঁধটা আবার লোকজনে গিজগিজ করতে লাগল ।

রিজার্ভ-স্কোয়াড্রন থেকে যে দলটা সব এসেছিল খানিকক্ষণ বাদে তারাও  
এসে ওদেব সঙ্গে যোগ দিল গ্লিগোরি দামার পাশে বসে পড়ল। বাঁধেব এটেল  
মাটি থেকে একটা ভারী সৌন্দ্য সৌন্দ্য গন্ধ উঠছে। বাঁধের প্রান্তের জল ঘন  
শৈবালে গাঢ় সবুজ হয়ে আছে গ্লিগোরি তার জামার সেলাই আর ভাঁজের  
ভেতর থেকে উকুন বার করে টিপে মারতে মারতে বলে চলল, ‘আমি, দামা  
মনের দিক থেকে মরে গেছি। আমি এখন কেমন যেন একটা আধমরা অবস্থার  
মধ্যে আছি। যেন ওবা আমাকে হাতাকলের মধ্যে পিষে মেরে ফেলেছে,  
নিঙড়ে বস বার করে আমাকে জ্বিড়ে করে ফেলে দিয়েছে অভিযোগের সুরে  
কথাগুলো বলতে বলতে তার কণ্ঠস্বর ধরে গেল, একটা গভীর রেখা কেবল

তখনই এটা লক্ষ করে পেত্রো ভেতরে ভেতরে শঙ্কিত হয়ে উঠল) কালো হয়ে ফুটে উঠে ওর কপালের ওপর দিয়ে আড়াআড়ি ভাবে চলে যেতে ওকে এমন অদ্ভুত আর অপরিচিত স্বেচ্ছাতে লাগল যে সেই পরিবর্তন ভয়ের উদ্বেক করে।

‘সে আবার কী রকম?’ গায়ের জামা টেনে খুলতে খুলতে পেত্রো জিজ্ঞাস করল বেবিয়ে পড়ল তার সাদা বস্ত্রের শরীরটা, সেই সঙ্গে স্পষ্ট হয়ে উঠল ঘাড়ের চারধারে সমান গোল হয়ে কেটে বসে রোদে-পোড়া দাগ।

‘কী রকম? তাহলে বলি শোন গ্রিগোরি তাড়াহুড়ো ক’বে বলতে শুরু করল বলতে গিয়ে তিড়তায় কঠিন হয়ে উঠল তার কণ্ঠস্বর। একদল লোকের সঙ্গে আরেক দল লোকের লড়াই বাধিয়ে দিয়েছে ওরা, এদিকে নিজেরা দিবি কেটে পড়েছে মানুষ হয়ে উঠেছে নেকড়েও অধম। যে দিকে তাকাও কেবল হিংসা আর বিদ্বেষ। আমার ত মনে হয় কোন লোককে যদি আমি কামড়ে দিই তাহলে সে পাগল হয়ে যাবে।’

‘তোকে কি কখনও খুন করতে হয়েছে কাউকে?’

‘হ্যাঁ গ্রিগোরি প্রায় চিৎকার করে এই কথা বলে জামাটা দলা পাকিয়ে পায়ের কাছে ছুঁড়ে ফেলে দিল অনেকক্ষণ ধরে আঙুল দিয়ে গলাটা এমন ভাবে রগড়াতে লাগল যেন কথাটা গলার আটকে যেতে ঠেলে নামিয়ে দিচ্ছে। তারপর সে তাকিয়ে রইল একপাশে।

‘বল দেখি আমাকে’ পেত্রো আদেশের সুরে বললেও ভয়ে আর চোখ তুলে ভাইয়ের চোখের দিকে তাকাতে পারল না।

‘আমি বিবেকের তাড়নায় মবছি লেশনিউভের কাছাকাছি একটা জায়গায় আমি একজনের বুকে বর্শা বিধিয়ে দিই আমার তখন মাথার ঠিক ছিল না।

এ ছাড়া অবশ্য উপায়ও ছিল না কিন্তু আরেকজনকে যে আমি কুপিয়ে মারলাম সেটা কেন?’

‘বেশ তারপর?’

‘তারপর আবার কি? লোকটাকে মিহিমিছি কুপিয়ে মারলাম, এখন হারামজাদাটির জন্যে আমি মনে বড় কষ্ট পাচ্ছি শালা শূয়োরের ব্যাচ্চা। রোজ রাতে আমাকে স্বপ্নে দেখা দেয়। বলি মোবটা কি আমার?’

‘তুই এখনও ঠিক সামলে উঠতে পারিস নি দেখছি দাঁড়া আস্তে আস্তে হাতস্থ হয়ে যাবি

‘তোমাদের ব্রোয়াদ্রনটা রিজার্ভে আছে নাকি?’ গ্রিগোরি জিজ্ঞাস করল

‘না, তা কেন হতে পারে? আমরা সাতাশ নম্বর রেজিমেন্টে আছি।’

‘ও, আমি ডাবলাম বুঝি আমাদের দল ভারী করার জন্যে এসেছে তোমরা।’

‘আমাদের স্কোয়াড্রনটা কোন একটা পায়-সল ডিভিশনের সঙ্গে এসে মেলার কথা আমরা তার নাগাল ধরতে চলেছি একটা রিজার্ভ স্কোয়াড্রন অবশ্য আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলছিল, সেখান থেকে অল্পবয়সীদের জুড়ে দেওয়া হয়েছে তোমাদের সঙ্গে।’

‘তা-ই বল। আচ্ছা, এবার তাহলে চান করা যাক।’

খ্রিগোরি চটপট সালোয়ার খুলে ফেলল, গিয়ে দাঁড়ান বাঁধের একেবারে মাথায়। গায়ের রঙ খয়েরি সূঠাম দেহটা একটু কুঁকে পড়েছে। পেত্রোর মনে হল শেষবার যেমন দেখেছিল তারপর থেকে একটু যেন বড়িয়ে গেছে। দু’হাত ছড়িয়ে দিয়ে মাথা নীচু করে খ্রিগোরি জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল, ভাবী সবুজ ঢেউ চারপাশ থেকে এসে তাকে ঢেকে দিল তারপর জল ছিটানোর সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। খ্রিগোরি আন্তে করে কাঁধদুটো নাড়াতে নাড়াতে স্নিগ্ধ ভঙ্গিতে হাত দিয়ে জল কাটিতে কাটিতে সীতারে চলে গেল মাঝ বরাবর, যেখানে একদল কসাক ঝাঁপাঝাঁপি হৈ ইটুগোল করছিল

গলার ক্রুশটা আর লেখা প্রার্থনার সঙ্গে সেলাই করে রাখা মায়ের আশীর্বাদীটা খুলে রাখতে পেত্রোর অনেকটা সময় লেগে গেল। সুতো-বাঁধা তাবিকটা কাপড়জামার নীচে গুঁজে রেখে দিয়ে কেমন যেন ভরে ভরে সতর্ক হয়ে, কুঠাভরে জলে নামল। বুক আর কাঁধ জলে ভেজাল, তারপর একটা অশুট আওয়াজ তুলে জলে ডুব দিল, খ্রিগোরিকে ধরার জন্য সীতার কাটিতে লাগল ওরা দু’জনে তফাতে তফাতে থেকে একই সঙ্গে সীতার কেটে চলল অন্য পাড়ের দিকে পাড়টা বালিতে ভর্তি, ঝোপেঝাড়ে ছেয়ে আছে

হাত পা বেলানের ফলে শরীর মন জুড়িয়ে গেল শান্ত হয়ে এলো খ্রিগোরি হাত ঝাপটে সীতার কাটিতে কাটিতে কথা বলতে লাগল সংযত হয়ে এই একটু আগে যে আবেগোচ্ছ্বাস সে দেখিয়েছিল তার ছিটেফোঁটাও এখন আর পাওয়া গেল না খ্রিগোরির কথার মধ্যে।

‘উকুনে আমাকে ধৈয়ে ফেলল। ঘরের জন্য মনটা বড় আনন্দান করছে আহা এখন যদি বাতি যেতে পারতাম দুটো ডানা যদি আমার থাকত তাহলে ঠিক উড়ে যেতাম অস্তুত একবার যদি চোখের দেখাও দেখতে পেতাম। বাড়ির সবাই আছে কেমন?’

‘নাতালিয়া আমাদের কাছে আছে।’

‘আঁ?’

‘আমাদের সঙ্গেই বাস করছে।’

‘বাবা মা কেমন আছে?’

‘মন্দ নয়। নাতালিয়া কিন্তু এখনও তোর পথ চেয়ে বসে আছে ও মনে মনে ধরে রেখেছে তুই ওর কাছে ফিরে আসবি।’

গ্রিগোরি নাক ঝাড়ার আওয়াজ করল তার মুখে জল ঢুকেছিল কোন কথা না বলে কুলকুচি করে সে সুখের ভেতরকার জল ফেলল পেরো ঘাড় ফিরিয়ে ভাইয়ের চোখে চোখে তাকানোর চেষ্টা করল

‘চিঠিতে অঙ্কত ওর ভালোমন্দ জানতে চেয়ে দু’ছত্তর লিখলেও ত পারিস তুইই মেরেটার একমাত্র ধ্যানজ্ঞান।’

‘কী চাই ওর? ছেঁড়া সুতোয় শিট লাগাতে চায়?’

‘তা হ্যাঁ, কী আর বলি তোকে? মানুষ আশা নিয়েই বেঁচে থাকে চমৎকার মেয়ে! বেশ কড়া ধাঁচের নিজেকে রাশ টেনে রাখতে জানে। কোন রকম ফটিনাট্ট? ওসব ওর ধাত্তেই নেই।’

‘বিয়ে করলেই ত পারত।’

‘আহা, কী উদ্ভট কথাই না বললি।’

‘উদ্ভটের কী আছে? সেইটেই ত হওয়া উচিত।’

‘যাক গে, সে ভোদের ব্যাপার। আমি ওর মধ্যে নেই।’

‘আর দুনিয়াশকা কেমন আছে?’

‘সে এখন রীতিমতো বিয়ের যুগি হয়ে উঠেছে রে ভাই। এই এক বছরে ধাঁক ধাঁক করে মাথায় এমন বেড়ে উঠেছে যে দেখলে চিনতেই পারবি নে।’

‘তাই নাকি?’ গ্রিগোরি অবাক হয়ে গেল তাকে এখন শানিকটা উৎফুল্ল দেখাল।

‘মাইরি বলছি ওর বিয়ে হয়ে যাবে, এদিকে বিয়ের নেমন্তন্নটা আমাদের মাঠা মারা যাবে, ভোদ্যকায় গৌফ ডোবানোর সুযোগ পর্যন্ত পাব না শালারা আমাদের মেরেই ফেলবে।’

‘সে আব বিচিত্র কি।’

ওরা এবারে পারে বালির ওপর উঠে কনুইয়ে ভর দিয়ে পাশাপাশি শুয়ে পড়ল। গ্রীষ্ম শেষের প্রখর রোদের তাপে শরীর গরম করতে লাগল ওরা ওদের পাশ দিয়ে সীতরে যেতে যেতে অর্ধেক শরীর জলের ওপর উঠিয়ে মিশ্কা কশেড়য় বলল, ‘নেমে পড় রে গ্রিশকা, জলে নেমে পড়।’

‘দাঁড়া, নামব ‘খন।’

ঝুরঝুরে বালির নীচে একটা গুবরে পোকা চালান করে দিতে দিতে গ্রিগোরি জিজ্ঞেস করল, ‘আগ্নিনিয়ার কোন খবর শুনছে কি?’

‘লড়হি যেদিন বাধল তার আগে আগে ওকে গ্রামে দেখেছিলাম।’

‘সেখানে আবার কী করতে গিয়েছিল?’

স্বামীর কাছ থেকে ওর নিজের জিনিসপত্রগুলো নিতে এসেছিল  
গ্রিগোরি সামান্য কাশল হাতের চেটোর এক পাশ দিয়ে একগাদা বালি  
ঠেলে গুবরে পোকাটাকে কবর দিল।

‘ওর সঙ্গে কথা বলেছিলাম?’

‘কেবল কী খবর’ ‘কেমন আছ’ এইটুকু দিবা মোলারেম হাসিখুশি  
দেখাচ্ছিল। দেখে মনে হয় জমিদারবাড়িতে ভালোই খেয়ে পরে আছে।’

‘তা স্ত্রোপান কী করল?’

ওর জিনিসপত্র সব দিয়ে দিল। এতটুকু বারাপ ব্যবহার করল না। তবে  
তুই কিন্তু সাবধানে থাকিস ঝুঁশিয়ার। কসাকদের মুখে শুনছি স্ত্রোপান নাকি  
মদের নেশার বোঁকে এই বলে শাসিয়েছে যে প্রথম লাড়াইতেই তাকে গুলি  
চালিয়ে খতম করে দেবে।’

‘আচ্ছা।’

‘ও তোকে ক্ষমা করবে না।’

‘সে আমি জানি।’

‘আমি একটা নতুন ঘোড়া কিনেছি,’ পেরো কথার মোড় ঘুরিয়ে বলল  
বঙ্গদ বেচে দিয়েছ নাকি?’

‘লোম ওঠা টোকোদুটোকে একশ’ আশিতে ঘোড়াটা কিনেছি দেড়শ’তে।  
দাবুগ ঘোড়া। তুসুতুস্কানে কিনেছি।’

ফসল কেমন হয়েছে?’

‘ভালো। কিন্তু তোলার আর সময় হল কোথায়?’ তার আগেই পাকড়াও  
করে নিয়ে গেল।’

এবারে কথা চলতে লাগল ঘর-গেরস্থালি নিয়ে, তাই আগেকার সেই তীব্রতা  
আর রইল না। গ্রিগোরি সাগ্রহে বাড়ির সমস্ত সমাচার গিলতে লাগল কিছুক্ষণের  
জন্য সে যেন ফিরে গেল তার সেই আগের ছোকরা বয়সের সহজ সরল দুরন্ত জীবনে

‘সে, চল আরেকটু দাপাদপি করা যাক জলে, তারপর জামাকাপড় পরা  
যাবে,’ পেটের ওপর থেকে ভিজে বালি ঝাড়তে ঝাড়তে এই বলে নড়েচড়ে  
উঠল পেরো। তার শিঠ আর হাতের চামড়া কাঁটা কাঁটা হয়ে উঠে আছে।

পুকুরধার থেকে সকলে দঙ্গল বোঁধে চলল। জমিদারবাড়ির বাগান আর  
উঠানের মাঝখানের বেড়ার কাছে তাদের ধরে ফেলল স্ত্রোপান আস্তাখভ চলতে  
চলতে হাড়ের চিবুনী দিয়ে কপালের সামনে ঝুঁটির জট ছাড়াতে ছাড়াতে টুপির  
নীচে ঝুঁটিটা গুঁজে দিল সে গ্রিগোরির পাশাপাশি এসে সে বলল, ‘এই যে দোস্ত।’

‘কী খবর?’ গ্রিগোরি ধমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। স্ত্রোপানের সামনাসামনি পড়ে

যেতে তার দৃষ্টিতে খানিকটা যেন হতবুদ্ধি আর অপরাধীর ভাব ফুটে উঠল।

‘আমার কথা ভুলে গেলেন নাকি?’

‘প্রায় তাই-ই।’

‘আমি কিন্তু ঠিক মনে বেখেছি তোমাকে, এই বলে বিদূষের হাসি হাসল স্তেপান তারপর সার্জেণ্টের কাঁধপাটি লাগানো যে কসাকটি আগে আগে লম্বা লম্বা পা ফেলে চলছিল তার গলা জড়িয়ে ধরে, এতটুকু না থেমে এগিয়ে গেল।

অন্ধকার যখন ঘনিয়ে এসেছে তখন ডিভিশনের সদর দপ্তর থেকে টেলিফোনে নির্দেশ এলো রেজিমেন্টকে পজিশন নিতে হবে। মিনিট পনেরো সময়ের মধ্যে রেজিমেন্টের সকলকে জড় করা হল দলে ভারী হয়ে গান গাইতে গাইতে তারা চলল হাস্যরসীয় ঘোড়সওয়ার দলের আক্রমণে ভাঙা সারিব ফাঁক ভরাতে

বিদায় নেওয়ার সময় পেত্রো ভাইয়ের হাতে চার ভাঁজ করা কাগজের একটা টুকরো গুঁজে দিল

এটা কী? গিগোরি জিজ্ঞেস করল।

‘তোমার জন্যে একটা প্রার্থনা টুক্রে রেখে দিয়েছিলাম ধর’

‘কাজে দেয়?’

‘হাসিস নে, গিগোরি।’

‘আমি হাসছি না।’

‘আচ্ছা চলি ভাই ভালো থাকিস। সবার আগে আগে ছুটে যাস নে যেন। যাদের মাথা গরম তাদেরই ওপর যাদের বেশি নজর থাকে কিনা সাবখানে থাকিস।’ পেত্রো চোঁচিয়ে বলল

‘আর প্রার্থনাটা? ওটা কী জন্যে তাহলে?’

পেত্রো হাল ছেড়ে দেওয়াব ভঙ্গিতে হাত নাড়ল

কোন রকম সন্তর্কতা না মেনে এগারোটা পর্যন্ত তারা চলল তারপর সার্জেণ্ট-মেজররা প্রতিটি স্কোয়াড্রনে ঘুরে ঘুরে এই মর্মে নির্দেশ দিল যে তারা যেন যতদূর সম্ভব নিঃশব্দতা পালন করে, কেউ যেন ধূমপান না করে

দূরে বনভূমির গাছের সন্নিবিষ্ট মাথায় হটফটিয়ে বেড়াচ্ছে হাউই থেকে ছোটো আগুনের ঝলক আর বেগুনী আভার ধোঁয়ার কুণ্ডলী।



একটা ছোট্ট নোটবই। ওক কাঠের রঙের মতো বাদামী রঙের মলাট। মরক্কো চামড়ায় বাঁধাই করা। কোনাগুলো ভাঙাচোরা। ক্ষয়ে গেছে - বহু কাল হযত মালিকের

পকেটে পকেটে ঘুরেছে। পাকানো পাকানো তেরছা অঙ্করের লেখায় পাতাগুলো আগাগোড়া ঠাসা

\* \* \*

কিছুকাল হল কাগজ-কলমের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার তাগিদ অনুভব করছি ছাত্রজীবনের ডায়েরীর মতো একটা ডায়েরী রাখতে চাই সবচেয়ে বড় কথা, ওর সম্পর্কে ফেব্রুয়ারী মাসে কত তারিখ তা মনে করতে পারছি নে ওরই দেশের একজন বইয়ারিশকিন নামে এক ছাত্র ওর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেয় এক সিনেমা-হলে ঢোকার মুখে ওদের সঙ্গে আমার দেখা আমাদের আলাপ করিয়ে দেওয়ার সময় বইয়ারিশকিন বলল, এ হল ভিওশেন্‌স্কায়া জেলার মেয়ে ওর সঙ্গে মিষ্টি ব্যবহার করা, ওর দিকে একটু নজর-টজর দিয়ে তিমকেই। নিজের কোন তুলনা হয় না 'আমার মনে আছে, ওর ঘামে ভেজা নরম হাতের চোটোটা নিজের হাতে চেপে ধরে আমি অসংলগ্ন কী যেন কতগুলো কথা উচ্চারণ করলাম। এই হল ইয়েলিজাবেতা মোখভার সঙ্গে আমার আলাপের সূত্রপাত সে যে একটা নষ্ট মেয়ে প্রথম দৃষ্টিতেই আমার বুঝতে ব্যক্তি যইল না এ ধবনের মেয়েদের চোখের ভাষা প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রকাশ করে ফেলে স্বীকার করতে বাধ্য নেই, আমার মনের ওপর যে ছাপটা সে ফেলল তাকে প্রতিকূলই বলতে হয় সর্বোপরি তার সেই ঘামে ভেজা উষ্ণ করতলের স্পর্শ কোন লোকের হাত যে এমন ঘামতে পারে এ আমার আগে জানা ছিল না - এমন লোক আমি আগে দেখি নি, তাছাড়া ওর ওই চোখদুটো বাদামী রঙের কেমন যেন একটা আভা মেশানো সত্যি কথা বলতে গেলে কি, বড় সুন্দর, অথচ অশ্রীতিকর।

‘বন্ধুবর ভাসিয়া, আমি পরিশীলিত রচনারীতি প্রয়োগের ব্যাপারে সচেতন, এমন কি জায়গায় জায়গায় আদর্শরীতিরও আশ্রয় গ্রহণ করেছি, যাতে কোন এক সময় সেমিপাল্যতিন্কে আমার এই ‘ডায়েরী’ যখন তোমার হাতে পড়বে (ইয়েলিজাবেতা মোখভার সঙ্গে আমার যে প্রণয়লীলা চলছে সে পালা চূকে যাবার পর এটা তোমার কাছে পাঠাব, এমন একটা ইচ্ছে আমার মনে মনে আছে, এই দলিলটা পাঠ করে, আশা করি, তুমি বেশ আনন্দ পাবে) তখন যেন ঘটনার একটা সঠিক ধারণা তুমি করতে পার। কালানুক্রমিক ঘটনাব বিবরণ লিখে যাব হ্যাঁ, যা বলছিলাম, তার সঙ্গে আমার আলাপ হল, আমরা তিনজনে মিলে তারপর দেখতে গেলাম বস্তাপচা সেক্টিমেন্টাল কী যেন একটা ছবি বইয়ারিশকিন কোন

কথা বলছিল না (ওর দাঁত ব্যথা কবছিল ওর নিজের ভাবায়, 'আঙ্কেল দাঁত শূলোচ্ছিল')। এদিকে আমিও কথাবার্তায় তেমন একটা জুত করতে পারলাম না। আমরা একই এলাকার, অর্থাৎ পাশাপাশি জেলার লোক, কিন্তু স্তম্ভপৃথিবির প্রাকৃতিক দৃশ্যের সৌন্দর্য ইত্যাদি যে যে বিষয়ের স্মৃতিচারণে আমাদের মতো মিল থাকতে পারে, তাই নিয়ে দুটো চারটে কথা বলার পরই আমাদের বলার মতো অব কিছু রইল না। আমি, বলা যেতে পারে, স্বাভাবিক ভাবেই চুপ করে গেলাম। আমাদের কথাবার্তার কুলি যে শেষ হয়ে গেল সেজন্য কিন্তু তাকে বিন্দুমাত্র অস্বস্তি বোধ করতে দেখলাম না। তার কথা থেকে আমি জানতে পারলাম সে সেকেন্ড ইয়ারের মেডিক্যাল ছাত্রী ব্যবসায়ী পরিবারের মেয়ে, কড়া চা আর আশ্মোলভ নসি। তার বড় প্রিয় তাহলেই দেখতে পাচ্ছি, একজন বাদামী-চোখ মেয়ের সঠিক পরিচয় জানার পক্ষে বড়ই অপ্রতুল তথ্য। বিদায় নেওয়ার সময় (ট্রাম স্টপ পর্যন্ত আমরা তাকে এগিয়ে দিলাম) সে আমাদের তাব কাছে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানাল। আমি ঠিকানা টুকে নিলাম আশা করি ১৮শে এপ্রিল একবার তার কাছে যাওয়া যাবে।

১৯শে এপ্রিল

আজ তার কাছে গিয়েছিলাম। চা আর হালুয়া দিয়ে আপ্যায়ন করল আসলে কিন্তু কৌতূহল উদ্বেক করার মতন মেয়ে কথার ধার আছে, মোটের ওপর বুদ্ধিমতী। কেবল তার কাছ থেকে যা ভেসে আসে, এমন কি দূর থেকেও টের পাওয়া যায় তা হল আর্ন্তসিবাশেভীয়\* যথেষ্টাচার তত্ত্বের গন্ধ ফিরলাম বেশ দেবিতে সিগারেট পাকাতে পাকাতে এমন সব জিনিসের কথা ভাবতে লাগলাম যার সঙ্গে তার কোন রকম সম্পর্ক নেই - বিলম্বিত, টাকাকড়ির বিষয়ে আমার পোশাকের অবস্থা বড়ই শোচনীয়, কিন্তু 'পুজি' বলতে আমার কিছু নেই। মোট কথা বিতর্কিত্ত্বি ব্যাপার।

---

\* কুশ প্রকৃতিবাদী উপন্যাস সচয়িতা মিখাইল পেত্রোভিচ আর্ন্তসিবাশেভের (১৮৭৮-১৯২৭) নাম অনুযায়ী যথেষ্টাচারের প্রবক্তা। ১৯১৭ সালের পর দেশান্তরী হন - অনুঃ



আজকের দিনটাকে একটা ঘটনার জন্য বিশেষ ভাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে সাকলনিকি পার্কে নেহাৎ নিরীহ-নির্দোষ সময় কাটাতে গিয়ে আমরা একটা ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়লাম। পুলিশবাহিনী আর সবসুস্থ জনাবিশেষ কসাকদের একটা বাহিনী যে দিবস উপলক্ষে মজুরদের আয়োজিত এক সভা ভেঙে দিচ্ছিল। একজন মাতাল এই সময় এক কসাকের ঘোড়াকে লাঠির দ্বা মারলে কসাক চাবুক হাঁকতে শুরু করল। চাবুককে কেউ কেউ 'বেত' বা 'কশা' কেন বলেন জানি নে 'বেত্রাঘাত' বা 'কশাঘাত' শব্দটা তেমন জমে না, কিন্তু 'চাবকানো' কথাটার একটা নিজস্ব মাহাত্ম্য আছে, আমি এগিয়ে গেলাম। ঠিক করলাম হস্তক্ষেপ করব সত্যি বলতে গেলে কি নীতিমতো মহৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়েই আমি এ কাজে এগোই কসাকটাকে আমি 'বণের ছানা'\* বা ওই রকম আরও দু-একটা কথা বলে গালাগাল করলাম। সে তখন আমাকেও চাবুক মেরে বসে আর কি। কিন্তু আমি বেশ তেজ দিয়ে বললাম যে আমি নিজে একজন কসাক। কামেনস্কায়া জেলায় আমার বাড়ি, ইচ্ছে করলে তাকে যে কোন সময় মেরে তার ভূত ভাগাতে পারি। কসাকটা ছিল অল্পবয়সী, ভালো স্বভাবচারিয়েবই বলতে হবে। পল্টনের চাকরী এখনও তাকে উজ্জ্বল দিতে পারে নি। উত্তরে সে বলল যে সে উক্ত-খোপিওরস্কায়া লোক। ঘুষোঘুষিতে তুখোড় আমরা কেউ কাউকে না ঘাঁটিয়ে যে যার পথ ধরলাম। লোকটা যদি আমার ওপরে কোন ব্যবস্থা প্রয়োগ করত তাহলে নির্বাসিত মারামারি বেধে যেত এবং ব্যক্তিগত ভাবে আমার পক্ষে আরও খারাপ কিছু হতে পারত। আমি যে বাধা দিতে গিয়েছিলাম তার কারণ এই যে আমাদের দলের মধ্যে ইয়েলিজাবেতা ছিল, তার উপস্থিতিতে নিজের 'কীর্তি' জাহির করার একটা ছেলেমানুষী ইচ্ছা আমার ভেতরে জেগে ওঠে। আমি আমার নিজের চোখের সামনে এখন একটা মোরগের মতো বুক ফুলিয়ে বেড়াই, আমি অনুভব করতে পারি আমার টুপির তলায় যেন গজিয়ে উঠেছে একটা অদৃশ্য লাল ঝুটি ওঃ কী দিলাম

\* কসাকরা তাদের টুপিতে ফেজটুপির ওপরকার পুচ্ছের কাঁদায় শোভা বর্ধনের জন্য বক্বেব পালক লাগাত। অনুঃ

ইচ্ছা করছে মদের নেশায় চুর হয়ে থাকি। সব কিছুই ওপরে যেটা বড় হয়ে দেখা দিয়েছে তা হল এই যে হাতে টাকাকড়ি নেই আমার প্যান্টটা এমন ভাবে ছিড়ে গেছে যে ওটার আর কিছু করার নেই, সোজা কথায় বলতে গেলে কুচকির কাছ থেকে ফেটে দু' আধখানা হয়ে গেছে দনের পাড়ের বেশি পাকা তরমুজের মতো। সেলাই করলে যে টিকবে সে আশা সুদূরপর্যায়তঃ ফাঁটা তরমুজ সেলাই করতে যাওয়া যা এ চেষ্টায় সাফল্যের সম্ভাবনাও ঠিক ততখানি ভালোদুকা শ্বেজনেভ এসেছিল কাল লেকচার শুনতে যেতে হবে।

৭ই মে

বাবার কাছ থেকে টাকা পেলাম চিঠিতে আমাকে বকাঝকা করেছেন, কিন্তু তাতে আমি এতটুকু লজ্জা বোধ করছি না। বাবা যদি জানতে পারতেন ছেলের নীতিবোধের ঝুঁতি কতটা নড়বড়ে হয়ে গেছে এক প্রস্ত পোশাক কিনলাম কোচোমান পর্যন্ত আমার টাইটা নজর করে। ভক্তেরদ্বারা স্ট্রীটের এক সেলুনে দাড়ি কামানোর পর সেখান থেকে বেবিয়ে এলাম মণিহারি দোকানের ফুলবাবু কর্মচারীটি হয়ে সাদোভো-ব্রিউমফাল্‌ন্যার কোনায় পুলিশ-কনস্টেবলটি আমাকে দেখে হাসল। বেটা বজ্জাত তবে আমার এই এখনকার সাজে গর আর আমার মধ্যে কিসের যেন একটা মিল আছে। কিন্তু আজ থেকে তিন মাস আগে? যাক গে পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে আর কী হবে? দৈবাৎ ট্রামের জানলায় ইয়েলিজাভেভকে দেখতে পেলাম হাতের দস্তানা খুলে নাড়ল, আমার দিকে চেয়ে হাসল ঠু ঠু, কেমন লোক আমি বল ত?

৮ই মে

‘যে কোন বয়স প্রেমের বশ’ তাতিয়ানার স্বামীবি মুখটা এখনও আমার চোখের সামনে ভাসছে কামানের নলের মতো হাঁ-বার করা। গ্যালারির আসন থেকেই অদম্য ইচ্ছা হচ্ছিল থুতু ফেলি লোকটার ওই মুখে কিন্তু যখন এই

উক্তিটা, বিশেষত শেষের এই ‘ব-অ-শ’ কথাটা মনে পড়ে যায় তখনি আমার হাই ওঠে। আমার দুই চোয়ালে খিল ধরে যায় খুব সম্ভব কোন স্নায়বিক দৌর্বল্য এর কারণ।

কিন্তু সে যা-ই হোক না কেন, আমি আমার বয়সে যে প্রেমে পড়েছি তাতে কোন সন্দেহ নেই এই ছত্রগুলো লিখতে লিখতে আমার মাথার চুল খাড়া হয়ে ওঠে। ইয়েলিজ্জাতেডার কাছে গিয়েছিলাম বেশ জমকাল ভাষায়, অনেক দূর থেকে শুরু করলাম সে এমন ভাব করল যেন বুঝতে পারছে না, কথার মোড় ঘোরানোর চেষ্টা করল তাহলে কি এখনও সময় হয় নি? দূর ছাই, এই নতুন স্টাটাই গোটা ব্যাপারটা গুলিয়ে দিল। আয়নার দিকে এক নজর তাকাতে মনে হল আমাকে ঠেকায় কে ‘ভাবলাম, তাহলে বলেই ফেলি। ভেতরে ভেতরে সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধি কেন যেন আর সব কিছু ছাপিয়ে প্রকট হয়ে উঠল এখন যদি মনের ভাব শূন্য না বলি তা হলে দু’মাস পরে বড্ড মেরি হয়ে যাবে। আমার প্যাঁট ততদিনে পুরনো হয়ে যাবে এবং পচে এমন জায়গায় ছিঁড়তে থাকবে যে প্রেম নিবেদনের কোন অর্থ থাকবে না লিখতে লিখতে আমি নিজের চমৎকৃত হয়ে যাই - এ যুগের শ্রেষ্ঠ সম্ভানদের সমস্ত ভালো ভালো উপলব্ধির কী অপূর্ব সমাহারই না ঘটেছে আমার মধ্যে! এখানে তোমরা যেমন পাবে স্নিগ্ধ অথচ উদগ্র আবেগানুভূতি তেমনি পাবে ‘বিচারবুদ্ধির দৃষ্ট কণ্ঠ’। অন্যান্য গুণের কথা বাদ দিলেও, এ যেন সদাচারের এক জগাবিচুড়ি।

তার সঙ্গে সেই প্রাথমিক প্রস্তুতির বেশি কিছু আর এগোন গেল না। বাগড়া দিল ওর বাড়িউলি মহিলা ওকে করিডরে ডেকে নিয়ে গেল আমি শূন্যতে পেন্সাম সে ওর কাছে টাকা ধার চাইছে। ধার দিতে ও রাজি হল না, যদিও টাকা ওর ছিল। এটা আমি বেশ ভালো ভাবেই জানতাম। আমি মনে মনে তার সেই তখনকার চেহারাটা অনুমান করতে পারলাম যখন প্রত্যাখ্যান করতে গিয়ে তার কণ্ঠস্বরে ফুটে উঠছে সত্যনিষ্ঠা আর বাদামী চোখদুটো ডরে উঠছে আন্তরিকতায়। প্রেমের কথা বলার ইচ্ছে আমার উবে গেল।

১৩ই মে

আমি প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছি। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। সমস্ত লক্ষণ প্রকট হয়ে দেবা দিয়েছে আগামীকাল বোলসা করে নিতে হবে আমার নিজের ভূমিকাটা আমি এখন পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারি নি

ঘটনা আকস্মিক রূপ নিল। বৃষ্টি পড়ছে। বিরঝিরে উষ্ণ বৃষ্টি, বেশ লাগছে। আমরা মথডায়া স্ট্রীটের ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছি, তেরছা হয়ে বাতাস এসে বাঁধানো ফুটপাথের গায়ে কেটে কেটে বসছে। আমি কথা বলে চলেছি সে কোন কথা বলছে না। মাথা হেঁট করে কী যেন ভাবতে ভাবতে চলেছে। টুপি থেকে তার গালের ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে বৃষ্টির ধারা। অপবূপ দেখাচ্ছে তাকে। কী কথাবার্তা আমাদের মধ্যে হল, বলি

‘ইয়েলিজাভেতা সের্গেয়েভনা, আমি আপনাকে আমার উপলব্ধির কথা বললাম এখন আপনি যা বলার বলুন।’

‘আপনার উপলব্ধির আন্তরিকতা সম্পর্কে আমার সন্দেহ আছে।’

আমি হৃদ বোকার মতো কিছু না বোকার ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকলাম। দরকার হলে আমি শপথ নিতে পারি বা ওই রকম বেফাঁস কিছু একটা আমি ফস করে বলে ফেললাম।

তাতে সে বলল

‘শুনুন, আপনি কথা বলছেন তুর্গেনেভের নায়কের ভাষায়। আরেকটু সরল করে বললে পাবতেন।’

‘এর চেয়ে সরল আর হতে পারে না। আমি আপনাকে ভালোবাসি।’

‘বেশ ত। তারপর?’

‘এবারে আপনি যা বলার বলুন

‘আপনি উত্তরে আমার স্বীকৃতি চাইছেন?’

‘আমি উত্তর চাই

‘বুঝলেন কিনা তিমফেই ইভানভিচ      আপনাকে কী বলতে পারি আমি  
আপনাকে আমার নেহাৎ মন্দ লাগে না      আপনি খুব লম্বা।’

‘আরও লম্বা হব আমি।’ আমি কথা দিলাম

‘কিন্তু আমাদের জ্ঞানার্শোনা, মেলানেশো এত কম      ’

‘এক হৈসেলে খাবার খেলেই একে অন্যকে জানা যায়।’

শোলাপী হাতের চোটা দিয়ে ভিজ়ে গাল মুছে সে বলল

‘বেশ ত, আসুন একসঙ্গে বাস করে দেখা যাক কী হয়      তবে আমাকে  
একটু সময় দিতে হবে যাতে আমার আগেকার কেটা সম্পর্ক চুকিয়ে দিতে পারি।’

‘কে সে?’ আমি কৌতুহল প্রকাশ করলাম।

‘আপনি তাকে জানেন না। এক ডাক্তার, ভেনেরাল রোগের ডাক্তার।’

‘কবে ছাড়া পাবেন?’

‘আশা করি শূক্রবার নাগাদ।’

‘আমরা তাহলে একসঙ্গে থাকব? মানে আপনি বলতে চান, একই ট্র্যাটে?’

‘হ্যাঁ, আমার ত মনে হয় সেটাই সুবিধেজনক হবে। আপনি আমার কাছে উঠে আসবেন।’

‘তা কেন?’

‘আমার ঘরটা বেশ আরামের। পরিষ্কার পবিত্র, আর বাড়িওলিও চমৎকার মানুষ।’

আমি আপত্তি করলাম না। ভেতেরকামা স্ট্রীটে আমাদের ছাড়াছাড়ি হল। আমরা পরস্পরকে চুমু খেলায় এক ভদ্রমহিলা পাশ দিয়ে যেতে যেতে তা দেখে ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে গেলেন।

ভবিষ্যতের গর্ভে কী নিহিত আছে কে জানে?

২২শে মে

আমাদের এখন মধুচন্দ্রিকা চলছে। মধুচন্দ্রিকার মেজাজটা আজ খিচড়ে গেল যখন লিজা আমাকে বলল আমার ভেতবের জামাকাপড়গুলো বদল করা দরকার বদল করা দরকার ঠিকই ওগুলোর অবস্থা শোচনীয়। কিন্তু টাকা, টাকা আমার নিজের ধুক্তি খরচ করে চলেছি, কিন্তু সে আর কত? কাজের সন্ধান করতে হবে।

২৪শে মে

ভেবেছিলাম আজ নিজের জন্য ভেতবের জামাকাপড় কেনা যাবে। কিন্তু লিজা আমাকে এমন একটা খরচের মধ্যে ফেলে দিল যা আগে থেকে আমার হিসাবে ধরা ছিল না। ভালো রেস্টোরাঁয় খাওয়ার এবং নিজের জন্য একজোড়া রেশমী মোজা কেনার হঠাৎ দাবুণ হচ্ছে হল তার রেস্টোরাঁয় খাবার খেলায় মোজাও কিনলাম কিন্তু আমার অবস্থা কাহিল - ভেতবের জামাকাপড়ের দফা রফা হয়ে গেল।

২৭শে মে

ও আমাকে শূঁষে যাচ্ছে আমার শরীরের আব কিছু নেই, আমি এখন সূর্যমুখী ফুলের একটা খালি ঝরা ডাঁটার মতো। মেয়ে ত নয়, আগুন আর ধোঁয়া

২রা জুন

আজ নটার সময় আমাদের ঘুম ভাঙল। পায়ের আঙুল নাড়াচাড়া করার একটা বদ অভ্যেস আমার আছে তার ফলটা আজ হল এইরকম কবল তুলে অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে সে আমার পায়ের তলি দেখল শেষকালে সংক্ষেপে তার সম্ভব প্রকাশ করল

পা ত নয়, যেন ঘোড়ার খুর। তার চেয়েও খারাপ! তাছাড়া আঙুলের ওই যে লোমগুলো মা গো! বলতে বলতে সে তাজিলাভরে বিকারগ্গস্তের মতো কীধ ঝাঁকাল, তারপর কবল মুড়ি দিয়ে দেয়ালের দিকে মুখ করে শুল

আমি ডেবাচেকা বেয়ে গেলাম পা গুটিয়ে নিলাম, ওর কীধ স্পর্শ করলাম  
'লিজ্জা

'হয়েছে'

'লিজ্জা, এটা একটা কথা হল? আমার পায়ের আকার বদলানো ত আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ওগুলো ত আর ফরমাস দিয়ে তৈরি করা হয় নি আর চুল গজানো? তার কোন মথামুতু আছে? কখন কোথায় গজায় কে বলতে পারে? তুমি ডাক্তারীর ছাত্রী, প্রাকৃতিক বিকাশের নিয়ম ত তোমার ভালোই জানা আছে

সে আমার দিকে মুখ ফেবাল। রাগে তার চোখে ফুটে উঠেছে একটা খয়েরি আভা

'আজই ঘামের গন্ধ দূর করার জন্যে পাউডার কিনে ফেলুন বিজ্ঞী পচা মড়া গন্ধ আপনাব পায়ের

আমিও যুক্তিসঙ্গত ভাবেই মন্তব্য করলাম যে ওর হাতের তালু সব সময় ঘামে ভিজ়ে থাকে ও চূপ করে রইল। আলাঙ্কারিক ভাষায় বলতে গেলে, মেঘের ছায়া নেমে এলো পা বা লোম এখানে কোন বাপার নয়।

৪ঠা জুন

আজ আমরা নৌকো করে মঞ্চভা নদীতে ঘুরে বেড়লাম। দনের পল্লী অঞ্চলের স্মৃতিচারণ করলাম আমরা ইয়েলিজাভেতার আচরণ বড়ই অসঙ্গত সর্বক্ষণ আমার ওপর কটাক্ষ করছে, কখন কখন বেশ অশিষ্ট ধরনের এক্ষেত্রে শটে শঠাং নীতি প্রয়োগ করতে যাওয়ার অর্থ আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন করা, কিন্তু সেটা করা আমার অভিপ্রায় নয়। এত সব কিছু সত্ত্বেও তার ওপর আমার আসক্তি উত্তরোত্তর বেড়েই যাচ্ছে। আসলে বেশি আদরে নষ্ট হয়ে গেছে আমার প্রভাব ওর চরিত্রের আমূল পরিবর্তন সাধনের পক্ষে বিশেষ কার্যকরী হবে বলে মনে হয় না। একটা মিষ্টি আদুরে ছোট্ট মেয়ে ছোট্ট মেয়ে, তবে এমন সব জিনিস

সে তার জীবনে দেখেছে যার কথা আমি শুধু লোকপরিচয় জ্ঞানি। ফেরার পথে সে হিড়হিড় করে আমাকে ওয়ুধের দোকানে টেনে নিয়ে গেল, মুখ টিপে হাসল। ট্যালকাম পাউডার এবং আরও কী সব হাবিজাবি কিনল।

‘এই যে, তোমার পায়ের ঘামের জন্যে পাউডার, সে বলল

আমি একজন ষড়ার্থ প্রণয়াদিলাধীর মতো রীতিমতো কায়দা করে মাথা নুইয়ে তাকে কৃতজ্ঞতা জানানাম।

ব্যাপারটা হাস্যকর, কিন্তু দাঁড়াল সেই রকমই

৭ই জুন

বুদ্ধির পুঞ্জিপাটা তার বড়ই কম। তবে অন্য অনেক ব্যাপারে যে কাউকে শেখাতে পারে

বোজ রাতে শোবার আগে গরম জল দিয়ে পা ধুই, অডিকলন ঢালি, বিব্রী কিসের একটা গুঁড়ো পায়ে ছড়াই।

১৬ই জুন

যত দিন যাচ্ছে তত ও আরও বেশি করে অসহিষ্ণু হয়ে পড়ছে। গতকাল স্নায়বিক বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল এমন জীলোকের সঙ্গে ঘর করা কঠিন।

১৮ই জুন

আমাদের দু'জনের মধ্যে কোন বিষয়ে এতটুকু মিল নেই আমরা একজন আরেকজনের ভাষা বুঝতে পারি না। আমাদের বন্ধনের একমাত্র ভিত্তি - শয্যা জীবনের সমস্ত রস শুকিয়ে গেছে

আজ সকালে বুটি কিনতে যাবার জন্য আমার পকেট থেকে টাকা বার করতে গিয়ে এই নোটবইটা ওর চোখে পড়ে যায়। বার করে জিন্জেরস করল

‘এটা কী?’

আমার সর্বাত্মক যেমন আগুন ঢেলে দিল। আমি মনে মনে ভাবলাম, আচ্ছা যদি দৈবাৎ একটা-দুটো পাতার ওপর চোখ পড়ে যায়? আমি উত্তর দিলাম

‘অন্ত কষার নোটবই।’

গলাটা এত স্বাভাবিক শোনাল যে আমি নিজেই অবাক হয়ে গেলাম

সে আর কোন আগ্রহ প্রকাশ না করে ওটাকে ফের আমার পকেটে গুঁজে রেখে বাইরে চলে গেল নাঃ, এর পর থেকে আরও সতর্ক হতে হবে দেখছি।

চোখা চোখা মস্তব্য দু'জনের মধ্যে একান্তে তখনই ভালো যখন তৃতীয় আরও কারও পড়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না।

আমাদের বন্ধু ডাসিয়ার হাসির খোরাক হবে

২১শে জুন

ইয়েনিজাভেতার কাণ্ডকারখানা দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। ওর বয়স ২১ বছর এমন কলুষিত হওয়ার অবকাশ সে কখন পেল? ওদের পরিবারই বা কেমন? কী ভাবে সে মানুষ হয়েছে, কার হাতে ওর বিকাশ ঘটেছে? এই প্রশ্নগুলোই আমাকে এখন অত্যন্ত ভাবিত কবে তুলছে তার মূপের একটা পৈশাচিক আকর্ষণ আছে বটে নিজের নিখুঁত গঠন সৌষ্ঠবের জন্য তার গর্ব আছে কেবল আত্মাদর এছাড়া জগতে আর কিছুর অস্তিত্ব তার কাছে নেই বার কয়েক গুরুত্বপূর্ণ ভঙ্গিতে তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করে দেখলাম কিন্তু নাঃ ওকে সংস্কার করতে যাওয়ার চেয়ে কোন গোঁড়া ধর্মবিশ্বাসীর ঈশ্বরবিশ্বাস টলানোও বোধহয় সহজ।

একসঙ্গে বসবাস করা ক্রমেই অর্থহীন ও মূর্খামি হয়ে পড়ছে। তা সত্ত্বেও বিচ্ছেদের ব্যাপারে আমার গড়িমসি স্বীকার করতে বাধ্য নেই, এসব সত্ত্বেও তাকে আমার ভালো লাগে আমার ভেতরের যেন একটা অংশ হয়ে বেড়ে উঠেছে

২৪শে জুন

রহস্যের উত্তরটা কিন্তু খুবই সহজ। আমরা আজ মন খুলে কথা বললাম সে বলল যে আমি তাকে দৈহিক তৃপ্তি দিতে পারছি না। আনুষ্ঠানিক ভাবে সম্পর্ক এখনও ছিন্ন করি নি, খুব সম্ভব কয়েক দিনের মধ্যেই করতে হবে।

২৬শে জুন

জেলা সদরের আন্তাবল থেকে জোয়ান মর্দা-ঘোড়া ওর দরকার  
জোয়ান মর্দা-ঘোড়া দরকার।



২৮শে জুন

ওকে ছেড়ে দেওয়া আমার পক্ষে কঠিন। পাকের মতো সে জড়িয়ে ধরেছে আমাকে আজ আমরা ভরবিয়োগি পাহাড়ে গিয়েছিলাম হোটেলের জানলার ধারে সে বসে ছিল জাফরিকাটা কার্শিশের ভেতর দিয়ে সূর্যের প্রথম আলো তার চূর্ণকুন্তলের ওপর এসে পড়ছে। খাঁটি সোনার বস্তু ধবেছে তার চুলে কেমন একশব্দ কাঁপা হল।

৪ঠা জুলাই

আমি কাজ ছেড়ে দিয়েছি ইয়েলিজাবেতা আমাকে ছেড়ে চলে গেছে আজ ব্রেজনেভের সঙ্গে বীয়ার খেলাম গতকাল আমরা জোদকা খেয়েছিলাম মার্জিত বৃষ্টির লোকজনদের মধ্যে যেমন দস্তুর ইয়েলিজাবেতার সঙ্গে আমারও সেই বকম ভদ্র ভাবে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল এতটুকু গোলমাল কোন বকম কুটুম্বামেলা হল না আজই দমিত্রভকা স্ট্রীটে জর্কি-বুট-পায়ে এক যুবকের সঙ্গে ওকে দেখলাম আমার অভিবাদনের উত্তরে সে সংযত ভাবে মাথা নোয়াল এখানেই আমার ডায়ারী লেখার ইতি চান্না উচিত - উৎস শুকিয়ে গেছে

৩০শে জুলাই

নিভান্তই অপ্রত্যাশিত ভাবে ফের কলম হাতে নিতে হল যুদ্ধ একটা পাশবিক উত্তেজনার বিস্ফোবণ। প্রত্যেকের মাথার টুপি ক্রোশখানেক দূর থেকে ঘেঘো কুকুরের মতো হুডাচ্ছে দেশত্রেমের দুর্গজ সঙ্গীসাথীরা সকলে বিক্ষুব্ধ কিন্তু আমি খুশি মনের দুঃখে 'স্বর্গস্তি' হওয়ার দুঃখে আমি কাতর। গত রাতে ইয়েলিজাবেতাকে নিয়ে একটা লালসাপূর্ণ স্বপ্ন দেখলাম। আমার মনের ওপর গভীর আকুলতার ছাপ সে রেখে গিয়েছে। এটা দূর করা দরকার।

১লা আগস্ট

চারধারের এই কোলাহলে আমি জেরবার হয়ে গেলাম আবার ফিরে এলো পুরনো সেই ব্যাকুলতা বাচ্চা ছেলের চুষির মতো চুষতে থাকি

নিষ্ঠাব পোতে হবে আমি যুদ্ধে যাব। মূর্খামি? খুবই মূর্খামি লজ্জাজনক?

নাঃ ষষ্ঠেই হয়েছে নিজেকে নিয়ে আমি যে কী করব জানি না সামান্য পরিমাণে হলেও অন্তত অন্য কিছুর স্বাদ ত পাওয়া যাবে! অথচ দু'বছর আগেও এমন বৈরাগ্য আমার মনে স্থান পেত না। বুড়িয়ে যাচ্ছি নাকি?

৬ই আগস্ট

লিখছি ট্রেনের কামরায় বসে। আমরা এই সবে ভরোনেজ ছাড়িয়েছি। আগামীকাল কামেনস্কায়াতে নামতে হবে মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা কবে নিলাম লড়াইয়ে চলেছি ধর্মবিশ্বাস, জর আর পিতৃভূমির সম্মান রক্ষার জন্য।

১২ই আগস্ট

বিদায়-অনুষ্ঠানটা বেশ জমকাল হয়েছিল আতামান মদের বৌকে একটা ছালামায়ী ভাষণ দিয়ে ফেলল পরে তাকে আমি কানে কানে বললাম, 'আপনি একটা গোমুখু, আন্দ্রেই কাপতিচ।' আমার কথা শুনে সে হতবাক হয়ে গেল এত রেগে গেল যে তার গালে সবুজ আভা ফুটে উঠল তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে চাপা গলায় হিসহিস করে বলল, 'নিজেকে বড় শিক্ষিত বলে ভাবেন বুঝি?' 'উনিশ শ' পাঁচ সালে যাদের আমরা চাবকে পিঠের ছালচামড়া তুলেছিলাম আপনি কি সেই দলের কেউ?'\* আমি উত্তরে বললাম, 'বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে আমি 'সেই দলের' কেউ নই। আমি তাকে সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের দলে যোগদানের উপদেশ দিলাম বাবা কৌদতে লাগলেন, আমাকে চুমু খেতে এগিয়ে এলেন এদিকে তাঁর নাক দিয়ে টপটপ করে জল বরছে আহা, বেচারি ভালোমানুষ বাবা আমার অবস্থায় পড়লে তুমি বুঝতে।' আমি তাঁকে ঠাট্টা করে আমার সঙ্গে ফ্রন্টে যেতে বললে তিনি তাঁতকে উঠলেন, বললেন, 'বলিস কি তুই?' ঘরগেরস্থালির কী হবে?' আগামীকাল স্টেশনে পৌছব।

\* ১৯০৫ সালে যারা বিপ্লব করেছিলেন তাঁদের প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছে। - অনুঃ

মাঠের পর মাঠ কোথাও কোথাও মাঠের ফসল তোলা হয় নি। ছোট ছোট টিবির ওপর হুইপুস্ট মোটো ইঁদুর জাতীয় প্রাণী চোখে পড়ে। বটতনার সমস্ত পটের ছবিতে যে-সমস্ত জার্মানকে কোজ্জা ক্রিউচকোভের বশায় বিদ্ধ হতে দেখি তাদের সঙ্গে আশ্চর্য রকমের মিল। বহাল তব্বিয়তে হেসে খেলে দিন কাটাচ্ছিলাম, গণিতশাস্ত্র এবং এটা ওটা আরও নানা সূক্ষ্ম জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা করছিলাম। জীবনে কখনও ভাবি নি যে এরকম ‘শভিনিষ্ট’ হব। রেজিমেন্টে ঢোকার পর কসাকদের সঙ্গে আমার যোগাচিত কথাবার্তা হবে

২২শে আগস্ট

ট্রেনে যেতে যেতে কোন এক স্টেশনে প্রথম এক দল যুদ্ধবন্দী দেখতে পেলাম। খেলোয়াড় মার্কো চেহরার সুন্দর গড়নের এক অস্ত্রিয়ান অফিসারকে পাহারাদারের হেফাজতে স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। দু’জন সম্ভ্রান্ত তরুণী প্লাটফর্মে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তারা তার দিকে তাকিয়ে মূগু হ্রাসল। অফিসারটি চলতে চলতেই বেশ কায়দা করে নীচু হয়ে তাদের কুণিগ কবল। চুমু ছুঁড়ে দিল তাদের উদ্দেশে।

বন্দী হলে কী হবে দাড়িগোঁফ নিবৃত্ত কামানো, কায়দাদোরস্ত, পায়ের বাদামী রঙের বৃটজোডা চকচক করছে। আমি দৃষ্টি দিয়ে তাকে অনুসরণ করলাম। সুদর্শন, অল্পবয়সী এক ছোকরা, মিষ্টি চেহারা দেখলেই বন্ধুত্ব পাতাতে ইচ্ছে কবে লাড়াইয়ে এরকম লোকের মুখোমুখি হলে তোমার হাতের তলোয়ার আর উঠবে না

২৪শে আগস্ট

লোকজন বাড়িম্বর ছেড়ে পালাচ্ছে। শরণার্থী আর শরণার্থী সবগুলো রেললাইন শরণার্থী আর সৈন্যদলে ভরতি গাড়িতে গিজগিজ করছে।

প্রথম হাসপিটাল-ট্রেনটা পাশ দিয়ে চলে গেল। ওটা যখন স্টেশনে থামল তখন কামরা থেকে লাফিয়ে নামল এক যুবক অফিসার। তার মুখে ব্যাণ্ডেজ। তার সঙ্গে আমার কথাবার্তা হল। ছটয়া গুলিতে আঘাত পেয়েছে। দাবুগ উল্লসিত এই ডেবে যে সম্ভবত তাকে আব মিলিটারীতে চাকরী করতে হচ্ছে না একটা চোখ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সে কিন্তু হাসছে।

আমি এখন আমার নিজের রেজিমেন্টে আমাদের রেজিমেন্টের কমান্ডার একজন বড় চমৎকার, ছোটখাটো চেহারার বৃদ্ধ। দনের ভাটি অঞ্চলের কসাক। এখানে ইতিমধ্যেই রক্তের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে শোনা যাচ্ছে পবশু দিন ব্লন্টলাইনে যেতে হবে। আমি পড়েছি তিন নম্বর স্কোয়াড্রনের তিন নম্বর টুপে কন্সটান্তিনোভ স্কারার কসাকদের নিয়ে এটা তৈরি রসকব্বীন ছেলেছোকরাব দল। ওদের মধ্যে কেবল একজনই বাচাল ধরেনব, গাইয়ে

আমরা এগিয়ে চলেছি। আজ সামনের দিক থেকে বেশ গুরু গুরু আওয়াজ শোনা যাচ্ছে শুনে মনে হয় যেন মেঘ ডাকছে, দূরে কোথাও বাজ পড়ছে আমি ত নাক টেনে গন্ধ নেওয়ার চেষ্টা করলাম - ভাবলাম বৃষ্টির গন্ধ পাওয়া যায় কিনা কিন্তু না আকাশ নীল সাটিনের মতো স্বচ্ছকে তকতকে

আমার ঘোড়াটা গতকাল থেকে ঝুড়িয়ে ঝুড়িয়ে চলছে ফৌজী রসুইগাভির চাকায় পা বেজে গিয়ে এই অবস্থা এখানে সব কিছুই নতুন, আমার কাছে অনভ্যস্ত। জানি না কোথা থেকে শুরু কবব কী নিয়ে লিখব।

গতকাল লেখার সময় ছিল না আজ এখন জিনের ওপর বসে লিখছি দোলা লাগছে, ফলে শেলিলের লেখাগুলো বিস্তী রকম আঁকাবাঁকা হয়ে ফুটে উঠছে। আমরা তিনজনে বস্তু নিয়ে ঘাস আনতে যাচ্ছি।

এই মুহূর্তে সকালে ঘাস বস্তাবন্দী করছে, আমি উপুড় হয়ে শুয়ে বিলম্ব হলেও, গতকাল যা যা ঘটেছে তার একটা 'রিপোর্ট' লেখার চেষ্টা করছি, কাল সার্জেন্ট-মেজর তলকোমিকভ (লোকটা ঠাট্টা করে আমাকে 'ছাত্র' বলে ডাকে। যেমন সেদিন বলল, 'ওহে ছাত্র তোমার ঘোড়ার নাল যে বসে পড়ে যাচ্ছে সে দিকে কোন নজর নেই বুঝি?') আমাদের ছয়জনকে প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে পাঠাল। আমরা একটা অর্ধদক্ষ পত্নী পার হয়ে গেলাম বেশ গরম ঘোড়াগুলো ঘামে

ভিক্সে গেছে, আমরাও গবয়কালেও বনাতের সালোয়ার পরে থাকতে হয় কসাকদের। এটা খারাপ ছোট শহরটা ছাড়িয়ে নালার ভেতরে আমরা প্রথম দেখতে পেলাম একটা মড়া। একজন জার্মান হাটু পর্যন্ত পা নালায় ডুবে রয়েছে, চিত হয়ে শুয়ে আছে একটা হাত পিঠের নীচে ঘুরে গেছে, আরেক হাতে কার্ডুজের ক্রিপ ধরা। আশেপাশে কোন রাইফেল দেখলাম না। রীতিমতো বীভৎস দৃশ্য চোখের সামনে যে দৃশ্য দেখলাম মনে মনে তা ফের কল্পনা করতে গেলে গা সিরসির করে ওঠে। লোকটার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল সে যেন নালার ভেতরে পা ঝুলিয়ে বসে ছিল, পরে চিত হয়ে শুয়ে পড়েছে, শুয়ে শুয়ে বিব্রাম করছে ছাইরঙা উর্দি মাথায় হেলমেট তার হেলমেটের ভেতবকার চামড়ার আন্তরগটা দেখা যাচ্ছে - সিগারেট পাকানোর সময় তামাক যাতে পড়ে না যায় সেইজন্য সিগারেটের কাগজ যেমন পাপড়ির মতো করে ধরা হয় অনেকটা সেই রকম প্রথম বারের এই মর্মস্থান অভিজ্ঞতায় আমি এতই বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম যে লোকটার মুখ আমি স্মরণ করতে পারছি না। শূণ্য মনে আছে তার হলদেটে কপাল আর কাচের মতো স্বচ্ছ স্থির আধ বোজা চোখের ওপর দিয়ে সার বৈধে চলেছে হলুদ রঙের বড় বড় কিছু পিপড়ে। কসাকরা পাশ দিয়ে যেতে যেতে ক্রুশটিক আঁকল তার উদির ডান ধারে যে রক্তের ছোপটা ফুটে উঠেছিল আমি সেই দিকে তাকিয়ে রইলাম, গুলি সোজা এসে তার ডান দিক ফুড়ে বাঁ পাশ দিয়ে এসে বেরিয়ে গেছে। যেতে যেতে আমি লক্ষ করলাম বাঁ দিকে যেখান থেকে গুলিটা বেরিয়েছে, উদির ওপর রক্তের ছোপ এবং মাটিতে জমাট রক্তের চাপ সেখানে আয়তনে অনেক বড়, আর উর্দিটাও ওই জায়গায় ছিড়ে কুটি কুটি হয়ে গেছে।

পাশ দিয়ে যাবার সময় আমি শিউরে উঠলাম এই তাহলে ঘটে থাকে।

একজন সিনিয়র সার্জেন্ট, সকলে যাকে 'ছেবলা' বলে ডাকে, আমাদের মনমরা অবস্থা দেখে চাঙ্গা ক'রে তোলার চেষ্টা করল - রাজ্যের যত নোংরা চুটকি ছাড়তে লাগল। এদিকে তার নিজেরই কিছু ঠোট থরথর করে কাঁপছে।

শহরতলি তখনও সিকি মাইলটাক দূরে। আমরা যেখানে এলাম সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে আগুনে পোড়া কোন একটা কারখানার কতকগুলো দেয়াল ইটের দেয়ালের মাথাগুলো ধোঁয়ায় কালো হয়ে গেছে। আমাদের রাস্তা এই ধ্বংসস্থলের পাশ দিয়ে গেছে বলে সরাসরি রাস্তার ওপর দিয়ে যেতে আমরা ভরসা পেলাম না, ঠিক করলাম ওটাকে ঘুরে যাব। আমরা সেই রাস্তা থেকে একপাশে সরে দাঁড়ালাম, অমনি কারখানার ওখান থেকে আমাদের ওপর ফরা যেন গুলি ছুঁড়তে লাগল প্রথম গুলির আওয়াজে স্বীকার করতে যদিও লজ্জা হয় আরেকটু হলোই

আমি জিন থেকে উলটে পড়ে যাচ্ছিলাম আমি জিনের সামনের কাঠামোটা আঁকড়ে ধরলাম স্বাভাবিক প্রকৃতিবশত ঝুঁকে পড়ে ঘোড়ার মুখে লাগাম ধরে টান মারলাম। নিহত জার্মানটা যে নালার ভেতরে পড়ে ছিল তার পাশ দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে আমরা শহরতলি দিকে চললাম। চলতে চলতে শহরতলি যখন শেষে ফেলে চলে গেলাম একমাত্র তখনই আমাদের সংবিৎ ফিরে এলো এর পর আমরা ফিরলাম ঘোড়া থেকে নামলাম। দু'জনকে পাহারাদার করে ঘোড়াগুলোকে তাদের জিম্মায় রেখে আমরা চারজনের একটা দল শহরের প্রান্তে সেই নালার দিকে এগোতে লাগলাম। গুড়ি মেরে চলতে হল নালার ধার দিয়ে দূর থেকেই আমি দেখতে পাচ্ছিলাম নিহত জার্মানটার পাদুটো- হাঁটুজোড়া ভাঁজ হয়ে নামার ওপরে উঁচিয়ে আছে, পায়ে হলুদরঙের খাটো বুটজুতো। আমি তার পাশ দিয়ে যাবার সময় এমন ভাবে নিঃশ্বাস বন্ধ করলাম যেন সে ঘুমোচ্ছে, আমার যেন ভয় হচ্ছিল পাছে তার ঘুম ভেঙে যায় ভিজ়ে সবুজ ঘাস তার শরীরের চাপে পিষে গেছে।

আমরা নালার ভেতরে ওত পেতে শূয়ে রইলাম মিনিট কয়েক বাদে জার্মান উলান\* ঘোড়সওয়ারদের নয়জনের একটা দল পোড়া কারখানার ধ্বংসস্তুপের আড়াল থেকে একের পর এক সাব বেঁধে বেরিয়ে এলো, উদ্দি দেখেই আমি ওদের উলান বলে চিনতে পারলাম ওদের অফিসারটি দল থেকে আলাদা হয়ে এসে জার্মান কঠাবর্ণের উচ্চারণে কর্কশ গলায় চিৎকার করে কী যেন নির্দেশ দিল, সঙ্গে সঙ্গে গোটা দলটা আমাদের দিকে ধেয়ে এলো। আমাদের দলের ছেলেরা ঘাসের আঁটি বঁধার কাজে সাহায্য করার জন্য আমাদের চেষ্টায়ে ডাকছে আমাদের যেতে হয়

৩০শে আগস্ট

প্রথমবার কী করে একজন লোককে আমি গুলি করলাম সেই বৃত্তান্তটা আমি শেষ করতে চাই। জার্মান উলানরা ঘোড়া ছুটিয়ে আমাদের ওপর এসে চড়াও হল। এখনও আমার চোখের সামনে ভাসছে টিকটিকির গায়ের রঙের মতো ছাই ছাই হালকা সবুজ আভার উদ্দিগুলো, ককঝকে ঘন্টার মতো দেখতে ওদের মাথার টুপি, ওদের বর্শা বর্শার মাথায় আন্দোলিত ছোট ছোট পতাকা

\* এক ধরনের হালকা অস্ত্রধারী অশ্বারোহিবাহিনী তাতার-মোগলদের বর্শাধারী ঘোড়সওয়ার যোদ্ধারা এই নামে অভিহিত হত। অনুঃ

ওদের ঘোড়াগুলো ছিল কালচে বাদামী। কেন জানি না, আমার দৃষ্টি নালার ধারের উঁচু জায়গাটার ওপর সরে গেল। সেখানে আমি মরকত-সবুজ রঙের একটা ছোট্ট কাঁচপোকাক দেখতে পেলাম। পোকাকটা আমার চোখের সামনে ধাঁক ধাঁক করে বাড়তে বাড়তে শেষকালে বিপুল আকার ধারণ করল। ঘাসের ডগাগুলোতে ঢেউ তুলে এক বিশাল দৈত্যের মতো সে গড়িয়ে গড়িয়ে আসতে লাগল নালার উঁচু পাড়ের দনার মতো খুরখুরে শুকনো মাটির চাঙড়ের দিকে যার ওপর আমার হাতের কনুইটা ভর দিয়ে রেখেছিলাম। এর পর সেটা আমার খান্দি রঙের ফিল্ড শার্টের হাতার ওপর দিগে উঠে এসে চট করে রাইফেলের ওপর চলে এলো, সেখান থেকে রাইফেল ঝোলানোর বেলটের ওপর আমি তার এই সফর বিভোর হয়ে দেখছি, এমন সময় শুনতে পেলাম আমাদের সার্জেন্ট ছেবলার কঠোর তার গলা কাটানো চিৎকার 'আরে কী হল আপনার ? গুলি করুন '

আমি আরও শক্ত করে কনুইয়ে ভর দিলাম, বাঁ চোখ কৌঁচকালাম। আমার মনে হচ্ছিল আমার স্বর্ধপিশুটা যেন ফুলছে, কুলতে ফুলতে সেই মরকত-সবুজ রঙের কাঁচপোকাকটার মতো প্রকাশ হয়ে উঠছে নিশানা স্থির করার ফ্রেমের ছাঁদার ভেতর দিয়ে মনে হল ছাইরঙা-সবুজ উদ্ভির পটে চোখের সামনে যেন রাইফেলের 'মাছি' নাচছে। আমার পাশ থেকে 'ছেবলা' গুলি ছুঁড়ল। আমি রাইফেলের ঘোড়া টিপলাম, সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেলাম আমার গুলি উড়ে যাবার একটা অশ্রুট আর্দনাদ। খুব সম্ভব আমার নিশানাটা বেশি নীচের দিকে হয়ে গিয়েছিল কেননা গুলি ঘাসের চাপড়ায় লেগে ধুলোর ঝড় উড়িয়ে সবুগে ছিটকে উঠল কোন মানুষের ওপর এই আমার প্রথম গুলি ছোঁড়া আমি চোখের সামনে কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না নিশানা না করেই আমি কার্তুজের খোপ খালি করে গুলি ঝেড়ে দিলাম শেষবার ঘোড়া টিপতে কট করে একটা আওয়াজ হল আমার মনেই ছিল না যে রাইফেলে আব কার্তুজ নেই। একমাত্র তখনই আমি জার্মানদের দিকে তাকানোর অবকাশ পেলাম তারা যেমন সার বৈধে এসেছিল তেমনি সার বৈধে ফিরে চলেছে। সবার পেছনে চলেছে তাদের অফিসার ওরা সবসুজ নয় জন্ম অফিসারের কালচে বাদামী ঘোড়ার পেছন দিকটা আর তার উলান-টুপির খাতব চাকতিটা তখনও দেখতে পাচ্ছিলাম

তলস্তয়ের 'যুদ্ধ ও শান্তি' উপন্যাসের একটা জায়গায় বলা হয়েছে দুই বিশক্ষ সৈন্যদের মধ্যে একটা সীমারেখা আছে - অজ্ঞাতপরিচয় সেই সীমারেখা যেন জীবিত আর মৃতদের মাঝখানে বিভেদের সীমারেখা নিকলাই রক্তোভ যে স্কোয়াড্রনে আছে সেই স্কোয়াড্রনটা শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করতে চলেছে রক্তোভ এখন সবে মনে মনে সেই সীমারেখাটা নির্ধারণের চেষ্টা করছে। উপন্যাসের ওই জায়গাটা আজ বিশেষ স্পষ্ট করে আমার মনে পড়ছে, যেহেতু আজ ভোরে আমরা হালকা অস্ত্রশস্ত্রধারী জার্মান হুজারদের একটা দলের ওপর হানা দিয়েছিলাম। আর্টিলারি সমাবেশের ফলে ওদের ইউনিটগুলোর দস্তুরমতো শক্তিবৃদ্ধি ঘটতে ওরা সকাল থেকে আমাদের পদাতিক বাহিনীকে কোণঠাসা করে দিচ্ছে আমি নিজের চোখে দেখলাম, আমাদের সৈন্যরা যতদূর মনে হয় ২৪১ নম্বর ও ২৭৩ নম্বর পদাতিক রেজিমেন্ট - আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পালাচ্ছে। আর্টিলারির কোন সাহায্য ছাড়া আক্রমণ করতে গিয়ে ব্যর্থ হওয়ার কলে আক্ষরিক অর্থে তাদের মনোবল ভেঙে গেছে শত্রুপক্ষের গোলাব আঘাতে তাবা পর্যুদস্ত হয়, গুবো দলটার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ধ্বংস হয়ে যায়। জার্মান হুজার ঘোড়সওয়াররা আমাদের পদাতিকদের তাড়া করে। ঠিক তখনই বনের শূঁড়িপথের ভেতরে আমাদের যে রিকার্ড রেজিমেন্টটা ছিল তাকে কাজে লাগানো হল ঘটনাটা আমার বেশ মনে আছে সকাল দুটো থেকে তিনটোর মধ্যে আমরা তিশভিটি গ্রাম ছাড়লাম প্রত্যুষের আগের মুহূর্তের গাঢ় অন্ধকার পাইনের ঝিরিঝিরি ছুঁচের মতো পাতা-আর কৈতের জইয়ের গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। রেজিমেন্টটা কতগুলো স্কোয়াড্রনে ভাগ ভাগ হয়ে চলেছে। আমরা ছোট রাস্তাটা থেকে বাঁয়ে মোড় নিয়ে ফসলক্ষেতের ভেতর দিয়ে চললাম। বুরের খাঙ্কায় কৈতের জইয়ের গা থেকে টসটসে শিশিরবিন্দু ঝাডতে ঝাডতে ঘোড়াগুলো চলেছে, চলতে চলতে নাক দিয়ে ঘড়ঘড় আওয়াজ করছে।

গ্রেটকোট গায়ে থাকা সত্বেও শীত-শীত লাগছে রেজিমেন্টটা অনেকক্ষণ ধরে মাঠের ওপর দিয়ে চলতে লাগল একঘণ্টা পরে রেজিমেন্টের সদর দপ্তর থেকে একজন অফিসার ঘোড়া ছুটিয়ে এসে কমান্ডারের হাতে একটা ফরমান খরিয়ে দিল। আমাদের মাতব্বর অসম্ভুট স্বরে নির্দেশ জারি করল তাব নির্দেশ পেয়ে রেজিমেন্ট সমকোণ রচনা করে বনের দিকে মোড় নিল আমাদের ট্রুপগুলো সারে সারে সবু রাস্তার ওপর জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। আমাদের খানিকটা বাঁ দিকে কোণায় যেন লড়াই চলছে জার্মান বাটারিগুলো সক্রিয় হয়ে উঠেছে। আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে মলে তারা বেশ ভারী গুলিগোলাব আওয়াজ ওঠা-পড়া



করছে, আমাদের মাথা ছাড়িয়ে এই গন্ধবিধুর পাইনেব বিরিবিরি পাতাগুলোয় যেন আগুন লেগেছে সূর্যোদয় পর্যন্ত আমরা ত্রোতার ভূমিকা পালন করলাম। তারপর একটা উল্লাসধ্বনি উঠল, কিন্তু সেটা নিস্তেজ, বড়ই কবুণ আর কীকা কীকা শোনাল - এদিকে নিস্তেজতা খানখান হয়ে ভেঙে পড়তে লাগল মেশিনগানের নিখুঁত গুলি হৌড়ার সঙ্গে সেই মুহূর্তে আমার মনের মধ্যে এসে ভিড় করতে লাগল ব্যস্ততার যত অসংলগ্ন চিন্তা। একমাত্র যে ছবিটা আমার কাছে তখন স্পষ্ট ও পরিষ্কার - এত স্পষ্ট ও পরিষ্কার যে মনের ওপর কেটে বসে যাচ্ছিল, ব্যথায় বুকের ভেতরটা টনটন করে উঠছিল তা হল সারের পর সার বৈধে আক্রমণের জন্য আমাদের পদাতিকদের এগিয়ে যাওয়া তাদের বহু মুখ মিলে একাকার একটি মুখের ছবি।

আমার চোখের সামনে ভাসছে বস্তুর মতো ছাই ছাই রঙের মূর্তিগুলো। তাদের মাথায় থাকি বস্তুর চেপটা টুপি, হাঁটুর খানিকটা নীচ পর্যন্ত উঠে গেছে পায়ের বদলদ পলটনী হাই বুট। শরতের ভেজা মাটি মাড়িয়ে তারা চলেছে আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি এই জীবিত ঘর্মান্ত মানুষগুলোকে যারা মৃতদেহের জুপে পরিণত করছে সেই জার্মান মেশিনগানের কৰ্কশ চাপা হাসি। দুটো রেজিমেন্ট দেখতে দেখতে সাফ হয়ে গেল, সৈন্যেরা অস্ত্রশস্ত্র ফেলে পালাতে শুরু করল জার্মান হুজারদের একটা রেজিমেন্ট ওদের ধাওয়া করে চলল আমরা এক পাশ থেকে ওদের হাজাব দেড়েক হাত কিংবা তার চেয়েও কম দূরত্বে এসে পড়লাম নির্দেশ শোনা গেল, আমবা তৎক্ষণাৎ সার বৈধে দাঁড়িয়ে পড়লাম। একমাত্র শুনতে পেলাম ঠাণ্ডা গলার একটা নির্দেশ 'মার্চ' ঘোড়ার মুখের ঠাণ্ডা কড়িয়ালে টান পড়ার মতো মুহূর্তের একটা উপলব্ধি পর মুহূর্তেই আমরা উর্ধ্বশ্বাসে সামনে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম দৌড়ের উত্তেজনায় আমার ঘোড়ার কানজোড়া ঘাড়ের সঙ্গে এমন লেপটে গেল যে মনে হয় হাত দিয়েও বৃষ্টি আলগা করা যাবে না পিছু ফিরে তাকিয়ে দেখি বেজিমেন্টের কন্ঠাশুর আর দু'জন অফিসার এই হল জীবিত আর মৃতদের মাঝখানের সেই সীমারেখা। এই হল চরম উন্মত্ততার মুহূর্ত।

হুজাররা তাদের ডাঙাচোরা লাইনগুলো সামনে-পেছনে করে গুছিয়ে নিয়ে পেছনে মোড় নিল। আমার চোখের সামনে লেফটেন্যান্ট চের্নেৎসোভ একজন জার্মান হুজারকে কেটে ফেলল। দেখলাম ছয় নম্বর স্কোয়াড্রনের একজন কসাক এক জার্মানের নাগাল ধরে ফেলল, উন্মত্ত হয়ে উঠে তার ঘোড়ার পাছায় কোপ বসিয়ে দিল তলোয়ার ঝাপটানোর সঙ্গে সঙ্গে উড়ে উড়ে পড়তে লাগল ঘোড়াটার গায়েব কাটা চামড়ার ফালি না, এ এক অর্থহীন বাতুলতা এর কোন নাম নেই এর পর চের্নেৎসোভ যখন ফিরে এলো তখন তার মুখ আমি দেখলাম একাধ

একটা সংযত উন্নাসের ভাব সেই মুখে - দেখে মনে হয় না মানুষ খুন করার পর জিনের ওপর বাসে আছে, মনে হচ্ছে যেন তাসের টেবিলে বসেছে লেফটেন্যান্ট চের্নেৎসোভ অনেক ওপরে উঠে যাবে। এলেম আছে বটে লোকটার।

৪ঠা সেপ্টেম্বর

আমরা বিজ্ঞান করছি দু'নম্বর কোর্-এর চার নম্বর ডিভিশনকে ফ্রন্টের দিকে নিয়ে আসা হচ্ছে আমরা এখন আছি কবিলিনো নামে একটা ছোট শহরে আজ সকালে শত্রুপক্ষের ব্যুহ ভেদ করে বেরিয়ে এগারো নম্বর ঘোড়সওয়ার ডিভিশনের কয়েকটি ইউনিট আর উরালের কসাকরা আমাদের এই জায়গাটার ওপর দিয়ে মার্চ করে চলে গেল। পশ্চিমে লড়াই চলেছে অবিরাম গুল্পন। দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পর ফিল্ড হাসপাতালে গেলাম আমি থাকতে থাকতেই আহত সৈন্যদের নিয়ে একটা গাড়ি এলো। হাসপাতালের কর্মচারীরা একটা চার চাকার বড় ওয়াগন খালাস করছে, তারা নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করছে আমি এগিয়ে গেলাম মুখে বসন্তের দাগওয়ালা একজন ঢাঙা সৈন্য হাসি হাসি মুখ করে ককাতে ককাতে হাসপাতালের একজন কর্মচারীর সাহায্য নিয়ে গাড়ি থেকে নামছে আমার দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'এই যে কসাক-বাবাজী, দেখছ কী? বেশ কিছু মটরদানা পাছায় ঢুকিয়ে দিয়েছে ব্যাটার। চার চারটে বিধেছে।' হাসপাতালের কর্মচারীটি জিজ্ঞেস করল, 'ও পেছনে গোলা ফেটেছিল বুঝি?' 'পেছনে ফাটবে কী? আমি নিজেই পাছা বাড়িয়ে দিয়ে আক্রমণ করতে যাচ্ছিলাম।' বাড়ির ভেতর থেকে একজন নার্স বেরিয়ে এলো তার দিকে চোখ পড়তে আমার বুকের ভেতরটা এমন কঁপে উঠল যে একটা ওয়াগনের গায়ে হেলান দিয়ে আমাকে ঝড়তে হল। ইয়েলিজাভেতার সঙ্গে আশ্চর্যকর্মের মিল। সেই চোখ, সেই মুখের আদল, নাক, চোখ এমন কি কণ্ঠস্বরও এক রকম। নাকি সবটাই আমার কল্পনা? বলা যায় না, এখন থেকে হয়ত যে-কোন মেয়ের মিল খুঁজে পাব তার সঙ্গে।

একদিন এক রাত ধরে ঘোড়াগুলোকে আন্তাবলের পিছরায় ধরে রেখে দানাপানি খাওয়ানো হয়েছে এখন আবার আমরা চলছি ফস্টে তুরী বাড়িয়ে জিনে ওঠার সম্বন্ধে দিচ্ছে বাজনাধার এই যে সেই লোকটি যাকে ঠিক এই মুহুর্তে গুলি করতে বড় সাধ হয় আমার।

\* \* \*

স্কোভাড্রনের কম্যান্ডার সংযোগের জন্য বার্তা দিয়ে গ্রিগোরি মেনেখভকে রেজিমেন্টের সদর দপ্তরে পাঠান কয়েকদিন আগে যেখানে লাড়াই হয়েছিল সেই এলাকার ভেতর দিয়ে যেতে যেতে গ্রিগোরি দেখতে পেল বড় রাস্তার ঠিক ধারে একজন কসাক মরে পড়ে আছে। ঘোড়ার খুরের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত রাস্তায় ফেঁকাসে রক্তের চুলভর্তি মাথাটা চেপে রেখে সে শূয়ে আছে। গ্রিগোরি ঘোড়া থেকে নামল, এক হাতে নাক টিপে ধরে (বাসি মড়ার গা থেকে একটা উগ্র গা-গোলানো গন্ধ ছাড়ছিল) সে তার শরীর তল্লাস করতে লাগল সালোয়ারের জেবের ভেতরে পাওয়া গেল এই নোটবইটা এক টুকরো কপিং শেডিল আর একটা মনিবাগ গ্রিগোরি লোকটার কার্ভুজের বেলট খুলে নিল, তার পাতুর ভিত্তে মুখের ওপর এক ঝলক নজর পড়তে দেখতে পেল ইতিমধ্যে পচন শুরু হয়ে গেছে কপালের দু'পাশের রূপ আর নাকের খাঁজ ভিত্তে, মধ্যমলে কালো দেখাচ্ছে, কপাল বরাবর ভেরছা হয়ে চলে গেছে মরণশীতল গভীর একাধ চিন্তার রেখা তার ওপর কালো হয়ে থুলো জমেছে।

মৃত ব্যক্তির পকেটে একটা কেমিষ্ট্রকের বুঝাল ঝুঞ্জে পেয়ে গ্রিগোরি তাই দিয়ে তার মুখটা ঢেকে দিল। সদর দপ্তরে যাবার পথে বারবার পিছু ফিরে তাকাল। নোটবইটা সে সদর দপ্তরের কেরানিদের হাতে তুলে দিল কেরানিরা জটলা করে ওটা রসিয়ে রসিয়ে পড়ল এক অপরিচিত ব্যক্তির স্বল্প জীবন আর পার্থক্য কামনা-বাসনা নিয়ে নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করল

লেশনিউত দখল করার পর ১১ নম্বর ঘোড়সওয়ার ডিভিশন লড়াই করতে করতে একের পর এক স্থানিয়ান্ডটিক, রাডজিভিমোভো ও ব্রোডি পার হয়ে চলে গেল ১৫ই আগস্ট তারিখে ডিভিশন কামেনকা-ঝুমিলোভো শহরের কাছাকাছি এসে ছোট ছোট দলে ছড়িয়ে রইল। পেশেন পেশেন আসতে লাগল আর্মি গুরুত্বপূর্ণ নানা স্ট্র্যাটজিক বিভাগে আর্মির পদাতিক ইউনিটগুলোর সমাবেশ ঘটে, জংশনে জংশনে হাই কম্যান্ডের অফিসারমণ্ডলী আর দলবাহী সবকরাহ গাড়ির ভিড় জমে ওঠে। বলটিক থেকে মরণফাঁসের মতো ছড়িয়ে পড়ে ফ্রন্ট সদর দপ্তরগুলো ব্যাপক আক্রমণের পরিকল্পনা রচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। জেনারেলরা ম্যাপের ওপর হুঁকে পড়েছে, আর্দালিরা সামরিক নির্দেশের বার্তা নিয়ে এখানে ওখানে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে, হাজার হাজার সৈন্য চলেছে যুদ্ধের মুখে

অনুসন্ধানকারী দলের লোকেরা খবর আনল শত্রুপক্ষের বেশ বড় ঘোড়সওয়ার দল এগিয়ে আসছে শহরের দিকে। রাস্তার কাছাকাছি বনজঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে যেখানে যেখানে শত্রুর আগুয়ান দলের সঙ্গে কসাক টহলদারদের দেখা হল সেখানেই সম্মুখ বেষ্টে গেল।

দাদার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হওয়ার পর এ পর্যন্ত অভিযানের সব সময়ই গ্রিগোরি মেনেখভ তার বেদনাদায়ক ডাবনাচিন্তার ইতি টেনে তার আগেকার সেই মানসিক কৈর্য ফিরে পাবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু কিছুতেই নিজের মনের ওপর আস্থা সে ফিরে পাচ্ছে না। শেষ সংরক্ষিত স্কোয়াড্রন থেকে তৃতীয় দফার লোকজন রেজিমেন্টের সঙ্গে এসে মিলল এই দলের একজন, কাজানস্কায়া জেলা সদরের কসাক, গ্রিগোরির সঙ্গে একই টুপে এসে পড়ল লোকটার নাম আলেক্সেই উরিউপিন। ঢাঙা, কোলকুজো গড়নের নীচের চোয়াল সামনের দিকে বেরিয়ে আছে, কালমিকদের ধরনের লম্বা পাতলা গৌরব তার ডাবলেশহীন, ফুটিমাথা চোখদুটি সব সময়ই হাসছে। বয়স তেমন একটা না হলে কী হবে তার মাথার টাক চকচক করছে, কেবল টিবির মতো ফুলো, এবড়োখেবড়ো উজাড় খুন্টিটার চারপাশে হালকা বাদামী রঙের কয়েক গোছা পাতলা চুল ঝাড় বেঁধে আছে। প্রথম দিনেই কসাকদের মধ্যে তার ডাবনাম হরে গেল ‘খুন্টিওয়াল’

ব্রোডির উপকণ্ঠে যুদ্ধের পর রেজিমেন্টটা এক দিনের বিশ্রামের সুযোগ পেল। উরিউপিনের সঙ্গে একই বাড়িতে ঠাই হল গ্রিগোরির। ওদের মধ্যে কথাবার্তা চলতে লাগল

‘তোমার যেন কেমন একটা নেতিয়ে পড়া ভাব মেনেখভ।’

নেতিয়ে পড়া মানে ?' গ্রিগোরি মুখ গোমড়া করে বলল।

'কেমন যেন নিস্তেজ দেখলে মনে হয় বুঝি অসুখ করেছে,' ঝুটিওয়ালা প্রাঞ্জল করে বলল।

যোড়ার শিঙ্গারার ভেতরে নিজেনের ঘোড়াগুলোকে দানাপানি ঝাওয়াতে ঝাওয়াতে একটা জরাজীর্ণ ছাতলাপড়া বেড়ার গায়ে হেলান দিয়ে ওরা তামাক টানছিল। পাশাপাশি চারজন করে দুজার ঘোড়সওয়ারদের দল রাস্তা দিয়ে চলেছে। বেড়ার ধারে ইতস্তত ছড়িয়ে পড়ে আছে মুতসেই (অস্ট্রীয়দের হাট্টিয়ে দিতে গিয়ে রাস্তায় রাস্তায় সংঘর্ষ হয়েছিল) ইতুদীদের একটা ধর্মমন্দির পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, ধ্বংসস্থলের ভেতর থেকে ছড়িয়ে পড়ছে হাল্কা ধোঁয়ার মেঘ গোথুলির এই বিচিত্র বর্ণসমারোহের মুহূর্তে শহরটা এক বিশাল ধ্বংসস্থলের মতো দেখাচ্ছে, বিস্তীর্ণ বকম খাঁ খাঁ করছে।

'অসুখ বিসুখ আমার কিছুই নেই,' ঝুটিওয়ালার মুখের দিকে না তাকিয়ে থুতু ফেলল গ্রিগোরি।

'বললেই হল। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি '

'কী দেখতে পাচ্ছ ?'

'তুমি ভয় পাচ্ছ হে, ভরে ফোর্সফোর্স নিশ্বাস ফেলছ কিসের ভয় ? মরার ভয় ?'

'তুমি একটা হীদারাম,' চোখ কুঁচকে নখের ডগা নিরীক্ষণ করতে করতে অবজ্ঞাভরে গ্রিগোরি বলল।

'আচ্ছা বল ত কোন লোককে বুন করেছে তুমি ?' গ্রিগোরির মুখ ঝুটিয়ে ঝুটিয়ে দেখতে দেখতে স্পষ্ট করে সে বলল

করেছি। কেন, কী হয়েছে তাতে ?'

'মনে মনে কষ্ট পাচ্ছ বুঝি ?'

'কষ্ট ? কিসের কষ্ট ?' গ্রিগোরি কাণ্টহাসি হাসল

ঝুটিওয়ালা খাপ থেকে তলোয়ার টেনে বার করল

'তুমি কি চাপ তোমার মুণ্ডটা খসিরে দিই ?'

'তারপর ?'

'তারপর কী আবার ? বুন করব কিছু এতটুকু দীর্ঘনিশ্বাস পড়বে না আমার এতটুকু দয়ামায়া নেই আমার মধ্যে।' ঝুটিওয়ালার চোখদুটো হাসতে লাগল, কিন্তু তার গলার স্বরে আর নাকের দু'পাশ হিংস্রতায় যেমন তিরতির করে কাঁপছে তাতে গ্রিগোরির বুঝতে বাকি রইল না যে তার কথাগুলো মিথ্যে নয়

'তুমি একটা আজব লোক, একটা জংলী ভূত, ঝুটিওয়ালার মুণ্ডটা মনোবোণ দিয়ে দেখতে দেখতে গ্রিগোরি বলল

‘তুমি একটা ভীতুর ডিম দেখছি আচ্ছা। বাকলানভের কোপ কাকে বলে জান? তাহলে এই দেখ।’

বাড়ির বাগানে একটা বুড়ো বার্চগাছ বেড়ে উঠেছিল ঝুটিওয়ালা চোখ দিয়ে স্থির লক্ষ্য রেখে ঘাড় গৌজ করে সোজা সেই দিকে ঘেঁরে গেল তার বেজায় চওড়া কব্জিওয়ালা, শিরা-ওঠা লম্বা হাতদুটো স্থির হয়ে দু’পাশে ঝুলে রইল।

‘এই দেখ।’

ধীরে ধীরে সে তলোয়ারখানা তুলল, গুড়ি মেরে বসতে বসতে হঠাৎ প্রচণ্ড বেগে এক তেরছা কোপ ঝাড়ল বার্চগাছটা শেকড়ের হাত তিনেক উঁচু থেকে কেটে টুকরো হয়ে পড়ে গেল তার ডালপালাগুলো বাড়ির দেয়াল আঁচড়ে জানলার খালি ফ্রেমে আটকে রইল।

‘দেখলে? শিশে রাখ। বাকলানভ একজন আত্মমান ছিল। শুনছে তার নাম? তার তলোয়ারটাও ছিল ভেতরটা পারায় ভরতি এত ভারী যে তোলা শক্ত, কিন্তু কোপ যা পড়ত! এক কোপে একটা ঘোড়া কেটে দু-আধলা। ঠিক এই রকম!’

কোপ মারার জটিল কায়দাটা বণ্ট করতে ত্রিগোবির বেশ সময় লাগল।

‘তোমার গায়ে জোর আছে, কিন্তু তলোয়ার চালাও বোকার মতো এই যে দেখ, কী রকম চালাতে হয়।’ ঝুটিওয়ালা গুকে শেখাতে লাগল। তলোয়ারের একেকটা তেরছা কোপ প্রচণ্ড বেগে এসে পড়তে লাগল তার লক্ষ্যবস্তুর ওপর।

‘মানুষের ওপর যখন কোপ মারবে তখন সাহস করে মেরো। মানুষ হল একতাল কাদার মতন নরম, দু’চোখে হাসতে হাসতে ঝুটিওয়ালা তাকে শেখাল ‘কখনও ডাববে না কেন, কী জন্যে তুমি কসাক, তোমার কাজই হচ্ছে কাটা কোন প্রশ্ন না করে কাটা। লড়াইয়ে শত্রুকে মারা পুণ্যের কাজ। একেকটা মানুষ খুন করবে, ভগবান একটা করে তোমার পাপের বোঝা হালকা কবে দেবেন, সাপ মারলে যেমন তিনি করেন কোন জীবজন্তুকে - এই ধর বাছুর বা ওই রকম কোন জীবকে দরকার না পড়লে মারবে না কিন্তু মানুষ? মানুষ ধ্বংস করে যাও মানুষ হল বিবাক্ত মানুষ জঞ্জাল, পৃথিবীর অববর্জনা বিবাক্ত ছাতার মতো।’

ত্রিগোবির আপত্তি তুলতে সে শুধু ভুরু কৌচকাল, মুখ খুলল না একেবারে চুপ মেরে গেল।

ত্রিগোবির অবাধ হয়ে লক্ষ করল প্রত্যক্ষ কোন কারণ না থাকা সত্ত্বেও ঘোড়াগুলো কেন যেন ঝুটিওয়ালাকে দেখলে ভয় পায় সে যখনই ঘোড়ার শিঁজুর কাছাকাছি আসে ওরা সঙ্গে সঙ্গে কান খাড়া করে, গায়ে গা লাগিয়ে

দঙ্গল বেঁধে দাঁড়িয়ে পড়ে যেন মানুষ ত নয়, কোন জানোয়ার তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। স্তানিগ্লাভচিকের উপকণ্ঠে স্কোয়াড্রনটাকে বনজঙ্গল আর জলা জায়গার ওপর দিয়ে আক্রমণ চালাতে হল সকলে ঘোড়া থেকে নেমে পায়ে হেঁটে যেতে বাধ্য হল কিছু সৈন্যের ওপর গিরিখাতের মধ্যে নিরাপদ জায়গায় ঘোড়াগুলোকে সরিয়ে নিয়ে যাবার ভয় পড়ল। ঝুটিওয়ালা ছিল তাদের মধ্যে একজন, কিন্তু সে সরাসরি আপত্তি করে বসল।

‘এই শালা খানকির বাজা উরিউপিন, এসব কী খেলা হচ্ছে শূনি? ঘোড়া নিয়ে ব্যালিস না কেন?’ টুপ-সার্জেন্ট ঝাঁকিয়ে উঠল তার ওপর।

ওরা আমাকে ভয় পায় মাইরি বলছি, ভয় পায়।’ চোখে তার সেই অভ্যস্ত হাসি হাসি ভাব বজায় রেখে দিবি্য করে বলল সে।

ঘোড়ার পাল উদারকির কাজ সে কক্ষিনকালে করে নি। নিজের ঘোড়াটাকে অবশ্য সে খুব আদর যত্ন করত কিন্তু একটা জিনিস গ্রিগোরি সব সময় লক্ষ করেছে - প্রভু তার অভ্যাসবশত দু’পাশে হাতদুটো স্থির ভাবে ঝুলিয়ে যখনই ঘোড়াটার কাছে এগিয়ে আসে অমনি ঘোড়াটা চকল হয়ে ওঠে - উদ্বেজনার তার শিরদাঁড়ার কাঁপুনি খেলে যায়।

‘ওহে সাধুবাবা, আমাকে বল দেখি তোমাকে দেখলেই ঘোড়াগুলো ছটফট করে কেন?’ গ্রিগোরি একবার তাকে জিজ্ঞেস করল।

‘কী জানি বাবা।’ ঝুটিওয়ালা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল। ‘আমি ত ওদের খুব ময়ামায়া করি।’

‘মাতালদের না হয় ওরা গজ্ঞে টের পায়, তাই ভয় পায়। কিন্তু তুমি ত বাপু নেশাটেশা কর না।’

‘আমার মনটা কঠিন, ওরা টের পায়।’

‘নেকড়ের মতো হিংস্র তোমার মনটা বলা যায় না হয়ত মন বলে কোন পদার্থই নেই তোমার, তার বদলে আছে আস্ত একটা পাথর।’

‘হবেও বা,’ কোন আপত্তি না তুলে প্রসন্নচিত্তে মেনে নিল ঝুটিওয়ালা।

কামেন্কা-গুমিলোগোভো শহরের উপকণ্ঠে তিন নম্বর টুপের সব সৈন্য টুপ-অফিসারের সঙ্গে প্রাথমিক পর্ববেক্ষণে বেরিয়ে পড়ল অস্টিয়ান ইউনিটগুলোর অবস্থান এবং গরোশি-স্তানভিনথ্ভি লাইনে তাদের সম্ভাব্য পাল্টা আক্রমণের সংবাদ আগের দিন একজন পলাতক চেক সৈন্য ব্লুশ ফৌজীকর্তাদের জানিয়ে গেছে ফলে যে হাজার ধরে শত্রুপক্ষের ইউনিটগুলো এগোনোর কথা তার ওপর নিরন্তর নজর রাখা দরকার হয়ে পড়ল। এই উদ্দেশ্যে যেন শৈশখপ্রান্তে একজন টুপ-সার্জেন্টের অধীনে চারজন কসাকের একটা দল রেখে বাকিদের নিয়ে

টুপ-অফিসার চলে গেল টিলার ওপাড়ের এক কুমক পানীর দিকে। দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল সেখানকার খোলায় ছাওয়া বাড়িঘরের চাল

বনের শেষপ্রান্তে একটা পুরনো ভজনালয়। সবু ছুঁচালো হয়ে উঠে গেছে তার চালটা, চালের মাথায় একটা মরচে ধরা ক্রুশবিদ্ধ যীশুমূর্তি। সার্জেন্টের সঙ্গে এই ভজনালয়ের কাছাকাছি রয়ে গেল গ্রিগোরি মেলেক্সও এবং আরও তিনজন অল্পবয়সী কসাক সিলান্টিয়েভ, ঝুটিওয়ালা উরিউগিন আর মিশ্কা কশেভয়।

‘নেমে পড় হে ছেলেরা, ঘোড়ার পিঠ থেকে,’ সার্জেন্ট হুকুম দিল ‘কশেভয়, ওই যে ওখানে দেবদারুগাছগুলো আছে ওর পেছনে নিয়ে যাও ঘোড়াগুলোকে হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই যে যেখানে একটু বেশি ঘন।’

একটা দেবদারুগাছ শুকিয়ে ডেঙে পড়েছিল কসাকরা তার তলায় শূয়ে শূয়ে ভামাক ঝেঁতে থাকে সার্জেন্ট দূরবীন চোখে লাগিয়ে অনবরত নজর রাখতে থাকে ওদের হাত পাঁচেক দূরে রাইয়ের ক্ষেত ফসল তোলা হয় নি, দানা ঝরে পড়েছে। পাকা রাইয়ের খালি শিথগুলো ওপর ঢেউ খেলে যাচ্ছে। শিথগুলো বাতাসে ঝুঁকে পড়ছে, শোকার্ভ মর্মবধ্বনি তুলছে কসাকরা শূয়ে শূয়ে অলস গালগল্প করে আশঘণ্টা কাটিয়ে দেয়। শহরের ডানখারের কোন এক জায়গা থেকে অবিরাম কামানের গর্জন কানে আসছে গ্রিগোরি হামাগুড়ি দিয়ে ক্ষেতের দিকে এগিয়ে যায়, দানাভরা কিছু শিথ বেছে নিয়ে হাতে জলে ভেতর থেকে দানা বার করে চিবুতে শুরু করে। বেশি পেকে যাওয়া দানাগুলো শক্ত হয়ে গেছে

‘ওই ত, অস্ট্রিয়ানরা না?’ সার্জেন্ট উন্নসিত হয়ে চাপা গলায় বলে

‘কোথায়?’ সিলান্টিয়েভ চমকে নড়েচড়ে ওঠে

‘ওই যে বনের ভেতর থেকে আসছে। ডান দিকে তাকিয়ে দেখ।’

দূরের বনের গাছপালার ফাঁক থেকে বেরিয়ে এসেছে এক দল্লল ঘোড়সওয়ার। তারা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে দূরের মাঠ আর মাঝে মাঝে অন্তরীপের মতো বেরিয়ে থাকা বনপ্রান্ত ঝুটিয়ে ঝুটিয়ে দেখতে লাগল তারপর এগোতে শুরু করল কসাকদের দিকে

‘মেলেক্সও’ সার্জেন্ট ডাক দিল

গ্রিগোরি হামাগুড়ি দিয়ে দেবদারু গাছটার কাছে ফিরে এলো

‘আরও কাছে আসতে দেওয়া যাক, তারপর দেব এক বাকি গুলি ঝেঁড়ে ওদের ওপর রাইফেল ঝাণিয়ে ধর ছেলেরা!’ সার্জেন্ট চাপা গলায় বিকারগ্রস্তের মতো ফিসফিস করে বলল।

ঘোড়সওয়ারের দলটা ডান দিকে মোড় নিয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল। কসাক চারজন দম বন্ধ করে নিঃশব্দে শূয়ে রইল দেবদারু গাছের নীচে



‘আউথ্রট, কাপ্তান’ বাতাসে ভেসে এলো একটা গমগমে তরুণ কণ্ঠস্বর

ত্রিগোরি মাথাটা একটু তুলতে দেখতে পেল বিনুনি পাকানো সুতোয় ঝালর দেওয়া সুন্দর ঝলমলে কোর্টা গায়ে দকল বেঁধে চলেছে ছয়জন হাস্যরসী হুজার। সামনের জন একটা বিশাল কালো কুচকুচে ঘোড়ার পিঠে, হাতে ক্যারাবিন-বন্দুক। মোটা গলায় চাপা হাসি হাসছে

‘চালাও!’ সার্জেন্ট ফিসফিস করে বলল

‘গুড-ডুম-গুম!’ গুলির বাঁক ছুটল।

‘উম-উম-উম!’ দীর্ঘ প্রতিধ্বনি উঠল পেছন পেছন

‘আরে করছ কী তোমরা?’ দেবদারুগাছগুলোর আড়াল থেকে শঙ্কিত হয়ে চিংকার করে বলল কশেভর, তারপর ঘোড়াগুলোর উদ্দেশে বলল, ‘এই, এই হারামজাদারা! আরে, কৈপে গেল যে ধুস্তেরি শয়তান!’ তার চড়া গলা, সকলকে সচকিত করে দিল

হুজারদের শৃঙ্খল ভেঙে গেছে, তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে ক্ষেতের মধ্য দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে। তাদের মধ্যে সেই যে লোকটা দানাপানি খাওয়া কালো কুচকুচে ঘোড়ার পিঠে চড়ে আগে আগে চলছিল সে শূন্যে গুলি ঝুড়ল শেবের জন আর সবার চেয়ে পিছিয়ে পড়েছিল ঘোড়ার ঘাড়ের সঙ্গে লেপটে পড়ে সে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে, মাথার টুপিটা বাঁ হাতে ধরা, থেকে থেকে পেছন ফিরে তাকাচ্ছে।

সবার আগে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল ঝুটিওয়ালা, রাইফেলটা ব্যাগেরে ধরে রাইফেলের ভেতর দিয়ে ছোট্ট খেতে খেতে সে ছুটে লাগল ‘খ’ পীচেক হাত দূরে একটা ঘোড়া মাটিতে পড়ে পা ঝুড়ছে, ওঠার বৃথা চেষ্টা করছে। তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে একজন হাস্যরসী হুজার লোকটার মাথায় টুপি নেই ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যাওয়ার ফলে তার হাঁটুতে চোট লেগেছিল, সেই জায়গাটায় হাত বুলাচ্ছে দূর থেকেই সে কী যেন বলে চেষ্টা করে উঠল মাথার ওপরে হাত তুলতে তুলতে ফিরে তাকাল পলায়নপর সঙ্গীদের দিকে ওরা ততক্ষণে অনেক দূরে চলে গেছে

পুরো ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটে গেল যে ঝুটিওয়ালা যখন বন্দীকে নিয়ে দেবদারুগাছের কাছে ফিরে এলো একমাত্র তখনই ত্রিগোরির চমক ভাঙল।

‘ওটা ফেলে দাও হে সেপাই বাবাজী!’ বুক ভাবে হুজারের তলোয়ারখানায় একটা হেঁচকা টান মেরে সে চেষ্টা করে বলল

বন্দী বিব্রত ভাবে হাসল, ব্যস্তসমস্ত হয়ে বেলট খুলতে গেল বেলটটা খুলতে পারলে সে বাঁচে, কিন্তু তার হাত রীতিমতো কাঁপছে, বকলস খোলার সাধি কোনমতে হল না ত্রিগোরি ঝুনিয়ার হয়ে তাকে সাহায্য করল হুজার

সৈন্যটির বয়স অল্প, লম্বা গড়নের, মুখখানা তার গোলগাল, নিখুঁত কামানো মুখের ওপরের ঠোঁটের কোনায় একটা আঁচিল। ছোকরা কৃতজ্ঞতাজরে গ্রিগোরির দিকে তাকিয়ে হাসল, মাথা ঝুঁকিয়ে বন্যবাদ জানাল তাকে। দেখে বেশ বোঝা গেল তলোয়ারটা ছাড়তে পেরে সে খুশি হয়েছে। কসাকদের মুখের দিকে তাকিয়ে সে পকেট হাতড়াতে লাগল, শেষকালে একটা চামড়ার ঝটুয়া বার করে তড়বড় করে কী যেন সব বলল, আকারে ইসিডে বোঝা গেল ওদের তামাক দিয়ে আপ্যায়ন করতে চায়।

‘আমাদের তামাক খেতে বলছে,’ মৃদু হেসে সার্জেন্ট নিজেই সিগারেট পাকানো কাগজের খোঁজ করল ওর পকেটে

‘ফোকটের সিগারেট খাওয়া যাক,’ বিকবিক করে হাসতে হাসতে বলল সিলানভিয়েভ।

কসাকরা সিগারেট পাকিয়ে টানতে লাগল। পাইপের কড়া কালো তামাক বেশ নেশা ধরিয়ে দিল

‘ওর রাইফেলটা কোথায় গেল?’ পরম আগ্রহভরে সিগারেট টানতে টানতে সার্জেন্ট জিজ্ঞেস করল

‘এই যে,’ পিঠে ঝোলানো হলুদ রঙের চামড়ায় সেলাই করা একটা বেল্ট দেখিয়ে ঝুটিওয়ালা বলল।

‘ওকে ঝোয়াড়ুনে নিয়ে যাওয়া দরকার। হেড কোয়ার্টারে খবর আদায়ের জন্য লোক চাই। কে ওকে নিয়ে যাবে ছোকরারা?’ কেশে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে কড়া তামাকের নেশায় ঢুলুঢুলু চোখের দৃষ্টি কসাকদের মুখের ওপর বুলিয়ে সার্জেন্ট জিজ্ঞেস করল।

‘আমি নিয়ে যাব,’ ঝুটিওয়ালা আগ বাড়িয়ে বলল।

‘ঠিক আছে, নিয়ে যাও।’

বলীকে দেখে মনে হল সে যেন বুঝতে পেরেছে কী ঘটতে যাচ্ছে। ঠোঁট ঝুঁকিয়ে সে কল্প ভাবে হাসল। অনেক কষ্টে নিজের উপলব্ধিকে চেপে রেখে যান্ত্রসমস্ত হয়ে পকেট হাতড়াল, পকেট উলটে খানিকটা দলাশাকানো গলামতন চকোলেট বার করে কসাকদের সাধাসামি করতে লাগল নেওয়ার জন্য।

‘বুসিন ইখ বুসিন নিখট আউস্ট্রিস’\* বিকৃত উচ্চারণে সে বলল। হাস্যকর অল্পভঙ্গি করে গাঙ্গে ভুরভুরে দলাশাকানো চকোলেট নিয়ে বারবার সাধতে লাগল কসাকদের

\* আমি গালিংস গালিংস অস্ট্রিয়ান নই (বিকৃত জার্মান)

‘আর কিছু অল্প আছে?’ সার্জেন্ট তাকে জিজ্ঞেস করল ‘আরে এমন আগড়ম্ব বাগড়ম্ব বুলি খেতো না বাপু, ওসব কিছুই বুঝি নে আমরা বলি লিভরভার আছে? গুড়ম্ব গুড়ম্ব আছে?’ সার্জেন্ট কান্টনিক রিভলভারের ট্রিগার টিপল।

বন্দী সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড জোরে মাথা ঝাঁকাল

‘আছে না! আছে না!’

ইচ্ছে করেই নিজেকে তল্লাশি করতে দিল সে তার ফুলো ফুলো গালদুটো কঁপতে লাগল

তার আঁটো প্যান্টটা হাঁটুর কাছে ছিড়ে গেছে, সেখান থেকে রক্ত বরছে, গোলাপী শরীরের ছড়ে যাওয়া জায়গাটা বেরিয়ে পড়েছে। সেখানে সে হুমাল চেপে ধরছে, সঙ্গে সঙ্গে ডুবু কৌচকাচ্ছে, মুখ দিয়ে চুকচুক আওয়াজ করছে আর অনর্গল বকবক করে যাচ্ছে তার মাথার টুপিটা মরা ঘোড়াটার পাশে পড়ে ছিল টুপি, কবল আর নোটবইটা আনার জন্য সে সেখানে যাবার অনুমতি চাইল ওদের কাছে। নোটবইটার মধ্যে তার পরিবার-পরিজনদের কটো আছে। সার্জেন্ট বেশ মন দিয়ে বোঝার চেষ্টা করল ও কী বলতে চায়, কিন্তু শেষকালে হাল ছেড়ে দিয়ে হাত নোড়ে বলে উঠল, ‘ওকে নিয়ে যাও।’

কম্পেভয়ের কাছ থেকে নিজের ঘোড়াটা নিয়ে ঝুটিওয়ালা তার ওপর উঠে বসল রাইফেলের বেল্টটা ঠিকঠাক করে নিয়ে হাত দিয়ে ইশারা করে বলল, ‘চল হে মিলিটারীর শো, ইন্ডির মিস্তির সেপাই বাবাজী।’

ঝুটিওয়ালার হাসিতে উৎসাহিত হয়ে বন্দীও হাসল, তারপর চলতে লাগল ঘোড়ার পাশে পাশে। এমন কি বেশ তোয়াজ করে অভয়রাজ ভঙ্গিতে ঝুটিওয়ালার শুকনো কেঁঠো পায়ের নলিতে চাপড়ও মারল। ঝুটিওয়ালা হুক ভানে ঝটকা মেরে তার হাত সরিয়ে দিল, ঘোড়ার রাশ টেনে ধরে তাকে আশে আশে যেতে দিল।

‘যা যা শয়তান! ইয়ারকি মারা হচ্ছে?’

বন্দী কাচুমাচু হয়ে স্রুত পা চালাল। এবারে সে গম্ভীর মুখে চলতে লাগল, চলতে চলতে ঘন ঘন ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে লাগল পিছনে পড়ে থাকা কসাকদের মাথার চাঁদির ওপর ঝাড়া হয়ে উডতে লাগল তার ফেকাসে রক্তের চুল-প্রায় কাপাসের মতো সাদা। পাকানো সুতোয় ঝালর দেওয়া হুজার কোর্তাটা কাঁধের ওপর ফেলা, চাঁদির ওপর কাপাসের মতো সাদা উডু উডু চুলের গোছা, তার হাঁটার দৃশ্য, সদর্প ভঙ্গি - লোকটার এই চেহেরাই আঁকা হয়ে রইল গ্রিগোরির স্মৃতিপটে।

‘মেলেশভ য়াও ত, ওর ঘোড়ার জিনটা খুলে নিয়ে এসো,’ মেলেশভকে এই নির্দেশ দিয়ে সিগারেটের শেষ টুকরোটোর ওপর সখেদে খুঁতু ফেলল সার্জেন্ট সুখটান দিতে গিয়ে হাতের আঙুল পোড়াতেও তার দুঃখ হল না

গ্রিগোরি মরা ঘোড়াটার কাছে গিয়ে জিন খুলল। কিছু দূরে মাটিতে লোকটার মাথার টুপিটা পড়ে ছিল, কেন যেন সেটা তুলে নিয়ে জেতরের লাইনিংটা নুকে দেখল যাম আর সম্ভারের মাঝানের ঝাঁঝাল গন্ধ নাকে এসে লাগল। জিনটা বয়ে নিয়ে গেল, তখনও বাঁ হাতে সজ্জপলে ধরে ধরে রেখেছে হুজার-টুপিটা কসাকরা দেবদাবুগাছের কাছে উলু হয়ে বসে জিনের খলি হাতড়াতে লাগল, অচেনা ধাঁচে তৈরি জিনটা ঝুটিয়ে ঝুটিয়ে দেখতে লাগল।

‘তামাকটা কিছু ওর বেড়ে ছিল সিগারেটের জন্যে আরও খানিকটা চেয়ে রাখলে হত’ সিলান্ভিয়েড দৃষ্টি করে বলল।

‘হ্যাঁ, সত্যি কথা বলতে বাধা কী? খাসা তামাক।’

‘আহা কী মিষ্টি! মাখনের মতো গলা দিয়ে নেমে যায়’ তামাকের কথা মনে করে সার্জেন্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলল জিতে জল এসে যাওয়ায় ঢোক গিলল।

কয়েক মিনিট পরে দেবদাবুগাছের ফাঁকে একটা ঘোড়ার মাথা দেখা দিল। ঝুটিওয়ালা ফিরে আসছে।

‘কী হল?’ সার্জেন্ট ভর পেয়ে লাফিয়ে উঠল ‘ছেড়ে দিলে নাকি?’

চাবুক দোলাতে দোলাতে ঝুটিওয়ালা এগিয়ে এলো ঘোড়া থেকে নেমে আড়িমুড়ি ডাকল, কঁধদুটো টান টান করল।

‘কোথায় গেল অস্ত্রিয়ানটা?’ সার্জেন্ট ওর দিকে এগিয়ে আসতে আসতে জিজ্ঞেস করল।

‘আঃ ছাড় দেখি!’ বঁকিয়ে উঠল ঝুটিওয়ালা ‘পালাজিল মানে, পালানের চেষ্টা করছিল’

‘তুমি ওকে পালাতে দিলে?’

‘আমরা রাস্তার নামতে ব্যাটা আচমকা তাই কেটে ফেলেছি ওকে’

‘মিছে কথা!’ গ্রিগোরি চিৎকার করে উঠল ‘ওকে শুষু শুষু খুন করেছ তুমি!’

‘অমন চোঁচাচ্ছ কেন তুমি? তোমার কী?’ এই বলে ঝুটিওয়ালা হিমকঠিন হ্রি দৃষ্টিতে তাকাল গ্রিগোরির দিকে।

‘কী-ই-ই?’ গ্রিগোরি ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল, কাঁপা কাঁপা হাতে চারপাশ হাতড়াতে লাগল।

‘নিজের চরকায় তেল দাও গে বুরোছ? নিজের চরকায় তেল দাও গে!’ কঠোর স্বরে ঝুটিওয়ালা দুবার আওড়াল।

হাঁচকা টানে বেল্টে-ঝোলানো রাইফেলটা তুলে নিয়ে গ্রিগোরি ঝট করে কাঁধে তুলল।

ট্রিগার চেপে ধরতে গিয়ে তার আঙুলটা ধরধর করে কেঁপে উঠল। মুখ বেগমী হয়ে উঠল, অদ্ভুত রকম বঁকে গেল।

‘এই, এই কী হচ্ছে?’ গ্রিগোরির দিকে ছুটে আসতে আসতে চিৎকার করে এক দাবড়ানি দিল সার্জেন্ট

পুলিটা ছোট্ট আর আগেই এক ধাক্কা মারল সার্জেন্ট, ফলে গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হল পাইনগাছের পাতা ঝরিয়ে মৃদু টানা শিস দিয়ে বেরিয়ে গেল।

এ কী কাণ্ড!’ কণ্ঠভয় অবাক হয়ে বলল।

সিলান্টিয়েভ হাঁ করে বসে ছিল, সেই তাবেই বসে রইল

সার্জেন্ট গ্রিগোরির বুক ধাক্কা মেরে তাকে সরিয়ে দিয়ে তার রাইফেলটা ছিনিয়ে নিল। একমাত্র ঝুটিওয়ালারই কোন বিকার দেখা গেল না। আগের মতোই বাঁ হাতে বেলট চেপে ধরে দু’পা ফাঁক করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

‘আবার গুলি কর!’

‘খুন করব।’ গ্রিগোরি তেড়ে গেল তার দিকে।

‘আরে হল কী তোমাদের?’ এসবের মানে কী? কোর্ট মার্শাল হয়ে গুলি খেয়ে মারা পড়ার ইচ্ছে আছে নাকি? বন্দুক নামিয়ে রাখ বলছি।’ সার্জেন্ট হুকুম দিয়ে উঠে গ্রিগোরিকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে কুশবিজ্ঞের ভঙ্গিতে হাত দু’পাশে ছড়িয়ে দিয়ে ওদের দু’জনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ল।

‘মিথ্যে কথা বলছ, তুমি আমাকে খুন করবে না।’ ঝুটিওয়ালার তড়াক করে লাফিয়ে উঠে একপাশে একটা পা সরিয়ে নিতে নিতে সংযত ভাবে হেসে বলল

ওরা যখন ফিরতি পথ ধরল ততক্ষণে গোথুলি নেমে এসেছে। গ্রিগোরিই প্রথম দেখতে পেল কাঁটা লাশটা, রাস্তার ওপর পড়ে আছে আর সকলকে ছাড়িয়ে সে এগিয়ে গেল সেই দিকে। ঘোড়াটা নাক দিয়ে ঘড়ঘড় আওয়াজ করতে লাগল। সামনে এসে ঘোড়ার রান টেনে ডালো করে তারিফ দিয়ে দেখল সে রাস্তার ধারের খিকখিকে শেওলার ওপর লোকটা উপুড় হয়ে পড়ে আছে, একটা হাত পিছন দিকে ঘুরে গিয়ে ছড়িয়ে আছে, মুখটা শেওলার মধ্যে গৌজা ঘাসের ওপর হাতের চোটোটা শরভের হলুদ ঝরাপাতার মতো নিম্প্রভ সেখাচ্ছে প্রচণ্ড একটা কোপে খুব সম্ভব সেটা এসেছিল পেছন থেকে বন্দীর দেহটা কাঁধ থেকে কোমর পর্যন্ত তেরছা ভাবে কেটে দু’আবখানা হয়ে গেছে।

‘ওঃ কী কোপটাই ঝেড়েছে।’ পাশ দিয়ে যেতে যেতে মরামানুষটার মাথার দিকে আড়চোখে চেয়ে শিউরে উঠে চাপা গলায় সার্জেন্ট মন্তব্য করল মাথাটা দুমড়ে বিকৃত হয়ে গেছে, কাপাস তুলোর মতো সাদা, উড়ু উড়ু খাড়া চুল ততক্ষণে নেতিয়ে পড়েছে।

স্কোয়াড্রনের ঘাঁটি পর্যন্ত কসাকরা নিঃশব্দে ঘোড়া চালিয়ে গেল। সম্ভার অন্ধকার গাঢ় হয়ে এসেছে, বাতাসে পশ্চিম দিক থেকে ভেসে আসছে কালো পালকের মতো একধাপ মেঘ কাছের কোন এক বিল থেকে জলাঘাস আর শচা কাদার একটা ভ্যাপসা গন্ধ উঠে আসছে একটা কাদাখোঁচা গলা ছেড়ে ডেকে চলেছে ঘোড়ার সাজের টুং টাং আওয়াজ, রেকাবের সঙ্গে হঠাৎ হঠাৎ তলোয়ারের ঠোকাঠুকি আর ঘোড়ার বুকের নীচে বিঝিকিঝি দেবদারু পাতা গুঁড়ানোর মচমচ শব্দ ঘুম-ঘুম নিস্তর্রতা ভেঙে দিচ্ছে বনপথের মাথার ওপরে দেবদারুগাছের কাণ্ডগুলোর গায়ে দশ দশ করছে পড়ন্ত সূর্যের গাঢ় লাল আভা। ঝুটিওয়ালা ঘন ঘন সিগারেট টেনে চলেছে। ঝিকিঝিকি আলোয় আলোকিত হয়ে উঠছে শক্ত করে সিগারেট আঁকড়ে ধরা তার ফুলো ফুলো আঙুল আর কালো কালো নখ

সম্ভার অব্যক্ত বেদনাঘন মোছা-মোছা যেনও পৃথিবীর বুকে নেমে এসেছিল, বনের মাথার ওপর মেঘ জমা হতে তা আরও শব্দ, আরও গাঢ় হয়ে উঠল



বুঝ ভোরে শুরু হয়ে গেল শহর দখলের অপারেশন দু'পাশে এবং রিজার্ভে ঘোড়সওয়ার সৈন্যদের রেখে ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বনের দিক থেকে পদাতিক-ইউনিটগুলো আক্রমণ চালাবে এই রকমই কথা ছিল। কিন্তু কোথা থেকে যেন সব গোলমাল হয়ে গেল দুটো পদাতিক-রেজিমেন্ট সময়মতো এসে পৌঁছুল না। ২১১ নম্বর পদাতিক-রেজিমেন্টকে নির্দেশ দেওয়া হল বাঁ পাশে সরে যেতে আরেকটা রেজিমেন্ট যখন ঘুরে আক্রমণের মুখে এগিয়ে যাবার উদ্যোগ করছিল সেই সময় নিজস্বেরই কমান্ডের গোলা তাদের ওপর এসে পড়ল একটা অর্ধহীন, মারাত্মক ডামাডোলের মধ্যে পড়ে প্ল্যান ভেঙে গেল। আক্রমণ করতে গিয়ে এখন উলটে আক্রমণকারীদেরই সমূহ বিনাশের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে তা যদি নাও হয়, অন্তত বার্থতার ত বটেই রাতে কোথা থেকে যেন নির্দেশ দিয়ে অস্ত্রশস্ত্র আর গোলাবাবুদসমেত কিছু গাড়ি জলা জমিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয় গোলন্দাজরা যখন সেই সব নামানোর কাজে ব্যস্ত এবং যখন পদাতিক বাহিনীকে ঢেলে সাজানো হচ্ছিল সেই সময় ১১ নম্বর ডিভিশন আক্রমণে নেমে পড়ল জলো আর জলা জমিতে বিস্তৃত ফ্রন্ট জুড়ে শত্রুপক্ষের ওপর আক্রমণ চালানো সম্ভব না হওয়ায় কোন কোন ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক বাহিনীর স্কোয়াড্রনগুলোকে আলাদা আলাদা টুপে ভাগ হয়ে আক্রমণের জন্য এগোতে হল। ১২ নম্বর রেজিমেন্টের



চার নম্বর ও পাঁচ নম্বর স্কোয়াডনকে বাড়তি হিঁশেবে সরিয়ে রাখা হল। বাকিরা ইতিমধ্যে তুমুল আক্রমণাত্মক লড়াইয়ে নেমে গেছে। মিনিট পনেরো বাদেই রিজার্ভ স্কোয়াডনগুলোর কানে এসে পৌঁছল লড়াইয়ের কোলাহল আর কান ফাটানো হুহুকার।

‘রে-রে-রে-রে।’

‘নেমে পড়েছে।’

‘শুরু হয়ে গেল।’

‘কেমন কট কট মেশিনগান চলেছে।’

‘আমাদের লোকজন নির্ঘাত কচুকাটা হয়ে গেল।’

‘আরে, সব চূপচাপ হয়ে গেল যে।’

‘তার মানে, ওরা এগোচ্ছে।’

‘দাঁড়াও না, আমরাও এক হাত দেখে নেব,’ কসাকরা নিজেদের মধ্যে ছাড়া ছাড়া ভাবে এই সব কথাবার্তা বলতে লাগল।

স্কোয়াডনটাকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল বনের ভেতরের একটা ফাঁকা জায়গায়। দৃষ্টি আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে মোটা মোটা দেবদারুগাছ পাশ দিয়ে প্রায় জোর কদমে মার্চ করতে করতে চলে গেল পদাতিকদের একটা কোম্পানি। পেছন থেকে কায়দামোরস্ত ধরনের একজন সার্জেন্ট-মেজর ডাঙা ডাঙা গলায় চিৎকার করে শেষের সারিগুলোকে ডাঙা দিতে দিতে বলছে

‘লাইন ভেঙো না, লাইন ভেঙো না।’

কাঁধে ঝোলানো জলের বোতলের টুংটাং আওয়াজ তুলে, ধূপধাপ পা ফেলাতে ফেলতে কোম্পানিটা চলে যায়, দেখতে দেখতে মিলিয়ে যায় একটা অ্যালডার বোশের আড়ালে।

অনেক দূরের জঙ্গলে ঢাকা ঢালের পেছন থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে আসছে একটা কীর্ণ ‘রে-রে-রে-রে হুহু-রে-রে-এ-এ।’ চিৎকার। আওয়াজটা এই দূরে সরে যাচ্ছে আবার কাছে ভেসে আসছে। তারপর হঠাৎই মাঝপথে থেমে গেল চিৎকার। একটা ক্লাস্তিকর গাঢ় নিস্তব্ধতা নেমে এলো।

‘এই এতক্ষণে পৌঁছল।’

‘এবারে সামনাসামনি লড়াই হচ্ছে জোর কাটাকাটি চলেছে।’

সবাই উৎকর্ণ হয়ে শোনার চেষ্টা করল। কিন্তু নিস্তব্ধতা গাঢ় হয়ে নেমে এসেছে। ডান ধারে অস্ত্রিয়ান কামানগুলো গর্জা করে গোলা ছুঁড়তে লাগল আক্রমণকারীদের ওপর। ঘন ঘন মেশিনগানের কট কট শব্দে কানে তাল লাগে যায়।

খ্রিগোরি মেলেকভ টুপের সকলের চারধারে তাকিয়ে দেখল কসাকরা ঘাবড়ে

অস্থির হয়ে উঠেছে, ঘোড়াগুলো ছটফট করছে, যেন ডাঁশ কামড়ান্নে তাদের ঝুটিওয়ালা জিনের কাঠামোর ওপর মাথার টুপি ঝুলিয়ে রেখে নীলচে-সবুজ রঙের টাকের ঘাম মুছেছে। গ্রিগোরির পাশে মিশ্কা কশেভর সে প্রাণপণে সস্তা তামাকের ধোঁয়া টানছে চারপাশের সব জিনিসই স্পষ্ট বড় বেশি মাত্রায় বাস্তব-ঠিক যেমন মনে হয় সারা রাত ঘুম না হলে

স্কোয়াদ্রনগুলো রিজার্ভ হিশেবে ঘন্টা তিনেক অপেক্ষা করল। গুলিগোলায় আওয়াজ শাস্ত হয়ে এলো, আবার বেড়ে উঠল নবোদ্যমে। কামের এরোপ্লেন ঠিক বোকা গেল না, মাথার ওপর গুল্লান তুলে করেকটা চক্র মারল নাগালের বাইরে অনেকখানি উঁচুতে ঘুরতে ঘুরতে সমানে ওপরে উঠতে লাগল, তারপর উড়ে গেল পূর্ব দিকে। এটি এয়ারক্রাফট গানগুলো প্লেনটাকে লক্ষ্য করে গোলায় ঝুড়তে লাগল - গোলা ফটার সঙ্গে সঙ্গে প্লেনের নীচে আকাশের নীল বিস্তারের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে লাগল দুখাল খোঁয়ার হালকা কুণ্ডলী

রিজার্ভ সৈন্যদের নামানো হল দুপুরের দিকে। যার যা যজ্ঞত তামাক ছিল সকলে ঝুঁকে শেষ করে দিয়েছে লোকের অপেক্ষা করে থেকে থেকে অস্থির হয়ে পড়েছে, এমন সময় নির্দেশ নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে হাজির হল এক হুজার-আদালি। চার নম্বর স্কোয়াদ্রনের কমান্ডার তৎক্ষণাৎ স্কোয়াদ্রনকে বনের পথে নামিয়ে একপাশে কোথায় যেন নিয়ে চলল (গ্রিগোরির কেন যেন মনে হল তারা সামনের দিকে না এগিয়ে শেছনের দিকে চলেছে)। ভাড়াচোরা সারি বৈধে মিনিট কুড়ি তারা চলল ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে। ক্রমেই কাছে এগিয়ে আসতে লাগল যুদ্ধের কোলাহল ধারেকাছে, তাদের পেছনে কোথায় যেন একটা ব্যাটারি নুহুর্মুহু ঝলকে ঝলকে কামান দেগে চলেছে, মাথার ওপর দিয়ে প্রতিকূল বাতাস ভেদ করে তীক্ষ্ণ কড় কড় শব্দে ছুটে চলেছে কামানের গোলা। বনের ভেতর দিয়ে জাগ জাগ হয়ে ঘুরতে ঘুরতে স্কোয়াদ্রনটা এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে ফাঁকায় ঝেঁরিয়ে এলো আধ মাইলটাক দূরে বনের শেষপ্রান্তে হাঙ্গেরীয় হুজাররা তখন এক বৃশ কামানের ঘাঁটির লোকজনদের কেটে সাফ করছে।

‘স্কোয়াদ্রন সার বঁধ’

পুরোপুরি সার বৈধে দাঁড়ানোর আগেই নির্দেশ এলো

‘স্কোয়াদ্রন, তলোয়ার খোল, আক্রমণ কর, এগিয়ে যাও।’

ইস্পাতের ফলার মুয়লধার নীল বর্ষণ স্কোয়াদ্রন দুলকি চাল বাড়িয়ে দিয়ে টপবগিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল

সবচেয়ে কাছের কামানের গাড়ির সামনে জনা ছয়েক হাঙ্গেরীয় হুজারকে ব্যস্ত দেখা গেল। কামানের ঘোড়াগুলো এগোতে চাইছে না সামনের দু’পা খাড়া



করে দাঁড়িয়ে পড়ছে। হাঙ্গেরীয় ঘোড়সওয়ারদের একজন সেই ঘোড়াগুলোকে মুখের লাগাম ধরে টানাটানি করছে, আরেকজন তলোয়ারের চেপটা দিক নিয়ে তাদের পেটাচ্ছে। বাদবাকিরা ঘোড়া থেকে নেমে পড়ে গাড়ির চাকর পাখিতে কাঁধ ঠেকিয়ে কামান নড়ানোর চেষ্টা করছে এক পাশে একটা খয়েরি রক্তের লেজহাটা ঘোড়ার পিঠে শোভাবর্ধন করছে এক অফিসার। সৈন্যদের নানা রকম নির্দেশ দিচ্ছিল সে কসাকদের দেখতে পেয়ে হাঙ্গেরীয়রা কামান ফেলে দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে পালাল।

‘এই ত চাই, এই ত চাই, এই ত চাই’ ছুটত ঘোড়ার লম্বা লম্বা পদক্ষেপ মনে মনে গুনতে গুনতে গ্রিগোরি বলল মুহূর্তের জন্য রেকাব থেকে তার পা ফসকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে জিনের ওপর নিজের অবস্থাটা বেসামাল উপলব্ধি করে ভেতরে ভেতরে শঙ্কিত হয়ে উঠে রেকাবে পা গলানোর চেষ্টা করল। ঝুঁকে পড়ে শেষকালে রেকাবটা ধরে ফেলে তার ভেতরে পায়ের পাতা গলিয়ে দিল। তারপর চোখ তুলে তাকাল। তাকাতেই সামনে দেখতে পেল ছয়জন সৈন্যের সেই কামানের গাড়ি গাড়ির সামনের ঘোড়াটার পিঠের ওপর দু’হাতে ঘোড়ার গলা জড়িয়ে ধরে পড়ে আছে গাড়ির চালক দেহটা দু’টুকরো, রক্তমাখা জামায় ঘিনু ছিটানো গ্রিগোরির ঘোড়া এক মৃত গোলন্দাজ সৈন্যের দেহ মচমচ শব্দে মাড়িয়ে গেল। গোলাবারুদের বাজটা উলটে পড়ে আছে, সৈটার পাশে আরও দু’জন, তৃতীয় আরেকজন মুখ খুবড়ে উপুড় হয়ে পড়ে আছে কামানের গাড়ির ওপর গ্রিগোরিকে পিছে ফেলে আগে আগে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল সিলান্টিয়েভ। লেজ-হাটা ঘোড়ার সওয়ার সেই হাঙ্গেরীয় অফিসারটি তাকে প্রায় সরাসরি নিশানায় গুলি করল জিনের ওপর সামান্য লাফিয়ে উঠল সিলান্টিয়েভ, তারপর দু’হাতে নীল শূন্যদেশ আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করতে করতে মাটিতে পড়ে গেল ডান দিক থেকে কোশ মারতে পারলে সুবিধা হয় বলে গ্রিগোরি লাগাম টেনে ঘোড়ার মুখ ঘুরাতে গেল অফিসার তার কৌশলটা ধরে ফেলল, হাতের নীচ দিয়ে গুলি ছুঁড়ল তার দিকে। রিসলডারের চেয়ার খালি হয়ে যাবার পর সে তলোয়ারখানা টেনে নিল। লোকটা যে একজন পাকা তলোয়ার খেলোয়াড় তাতে কোন সন্দেহ নেই - তিন তিনটে প্রচণ্ড কোশ সে অবলীলাক্রমে ঠেকিয়ে দিল চারবারের বার গ্রিগোরি মুখ বিকৃত করে রেকাবের ওপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে (ওদের দু’জনের ঘোড়া প্রায় গায়ে গায়ে ছুটছিল, হাঙ্গেরীয়টির ফেস্কাসে ছাইরঙা নিখুঁত কামানো গালের একপাশ আর তার উর্দির কলারের ওপর সেলাই-করা নম্বর গ্রিগোরি দেখতে পাচ্ছিল) তাকে আক্রমণ করল, মধ্যে ঢাল মেরে তলোয়ার ঘুরিয়ে হাঙ্গেরীয়টির সতর্কতাকে কাঁকি দিল শেষ মুহূর্তে কোশটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে

নিয়ে তলোয়ারের ডগা গায়ে বিধিয়ে দিল। দ্বিতীয় কোপটা মারল কাঁধের বেখানে শিরদাঁড়া শেষ হয়েছে তার ওপর। হাঙ্গেরীয়টির তলোয়ারসূত্র হাতটা এলিয়ে পড়ল। তার হাত থেকে লাগাম খসে পড়ল। মুহূর্তের জন্য সোজা হয়ে গেল সে, বুকাটা ধনুকের মতো বেকে গেল। মনে হল কিছুতে যেন কামড়েছে তাকে শেষকালে ঘুরে পড়ে গেল জিনের কাঠামোর ওপর একটা বিকট রকমের স্বস্তি অনুভব করে গিগোরি তার মাথায় কোপ বসিয়ে দিল। দেখল তলোয়ারটা কানের খানিকটা ওপরে হাড় কেটে বসে গেল।

পব মুহূর্তেই পেছন থেকে একটা ভয়ঙ্কর আঘাত মাথায় এসে পড়তে গিগোরির সংজ্ঞা লোপ পেল। মুখের ভেতরে গরম রক্তের নোনা স্বাদ টের পেল সে, বুঝতে পারল যে পড়ে যাচ্ছে - কাটা কসলেব গোড়ায় ঢাকা এবড়োখেবড়ো মাঠ কেমন করে যেন ঘূরপাক খেতে খেতে একপাশ থেকে ধেয়ে আসছে তার দিকে।

মাটিতে আছড়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড ধাক্কা মুহূর্তের জন্য সে বাস্তবজগতে ফিরে এলো। চোখ খুলল সে, সঙ্গে সঙ্গে রক্তে ভেসে গেল দু'চোখ। কানের কাছে ঘোড়ার খুরেব আওয়াজ, ভাবী নিঃশ্বাস ফেলছে একটা ঘোড়া হাপ, হাপ, হাপ।' শেষ বারের মতো চোখ খুলল গিগোরি, দেখতে পেল ঘোড়ার গোলাপী রঙের বিস্ফারিত নাসারন্ধ্র আর রেকাবে আটকানো কার যেন বুটসূত্র পা 'সব শেষ।' সাপের মতো ঐক্যবৈক্য মনের মধ্যে ঘূরপাক খেল চিন্তাটা। সঙ্গে সঙ্গে স্বস্তি বোধ করল সে। তারপর একটা গর্জন আর কালিঢালা শূন্যতা।

## চৌদ্দ

আগস্টের গোড়ার দিকে লেফটেন্যান্ট ইয়েভগেনি লিস্তনিৎস্কি আতামান রেজিমেন্টের দেহরক্ষিদল থেকে কোন একটা কসাক আমি-রেজিমেন্টে বদলি হওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। এই মর্মে সে একটা দরখাস্ত পেশ করল। অনেক চেষ্টাচরিত্র করে তিন সপ্তাহ বাদে সক্রিয় সেনাবাহিনীর একটা রেজিমেন্টে সে উপযুক্ত পদ পেয়ে গেল। নিয়োগের সমস্ত ব্যবস্থা পাকাপাকি হয়ে যাওয়ার পর পেত্রোগ্রাদ ছাড়ার আগে একটা সংক্ষিপ্ত পত্র লিখে সে তার এই সিদ্ধান্তের সংবাদ বাবাকে জানাল।

শ্রীচবণকমলেষু

বাবা আমি চেষ্টাচরিত্র করে আতামান রেজিমেন্ট থেকে নিয়মিত সেনাবাহিনীতে বদলি নিয়েছি। আজ আমি দু'নম্বর আমি কোর-এর

কম্যাণ্ডারের অধীনে কাজ পেয়ে সেখানে চলে যাই। আমি বেসিকাল্ড নিয়েছি তাতে আপনি খুব সম্ভবত আশ্চর্য হইছেন, তাই এর শেহনে আমার ব্যাখ্যাটা আপনাকে দিই। যে-অবস্থার মধ্যে আমাকে এককাল কাটাতে হয়েছে তা আমার কাছে অসহ্য ঠেকছিল। কুচকাওয়াজ, দেখাসাক্ষাৎ, পাহারাবদল রাজসভার চাকরীর এই পুরো ব্যাপারটাই আমার কাছে একঘেয়ে, ক্রান্তিকর আমার মন হাঁপিয়ে উঠছিল আমি চাই প্রাণবন্ত কোন কাজ। হ্যাঁ বলতে পারেন আমি চাই কাজের মতো কাজ - বীরত্বের কাজ। আমার মনে হয় সিন্ডিন্থিস্ট বংশের যে গৌরবময় রক্ত আমার ধমনীতে প্রবাহিত হচ্ছে তাই আমার ওপর প্রভাব ফেলছে এই রক্ত তাঁদের রক্ত যারা ১৮১২ সালের পিতৃভূমির যুদ্ধকাল থেকে শুরু করে রশিয়ার সম্রাট বাহিনীর মাধ্যম যশের মুকুট পরিয়ে এসেছেন। আমি ফ্রন্টে চললাম। আপনার আশীর্বাদ কামনা করি। গত সপ্তাহে সম্রাট হেড কোয়ার্টার্সে যাবার আগে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, এই মানুষটিকে আমি ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করি আমি রাজপুরীর অন্দরমহলের প্রহরায় ছিলাম উনি রোডজিয়ানকোব\* সঙ্গে যাচ্ছিলেন, আমার পাশ দিয়ে যেতে যেতে মৃদু হেসে চোখের ইশারায় আমাকে দেখিয়ে ইংরেজিতে বললেন, এই হল আমার বিখ্যাত গার্ড বাহিনী। এদের দিয়ে আমি যথাসময়ে ভিলহেল্মের\*\* তাসের ওপর টেকা মারব ' আমি একজন কলেজে-পড়া মেয়ের মতো তাঁকে ভক্তি করি। আমার বয়স যদিও আঠাশ পার হয়ে গেছে তবু আপনার কাছে একথা স্বীকার করতে আমি কুণ্ঠিত নই। মহারাজের পুত্র নামকে ঘিরে রাজপুরী থেকে মাকড়সার জালের মতো যে গুচ্ছের আব গালগল্প ছড়ায় তাতে আমি গভীর বেদনা বোধ করি আমি ওসব বিশ্বাস করি না, বিশ্বাস করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এই কিছুদিন আগে মেজর গ্রমোভ আমার সামনে মহামান্য সম্রাট্রী সম্পর্কে অশালীন মন্তব্য করে বসলে তার এই

\* মিখাইল ডলাদিমিরোভিচ রোডজিয়ানকো (১৮৫৯-১৯২৪) বৃহৎ জমিদার ১৯০৫ সালে বৃহৎ জমিদার ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি এবং বুর্জোয়াসের নিয়ে যে প্রতিদ্বন্দ্বী পার্টি গঠিত হয় ইনি ছিলেন তার অন্যতম নেতা ১৯১৭ সালের বিপ্লবের পর দেশান্তরী হন - অনুঃ

\*\* জার্মানির সম্রাট ও রুশিয়ার রাজা দ্বিতীয় ভিলহেল্ম ১৯১৮ সালে সিংহাসনচ্যুত হন - অনুঃ

স্বর্ধা দেখে আরেকটু হলেই আমি তাকে গুলি করতে গিয়েছিলাম। ব্যাপারটা ন্যাকারজনক, আমি তাকে বললাম যে-লোকের খম্বীতে গোলামের রক্ত বইছে একমাত্র তারই পক্ষে এতদূর নীচে নামা এবং এমন নোংরা কুৎসা রটনা করা সম্ভব এই ঘটনাটা কয়েকজন অফিসারের উপস্থিতিতে ঘটেছিল একটা প্রচণ্ড ক্ষিপ্ততা হঠাৎ আমাকে পেয়ে বসল আমি বিভলভার বার করলাম, ইচ্ছে ছিল ওই ইতরটার পেছনে একটা গুলি বরচ করি কিন্তু অন্য অফিসাররা আমাকে নিরস্ত করল। এই নোংরা নর্দমাটার ভেতবে বাস করা দিনের পর দিন আমার পক্ষে আরও কঠিন হয়ে উঠল রকীদের রেজিমেন্টগুলোতে, বিশেষত অফিসারদের মহলে, খাঁটি দেশপ্রেম বলে কিছু নেই এমন কি কথাটা ভয়ঙ্কর শোনাতে কী হবে রাজবংশের ওপর টান পর্যন্ত নেই ওরা অভিজাতসম্প্রদায়ের লোক নয়-রাজ্যের যত গাঁজলা মোটের ওপর বলতে গেলে, এটাই হল রেজিমেন্টের সঙ্গে আমার সম্পর্কচ্ছেদের কারণ, যে সমস্ত লোকের ওপর আমার কোন ভক্তিশ্রদ্ধা নেই তাদের সঙ্গে মেলামেশা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আপাতত এখানেই শেষ করছি কোন কোন জায়গার অসংলগ্ন ঠেকলে ক্ষমা করবেন বড় তাড়া স্যুটকেস গোছগাছ করতে হবে, কম্যাণ্ডেন্টের কাছে ধেতে হবে আপনার কুশল কামনা করি বাবা আমি থেকে বিশদ পত্র লিখব

ইতি

আপনার ইয়েভ্‌গেনি

ওয়ারশ যাবার ট্রেন ছাড়ল সন্ধ্যা আটটায়। লিন্ডনিৎস্কি একটা ভাড়া গাড়ি হাঁকিয়ে স্টেশনে এসেছিল। পেছনে ময়ূরকণী রঙের নীল-নীল মিটমিটে আলোর মালার মধ্যে পড়ে আছে পেত্রোগ্রাদ। রেলস্টেশনে গাদাগাদি ভিড়, হৈহট্টগোল যাত্রীদের বেশির ভাগই পল্টনের লোক কুলি লিন্ডনিৎস্কির স্যুটকেস বয়ে এনে কামরার তাকে রাখল, খুচরো কিছু পয়সা পারিশ্রমিক পাওয়ার পর বাবুটির শ্রুতযাত্রা কামনা করে বিদায় নিল লিন্ডনিৎস্কি তলোয়ারের বেলট আর গায়ের জেটকেট খুলে রাখল, শয্যাসামগ্রীর বেলটের বাঁধন খুলে রঙবেরঙের ফুল আঁকা রেশমী কাপড়ের ককেসীয় লেপটা বার্থের ওপর বিছাল তার নীচের বার্থে জানলার ধারে ছোট টেবিলটাতে বাড়ির তৈরি নানা খাবার সাজিয়ে থেতে বসেছে একজন পুরুষঠাকুর, মুখখানা তার যোগীপুরুষের মতো লীর্ণ তার উলটো দিকে

বসেছে হাই স্কুলের ইউনিফর্ম পরা তামাটে রঙের অস্টিচর্মসার একটি মেয়ে পুরুতঠাকুর তার আঁশের মতো মাড়ি থেকে বুটির গুড়ো ঝাড়তে ঝাড়তে মেয়েটিকে কিছু খাবার নিয়ে সাধাসাধি করছে।

‘একটু চেঁষেই দেখুন না, অ্যাঁ?’

‘না, ধন্যবাদ।’

‘হয়েছে হয়েছে, আর লজ্জা করতে হবে না আপনার যা শরীরের অবস্থা তাতে আরও বেশি করে খাওয়া উচিত।’

‘ধন্যবাদ।’

‘আজ্ঞা এই ছানাবড়াটা একটু খেয়েই দেখুন না আপনি একটু খেয়ে দেখবেন কি মিলিটারী অফিসার সাহেব?’

লিভনিংস্টনি বাক থেকে মাথা ঝুলিয়ে জিজ্ঞেস কবল

‘আমাকে বলছেন কি?’

‘হ্যাঁ হ্যাঁ।’ পুরুতঠাকুরের বিষয় চোখের দৃষ্টি তুরপুনের মতো লিভনিংস্টনিকে বিদ্ধ কবল, চাপড়া চাপড়া ঘাসের মধ্যে আঁশের মতো ঝুলে থাকা ঘন গৌফের অঙ্ককার ঝোপের তলায় ফুটে উঠল কেবল তার পাতলা দুই চৌঁটের মৃদু হাসি

ধন্যবাদ। ইচ্ছে করছে না।

ঠিক করলেন না কিছু কাজটা। প্রভু যে অন্ন মুখে তুলে দিচ্ছেন তাতে কেউ অশুদ্ধ হয়ে যায় না। আপনি কি আর্মিতে যাচ্ছেন?’

‘হ্যাঁ।’

‘ভগবান আপনার সহায় হোন।’

তদ্রার বিদ্রী ভেস করে বহু দূর থেকে লিভনিংস্টনির কানে ভেসে আসতে লাগল পুরুতঠাকুরের মোটা গলা। শুনতে শুনতে তার মনে হল মোটা গলায় অভিযোগের সুরে কথাগুলো বলছে পুরুতঠাকুর ত নয়, স্নেহের প্রয়োজ।

‘পরিবার আছে, বুঝলেন কিনা, সামান্য আয়ে টেনেটেনে চলে তাই ত চলেছি রেজিমেন্টের পুরুত হয়ে ভগবানে বিশ্বাস ছাড়া কুশ জাতের চলে না আর এই বিশ্বাস, বুঝলেন কিনা, বছরের পর বছর বেড়েই চলেছে অবিশ্বাস এমন কিছু কিছু লোকও আছে যারা ধর্মবিশ্বাস থেকে সরে দাঁড়াচ্ছে, কিছু তারা হল বুদ্ধিজীবী জৈবীর লোক, কিছু সাধারণ মানুষ ঠিক ধরে আছে ভগবানকে হ্যাঁ ঠিকই তাই। হেঁড়ে গলায় একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল, তারপর আবার কিছু কথার বন্যাক্রান্ত, কিছু সেগুলো আর লিভনিংস্টনির চৈতন্যে পৌঁছতে পারল না।

লিভনিংস্টনির ঘুম এসে গিয়েছিল। অর্ধেক ঘুম অর্ধজাগ্রত অবস্থায় শেষ ঘোঁসে উপলব্ধি করতে পারল তা হল কামবার সিলিং-এর সবু সবু তক্তাগুলোর

ওপর সদা লাগানো রং-এর গজ্ঞ আর জানলার বাইরে কার যেন চড়া গলা

‘লাগেজ অফিস নিয়েছে। আমার কিছু করার নেই।’

‘লাগেজ অফিস কী নিয়েছে? মুহূর্তের জন্য শ্রমটা তার চেতনাকে আলোকিত করল, কিন্তু পরক্ষণেই তার নিজের অজান্তে চিন্তার খেই হারিয়ে ফেলল সে। দু’রাত্রির অনিদ্রার পর গভীর নিদ্রায় তার দু’চোখ জড়িয়ে এলো। লিভুনিথ্‌সের যখন ঘুম ভাঙল ট্রেন ততক্ষণে পেত্রোগ্রাদ ছেড়ে ক্রোশ বারো-চৌদ্দ চলে এসেছে। জালে জালে চাকর আওয়াজ উঠছে, ইঞ্জিনের ঘন ঘন ধাক্কা লেগে কামরাটা দুলছে, পাশের কম্পার্টমেন্টে কারা যেন চাপা গলায় গান ধরেছে, কামরার ল্যাম্পটা উত্তরছা বেগনী রঙের ছায়া ফেলছে

লেক্টেন্যান্ট লিভুনিথ্‌সি যে বেরজিমেন্টে কাজ নিয়ে এসেছে, শেষ কয়েক মিনিট লড়াইয়ে সেটা বড় রকমের ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, তাই যুদ্ধের জায়গা থেকে সরিয়ে এনে ঘোড়া আর লোকবল দিয়ে সেটাকে চটপট নতুন করে গড়ে তোলা হচ্ছিল

বেরজিমেন্টের সদর দপ্তর করা হয়েছিল বেরেজনিয়াগি নামে এক বড় গাঞ্জে কোন এক ছোট অনামা স্টেশনে গাড়ি আসতে লিভুনিথ্‌সি কামরা থেকে নেমে পড়ল একটা ফৌজী হাসপাতালও সেখানে ট্রেন থেকে নেমেছিল। হাসপাতালের গম্ভাব্যত্ব সম্পর্কে ভারপ্রাপ্ত ডাক্তারকে জিজ্ঞেসবাদ করে লিভুনিথ্‌সি জানতে পারল হাসপাতাল দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্ট থেকে স্থানান্তরিত করে যুদ্ধের এই এলাকাতেই পাঠানো হচ্ছে এবং এক্ষুনি বেরেজনিয়াগি ইভানভ্‌কা ক্রিশোভিনস্কোয়ে বৃট ধরে যাত্রা করবে লক্ষ্য-চওড়া চেহাবার লাল মুখ ডাক্তার তার সবাসরি ওপরওয়ালাদের সম্পর্কে যে সব মন্তব্য করল সেগুলো খুব একটা শিষ্টাচারসম্মত নয়, ডিভিশনের স্টাফ-অফিসারদের সে আদ্যপ্রাজ্ঞ করল, দৈবাৎ একজন কথা বলার লোক পেয়ে দাড়ি ওপড়াতে ওপড়াতে সোনালি পীশানের তলা থেকে ক্রুদ্ধ চোখের স্বলন্ত দৃষ্টি হেনে সমস্ত তিক্ততা আর মনের কোষ তার ওপর ঢেলে দিতে লাগল লিভুনিথ্‌সি কথার মাঝখানে তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল

‘আপনি আমাকে বেরেজনিয়াগি পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারেন?’

‘একগাড়িতে উঠে বসুন লেক্টেন্যান্ট আমাদের সঙ্গে যাবেন’ ডাক্তার রাজী হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে লেক্টেন্যান্টের গ্রেটকোটের একটা বোতাম মোচড়াতে মোচড়াতে তার সহানুভূতি লাভের আশায় সংযত ভাবে মোটা গলায় বলতে লাগল, একবার ভেবে দেখুন লেক্টেন্যান্ট, গোবুভেডার ওয়াগনে করে ষাট-সত্তর কোশ টেঙিয়ে কিনা শুরে বসে সময় নষ্ট করার জন্যে এখানে এলাম, অথচ যেখানে থেকে আমার হাসপাতাল ভুলে নিয়ে আসা হল সেই সৈক্টের দু’দিন ধরে দারুণ রক্তারক্তি যুদ্ধ চলছিল পড়ে ছিল কাতারে কাতারে আহত লোকজন,

আমাদের সাহায্য যাদের খুবই দরকার।' হিংস্র উল্লাসভরে আবেশজড়িত স্বরে 'র' এর ওপর বিশেষ জোর দিয়ে সে আবার বলল 'হ্যাঁ, দারুণ রক্তারক্তি যুদ্ধ।'

'এরকম তালগোলের কারণ কী হতে পারে বলে আপনার মনে হয়?' ভদ্রতার খাতিরে আগ্রহ প্রকাশ করল লিভনিৎস্কি।

'কারণ?' ডাক্তার বিদ্রূপের ভঙ্গিতে ডুবু নাচিয়ে পাঁশনের ওপরে তুলে গাঁক গাঁক করে বলল, 'কারণ আবার কী? যাদের ওপর ভার দেওয়া আছে সেই ওপরওয়ালাদের শ্রেয় গাফিলতি, তাদের জড়বুদ্ধি, আকাট মুখামি পাজী বদমাশগুলো ওখানে বসে বসে বসত তালগোল পাকায়। অব্যবস্থার চূড়ান্ত, এমন কি সাধারণ স্বানবুদ্ধি বলতে কারও মাথায় কিছু নেই। ভেরেসায়েভের\* 'ডাক্তারের রোজনামচা' মানে আছে ত? সেই একই ব্যাপার বরং তার চতুর্গুণ।'

লিভনিৎস্কি তাকে স্যাঁলুট তুকে গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল পেছন পেছন শুনতে পেল ক্রুদ্ধ ডাক্তারের কর্কশ গলা

'লড়াইয়ে হারতে বসেছি আমরা, লেফ্টেন্যান্ট! জাপানীদের কাছে হারার পরও এতটুকু বুদ্ধিসুদ্ধি হল না আমাদের সহজেই কেলা ফতে হয়ে যাবে বলে ধারণা, সুতরাং আর কী আশা করা যেতে পারে।' বলতে বলতে ভীষণ ভাবে মাথা ঝাঁকতে ঝাঁকতে ভাসা-ভাসা তেলের ওপর রামধনু রঙ-ফেলানো ছোট ছোট ডোবাগুলো ডিঙিয়ে রেললাইন ধরে এগিয়ে গেল।

হাসপাতাল যখন বেরেজনিয়াগিতে এসে পৌঁছল তখন অন্ধকার হয়ে আসছে ফসলের কাটা হলুদ গোড়াব ওপর দিয়ে বাতাস সরসর করে য়রে চলছে পশ্চিমে জড়াজড়ি করে এগিয়ে আসছে ঘন কালো মেঘের স্তূপ ওপরের দিকটা বেগনি-কালো, খানিকটা নীচে মেঘের সেই বীভৎস রঙের আভাটা ফিকে হতে হতে পালাটে গিয়ে আকাশের বিবর্ণ গায়ের ওপর ঢেলে দিতে লাগল ধোঁয়াটে নীল-লাল রঙের স্নিগ্ধ ছটা মাঝখানে বরফগলা নদীর মধ্যে আটকে পড়া জমাট করফের চাঙডের মতো আটকে রইল এই আকারহীন মেঘের স্তূপটা। তারপর একটু একটু করে ফাটতে লাগল ফাটলের ভেতর দিয়ে অবিরাম টুইয়ে টুইয়ে পড়তে লাগল অস্তগামী সূর্যের কমলারঙের কিরণধারা। আলোর ধারা পাখার মতো ঝলকে ঝলকে ছড়িয়ে পড়ল ডোঙে গুঁড়িয়ে গুঁড়িয়ে ছলতে লাগল, বাড়ী নেমে এসে বিধল, আর ফাটলের ঠিক নীচে বুনে দিল এক অবর্ণনীয় মায়াময় বর্ণজ্বটা

---

\* ভিক্টর ভিক্তরভিচ ভেরেসায়েভ (১৮৬৭-১৯৪৫) রুশ ও সোভিয়েত লেখক ও সমালোচক 'ডাক্তারের রোজনামচা' প্রকাশিত হয় ১৯০১ সালে অনু:

রাস্তার ধারে নালার মধ্যে পড়ে আছে বাদামী রঙের একটা মরা ঘোড়া গুলি বেয়ে মরেছে ঘোড়াটার পেছনের একটা পা বিলী ভাবে ওপর দিকে উঠে আছে, পারের খুরের নালটা অর্ধেক কওয়া, চকচক করছে একাধাঙ্কিতে ঝাঁকুনি খেতে খেতে লিঙ্গনিংকি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল মরা ঘোড়াটাকে। ঘোড়াটার পেট ফুলে ঢোল হয়ে উঠেছে। হাসপাতালের যে আদালিটি লিঙ্গনিংকির সঙ্গে যাক্ছিল ঘোড়ার ফোলা পেটের ওপর থুতু ফেলতে ফেলতে সে বুঝিয়ে বলল, 'গেওপিণ্ডে গিলেছে বেশি দানা খেয়ে ফেলেছে আর কি,' লেফটেন্যান্টের দিকে তাকিয়ে পরে সে সংশোধন করে বলল 'আরও একবার থুতু ফেলার ইচ্ছে তার ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভয়ভার খাতিরে থুতু গিলে ফেলল। ফৌজী শাটের হাতায় ঠোঁট মুছে নিয়ে যোগ করল, 'অক্স পেয়েছে সরানোর জন্যে কারও মাথা ব্যথা নেই। জার্মানরা কিন্তু এ ব্যাপারে একেবারে অন্য রকম আমাদের উল্টো '

'তুমি কী করে জানলে?' অকারণে রেগে উঠে লিঙ্গনিংকি জিজ্ঞাস করল সেই মুহূর্তে আদালির হামবড়া ও অবজ্ঞার ভাব মেশানো উদাসীন মুখখানাও তার মনের মধ্যে এক অকারণ তীব্র ঘৃণা জাগিয়ে তুলল ফসলকাটা শরতের মাঠের মতো ধূসর, নিরানন্দ তার মুখটা, পেট্রোগ্রাফ থেকে ফ্রাণ্টে আসার পথে যে হাজার হাজার চাবী সেপাইকে লেফটেন্যান্ট লিঙ্গনিংকি দেখেছে তাদের মুখের চেয়ে এতটুকু তফাত নেই এ মুখের দেখে মনে হয় এরা সকলেই কেমন যেন ঝঙ-ওঠা, বিবর্ণ, ধূসর, নীল, সবুজ বা যে কোন রঙেরই হোক না কেন তাদের চোখ, সেখানে যেন জমট বেঁধে আছে ভোঁতা দুটি দেখলে মনে হয় বহুকাল আগের তৈরি তামার পয়সা, বহু লোকের হাতে হাতে ফিরে ক্ষয়ে গেছে

'যুদ্ধের আগে তিন বছর আমি জার্মানিতে ছিলাম,' আদালি ধীরেসুস্থে জবাব দিল লোকটার দুটিতে লেফটেন্যান্ট যে হামবড়া ও অবজ্ঞার ভাব লক্ষ করেছিল তার কঠোরও সেটা ফুটে উঠল 'আমি কেমিসবার্গে একটা চুরুটের কারখানায় কাজ করতাম, হাতে জড়িয়ে রাখা চামড়ার লাগামের পিট পাকানো প্রাঙটা নিয়ে গাড়ির ছোট ঘোড়াটার শিটে চাবুক ঝেরে গোমড়া মুখে আদালি বলল।

'চোপ্ রও ' কঠোর স্বরে তাকে ধমক দিল লিঙ্গনিংকি। তারপর পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখল মরা ঘোড়ার মাথাটা। সামনের চুলের গোছা চোখের ওপর এসে পড়েছে, দাঁতের পাটি ঝুলে বেরিয়ে পড়েছে, রোদে হাওয়ায় বিবর্ণ হয়ে গেছে উর্ধ্বমুখী পায়ের হাঁটুর ভাঁজটা বেকে আছে নালের কাঁটার জন্যে খুরটা সামান্য ফেটে গেছে, তবে ভেতরের গর্তটা বেশ মজবুত, একটা নীলাভ চকচকে তাজা ভাব সেখান থেকে ফুটে উঠছে খুরের ঠিক ওপরের অংশের নিখুঁত ছাঁদ



আর পা দেখে লিঙ্গনিবন্ধির বুঝতে বাকি রইল না যে ঘোড়াটা ভালো জাতের ওটার বয়সও কম

গ্রামের উঁচু নীচু পথে খানাখন্দের ওপর দিয়ে লাফাতে লাফাতে একাগাড়ি এগিয়ে গেল আকাশের পশ্চিম কোণে স্নান হতে হতে মিলিয়ে গেল রঙের খেলা বাতাস শুষে নিল কালো মেঘ। পেছনে উপাসনালয়ের মাথাভাঙা ক্রসের মতো কালো হয়ে জেগে রইল মরা ঘোড়ার পাটা। লিঙ্গনিবন্ধি তখনও তাকিয়ে আছে সেই দিকে এমন সময় হঠাৎ ঘোড়াটার ওপর চারদিক থেকে ঝরে পড়ল একরশ্মি সূর্যকিরণ - লালচে বাদামী রঙের মসৃণ লোমসূত্র পাটা সঙ্গে সঙ্গে যেন এক আশ্চর্য পাতাবিহীন ডালের মতো কোন এক মায়ামন্ত্রবলে কমলারঙের ফুলে ফুলে মঞ্জুরিত হয়ে উঠল

বেরেজনিয়াগিতে ঢোকের মুখেই আহত সৈন্য বোঝাই একসার গাড়ির সাক্ষাৎ মিলল।

প্রথম গাড়ির দায়িত্বে ছিল দাড়িগোফহীন একজন শ্রীড় বেলোবুশ দড়ির লাগাম হাতে জড়িয়ে নিয়ে ঘোড়ার পাশে পাশে হেঁটে চলেছে। গাড়ির ভেতরে কনুইয়ে ভর দিয়ে শুয়ে আছে এক কসাক মাথায় টুপি নেই, ব্যাণ্ডেজ করা। ক্রান্তিতে তার চোখদুটো বোজা শুয়ে শুয়ে সে দানা চিবোচ্ছে আব মুখ থেকে ধু ধু করে কালো কালো ছিঁড়ে ফেলছে। তার পাশে উপুড় হয়ে পড়ে আছে এক সেপাই লোকটার পাহার ওপর প্যার্টটা বিক্সী ভাবে ছিঁড়ে ফালা ফালা হয়ে গেছে, কঁকড়ে, জমাট রক্ত বেঁধে শক্ত হয়ে আছে মাথা না তুলেই সে যাচ্ছেতাই গালিগালাজ বর্ষণ করে যাচ্ছে লোকটার গলার স্বরে যে ভাব ফুটে উঠছিল তা শুনতে শুনতে লিঙ্গনিবন্ধি আতঙ্কিত হয়ে উঠল কোন গভীর ভগবদ্বিশ্বাসী যখন প্রার্থনা উচ্চারণ করে একমাত্র তখনই এরকম আকৃতি ফুটে ওঠা সম্ভব। পরেব গাড়িটাতে জনাছরের সেপাই গাদাগাদি মেরে পড়ে আছে তাদের মধ্যে একজনকে বিকারগ্রস্তের মতো অস্বাভাবিক খুশি খুশি দেখাচ্ছে ফোলা ফোলা চোখদুটো কঁচকে উত্তেজিত হয়ে সে বলে চলেছে, 'শোনা যাচ্ছে ওদের সম্মাটের কাছ থেকে নাকি একজন দূত এসেছিল, সজ্জির পস্তাবে নাকি দিয়েছিল সবচেয়ে বড় কথা লোকটাকে বিশ্বাস করা যায় আশা করি মিছে বলছে না।'

বলা যায় না' মাথা ঝাঁকিয়ে আরেকজন সন্দেহ প্রকাশ করল বহুকাল আগেকার খোস পাঁচড়ার দাগে ছেয়ে আছে তার কামানো গোল মাথাটা

'কেন নয় ফিলিপ? কে বলতে পারে, হয়ত সবিতাই এসেছিল' ওদের দিকে পেছন ফিরে তৃতীয় আরেকজন বসে ছিল - সে এবারে মুখ খুলল তার কথায় ভোলগা অঞ্চলের নরম টান

পঞ্চম গাড়িটাতে শোভাবর্ধন করছে কয়েকটা কসাক টুপির লাল ব্যাণ্ড।  
চতুর্থ গাড়ির ভেতরে আবাম কবে হাত-পা ছড়িয়ে বসে আছে তিনজন কসাক,  
জান্না নিশেবে তাকিয়ে দেখল লিভনিৎস্কিকে, কিন্তু সারিবদ্ধ সৈন্যদের মধ্যে  
সচরাচর যে সন্ত্রাসের ভাব ফুটে ওঠে ওদের ধুলোমাখা বুদ্ধ মুখে তার চিরুমাত্র  
দেখা গেল না।

‘কী খবর হে কসাকরা’ লেফটেন্যান্ট তাদের অভিযান জানাল।

গাড়োয়ানের সবচেয়ে কাছাকাছি সুন্দর চেহারার যে কসাকটি বসে ছিল, যার  
গোঁফজোড়া বুপোলি রঙের আর ইয়া ধাবডা তুর, সে-ই উত্তরে বলল, ‘হুজুরের  
কামনা করি!’

কিন্তু তার কণ্ঠস্বর কেমন যেন নিস্তেজ শোনাল।

‘কোন্ রেজিমেন্ট?’ কসাকের উদ্দির নীল কাঁধপটির ওপরকার নম্বরটা পড়ার  
চেষ্টা করতে করতে লিভনিৎস্কি জিজ্ঞেস করল।

‘বারো নম্বর

‘তোমাদের রেজিমেন্ট এখন কোথায়?’

‘তা জানি নে’

‘মার খেলে তাহলে কোন জায়গায় তোমরা?’

‘এই কাছাকাছিই একটা গাঁয়ে

কসাকরা নিজেদের মধ্যে কী যেন ফিসফাস করল। শেষকালে ওদের মধ্য  
থেকে একজন অস্কৃত হাত দিয়ে মোটা কাপড়ের ফালিতে ব্যাণ্ডেজ-করা আহত  
হাতটা আলতো করে তুলে ধরে গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল।

‘হুজুর একটু অপেক্ষা করুন!’ গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে ফাণ্ডা হাতে ধুঁজ জমাব  
লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে। হাতটা সমস্ত চেপে ধরে রাস্তার ওপর দিয়ে দমদম করে  
খালি পায়ে হাঁটতে হাঁটতে লিভনিৎস্কির দিকে তাকিয়ে সে হাসল।

‘আপনি কি ভিওশেন্‌স্কায়া জেলার লোক? আপনি লিভনিৎস্কি না?’

‘হ্যাঁ।’

‘ওঃ, তাহলে তু ঠিকই ধরেছি আমরা। আপনার কাছে সিগারেট হবে হুজুর?  
ট্রীটের লোহাই, আমাদের একটু তোমাক দিন সিগারেট না পেয়ে আমরা মরতে বসেছি’

একাগাড়ির রঙ-করা ধারটা ধরে সে পাশে পাশে হাঁটতে লাগল। লিভনিৎস্কি  
সিগারেট-কেস বার করল।

‘আপনি যদি আমাদের গোটা দশেক দিতে পারতেন তা হলে ভালো হত  
আমরা তিনজন’ ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে মৃদু হাসল কসাকটি।

লিভনিৎস্কি লোকটার বিশাল বাদামী রঙের হাতের পুটে তার মজুদ সিগারেটের

সবটা উজাড় করে ঝেড়ে দিল তারপর জিজ্ঞেস করল, 'রেজিমেন্টে আহত কি অনেক?'

'ভালো দুয়েক।'

'কতের পরিমাণ কেমন?'

'অনেক লোক মরেছে। দয়া করে আগুনটা ধরিয়ে দিন হুজুর ধন্যবাদ।' সিগারেটটা ভালো করে ধরাতে গিয়ে কমান্ড খানিকটা পেছনে পড়ে গিয়েছিল। এবারে সে চিৎকার করে দূর থেকে বলল, 'আপনার জমিদারীর কাছে যে তাতারস্থি গ্রাম আছে সেখানে আজ তিনটে লোক মারা পড়েছে কসাকদের বশ্ত করিয়েছে।'

লোকটা হাত নাড়া দিল তারপর নিজেদেব গাড়ির নাখাল ধরতে এগিয়ে গেল তার গায়ের বেল্ট-না-বাঁধা থাকি ফৌজী শার্ট হাওয়ায় এলোমেলো হয়ে উড়তে লাগল

লেক্টেন্যান্ট লিভনিৎস্কি যে রেজিমেন্টে নিযুক্ত হয়ে এসেছে তার কমান্ডিং অফিসার বেরেকনিয়াগিতে এক পাখির বাড়িতে আস্তানা নিয়েছিল। বারোয়ারীতলায় এসে, এত খাতিরবস্ত্র করে একাশাডিতে জায়গা দেওয়ার জন্য ডাক্তারকে ধন্যবাদ জানিয়ে তার কাছ থেকে বিদায় নিল লিভনিৎস্কি, তারপর চলতে চলতেই উর্দির ধুলো ঝাড়তে লাগল পথ-চলতি যে-সমস্ত লোকজন সামনে পেল রেজিমেন্টের সদর দপ্তরের অবস্থান সম্পর্কে তাদের জিজ্ঞেসবাদ করল লালচে বাদামী দাড়িওয়ালা এক সার্জেন্ট-মেজরকে সে সামনাসামনি পেয়ে গেল লোকটা একজন সৈপাইকে মার্ট করিয়ে গার্ড হাউসে নিয়ে যাচ্ছিল লেক্টেন্যান্টকে দেখে সে তার স্বাভাবিক কদম বজায় রেখেই টুপিতে হাত ঠেকিয়ে সেলাম ঠুকল, প্রশ্নের উত্তর দিল, বাড়িটাও হাত দিয়ে দেখিয়ে দিল সদর দপ্তরের বাড়িটা একেবারে নিরিবিলি - সামনের লাইন থেকে অনেক পেছনে থাকা যে-কোন সদর দপ্তরের বেলায় যেমন দেখা যায় একটা বড় টেবিলের ওপর কেরানিরা ঝুঁকে পড়ে আছে, বসে বসে চুলছে, ফিল্ড টেলিফোনের রিসিভার ধরে একজন প্রৌঢ় মেজর ওপাশের অবশ্য কোন একজনের সঙ্গে হাসিঠাট্টা করছে। প্রশস্ত কুঁড়েঘরটার জানলায় চারপাশে মাছি ভন ভন করছে, মশার গুনগুন আওয়াজের মতো দূরের কোথা থেকে যেন ভেসে আসছে টেলিফোনের আওয়াজ। একজন আদালি লিভনিৎস্কিকে রেজিমেন্ট কমান্ডারের কামরায় পৌঁছে দিল সামনের ঘরে অপ্রসন্ন মনে তাকে অভ্যর্থনা জানাল এক লম্বামতন কর্নেল লোকটার খুতনির ওপর একটা তিনকোনা কাটা দাগ। কিসের জন্য যেন তার মনমেজাজ খারাপ বলে মনে হচ্ছিল

'আমিই রেজিমেন্টের কমান্ডার,' লিভনিৎস্কির প্রশ্নের উত্তরে সে জানাল লিভনিৎস্কি যখন যথাবিহিত সম্মানের সঙ্গে নিবেদন করল যে সে তার অধীনে

কাজ করতে এসেছে, তখন কামাণ্ডার মুখে কোন কথা না বলে হাতের ইশারায় ডাকে খাস কামরায় ঢোকার আমন্ত্রণ জানাল। ঘরে ঢোকার পর দরজা বন্ধ করে অপরিসীম ক্রান্তিভরে মাথার চুল ঠিকঠাক করে নিয়ে একঘেয়ে মরম স্বরে সে বলল, 'ব্রিগেডের সদর দপ্তর থেকে গতকাল এ খবর আমাকে জানানো হয়েছে দয়া করে বসুন

লিভুনিথ্‌সের আগের কাজ সম্পর্কে সে প্রশ্ন করল, রাজধানীর হালচাল জানতে চাইল, পথের সম্পর্কেও খোঁজখবর নিল। এই স্বল্পকালীন কথাবার্তার মধ্যে একবারও কিছু গভীর ক্রান্তিভরা দু'চোখের ভারী পাতা মেলে লিভুনিথ্‌সের দিকে তাকাল না।

'মেম্বেশনে মনে হয় হ্রস্টে খুব একচোট ঝড় বয়ে গেছে ওষ ওপর দিয়ে। চেহারাটা দেখছি মারাত্মক বকমের ক্রান্ত।' কর্ণেলের বুদ্ধিদীপ্ত চওড়া কপালের দিকে তাকিয়ে সহানুভূতিভরে লিভুনিথ্‌সি ডাবল কিছু তার ধারণাটা যে ভুল একথা প্রমাণ করার জন্য যেন ইচ্ছে করেই লোকটা তলোয়ারের হাতল দিয়ে নাকের মাঝখানের খাঁজ চুলকোল। তারপর বলল 'যান লেকটেনান্ট, অফিসারদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে নিন বুঝলেন কিনা, গত তিন রাত্তির শুম হয় নি এই পাণ্ডববর্জিত জায়গায় মদ খাওয়া আর তাস খেলা ছাড়া আর কিছু করার থাকে না।'

লিভুনিথ্‌সি কঠিন অবজ্ঞার ভাবটুকু হাসির আড়ালে ঢেকে টুপিতে হাত ঠেকিয়ে সেলাম করল এই সাক্ষাৎকার সম্পর্কে একটা বিবৃতি চিন্তা মনে নিয়ে সে বেরিয়ে এলো, কর্ণেলের ক্রান্ত চেহারা আর তার চওড়া চিবুকের ওপর কাটা দাগ নিজের অজান্তেই লিভুনিথ্‌সির মনে যে শ্রদ্ধার ভাব জাগিয়ে তুলেছিল তাই নিয়ে এখন সে মনে মনে বিদ্রূপ করতে লাগল

### পনেরো

ডিভিশনের ওপর তার পড়ল জোব করে স্ত্রীর নদী পার হয়ে লভিশ্‌টির কাছে ব্যুহ ভেদ করে শত্রুর পেছনে বেরিয়ে আসার

কয়েক দিনের মধ্যে অফিসার মহলের সঙ্গে লিভুনিথ্‌সি দিবা মানিয়ে নিল যে অস্রাম আর নিশ্চিন্তির ঘোরে এতদিন সে আচ্ছন্ন হয়ে ছিল, যুদ্ধের পরিস্থিতিতে পড়ে তা সে দ্রুত মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিল।

নদী পার হওয়ার কাজটা ডিভিশন সমাধা করল চমৎকার শত্রুসৈন্যের বাঁ পাশের একটা বিশাল দলকে বিধ্বস্ত করে দিয়ে ডিভিশন তাদের পেছনে পৌঁছে

গেল। লিভিংস্টনের উপকণ্ঠে মাদিয়ার\* অশ্বারোহিবাহিনীর সহায়তায় অষ্টীররা পাল্টা-আক্রমণের উদ্যোগ নিল। কিন্তু কসাক ব্যাটারিগুলোর শার্পনেল গোলায় আঘাতে তারা বিধ্বস্ত হয়ে গেল, মাদিয়ার স্কোয়াড্রনগুলো ছত্রভঙ্গ হয়ে এলোমেলো ভাবে পিছু হটতে লাগল। এদিকে পাশ থেকে মেশিনগানের গুলি এসে তাদের সাবাড় করতে লাগল। কসাকরা তাদের পিছু ধাওয়া করল।

লিভিংস্টনের রেজিমেন্ট এগিয়ে গেল। পাল্টা-আক্রমণের মুখে, তাদের ব্যাটেলিয়ন পিছু হটা শত্রুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। লিভিংস্টনের অধীনে যে তিন নম্বর ট্রুপটি ছিল সেখানে একজন কসাক মারা পড়ল, চারজন আহত হল। বাইরে শান্ত ডাব বজায় রেখে লিভিংস্টনের পাশ দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল লেফটেন্যান্ট লিভিংস্টন, লোকটাব ভাঙা ভাঙা স্বরেব মৃদু আত্ননাদ না শোনার চেষ্টা করল সে। লিভিংস্টন ভ্রমকৃষ্ণায় জেলার এক বাঁকা-নাক অল্পবয়সী কসাক মারা ঘোড়ার নীচে পিষে গেছে সে। তার হাতের সামনের অংশে আঘাত লেগেছে। চূপচাপ পড়ে আছে, কেবল থেকে থেকে পাশ দিয়ে ঘোড়ার পিঠে কসাকদের ছুটে যেতে দেখে দাঁত বাঁক করে অনুন্নয়-বিনয় করছে, 'ও দাদারা আমাকে ছেড়ে যেরো না।' দোহাই তোমাদের, দাদারা, আমাকে বাঁচাও।'

যন্ত্রণায় ভেঙে পড়া মৃদু কণ্ঠস্বর মৃদু মৃদু কানে বাজতে লাগল, কিন্তু পাশ দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে যাবার সময় বিহ্বল কসাকদের মনে সমবেদনার কোন চিহ্ন দেখা গেল না, আর যদি থাকেও তাহলে একটা প্রবল ইচ্ছা সেটাকে নিরস্তর চাপতে থাকে। দমিয়ে রাখে। কোন মতেই প্রকাশ পেতে দেয় না। লাফিয়ে লাফিয়ে ছোট্ট ফলে ঘোড়াগুলো ঘড় ঘড় আওয়াজ করছিল। পাঁচ মিনিটের জন্য স্বাভাবিক কদমে চালিয়ে তাদের দম ফেলার অবকাশ দিল ট্রুপটি। আধমাইলটাক দূরে ছত্রভঙ্গ মাদিয়ার স্কোয়াড্রনগুলো পিছু হটছে। ঘোড়সওয়ারদের গায়ে পশুলোমের কাজ করা সুন্দর সুন্দর কোর্তা, সৈন্যদের হাতখানে এখানে ওখানে চোখে পড়ছে পদাতিকদের ধূসর-নীল উর্দি। অষ্টীরদের সরবরাহ গাড়ির একটা সারি পাহাড়ের চূড়ার ওপর দিয়ে চলেছে, সারিটার মাথার ওপর শার্পনেলের দুধ-রঙা হালকা ধোঁয়া যেন বিদ্যায়ের ডঙ্কিতে হাত নাড়ছে। বাঁ দিক থেকে একটা ব্যাটারি গাড়িগুলোর ওপর সমানে গোলাবর্ষণ করে চলেছে। গুম গুম আওয়াজ মাঠের ওপর দিয়ে গড়াতে গড়াতে কাছের বনের ভেতরে ঢুকে জাগিয়ে তুলছে বহুকণ্ঠের প্রতিধ্বনি।

\* মাদিয়ার বা মাদিয়ার হাজেরির অপর নাম অনুঃ

ঘোড়সওয়ারদের ব্যাটেলিয়নটা পরিচালনা করছিল কমান্ড সেনাপতি লেফটেন্যান্ট কর্ণেল সাফ্রোনভ তার কাছ থেকে দুলকিতে চলার হুকুম পেয়ে তিনটে স্কোয়াড্রন ছড়িয়ে পড়ল অনেকখানি জায়গা জুড়ে লম্বা হয়ে মস্তুরগতিতে পা ফেলে দুলকি চালে চলেতে লাগল ঘোড়ার পিঠে ঘোড়সওয়াররা দুলুনি বেতে লাগল, ঘোড়াগুলোর দেহ থেকে গোলাপী হলুদ রঙের ফেনা বারতে লাগল

সেই রাতে তাদের আশ্রয় নিতে হল একটা ছোট্ট গ্রামে

একটা কুঁড়েঘরের মধ্যে গাঙ্গাগাদি করে থাকতে হল রেজিমেন্টের বারোজন অফিসারকে। ক্রান্তিতে ভেঙে পড়ে পেটে খিদে নিয়েই তারা ঘুমোবার জন্য শুয়ে পড়ল ফিল্ডের খাবারের গাড়ি যখন এলো তখন প্রায় মাঝরাত নিজের ভাগের মাংস আর বাঁধাকপির ঝোলের ডেকচি নিয়ে ঘরে ঢুকল কর্ণেল চুবোভ। চর্বিওয়ালা মাংসের ঝোলের ম-ম গন্ধে অফিসারদের ঘুম ভেঙে গেল। মিনিট পনেরো পরেই ঘুমে ফোলা ফোলা মুখ নিয়ে অফিসাররা খেতে বসে গেল, গোত্রাসে গিলতে লাগল। কাবও মুখে কোন কথা নেই সকলেনই যেন লড়াইতে নষ্ট হওয়া দুটো দিনের ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার জন্য ব্যস্ত রাতের খাওয়াটা দেরি করে হওয়ার ফলে ঘুম চটে গেল অতিরিক্ত খাওয়ার পর আইটাই করতে করতে কেউ খড়ের গাদার ওপর কেউ বা আত্মাখান আড়রাখা বিছিয়ে তার ওপর গা এলিয়ে দিল, শুয়ে শুয়ে তামাক টানতে লাগল।

সব অলটার্ন কালমিকোভ ছোটখাটো গোলগাল চেহারার এক অফিসার। শুধু নামে নয় তার মুখেও মঙ্গোলীয় জাতিদের চিহ্ন স্পষ্ট। ভীষণ ভাবে হাত পা ঝুঁড়ে অঙ্গভঙ্গি করে সে বলল, 'এ লড়াই আমার জন্যে নয় শ' চারেক বছর দেরি করে ফেলেছি জন্মতে, বুঝলে হে পেত্রো।' লেফটেন্যান্ট পিওত্র তের্সিনৎসেভকে 'পিওত্র' না বলে বিশেষ জোর দিয়ে 'পেত্রো' নামে সম্বোধন করে সে বলল, 'এ যুদ্ধের শেষ দেখা আমার ভাগ্যে হয়ে উঠবে না'

'তোমাব ওই হাত গোনা স্বভাব ছাড় ত' আঙুরাখার তলা থেকে মোটা গলায় ঘড়ঘড় করে পিওত্র বলল।

'হাত গোনা মোটেই না এ আমার বংশের নিয়তি, ভগবানের দিবি। আমি এখানে বাড়তি লোক। আজকে যখন আমরা গুলিগোলায় ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলাম তখন কী দাবুগ কাঁপুনিই না আমাদের পেয়ে বসেছিল। পাগল হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। শত্রুকে চোখে না দেখতে পেলে আমি স্থির থাকতে পারি নে। এই বিশ্রী অনুভূতি আতঙ্কেরই সমান কয়েক মাইল দূর থেকে ওয়া তোমাকে লক্ষ্য করে গোলা ঝুঁছে, আর তুমি স্তম্ভের খোলা মাঠের বুকে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছ শিকারীর লক্ষ্যের মুখে তিতিব পাখির মতো।'

‘কৃপালু’র একটা অস্থির হাউইটসার কামান দেখার সুযোগ হয়েছিল আমার। আপনাদের মধ্যে কেউ দেখেছেন কি? ইংরেজ কায়দায় ছাঁটা কটা রঙের গোর্গেব ওপর লেগে থাকা খাবারের গুঁড়ো চাটতে চাটতে মেজর আত্মমন্যকৃত জিজ্ঞেস করল

‘অপূর্ব জিমিস’ নিশানা ঠিক করার কৌশল, পুরো যন্ত্রপাতি চূড়ান্ত রকমের নিখুঁত কণ্ঠে চুবোত সপ্রশংস মন্তব্য করল প্রথম ডেকচির পর ইতিমধ্যে আরও এক ডেকচি বোল সে সাবাড় করেছে।

‘আমি দেখেছি, কিন্তু এ নিয়ে আমার কোন মন্তব্য করা সাজে না চুপ করে থাকাই বোধহয় ভালো। আর্টিলারির ব্যাপারে আমি একজন অনাড়ি আমার মনে হয়েছে, কামান সচরাচর যেমন হয়ে থাকে তাই - হাঁ-টা মন্ত বড়।’

‘আগেকার দিনে যারা আদিম পদ্ধতিতে লড়াই করতেন তাদের ওপর আমার হিংসে হয়,’ এবারে নিম্ননিখর দিকে ফিরে বলে চলল কালমিকোভ, ‘ন্যায়যুদ্ধে প্রতিপক্ষের ওপর আঘাত করা, ভালোয়ারের কোপে কোন লোককে দুটুকরো করে কাটা এটা আমি বেশ বুঝি কিন্তু এ যে কী হচ্ছে তা শয়তানই জানে।’

‘ভবিষ্যতের লড়াইতে ঘোড়সওয়ারের কোন জায়গা থাকবে না’

‘আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে, তার অস্তিত্বই থাকবে না।’

‘কিন্তু এ ত আমাদের অনুমানমাত্র।’

‘অনুমান কেন? কোন সন্দেহই নেই।’

‘শোনো, তের্মিন্থেসভ, তোমার কি মনে হয় যন্ত্র মানুষের জায়গা নেবে? এটা কিন্তু বড় বাড়াবাড়ি।’

‘আমি মানুষের কথা বলছি না, বলছি ঘোড়ার কথা মোটর সাইকেল বা মোটরগাড়ি তার জায়গা নেবে।’

‘মোটরগাড়ির স্কোয়াড্রনের কথাটা আমি কল্পনা করতে পারি।’

‘যত সব বাজে কথা’ কালমিকোভ উত্তেজিত হয়ে বলল ‘আর্মিতে ঘোড়া এখনও কাজে লাগবে অবাস্তব কল্পনা। দূশ তিনশ বছর পরে কী হবে আমরা জানি নে কিন্তু আজকের দিনে অন্তত ঘোড়সওয়ার।’

‘আজ্ঞা সমস্ত ফ্রন্ট জুড়ে যখন ট্রেন কাটা হয়েছে তখন দমিত্রি দনস্কোয়\* তার ঘোড়া দিয়ে কী করবে বল দেখি? কী হল উত্তর দাও।’

বুহ ভেঙে বেরিয়ে আসা, আক্রমণ শত্রুর পেছন দিক থেকে অনেকখানি ভেতরে ঢুকে হানা দেওয়া এই হল ঘোড়সওয়ারের কাজ

\* দমিত্রি দনস্কোয় (১৮৫০-১৮৮৯), মস্কো ও ভলদিমিরের মহাসামন্ত ১৮৮০ সালে দনের উজ্জানে তাতার-মস্কোলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনায় অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দিয়ে ‘দনস্কোয়’ আখ্যা পান। প্রতিভাবান সেনাপতি। অনুঃ

‘রাবিশ’

‘আচ্ছা, আচ্ছা মশাই, সেটা আমরা যথাসময়ে দেখব।’

‘এখন ঘুমানো যাক’

‘হয়েছে, আর তর্কবিতর্ক নয় সব কিছুই একটা সীমা আছে অন্যেরা এখন ঘুমোতে চায়’

তর্কবিতর্ক যেমন দপ করে ছলে উঠেছিল তেমনই খিতিয়ে গেল আন্তরাধার তলা থেকে কার যেন নাক ডাকার ঘড় ঘড় শৌ-শৌ আওয়াজ ভেসে আসতে লাগল। লিঙ্গনিবন্ধি এদের কথাবার্তার মধ্যে যোগ দেয় নি সে চিত্ত হয়ে শূয়ে ছিল যে রাইয়ের খড় বিছিয়ে শূয়েছিল তার ঝাঁঝাল গন্ধ টানতে লাগল নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে। কালমিকোভ ক্রুশচিহ্ন একে তার পাশে শূয়ে পড়ল

‘আপনি ডলটিয়ার\* বুনচুকের সঙ্গে আলাপ করে দেখবেন লেফটেন্যান্ট আশনার টুপে আছে বেশ ছোকরা’

‘কী হিশেবে?’ কালমিকোভের দিকে পিঠ ফিরিয়ে শূতে শূতে লিঙ্গনিবন্ধি জিজ্ঞেস করল

‘লোকটা কসাক, তবে বুখী বনে গেছে। মস্তোর থাকত একজন সাধারণ মজুর ছিল, কিন্তু এই সব নানা বিষয়ে তার অসাধারণ দখল আছে। কিছু পরোয়া করে না। মেশিনগান চালানোয় তুখোর।’

‘এবারে ঘুমানো যাক,’ লিঙ্গনিবন্ধি প্রস্তাব দিল

‘হ্যাঁ, তা ঠিক, মনে মনে কী যেন চিন্তা করতে করতে কালমিকোভ সম্মতি জানাল তারপর পায়ের আঙুল নাড়াতে নাড়াতে কাচুমাচু হয়ে চোখমুখ ঝুঁচকে বলল, ‘আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন লেফটেন্যান্ট, গন্ধটা আসছে আমার পা থেকে। বুঝতেই ও পারছেন গত তিন হপ্তা হল পায়ের জুতো খোলার সুযোগ হয় নি ভেতরের মোজাটোজাগুলো ঘামে ভিজে বোধহয় পচেই গেল কী জঘন্য ভাবতে পারেন। এখন কসাকদের কাছ থেকে জুতোর ভেতরে পায়ে জড়ানোর জন্য ন্যাকড়া চেয়ে নিতে হবে।’

‘ও কিছু নয় ও কিছু নয়,’ গভীর ঘূমে ঢুলে পড়তে পড়তে অস্বুটস্বরে লিঙ্গনিবন্ধি বলল

কালমিকোভের সঙ্গে কথাবার্তার ব্যাপারটা লিঙ্গনিবন্ধি ভুলেই গিয়েছিল কিন্তু

\* ডলটিয়ার তাদেরই বলা হত যারা তাদের বিশেষ শিক্ষাগত যোগ্যতাবলে বাধ্যতামূলক সামরিক চাকরীতে নিয়োগের সময় এবং অন্যান্য ব্যাপারে বিশেষ সুযোগসুবিধা পেল অনুঃ



পরের দিন দৈবক্রমে ভলাকিয়ার বুনচুকের সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়ে গেল। ভোরবেলায় স্কোয়াড্রনের কমান্ডার তাকে প্রাথমিক পর্ববেষ্টিতের কাজে বেরিয়ে পড়ার নির্দেশ দিল বাঁ পাশে যে পদাতিক রেজিমেন্ট আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে, সম্ভব হলে তাদের সঙ্গেও যোগাযোগ করতে বলল। উঠোনের সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে ঘুমোচ্ছে কসাকবা। ভোরের আধা আলো আধা অন্ধকারে তাইই ভেতর দিয়ে পথ করে চলতে চলতে লিস্তনিৎস্কি খুঁজে বেড়াতে লাগল টুপ-সার্জেন্টকে

‘আমার সঙ্গে যাবার জন্যে পাঁচজন কসাকের একটা টহলদার দল তৈরি করে নিয়ে এসো। আর হ্যাঁ বোলো, আমার ঘোড়াটাও যেন তৈরি করে আনে জনাদি।

মিনিট পাঁচেক পরে একজন বেঁটেখাটো গভনের কসাক চৌকাটের সামনে এসে দাঁড়াল লেফটেন্যান্ট তখন তার সিগারেট কেস-এ সিগারেট ভরছিল তাকে উদ্দেশ্য করে লোকটা বলল, ‘হুজুর! আমার পাল্লা নয় বলে টহলদারের কাজে সার্জেন্ট আমাকে নিতে চাইছে না আপনি কি অনুমতি দেবেন?’

‘শোমামোদ করতে এসেছ নাকি?’ কোন অফিস কুসাজের জন্যে শান্তি বা জরিমানার হুকুম হয়েছে নাকি?’ ধূসর অন্ধকারের মধ্যে লোকটার মুখ ভালো করে দেখে নেওয়ার চেষ্টা করতে করতে লেফটেন্যান্ট জিজ্ঞেস করল

‘না তা হয় নি।’

‘তাহলে ঠিক আছে, যেতে পাব, লিস্তনিৎস্কি সম্মতি দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

লোকটা চলে যাচ্ছিল, এমন সময় লিস্তনিৎস্কি তাকে টেঁচিয়ে পেছন থেকে ডেকে বলল ‘এই যে, শোনো এদিকে এসো।’

লোকটা ফিরে আসতে সে বলল ‘সার্জেন্টকে বোলো

তাকে বাধা দিয়ে কসাক বলল ‘আমার নাম বুনচুক।’

‘ভলাকিয়ার?’

‘হ্যাঁ হুজুর’

‘সার্জেন্টকে বলবেন যেন ’ মুহুর্তের হতবুদ্ধির ভারটা কাটিয়ে উঠে শূধরে নিয়ে বলল লিস্তনিৎস্কি ‘আচ্ছা ঠিক আছে, যান, আমি নিজেই বলব ‘খন।’

অন্ধকারটা হালকা হয়ে এলো টহলদারী দলটা গ্রাম ছাড়িয়ে চলে গেল। পাহারাদারদের টৌকি আর সত্ৰীদের ঘাঁটিগুলো পার হয়ে যাবার পর ম্যাপে যে গ্রামটায ওপর দাগ দেওয়া ছিল সেই দিক লক্ষ্য করে তারা চলতে লাগল।

আধমাইলটুকু চলে আসার পর লেফটেন্যান্ট তার ঘোড়ার চাল পালটাল সাধারণ কদমে চালাতে লাগল ঘোড়া।

‘ভলাকিয়ার বুনচুক’

‘বলুন স্যার।’

‘কষ্ট করে একটু এগিয়ে আসুন।’

বুনচুক তার সাদাসিধে ঘোড়াটাকে লেফটেন্যান্টের দায়ী জাতের কুলীন ঘোড়ার পাশে নিয়ে এলো

‘আপনি কোন্ জেলার লোক?’ পাশ থেকে ভলাটিয়ারের চেহারা ঝুটিয়ে দেখতে দেখতে লিঙ্গনিঃস্রি জিজ্ঞেস করল।

নোভোচেব্‌কাস্‌স্কায়া।’

‘ভলাটিয়ার হয়ে আসার পেছনে আপনার তাগিদটা কী ছিল জানতে পারি কি?’

‘অবশ্যই টেনে টেনে খানিকটা যেন বিদূষের ভঙ্গিতেই জবাব দিল বুনচুক, বুক ধরনের সবজ্যেটে চোখদুটো মেলে তাকাল লেফটেন্যান্টের দিকে। সে চোখের দৃষ্টি অপজক, কঠিন, স্থির শেষকালে বলল, ‘যুদ্ধের কায়দাকানুনে আমার আগ্রহ আছে বুঝতে চাই

‘এর জন্যে ত মিলিটারী স্কুলই আছে।’

‘তা আছে।’

‘তবে?’

‘গোড়ায় হাতে কলমে পরীক্ষা করে দেখতে চাই। তত্ত্ব-টক্স সে পরে ঠিক হয়ে যাবে।’

‘লড়াইয়ের আগে আপনি কী কাজ করতেন?’

মজুর ছিলাম।’

কোথায় কাজ করতেন?’

‘পিটার্সবুর্গে দনের রস্তোভে, তুলায় গান ফ্যাক্টরিতে মেশিনগান প্রেটুনে বদলি হওয়ার জন্য আমি আর্জি করতে চাই

‘মেশিনগান সম্পর্কে আপনার জ্ঞান আছে?’

‘শোশা, বোর্টসের, ম্যাডসেন, ম্যাক্সিম, গোচকিস, বার্গম্যান, ভাইকাস, লুইস, শ্ভার্ডসলোজে এসবের সিস্টেম আমার জ্ঞান আছে।’

‘কটে। আমি রেজিমেন্টের কমান্ডারের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলে দেখব

‘তাহলে ত বেশ হয়।’

লেফটেন্যান্ট আরও একবার তাকাল বুনচুকের বৈঠোটা মজবুত গড়নের চেহারা দিকে। দেখে তার মনে হল যেন দন অঞ্চলের কর্ক-এল্ম গাছ চোখে পড়ার মতো বিশেষত্ব তার মধ্যে কিছু নেই সবই অতি সাধারণ। শুধু তাব শক্ত চাপা চোয়াল আর চোখদুটো, যার চাউনির সামনে লোকে বিব্রত বোধ করে - এতেই বহু লোকের ভিড়ের মধ্যে আলাদা করে চেনা যায় তার মুখ।

হাসে সে কদাচিৎ, তাও চৌটের ফীকে হাসলেও কিছু এতটুকু নরম হয়

না তার চোখদুটো, সব সময় বজায় থাকে সেই দুর্ভেদ্য মৃদু প্রভা রঙচঙের ব্যাপারে সে যেন কার্পণ্যের প্রতিমূর্তি, দীতল শাস্ত্র সংযত - কর্ক-এলম গাছ যেমন হয় - বৃক্ষ, লোহার মতো কঠিন সে গাছ, যা দনের খারের দাক্ষিণ্যবিহীন বুরখুরে গুর মাটিতে জন্মায়।

কিছুক্ষণ তারা নিশেকে এগিয়ে চলল চটা ওঠা সবুজ রঙের জিনের কাঠামোর ওপর পড়ে আছে বুনচুকের চওড়া দুটি হাতের থাকা লিন্ডনিথকি সিগারেট বার করল বুনচুক দেশলাই ছালিয়ে সিগারেট ধরিয়ে দিতে লিন্ডনিথকি তার হাতে ঘোড়ার ঘামের উগ্র কাঁচু গন্ধ টের পেল। হাতের পাঞ্জার উলটো দিকটা ঘোড়ার কর্কশ লোমের মতো বাদামী রঙের ঘন লোমে ঢাকা। নিজের অজান্তেই ওখানে হাত বুলোতে ইচ্ছে করছিল লিন্ডনিথকির ঝাঁঝাল ধোঁয়া গিলতে গিলতে সে বলল

‘এই বনটা থেকে আরেকজন কসাকের সঙ্গে ওই কাঁচা বাস্তাটা ধরে বাঁ দিকে চলে যাবেন। দেখতে পাচ্ছেন ত?’

হ্যাঁ।’

‘মাইলবানেক যাবার পরও যদি আমাদের পায়-দল সেপাইদের দেখা না পান তাহলে ফিরে আসবেন।’

‘যে আশ্বে।’

দুলকি চালে ঘোড়া ছুটিয়ে চলল ওরা। বনের প্রান্তে গলাগলি করে ঘন ঘন দল বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে এক সারি কচি বাঁচগাছ। তাদের পেছনে বেঁটে বেঁটে দেবদারুগাছের নিরানন্দ হলুদ বিস্তার দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে আসে চোখদুটো, চোখে পড়ে ফাঁকা ফাঁকা ছোট ছোট গাছপালা আর অসংখ্য ঝোপঝাড়। যেগুলোকে অস্ট্রিয়দের যানবাহনগুলো পালানোর সময় মাড়িয়ে চলে গেছে ডান দিকে বহু দূরে মেসিনী কাঁপিয়ে উঠছে কামানের ঘোর গর্জন। কিন্তু এখানে, বাঁচগাছগুলোর পাশে বিরাজ করছে অবর্ণনীয় নিস্তব্ধতা। প্রচুর শিশির পড়েছে মাটিতে, মাটি শুষে নিচ্ছে সেই শিশির ঘাস গোলাপী হয়ে উঠছে, সর্বত্র উজ্জ্বল বর্ণসুবমা, প্রথম শরতের রঙের ঢল নেমেছে এ যেন রঙের আসন্ন মৃত্যুরই সর্ব ঘোষণা। বাঁচগাছগুলোর পাশে ঘোড়া থামাল লিন্ডনিথকি। দূরবীন বার করে দেখতে লাগল বনের পেছনে উঁচিয়ে থাকা টিলাটা। তার তলোয়ারের পেতলের হাতলের ওপর একটা মৌমাছি উড়ে এসে বসে টানটান করে পাখাদুটো ছড়াল

‘বোকা।’ মৌমাছিটার ভুলের জন্য দরদভরা মৃদু কণ্ঠে তাকে নিন্দা করে বলল বুনচুক।

‘কী?’ লিন্ডনিথকি দূরবীন থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে বলল।

বুনচুক ইন্সটিতে মৌমাছিটাকে দেখিয়ে দিল, লিভুনিৎস্কি হাসল

‘এর মধু হবে তেতো, কী মনে হয় আপনার?’

লিভুনিৎস্কির প্রশ্নের জবাব যে দিল সে কিছু বুনচুক নয়। দূরের সেবাদারুগাহগুলোর মাথার ওপাশ থেকে এক ঝাঁক ছাতার পাখির মতো তীক্ষ্ণ কিচিরমিচির আওয়াজ ভুলে নিস্তব্ধতা খান খান করে ভেঙে ছুটে গেল মেশিনগানের গুলি, হু হু আতঁনাদ করতে করতে বার্টিগাহগুলো ভেদ করে চলে গেল বুলেটের ছবরা। গুলির আঘাতে গাছের একটা ডাল ভেঙে গিয়ে ঘুরতে ঘুরতে, এদিক শুদিক দোল খেয়ে এসে পড়ল প্লেফটফর্মের ঘোড়ার কেশরের ওপর।

ওরা ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে দিল চিৎকার-চৈচামেচি হীকাহীকি করে চাবুক ঘেরে ঘোড়াগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে চলল গ্রামের দিকে। তামেব পেছন পেছন অস্ট্রিয়ান মেশিনগান তার বুলেটের গুলি শেষ না হওয়া পর্যন্ত এতটুকু দম না ফেলে একটানা গর্জন করে চলল।

এর পর ভলান্টিয়ার বুনচুকের সঙ্গে একাধিকবার দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে লিভুনিৎস্কির। যতবার দেখা হয়েছে ততবারই বুনচুকের দুই চোখের কঠিন দৃষ্টিতে অদম্য ইচ্ছাশক্তির বলক দেখে সে বিস্মিত হয়েছে, কালো মেঘের পর্দার মতো ধরা-ছোঁয়ার-বাইরে যে গোপনীয়তা সাদাসিধে চেহারার এই মানুষটির মুখখানি আড়াল করে রেখেছে সেটা কী হতে পারে একথা ভেবে ভেবে, কিছুতেই তার রহস্য ভেদ করতে না পেরে সে বারবার বিস্মিত হয়েছে। বুনচুকের সব কথাই কেমন যেন অর্ধেক অর্ধেক কথা বলার সময় তার চাপা চৌঁটের কোনায় লেগে থাকে মৃদু হাসি, হালভাব দেখে মনে হয় যেন আঁকাবাঁকা সর্পিণ পথ ধরে সে এড়িয়ে যেতে চাইছে কোন এক সত্য, যে সত্য একমাত্র তারই জানা আছে। মেশিনগান-প্লেটুনে বদলি সে হয়েছে। দিন দশেক পরে (রেজিমেন্ট তখন একদিনের বিশ্রাম নিচ্ছিল) স্কোরাড্রন-কম্যান্ডারের কাছে যাবার পথে লিভুনিৎস্কি তাকে ধরে ফেন্সল খেলাচ্ছিলে বাঁ হাতের কব্জিটা নাড়াতে নাড়াতে একটা আগুনে পোড়া চালাঘরের দিকে বুনচুক যাচ্ছিল।

‘এই যে ভলান্টিয়ার যে!’

বুনচুক ঘাড় ফেরাল, সেলাম করল লিভুনিৎস্কিকে।

‘কোথায় যাচ্ছেন?’ লিভুনিৎস্কি জিজ্ঞেস করল।

‘প্লেটুন-কমান্ডারের কাছে।’

‘একই পথে যাচ্ছি তাহলে আমরা?’

‘তাই শু মনে হচ্ছে।’

কিছুক্ষণ দু’জনে নিঃশব্দে হেঁটে চলল ছাবখার হয়ে যাওয়া গ্রামের রাস্তা

ধরে। এখানে ওখানে ছাড়া ছাড়া কয়েকটা চালা তখনও ঝাড়া হয়ে আছে, সেগুলোর উঠোনে লোকজনের ব্যস্ততা চোখে পড়ে। কিছু ঘোড়সওয়ার পাশ দিয়ে চলে গেলে। রাস্তার একেবারে মাঝখানে পল্টনের হেঁসেল বসে গেছে, ঘোঁয়া উড়ছে, একদল কসাক লম্বা সার বেঁধে পাশে দাঁড়িয়ে আছে বাবারের অপেক্ষায় বাতাসে গুঁড়িগুঁড়ি ভিজে কণা ভাসছে

লিভনিৎস্কির খানিকটা পিছন পিছন হাঁটছিল বুনচুক তেরছা চোখে তার দিকে ফিরে তাকিয়ে সে জিজ্ঞেস করল, 'তারপর, যুদ্ধবিদ্যার চর্চা চলছে ?'

'হ্যাঁ চলছে বলেই ত মনে হচ্ছে '

'যুদ্ধের পর আপনি কী করবেন বলে ডাবছেন ?' ডলান্টিয়ারের লোমশ হাতের দিকে তাকিয়ে লিভনিৎস্কি কেন যেন জিজ্ঞেস করল।

'কেউ কেউ কৃতকর্মের ফল ভোগ করবে আর আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখব।' বুনচুক চোখ কোঁচকাল

'তার মানে ? কী বলতে চান ?'

'জানেন ত লেফটেন্যান্ট (চোখদুটো আরও কুঁচকে, আবও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হানল সে) কথায় বলে, 'ঝড় নামালে তার ঝাপটাটাও যেতে হয়' ? সেই রকম আর কি '

ওসব হেঁয়ালি বাদ দিয়ে একটু বোলসা করেই বলুন না কেন '

'অমনিতেই পরিষ্কার আচ্ছা চলি লেফটেন্যান্ট আমাকে বীয়ে যেতে হবে '

কসাক-টুপির কানায় লোমশ আঙুল ঠেকিয়ে সেলাম করে বুনচুক বাঁ দিকে মোড় নিল

লেফটেন্যান্ট কিছু না বুঝে কাঁধ ঝাঁকাল, অনেকক্ষণ তাকে অনুসরণ করল দৃষ্টি দিয়ে

'লোকটা কি মৌলিক হবার চেষ্টা করছে, নাকি স্রেফ ছিটখুসু ?' স্কোয়াড্রন-কমান্ডারের ঝকঝকে তকতকে সুড়ঙ্গ-ঘরের ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বিরক্ত হয়ে লিভনিৎস্কি ডাবল।

## মোল

দু'মন্ডর বিজার্ড লাইনের সঙ্গে তিন মন্ডর বিজার্ড লাইনটাও চলে গেল। দনের জেলা আর গ্রামগুলোও ফাঁকা জনশূন্য হয়ে পড়ে রইল দেখে মনে হতে পারে দন অঞ্চলের সবাই যেন একসঙ্গে ফসল কাটাতে বেরিয়ে গেছে

কিন্তু সীমান্তে সে বছর চলছিল এক ত্রিফল ফসলকাটার কাজ যেন এক

বহুৎসব ফসল যারা কাটেতে এসেছিল মৃত্যুর ভয়ঙ্কর ধাওয়া নেমে এলো তাদের ওপরে বহু কসাক রমণী এলোচুলে বিশায় জ্ঞানাল মৃতদের, ইনিয়ৈ বিনিয়ৈ কাঁদল তাদের শোকে 'ওগো তুমি কোথায় গেল গো? কার কাছে আমায় রেখে গেল গো?'

এখানে ওখানে চতুর্দিকে ধরাশায়ী হতে লাগল প্রিয়জনদের মাথা, ঝরতে লাগল কসাকদের লাল রক্ত, নিঃশ্রাণ নিখর চোখে চিরনিদ্রায় ঘুমিয়ে রইল তারা, পচতে লাগল কামানের গর্জন তাদের অস্ত্রোটিময় উচ্চারণ করল অস্থিমায়া, পোলাডাও, প্রুশিয়ায়। পূর্বের হাওয়া বৌ আর মায়ের বুককাটা কাছা তাদের কানে পৌছে দিতে পারল না

কসাকদের স্রেষ্ঠ সজ্ঞানরা তাদের ধরবাড়ি ছেড়ে চলে গেল, মৃত্যুর তাণ্ডব উকুন আর বিত্তীবিহার মধ্যে পড়ে পড়ে ধ্বংস হতে লাগল।

সেপ্টেম্বর মাসের এক চমৎকার দিন। তাতারস্বি গ্রামের মাথাব ওপর পৈঞ্জা তুলোর মতো সুন্দর দুধের মতো সাদা মাকড়সার জাল ঝুলছে। রামধনুর রঙ খেলা করছে জালের ওপর নিরঙ্ক সূর্যের মুখে বিধবার স্নান হাসি নিষ্পাপ কুমারীর মতো আকাশের নীলিয়া। তার শুদ্ধতা ও গর্বোদ্ধত ভাব বিরক্তির উদ্বেক করে দনেব ওপারে হলুদের ছৌওয়া লেগেছে বনে। শোকে-বেদনায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে বনভূমি, পপলার গাছ নিস্তেজ ভাবে ক্রিমিক করছে, গুঁকগাছ তার বিচিত্র কাবুকাজ করা বিরল পাতাগুলো ঝরিয়ে দিচ্ছে শুষু এলডার গাছই সববে ঘোষণা করছে তার সবুজের সমারোহ। তার প্রবল জীবনী শক্তি ছাতার পাতাঘের চোখ জুড়িয়ে দিচ্ছে।

সেই দিনই পাঙ্কলেই প্রকোফিয়েভিচ মেলেখভ যুদ্ধরত সেনাবিভাগ থেকে একখানা চিঠি পেল পোস্ট অফিস থেকে চিঠিটা নিয়ে এলো দুনিয়াশ্কা চিঠিটা তার হাতে দেওয়ার সময় পোস্টমাস্টার মাথা নোয়াল তার টাকমাথাটা নাড়াল তারপর দু'হাত ছড়িয়ে অপরাধীর ভঙ্গিতে অনুনয় কবে বলল, 'ভগবানের দোহাই, আমাকে ক্ষমা করবে, চিঠিটা আমি খুলে ফেলেছি। হ্যাঁ, বাবাকে এই কথাই বোলো - কিরুস সিদরভিচ চিঠিটা খুলে ফেলেছে। কেমন? ফলবে লড়াইয়ের খবর জানার জন্যে, লড়াই কেমন চলছে জানার জন্যে ভারী কৌতুহল হয়েছিল তাই আর কি কেমন, বলবে ত? আমাকে ক্ষমা করো। এ কথাই জ্ঞানিও তোমার বাবা পাঙ্কলেই প্রকোফিয়েভিচকে

তাকে অস্বাভাবিক রকমের বিচলিত দেখাচ্ছিল দুনিয়াশ্কাকে সে এগিয়েও দিল অফিসের বাইরে এসে, এমন কি নাক যে কপিলিতে মাখামাখি হয়ে গেছে সেদিকেও কোন খেয়াল ছিল না তার

‘যাই হোক না কেন, আমার অপরাধ নিও না তোমরা, ভগবান রক্ষা করুন চেনাশোনা বলেই না দুনিয়াশকার পেছন পেছন আসতে আসতে অসংলগ্ন ভাবে বিভ্রিভি করে সে বলে, মাথা নুইয়ে নমস্কার জানায়। দেখেশুনে দুনিয়াশকার মনে খটকা লাগল কিসের যেন একটা আশঙ্কায় তার বুক কঁপে উঠল

উত্তেজিত অবস্থায় সে বাড়ি ফিরে এলো। চিঠিটা বৃকের কাছে রেখেছিল, অনেকক্ষণ সময় লাগল সেটা টেনে বার করে আনতে

পাঙ্ডেলেই প্রকোফিয়েভিচের দাড়ি কাঁপছিল। দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে মেরেকে ধমক দিয়ে সে বলল, ‘জ্বলদি কর।’

দুনিয়াশকা খামটা বার করে তড়বড়িয়ে বলে উঠল, ‘পোস্টমাস্টার বলেছে কোতুল হওয়ায় চিঠিটা খুলে পড়েছে, তুমি যেন রাগ করো না।’

‘তুলোয় যাক তোর পোস্টমাস্টার! গ্রিগোরি চিঠি?’ উত্তেজিত হয়ে দুনিয়াশকার মুখের ওপর ফৌসফৌস করে নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে বুড়ো জিঞ্জিঙ্গা করল। ‘নিশ্চয়ই গ্রিগোরির, তাই না? নাকি পেরোর?’

‘না বাবা, ওদের কারোরই নয় খামের ওপর যে হাতের লেখা দেখছি সেটা অন্য কারও।’

‘আর না ছালিয়ে পড় ত দেখি।’ জবুথবু ভারী পায়ের ধপধপ করতে করতে বেক্সির কাছে এগিয়ে এসে ইলিনিচনা বন্ধার দিয়ে বলল (তার পা ফোলা অনেক কষ্টে একটা একটা করে পা উঠিয়ে চলে, দেখলে মনে হয় যেন সাইকেল চালাচ্ছে)

উঠোন থেকে ছাঁপাতে ছাঁপাতে ছুটে এলো নাতালিয়া। দৃশ্যতে বুক চোপে ধরে ক্ষতবিক্ষত বিকৃত ঘাড়টা একপাশে কাত করে উনুনের ধারে সে দাঁড়িয়ে রইল তার ঠোঁটের কোনায় সূর্যের ঠিকরে পড়া বিলিমিলি আলোর মতো তিরতির করে কাঁপতে লাগল এক টুকরো হাসি সে আশা করে ছিল চিঠিতে গ্রিগোরি তার কুশল কামনা করবে, লেখার মাঝখানে কোন এক ফাঁকে হোক, যৎসামান্য হোক অস্তুত তার সম্পর্কে উল্লেখ - সে-ই হবে তার কুকুরের মতো প্রভুতন্ত্রির, তার একনিষ্ঠ অনুসরণের পুরস্কার।

‘দরিয়া আবার কোথায় গেল?’ বুড়ি কিসকিস করে বলল।

চোপ্ ‘পাঙ্ডেলেই প্রকোফিয়েভিচ ধমক দিয়ে উঠল, কিন্তু হয়ে সে চোখ পাকাল, তারপর দুনিয়াশকার দিকে ফিরে বলল, পড়

‘আপনার অবগতির জন্য জানাইতেছি যে ’ দুনিয়াশকা শব্দ করল, তারপরই বেক্স থেকে গড়িয়ে পড়ে গেল, কাঁপতে কাঁপতে বিকট গলায় আর্ত চিৎকার করে উঠল। ‘বাবা বাবা গো ওঃ, মাগো! আমাদের গ্রিগো! ওঃ! ওঃ! গ্রিগো মারা গেছে।’

একটা মৃতপ্রায় জেরেইনিয়ামের পাতার মধ্যে জড়িয়ে গিয়ে ডোরাকাটা একটা বোলতা উঁষণ ডাবে ভৌ ভৌ করতে করতে জনলার গায়ে গোস্তা খেতে লাগল। উঠোনে একটা মুরগী নিশ্চিন্তে কঁক কঁক করে চলেছে, খোলা দরজা দিয়ে দূর থেকে ভেসে আসছে লিশুকঠের বিলবিল হাসি

এই কিছুক্ষণ আগে ঠোটের কোনে যে মৃদু হাসির শিহরণ খেলছিল তা মিলিয়ে যেতে না যেতে নাতালিয়ার মুখটা খরখর করে কাঁপতে লাগল,

দুনিয়াশুকা মেঝেতে পড়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে, ছটফট করছে তাই মেঝে পক্ষাঘাতের মতো মাথা ঝাঁকতে ঝাঁকতে পাগুলোই প্রকোফিয়েভিচ উঠে দাঁড়াল, ভেবাচেকা খেয়ে ফ্যালফ্যাল করে সেদিকে তাকিয়ে রইল

চিঠিতে লেখা ছিল

‘আপনার অবগতির জন্য জানাইতেছি যে আপনার পুত্র, বারো নম্বর দন কসাক রেজিমেন্টের কসাক গ্রিগোরি পাঙ্কেলেয়েভিচ মেলেখভ গত সেপ্টেম্বর মাসের ১৬ তারিখে রাতে কামেনকা-ভুমি-লোভো শহরের উপকণ্ঠে এক যুদ্ধে নিহত হইয়াছে আপনার পুত্র বীরের মৃত্যু বরণ করিয়াছে আপনার এই অপূরণীয় ক্ষতিতে ইহাই হউক আপনার সাধুনা তাহার যাবতীয় ব্যক্তিগত জিনিসপত্র তাহার সহোদর ভ্রাতা পিওতর মেলেখভের হস্তে অর্পণ করা হইবে ঘোড়াটি রেজিমেন্টে রাখিয়া দেওয়া হইল

ভবদীয়

সাব-অলটার্ন পলকোভনিকভ

চার নম্বর স্কোয়াড্রনের কমান্ডার  
যুদ্ধরত সেনাবিভাগ

১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯১৪ সাল

গ্রিগোরির মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার পর পাঙ্কেলেই প্রকোফিয়েভিচ হঠাৎই কেমন ধেন হাত পা ছেড়ে দিল বাড়ির লোকজনের চোখের সামনে সে দিন দিন বুড়িয়ে যেতে লাগল। এমনই শোচনীয় এক পরিণতির দিকে সে এগিয়ে যেতে লাগল যা থেকে তার ফেরার আর কোন উপায় নেই। স্মৃতিভ্রংশ পেয়ে বসল তাকে, চিন্তাশক্তি লোপ পাওয়ার মতো অবস্থা হল তার পিঠ নুইয়ে সে হাঁটতে লাগল বাড়ির ভেতরে, ঢালাই লোহার মতো কালো রঙ ধারণ করল তার মুখ



তার স্বরতন্তু চোখের তেল চকচকে দৃষ্টিতে মানসিক অস্থিরতা চাপা থাকল না।

স্কোয়াড্রন-কমান্ডারের চিঠিটা সে নিজের বিগ্রহের কুলুঙ্গির তলায় রেখে দিল দিনের মধ্যে বার কয়েক বারান্দায় বেরিয়ে আসে আঙুলের ইশারায় দুনিয়াশ্বককে ডাকে

‘আয় দেখি এদিকে বিটি।’

দুনিয়াশ্বক বারবার কাছে এগিয়ে আসে ভেতরের ঘরে, যেখানে ইলিনিচনা বিছানায় শুয়ে অবর্ণনীয় শোকে দুঃখে কাতর হয়ে ছটফট করছে, ভয়ে ভয়ে সেই ঘরের দরজার দিকে তাকিয়ে পাত্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ মেয়েকে হুকুম দেয়

‘সেই যে প্রিগোরির কথা যে চিঠিখানায় লেখা আছে, সেটা নিয়ে আর দেখি পড়ে শোনা’ গোটা শরীবটা বাকিয়ে চতুরের মতো চোখ টিপে ইশারায় দরজা দেখিয়ে দিয়ে বলে, ‘একটু আস্তে আস্তে পড়, মনে মনে পড়ার মতন কর’ আস্তে আস্তে, নইলে তোর মা আবার ওকে নিয়েই হয়েছে বিপদ

দুনিয়াশ্বক কান্না গিলতে গিলতে প্রথম ছবটা পড়ে এই সময় পাত্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ সচরাচর উবু হয়ে বসে থাকতে থাকতে মোড়ার খুরের মতো চওড়া কালো রঙের হাতের চোটেটা খাড়া করে সামনের দিকে তুলে বলে

‘আচ্ছা থাক। বাকিটা আমি জানি এবারে যা দেখি কুলুঙ্গির নীচে রেখে আয় গে। আস্তে কিছু নইলে তোর মা আবার বলতে বলতে আবার বিদ্রী ভাবে চোখ টেপে, আগুনে পোড়া গাছের বাকলের মতো কুকড়ে বার তার সর্বাস

মাথার চারপাশের চুলে পাক ধরল, দেখতে দেখতে তার মাথার সর্বত্র ঝকঝকে সাদা পাক ধরা চুলের ছোপে ঢেকে গেল, সাদা সুতোব মতো কুলতে লাগল তার দাড়ির গোছা খাওয়ার ব্যাপারে সে এখন আর কোন বাহবিজ্ঞার কবে না প্রচুর খায়, পেটকের মতো গোপ্রাসে গেল।

মৃত যোদ্ধার পারলৌকিক ক্রিয়া শেষ হয়ে যাবার পর নয় দিনেব দিন পাদ্রি ভিস্সারিওন আর আত্মীয়স্বজনকে আক্রান্তোজনে নিমন্ত্রণ করা হল।

পাত্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ তড়বড় করে রাফসের মতো খেয়ে চলল সেমাইগুলো সুতোব মতো দাড়িতে কুলতে লাগল। গত কয়েক দিন ধরেই তাব হাবভাব লক্ষ করে ইলিনিচনা গভীর উদ্বেগ বোধ করছিল বুড়োর এই কাণ্ড দেখে সে কৈদে ফেলল।

‘ওগো, এ কী দশা হয়েছে তোমার?’

‘কেন? কী হয়েছে আবার?’ বাটি থেকে মুখ তুলে খোলাটে চোখে তাকিয়ে বাস্তসম্মত হয়ে বুড়ো বলল

ইলিনিচনা হতাশ ভঙ্গিতে হাত নেড়ে একটা কাজ-করা বুঝাল চোখে চাপা দিয়ে পেছন ফিরে তাকাল

‘বাবা, আপনি এমন ভাবে যাচ্ছেন যেন তিন দিন কিছু খান নি।’ ক্রুদ্ধকণ্ঠে দারিয়া বলল, তার চোখদুটো ঝকঝক করে উঠল।

‘কী? আমি অনেক খাচ্ছি? বাটে? বেশ তা বেশ ত, খাব না।’ পাশ্বেলেই প্রকোফিয়েভিচ হতবুদ্ধি হয়ে গেল টেবিলের চারধারে যারা বসে ছিল তাদের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকাল চোঁট কামড়ে ভুরু কঁচকে চুপচাপ বসে রইল কারও প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না

‘বুকে সাহস ধর প্রকোফিচ! অমন ভেঙে পড়লে চলবে কেন?’ শ্রদ্ধভোজনের পর্ব শেষ হলে পাত্রি ভিস্‌সারিওম তাকে চাক্ষু করার জন্য বললেন, ‘ছেলে তোমার পুণ্যের কাজ করে প্রাণ দিয়েছে অমন ভাবে শোক করে ভগবানকে কুঁচু করো না। জারের জন্যে স্বদেশের জন্যে কণ্টক মুকুট মাথায় পড়েছে, আর তুমি কিনা এ হচ্ছে পাপ, পাপ করছ তুমি প্রকোফিচ। ভগবান ক্ষমা করবেন না।’

‘আমি ত চেষ্টা করছি ঠাকুরমশাই বুকে সাহস ধরার চেষ্টা ত আমি করছিই কম্যাণ্ডার ত লিখেইছে ‘বীরের মৃত্যু বরণ করিযাছে’

পাত্রির হাতে চুমো খেয়ে দরজার চৌকাটের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল বুড়ো গ্রিগোরির মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার পর এতদিনের মধ্যে এই প্রথম সে কঁদে ফেলল, গুমবে গুমবে কঁদতে লাগল। দুলে দুলে উঠতে লাগল তার শরীরটা

সেই দিন থেকে সে নিজের ওপর আস্থা ফিরে পেল। মনের দিক থেকে সামলে উঠল।

পরিবারের প্রত্যেকেই নিজের নিজের মতো করে এই ক্ষত লেহন করতে লাগল

দুনিয়াশকার মুখ থেকেই নাতালিয়া সেই যখন শুনতে পেল যে গ্রিগোরি মারা গেছে তখন সে উঠোনে ছুটে বেরিয়ে এসেছিল ‘আশ্চর্য্যত্যা করব। আমার সব ফুরিয়েছে আর কেন?’ একমাত্র এই চিন্তাটাই তখন মাথার ভেতরে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল দারিয়ার বাহুবন্ধনে সে ছটফট করছিল তারপর সে জ্ঞান হারাল স্বস্তি পেল জ্ঞান হারিয়ে, কেননা এর ফলে অস্বস্ত জ্ঞান ফিরে আসার মুহূর্তটি বিনশিত হবে, আর সেই মুহূর্তটি ফিরে আসার পর এখন যে ঘটনা ঘটে গেল তা মনে করার মতো মনোবল সে ফিরে পাবে। বিল্টী ঘোরের মধ্যে কেটে গেল একটা সপ্তাহ বাস্তব জগতে যখন ফিরে এলো তখন সে অন্য মানুষ - একেবারে শান্ত একটা অন্ধ অক্ষমতা তাকে করে করে যাচ্ছে এক অদৃশ্য প্রেত হানা দিয়েছে মেলেক্তদের বাড়িতে। জীবিতেরা তাব পচা ঝাঁঝাল গন্ধে নিশ্বাস নিচ্ছে

গ্রিগোরির মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার এগারো দিন পরে মেলেখভরা পেত্রোর দু'খানা চিঠি পেল একসঙ্গে। দুনিয়াশকা পোস্ট অফিসেই চিঠিদুটো পড়ে ফেলেছিল। পড়ামাত্রই ঝড়ের মুখে পড়া ঝড়ের কুটোর মতো ছুটতে লাগল, কখনও বা টলতে টলতে বেড়ার গায়ে হেলান দিয়ে তাকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল। মোটকথা গ্রামে সে একটা দারুণ হুলস্থূল কাণ্ড বাধিয়ে দিল, বাড়িতে বয়ে আনল অবর্ণনীয় উত্তেজনা

‘বৈচে আছে, বৈচে আছে আমাদের গ্রিশা বৈচে আছে’ দূর থেকেই ফৌপাতে ফৌপাতে চিৎকার করে সে বলল ‘পেত্রো লিখেছে! চোট লোগেছে গ্রিশার, মরে নি। বৈচে আছে, বৈচে আছে’

২০ সেপ্টেম্বর তারিখের চিঠিতে পেত্রো লিখেছে

### শ্রীচরণকমলেশু

বাবা ও মা এই পত্রে জানিবেন যে আমাদের গ্রিশ্কার প্রায় পঞ্চদ্বপ্রাপ্তি ঘটয়াছিল কিন্তু ভগবানের অসীম কৃপায় এক্ষণে সে জীবিত ও সুস্থ। পরম কবুণাময় প্রভুর নিকট আমরাও আপনাদের জন্য উহাই কামনা করি আপনাদের সকলের শারীরিক কুশল ও সুখ্যাতি কামনা করি কামেনকা-সুমিলোভো শহরের নিকটে গ্রিশ্কা-কাদের রেজিমেন্ট যুদ্ধ করিতেছিল, আক্রমণের সময় তাহার ট্রুপের কমান্ডার দেখিতে পায় এক হাজেরীয় হুজার সৈন্য তাহাকে তরবারির আঘাত করে, গ্রিশ্কা ঘোড়া হইতে পড়িয়া যায় অতঃপর আমরা আর কিছুই জানিতে পারি নাই, আমি বহু জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াও তাহাদের নিকট হইতে ইহার আধিক কিছু জানিতে পারি নাই কিন্তু পরে মিশকা কণ্ঠভয় কোন বিশেষ বার্তা লইয়া আমাদের রেজিমেন্টে উপস্থিত হইলে তাহার নিকট হইতে জানিতে পারি যে গ্রিগোরি ওই অবস্থায় রাত্রি পর্যন্ত পড়িয়া ছিল, রাত্রে জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে সে হামাগুড়ি দিয়া আগাইতে থাকে। আকাশের তারা দেখিয়া পথ চিনিয়া এইভাবে আগাইতে আগাইতে আমাদের এক আহত অফিসারের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। আহত অফিসারটি

ছিলেন ড্রাগুন বেজিমেন্টের এক লেফটেন্যান্ট-কর্ণেল। গোলায় তাহার পেট ও পা জখম হয় গ্রিগোরি তাহাকে পিঠে তুলিয়া লইয়া টানিতে টানিতে প্রায় দুই ক্রোশ পথ চলিয়া আসে। ইহার জন্য তাহার পুরস্কার মিলিয়াছে সেন্ট জর্জ ক্রস লাভ করিয়াছে, উপরন্তু পদোন্নতিও ঘটয়াছে - জুনিয়ার সার্জেন্টের পদ লাভ করিয়াছে গ্রিগো। ইহাই হইল বৃত্তান্ত। গ্রিগোর আঘাত তেমন গুরুতর নহে। শত্রুর তরবারির আঘাত তাহার মাথা ঘেঁষিয়া চলিয়া যায়, চামড়া ছড়িয়া গিয়াছে মাত্র ঘোড়া ইহাতে পড়িবার ফলে তাহার সংজ্ঞালোপ পাইয়াছিল গ্রিগো বলিয়াছে, সে ইতিমধ্যেই বাহিনীতে ফিরিয়াছে পত্রে কোন ত্রুটি ঘটিয়া থাকিলে মার্জনা করিবেন। জিনের উপর বসিয়া লিখিতে ইহঁতেছে, ডীফল দোঙ্গা লাগিতেছে।

পরের চিঠিতে নিজেনের বাগানের শুকনো চেরীফল চেয়ে পাঠিয়েছে পেরো, লিখেছে তাকে যেন ওরা ভুলে না যায়, আরও ঘন ঘন চিঠি লেখে। ওই চিঠিতেই সে গ্রিগোরির নামে অনুযোগ করেছে অন্য কসাকদের মুখে সে জানতে পেরেছে যে ঘোড়াটার ঠিকমতো দেখাশোনা করছে না গ্রিগোরি। পাটকিলেটা পেরোর নিজের ঘোড়া, তার প্রাণের চেয়েও প্রিয়। তাই সে তার হয়ে গ্রিগোরিকে এ বিষয়ে লেখার জন্য বাবাকে অনুৰোধ জানিয়েছে

‘কসাকদের মারফত আমি তাহাকে জানাইয়া দিয়াছি যে সে যদি নিজের সম্পত্তি জ্ঞান করিয়া ঘোড়াটার যত্ন না করে তাহা হইলে তাহাকে এক চোটে দেখিয়া লইব, এক খাবড়ায় তাহার বদন বিগড়াইয়া রক্ত বাহির করিয়া ছাড়িব সেন্ট জর্জ ক্রস পাইলেও কোন ছাড়াছাড়ি নাই,’ এই কথা লেখার পর এর ওর তার উদ্দেশ্যে অসংখ্য প্রণাম-স্নেহ-ভালোবাসা ইত্যাদির এক বিরাট পর্ব। এত সব সন্তোষ বৃষ্টির জলে ভেজা চিঠির খেবড়ানো অক্ষরগুলোর মধ্যে তিক্ত বেদনার নিঃশ্বাস স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায় বুঝতে বাকি থাকে না যে পলটনের চাকরি পেরোর কাছেও তেমন মধুর হয়ে দেখা দেয় নি

পাস্তেলের প্রকোফিয়েভিচ আনন্দে এমন তিড়িকিড়ি করতে লাগল যে তাকে দেখলেও মায়া হয় দু’খানা চিঠিই মুঠোয় নিয়ে গ্রামে ঘুরে বেড়াতে লাগল লেখাপড়া জানা কাউকে দেখতে পেলই তাকে ধরে পড়ে শোনাতে বলে আসলে নিজের জন্য নয়, দেরিতে যে আনন্দের সংবাদটা তার কাছে পৌছেছে তাই নিয়ে গ্রামের সকলের সামনে বুড়ো জাঁক করে বেড়াতে চায়

‘ই-ই, ডাব কী আমার গ্রিগোকে? অ্যা?’ চিঠির যে জায়গায় আহত লেফটেন্যান্ট-কর্ণেলকে পিঠে নিয়ে টানতে টানতে গ্রিগোরির দু’ক্রোশ পথ চলার

কীর্তির বর্ণনা পেত্রো দিয়েছে, পাঠক কঁকিয়ে কঁকিয়ে বানান করে পড়তে পড়তে সেখানে এসে পৌঁছুতেই ঘোড়ার খুরের মতো হাতের চেটোখানা খাড়া করে তুলে সে বলে

‘আমাদের এ গাঁয়ে ও ই প্রথম ক্রস পেল. সগর্বে এই কথা বলে ঈর্ষাভবে পাঠকের হাত থেকে চিঠিখানা ছৌঁ মেরে নিয়ে দলামোচড়া পাকানো টুপির ভাঁজে গুঁজে রাখে সে তারপর চলে আরেকজন লেখাপড়া জানা লোককে পাকড়াও করতে

স্বয়ং সের্গেই প্রাতোনভিচ তার দোকানের জানলা থেকে বুড়োকে দেখতে পেয়ে সম্মান জানিয়ে মাথার টুপি খুলে বেরিয়ে এলো খাতির করে বলল, ‘ভেতরে এসো হে প্রকোফিয়েভিচ।’

মাংসল সাদা হাতে বুড়োর হাত চেপে ধরে সে বলল, ধনি্য বলতে হয় তোমাকে। ধনি্য বলতে হয় দুম অমন ছেলের জন্যে গর্ব হওয়া উচিত, আর তোমরা কিনা ওর শ্রাদ্ধশাস্তি করে সারলে খবরের কাগজে পড়লাম ওর কীর্তিকাহিনী।’

‘কাগজেও লিখেছে নাকি? পাশ্বেলেই প্রকোফিয়েভিচের গলার ভেতবটা শুকিয়ে গেল একটা মিচুনি ঠেলে উঠল ভেতর থেকে।

‘হ্যাঁ খবরে লিখেছে পড়েছি, পড়েছি

সের্গেই প্রাতোনভিচ নিজের হাতে তাক থেকে সেরা তুর্কী তামাকের তিনটে কোয়ার্টার পাউণ্ড প্যাকেট পাড়ল, ওজন না করে একটা মোড়কের ভেতরে দামী দামী বেশ কিছু মিঠাই ঢালল জিনিসগুলো পাশ্বেলেই প্রকোফিয়েভিচের হাতে তুলে দিয়ে বলল, ‘গ্রিগোরি পাশ্বেলেভেভিচকে যখন পার্সেল পাঠাবে তখন আমার শূভেচ্ছা জানিও সেই সঙ্গে এই এগুলো পাঠিয়ে দিও।’

ওঃ ভগবান গ্রিগোর কী খাতির দেখ গোটা গাঁয়ের মুখে ওর নাম। এই দেখার জন্যেই না আমি বৈচে আছি। মোখভের দোকানের সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে আপন মনে ফিসফিস করে বুড়ো বলতে লাগল সে সম্বন্ধে নাক খাড়ল চোখের জল পড়ে গাল সুড়সুড় করছিল চাপকানের হাতা দিয়ে চেপে জল ধেকড়ে দিল, মনে মনে ডাবল ‘নির্ঘাত বুড়ো হয়ে যাচ্ছি একটুতেই চোখে জল এসে যায়। নাঃ পাশ্বেলেই প্রকোফিয়েভিচ এ কী হাল হয়েছে তোমার? এক সময় তুমি ছিলে পাথরের চাপড়ের মতো কঠিন, মহাজনী নৌকো থেকে আড়াইমণী বস্তা অনায়াসে পিঠে করে বয়ে নিয়ে যেতে আর এখন? গ্রিগোরটাই আমাকে একটু কাবু করে ফেলেছে।’

মিঠাইয়ের টোঙাটা বুকের কাছে চেপে ধরে ঝুড়িয়ে ঝুড়িয়ে রাস্তা দিয়ে চলতে থাকে পাশ্বেলেই প্রকোফিয়েভিচ চলতে চলতে বিলের মাথার ওপর

টিটিপাখির মতো আবার তার চিন্তা পাক খেতে লাগল গ্রিগোরিকে ঘিরে, তাব মনের মধ্যে ঘুরেফিরে আসতে থাকে পেন্সনের চিঠির কথাগুলো এই সময় দেখা হয়ে গেল বেয়াই কোবশুনভের সঙ্গে কোবশুনভই প্রথম ডাকল পাণ্ডুলেই প্রকোফিয়েভিচকে।

‘আরে বেয়াইমশাই যে! দাঁড়াও না একটু’

যুদ্ধ যে দিন থেকে ঘোষণা হয়েছে, তার পর থেকে ওদের মধ্যে আর দেখাপাশ্কা নেই। গ্রিগোরি বাড়ি ছাড়ার পর থেকে তাদের মধ্যে যে সম্পর্কটা দাঁড়িয়েছে সেটা শত্রুতার না হলেও এক ধরনের নিরুত্তাপ মন কষাকষির বলা যেতে পারে। নাতালিয়ার ওপর মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ চটে আছে, কেননা গ্রিগোরির কাছে নিজেকে সে ছোট করেছে, তার কাছে কৃপা ভিক্ষা করেছে, শুধু তাই নয়, মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচকেও সেই একই রকম অপমান সইতে বাধ্য করেছে

‘একটা হা-ঘরে কুকুর’ পারিবারিক মহলে নাতালিয়ার প্রসঙ্গ উঠলে গালাগাল দিয়ে সে বলে। কেন, বাপের বাড়িতে থাকলে কী দোষের হত শুনি? তা নয়ত, গেল সেই খশুরবাড়ি, সেখানকার অন্ন আরও বেশি মিষ্টি কিনা! বাপের নাম ডোবাল হারামজাদীটা, লজ্জায় লোকের সামনে মাথা কাটা যায়।’

বেয়াইয়ের কাছে ঘন হয়ে এগিয়ে এসে রোদে পোড়া ছিটে ছিটে হাতের পাঞ্জাটা নৌকোর মতো করে বাঁকিয়ে সামনে বাড়িয়ে দিল মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ

‘কী খবর বেয়াই?’

‘এই চলছে আর কি, ভগ্নবানের দগায়ে

‘কেনাকাটা করছিলে বুঝি?’

পাণ্ডুলেই প্রকোফিয়েভিচের ডান হাতটা খালি ছিল, সেই হাতটা উঁচু করে মাথা নাড়ল সে

‘এ হল ভাই আমাদের বীরের জন্যে উপহার আমাদের পরম উপকারী, দাতা সেগেই প্লাতোনভিচ খবরের কাগজে ওর বীরত্বের কথা পড়ে কিছু মিঠাই আর অল্পরী তামাক উপহার দিলেন। বললেন, ‘তোমাদের বীরপুরুষকে আমার শ্রুভেচ্ছা জানিও আর সেই সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়ে এই উপহারগুলো ভবিষ্যতেও সে যেন এই রকম সুখাতি পায়।’ এমন কি, জল এসে গিয়েছিল তাব চোখে, বুঝলে বেয়াই?’ উদ্ভাসিত গর্বের সঙ্গে পাণ্ডুলেই প্রকোফিয়েভিচ বলল তারপর বেয়াইয়ের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে তার কথাগুলো কী রকম ছাপ ফেলে বুঝতে চেষ্টা করল

বেয়াইয়ের চোখের সাদাটে পালকের তলায় আলোছায়ায় লুকোচুরি খেলতে লাগল, তাবই ফলে তার আনত চোখের হাসি হাসি দৃষ্টিতে ফুটে উঠল বিদ্রূপের ভাব।

‘আচ্ছা তাই নাকি?’ ঘোঁত ঘোঁত করে কথাগুলো বলে রাস্তার ওপাশের বেড়ার দিকে পা বাড়াল কোরশুনভ

রাগে থরথর করে কাঁপতে লাগল পাশ্বেলেই প্রকোফিয়েভিচের সর্বাঙ্গ কাঁপা কাঁপা আঙুলে মিঠাইয়ের মোড়কটা খুলতে খুলতে ব্যস্তসমস্ত হয়ে সে ছুটল কোরশুনভের পেছন পেছন

‘এই যে চেখেই দেখ না, মধু দেওয়া মিঠাই’ কৃত্রিম ভোবামোদের সুরে খোঁচা দিয়ে বলল সে ‘একটু চেখেই দেখ না দয়া করে, তোমার জামাইয়ের হয়ে না হয় আমিই বলছি জীবনটা ত তোমার এমন কিছু মধুব নয় ভাই। তা তুমি নিজেই হয়ত ভালো জান কে বলতে পারে তোমার ছেলে কোন কালে এমন সম্মান পাবে কিনা?’

‘আমার জীবন নিয়ে কোন কথা বলতে এসো না। আমি নিজেই তা ভালো জানি’

‘চেখেই দেখ না, চেখে আমাকে কৃত্তার্থ কর’ বেয়াইয়ের সামনে ছুটে এসে অতিমাত্রায় বিগলিত হয়ে মাথা নোয়াল পাশ্বেলেই প্রকোফিয়েভিচ। গটি গটি আঙুলগুলো দিয়ে পাতলা বুপোলি কাগজ ছাড়িয়ে মিঠাই বার করতে লাগল সে।

‘ওসব মিষ্টিটিষ্টি খাওয়া আমাদের অভ্যেস নেই’ বেয়াইয়ের হাতটা সরিয়ে দিয়ে মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ বলল ‘ওসব অভ্যেস নেই আমাদের অন্যেব দেওয়া মিষ্টি আমাদের মুখে রোচে না আর তোমাকেও বলি বেয়াই, ছেলের জন্যে দোরে দোরে ভিক্ষে করে বেড়ানো তোমার শোভা পায় না বাপু অভাব আছে তা আমার কাছে এলেই ত পারতে জামাইকে কি আমি দিতে পারতাম না? হাজার হোক, আমাদের নাতাশা তোমাদেরই অন্ন খাচ্ছে। তোমার এই দৈন্যদশায় আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারতাম’

‘আমাদের চৌদ্দপুরুষে কেউ কখনও ভিক্ষে মাগে নি। বাজে বোকো না। তোমার ওই কুদো মার্কী জিভ নাড়িয়ে আর কাজ নেই। বড় হামবড়াই তোমার। বড় বেশি হামবড়াই। তুমি এত বড়লোক যে তোমার মেয়ে আমাদের ঘরে চলে এসেছে - এজন্যেই কি তোমার এত জাঁক?’

‘দাঁড়াও’ মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ কর্তৃত্বের সুরে তাকে বলল ‘আমাদের ঝগড়াবিবাদ করার কোন কারণ আমি দেখি না আমি ঝগড়া করতে আসি নি, তাই বলি কি শান্ত হও বেয়াই। চল, একটু আলোচনা করা যাক, তোমার সঙ্গে কাজের কথা আছে’

‘কিসের আবার আলোচনা আমাদের?’

‘আছে, আছে, চলে এসো’

মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ বেয়াইয়ের চাপকানের হাতা ধরে টানতে টানতে একটা

ছোট গলির ভেতরে তাকে নিয়ে এলো। এ বাড়ির ও বাড়ির উঠোন পেরিয়ে তারা এসে পড়ল স্তম্ভের খোলা মাঠে।

‘কথাটা কী শুনছি না?’ রাগের ধাক্কাটা সামলে ওঠার পর প্রকৃতিস্থ হয়ে জিজ্ঞেস করল পাশ্বেলেই প্রকোফিয়েভিচ

কোরশুনভের ছুলিভরা সাদাটে মুখের দিকে সে আড় চোখে তাকাল কোরশুনভ তার ঝুল-কোঁটার লম্বা কিনারা গুটিয়ে উঁচু খালপারে বসে চারধারে ঝালর লাগানো তামাক রাখার একটি পুরনো বাঁটুয়া বার করল।

‘দেখ প্রকোফিচ, জানি না কেন, লড়িয়ে মোরগের মতো তুমি আমার দিকে ভেড়ে এলে। কিন্তু আত্মীয়-কুটুম্বের মধ্যে এটা ভালো নয়। ঠিক বলছি কিনা? আমি জানতে চাই’ বলতে বলতে তার কণ্ঠস্বর বদলে গেল। কঠিন ককেশ স্বরে সে শুরু করল, তোমার ছেলে আর কতদিন হাসির খোরাক করে রাখবে নাভালিয়াকে? বল দেখি আমাকে।’

‘আমার কাছ থেকে জানতে না চেয়ে তাকেই ববং জিজ্ঞেস কব না।’

‘তাকে জিজ্ঞেস করার কিছু নেই আমার। তুমি হলে বাড়ির কর্তা - তাই তোমাকেই জিজ্ঞেস করছি।’

কাগজ-ছাড়ানো মিঠাইটা তখনও পাশ্বেলেই প্রকোফিয়েভিচের মুঠোব মধ্যে ধরা শক্ত করে চেপে ধরতে ভেঙে গলে গিয়ে আঙুলের ফাঁক দিয়ে চটচটে রস গড়িয়ে পড়ল খালপারের বুঝবুঝে খয়েরি মাটির গায়ে হাতের চেটো মুছে নিয়ে সে নীরবে তামাক দিয়ে সিগারেট পাকাতে লাগল কোয়ার্টার পাউন্ডের একটা প্যাকেট থেকে এক ঘিমচে তুর্কী তামাক তুলে নিয়ে ভাঁজ করা কাগজের টুকরোটোর ওপর ছড়িয়ে নিষেব জন্য সিগারেট বানাল, তারপর প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিল বেয়াইয়ের দিকে মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ বিনা দ্বিধায় প্যাকেটটা নিল, মোশভের দরাজ উপহারের দৌলতে সেও একটা সিগারেট পাকাল। তারপর দু’জনেই সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগল ওদের মাথার ওপর ঝুলতে লাগল সাদা মেঘপুষ্পের স্তনভার মাকড়সার জালের একটা মিহি সুতো মাটি থেকে উঠে বাতাসে কাঁপতে কাঁপতে অভাবনীয় উঁচুতে ধেয়ে চলেছে সেই মেঘের দিকে।

দিন শেষ হয়ে আসছে। শরতের অবর্ণনীয় স্তব্ধতা - ঘুমপাড়ানি গানের মতো শান্ত, মধুর। অন্ধাশ ইতিমধ্যে গ্রীষ্মের খুশিতে উপছে পড়া উজ্জ্বলতা হারিয়ে ফেলেছে, ফিকে নীল হয়ে উঠছে খালের ওপরে কে জানে কোথা থেকে, আপেল গাছের রাশি রাশি পাতা উড়ে এসে গাঢ় জাল রঙ ছড়িয়ে দিয়েছে। পাহাড়ের ঢেউতোলা মাথার ওপারে রাস্তাটা শাখাপ্রশাখা মেলে হারিয়ে গেছে বৃথাই সে ইশারায় মানুষকে তার বুকে পা ফেলতে ডাকছে, টানছে দিগন্তের বুকে



মরকত রঙের ঘুম ঘুম আবছা এক সূক্ষ্ম বেখা ছাড়িয়ে, অচেনা-অজানা দেশে মানুষ তার ঘর আর প্রাত্যহিক জীবনের পাকে বাঁধা পড়ে খেটে হয়রান হচ্ছে, মাড়াই-উঠোনে শেখ করে দিচ্ছে শক্তি, এদিকে জনহীন ওই পথটা মানুষের পদচিহ্নের জন্য আকুল হয়ে চেয়ে আছে, দিগন্তের বুক চিরে বয়ে চলেছে অদৃশ্যালোকে তার বৃকে ধুলোর ঝড় তুলে পা ঠুকে বেড়ায় বাতাস।

‘তামাকটা নরম, একেবারে ঘাসের মতো, মুখ থেকে জমটি ধোঁয়াব মেঘ ছেড়ে মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ বলল।

‘নরম বটে তবে মিঠে,’ পাশ্বেলেই প্রকোফিয়েভিচ তার কথাটা মেনে নিয়েও বলল

‘আমার কথাটার জবাব দাও বেয়াই, সিগারেট নিভিয়ে এবারে শান্ত গলায় কোরশুনভ বলল।

‘গ্রিগোরি এ ব্যাপারে কিছু লেখে নি। এখন ত ও জখম হয়ে পড়ে আছে।

‘সে আমি শুনছি’

‘এর পর কী হবে জানি নে এর পর যদি সত্যি সত্যিই মারা যায়? তখন কী হবে?’

‘কিন্তু এমন ভাবে চলে কী করে বেয়াই?’ মিবোন গ্রিগোরিয়েভিচ হতবুদ্ধি হয়ে কন্ঠ ভাবে চোখ পিটপিট করে বলল ‘মেয়েটা কী হয়ে রইল - না কুমারী না সখা, না সত্যিকারের বিধবা। কী লজ্জার কথা যদি জানতাম এমন দশা হবে তাহলে কি আব ঘটকালী করার জন্য আমার বাড়িতে ঢুকতে দিতাম তোমাদের? এ বাড়ির চৌকট মাড়াতে দিতাম? ভেবেছ কী? ওঃ বেয়াই বেয়াই! নিজের নিজের সম্ভানের জন্যে সকলেই দুঃখ পায় রক্তের টান যে

‘কিন্তু আমি কী করতে পারি?’ ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড ক্রোধ চেপে বেখে পালটা আক্রমণ করল পাশ্বেলেই প্রকোফিয়েভিচ তুমি আমাকে বুঝিয়ে বলই না। তুমি কি ভেবেছ ছেলে ঘর ছেড়ে চলে গেছে বলে আমি খুশি? এতে আমার লাভটা কী বল ত? কী সব লোক তোমরা।’

‘তুমি ওকে লিখে দাও, চাপা কর্কশ সুরে মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ নির্দেশ দিল, কথার তালে তালে হাতের ফাঁক দিয়ে খয়েরি রঙের একটা ক্ষীণ জলশ্রোতের মতো খালের মধ্যে বুরবুর করে মাটি করে পড়তে লাগল শেষবারের মতো বলে দিক’

ওদিকে একটা বাচ্চাও হয়েছে যে

‘এদিকেও বাচ্চা হবে’ রাগে লাল হয়ে চিৎকার করে উঠল কোরশুনভ।

‘একটা জ্যান্ত মানুষের সঙ্গে এই রকম ব্যবহার? আঁ? একবার মরতে

গিয়েছিল, এখন খুঁত হয়ে রইল পায়ে মাড়িয়ে তাকে কবরে ঠেলে দিতে চাও ? অ্যাঁ ? আর মন ? মন বলে কি কিছুই নেই ওর ? ' বলতে বলতে মিরোন গ্রিগোরিয়োভিচের গল্যা বুজ্ঞে এলো এক হাতে নিজের বুক খামচাতে খামচাতে অন্য হাতে বেয়াইয়ের পোশাকের কিনারা ধরে টানতে টানতে ফিসফিস করে সে বলল ওর মনটা কি নেকডের মন ?'

পাশ্বেলেই প্রকোফিয়েভিচ ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছেড়ে মুখ ঘুরিয়ে নিল

' মেয়েটা গুর জনো শুকিয়ে মারা যাচ্ছে, স্বামীই তার একমাত্র ধ্যানজ্ঞান। তোমার বাড়িতে দাসীবাঁদির মতো দিন কাটাচ্ছে। '

'আমাদের কাছে আপন জনের চেয়েও বড় মুখ সামলে কথা বলবে ' পাশ্বেলেই প্রকোফিয়েভিচ চোঁচিয়ে উঠল তারপর জারিগা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

কোন বিদায়সম্ভাষণ না করেই যে যার পথে গেল

## আঠারো

জীবনের স্রোত তার স্বাভাবিক ঋতু ছেড়ে কূল ভেঙে অসংখ্য শাখা প্রশাখায় ছড়িয়ে পড়ে এই অবস্থায় কোন আঁকাবাঁকা চোরা ঋতে সে বইবে আগে থাকতে বলা কঠিন আজ যেখানে জীবনের ধারা চড়ার মাঝখানকার জলধারার মতো ক্ষীণ, অগভীর, এত অগভীর যে তার তলাকার বিশ্রী বালির স্তরটাও চোখে পড়ে, কাল সেখানে কানায় কানায় তরা তার অতুল বিভব।

একটা সিদ্ধান্ত একদিন হঠাৎই নাভালিয়ার মাথায় পাকাপাকি ঠেঁখে বসে গেল সে ঠিক করল ইয়াগদনোয়েতে আক্সিনিয়ার কাছে গিয়ে গ্রিগোরিকে ফিরিয়ে দেবার জন্য অনুনয়-বিনয় করবে তার কেন যেন মনে হয়েছিল যে সবটাই নির্ভর করছে আক্সিনিয়ার ওপর, সে যদি আক্সিনিয়াকে বলে করে বোঝাতে পারে তাহলে গ্রিগোরি আবার তার কাছে ফিরে আসবে, সেই সঙ্গে ফিরে আসবে তার আগেকার সুখ। এটা বাস্তবে সম্ভব কিনা, কিংবা তার এই অন্ধৃত প্রস্তাব আক্সিনিয়া কী ভাবে নেবে একবার সে ভেবেও দেখল না অসচেতন ইচ্ছার তাগিদে সে তার এই আকস্মিক সিদ্ধান্তকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাস্তবে রূপ দেবার জন্য অস্থির হয়ে উঠল। মাসেব শেষে মেলেকভরা গ্রিগোরির একখানা চিঠি পেল চিঠিতে মা-বাবাকে প্রণাম জানানোর পর নাভালিয়া মিরোনভনাকে সে তার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়েছে গ্রিগোরির একথা লেখার পেছনে কারণ অজ্ঞাত। কিন্তু কারণ যা-ই থাক না কেন নাভালিয়ার কাছে এটাই প্রেরণা হয়ে

দেখা দিল। এর পর প্রথমেই যে রবিবার পড়ল সেইদিনই সে ইয়াগদনোয়েতে যাবার জন্য তৈরি হল।

একটা আরশির ভাঙা টুকরোর সামনে বেশ মনোযোগ দিয়ে ঝুটিয়ে ঝুটিয়ে নাতালিয়া নিজের মুখ দেখছিল, তাই দেখে দুনিয়াশ্কা জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাবছ বৌদি?'

'যাই, আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে একটু দেখা করে আসি।' সে মিথো করে বলল সঙ্গে সঙ্গে যে দুঃসহ অপমানের বোঝা ও দুর্ভাগ্য নৈতিক পরীক্ষার ঝুঁকি সে নিতে চলেছে এই প্রথম তা উপলব্ধি করে সে লাল হয়ে উঠল।

'আচ্ছা নাতালিয়া তুমিও একবারও অন্তত আমার সঙ্গে সঙ্কেবেলা বেড়াতে যেতে পারিস,' গায়ের সাজগোজ ঠিকঠাক করতে করতে দাবিয়া ফলল। 'আজ যাবি সঙ্কেবেলা?'

'বলতে পারছি নে না বোধহয়।'

'তুমি যে একেবারে যোগিনী হয়ে গেলি রে! সোয়ামীরা যখন কাছে নেই তখনই ত আমাদের সময় ' দুটুমি করে চোখ টিপল দাবিয়া। তাবপর কোমল শরীরটাকে দু'ভাঁজ করে নুইয়ে পড়ে আরশির সামনে ফিকে নীল রঙের নতুন ঘাগরাটার কিনারার এশ্বর্যভারি ঝুটিয়ে ঝুটিয়ে দেখতে লাগল।

শেষে যাবার পর থেকে দাবিয়া একেবারে পালটে গেছে। স্বামীর অনুপস্থিতির যে প্রভাব তার ওপর পড়েছে সেটা লক্ষ করার মতো। তার চোখেমুখে, ভঙ্গিতে, চালচলনে ফুটে উঠছে কেমন যেন একটা অস্থিরতা। রবিবার-রবিবার সে বিশেষ যত্ন নিয়ে সাজগোজ করে সঙ্কের আড্ডা থেকে বেশ দেরি করে বাড়ি ফেরে। তার চোখের কোণে কালো ছায়া মেজাজ খারাপ নাতালিয়ার কাছে অভিযোগ করে বলে, 'কি বিছুছিবি ব্যাপার! মাইরি বলছি। ভালো ভালো মদ্যগুলোকে সব নিয়ে গেছে, গায়ে এখন থাকার মধ্যে আছে শুধু ছোট খোকারা আর বুড়ো হাণ্ডার দল।'

'তাতে তোমার কী যায় আসে?'

'কী যায় আসে মানে?' আশ্চর্য হয়ে সে বলে 'সঙ্কের আড্ডায় যে একটু কষ্টনিষ্ঠি করব এমন কেউ নেই অটাকলে যদি একলা ছাড়ত তাহলেও হত, কিন্তু স্বশুরকে কাটানোর কি কোন উপায় আছে?'

কোন রকম আড়াল-আবডাল না রেখে নির্লজ্জের মতো নাতালিয়াকে জিজ্ঞেস করে, 'মদ্য ছাড়া কী করে তুমি এতদিন আছিস বে ভাই?'

'লাজলজ্জার মাথা খেয়ে বসে আছি দেখছি।' গাঢ় লাল রঙের উচ্ছ্বাস খেলে যায় নাতালিয়ার মুখে।

‘তোমার কি ইচ্ছে হয় না?’

‘তোমার হয় বুঝি?’

‘হয় রে ভাই, হয়।’ বাকী ভুবুজোড়া কাঁপিয়ে হাসতে হাসতে গোলাপী হয়ে গিয়ে দারিয়া বলল। ‘লুকোতে যাব কোন দুঃখে? আমি ত সুযোগ পেলে কোন বুড়োকে ধরেই চিৎপটাং করে দিই মাইরি বলছি। একবার ভেবে দ্যাখ দেখি আজ দু’মাস হল পেত্রো নেই।’

‘তুমি কিন্তু নিজের বিপদ ভেঁকে আনছ দিদি।’

‘হয়েছে হয়েছে, আর সতীসাধবী ঠানদি সঙ্গে থাকতে হবে না। ওসব ভিজ়ে নেভালদের খুব জানা আছে মুখে স্বীকার করবি নে তাই বল।’

‘স্বীকার করাব কিছুই নেই আমার।’

দারিয়া রাগের জ্বালায় খুঁদে খুঁদে দাঁত দিয়ে ঠোট কামড়ে বিদ্রূপের দৃষ্টিতে টেরিয়ে তাকান নাভালিয়ার দিকে, তারপর বলতে শুরু করল

‘এই ত সেদিন যখন সন্দের আড্ডায় আমাদের গল্পগুজব চলছে সেই সময় মোডলের বোঁটা তিমোল্কা মানিংস্কেভ আমার পাশে এসে বসল বসে বসে গলগল করে ঘামছে বুকেতে পাবছি তয় পাচ্ছে শুরু করতে তারপর আস্তে করে হাতটা গলিয়ে দিল আমাব বগলের তলায়, এদিকে হাত কাঁপছে। আমি চুপচাপ সয়ে গেলাম, ভেতরে ভেতরে রাগে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলছে - আরে একটা ছোকরা হলেও না হয় বুঝতাম কিছু নাক টিপলে যে একেবারে দুখ গলে বছর হোলর বেশি হবে না দেখছি ত কেমন সব এসে জোটে। কোন কথা না বলে চুপচাপ বসে আছি, এদিকে আমাকে খাবলাতে খাবলাতে কিসকিস করে বলে কি, এসো না মাড়াই-উঠোনে যাই।’ তখন আমি দিলাম একটোট কোড়ে।’

দারিয়া খুশির চোটে হো হো করে হাসতে লাগল, তার ভুবুজোড়া কাঁপতে লাগল। কৌচকান চোখে খেলে গেল উজ্জল হাসির বিচ্ছুরণ

‘যা গালাগালটা দিলাম না। ভেড়েরুঁড়ে বললাম ‘তবে রে তুই অমুক, তুই তমুক এই সেদিনের দুখের বাচ্চা। কী করে তুই এমন কথা আমার বলতে পারলি? এত দূর আশ্পর্ষ্য তোমার! কবে বিছানা ভিজ়ানো ছেড়েছিস রে?’ এমন শুনিয়ে দিলাম না।’

নাভালিয়ার সঙ্গে এখন দারিয়ার সহজ বন্ধুত্বের সম্পর্ক দাঁড়িয়ে গেছে প্রথম প্রথম ছোট জায়ের ওপর যে বিরূপতা দারিয়া অনুভব করত সেটা এখন আর নেই। ওদের দু’জনের চরিত্র আলাদা ধরনের, দু’জনের মধ্যে কোন ব্যাপারে কোন মিল নেই, তবু দুই জায়ে দিবি মিলমিশ তাদের একসঙ্গে থাকার কোন ব্যাধা বইল না।

নাতালিয়া কামাকাপড় পরে ভেতরের ঘর থেকে বেরিয়ে এলো  
বাইরের বারান্দায় তাকে পাকড়াও করল দারিয়া।

‘আজ রাতেও দরজা খুলে দিবি ত?’

‘ভাবছি আজ বাপের বাড়িতেই রাত কাটাব।’

চিন্তিত ভাবে চিবুনিটা দিয়ে নাকের মাঝখানের খাঁজটা চুলকোতে চুলকোতে  
মাথা নাড়ল দারিয়া।

‘আজ্ঞা যা দুনিয়াশুঁকাকে বলার ঠিক হচ্ছে ছিল না - কিন্তু বলতেই হবে দেখছি।’

বাপের বাড়ি যাচ্ছে, শাশুড়িকে এই কথা বলে নাতালিয়া বাড়ি ছেড়ে রাস্তায়  
খামল বারোয়্যবিতলা দিয়ে বাজার ফেরত গাড়িগুলো যাচ্ছে, গির্জা থেকে  
লোকজন বাড়ির দিকে ফিরছে। নাতালিয়া দুটো গলি পেরিয়ে বাঁ দিকে মোড়  
নিল। তাড়াহাড়ি পাহাড়ে উঠতে লাগল গিরিপথে এসে পেছন দিয়ে তাকিয়ে  
দেখল নীচে রোদের বান ডেকেছে গ্রামের বুকে, চুনকাম করা ছোট ছোট  
বাড়িঘরগুলো সাদা ঝকঝক করছে, আটকলের গড়ানে ছাদের ওপর সূর্যের কিরণ  
ঠিকরে পড়ে সেখান থেকে ফুলকি ছুটছে, টিনের চালটা গলিত ধাতুর মতো  
চকচক করছে

## উনিশ

যুদ্ধ ইয়াগদুনোয়ে থেকেও মানুষজন উপড়ে নিয়ে গেছে ভেনুইয়ামিন ও  
তিখোন চলে গেছে তারা চলে যাবার পর জায়গাটা আরও নির্জন কিম্বদ্বারা  
আর নিরানন্দ হয়ে গেল ভেনুইয়ামিনের জায়গায় বুডো জেনারেলের কাজকর্ম  
এখন করতে হয় আক্সিনিয়াকে বিপুল নিতম্বিনী লুকেবিয়ার রোগা হওয়াব এতটুকু  
লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে না। রাস্তাঘরে বাসনমাজা কুটনো কাটার কাজ আর  
হাঁসমুরগীগুলোর দেখাশোনার ভার সেই নিয়েছে বুডো দাদু শাসকার আত্মবলের  
দায়িত্বের সঙ্গে এসে জুটল বাগানের পাহারাদারী নতুন লোক বলতে শুধু  
একজন - গুবুগস্তীর প্রকৃতির এক বুডো কসাক নিকিতিচ কোচোয়ানের কাজ  
করে সে।

এ বছর জেনারেল চাষের কাজ কমিয়ে দিল। মিলিটারির ঘটতি পূরণের  
জন্য প্রায় বিশটা ঘোড়া সে যোগান দিয়েছে রেখে দিয়েছে শুধু প্রজননের জন্য  
কিছু ভালো জাতের দুগন্ধি চালের ঘোড়া আর গেরস্থালির প্রয়োজনে তিনটে  
কাজের ঘোড়া। জমিদারবাবুটির এখন সময় কাটে শিকার করে নিকিতিচের সঙ্গে

ভিত্তির শিকারে বেবোয় কদাচিৎ যজ্ঞেই কুকুর নিয়ে নেকড়ে শিকারে বেরিয়ে  
পাড়ার সকলকে সচকিত করে তোলে।

খ্রিগোরির কাছ থেকে অগ্নিনিয়া মাঝেমধ্যে সংক্ষিপ্ত চিঠি পায চিঠিতে  
খ্রিগোরি জানায় এখন পর্যন্ত সে ভালোই আছে, কাজ করে যাচ্ছে মনের জোর  
ফিরে পাবার দরুন হোক অথবা চিঠিতে হয়ত সে তার দুর্বলতা প্রকাশ্য কবতে  
চায় না বলেই হোক, তার যে মন কেমন করছে, এখানে যে খুব খারাপ লাগছে  
এধরনের একটা কথাও সে কখনও লেখে না চিঠিগুলো সব উত্তাপহীন, যেন  
নেহাৎ লিখতে হয় বলেই লিখেছে। কেবল শেষ যে চিঠিটা লিখেছিল তাতে  
কেমন করে যেন বেরিয়ে গেছে এই কথাগুলো ' সর্বক্ষণ লড়াইয়ের মধ্যে  
আছি, লড়াই করতে করতে ঘেলা ধরে গেল মরণকে যেন নিজের ধলাতে করে  
বয়ে বেড়াচ্ছি ' প্রত্যেক চিঠিতে সে মেয়ের কথা জানতে চায়, তার সম্পর্কে  
লিখতে বলে 'আমার ছোট্ট তানিয়াটা কত বড় হয়েছে, দেখতে শুনতে কেমন  
হয়েছে লিখো ' সে দিন ওকে স্বপ্নে দেখলাম যেন অনেক বড় হয়ে গেছে,  
একটা জাল ট্রাক পরে আছে '

অগ্নিনিয়াকে দেখে মনে হয় বিচ্ছেদটা সে সাহসের সঙ্গেই সহ্য করছে।  
খ্রিশকার প্রতি সবটুকু প্রেম সে নিঃশেষে ঢেলে দিয়েছে তার মেয়ের ওপর  
বিশেষত মেয়েটা যে খ্রিশকারই, এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হওয়ার পর। যে বাস্তব  
প্রমাণ পাওয়া গেছে তা অকটি মেরেটার কালচে বাদামী রঙের চুল পড়ে গিয়ে  
নতুন চুল গজিয়েছে - কালো কুচকুচে, কোঁকড়া, চোখের বগুও পাল্টেছে, কালো  
হয়ে উঠছে চোখের মণি টানা টানা হচ্ছে চোখের ষাঁচ যত দিন যাচ্ছে বাপের  
সঙ্গে তার চেহারা মিল ততই আশ্চর্য বকম হয়ে দেখা দিচ্ছে। এমন কি হাসিটাও  
যেন খ্রিগোরির, মেলোখভদের হাসির হিংস্র-হিংস্র ভাব যেন তার ভেতর থেকে  
ফুটে বেরোচ্ছে - এখন অগ্নিনিয়া মেয়ের মধ্যে নিঃসন্দেহে মেয়ের বাপকে চিনতে  
পাবে ফলে মেয়ের ওপর তার টান আরও তীব্র হয়ে উঠেছে আগে অনেক  
সময় ঘুমন্ত শিশুর ছোট্ট মুখের আদলে স্বপ্নানের ঘৃণা জাগানো মুখের রেখার  
ক্ষীণতম কোন আভাস, অতি সামান্য কোন মিল দেখতে পেয়ে দোষনার কাছে  
আসতে গিয়ে সে যেমন অীতকে পিছে সরে যেত - এখন আর সে বকম হয় না।

চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে একেকটা দিন, প্রতিটি দিন অগ্নিনিয়ার মনের ভেতরে  
রেখে যাচ্ছে একটা ছালাধরা তালানির তিত্ত স্বাদ প্রিয়জনের জীবনের জন্য  
গভীর উৎকণ্ঠা তার মস্তিষ্কে চুঁচের মতো বিধতে থাকে, দিনের বেলায় সেই  
চিন্তার হাত থেকে তার রেহাই নেই, রাতেও হানা দেয় কিন্তু রাতে যখন হানা  
দেয় তখন প্রবল ইচ্ছাশক্তির চাপে এতক্ষণ মনের ভেতরে যা কিছু জমে ছিল,

বাঁধ ভাঙা জলের মতো তা বেরিয়ে পড়ে - সারা রাত, রাত যতক্ষণ শেষ না হচ্ছে ততক্ষণ অব্যাহত কানায় সে ছুটফুট করতে থাকে। চোখের জলে ভাসিয়ে দেয়। কানায় শব্দে পাছে বাচ্চার ঘুম ভেঙে যায় সেই ভয়ে নিজের হাত কামড়ায়। শারীরিক যত্ন দিচ্ছে মনসিক যত্ন থাকে চেপে রাখার চেষ্টা করে বাড়তি চোখের জল ঝরায়ে বাচ্চার কাঁথায় মুখ গুঁজে কাঁদতে কাঁদতে শিশুর মতো সরলতায় ডাবে, 'খিশ্কারই ত বাচ্চা, বাচ্চাটার ভেতর দিয়েই ও বুক ওর জন্যে আমার মনের কষ্ট।'

এই রকম রাত কটানোর পর সকালে সে যখন বিছানা ছেড়ে ওঠে তখন মনে হয় যেন মার খেয়ে তার সর্বাত্মক জর্জরিত। সারা শরীর ব্যথায় ভেঙে পড়ছে, কপালের দু'পাশের রং দপ্ দপ্ করছে যেন কোন ছোট্ট বুপোলি হাতুড়ির একটানা ঘা পড়ছে, যে বিকলিত স্বীত অধরে এক সময়ে কৈশোরের মধুরিমা প্রকাশ পেত তার কানায় এখন এসে পড়েছে পরিণত শোকের ছায়া। রাতের পর রাত শোকে দুঃখে জর্জরিত হয়ে বুড়িয়ে যেতে লাগল আন্নিয়া।

এক রবিবারে কর্তামশাইকে সকালের জলখাবার পরিবেশন করার পর আন্নিয়া যখন ঘর থেকে বেরিয়ে সদর দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে এমন সময় গেটের দিকে একটা মেয়েলোককে আসতে দেখল। মাথার সাদা ওড়নার নীচে চোখদুটো তার জ্বলজ্বল করছে, বড়ই পরিচিত সে চোখ, মেখে কেমন যেন ভয় লাগে। মেয়েলোকটি গেটের ছিটকিনি খুলে আঙিনায় ঢুকল। নাভালিয়াকে চিনতে পেরে মুখ ফেঁকাশে হয়ে গেল আন্নিয়ার, সে বীরে বীরে এগিয়ে গেল তার দিকে। উঠানের মাঝামাঝি এসে দাঁড়িয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ল। নাভালিয়ার পারের জুতোয় পুরু হয়ে জমেছে রাস্তার ধুলো। সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, তার বড় বড় কর্মঠ হাতদুটো প্রাণহীনের মতো দুলাতে লাগল দু'পাশে, ফৌস ফৌস করে নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে সে তার বিকৃত ঘাড়টা সোজা করার ব্যর্থ চেষ্টা করল, তার ফলে মনে হচ্ছিল সে বুঝি প্যাশের দিকে কোথাও তাকিয়ে আছে।

বাতাসে শুবিয়ে ওঠা চোঁটদুটো শুকনো জিভ দিয়ে চাটতে চাটতে সে বলল 'আমি তোমার কাছে এসেছি আন্নিয়া।'

আন্নিয়া দ্রুত পেছন ফিরে বাড়ির জানলাগুলোর ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। তারপর নিঃশব্দে চাকরদের মহলে নিজের ঘরের দিকে পা বাড়াল। নাভালিয়া চলল তার পেছন পেছন। আন্নিয়ার ঘাগরার বসখস আওয়াজ তার কানের ভেতরে কড়কড় করে বাজতে লাগল।

'হয়ত গরমেই কানের ভেতরে এরকম যত্ন হাচ্ছে, নানা চিন্তার রাশি ভেদ করে এই একটি চিন্তাই তখন তার মনে প্রকট হয়ে উঠল।'

নাভালিয়াকে ঘরে ঢুকতে দিয়ে ভেতর থেকে মরজা ভেজিয়ে দিল আন্নিয়া। মরজা ভেজিয়ে দিয়ে বুকের সামনে কোলানো সাদা কাপড়ের তলায় দু'হাত গুঁজে ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়াল শুরু করল সে-ই

‘কী জানো এসেছ?’ প্রায় ফিসফিস করে চাপা গলায় সে জিজ্ঞেস করল

‘একটু জল খেতে পারলে হত এই বলে নাভালিয়া তার ভারী চোখের অদম্য দুটি বুলাল ঘরের চারপাশে

আন্নিয়া অপেক্ষা করতে লাগল অতি কষ্টে কণ্ঠস্ব চড়িয়ে নাভালিয়া বলতে শুরু করল ‘তুমি আমার স্বামীকে কেড়ে নিয়েছ। ফিরিয়ে দাও আমার গ্রিগোরিকে। তুমি তুমিই আমার জীবনটাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছ দেখতে পাচ্ছ, আমাব কী হাল হয়েছে

‘স্বামী ফিরিয়ে দেব তোমাকে?’ আন্নিয়া দাঁতে দাঁত ঘসল, পাথরের গায়ে টুপটাপ বৃষ্টির ফোঁটার মতো করে করে পড়তে লাগল তার শ্যানিত কথাগুলো ‘স্বামী ফিরিয়ে দেব তোমাকে? কার কাছে এসেছ তুমি আর্জি জানাতে? কেন এসেছ? বড্ড দেরি করে চাইতে এসেছ ভাবতে শুরু করেছে বড্ড দেরিতে।’

আন্নিয়া সর্বাঙ্গ দুলিয়ে নাভালিয়ার কাছে ঘেঁষে এলো, জ্বালা-খরা হাসি হাসল। ব্যক্ত করে তাকাল শত্রুর মুখের দিকে। এই ত সামনে দাঁড়িয়ে আছে গ্রিগোরির বিয়ে করা বৌ, যাকে গ্রিগোরি ত্যাগ করেছে - শোকে দুঃখে নিষ্পেষিত, লালিত অপমানিত এই সেই নারী যার দৌলতে গ্রিগোরির সঙ্গে তার বিচ্ছেদ ঘটায় একদিন চোখের জলে ডাসতে হয়েছিল আন্নিয়াকে, বুকে বয়ে নিয়ে বেড়াতে হয়েছিল রক্তাক্ত বেদনা। আর আন্নিয়া যখন মর্মান্তিক বিরহবেদনায় আকুল তখন এই নারীই গ্রিগোরিকে আদর করছিল। সে যে এক অভাগা প্রণয়িনী, প্রেমাস্পদ যে তাকে ছেড়ে চলে গেছে এই কথা ভেবে সম্ভবত মনে মনে হেসেছিল

‘ওকে যেন আমি ছেড়ে দিই এই আবদার জানাতে এসেছ তুমি?’ আন্নিয়া হাঁপাতে হাঁপাতে বলল ওরে তুই কালসাপিনী। তুই প্রথমে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিলি গ্রিগোকে আমি নই, কেড়ে নিয়েছিলি তুই তুই জানতিস গ্রিগো আমার সঙ্গে থাকে, তাহলে বিয়ে করতে গিয়েছিলি কেন? আমি আমার জিনিস ফিরিয়ে এনেছি ও আমার। ওরই বাচ্চা হয়েছে আমার পেটে, আর তুই

প্রচণ্ড ঝগড়ায় সে নাভালিয়ার চোখে চোখ রেখে তাকাল, তারপর যে কথাগুলো এতক্ষণ তার মনের ভেতরে টগবগ করে ফুটছিল এলোমেলো ভাবে দু'হাত নেড়ে তার স্রোত ঢালতে লাগল সে



‘খ্রিশ্চা আমার! কাউকে দেব না আমি। আমার! আমার! শুনছ? আমার! ভাগ এখান থেকে, বেহায়া কুস্তী, তুমি ওর বৌ নও তুমি বাচ্চার বাপকে কেড়ে নিতে এসেছ? আহ! আগে আস নি কেন? বলি, আগে কোণায় ছিলে, আ? ’

কাত হয়ে বেকির দিকে এগিয়ে গিয়ে নাতালিয়া বসে পড়ল, মাথা নীচু করে দু’হাতে মুখ ঢাকল

‘তুমি নিজেব স্বামীকে ছেড়ে এসেছ অমন জোর গলায় কথা বলতে এসো না

‘খ্রিশ্চা ছাড়া আমার কোন স্বামী নেই। কেউ নেই আমার সারা দুনিয়ার ’

মনের মধ্যে যে প্রচণ্ড বাগ জমে উঠছে তা প্রকাশের পথ না পেয়ে ভেতরে গুমরে মরছে উপলব্ধি করে নাতালিয়ার মাথার ওড়নার তলা থেকে যে সোজা কালো চুলের গোছা তার হাতের ওপর এসে পড়েছে সেদিকে তাকিয়ে বইল আন্নিয়া

‘তোমাকে নিতে ওর বয়ে গেছে নিজের ঘাড়ের দিকে চেয়ে দেখ একবার ঘাড় ত তোমার বাঁকা। তুমি ভাবছ ও তোমাতে মজবে? তুমি যখন সুস্থ ছিলে তখনই তোমাকে ছেড়ে চলে গেছে, আর এখন কিনা এই চেহারা দেখিয়ে তুমি ওকে পটাবে? খ্রিশ্চার আশা ছেড়ে দাও এই হল আমার সাফ কথা। ভাগ এখন ’

নিজের নীড় বাঁচাতে গিয়ে আন্নিয়া ভয়ঙ্করী মূর্তি ধারণ করেছে, আগে যে দুঃখ তাকে ভোগ করতে হয়েছে তারই প্রতিশোধ হিসেবে সে আঘাত হানল সে দেখল ঘাড় একটুখানি বাঁকা হলে কী হবে নাতালিয়া এখনও আগের মতোই সুন্দরী আছে তার গাল আর ঠোঁট এখনও তাজা, সময়ের ছোঁয়াচ লাগে নি এদিকে আন্নিয়ার নিজের কী হাল হয়েছে? সময়ের আগেই চোখের নীচে মাকড়সার জালের মতো সূক্ষ্ম বলিরেখা পড়তে শুরু করেছে এসব কি নাতালিয়ার দোষেই নয়?

যন্ত্রণাকাতর উদ্বাস্ত চোখ তুলে আন্নিয়ার দিকে চেয়ে নাতালিয়া বলল, ‘তুমি কি ভাবছ আমি চাইলেই তুমি আমাকে ফিরিয়ে দেবে সে আশা আমার ছিল?’

তাহলে এলে কেন? আন্নিয়া এক নিঃশ্বাসে জিজ্ঞেস কবল।

‘মনটা আকুলিবিকুলি করে, তাই!’

ওদের কথাবার্তার শব্দে আন্নিয়ার মেরে জেগে উঠল, খাটের মধ্যে শুয়ে শুয়ে মাথা তুলে কাঁদতে লাগল। বাচ্চাকে কোলে তুলে নিয়ে জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে ঘুরে বসল আন্নিয়া। নাতালিয়ার সর্বাস্থ ধরধর করে কাঁপতে লাগল, বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে রইল সে একটা শুকনো হিঙা তার কঠনালী চেপে ধবল শিশুর মুখ থেকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে

গ্রিগোরির চোখজোড়া, যেন কিছু একটা বোঝার চেষ্টা করছে। নাতালিয়া ধূসিয়ে কান্ডিতে কান্ডিতে টলতে টলতে বেরিয়ে এলো বাইরের সিঁড়ির ধাপে। আন্সিনিয়া তাকে এগিয়ে দেওয়ার কোন চেষ্টা কবল না।

মিনিটখানেক বাদে সাশকা বুড়ো এসে হাজির হল। ব্যাপারটা বোধহয় আন্দাজ করতে পেরেই সে জিজ্ঞেস করল কে ওই মেয়েলোকটা?

‘ওই, আমাদের গাঁয়ের একজন।’

লিভনিখ্বিদের জমিদারী ছেড়ে ক্রোশখানেক দূরে যাবার পর নাতালিয়া একটা কটাঝোপের নীচে শুয়ে পড়ল। কী এক অবর্ণনীয় আকুলতায় তার মন পিষে গুড়িয়ে যাচ্ছিল উদাস মনে সে শুয়ে রইল তার চোখের সামনে একই ভাবে ভাসতে লাগল দুলতে লাগল শিশুর মুখের ওপর কেটে বসানো গ্রিগোরির বিষাদমাখা কালো চোখদুটো।

## বিশ

সেদিনকার সেই রাতটা গ্রিগোরির বেশ মনে পড়ে এতই চোখ-ধাঁধানো উজ্জ্বল যে যন্ত্রণা ধরিয়ে দেয় ভোরের আগে আগে তার জ্ঞান ফিরে এলো। মাটি হাতড়াতে গেল - কাটা ফসলের খোঁচা খোঁচা গোড়া হাতে এসে বিধল। মাথার ভেতরটা দপদপ করছে, একটা অসহ্য জ্বালায় ছেয়ে আছে যন্ত্রণায় সে আতর্জনাদ কবে উঠল অতিকষ্টে গ্রিগোরি হাত উঁচু করল কপালে ঠেকাতে অনুভব করল মাথার সামনের চুলের গোছা বাসী রক্ত শুকিয়ে জমাট বেঁধে চড়চড় করছে। ছড়ে যাওয়া তুলতুলে জায়গাটা আঙুল দিয়ে টুয়ে দেখল যেন জ্বলন্ত অঙ্গারের ছাঁকা লাগল শেষকালে চিত হয়ে শুয়ে পড়ে এক নাগাড়ে দাঁতে দাঁত ঘসতে লাগল। অসময়ে হিম পড়ে তার মাথার ওপরকাব গাছের পাতাগুলো জমে গেছে, সেখান থেকে কাচের মতো টুংটাং করে বাজছে ব্যাকুল মর্মরধ্বনি। গাঢ় নীল আকাশের পটভূমিকায় স্পষ্ট হয়ে আছে ডালপালার কালো রেখা, তাদের ফাঁকে ফাঁকে ছলছল করছে তারাগুলো। গ্রিগোরি তার বিক্ষণবিত চোখের অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল তার মনে হতে লাগল গুলো যেন তারা নয় বৃষ্টি বা কালো কালো পাতার গায়ে ডালে ডালে ঝুলছে অস্বুত সব নীলচে-হলুদ রঙের টসটস ফল

কী ঘটেছে সেটা উপলব্ধি করার পর, যে অনিবার্য বিপদ ঘনিয়ে আসছে সে সম্পর্কে সচেতন হয়ে দাঁতে দাঁত ঘসতে ঘসতে চার হাত পায়ে ডর দিয়ে গ্রিগোরি এগোতে লাগল যন্ত্রণা তার সঙ্গে রসিকতা শুরু করে দিল তাকে ফেলে

দিতে লাগল, মুখ খুঁড়ে পড়ে যেতে লাগল সে মনে হচ্ছিল অনন্তকাল যেন সে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চলেছে অনেক কষ্টে, নিজের ওপর জোর খাটিয়ে সে পেছন ফিরে তাকাল যে গাছের তলায় সে জ্ঞান হারিয়ে নিখর হয়ে পড়ে ছিল মাত্র হাত পঁচিশেক শেছনে তার কালো রেখা চোখে পড়ছে। একবার এক মড়ার ঘাড়ে গিয়ে পড়ল মড়ার গর্ভে ঢোকা স্তম্ভ পেটের ওপর কনুইয়ের ভর দিতে হল অতিরিক্ত রক্তক্ষয়ের ফলে তার গা বমি বমি করতে লাগল, বাচ্চা ছেলের মতো সে কঁদতে শুরু করল, সংজ্ঞা যাতে লোপ না পায় তার জন্য শিশিরে ভেজা তাজা ঘাস চিবুতে লাগল। একটা গোলাঝরুন রাখার ওল্টানো পেটির কাছে আসার পর উঠে দাঁড়াল, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টলতে লাগল, তারপর হাঁটা দিল। তার গায়ে বল ফিরে এলো। দৃঢ় পদক্ষেপে এগোতে লাগল সে পূর্ব দিক বোঝার মতো ক্ষমতা এখন তার হয়েছে। সপ্তর্ষিমণ্ডল তাকে পথ দেখাল

বনের ধারে এসে একটা কর্কশ চাপা ঝুঁশিয়ারী শূনে তাকে থমকে দাঁড়াতে হল

‘আর এক পাও এগিয়ো না, গুলি করব।’

খুঁট করে আওয়াজ হল রিভলভারের ড্রামের। শব্দটা যেদিক থেকে এলো সেদিকে ঠাণ্ডা করে দেখল গ্রিগোরি দেবদারু গাছের গায়ে একটা কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে আধা শোওয়া অবস্থায় পড়ে আছে একজন লোক

‘কে তুমি?’ গ্রিগোরি জিজ্ঞেস করল। নিজের কণ্ঠস্বর তার নিজের কানেই অন্যের কণ্ঠস্বরের মতো শোনাল।

‘বুলী? ওঃ ভগবান! এদিকে এসো।’ গাছের গায়ে হেলান দেওয়া লোকটা এবারে ধপ করে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল।

গ্রিগোরি এগিয়ে এলো

‘একটু ঝুঁকে পড়,’ লোকটা বলল

‘পারছি নে।’

‘কেন?’

‘পড়ে যাব, একবার পড়ে গেলে আর উঠে দাঁড়াতে পারব না মাথায় চোট লেগেছে।’

‘তুমি কোন ইউনিটের?’

‘বারো নম্বর দন রেজিমেন্টের।’

‘আমাকে একটু সাহায্য কর, কসাক

পড়ে যাব হুজুর,’ (লোকটার গ্রেটকোটের ওপরে অফিসারের পদমর্যাদাসূচক কাঁধপাতি ততক্ষণে গ্রিগোরির নজরে পড়েছে)।

‘হাতটা অস্ত্রত বাড়িয়ে দাও ত।’

গ্রিগোরি অফিসারকে উঠতে সাহায্য করল ওরা দু’জনে চলতে লাগল কিন্তু প্রতি পদক্ষেপে আহত অফিসারটি বেশি করে ভার দিতে লাগল গ্রিগোরির হাতের ওপর। একটা নাবাল জায়গা থেকে ওপরে ওঠার সময় গ্রিগোরির কৌজী শার্টের হাতা খণ্ড করে চেপে ধরে অল্প অল্প দাঁতে দাঁত ঠকঠক করতে করতে সে বলল

‘আমাকে ছেড়ে দাও কসাক। আমার চোট লেগেছে পেটে  
এফৌড় ওফৌড় হয়ে গেছে পেটটা

পাশনে চশমার নীচে তার চোখদুটো আরও স্বাপসা হয়ে গেল, ঘড়ঘড় আওয়াজ তুলে সে খাবি খেতে লাগল অফিসার সংজ্ঞা হারাল। গ্রিগোরি তখন তাকে ঘাড়ের টেনে নিয়ে চলল চলতে চলতে পড়ে যায় আবার ওঠে, আবার পড়ে দু’বার সে তার ঘাড়ের বোঝা ফেলে দিয়েছিল কিন্তু দু’বারই ফিরে এসে আবার টেনে নিল, চলতে লাগল যেন নিশির ডাকে সাড়া দিয়ে

বেলা এগারোটার সময় সিগন্যালম্যানদের একটা দল ওদের দেখতে পেয়ে তুলে নিয়ে ড্রেসিং স্টেশনে পাঠিয়ে দিল

এক দিন বাদে গ্রিগোরি কাউকে না জানিয়ে চুপি চুপি সেখান থেকে পালাল। পথের মাঝখানেই মাথার ব্যাণ্ডেজ খুলে ফেলল স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে লাল টকটকে রক্তের ছোপখরা ব্যাণ্ডেজটা দোলাতে দোলাতে রাস্তা ধরে চলল

‘আরে তুমি কোথেকে ?’ স্কোয়াড্রন-কমান্ডার থ মেরে গিয়ে জিজ্ঞেস করল

‘কাজে ফিরে এলাম হুজুর।’

স্কোয়াড্রন-কমান্ডারের সঙ্গে দেখা করে বেরিয়ে আসার পর দেখা হয়ে গেল দুপ-সার্জেন্টের সঙ্গে।

‘আমার ঘোড়া আমার পাটকিলেটা কোথায় ?’

ওটা বহাল তবয়িতে আছে ভাই, গায়ে এতটুকু আঁচড় পড়ে নি। অস্ত্রিয়ানগুলোকে বিদেয় করে দেবার ঠিক পরে ওখানেই আমরা ওকে ধরি তা তোমার খবর কী হে ? আমরা ও ইতিমধ্যে তোমার আত্মার সদগতির জন্য প্রার্থনা সেরে ফেলেছি ’

‘অত তাড়াতাড়ির কোন দরকার ছিল না,’ বৌকা হাসি হেসে বলল গ্রিগোরি

## হুকুমনারার অনুলিপি

নয় নম্বর ড্রাগুন রেজিমেন্টের কম্যান্ডার কর্ণেল গুস্তাভ গ্রাসবার্গের  
প্রাণ রক্ষা করিবার পুরস্কারস্বরূপ বারো নম্বর দল কসাক রেজিমেন্টের  
গ্রিগোরি মেনেলখভকে কর্পরাল পদে উন্নীত করা হইল এবং চতুর্থ  
শ্রেণীর সেন্ট জর্জ ক্রসের নিমিত্ত তাহার নাম সুপারিস করা  
হইল।

ওদের রেজিমেন্টটা দু'দিনের জন্য কামেনকা-জুমিলোভো শহরে থেমেছিল,  
সেই দিন রাতে তাদের বেরিয়ে যাবার কথা গ্রিগোরি তার নিজের টুপেব  
কসাকদেব আস্তানা খুঁজে বার করল, তারপর দেখতে গেল তার ঘোড়াটা কেমন আছে

জিনের ধলের ভেতরে কিছু জামাকাপড় একটা গামছা ছিল সেগুলো পাওয়া  
গেল না।

মিশ্কা কশেভয় ঘোড়াটার দায়িত্বে ছিল, তাই সে কাচুমাচু হয়ে কৈকিয়তের  
সুরে বলল, 'চোখের সামনে চুরি হয়ে গেল গ্রিগোরি। একগাদা পায়দল সেপাইকে  
এই উঠানে ঢেকানো হয়েছিল কত যে ছিল তার কোন লেখাজোখা নেই  
ওরাই চুরি করেছে।'

'মবুক গে, কারও কাজে লাগলে নিক গে আমার এখন দরকার হল মাথাটা  
ব্যাণ্ডেজ করা এই ব্যাণ্ডেজটা ভিক্ষে গেছে।'

'আমার গামছাটা নে।'

চালার নীচে যেখানে দাঁড়িয়ে ওরা দু'জনে কথাবার্তা বলছিল এমন সময়  
সেখানে এসে হাজির হল ঝুটিওয়ালা উরিউপিন। গ্রিগোরির দিকে সে হাত বাড়িয়ে  
দিল এমন ভাবে হাতখানা বাড়িয়ে দিল যেন ওদের মধ্যে কন্সিনকালে কোন  
গুণ্ডগোলা হয় নি

'আরে মেনেলখভ যে এখনও বেঁচে আছ তাহলে বুলেট?'

এই কোনরকম আর কি।'

কপালে রক্ত দেখছি, মুছে ফেল

'মুছব খন। তাড়া নেই।'

'দেখি, দেখি একবার কেমন বসিয়েছে।'

ঝুটিওয়ালা জোর করে গ্রিগোরির মাথাটা নীচু করে দেখে নাক সিটকে বলল,  
'মাথার চুলগুলো এমন ছোট্টে ফেলতে দিলে কী বলে? ইশ্ দেখ দেখি চেহারাখানা

কী বদখত বানিয়ে দিয়েছে। ডাক্তারগুলো তোমার বারোটা বাজিয়ে ছাড়বে দেখছি। দাঁড়াও আমি সারিয়ে দিচ্ছি।’

খ্রিগোরির সম্মতির কোন অপেক্ষা না করেই গুলির থলে থেকে সে একটা টোটো বার করলে, টোটো থলে ভেতরকার বাবুদ তার কালো হাতের তেলোর ওপর ঢালল।

‘খানিকটা মাকড়সার জাল যোগাড় করে আন ত মিশা।’

তলোয়ারের ডগা দিয়ে চালার এক কোনার কাঠের ঝুড়ির খাঁজের ভেতর থেকে হালকা তুলোর মতো খানিকটা মাকড়সার জাল বার করে দিল কশেভয়। সেই তলোয়ারের ধারাল ডগাটা দিয়েই ঝুটিওয়ালা মেঝে থেকে সামান্য এক ডেলা মাটি ঝুটিয়ে বার করল, মাটির ডেলাটা মাকড়সার জাল আর বাবুদের সঙ্গে মিশিয়ে মুখে দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে চিবুল, কাদা কাদা ঘন প্রলেপটা পুঁচু করে খ্রিগোরির মাথার রক্তাক্ত ঘায়ের ওপর লাগিয়ে দিল, তারপর হেসে বলল

‘তিনদিনের মধ্যে বিলকুল সেরে যাবে দেখলে ত তোমার কেমন সেবায়ত্ন করছি, আর তুমি কিনা আমাকে গুলি করে মারতে গিয়েছিলে।’

‘সেবাবত্তের জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ তবে তোমাকে খুন করতে পারলে আমার একটা পাপের বোঝা হালকা হত।’

‘তুমি বড় সাদাসিধে ছোকরা হে।’

‘কী আর করা যাবে? যেমন জন্মেছি কেমন দেখলে আমার মাথাটা?’

‘বিঘৎখানেক লম্বা হয়ে কেটে গেছে একটা শ্বত্ভিচিক রয়ে গেল তোমার।’

‘ভুলব না।’

‘চাইলেও ভুলতে পারবে না অস্ট্রিয়ানরা তলোয়ারে শান দেয় না ভেঁততা তলোয়ার দিয়ে ঝেড়েছে। এখন সারা জন্মের মতো ফুলোফুলো কাটা দাগ থেকে যাবে।’

‘তোমার ভাগ্যি ডালো বলতে হবে খ্রিগোরি যে তেরহা ভাবে পিছলে বেরিয়ে গেছে, নইলে ভিনদেশে তোকে কবর দিতে হত,’ কশেভয় হাসল

খ্রিগোরি হতভম্ব হয়ে তার মাথার টুপি হাতে করে ঘোরাতে ঘোরাতে বলল, ‘এখন আমি আমার টুপি দিয়ে কী করব?’

টুপির মাথাটা রক্তে মাখামাখি, কেটে ফাঁক হয়ে গেছে

‘ফেলে দে, কুকুরে খাক।’

‘ওহে, ছেলেরা, খ্যাঁট এসে গেছে, শিগগির চলে এসো।’ পরজার বাইরে থেকে কে যেন চোঁচিয়ে বলল

কসাকরা চালা ছেড়ে বেরিয়ে এলো খ্রিগোরিকে বেরিয়ে যেতে দেখে চোখ উল্টে তার দিকে টেরিয়ে তাকিয়ে টিহিহি করে ডেকে উঠল তার ঘোড়াটা।

‘তোমার জন্যে বাক্স মনমরা হয়ে ছিল রে গ্রিগোরি।’ ঘোড়াটার নিকে ঘাড় নেড়ে ইঙ্গিত করল কশেভর ‘আমি ত অবাঁক। দানাপানি কিছু খায় না। থেকে থেকে কেবল আস্তে আস্তে টিহি টিহি ডাক ছাড়ে।’

ওখান থেকে বেবিয়ে আসার সময় কতবার যে ওকে ডেকেছি।’ মুখ ঘুরিয়ে ভারী গলায় সে বলল। ‘ভেবেছিলাম, আমাকে ছেড়ে যাবে না তাছাড়া ওকে ধরাও কঠিন, অচেনা লোকের বশ মানে না ও।’

‘ঠিকই তাই, অনেক কষ্টে, জোর খাটিয়ে ধরতে হয়েছে ফাঁস ছুঁড়ে আমরা ওকে ধরেছি।’

‘ঘোড়াটা বড় ভালো। আমার দাদা পেত্রোর ঘোড়া,’ চোখের জল লুকোবার জন্য গ্রিগোরি মুখ ঘোরাল।

ওরা বাড়ির ভেতরে ঢুকল। সামনের ঘরে খাট থেকে স্প্রিংয়ের গদি তুলে মেঝেয় পেতে তার ওপর শূয়ে নাক ডাকাচ্ছিল ইয়েগোর জারুকোভ। ঘরদোবের বিশৃঙ্খলা অকণীয়া বাড়ির মালিক যে তাড়াতাড়ি করে বাড়ি ছেড়ে গেছে এ যেন তারই নীরব সাক্ষ্য দিচ্ছে। ভাঙা বাসনকোসনের টুকরো, ছেঁড়া কাগজ আর বইশুণি, মধুতে মাখামাখি বনাত কাপড়ের কিছু টুকরো, ব্যাজাদের খেলনাপাতি, পুরনো জুতো, ছড়ানো ময়দা—সব উৎকট রকম এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে আছে মেঝের ওপর ধ্বংসের এক সোচ্চার প্রকাশ।

এরই মধ্যে খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করে নিয়ে সেখানে বসে থাকছিল ইয়েমেলিয়ান গ্রোশেভ আর প্রোখর জিকভ গ্রিগোরিকে সেখা প্রোখরের বাছুরের মতো বড় বড় কোমল চোখদুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে এলো

‘গ্রি-ই-শ্কা। তুই কোথেকে রে?’

‘যমের বাড়ি থেকে।’

‘দৌড়ে যাও ত, ওর জন্যে বাঁধাকপি আর মাংসের ঝোল নিয়ে এসো। অমন চোখ কপালে তোলার কী আছে?’ ঝুটিওয়ালা থৈকিয়ে উঠল

‘এক্ষুনি রান্নার জায়গা ত এই এখানে, গলিটার মধ্যেই।’

মুখের খাবারের টুকরো চিবোতে চিবোতেই প্রোখর এক ছুটে উঠোনে বেরিয়ে গেল।

প্রোখরের ছেড়ে যাওয়া জায়গায় ক্লান্ত ভাবে বসে পড়ল গ্রিগোরি।

‘কখন যে শেষ হয়েছিলাম মনে নেই,’ কাচুমাচু হয়ে হেসে বলল সে

শহরের ওপর দিয়ে এগিয়ে চলেছে তিন নম্বর কোর-এর ইউনিটগুলো। সঙ্গীরা রাস্তাঘাট পদাতিক সৈন্যদলে বোঝাই, অসংখ্য সরবরাহগাড়ির সারি আর ঘোড়সওয়ার ইউনিটের ভিড়ে উপছে পড়ছে। চৌরাস্তার মোড়ে মোড়ে গাড়িঘোড়া গান্ধগান্ধি

হয়ে জট পাকিয়ে আছে, বন্ধ দরজা ভেদ করে বাড়ির ভেতরে এসে ঢুকছে গাড়িঘোড়া চলাচলের কোলাহল। শিগগিরই এক বাটি বীধাকপি আর মাংসের ঝোল আর ঠোঙায় করে খানিকটা জাউ নিয়ে এসে হাজির হল প্রোখর।

‘জাউটা কোথায় ঢালব?’

জানলার তাকে একটা বাসন দেখাতে পেয়ে জিনিসটা আসলে কী কাজে লাগে না জেনেশুনেই টেনে নিয়ে জোশেভ বলল, এই যে এখানে একটা হাতলওয়ালা পাত্তর আছে।’

‘বিচ্ছিন্ন গন্ধ বেরোচ্ছে তোমার ওই পাত্তর থেকে।’ প্রোখর নাক সিটকাল

‘ও কিছু নয়, এতেই চুড়োচুড়ি করে ঢাল ত, পরে বোঝা যাবে।’

প্রোখর ঠোঙাটা উপুড় করে দিল। চমৎকার ঘন জাউ থেকে ধোঁয়া উঠতে লাগল, পাত্রের চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল ঘিয়ে হলুদ রঙের গলা মাখন ওরা গল্পগুজব করতে করতে যেতে লাগল। প্যাণ্টের পাশের রঙ-ওঠা লাল ডোরার ওপর চর্বির ফোঁটা পড়েছিল, খুতু দিয়ে জায়গাটা চেটে নিয়ে প্রোখর বলতে লাগল

‘এখানে আমাদের পাশের উঠোনেই পাহাড়ী ঘোড়সওয়ার ব্যাটেলিয়নের একটা ব্যাটারী আস্তানা নিয়েছে, ওদের ঘোড়াগুলোকে দানাপানি খাওয়াচ্ছে ওদের ওয়ারেন্ট অফিসার নাকি কাগজে পড়েছে যে আমাদের মিত্রপক্ষের লোকেরা জার্মানদের সত্যিকারের যাকে বলে ছাত্ত্ব করে দেওয়া তাই করে দিয়েছে।’

‘আহা আজ সকালে তুমি ছিলে না হে মেলেবড।’ আমরা খুব প্রশংসা পেয়েছি।’ মুখভর্তি জাউ নিয়ে চোয়াল নাড়াতে নাড়াতে অশ্রুট গলায় বলল ঝুটিওয়াল।

‘কে করল প্রশংসা?’

‘ডিভিশনের বড় কর্তা লেফটেন্যান্ট-জেনারেল ফন ডিভিড আমাদের ঘুরে ঘুরে দেখলেন হাজেরিয়ান ঘোড়সওয়ারদের খতম করে আমরা আমাদের ব্যাটারিকে বাঁচিয়েছি বলে খুব ধন্যবাদ জানালেন। আরেকটু হলোই ওরা কামানগুলোকে হাতিয়ে নিত কিন্তু।’ উনি বললেন, ‘সাবাস কসাকদেব জার আর পিত্তভূমি তোমাদের কখনও ভুলবে না।’

‘আজ্ঞা।’

এমন সময় রাস্তায় একটা শূকনো চড়চড়ে গুলির আওয়াজ হল। পবক্ষণেই ঘড়ঘড় করে ছুটল মেশিনগানের ফসরা

‘কে-সি-য়ে এসো।’ গেটের বাইরে চিংকার শোনা গেল

কসাকরা চামচ ফেলে বাইরে ছুটে এলো। মাথার ওপর দিয়ে অনেকটা



নীচুতে মধুরগতিতে পাক যাচ্ছে একটা এবোপ্লেন তার শক্তিশালী ইঞ্জিনটা ভয়ানক গর্জন করছে।

‘বেড়ার গা ঘেঁষে শূয়ে পড় সবাই।’ এফুনি বোমা ফেলতে শুরু কববে। পাশেই একটা বাটারি আছে। ঝুটিওয়ালা চিৎকার করে বলল।

‘ইয়েগোরকে জাগিয়ে নাও! নরম গদিতে ঘুমুতে ঘুমুতেই না অঙ্কা পেয়ে যায়!’

‘রাইফেল ধর রাইফেল!’

ঝুটিওয়ালা সঘন্থে তাক করে সোজা সদর দরজার ধাপ থেকে গুলি ছুঁড়তে লাগল।

রাস্তা দিয়ে সৈন্যরা ছুটছে তারা ছুটছে কেন যেন নুইয়ে পড়ে পাশের আঙ্গিনা থেকে একটা ঘোড়ার ডাক আর কর্কশ সুরে সামরিক নির্দেশ শোনা গেল। গুলি করে কার্তুজের খোপ খালি করে দেওয়ার পর গ্রিগোরি বেড়ার ওপর দিয়ে তাকান দেখতে পেল ওখানে গোলকাজরা ব্যস্তসমস্ত হয়ে চালার নীচে কামান ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে আকাশের উজ্জ্বল নীলিমা ছুঁচের মতো চোখে বিষতে থাকে গ্রিগোরি চোখ ঝুঁচকে আকাশের দিকে তাকাতো দেখতে পেল ভয়ানক গর্জন করতে করতে বিশাল পার্খিটা ছৌঁ মারার জন্য তেড়ে আসছে, সেই মুহূর্তে ওখান থেকে প্রচণ্ড বেগে কী যেন একটা খসে পড়ল সূর্যের কিরণে বলসে উঠল ভয়ঙ্কর শব্দে বোমা ফাটল, ছোট্ট বাড়িটা এবং বাড়ির দেউড়ির সামনে উপুড় হয়ে পড়ে থাকা কসাকরা কেঁপে উঠল তাতে। পাশের আঙ্গিনায় একটা ঘোড়া শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যুব্রণায় কাতর চিৎকার করে উঠল। বেড়ার ওপাশ থেকে ভেসে এলো গজকের পোড়া ঝাঁঝাল গন্ধ।

‘লুকিয়ে পড় লুকিয়ে পড়!’ দেউড়ির ধাপ থেকে ছুটে নেমে আসতে আসতে ঝুটিওয়ালা বলল

গ্রিগোরিও তার পেছন পেছন ছুটল, তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল বেড়ার গায়ে এবোপ্লেনটা স্বচ্ছন্দগতিতে লেজ তুলে একটা পাক খেল। বলক দিয়ে উঠল এলুমিনিয়ামের ডানার একটা অংশ। রাস্তা থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ছুটছে, গোলায় গুমগুম আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, বিজির এলোমেলো গুলির আওয়াজও কানে আসছে গ্রিগোরি সবে গুলি ভরেছে এমন সময় আরও বড় একটা বিস্ফোরণের প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে সে বেড়া থেকে হাত পাঁচেক দূরে ছিটকে পড়ল। একটা মাটির চাক্সড়া ধপ কবে তার মাথাব ওপর পড়ল। বুরবুর করে মাটি পড়ায় সে চোখে কিছু দেখতে পেল না। তারে পিষে গেল।

তাকে ধরে পায়ের ওপর খাড়া করে দিল ঝুটিওয়ালা উরুউপিন বা চোখের ভেতরে একটা তীব্র যন্ত্রণা, তাই গ্রিগোরি চোখ মেলে তাকাতো পারছিল না অনেক কষ্টে ডান চোখ খোলার পর সে দেখতে পেল অর্ধেক বাড়িটাই উড়ে

গেছে, একটা কর্মব্যরকমের এলোমেলো লাল ইটের কুপ পড়ে আছে, তার মাথার ওপর উড়ছে গোলাপী রঙের ধুলোর একটা কুণ্ডলী। দেউড়ির খাপগুলো ভেঙেচুরে ওলটপালট হয়ে গেছে, তারই তলা থেকে দু'হাতে ভর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসছে ইয়েগোর জাবকোভ। তার গোটা মুখখানা যেন চিংকারে ফেটে পড়তে চাইছে, চোখদুটো কোটর থেকে বেরিয়ে পড়েছে, সেখান থেকে গাল বয়ে গড়িয়ে পড়ছে রক্তমাখা চোখের জল মাথাটা কাঁধের ভেতরে গুঁজে গুড়ি মেরে এগোতে লাগল সে মৃত্যুপান্থর ঠোঁটজোড়া না খুলেই যেন সে চিংকার করে যেতে লাগল

‘আ-ই-ই-ই-ই! আ-ই-ই-ই-ই’ ‘আ-ই-ই-ই-ই’

ডুব থেকে একখানা পা ছিড়ে গেছে, আড়াআড়ি ভাবে আগুনে বলসে যাওয়া প্যান্টের পায়ার কাছে পাতলা চামড়ার গায়ে সেই পাটা ঝুলছে। পাটা পেছন পেছন ঘসড়োতে লাগল সে আরেকখানা পা নেই আস্তে আস্তে হাতে ভর দিয়ে সে এগিয়ে চলেছে, তার ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে ঝরে পড়ছে বাচ্চাদের নাকি নাকি গলার ঘ্যানঘ্যানে কান্নার মতো চিংকার। শেষকালে তার চিংকার বন্ধ হয়ে গেল, কাত হয়ে শূন্যে পড়ল সে বোড়ার নাদ ছড়ানো, ভাঙাচোরা ইটে ছাওয়া বিল্ডী স্মার্টসেতে অক্লুণ মাটির বুকে মুখ গুঁজল কেউ এগোল না তার কাছে।

খ্রিগোরি তখনও হাতের তালু দিয়ে বাঁ চোখ চেপে ধরে আছে সেই অবস্থাতেই সে চিংকার করে বলল, ওকে তোমরা কেউ তোল

পদাতিক বাহিনীর কিছু লোক ছুটে এলো উঠানে। গেটের কাছে এসে ধামল টেলিফোন অপারেটরদের একটা দু'চাকর গাড়ি।

একজন অফিসার পাশ দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে যেতে হুঙ্কার দিয়ে উঠল

গাড়ি হাঁকাও! এখানে দাঁড় করিয়ে রাখলে কেন? যন্ত সব হাঁ-করা জানোয়ারের দল

কোথা থেকে যেন ছপছপ করে পা ফেলে এগিয়ে এলো কালো ঝুল কুর্তা গায়ে এক বুড়ো, সেই সঙ্গে দু'জন স্ত্রীলোক জাবকোভের চার পাশে ভিড়ি জমে উঠল ভিড়ের মধ্যে গলে গেল খ্রিগোরি, সেখানে পেল তখনও নিঃশ্বাস পড়ছে জাবকোভের। তখনও মৃদু আর্দ্রনাদ করছে, তার দেহটা থরথর করে কাঁপছে মৃত্যুর পান্থর হ্রৌণ্ডরা লাগা কপালে জমে উঠেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম

‘আরে তোল ওকে তোমরা কী? মানুষ না জানোয়ার?’

লম্বা এক পদাতিক সেপাই ঝেঁকিয়ে উঠল

‘অমন চেলাচেঙ্গি শুরু করে দিয়েছ কেন? তোল, তোল আরে তুলে নিয়ে যাবে কোথায়? দেখছ না শেষ হয়ে আসছে?’

‘দুটো পা-ই ছিড়ে গেছে।’

‘ওঃ কী রক্ত’

‘স্ট্রেকার বওয়ার লোকজন সব কোথায় গেল?’

‘তাদের দিবে এখন আর কী হবে?’

‘কিন্তু এখনও ত জ্ঞান আছে ওর।’

ঝুটিওয়ালা পেছন থেকে গ্রিগোরির কাঁধ স্পর্শ করল। গ্রিগোরি পিছন ফিরে তাকাল।

‘ওকে নাড়াচাড়া করো না,’ ফিসফিস করে সে বলল, ‘ওপাশে ঘুরে গিয়ে দেখে এসো একবার।’

ফৌজী শার্টের হাতা ধরে টানতে টানতে গ্রিগোরিকে অন্য ধারে এনে সামনের লোকজনের ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেল তাকে। একবার শূণ্য তাকিয়ে দেখল গ্রিগোরি, তারপর ঘাড় ঘুঁজে চলে গেল গেটের দিকে জারকোভের পেটের নীচে গোলাপী আর নীল নাড়িভুঁড়ি কুলছে, সেখান থেকে ঘোঁয়া উঠছে কুণ্ডলী পাকানো নাড়িভুঁড়ির শেষপ্রান্তটা বালি আর বোড়ার নাসের মধ্যে গড়াগড়ি যাচ্ছে, নড়াচড়া করছে, মাঝে মাঝে ফুলে বড় হয়ে উঠছে। মৃত্যুপথযাত্রীর হাতখানা একপাশে কাত হয়ে পড়ে আছে, যেন মাটি খামচে তুলতে চাইছে।

‘ওর মুশটা ঢেকে দাও,’ কে একজন বলল

জারকোভ হঠাৎ দু’হাতে ভর দিয়ে উঠল, মাথাটা পেছন দিকে হেলান, তার বঁকে যাওয়া দুই কাঁধের মাঝখানে মাথার পেছনটা ধাক্কা খেল, তারপর ভাঙা ভাঙা কর্কশ গলায় অমানুষিক চিৎকার করে বলল, ‘ভাই, আমাকে মেরে ফেল তোমরা। ও ভাই! অমন করে কী দেখছ? আ-হা-হা! মেরে ফেল, আমাকে মেরে ফেল ভাই তোমরা।’

### একুশ

কামরা মদুমন্দ দোল খাচ্ছে, গাড়ির চাকার আওয়াজ ঘুমপাড়ানি গানের মতো তালে তালে তন্ত্রাবেশ এনে দিচ্ছে। লষ্টনের হলদে আলোর রেখা ঠিকরে পড়ে বেথের অর্ধেকটা জুড়ে ফুটে উঠেছে এক ধরনের বিচিত্র নকশা গত দু’সপ্তাহ ধরে বুটজুতোর ভেতরেই পাদুটো ঘর্ষিত হয়েছে এত দিনের মধ্যে আজ এই প্রথম বুট খুলে পাদুটোকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে সারা শরীর টান টান করে দিয়ে শূন্য পড়তে কী ভালোই না লাগে! কী ভালোই না লাগে যখন নিজেকে

দায়িত্বমুক্ত মনে হয়ে, যখন জানা যায় জীবনের আর কোন আশঙ্কা নেই, মৃত্যু সরে গেছে অনেক দূরে। বিশেষ করে মধুর লাগে গাড়ির চাকার নানা সুরের বিচিত্র তাল কান পেতে শুনতে, কারণ চাকার প্রতিটি আবর্তন আর ইঞ্জিনের প্রতিটি ঝাঁকুনির সঙ্গে সঙ্গে ফ্রন্ট ব্রেকেই দূরে সরে যাচ্ছে গ্রিগোরিও তই শূয়ে আছে, শূয়ে শূয়ে খালি পায়ের আঙুলগুলো নাড়াতে নাড়াতে শব্দ শুনছে। সবে পরিকার-পরিচ্ছন্ন জামাকাপড় গায়ে দিতে পারার আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে তার সর্বাঙ্গ তার মনে হচ্ছিল একটা নোংরা খোলস গা থেকে ছেড়ে ফেলে দিয়ে যেন সে প্রবেশ করতে চলেছে শুদ্ধ অকলঙ্ক আরেক জীবনে, এক নতুন জীবনে।

তার এই শান্ত নিশ্চিন্ত আনন্দের উপলব্ধিতে বাধা পড়তে লাগল বাঁ চোখের চিনচিনে যন্ত্রণায়। ব্যাথাটা মাঝে মাঝে কমে যায়, তারপর আবার হঠাৎ ফিরে আসে, চোখে আগুনের মতো ছালা ধরিয়ে দেয়, চোখের জল চেপে রাখা যায় না - ব্যাণ্ডেজের ভেতর দিয়ে নিংড়ে বেরিয়ে আসে। কামেনকা-জুমিলোভোর সামরিক হাসপাতালে অল্পবয়সী এক ইতুদী ডাক্তার গ্রিগোরির চোখ পরীক্ষা করে, এক টুকরো কাগজে কী সব লেখার পর তাকে বলেছিল 'আপনাকে ফ্রন্ট লাইনের পেছনে চলে যেতে হবে। আপনার চোখের অবস্থা মোটেই সুবিধের নয়।'

'কানা হয়ে যাব নাকি?'

'না না, কী যে বলেন।' প্রশ্নটার মধ্যে যে আতঙ্কের ভাব প্রকট হয়ে পড়েছিল সেটা ধরতে পেরে মিষ্টি হেসে ডাক্তার বলল 'চিকিৎসা করতে হবে, হয়ত একটা অপারেশনও করতে হতে পারে। আমরা আপনাকে পাঠিয়ে দেব ফ্রন্ট লাইনের অনেক পেছনে এই ধরুন, পেন্ডোগ্রাদে, নয়ত মস্কোয়।'

'অনেক ধন্যবাদ।'

'আপনি ঘাবড়াবেন না চোখ আপনার একদম ঠিক হয়ে যাবে' এই বলে ডাক্তার গ্রিগোরির শিটে চাপড় মারল, কাগজের টুকরোটা হাতে গুঁজে দিয়ে আস্তে করে ওকে করিডরে ঠেলে দিল। তারপর জামার হাতা গুটিয়ে অপারেশনের জন্য তৈরি হতে লাগল।

অনেক কামেনকার পর হাসপাতালের একটা ট্রেনে গ্রিগোরি জায়গা পেল পুরো একটা দিন ও একটা রাত শূয়ে শূয়ে শান্তিসুখ উপভোগ করল। ছোটখাটো, ঝরঝরে পুরনো ইঞ্জিনটা সবটুকু শক্তি প্রয়োগ করে বহু কামরার ডারী ট্রেনটাকে টেনে নিয়ে চলেছে মস্কো এগিয়ে আসছে।

গাড়ি পৌঁছাল রাতে। যারা গুরুতর আহত তাদের স্ট্রেকারে করে বয়ে নিয়ে যাওয়া হল যারা অন্যের সাহায্য ছাড়া চলে ক্লিরে বেড়াতে পারে তারা নাম রেজিস্ট্রিভুক্ত হওয়ার পর প্র্যাকটিকর্মে নামল। গাড়িতে ওদের সঙ্গে যে-ডাক্তার

এসেছিল সে তালিকা ধরে গ্রিগোরিকে ডেকে পাঠাল তাকে দেখিয়ে একজন নার্সকে বলল, 'ডাক্তার গ্রিগরিওভের চোখের হাসপাতালে। কলপাচনি লেন।'

'আপনার জিনিসপত্র আপনার সঙ্গেই আছে ত?' নার্সটি জিজ্ঞেস করল।

'জিনের থলে আর গ্রেটকোট এ-ই সব এছাড়া কসাকের আর কী জিনিসপত্র থাকতে পারে?'

'চলুন'

নার্সটি তার চুপির নীচের পাট করা চুল ঠিক করতে করতে চলতে লাগল চলার সঙ্গে সঙ্গে খসখস করতে লাগল তার পরনের পোশাক। গ্রিগোরি অনিশ্চিত ভাবে তার পেছন পেছন চলল স্টেশন থেকে বেরিয়ে এসে তারা একটা ঘোড়াগাড়ি নিল বিরাট শহরটা তখন ঘুমে ঢলে পড়ছে। তার কোলাহল, ট্রামের চন্ডন্ড আওয়াজ, বিজলী বাতিব নীলচে আভা সব মিলে গ্রিগোরির যেন স্বাস্রোধ হবার উপক্রম হল ঘোড়াগাড়ির আসনের পিঠে হেলান দিয়ে বসে বসে গ্রিগোরি সাগ্রহে দেখতে লাগল রাতের পথঘাট বাতের বেলাতেও রাস্তায় অসংখ্য লোকজন পাশে এক নারীদেহের উদ্বেজনার উন্মত্তা অনুভব করে বড়ই অদ্ভুত লাগল তার মস্তক শরতের ছৌওয়া লেগেছে। বড় রাস্তার দু'পাশের গাছপালার পাতাগুলো রাস্তার আলোয় ভ্রান হলুদ দীপ্তি দিচ্ছে রাতের নিঃশ্বাসে কনকনে ঠাণ্ডার ভাব বীধানো ফুটপাথ ভিজ্জে চকচকে, স্বচ্ছ নির্মল আকাশের তারাগুলোতেও শারদীয় ঔজ্জ্বল্য ও হিমের স্পর্শ। শহরের কেন্দ্র থেকে গাড়ি এবারে ঢুকল একটা নির্জন ছোট রাস্তায়। রাস্তার পাথরে ঘোড়ার খুরের খটখট আওয়াজ উঠল, পাদ্রিব মতো লম্বা ঝুলের নীল বনাতের কোর্তা গায়ে কোচোয়ান গাড়ির উঁচু আসনে বসে ঝাঁকুনি খেতে লাগল, মাঝে মাঝে কানখোলা মরকুটে ঘোড়াটার উদ্দেশ্যে লাগামের প্রান্ত দোলাতে লাগল। শহরের উপকণ্ঠে কোথায় যেন ইঞ্জিনের বাঁশি বেজে উঠল 'হয়ত মনের দেশেই কোন একটা যাবে এখন?' মনে মনে এই কথা ভাবতে বাড়ির জন্য গ্রিগোরির মনটা বড় ব্যাকুল হয়ে উঠল, বুকের ভেতরটা খচখচ করতে লাগল

'আপনি চলেছেন নাকি?' নার্সটি জিজ্ঞেস করল।

'না।'

'এই এসে পড়লাম বলে।'

'আজ্ঞে কী বললেন?' কোচোয়ান ঘাড় ফেরাল

'জোরে চালাও।'

লোহার রেলিংয়ের বিনুনির ওধারে ঝলক দিয়ে উঠল তেলের মতো চকচকে একটা পুকুরের জল, তারপর এক ঝলক দেখা দিল রেলিং ঘেরা কয়েকটা ছোট

ছেঁট ঘটিমতন সেগুলোর গায়ে নৌকো বাঁধা। ভিজ্জে হাওয়ার আপটা লাগল

গ্রিগোরি কিছু বুঝতে না পেরে অস্পষ্ট ভাবে ভাবতে থাকে 'জল বে জল তাকেও দেখছি এখানে বৈধে বেখেছে, লোহার গরাদের আড়ালে বেখেছে, অথচ আমাদের দন ' গাড়ির টায়ার লাগানো চাকার তলায় সরসর করতে লাগল অরূপাতা।

একটা তিন তলা বাড়ির সামনে গাড়িটা এসে থামল গায়ের গ্রেটকোটটা ঠিকঠাক করে নিয়ে গ্রিগোরি লাফিয়ে নেমে পড়ল

'আপনার হাতটা বাড়িয়ে দিন এদিকে,' এই বলে নার্স গাড়ি থেকে নামার জন্য সামনের দিকে ঝুঁকল।

নার্সের ছোট্ট নরম হাতখানা নিজের হাতের মুঠোয় চেপে ধরে গ্রিগোরি তাকে নামতে সাহায্য করল

'আপনার গায়ের মিলিটারির ঘামের বোটকা গন্ধ,' পরিপাটি প্রসাধন-করা নার্সটি নিঃশব্দে হাসল। তারপর সদর দরজার কাছে গিয়ে বেল বাজাল।

'কিছু দিন ওখানে কাটালে আপনার গা থেকে হয়ত আরও কিছুটা গন্ধ ছাড়ত সিস্টার,' চাপা রাগে গরুর করতে করতে গ্রিগোরি বলল

দাবোয়ান দরজা খুলে দিল সোনালি কাজকরা রেলিং দেওয়া সিঁড়ি বয়ে দোতলায় এলো ওরা আরও একটা দরজা এখানেও দরজায় বেল বাজাল সিস্টার সাদা লম্বা কোটপরা একজন স্ত্রীলোক ওদের ভেতরে নিয়ে এলো। গ্রিগোরি একটা ছোট গোল টেবিলের ধারে এসে বসল সাদা পোশাক পরা স্ত্রীলোকটির কানে কানে সিস্টার চাপা গলায় কী সব বলল, স্ত্রীলোকটি খসখস করে লিখে যেতে লাগল

অপ্রাপ্ত লম্বা করিডরের দু'ধারে পর পর চলে গেছে রোগীদের কামরা। দরজার ভেতর থেকে উঁকি মারছে রঙিন চশমা-চোখে লোকজনের মাথা

'গ্রেটকোটটা খুলে ফেলুন,' সাদা পোশাক পরা স্ত্রীলোকটি বলল

হাসপাতালের একজন পরিচারক তাবও গায়ে ওই রকম সাদা লম্বা কোট গ্রিগোরির হাত থেকে গ্রেটকোটটা নিয়ে তাকে স্নানঘরে নিয়ে এলো

'গায়ের সব জামাকাপড় খুলে ফেলুন।'

'কী জন্যে?'

ভালো করে স্নান করতে হবে।'

জামাকাপড় খুলতে খুলতে গ্রিগোরি আশ্চর্য হয়ে ঘরের চারপাশ আর জানলার ঘসা কাচের শার্সিগুলো দেখতে লাগল হাসপাতালের পরিচারকটি ততক্ষণে স্নানের

টব জলে ভরতি করে জলের তাপ মেপে দেখল, তারপর গ্রিগোরিকে জলে নামতে বলল।

এ গামলা বাপু আমার জন্যে নয় ' গাঢ় তামাটে রঙের কালো লোমশ পা জলে নামানোর জন্যে ওঠাতে ওঠাতে হতভম্ব হয়ে বিড়বিড় করে বলল গ্রিগোরি।

লোকটা তাকে বেশ কবে গা-হাত-পা বগড়াতে সাহায্য করল। স্নান করা হয়ে গেলে তোয়ালে ভেতরে পরার একপ্রান্ত জামাকাপড় এক জোড়া ঘরে পরার চটি আর বেল্ট দেওয়া একটা ছাইরঙা জোকা গ্রিগোরিকে এনে দিল

‘আমার জামাকাপড়ের কী হল? গ্রিগোরি আশ্চর্য হয়ে গেল

এখানে এই জামাকাপড়ই পরে থাকতে হবে। আপনি যখন হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবেন তখন আপনার পোশাক ফিরিয়ে দেওয়া হবে।’

সামনের বড় ঘরটার দেয়ালে টাঙানো বড় আরশিটার পাশ দিয়ে যেতে যেতে নিজেকে দেখে চিনতে পারল না গ্রিগোরি লম্বা শরীর, মুখটা কালচে মেঝে গেছে, গালের হাড়দুটো উঁচু হয়ে আছে, দুই গালের ওপর গরমের লাল ছোপ পড়েছে, পরনে ড্রেসিংগাউন, কালো চুলের রাশির ওপর আঁটো করে বাঁধা পাট সব মিলিয়ে আগেকার গ্রিগোরির সঙ্গে তার মিল খুবই সামান্য বড় একজোড়া গৌফ গজিয়েছে, নরম কোঁকড়ানো দাড়ি বেরিয়েছে

‘এর মধ্যে কয়সটা কমে গিয়েছে দেখছি,’ গ্রিগোরি বাঁকা হেসে আপন মনে বলল।

‘হয় নম্বর ওয়ার্ড, ডান দিকের তৃতীয় দরজা, পরিচারক দেবিয়ে দিয়ে বলল

গ্রিগোরি একটা বড় সাদা কামরার ভেতরে এসে ঢুকলে নীল চশমা-চোখে জোকা পরা একজন পুরুতঠাকুর জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

‘একজন নতুন পড়ানী দেখছি? বেশ বেশ, খুব ভালো লাগল। যাক, আর একঘেয়ে লাগবে না। আমি জারাইন্সের লোক, গ্রিগোরির দিকে চেয়ার এগিয়ে দিয়ে মিশুক ভঙ্গিতে সে জানাল।

কয়েক মিনিট পরে ঘরে এসে ঢুকল একজন এসিস্টেন্ট ডাক্তার। বিশাল মুখ, মোটাসোটা স্ট্রীলোক, বিজী চেহারা

‘মেলেন্ড, চলুন, আপনার চোখ দেখা হবে,’ নীচু ভারী গলায় কথাগুলো বলে সে সরে দাঁড়িয়ে গ্রিগোরিকে করিডরে বের হওয়ার পথ করে দিল।



শেভেল এলাকার দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্টে সামরিক নেতৃমণ্ডলী ঘোড়সওয়ার দলের সাহায্যে বড় রকমের আক্রমণ ঘটিয়ে শত্রুবাহ ভেদ করার সিদ্ধান্ত নিল। উদ্দেশ্য ছিল শত্রুপক্ষের ফ্রন্ট লাইনের পেছনে একটা বড়সড় ঘোড়সওয়ার দল পাঠানো হবে। এই বাহিনী ফ্রন্ট লাইন বরাবর হানা দিয়ে যোগাযোগের লাইনগুলো ধ্বংস করবে এবং আচমকা আক্রমণে শত্রুপক্ষের ইউনিটগুলোকে বিপর্যস্ত করবে। এই পরিকল্পনার সাফল্য সম্পর্কে সামরিক নেতৃমণ্ডলীর বিরাট আস্থা ছিল নির্দিষ্ট এলাকায় তাই বিপুল সংখ্যক ঘোড়সওয়ার সৈন্য এনে জড় করা হল। এই ভাবে বাকি যে-সমস্ত ঘোড়সওয়ার রেজিমেন্টকে এই বিভাগে হানান্তরিত করা হয় তাদের মধ্যে লেকটেন্যান্ট লিভনিথস্কি যেখানে কাজ করত সেই কসাক রেজিমেন্টও ছিল। আক্রমণ শুরু হওয়ার কথা ছিল ২৮শে আগস্ট, কিন্তু বাঁটি হওয়ার দরুন পিছিয়ে ২৯শে আগস্ট স্থির করা হল।

সেদিন সকালে বিশাল জায়গা জুড়ে ডিভিশন সমবেত হয়ে আক্রমণের তোড়জোড় করতে লাগল।

ডান পাশে ক্রোশ তিনেক এলাকা জুড়ে পদাতিক বাহিনী লোক-মেখানো আক্রমণ শুরু করে দিল, ফলে শত্রুপক্ষের গুলিগোলা তার ওপর এসে পড়তে লাগল। শত্রুকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে একটা ঘোড়সওয়ার ডিভিশনের কয়েকটা ইউনিটকেও পাঠিয়ে দেওয়া হল আরকেটা ভুল পথে।

সামনে যত দূর দৃষ্টি যায় শত্রুর কোন চিহ্ন চোখে পড়ে না। তার স্কোয়াড্রনের মাইলবানেক দূরে লিভনিথস্কি মেখাতে পেল শত্রুর ফেলে যাওয়া ট্রেনের কালো কালো খোঁড়ল পেছনে মাথা উঁচিয়ে আছে রাইফেলত ভোরের অব্যবহিত আগের নীলচে কুয়াসা মৃদুস্বন্দ বাতাসে খীত হয়ে উঠেছে।

ঘটনটা এই যে বিপক্ষের সামরিক নেতৃমণ্ডলী আসন্ন আক্রমণের কথা হয় জেনে ফেলে কিংবা আগে থেকে আঁচ করতে পারে যে-কোন কারণেই হোক, ২৮ তারিখ রাতে শত্রুপক্ষের সেনাবাহিনী জায়গায় জায়গায় মেশিনগানের ঘাঁটি দিয়ে ওত পেতে রেখে ট্রেন ছেড়ে ক্রোশ দুয়েক দূরে সরে গেল। ওদের বিরুদ্ধে আমাদের যে পদাতিক বাহিনী ছিল এই মেশিনগানের ঘাঁটিগুলোই গোটা বিভাগ জুড়ে তার দুর্গতির কারণ হয়ে দাঁড়াল।

সূর্য উঠছে। মাথার ওপরে কোথায় যেন মেঘের রাশির আড়াল থেকে তার দীপ্তি প্রকাশ পাচ্ছে। হলুদ ঘিয়ে রক্তের কুয়াশার বান ডেকেছে সারা উপত্যকা জুড়ে। আক্রমণের নির্দেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রেজিমেন্টগুলো এগিয়ে গেল।



হাজার হাজার ঘোড়ার খুরে চাপা গুরু গুরু আওয়াজ উঠল মনে হল যেন মাটির তলা থেকে উঠে আসছে সে আওয়াজ। বিশুদ্ধ জাতের ঘোড়াটাকে চার পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটেতে দিতে লিঙ্গনিধির আপত্তি, তাই সে তার ঘোড়ার রাশ টেনে টেনে চলতে লাগল। মাইলখানেক পথ তারা শেছনে ফেলে এলো। সূর্যখল সারি বাঁধা আক্রমণকারীদের সামনে ফসলের ক্ষেত কোমর ছাড়িয়ে উঠেছে ফসলের উঁচু উঁচু মাথা ফসলের গা আট্টিপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে উঠেছে লতানো গাছ আর ঘাস ফলে ঘোড়সওয়ারদের দ্রুত এগিয়ে চলা রীতিমতো দুবুহ হয়ে উঠল সামনে একটানা লালচে রাইয়ের লীষ ঢেউয়ের পর ঢেউ তুলে চলে গেছে, পেছনে ঘোড়ার খুরের চাপে মাটিতে পড়ে থেঁতো হয়ে থাকছে এই ভাবে এক ক্রোশ পথ চলার পর ঘোড়াগুলো হোঁচট খেতে লাগল ঘামতেও লাগল প্রচুর অথচ শব্দর কোন পাত্তা নেই লিঙ্গনিধি ঘাড় ফিরে তাকাল স্কোয়াড্রন-কমান্ডারের দিকে মেজরের চোখেমুখে চাপা হতাশার ছাপ

ক্রোশ দুয়েক এই ভাবে অনর্থক কষ্ট দিয়ে ঘোড়াগুলোকে ছোটানোর ফলে তাদের সব শক্তি ফুরিয়ে গেল কিছু কিছু ঘোড়া সওয়ার পিঠে নিয়েই বসে পড়ল তাদের মধ্যে যেগুলো একটু বেশি কষ্টসহিষ্ণু তারা শেষ শক্তি প্রয়োগ করে টলতে টলতে চলতে লাগল এখানেই অস্থিয়ান মেশিনগানগুলো কাজ শুরু করে দিল সমান তালে বমবম গোলাবর্ষণ শুরু হয়ে গেল প্রাণঘাতী অগ্নিবর্ষণে সামনের সারিগুলো কচুকাটা হয়ে পড়ে গেল সবচেয়ে প্রথমে টল খেয়ে উলটো দিকে মুখ ফেরাল উলানরা, কসাক-রেজিমেন্টটাও ভেঙে গেল। আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে তারা যখন পালাতে লাগল সেই সময় মেশিনগানগুলো পিচকিরির মতো তোড়ে গুলি বর্ষণ করে তাদের ধুইয়ে দিল, সঙ্গে সঙ্গে কামানগুলোও গোলা ছুঁড়তে লাগল তাদের ওপর। সুবিস্তৃত এলাকা জুড়ে যে অসাধারণ আক্রমণের পরিকল্পনা করা হয়েছিল হাই কমান্ডের অপরাধমূলক গাফিলতির দরুন এই ভাবে তার চূড়ান্ত পরাভব ঘটল কোন কোন রেজিমেন্টের অর্ধেক ঘোড়া আর মানুষ খোঁয়া গেল লিঙ্গনিধির রেজিমেন্টের প্রায় চারশ জন সৈন্য আর বোলজেন অফিসার হতাহত হল

লিঙ্গনিধির ঘোড়াটা তাকে পিঠে নিয়েই গুলি খেয়ে মারা গেল লিঙ্গনিধি নিজে মাথায় আর পায়ে দুটো চোট পেল লিঙ্গনিধি পড়ে যেতে সার্জেন্ট-মেজর চেবভারিয়োভ ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে নেমে তাকে জিনের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

ডিভিশনের সর্বাধিনায়ক স্কেনারেল স্ট্রাফের কর্ণেল গোলোভাচোভ আক্রমণ-মুহুর্তের কয়েকটা ছবি তুলেছিল পরে সে অফিসারদের সেগুলো দেখাল। আহত

লেকটেন্যান্ট চেরভিরাফোড প্রথমে তার মুখে ঘুসি মারল তারপর নিজেই কান্নায় ভেঙে পড়ল। এর পর কসাকরা ছুটে এসে গোলোভাচোভকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলল অনেকক্ষণ ধরে তার লাশটার ওপর নিজেদের মনের খাল মেরাল, তারপর ছুঁড়ে ফেলে দিল রাস্তার ধারের একটা নদীয়ার কাদার ভেতরে। এই ভাবে দীনহীন পরিসমাপ্তি ঘটল এত বড় একটা আক্রমণের।

ওয়ারশর এক সামরিক হাসপাতাল থেকে লিঙ্কনিংকি তার বাপকে জানাল যে আরোগ্য লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে ছুটি কাটানোর জন্য ইয়াগদনোয়েতে তার কাছে আসছে চিঠিটা পেয়ে বুড়ো তার বসার ঘরে গিয়ে সেই যে দরজা দিল সেখান থেকে বেরিয়ে এলো তার পরের দিন। তখন তার মুখ আঘাতের মেঘের মতো ধমধম করছে নিকিতিচকে ফিটন গাড়িতে দুলাল চালেব ঘোড়াটা যুততে বলল, সকালের খাবার খেল, তারপর গাড়ি হাঁকিয়ে ছুটল ভিওশেনস্কায়ায় টেলিগ্রাফ করে ছেলেকে চারশ' বুঝ পাঠাল, সেই সঙ্গে পাঠাল একটা সংক্ষিপ্ত চিঠি

‘স্নেহের পুত্রধন আমার, তুমি যে অগ্নিশরীকার মধ্য দিয়া দীক্ষা পাইয়াছ তজ্জন্য আমার আনন্দের অবধি নাই প্রাসাদ ছাড়িয়া যে কাজে তুমি যোগ দিয়াছ তাহা তোমার অশেষ সৌভাগ্যসূচক বলিতে হইবে। তোমার যথেষ্ট সততা ও বুদ্ধিবিবেচনা রহিয়াছে, তাই বিবেকের বালাই না রাখিয়া অপরের পদলেহন করিবার পাত্র তুমি নহ। আমাদের পবিবারে আরও কাহারও মধ্যে এই চাবিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায় নাই সেই কারণেই তোমার পিতামহ রাজরোষে পতিত হন, মহামানা সম্রাটের অনুকম্পা লাভ সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়া জীবনের বাকি দিনগুলি তাহাকে ভগ্নহৃদয়ে ইয়াগদনোয়েতে অতিবাহিত করিতে হয়। তোমার কৃশল ও সঙ্কর আরোগ্য কামনা করি মনে রাখিও, এই পৃথিবীতে তুমি ছাড়া আমার আর কেহ নাই তোমার পিসীমা তোমাকে আশীর্বাদ জানাইয়াছে। সে ভালোই আছে আমার নিজের সম্পর্কে কিছুই জিবিবার নাই। আমার জীবনযাত্রা তোমার ভালোই জানা আছে। ফ্রন্টে বর্তমানে কী ঘটিতেছে? সুস্থ চিন্তাভাবনা করিবার মতন লোকজন কি আদৌ নাই? সংবাদপত্র যে সমস্ত সংবাদ দিয়া থাকে তাহাতে বিশ্বাস হয় না সেগুলি আগাগোড়া মিথ্যায় বোকাই, অন্তত আমার অতীতের অভিজ্ঞতা তাহাই বলে। এই অভিযানে আমাদের কি সত্য সত্যই পরাজয় ঘটিবে? তোমার কী মনে হয় ইয়েভগেনি?

অধীর আগ্রহে তোমার পথ চাহিয়া বসিয়া আছি

অবশ্য নিজের জীবন সম্পর্কে লেখার মতো কিছু নেইও বুড়ো লিঙ্গনিবন্ধির দিনগুলো তার সেই আগের মতোই ঢিকিয়ে ঢিকিয়ে চলছে, কোন বৈচিত্র্য নেই, কোন অদলবদল নেই শূণ্য মুনিষের দাম চড়েছে, আর মদের ঘাটতি অনুভব করা যাচ্ছে কঠা আজকাল ঘন ঘন মদ খাচ্ছে, মেজাজটা তার আরও বিটবিটে হয়ে উঠেছে, আরও বেশি করে খুঁত ধরছে লোকজনের। একদিন অসময়ে আঙ্গিনিয়াকে ডেকে পাঠাল, তাকে বলল

‘তুমি কিন্তু মন দিয়ে কাজকর্ম করছ না কাল যে সকালের খাবার দিয়েছিল সেটা ঠাণ্ডা ছিল কেন? কফির গেলান ভালোমতো পরিষ্কার ছিল না কেন? কেন যদি এমন হয় তাহলে আমি তোমাকে শুনছ আমার কথা? আমি তোমাকে বরখাস্ত করব। নোংরা আমি একদম বরদাস্ত করতে পারি নে।’ কঠা বিরক্তির হাত নেড়ে বলল ‘শুনলে কী বললাম? বরদাস্ত করতে পারি নে।’

আঙ্গিনিয়া জোর করে ঠোঁট ঠোঁট চাপল, তারপর হঠাৎ কঁদে ফেলল।

‘নিকলাই আলেক্সেয়েভিচ! মেয়েটার অসুখ করেছে আমাকে একটু ছুটি দিন কাজ থেকে ওকে ছেড়ে নড়তে পারি নে।’

‘কী হয়েছে?’

‘স্বাসনাশী বন্ধ হয়ে আসছে।’

‘স্কার্লেট ছব? আগে বল নি কেন? আহাম্মক কোথাকার! চুলোয় যা অকস্মাৎ ঘাড়ি। শিগগির যাও, নিকিতিচকে ঘোড়া জুততে বল বল সম্বরে গিয়ে ডাক্তার ডেকে আনুক। যাও, জরদি কর!’

আঙ্গিনিয়া এস্ত পায়ে ছুটল, তার পেছন পেছন ফেটে পড়ল বুড়োর বন্ধকঠের হুঙ্কার

‘আহাম্মক মাগী! আহাম্মক একেবারে আহাম্মক!’

সকালে নিকিতিচ ডাক্তার নিয়ে এলো। অচেতন ছবরতন্তু শিশুটিকে ডাক্তার পরীক্ষা করে দেখল, আঙ্গিনিয়ার প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে মনিবের মহলের দিকে পা বাড়াল। লিঙ্গনিবন্ধি সামনের ঘরে তার সঙ্গে দেখা করল করমর্দনের জন্য হাত বাড়াল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলল।

‘কী হয়েছে বাচ্চাটার?’ ডাক্তারের সম্ভাবণের উত্তরে তাকিলাডরে ঘাড়টা সামান্য নাড়িয়ে সে জিজ্ঞেস করল

‘স্কার্লেট ছব কঠা।’

‘ভালো হবে? আশা আছে কি?’

‘আশা খুবই কম। মারা যাবে মেয়েটা ওই ত অতটুকুন বয়স, বুঝতেই পারছেন।’

‘আহাম্মক!’ কর্তার মুখ লাল হয়ে উঠল ‘কী ছাই বিদো তাহলে শিখো?’  
ভালো করে দাও।’

ডাক্তার ঘাবড়ে গেল তার মুখের ওপর দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিয়ে  
লিফটখিন্তি হল-ঘরে পায়চারি করতে লাগল অস্থির ভাবে।

দরজায় টোকা দিয়ে ভেতরে এসে ঢুকল আঞ্জিনিয়ার

‘ডাক্তার সদরে যাবার জন্যে ঘোড়া জুততে বলছেন।’

বুড়ো ষট করে গোড়ালিতে ভর দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল।

ওকে বল ও একটা গোমুখ্য। বল যে মেয়েটাকে আমার ভালো না করে  
দেওয়া পর্যন্ত এখান থেকে যেতে পারবে না। বাইরের বাড়িতে একটা ঘর দাও  
ওকে থাকতে, খাবারদাবার দাও। হাজিসার হাতের মুঠো নাড়াতে নাড়াতে বুড়ো  
চুটিয়ে বলল। ‘দানাপানি দিয়ে আটকে রেখে দাও বলির পিঠার মতন  
যাওয়া-টাওয়া চলবে না। কোন ট্যাঁ ফোঁ নয়।’ হঠাৎ কথা বন্ধ করে জানলার  
দিকে এগিয়ে গেল, জানলার গায়ে আঙুল দিয়ে খানিকটা তাল ঠুকল, তারপর  
ছেলের একটা বড় করে তোলা ফোটোর দিকে এগিয়ে গেল। বাইরের কোলে  
তোলা ছোটবেলাকার ছবি। দু’পা পিছিয়ে গিয়ে চোখ কুঁচকে অনেকক্ষণ ধরে  
এমন ভাবে তাকিয়ে রইল যেন চিনতেই পারছে না ছেলেকে।

মেয়েটা যেদিন অসুস্থ হয়ে শয্যা নিল সেই দিনই আঞ্জিনিয়ার মনে পড়ে  
যায় নাভালিয়ার সেই তিক্ত কথাগুলো ‘আমার মতো চোখের জল যখন তোমাকে  
ফেলতে হবে তখন বুঝবে’ আঞ্জিনিয়ার ধরে নিল নাভালিয়াকে ব্যঙ্গ করার  
জন্য ভগবান এখন তাকে শাস্তি দিচ্ছেন।

মেয়ের জীবনের আশঙ্কায় সে মুষড়ে পড়ল তার মাথার কোন ঠিক রইল  
না, উদ্ভ্রান্তের মতো সে ছটফট করে বেড়াতে লাগল, কাছে এতটুকু মন লাগাতে  
পারল না।

‘ভগবান কি সত্যি সত্যিই কেড়ে নেবেন?’ এই চিন্তা অহরহ তাকে ব্যাকুল  
করে তুলতে লাগল এটা বিশ্বাস করতে তার মন চাইল না, সর্বশক্তি নিয়ে সে  
দূরে ঠেলে রাখার চেষ্টা করল এই চিন্তা। আঞ্জিনিয়ার কাতর হয়ে ভগবানের কাছে  
প্রার্থনা করল, তাঁর কাছে একমাত্র যে করুণা ভিক্ষা করল তা হল তিনি যেন  
বাচ্চটার প্রাণ রক্ষা করেন।

‘অপরাধ মার্জনা কর ঠাকুর কেড়ে নিয়ো না।’ করুণা কর, দয়া কর।’

রোগ ওই ছোট্ট অতটুকু প্রাণের শেষ নিঃশ্বাস চেপে ধরতে লাগল মেয়েটা  
চিত হয়ে শুয়ে রইল, তার গলা ফুলে উঠেছে, অনেক কষ্টে ভেতর থেকে ঘড়ঘড়  
করে দমকে দমকে নিঃশ্বাস ঠেলে বেরোচ্ছে।

সদর থেকে সেই যে ডাক্তার এসেছিল, বাইরের বাড়িতে তাকে জায়গা দেওয়া হয়েছে। দিনের মধ্যে চারবার করে এসে সে রোগী দেখে যায় সন্ধ্যাবেলায় চাকরদের মহলেব দেউড়ির ধাপের সামনে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাক টানে আর শবতের আকাশের বুকে ছড়ানো তারার শীতল দীপ্তির দিকে তাকিয়ে থাকে।

রাতের বেলায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে মেয়ের বিছানার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে থাকে আঞ্জিনিয়া। শিশুর গলার ষড়ষড়ানি তার বুকের ভেতরে কেটে বসে।

ছোট্ট ঠোঁটদুটো শুকিয়ে চড়চড় করতে থাকে। খসখস করে মৃদু ঠোঁট নেড়ে মেয়ে ডেকে ওঠে।

‘মা-আ, মা-আ’

আঞ্জিনিয়া চাপা গলায় আর্তনাদ করে।

‘লক্ষ্মী সোনা আমার, কী হয়েছে? তানিয়া সোনা মা আমার আমাকে ছেড়ে যেয়ে না।’ ওরে চোখ মেলে তাকা একবার ধন আমার মানিক আমার, একবারটি চেয়ে দ্যাখ হা ভগবান, কেন কেন এমন হল গো?’

শিশু মাঝে মাঝে টসটসে ভারী চোখের পাতা খুলতে থাকে দু’চোখে রক্ত ফেটে পড়ছে। অস্থির, ধরা-ছোঁওয়ার বাইবে চোখের দৃষ্টি। ফ্যাল ফ্যাল করে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে মার দিকে। মা উদগ্রীব হয়ে মেয়ের চোখের ভাষা ধরার চেষ্টা করে কিন্তু ব্যর্থতর, শান্ত সমাহিত সেই দৃষ্টি নিজের ভেতরে কোথায় যেন নিজেকে গুটিয়ে নেয়।

মায়ের কোলেই মারা গেল সে শেষ বাকের মতো ছোট্ট নীল বুখটা হাঁ হয়ে গেল, ফুণিয়ে উঠল ছোট্ট শরীরটা কঁপে উঠল ধরধর করে। ঘামে ভেজা ছোট্ট মাথাটা পেছন দিকে হেলে গেল, আঞ্জিনিয়ার হাত থেকে গড়িয়ে পড়ল আধবোজা পাতার ফাঁক দিয়ে আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে রইল নিম্প্রাণ নিথর দুটো চোখের মণি তাতে ফুটে উঠেছে মেলখড বংশের চোখের বিবম্ব দৃষ্টি।

পুকুরের ধারে, বহু শাখাপ্রশাখা ছড়ানো এক পুরনো পপলার গাছের নীচে বুড়ো সাপুকা ছোট্ট একটা কবর খুঁড়ল, বগলমাঝা করে কফিনটা সেখানে বয়ে নিয়ে এলো কেমন যেন একটা অস্বাভাবিক বাস্তবতার সঙ্গে মাটি চাপা দিল, তারপর বহুক্ষণ হৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগল কখন সেই কাটামাটির স্থূপ থেকে আঞ্জিনিয়া উঠে দাঁড়ায় শেষ পর্যন্ত আর অপেক্ষা করতে না পেরে জোরে চাবুক হাঁকড়ানোর মতো শব্দ করে নাক বাড়ি দিয়ে আন্ডাবলে ফিরে গেল। চালার খড়ের গাদা থেকে টেনে বার করল এক লিপি অডিকোলন আর অনেকটা খালি স্পিরিটের একটা ছোট্ট বোতল। একটা খালি বোতলের মধ্যে দুটোকে মিশিয়ে ভালো করে ঝাঁকাল, মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল রঙটা তারপর বলল,

‘আম্বার শান্তি হোক অক্ষয় স্বর্গলাভ হোক তোর, বাছ। একটা দেবশিশুর মত্ন হোক’

তরল দ্রব্যটা নিঃশেষে পান করল, ভীষণ ভাবে মাথা ঝাঁকতে ঝাঁকতে খানিকটা খেঁতো টমেটো গিলে সেটাকে ভেতরে চালান করে দিল তারপর বিচলিত হয়ে বোতলটার দিকে চেয়ে বলল, ‘আমাকে ভুলে যাস নে রে তুই, আমিও তোকে ভুলব না’ বলেই কঁদে ফেলল

তিন সপ্তাহ পরে ইয়েভগেনি লিঙ্গনিথকি টেলিগ্রাম করে জানাল যে ছুটি পেয়ে বাড়ি যশনা হয়েছে তাকে আনার জন্য তিন ঘোড়ার একটা গাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হল স্টেশনে। বাড়ির সমস্ত চাকরবাকর ততস্থ হয়ে উঠল হাঁস মুরগী কাটা হল বুড়ো সশকা কাটা তেড়ার গায়ের চামড়া ছাড়িয়ে রাখল আয়োজনটা এমন হল যেন বহু অতিথির সমাগম হতে চলেছে

ছোটকর্তার আগমনের আগের দিন আসার পথে গাড়িতে বদলের জন্য ঘোড়া পাঠিয়ে দেওয়া হল কামেনকা বসতিতে ছোটকর্তা এসে শৌচুল রাত্রে ঘনকনে ঠাণ্ডা গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি ঝরছে বাইরে। রাস্তার যেখানে যেখানে জল জমেছিল লষ্ঠানের আলোর রেখা তার ওপর পড়ে ঝিলঝিল করে কাঁপছে সদর দরজার সামনে এসে ঘুটির টুংটাং আওয়াজ ভুলে ঘোড়াগুলো ধেমে গেল। বন্ধ গাড়ির ভেতর থেকে ইয়েভগেনি বেরিয়ে এলো তার মুখে মৃদু হাসি, উত্তেজনায় বুক দূরদূর করছে। বুড়ো সশকার হাতে গরম বর্ষাতিটা ছুঁড়ে দিয়ে দেউড়ির সিঁড়ির ধাপ বয়ে গীতিমতো খোঁড়াতে খোঁড়াতে সে উঠতে লাগল হল ঘরের ভেতর থেকে পা ঘষটাতে ঘষটাতে ব্যস্তসমস্ত হয়ে বেরিয়ে এলো বুড়ো কর্তা, ঘরের কিছু আসবাব তার পায়ে ঠেকে এদিক ওদিক হটকে পড়ল।

খাবার ঘরে রাতের খাবার বাড়ল আঞ্জিনিয়া, তারপর ডাকতে গেল দুই কর্তাকে চাবির ফুটো দিয়ে দেখতে পেল বুড়ো বাপ ছেলেকে জড়িয়ে ধরে কাঁধের ওপর চুমু খাচ্ছে। বুড়োর বলিরেখা আঁকা লোলচর্ম ঘাড়টা অন্ন অন্ন কাঁপছে মিনিট কয়েক অপেক্ষা করে আঞ্জিনিয়া আবার উঁকি মেঝে দেখল এবারে দেখতে পেল ইয়েভগেনির থাকি রঙের ফৌজী শার্টের বোতামগুলো খোলা, মেঝের ওপর ছড়ানো একটা নিরাট ম্যাপের সামনে সে হাঁটু গেড়ে বসে আছে

বুড়ো কর্তা পাইপ থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছাড়তে ছাড়তে হাড়িসার আঙুলগুলো চেয়ারের হাতলে ঠুকছে আর ক্রুদ্ধকণ্ঠে গর্জন করছে

‘আলেগ্রেয়েভ? না না হতে পারে না’ আমি বিশ্বাস করি না’

ইয়েভগেনি শান্ত গলায় অনেকক্ষণ ধরে কী যেন বলে তাকে বোঝাতে লাগল, আঙুল দিয়ে মাপের ওপর দাগ কেটে দেখাল উত্তরে বুড়ো চাপা গলায় গরগর করে বলল

‘এক্ষেত্রে কম্যাণ্ডার ইন-চীফ ঠিক করে নি দৃষ্টিশক্তির অভাব কলতে হবে। হ্যাঁ তা যাই বল না কেন ইয়েভ্‌গেনি, ঠিক এই ধরনেরই দৃষ্টান্ত মেওয়া ফয় যুশ-জাপান যুদ্ধ থেকে। দাঁড়া, দাঁড়া। বলছি।’

আগ্নিনিয়া দরজায় টোকা দিল

‘কী হল?’ খাবার বাড়া হয়ে গেছে? এই যাচ্ছি।’

বুড়ো বেরিয়ে এলো। তাকে বেশ উত্তেজিত ও প্রফুল্ল দেখা গেল তার দু’চোখে যুবকনোচিত উৎসাহের ঝলক। মাত্র গতকাল মাটির তলা থেকে পুরনো এক বোতল মদ বার করা হয়েছিল, বাশ-বেটায় মিলে খাবার টেবিলে সেটা শেষ করল বোতলটার গায়ের লেবেল শেওলা পড়ে সবুজ হয়ে গেছে, বিবর্ণ হলেও লেবেলের ওপরকার তারিখটা তখনও পড়া যাচ্ছিল ১৮৭৯ সাল

খাবার পরিবেশন করতে করতে ওদের দু’জনের প্রফুল্ল মুখের দিকে তাকিয়ে আগ্নিনিয়া আরও বেশি করে অনুভব করতে লাগল তার নিজের নিঃসঙ্গতা একটা আতি কালার ভেতর দিয়ে প্রকাশ হতে না পেরে ভেতরে ভেতরে তাকে যন্ত্রণা দিতে লাগল। মেয়েটা মারা যাওয়ার পর পর প্রথম কয়েক দিন সে কঁাদার চেষ্টা করে, কিন্তু কান্না আর কিছুতেই বেরোতে চায় না তার গলার ভেতরে কান্না ঠেলে ওঠে, কিন্তু চোখে জল আসে না। ফলে পাশাণের মতো কঠিন বেদনা তার বুকে জিগুণ ভারী হয়ে চেপে থাকে। সে খুব ঘুমোতে লাগল, চেষ্টা করল ঘুমের মধ্যে ভুলে থাকার, শাস্তি খোঁজার কিন্তু ঘুমের মধ্যেও শিশুর অশরীরী ডাক তার কানে এসে বাজে কখন কখন তার মনে হয় মেয়ে যেন পাশেই শুয়ে আছে তখন সে সরে আসে, বিছানা হাতড়াতে থাকে কখনও শুনতে পায় মেয়ে যেন অল্পট গলায় ফিসফিস করে বলছে, ‘মা জল খাব’ হিমালীতল চৌঁট নেড়ে বিড়বিড় করে বলে আগ্নিনিয়া, লক্ষ্মী আমার সোনা আমার।’

এমনকি জাগ্রত অবস্থায় কঠিন বাস্তব পরিবেশের মধ্যেও তার মাঝে মাঝে মনে হয় মেয়ে যেন তার হাঁটুর কাছে ঘেঁষে রয়েছে, তারপর হঠাৎ সংবিৎ ফিরে আসতে দেখতে পায় মেয়ের মাথার কৌকড়া চুলে হাত বুলাবার জন্য কখন হাতখানা বাড়িয়ে দিয়েছে।

বাড়িতে আসার পর তিন দিনের দিন ইয়েভ্‌গেনি সন্ধ্যা গড়িয়ে খাবার পরও অনেকক্ষণ পর্যন্ত আস্তাবলে বুড়ো সাশ্কার কাছে বসে বসে দনের ধারে সুদূর অতীতে স্থাধীন মুক্ত কসাকমের জীবনযাত্রার নানা কাহিনী, সেকালের নানা ঘটনার সাদামাঠা বিবরণ তার মুখ থেকে শুনল। সেখান থেকে ইয়েভ্‌গেনি যখন উঠল তখন আটটা বেজে গেছে উঠানে হাওয়ার দাপাদাপি চলছে, পায়ের নীচে কাদা

প্যাচ প্যাচ করছে। মেঘের ফাঁকে কসাকের চৌফের মতো ঊঁকি মারছে হলুদ এক ফালি চাঁদ। চাঁদের আলোতেই ঘড়ি দেখল ইয়েভগেনি, তারপর রওনা দিল চাকরদের মহলের নিকে। দেউড়ির কাছে এসে সে একটা সিগারেট ধরাল, এক মূহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে কী বেন ডাবল, তারপর কাঁধদুটো ঝাঁকুনি দিয়ে নিঃশ্বাস সদর দরজার ধাপ বয়ে ওপরে উঠল। সম্ভবপূর্ণে খিলটা তুলতে কাঁচ করে আওয়াজ তুলে দরজা খুলে গেল। বাড়ির যে অংশে আগ্নিনিয়া থাকত সেখানে ঢুকে সে ফস্ করে দেশলাই জ্বালাল।

‘কে? কে ওখানে?’ কন্ঠ্যটা গায়ে টেনে আগ্নিনিয়া জিজ্ঞেস করল  
‘আমি।’

‘একুনি জামাটা পরে নিই।’

‘দরকার নেই। মিনিটখানেকের বেশি থাকছি না।’

ওড়ারকোটটা ফেলে দিয়ে বিছানার এক পাশে বসল ইয়েভগেনি।

‘তোমার বাচ্চা মেয়েটা মারা গেছে।’

‘মারা গেছে,’ আগ্নিনিয়া প্রতিধ্বনি তুলে বলল।

‘তুমি বেশ পাল্টে গেছ। তা ত হবেই। সম্ভান হারানোর কষ্ট যে কী সে কি আর আমি বুঝি নে? কিন্তু আমার মনে হয় অযথাই নিজেকে কষ্ট দিচ্ছ। তাকে ত আর ফিরিয়ে আনতে পারবে না। তোমার বরষও বেশ কম, এখনও অনেক ছেলেপুলে হবার সময় আছে তোমার। তাই বলি কি অমন ভেঙে পড়ার কিছু নেই। নিজেকে সামলে তোল, যা হয়েছে তার সঙ্গে আপস করে ফেল। মোট কথা, বাচ্চা মারা গেছে বলে যে সবই হারিয়েছ এমন নয়। একবার ভেবে দেখ। গোটা জীবনটাই ত পড়ে আছে সামনে।’

আগ্নিনিয়ার হাতে চাপ দিল ইয়েভগেনি, কর্তৃত্বের ভঙ্গিতে স্নেহভরে তার গায়ে হাত বুলাল, গলার স্বর নীচু করে খেলিয়ে কথা বলতে লাগল। তারপর আওয়াজ আরও নামিয়ে আগ্নিনিয়ার কানের কাছে ফিসফিস করতে লাগল, শেষকালে যখন শুনতে পেল চাপা কান্নায় গুম্বাতে গুম্বাতে আগ্নিনিয়া একেবারে ভেঙে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, তখন তার কান্না-ভেজা গাল আর চোখে চুন্নু বেতে লাগল।

মেয়েমানুষের মন কবুণা আর স্নেহের কাঙাল। দুঃসহ নৈরাশ্যের ভারে শ্রান্ত ক্রান্ত আগ্নিনিয়া নিজেকে হারিয়ে ফেলে - সে তার বহুকালের সুপ্ত উদ্দাম কামনা নিয়ে আত্মসমর্পণ করল ইয়েভগেনির কাছে, কিছু নির্লজ্জ লালসাতৃষ্টির অভূতপূর্ব, সর্বধ্বংসী কালো তরঙ্গটা ভেঙে পড়তে তার কাপট্য যখন সে সংবিল ফিরে পেল তখন তীব্র চিৎকার করে উঠল, কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে গায়ের পাতলা জামা



সবল ক'রে অর্ধশয় অবস্থায় ছুটে সদর দরজার সামনে বেরিয়ে এলো দরজা খোলা রেখে তার পেছন পেছন ইয়েভগেনিও বেরিয়ে এলো দ্রুত পায়ে চলতে চলতে শুভারকোটটা গায়ে দিল তাড়াতাড়ি পা চালান। হাঁপাতে হাঁপাতে বাড়ির বারান্দায় উঠতে উঠতে সে আনন্দ আব তৃপ্তির হাসি হাসল পবন সুখের উল্লাসে তখন সে ভাসছে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে নরম ফোলা ফোলা বুকখানা ঘসতে ঘসতে সে ভাবল, 'একজন সং লোকের দৃষ্টিতে বিচার করলে আমার কাজটাকে হীন ও নীতিবিহীন বলতে হয় গ্রিগোরি আমি আমার পড়শীর ঘরে সিঁধ কেটেছি কিন্তু ফ্রন্টে ত আমি বাপু নিজের জীবন বিপন্ন করেছি! গুলিটা আরেকটু ডান দিকে লাগলেই হয়ে যেত আমার মাথাটা ছেঁদা করেও ত দিতে পারত। তাহলে এতক্ষণে আমি মাটির নীচে পড়ে মরতাম, আমার দেহটা পোকামাকড়ের খোরাক হত জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে তাই কামনা বাসনা নিয়ে বাঁচতে হবে। সবই করার অধিকার আছে আমার' নিজের এই ভাবনায় মুহূর্তের জন্য সে আতঙ্কিত হয়ে উঠল কিন্তু পরক্ষণেই তার চোখের সামনে ভেসে উঠল আক্রমণের ছবিটি। বিশেষ করে সেই মুহূর্তটি যখন মরা ঘোড়ার পিঠ থেকে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে গুলি খেয়ে সে পড়ে যায় ঘুমে ঢুলে পড়তে পড়তে সে নিজেকে এই বলে বুঝ দিল, 'আজ্ঞা কাল এ নিয়ে ভাবনাচিন্তা করে দেখা যাবে এখন ঘুমোতে হয় ঘুম পেয়েছে এখন'

পরদিন সকালে খাবার ঘরে আক্সিনিয়াকে একা পেয়ে সে তার দিকে এগিয়ে গেল, মুখে অপরাধীর হাসি। কিন্তু আক্সিনিয়া দেয়ালের সঙ্গে পিঠ ঠেকিয়ে ঠেলে দেওয়ার ভঙ্গিতে সামনে হাতদুটো বাড়িয়ে দিল, কিন্তু হয়ে চাপা গলায় গর্জ্জ বলল, 'খবরদার, এগোবি না বলছি, মুখপোড়া'

জীবন তার অলিখিত অহিন মানুষের ওপর চাপিয়ে দেয় এই ঘটনার তিন দিন পরে ইয়েভগেনি রাত্রিবেলায় আবার আক্সিনিয়ার ঘরে এলো, এবারে কিন্তু আক্সিনিয়া তাকে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিল না।

## তেইশ

ডাক্তার স্নেগিরিওভের চোখের হাসপাতালের লাগোয়া একটা ছোট্ট বাগান আছে

মস্তুর আলোপাশে গলিঘুঞ্জির ধারে এরকম কিস্তী ছাঁটকাট করা বাগান অনেক। এগুলোর দিকে তাকালে শহরের ক্রান্তিকর দুষ্ক ইটকাট পাথর থেকে চোখের বিশ্বাস পাওয়া ত দূরের কথা বরং আরও তীব্র আরও বেদনাদায়ক ভাবে মনে

পড়ে অরণ্যের বাধ্যবন্ধনহীন স্বাধীনতার কথা হাসপাতালের বাগানে তখন শরতের আধিপত্য চলছে বাগানের পথগুলো কমলা ও তামাটে বস্তুর ঝরাপাতায় ছেয়ে গেছে, ভোরবেলার হিমে নেতিয়ে পড়েছে ফুলগুলো বাগানের শ্যামল ঘাসের আশ্রয়ে সবুজ জলের বান ডেকেছে আবহাওয়া যেদিন ভালো থাকে সেদিন ঈশ্বরভক্ত মন্ডার গির্জাগুলোর একের পর এক ঘণ্টাধ্বনি শুনতে শুনতে ব্রোঞ্জীরা বাগানের পথগুলোতে ঘুরে বেড়ায়। বাদলা দিনে (সে বছর আবার ওরকম দিনই বেশি ছিল) তারা এক ওয়ার্ড থেকে আরেক ওয়ার্ডে ঘোরাফেরা করে, নয়ত চুপচাপ বেড-এ শুয়ে থাকে যেমন নিজেরা নিজেরদের ওপর বিরক্ত হয়ে ওঠে তেমনি অন্যদের ওপরেও।

হাসপাতালের বেশির ভাগ রোগীই বেসামরিক লোকজন যুদ্ধে আহত হয়ে যারা এসেছে তাদের রাখা হয়েছে একটা আলাদা ওয়ার্ডে।' সংখ্যায় তারা পাঁচজন ইয়ান ভারেইকিস নামে এক লম্বা লাতভীয় বাদামী চুল, সুন্দর করে ছাঁটা চাপদাড়ি, নীল চোখ, আঠাশ বছর বয়সী সূত্রী চেহারা ড্যাগুন সৈন্য ইভান ভুবলেভস্কি - ভল্যাদিমির প্রদেশে তার জন্ম কসিখ নামে সাইবেরিয়ার এক রাইফেল-সৈনিক, বৃগিন নামে এক ছোটখাটো হলদে চামড়ার ইটফটে সৈনিক আর গ্রিগোরি মেলেকভ সেপ্টেম্বরের শেষে আরও একজন যোগ হল। সন্ধ্যাবেলায় সবাই যখন চা খেতে বসেছে এমন সময় সদর দরজায় বেল বেজে উঠল - একটানা অনেকক্ষণ ধরে বাজল গ্রিগোরি করিডরে উঁকি মেরে দেখল। সামনের বড় ঘরটায় এসে চুকেছে তিনজন লোক একজন নার্স, চেকোস্লোভাকীয় লম্বা কোর্তা গায়ে একজন পুরুষ, তৃতীয় আরেকজনকে তারা ধরে ধরে নিয়ে আসছে। লোকটার গায়ের নোংরা ফৌজী শাট আর বুকের কাছে বাদামী রঙের রক্তের দাগ দেখে মনে হয় সম্ভবত সবে রেল স্টেশন থেকে এসেছে সন্ধ্যাবেলাই তার অপারেশন হয়ে গেল অপারেশনের প্রস্তুতি নিতে সামান্যই সময় লাগল (অপারেশনের যত্নপাতি ফুটিয়ে জীবানুমুক্ত করা হচ্ছিল ওয়ার্ডে তার শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল) প্রস্তুতির পর নবাগতকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হল কয়েক মিনিট বাসে সেখান থেকে ভেসে এলো চাপা গানের সুর গোলাার টুকরো লেগে লোকটার একটা চোখ ধৌতলে গেছে। চোখের বাকি অংশটুকু যখন অপারেশন করে তুলে ফেলা হচ্ছিল সেই সময় ক্লোরোফর্মের আচ্ছন্ন হয়ে ঘুমের ঘোরেরই সে গান গাইতে লাগল, অস্পষ্ট বিড়বিড় করে থিস্তি করতে লাগল। অপারেশনের পর অন্যান্য আহত সৈনিকরা যেখানে আছে সেই ওয়ার্ডে তাকে এনে রাখা হল। পরের দিন ক্লোরোফর্মের বিষমিথ্য করা গভীর ঘোরটা কেটে গেলে মাথা মাফ হয়ে আসতে ওয়ার্ডের অন্য রোগীদের সে জানাল যে জার্মান ফ্রন্টে ডেরবার্গের

কাছে সে আহত হয়। তার নাম গারান্জা। মেশিনগান চালাত, বাড়ি তার ইউক্রেনের চের্নিগভ প্রদেশে। কয়েক দিনের মধ্যেই বিশেষ করে গ্রিগোরির সঙ্গে তার দাবুণ খাতির জমে গেল। ওদের বেড ছিল পাশাপাশি। ডাক্তারের সঙ্গ্যার রাউণ্ড শেষ হয়ে গেলে ওরা দু'জনে অনেকক্ষণ ধরে নীচু গলায় গল্পগুজব করতে থাকে।

‘কী হে কসাকের পোলা হালচাল কামন?’

‘অঙ্ককার বেমন সাদা।’

‘হইছে? খুবলাইয়া লইছে নাকি চক্ষুডা?’

‘ইঞ্জেকশন নিতে হচ্ছে।’

‘কয়ডা লাগাইছে?’

‘আঠারোটো।’

‘ব্যথা লাগে?’

‘না, বড় আরাম লাগে।’

‘অগ আকবার গিয়া কও না চক্ষুডা তুইল্যা ফ্যালাক।’

‘সবাইকেই কানা হতে হবে এমন কোন কথা আছে নাকি?’

‘হ, তা ঠিক কইছ।’

গ্রিগোরির এই খিটখিটে তিরিকি মেজাজের প্রতিবেশীটির সবেতেই অসন্তোষ। সরকার, লড়াই, নিজের ভাগ্য, হাসপাতালের খাবার, রাঁধুনি, ডাক্তার তার ধারাল জিন্ডের শাপ শাপান্ত থেকে কিছুই নিস্তার নেই।

‘আইচ্ছা এই যে আমি তুমি আমরা ব্যাবাক লড়াই কইরত্যাছি এইড্যার কারণ কইবার পার ডাই?’

‘কারণ আবার কী? সবাই যে জনো, আমরাও সেই জনো।’

‘হুঃ তা কইলে চলব ক্যান? আমারে বুঝাইয়া দাও, আরে ছ্যামরা বুঝাইরা কও আমারে।’

‘ছাড় দেবি।’

‘ধুস! তুমি একডা ভোদাই সেখত্যাছি না না ব্যাপারডা জাইল্যা রাখা ভালো আমরা মুচ্ছ কইরত্যাছি বুর্জোয়াগো লইগ্যা এইডা বুইঝবার পার? বুর্জোয়া কারে কয়? তারা অইল গিয়া এক আতের সুখের কবুতর।’

কথার মাঝে মাঝে বিস্তিখৈউডের লক্সা ফোড়ন দিয়ে দুর্বোধ্য শব্দগুলো সে বুঝিয়ে দিতে লাগল গ্রিগোরিকে।

‘অমন তাড়াহুড়ো করো না হে তোমার ওই ইউক্রেনীয় টানে কথা আমি ভালো বুঝতে পারি নে ছাই,’ কথার মুখে গ্রিগোরি তাকে বাধা দিয়ে বলে।

‘দ্যাহ কারবার! ভারী আমার মস্তকল আইছে যে, বুইঝবার পার না?’

‘একটু আস্তে আস্তে বল

‘আমি ত আস্তে আস্তেই কইত্যাছি রে ভাই, বেশ বুঝবার নাহান কইর্যাই কইত্যাছি। তুমি ভাব, লড়াই কইরত্যাছ জারের লইগ্যা, কিন্তু জিগাই, এই জার লোকডা কান্ডা? জার অইত্যাছে একডা বেহেড মাতাল, আর জারের বিবি যে জারিৎসা হেইড্যা একডা খানকী মইয়া, অণ লগে যেই ইগল ফুটা জমিদার আছে, লড়াই থাইক্যা তারা দুই হাতে মুনাফা লুটত্যাছে। কিন্তু লড়াই আমগো গলার ফাঁস বুঝলা কিনা? দ্যাখ কারবার। হালার কারখানার মালিক ভোদকা টানে, আর সিপাইয়ে উকুন বাছে - দুয়েরই বড় কষ্ট। কারখানার মালিকের ভাইগো ছিকা ছিডত্যাছে, আমগো মজুরগো হাতে হারিকেন এই হইল নিরম এই ভাবেই চইলা আইত্যাছে। স্যাবা কইর্যা যাও হে কসাকের পোলা, স্যাবা কইর্যা যাও। আরও একটা ক্রসও জুইট্যা যাইতে পারে - ইয়া বড়, ওক কাঠের ’ অমনিতে কথা বলছিল সে ইউক্রেনীয় ভাষায়, কিন্তু কোন কোন মুহুর্তে যখন উত্তেজিত হয়ে পড়ছিল তখন কৃষ্ণ ভাষা ব্যবহার করছিল, সেই সঙ্গে তোড়ে গালিগালাজ, তবে মনের ভাব প্রকাশের মধ্যে কোন অস্পষ্টতা ছিল না।

গ্রিগোরির কাছে এতকাল পর্যন্ত যা অজ্ঞাত ছিল দিনের পর দিন সেই সত্যের বীজমন্ত্র সে তার মস্তিষ্কে ঢোকাতে লাগল। যুদ্ধের প্রকৃত কারণ সে ব্যাখ্যা করল, ঈশ্বরাচারী সরকারকে নিয়ে কঠোর বাজবিশ্বপ করল গ্রিগোরি আপত্তি তোলার চেষ্টা করল, কিন্তু গারানজা তার অতি সাদামাঠা, মারাত্মক বকমের সাদামাঠা প্রশ্ন দিয়ে তাকে কোনঠাসা করে দিল, তাই সায না দিয়ে আব কোন উপায় রইল না গ্রিগোরির।

সবচেয়ে ভয়ঙ্কর যা তা হল এই যে গ্রিগোরি নিজে মনে মনে ভাবতে শুরু করল যে গারানজার কথাই ঠিক, তার কথার প্রতিবাদ করতে গ্রিগোরি অক্ষম, কোন বিরুদ্ধ যুক্তি তার ছিল না, আসলে ঝুজলেও পাওয়া যেত না গ্রিগোরি মনে মনে ভেবে আতঙ্কিত হয়ে উঠল যে এই বুদ্ধিমান বদরাগী ইউক্রেনীয় লোকটি জার মাতৃভূমি, কসাক হিসাবে তার নিজের সামরিক কর্তব্য সম্পর্কে আগেকার যাবতীয় ধ্যানধারণা ধীরে ধীরে অথচ সুনিশ্চিত ভাবে খুলিসাং করে দিচ্ছে

যার ওপর ভিত্তি করে জীবন সম্পর্কে গ্রিগোরির চিন্তাধারা গড়ে উঠেছিল গারানজা হাসপাতালে আসার এক মাসের মধ্যে সে সব জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। এর আগেই অবশ্য তাতে পচন ধরেছিল, যুদ্ধের অধীনীন বীভৎসতার জং পড়ে ক্ষয়ও দেখা দিয়েছিল। এখন প্রয়োজন ছিল একটি মাত্র ধাক্কায় ধাক্কাটা লাগার সঙ্গে সঙ্গে গ্রিগোরির চমক ভাঙল। জাগরণ ঘটল তার ভাবনার যার

চাশে ক্রান্ত অবসন্ন হয়ে পড়ে ছিল গ্রিগোরির ঘন। সে ছটফট করছিল, তার নিজের বুদ্ধিবৈচিত্র্যের সাধ্যতীত এই সমস্যার সমাধান খুঁজছিল, সেখান থেকে বেরোবার পথ খুঁজছিল, অবশেষে গারানজার উত্তরের মধ্যে তা খুঁজে পেয়ে তার আনন্দ হল।

একদিন বেশ রাতে গ্রিগোরি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। গারানজাকে ডেকে তুলল। গারানজার খাটের ধারে বসল। জানলার পর্দা নামিয়ে দেওয়া হয়েছে, তার ফাঁক দিয়ে ভেতরে এসে ঢুকছে শরতের চাঁদের ফিকে সবুজ আলো। সদ্য ঘুম ভাঙা গারানজার দু'গালে মেটে রঙের কালচে খাঁজ ফুটে উঠেছে, তার চোখের বসে যাওয়া কালো কেটিরদুটো ভিজে চকচক করেছে। সে হাই তুলল, শীতে জড়পড় হয়ে চামরে পা ঢাকল।

‘কী অইল? ঘুমাও না ক্যান?’

ঘুম নেই। আমার চোখের ঘুম উবে গেছে। তুমি আমাকে একটা কথা বুঝিয়ে বল দেখি - যুদ্ধ কারও কাছে আশীর্বাদ, কারও কাছে বা অভিশাপ।

‘বেশ ত, তারপর?’ বলে গারানজা সশব্দে হাই তুলল।

‘দাঁড়াও’ রাগে আগুন হয়ে ফিসফিস করে বলল গ্রিগোরি। ‘তুমি বলছ যে বড়লোকদের দরকারে আমাদের পাঠানো হচ্ছে মরণের মুখে তাহলে সাধারণ লোকের কথা কী বলবে? তারা কি বোঝে না? এমন কেউ কি নেই যে তাদের বলে? সামনে এগিয়ে এসে বললেই ত পারে, ‘ভাইসব একবার তাকিয়ে দেখ, কিসের জন্যে তোমরা প্রাণ দিচ্ছ, নিজেদের শরীরের রক্ত ঢালছ?’

‘সামনে আগাইয়া আসব? কও কি তুমি? তুমি আগাইয়া যাও না দেখি ক্যামন? আমরা দুইজনে এইখানে মলখাগড়ার বনের ভিতরে বইস্যা। হাসের নহাল গুজগুজ ফুমফুম কইরত্যাছি, কিছু গলা চড়াইয়া খেউ খেউ কইর্যাই দ্যাখ না সঙ্গে গুলি খাইবা। সাধারণ মানুষ বয়রা - কানে শোনে না যুদ্ধে তাগো ঘুম ভাঙব। কালো মেঘ থাইক্যাই বজ্রবিদ্যুতের শোবে ঝড়বুটি লামে।’

‘কী করতে হবে? তাই বল না শালা। তুমি আমার মনের ভেতরটা একেবারে ওলট পালট করে দিয়েছ।’

‘তোমার মনডা কী কয়?’

‘জানি না, বুঝতে পারছি না, গ্রিগোরিকে স্বীকার করতে হয়।’

‘আমারে যদি কেউ পাহাড়ের চূড়া থাইক্যা ঠেইল্যা ফলাইয়া দিতে চায়, আমিও তারে ঠেইল্যা ফলাইয়া দিতে চামু, যেইডা দরকার তা অইল বিনা দ্বিধায় বন্দুক ঘুরাইয়া ধরা। দরকার অইল মাইনঘেরে যারা নরককুণ্ডে চালান কইরত্যাছে তাগো গুলি কইর্যা যারা জাইন্যা রাখবা। গারানজা উঠে বসল বিছানার

ওপরে, দাঁতে দাঁত ঘসতে ঘসতে হাতদুটো বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'বিশাল এক ঢেউ উঠতছে, সব ভাসাইয়া লইয়া যাইব!'

'তুমি তাহলে বলতে চাও সব ওলট পালট করে দিতে হবে?'

'হ। পুরানা নোংরা যেমন ফলাইয়া দিই - এই সরকারেরও ছুইড্যা ফলাইয়া দিতে হইব ভবলোকগণের গায়ের ছালচামড়া ছুইল্যা লইতে হইব, অগ ভাইঙা গুড়াইয়া দিতে হইব, অরাই অসহ্য কইর্যা তুলছে সাধারণ মানুষের জীবন।'

'আচ্ছা নতুন সরকার যখন হাতে ক্ষমতা পাবে তখন লড়াইয়ের কী হবে? এই রকমই ত আবার ঘোঁট পাকাবে আমরা না হলেও আমাদের ছেলেপুলেরা লড়বে। লড়াইয়ের গোড়া ওপড়াবে কী করে? কী করে ফংস কববে তাকে, যখন যুগের পর যুগ ধরে মানুষ লড়াই করে আসছে?'

'কথাডা ঠিক, অনাদিকাল হইতে লড়াই চইল্যা আসত্যাছে আর যতদিন এই দুনিয়ায় শোষণকারী সরকার থাকব ততদিন তা চইলতেও থাকব এই হইল ঘটনা। কিছু যখন প্রতিটি দ্যাশে মেহনতীর সরকার হইব তখন আর কেউ লড়াই কইরব না এই কাজ্জই কইরবার লাগব মরুক গিয়া হালার সুমুন্দির পুতরা হুরাঘীর বাচ্চাগুলান! তা হইবও হইতেই হইব জার্মানি কও ফরাসী কও ইংলেন্ডই চাষীমজুরের সরকার হইব। তখন আর আমরা লড়াই কইরবার যামু কোন্ কামে? সীমান্ত থাকব না। হিংসা ঘেঁষ বইল্যা কিছু থাকব না সারা দুনিয়া জুইড়া জীবন হইব খাটি সুনার। আঃ।' গগানজ্ঞা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, গোর্গের ডগা কামড়াল, তার একমাত্র চোখটা চকচক করে উঠল, স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো হেসে বলল, 'আঃ গ্রিনা, আমি ভাই সেই দিনডা চক্ষে দ্যাখবার লাইগ্যা বিন্দু বিন্দু কইর্যা আমার এই দ্যাহের লহু খরাইতে রাজী আছি সেই দিনডা দ্যাখার লাইগ্যা আমার বুকের ভিতরডা উথালপাথাল করে '

ভোর হরে আসা পর্যন্ত ওদের দু'জনের কথা চলল ডোরের ধূসর আলো আঁধারির মধ্যে গিগোরি আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল এক অস্বস্তিকর ঘূমে।

সকালে কিছু কঠের টেচামেটি আর কান্নাকাটির শব্দে গিগোরির ঘুম ভেঙে গেল

ইভান ভুবলেভস্কি নামে এক রোগী বিছানায় উপুড় হয়ে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে নাকি কান্না কাঁদছে। হাসপাতালের একজন নার্স, ইয়ান ডারেইকিস আর কসিন্ধ তাকে ঘিবে দাঁড়িয়ে আছে।

'জমন নাকি কান্না কাঁদছে কেন?' কবলের তলা থেকে মাথা বার করে কর্কশ স্বরে জিজ্ঞেস করল বর্দিন

'চোখ ভেঙে ফেলেছে গেলাসের ভেতর থেকে বার করে আনতে গিয়ে

হাত থেকে পড়ে ভেঙে গেছে,' কসিখ উন্নর দিল তার কথার সুরে সমবেদনার চেয়ে হিংস্র উন্নাসের ডাবটাই সম্ভবত বেশি প্রকট হয়ে পড়ল

বুশী বনে যাওয়া কোন এক জার্মান বংশোদ্ভূত কৃত্রিম চোখের কারবারী দেশপ্রেমে উদ্ভুদ্ধ হয়ে যুদ্ধে আহত সৈনাদের বিনামূল্যে তার পণ্যদ্রব্য বিতরণ করতে লেগেছে আগের দিন সত্যিকারের চোখের মতো সুন্দর নীল একটা কাচের চোখ ভুবলেভঙ্কির জন্য বাছাই করা হয়েছিল। সুস্থ কাজ আর কাজে বলে শিল্পের বিচারে জিনিসটা এত নিখুঁত যে ঝুঁটিয়ে দেখলেও আসল চোখের সঙ্গে তার ফারাক ঝুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। চোখটা কোটরে লাগানোর পর ভুবলেভঙ্কি একটা বাচ্চা ছেলেব মতো আনন্দে মেতে উঠল, হাসাহাসি লাফলাফি শুরু করে দিল

ভুলাদিমির জেলার টানে সে বলতে লাগল 'বাড়িতে একবার বাই না আগে যে-কোন মেয়ে ঠকে যাবে। আগে বিয়ে করব, তারপর স্বীকার করব যে আমার একটা চোখ কাচের।'

বুর্দিন লোকটা সব সময় দুনিয়া নামে একটা মেয়ে আর আরশোলায় তার জামা কাটার বিষয় নিয়ে গান গাইত। ভুবলেভঙ্কির কথা শুনে হো হো করে হাসতে হাসতে সে বলত, লালা বলে কিনা ঠকাবে।'

এখন শেষকালে কিনা এমন একটা দুখটিনা সুন্দর চেহারা ছেকরাকে কিনা এখন নিজের গাঁয়ে ফিরতে হবে কানা চোখ নিয়ে

'অমন কাঁদিস নে বাপু, আরেকটা নতুন পেয়ে যাবি, গ্রিগোরি সাঙ্কনা দিয়ে বলল

কৈদে কৈদে ভুবলেভঙ্কির মুখ ফুলে গেছে। গ্রিগোরির কথা শুনে সে মুখ তুলে তাকাল কানা চোখের লাল দগদগে শূন্য কোটরটা ভিজে টলটল করছে

'তা পাওয়া যাবে না। একটা চোখের দাম তিন শ' বুঝল। আব দেবে না '

'আহা চোখের মতন চোখ ছিল একটা। প্রতি্যেকটা সুস্থ শিরা ওর গায়ে আঁকা ছিল।' তারিফ করে বলল কসিখ

সকালের চা পানের পর ডাক্তারের এসিস্টেন্ট মহিলার সঙ্গে ভুবলেভঙ্কি সেই জার্মানের দোকানে গেল। জার্মানটি এখানেও তাকে আরেকটা চোখ উপহার দিল

'জার্মানরা ত দেখছি বুশীদের চেয়ে ভালো।' ভুবলেভঙ্কি আনন্দে আঁখিহারা হয়ে বলল। 'বুশী ব্যবসায়ী তোমাকে কচুপোড়া খাওয়াবে, কিন্তু এ লোকটা একটা কথাও বলল না '

সেপ্টেম্বর কেটে গেল সময়ের হাত দিয়ে দিনগুলো যেন আর গলতে চায় না অসহ্য ক্রান্তিতে ভবা দীর্ঘ দিনগুলোর যেন শেষ নেই সকাল নয়টায় চা,

সঙ্গে প্রত্যেক রোগীকে একটা ছোট্ট রেকাবে করে দেওয়া হয় ফিন্নফিনে দু'চিলতে ফরাসী বুটি আর কড়ে আঙুলের সমান এক টুকরো মাখন দুপুরের খাওয়ার পরও রোগীদের খিদে থেকে যায়। সন্ধ্যায় চা চায়ের ফাঁকে ফাঁকে মুখ বদলানোর জন্য ঢোকে ঢোকে জল খাওয়া। একদল রোগী ছাড়া পায়, আবার নতুন আরেক দল আসে ফৌজী ওয়ার্ডে (আহত সৈন্যদের ওয়ার্ডকে হাসপাতালের অন্য রোগীরা এই নাম দিয়েছিল) প্রথম ছাড়া পেল কসিখ নামে সাইবেরীয়টি, তারপর লাভভিয়ার ভারেইকিস অক্টোবরের শেষে পালা এলো গ্রিগোরির।

হাসপাতালের মালিক ডাক্তার স্নেগিরিওভ সুপুরুষ ব্যক্তি, নিখুঁত ছাটা একটুখানি দাড়ি তার মুখে অঙ্ককার ঘরের মধ্যে একটা বিশেষ দূরত্ব থেকে জ্বলন্ত কতকগুলো বড় বড় অঙ্কর আর সংখ্যা দেখিয়ে গ্রিগোরিকে পড়তে বললেন। পরীক্ষার পর গ্রিগোরির দৃষ্টিশক্তি সন্তোষজনক বলে তিনি বায় দিলেন চোখের হাসপাতাল থেকে সে ছাড়া পেল, কিন্তু মাথার ঘাটা সারার মুখে এসে হঠাৎ বেড়ে গিয়ে সেখানে সামান্য পূজু জমতে থাকায় তাকে ভেতরস্থায়ী স্ট্রীটের আরেকটা হাসপাতালে বদলি করে দেওয়া হল। গারানজার কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় গ্রিগোরি জিজ্ঞেস করল 'আর কি দেখা হবে?'

'দুইড়া পাহাড়ে কি আর কোন কালে এক জায়গায় হয়?'

'তুমি আমার চোখ খুলে দিয়েছ হে বোঁটন সে জন্যে ধন্যবাদ। এখন আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি, আমার মনটা তাই বিবিরে উঠেছে।'

'রাজিয়েমেন্টে যখন ফিরবা তখন হগল কসাকরে এই বিষয়ে দুই-চাইর কথা কইও বেশ।'

'আর যদি কোন সময় চেনিগোভের কাছাকাছি গাবোখভকা গ্রামে গিয়া পড়তাইলে খোঁজ কইরো কর্মকার আন্ড্রেই গারানজার। দ্যাখলে খুশি হমু, আইচ্ছা আস তাইলে।'

ওরা আনিসন করল একটিমাত্র চোখের কঠিন দৃষ্টি, বালিরগ্লেব গাল মুখের চারধারে দরদভরা সিন্ধু কতকগুলো রেখা - ইউক্রেনীয় লোকটির এই ছবি বহুকালের জন্য আঁকা হয়ে রইল গ্রিগোরির স্মৃতিপটে।

পরের হাসপাতালে গ্রিগোরিকে দিন দশেক কাটাতে হল, ইতিমধ্যে তার মনের ভেতরে গারানজার শিক্ষার বিধক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে, নির্দিষ্ট কোন সিদ্ধান্তে আসতে না পেরে সে নিজের মনের সঙ্গে যুদ্ধে লাগল। ওয়ার্ডে আরও বারো রোগী ছিল তাদের সঙ্গে বিশেষ একটা কথাবার্তা সে বলে না তার চলাফেরার প্রতিটি ভঙ্গির মধ্যে প্রকট হয়ে উঠতে লাগল কেমন যেন একটা অস্থির উদ্বাস্ত ভাব ভর্তি করার সময় হাসপাতালের বড় ডাক্তার গ্রিগোরির অবুশী চেহারাটার



ওপর এক ঝলক চোখ বুলিয়ে নিয়ে ‘অস্থির মতি’ বলে মত প্রকাশ করলেন

প্রথম কয়েক দিন গ্রিগোরি জ্বরের তাড়সে পড়ে রইল, বিছানায় শুয়ে শুয়ে কানের ভেতরে অবিরাম ভৌ ভৌ শব্দ শুনতে লাগল

ঠিক এই সময়ই একটা ঘটনা ঘটে গেল

ভরোনেজ থেকে ফেরার পথে রাজপরিবারের এক গণ্যমান্য ব্যক্তি অনুগ্রহ করে হাসপাতালে দর্শন দিতে এলেন। গোলায় আগুন লাগলে ইঁদুরের পাল যেমন ছুটোছুটি করে তাঁর আগমন বার্তা পেয়ে হাসপাতালের ডাক্তার কর্মচারীদের মধ্যে সেদিন সকাল থেকে সেই রকম ছুটোছুটি শুরু হয়ে গেল। আহতদের ধুয়েমুছে পরিষ্কার করা হল যথাসময়ের আগে বিছানার চাদর পাল্টে তাদের ব্যক্তিবাস্ত্র করে তোলা হল এমনকি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিটির কথার কী ভাবে উত্তর দিতে হবে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তার সময় কী রকম আচরণ করতে হবে, একজন অধস্তন ডাক্তার তাঁর শিবিরে পড়িয়ে দেওয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেল আহত রোগীরাও রেহাই পেল না তাদের মধ্যে কেউ কেউ আগে থেকে গলার স্বর নামিয়ে কথা বলতে শুরু করে দিল। দুপুরের দিকে সদব দবজার কাছে মোটরগাড়ি বর্ণ বেঞ্জে উঠল, হাসপাতালের খোলা দরজা দিয়ে বেশ কিছু সংখ্যক পারিষদমূল পরিবৃত্ত হয়ে গণ্যমান্য ব্যক্তিটি ভেতরে এসে ঢুকলেন (আহতদের মধ্যে একজন বেশ ফুর্তিবাক্ত ও বাচাল ধরনের লোক - পরে বন্ধুদের বলে বেড়াতে থাকে যে আবহাওয়া সেদিন মকুরমতো ভালো ও শান্ত থাকা সত্ত্বেও হোমরা চোমরা অতিথিদের আগমনমুহুর্তে হাসপাতালের ব্রেডক্রস চিহ্ন আঁকা ফ্লাগটা হঠাৎ কেন যেন ভীষণ ভাবে পতপত করতে থাকে, আর রাত্তার উল্টো দিকে নাপিতের দোকানের সাইনবোর্ডের ওপরে সুন্দর কেশবিন্যাস করা যে পুরুষমানুষটি আঁকা আছে সে আভূমি নত হয়ে প্রণাম বা ভক্তিগদগদগোছেব একটা ভঙ্গি করে ওয়ার্ডগুলো ঘুরে ঘুরে দেখে বেড়াতে শুরু করলেন তিনি। রাজকীয় ব্যক্তিটি এমন সব বোকা বোকা প্রশ্ন করতে লাগলেন যেগুলো তাঁর মতো বংশের আব সমাজের লোকের পক্ষেই শোভা পায়। আহতরা ছোট ডাক্তারের পরামর্শমতো কুচকাওয়াজের সময় তাদের যেমন শেখানো হয়েছিল তার চেয়েও বেশি চোখ ছানাবড়া করে ‘যে আঙ্কে হুজুর’ কিংবা ‘আঙ্কে না হুজুর’ এই রকম সব উত্তর দিতে থাকে তাদের উত্তরের সঙ্গে সঙ্গে ভাষা রচনা করে যাচ্ছিলেন হাসপাতালের বড় ডাক্তার কথা বলতে বলতে তিনি মাঠের মধ্যে বিদেকাটির খোঁচা খাওয়া সাপের মতো শরীরটা এমন কিলবিল করতে লাগলেন যে দূর থেকেও তাঁকে দেখলে মায়া হয়। রাজকীয় মহাশয়টি বেড-এ ঘুরে ঘুরে ছোট ছোট বিগ্নহ বিতরণ করতে লাগলেন ঝলমলে উর্দিব একটা ভিড় আর দামী আতরের ভুরভুরে গন্ধের ঢেউ

এগিয়ে এলো গ্রিগোরির দিকে। গ্রিগোরি দাঁড়িয়ে রইল তার বিছানার পাশে তার চোখদুটো ফুলে আছে, মুখের দাড়িগোঁফ না-কামানো শরীর শুকিয়ে গেছে বাদামী বজ্রের চোয়ালের হাড় উঁচু হয়ে আছে, থেকে থেকে মৃদু মৃদু কঁপছে, তাইতে প্রকাশ পাচ্ছে তার মনের উত্তেজনা।

গ্রিগোরির মাথার ভেতরে তখন টগবগ করে কুণ্ডলী পাকিয়েঠেলে উঠছে একটা চিন্তার ডেলা ‘এই যে ওবা যাদের তৃপ্তির জন্য সাতপুরুষের ভিটেমাটি থেকে তাড়িয়ে এনে আমাদের ঠেলে দেওয়া হয়েছে মৃত্যুর মুখে শালা হারামজাদা। বস্ত্রচোষার দল এই এরাই উকুন হয়ে আমাদের পিঠেব ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছে এদের জনোই না আমরা অন্যের ক্ষেতের পাকা ফসল ঘোড়ার খুরে মাড়িয়েছি, যারা কোন অপরাধ করে নি অচেনা অজানা সেই সব মানুষকে খুন করেছি? ফসলকাটা খোঁচা খোঁচা মাঠে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে চলতে যন্ত্রণায় চিংকার করেছি? আর আতঙ্ক? আমাদের ঘরসংসার থেকে ওরা আমাদের ছিনিয়ে নিয়েছে, মিলিটারী ব্যাংকে উপোস করিয়ে মেরেছে ডাবতে ডাবতে ক্রোধ পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে মাথার ভেতরে, তার ঠেচিদুটো ধরধর করে কঁপতে থাকে ঝেয়েমেয়ে দিবাি ভুঁড়ি বাগিয়েছ তোমরা কেমন তেল চুকচুকে সব চেহারা। শরতাব্দের ঝাড় তাদের সবগুলোকে ধরে ধরে ওখানে পাঠাতে হয় ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে বন্দুক ঘাড়ে বুলিয়ে দিয়ে পাঠাতে হয় উকুন ছড়িয়ে দিতে হয় সারা গায়ে পচা রুটি আর পোকাপড়া মাংস খাওয়াতে হয়।’

রাজকীর অনুচরদলের মধ্যে উপস্থিত তেল চুকচুকে অফিসারদের ওপর গ্রিগোরি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল তারপর ভাব নিশ্চিন্ত চোখের নজর রাজপরিবারের সেই বিশিষ্ট ব্যক্তির বস্ত্রের মতো কুলে পড়া গালের ওপর এসে ঠেকে গেল।

‘একজন দন কসাক। সেন্ট জর্জ ক্রস পেয়েছে,’ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে গ্রিগোরিকে দেখিয়ে হাসপাতালের বড় ডাক্তার বললেন তাঁর গলার স্বর শূন্য মনে হল যেন ক্রসটা তিনিই পেয়েছেন।

‘একটা ছোট বিগ্রহ দেওয়ার জন্য তুলে ধরে মান্যবর জিজ্ঞেস করলেন ‘কোন জেলাব?’

‘ভিওশেনস্কায়া হুজুর’

‘কিসের জন্য ক্রস পেলে?’

মান্যববের উজ্জ্বল দুই চোখের শূন্য দৃষ্টিতে একটা ক্লান্তি আর অভুচির ভাব খিঁচি খিঁচি জ্বলতে লাগল তার বাঁ চোখের বাদামী রঙের জুরটো বিশেষ শিক্ষার গুণ সামান্য ওপরের দিকে উঠে গেল তাতে তাঁর মুখের ভাব আরও ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠল মুহূর্তের জন্য গ্রিগোরি বুকের ভেতরে একটা হিমের স্পর্শ আর

কিসের যেন একটা খোঁচা উপলব্ধি করল। ঠিক এই রকমই উপলব্ধি তার মনে জাগত আক্রমণের প্রথম মুহূর্তে। তার চৌদ্দদুটো বৈকে গেল, ধরধর করে কাঁপতে লাগল, থামতে পারল না সে।

‘আমার আমার একটু ইয়ে করতে যেতে হবে বড় দরকার হুজুর ছোট বাইরে’ খ্রিগোরি ভেঙে পড়া গাছের মতো একটা ঢাল খেল, সীতিমতো অস্বস্তি করে বাটের তলাটা দেখিয়ে দিল।

গণ্যমান্য ব্যক্তিটির বাঁ চোখের জুঁটটা আরও ওপরে উঠে গেল, বিগ্রহ ধরা হাতটা অর্ধেক পথেই থেমে গেল। স্থির হয়ে রইল। তিনি সভাচেকা খোয়ে গেলেন, অসম্ভাব্যভাবে তাঁর নীচের চৌদ্দদুটো ঝুলে পড়ল। সঙ্গেই পাকাচুল জেনারেলটির দিকে ফিরে ইংরেজিতে তিনি কী যেন বললেন সান্সোপাগদের মধ্যে বাইরের লোকজনের প্রায় অগোচরে একটা চাপা অস্বস্তির ভাব খেলে গেল। তকমা-আটা এক চাঙা মিলিটারী অফিসার সাদা ধবধবে দস্তানামোড়া হাত দিয়ে চোখ ঢাকল। দ্বিতীয় একজন মাথা হেঁট করে রইল। তৃতীয় একজন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল চতুর্থজনের মুখের দিকে। পাকাচুল জেনারেল সসম্মুখে হেসে মহামান্যকে ইংরেজিতে কী যেন বলতে অশেষ কণ্ঠগাপরবশ হয়ে বিগ্রহটা তিনি খ্রিগোরির হাতে গুঁজে দিলেন। এমনকি খ্রিগোরির কাঁধটা হাত দিয়ে ছুঁয়ে তার প্রতি পরম অনুগ্রহ প্রকাশ করলেন।

সম্মানীয় অতিথিরা চলে যাওয়ার পর খ্রিগোরি বিছানার ওপর লুটিয়ে পড়ল। বালিশে মুখ গুঁজে সে পড়ে রইল কয়েক মিনিট, তার কাঁধদুটো কাঁপতে লাগল সে কাঁদছে না হাসছে বোঝা কঠিন। কিন্তু যখন উঠল তখন তার চোখদুটো লুকনো, এমনকি যেন একটু বেশি রকমেরই উজ্জ্বল। তবুনি হাসপাতালের বড় ডাক্তারের ঘরে তার ডাক পড়ল।

‘ফেরেববাজ কোথাকার!’ বরগোসের রঙ চটা চামড়ার মতো দাডিটা আঙুলে মুঠো করে পাকাতো পাকাতো ডাক্তার শুরু করলেন।

‘আমি তোমার ফেরেববাজ নই, শালা হাবামজাদা!’ খ্রিগোরি আর সামলাতে পারল না। তার নীচের চোখালটা ঝুলে পড়ল। ডাক্তারের দিকে লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে যেতে যেতে সে বলল, ‘ফ্রন্টে ত আর যেতে হয় না তোমাদেব’ তারপর নিজেই নিয়ে সংযতকণ্ঠে বলল, ‘আমাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিন’

ডাক্তার তার এই বুদ্ধমুষ্টি দেখে ভয়ে পিছিয়ে গিয়েছিল, এবারে লেখার টেবিলের পেছনে ঘুরে গিয়ে একটু নরম করে বলল

‘দিজি পাঠিয়ে চুলোয় যাও’

গ্রিগোরি বাইরে চলে এলো। হাসির গমকে তার মুখটা কাঁপছে, চোখে উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টি।

মহামান্য অতিথির সমক্ষে তার এহেন কন্মার অযোগ্য উৎকট আচরণের ক্ষম্য হাসপাতালের প্রশাসন দপ্তর ভিনদিন তার খাওয়া বন্ধ করে দিল। কিন্তু ওয়ার্ডের অন্যান্য রোগীরা আর হার্ণিয়া-রোগী নরম স্বভাবের বাবুচাঁট গ্রিগোরিকে খাওয়াতে লাগল।

## চরিত্র

তেসরা নভেম্বর বাত্রে গ্রিগোরি ভিওলেনত্ভার্সা জেলা শিবিরের প্রথম গ্রাম নিজনে-ইয়াবলানোভস্কিতে এসে পৌঁছুল। ইয়াগদনোয়ে তখনও আরও বেশ কয়েক ক্রোশ দূরে ছাড়া ছাড়া বাড়িঘরের উঠোনের পাশ দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে গ্রিগোরি চলতে লাগল। কুকুরগুলো সচকিত হয়ে সাড়া দিতে লাগল। পাড়ের উইলোবোষের ধারে ছেলেছোকরারা গান গাইছে। তাদের কচিগলার গান ভেসে আসছে।

গহন বনের আড়াল থেকে উঠছে অগ্নি কলমলিয়ে।  
গোঁফ বাগিয়ে চলছে যতক কসাক সেপাই টপকিয়ে।  
অগ্রে তাদের বুক চিড়িয়ে নবীন যুবক এক অকিসার,  
বাদবাকিরা হুকুম মেনে পিছন পিছন চলছে তার।

একটা বেশ জোরালাে নিখুঁত গলা সপ্তমে ধরল

ভাইবে সবাই হও আগুয়ান কিসের দিধা কিসের ডর?

কতকগুলো সুরেলা গজা উদ্ভাস হয়ে একসঙ্গে ধরল

উঠব মোরা সটান গিয়ে ওদের গড়ের আধার পর  
দুর্জনেয়ে হানতে আঘাত যে জন প্রথম এগিয়ে যায়।  
গৌরব আর যশের মুকুট জ্ঞানবে শোভে তার মাথায়।

এক সময় গ্রিগোরি নিজেই কতবার এই গান গেয়েছে। বহুকালের পরিচিত এই কসাক গানের কথাগুলো একান্ত আপনার কোমল এক ধরনের আবাক্ত

অনুভূতিতে খ্রিগোরিকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। একটা সিরসিরে ঠাণ্ডা স্রোত তার চোখে বিঁধতে লাগল, বুকের ভেতরটা চেপে ধরল কসাক-পন্নীর বাড়িঘরের মাথার ওপরকার চিমনি থেকে বেরিয়ে আসা ঝাঁঝাল ঝুটের শোঁয়ায় প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিতে নিতে লম্বা লম্বা পা ফেলে গ্রামের ভেতর দিয়ে এসিয়ে চলল খ্রিগোরি। পেছন পেছন ভেসে আসতে লাগল

গড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে মোর প্রকাশ এক প্রাচীর হৈন  
পড়ছে এসে গোলাগুলি মৌমাছিদের ঝাঁক যেন  
দনের কসাক তেজ দেব তার অন্ত যখন হাতে  
অসির যায়ে টুকরো করে, সঙ্গীন দিয়ে গাঁথে

‘কতকাল আগে যখন আমার ছোকরা বয়স ছিল, তখন আমিও এমনি গান গাইতাম এখন আমার সেই গলা গেছে, জীবনে যা দেখলাম তাতে গানের ভাল কেটে গেছে এখন আমি পলটন থেকে সামান্য কয়েক দিনের ছুটি নিয়ে চলেছি আরেকজনের বোয়ের কাছে, আমার কোন চালচুলো নেই, মাথা গোঁজার কোন ঠাই নেই, আমি যেন একটা নেকড়ে পাহাড়ের সবু খাতের ভেতরে আমার ডেরা সমান তালে ক্লাস্ত পা ফেলে চলতে চলতে এই সব কথা ভাবতে লাগল খ্রিগোরি, নিজের জীবনের নিদারুণ পরিণতির কথা ভেবে মনে মনে তিক্ত হাসি হাসল সে। গ্রামটা পেরিয়ে একটা গডানে টিলার মাথায় উঠে সে পিছন ফিরে তাকাল শেষ বাড়িটার জানলাব ভেতর দিয়ে একটা বোলানো বাস্তির হলদেটে আলো এসে পড়েছে, সেই আলোয় দেখতে পেল জানলার ধারে এক বুড়ি বসে বসে চরকায় সুতো কাটছে

খ্রিগোরি বাস্তা ছেড়ে ঘাসের ওপর দিয়ে চলল। ভিজে ঘাস পাতলা হিমের সর পড়ে মচমচ করছে। পরের দিন দিনের আলো থাকতে থাকতে যাতে ইয়াগদনোয়েতে পৌঁছানো যায় সেই উদ্দেশ্যে চিৎ-এর ধারে প্রথম যে গ্রামটা পড়ে সেখানে রাত কাটানো স্থির করল গ্যাচেভ গ্রামে সে যখন এসে উপস্থিত হল তখন মাঝরাত পার হয়ে গেছে গ্রামের কিনারার প্রথম বাড়িটাতে সে উঠল ডোরের বেগুনী রঙের আলো-আঁধারি যখন সবে কাটতে শুরু করেছে তখন সেখান থেকে বেরিয়ে পড়ল

ইয়াগদনোয়েতে সে যখন এলো তখন রাত নিশেকে বেড়াটা লাফিয়ে পার হয়ে সে আন্তরলের পাশ দিয়ে চলল। সেখান থেকে সামান্য বুড়োর বড়ঘড়ে কাশির আওরাজ কানে এলো খ্রিগোরি দাঁড়িয়ে পড়ল। ডাক দিল

‘সামান্য দাদু, ঘুমিয়ে পড়েছ নাকি?’

‘দাঁড়াও কে ওখানে? গলাটা যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে কে?’

মোট বনাত কাপড়ের কোর্টা কাঁধের ওপর ফেলে সাস্কা বুড়ো বেয়ি়ে এলো

‘জয় ভগবান খ্রিস্টা যে কোথেকে? দেখ দেখি কাণ্ড?’

দু’জনে আলিঙ্গন করল সাস্কা বুড়ো নীচ থেকে খ্রিগোরির চোখের দিকে তাকিয়ে বলল

‘ভেতরে এসো, তামাক খাও’

‘না থাক, কাল হবে এখন যাই’

‘এসেই না, যা বলাছি শোন।’

অনিচ্ছাসঙ্গেও বুড়োর কথা না মেনে পারল না খ্রিগোরি তক্তপোষের ওপর বসল। সাস্কা খাঁকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করতে লাগল, খ্রিগোরি অপেক্ষা করে রইল

‘বেশ বুড়ো দাদু, বৈচে আছ তাহলে? দুনিয়ায় পা ঠুকে বেড়াচ্ছ এখনও?’

‘তা এই একটু আধটু ঠুকঠুক করে চলে ফিরে বেড়াচ্ছি বৈকি! আমি হলেম গিয়ে চকমকি পাথরের মতো আমার কোন ক্ষয় নেই’

‘আন্নিনিয়ার খবর কী?’

‘আন্নিনিয়া? ভগবানের রূপায় ভালোই আছে,’

বুড়োর কাশির দমক উঠল খ্রিগোরি বুঝতে পারল কাশিটা আসলে বুড়োর ভান - কাশির আড়ালে সে অস্বস্তি ঢাকার চেষ্টা করছে।

‘তানিয়াকে কোথায় কবর দিয়েছে?’

‘বাগানে, পপলার গাছের নীচে।’

অচ্ছা এবারে বল কী বলবে

‘কাশি যে ভাই খ্রিশা, কাশিতে বড় কষ্ট পাচ্ছি’

‘কী হল?’

সবাই বৈচে বর্তে আছে কঠা ঢুকু ঢুকু মদ খেয়ে যাচ্ছেন। মুখ্য লোকের মতো এতটুকু বুদ্ধিবিবেচনা না করে গিলছেন।

‘আর আন্নিনিয়া? আন্নিনিয়ার খবর কী?’

‘আন্নিনিয়া এখন খাস চাকরানী হয়েছে।’

‘সে আমি জানি।’

তামাক খেতে চাও? তা পাকাও না কেন? আমার তামাকটা টেনে দেখ, পয়লা নম্বরের

‘চাইনে তোমার তামাক যা বলার বল দেখি বাপু, নইলে এই চললাম আমি আমি বুঝতে পারছি খ্রিগোরি শরীরের ভর দিয়ে ঘুরে বসতে তক্তপোষটা মচমচ করে উঠল সে বলল, ‘আমি বেশ বুঝতে পারছি তুমি কিছু

একটা লুকোচ্ছ বুকের কাছে পাথরের মতো ভারী কিছু একটা লুকিয়ে রেখেছ।  
মারবে ত মারই না ওটা দিয়ে '

'মারবই ত '

'মার ।'

'এই মারলাম না: আর চূপ কবে খাকা যায় না শিশা আর শক্তি নেই  
আমার চূপ করে থাকাটা দুঃখের ব্যাপার হবে।'

'বল বল তাহলে।' আদরের ভঙ্গিতে পাথরের মতো ধপ করে বুড়োর কাঁধে  
হাত রেখে তাকে অনুনয় করে বলল শ্রিগোবিন্দ। গর্জিত হয়ে বসে সে অপেক্ষা  
করতে লাগল।

'সাপ পুষে রেখেছ তুমি।' আনাড়ির মতো হাতের আঙুলগুলো ছড়িয়ে  
অস্বাভাবিক সরু কর্কশ গলায় চটেচিয়ে বলল সান্ধা বুড়ো 'মুখকলা দিয়ে  
সাপ পুষে রেখেছ। ইয়েভগেনির সঙ্গে চলাচলি শুরু করে দিয়েছে কেমন লাগছে  
শুনতে।'

বুড়োর খুঁতনির গোলাপি কাটা সাগের খাঁজ বয়ে করেক বিন্দু চটচটে গাঁজলা  
গড়িয়ে পড়ল সেটা মুছে নিয়ে হাতের তেলোটা মোটা সূতীর কাপড়ের পাকামায়  
ঘসল।

'সত্যি বলছ?'

'নিজের চোখে দেখেছি। রোজ রাতে ইয়েভগেনি যায় ওর কাছে। যাও না,  
হয়ত এখনও ওর কাছেই আছে '

'তা হলে এই ব্যাপার। ' গাটিগুলোতে চাপ দিয়ে শ্রিগোবিন্দ মটমট করে  
আঙুল মটকাল গালের কঁচকে ওঠা মাংসপেশীগুলো স্বাভাবিক করার চেষ্টায় ঘাড়  
গেঁজ করে অনেকক্ষণ বসে রইল। তার মাথার ভেতরে ঘুঙুড়ের মতো একটিনা  
রিমঝিম আওয়াজ বেজে চলল।

'মেয়েমানুষ হচ্ছে বেড়ালের জাত যে গায়ে মাথায় হাত বুলোবে তারই  
আদর কাড়বে বিশ্বাস করতে নেই, একদম বিশ্বাস করবে না।' সান্ধা বুড়ো বলল।

একটা সিগারেট পাকিয়ে ধরিয়ে শ্রিগোবিন্দের হাতে গুঁজে দিল।

'নাও, টান '

শ্রিগোবিন্দ দুটো টান মারল। তারপর আঙুলে চেপে নিভিয়ে ফেলল। একটা  
কথাও না বলে বেরিয়ে পড়ল চাকরদের মহলের জানলার সামনে এসে দাঁড়িয়ে  
পড়ল। গভীর ভাবে ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিতে লাগল। বার কয়েক টোকা মারার  
জন্ম হাত তুলল। কিন্তু প্রতিবারই কোন এক অদৃশ্য শক্তির মোচড় খেয়ে হাতটা  
যেন পড়ে গেল শেষকালে টোকা মারল। প্রথম বার সে টোকা মারল বেশ

সংযত ভাবে, একটা আঙুল বঁকিয়ে কিছু তারপরই ঐষ্য হারিয়ে ফেলল - থপ করে দেয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে অনেকক্ষণ ধরে জানলার ফ্রেমের ওপর দুমদাম ঘুসি চালাতে লাগল। জানলার ফ্রেম কৈপে উঠল, ঝনঝন শব্দে আতর্নাদ করে উঠল জানলার কাচ, রাতের নীলচে আলো তার গায়ে তরঙ্গ ভুলল।

মুহুর্তের জন্য বলকে উঠল আঙ্গিনিয়ার মুখটা ভয়ে যেন লম্বা হয়ে খুলে পড়েছে। আঙ্গিনিয়া দরজা খুলে দিল। চিৎকার করে উঠল গ্রিগোরিকে দেখতে পেয়ে গ্রিগোরি সেই মুহুর্তে বাইরের বারান্দাতেই তাকে জড়িয়ে ধরল, তার চোখে চোখে তাকাল।

ওঃ এমন খাঙ্কা মারছিলে না এদিকে আমি ত খুমিয়েই পড়েছিলাম।

তুমি আসবে ভাবতেই পারি নি। এগো

'ঠাণ্ডায় জমে গেল্যাম'

আঙ্গিনিয়া অনুভব করল গ্রিগোরির বিশাল সেইটা আগাগোড়া ভীষণ ভাবে ঠকঠক করে কাঁপছে, এদিকে হাতদুটো তার যেন জুরে পুড়ে যাচ্ছে আঙ্গিনিয়া স্নিগ্ধিমতো ব্যস্ত হয়ে পড়ল, বাতি জ্বালল, ঘরের মধ্যে ছুটোছুটি করতে লাগল, যর গরম করার চুল্লিটা ধরল তার ঘসামাজা মসৃণ কাঁধের ওপর একটা পাতলা ফুরফুরে পশমের চাদর জড়ানো।

'আশাই করতে পারি নি কতকাল চিঠি লেখো নি। ভাবল্যাম

আর এলে না বুঝি আমার শেষ চিঠিটা পেরেছিলে? ভেবেছিলাম তোমাকে কিছু জিনিস পাঠাব তারপর ভাবল্যাম, দেখি কোন চিঠি পাই কিনা

থেকে থেকে সে গ্রিগোরির মুখের দিকে তাকাতে লাগল রক্তিম অধরপুটের সেই আড়ষ্ট হাসিটুকু কিছু জমট বৈধেই রইল।

গ্রেটকোটটা না ছেড়েই গ্রিগোরি বেক্সির ওপর বসে পড়ল দাড়ি-না-কামানো গালদুটো জ্বালা করছে। গ্রেটকোটের সঙ্গে লাগানো মাথার ঢাকনাটাও সে খোলে নি সেখান থেকে অধনিম্নলিত চোখের ওপর এসে পড়েছে গাঢ় ছায়া। ঢাকনাটা সে খুলতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ ব্যস্তসমস্ত হয়ে তামাকের বটুয়াটা বার করল, পকেটের ভেতরে সিগারেটের কাগজ হাতড়াতে লাগল। একটা বিপুল আন্তিতে সে আঙ্গিনিয়ার মুখের ওপর দ্রুত চোখ বুলাল

গ্রিগোরির অনুপস্থিতিতে তার সর্বনাশা রূপ আরও খুলেছে

তার সুন্দর মাথাটা নড়াচড়া করার ভঙ্গির মধ্যে কর্তৃত্বব্যঞ্জক নতুন কী যেন একটা দেখা দিয়েছে। তবে তার হালকা বড় বড় চূর্ণকুন্তল আর চোখজোড়া সেই আগের মতোই আছে। কিন্তু তার সর্বগ্রাসী আগুনধরা রূপ এখন আর গ্রিগোরির নয় থাকেই কী করে? এখন যে সে বাবুর ছেলের রক্ষিতা।



তোমাকে এখন আর বাড়ির ঝিয়ের মতো দেখাচ্ছে না, বরং দেখে মনে হচ্ছে তুমিই যেন এখানে ঘর-গেরস্থানি চালাও।

আগ্নিনিয়া চমকে উঠে গ্রিগোরির দিকে এক বলক তাকাল, জোর করে হাসল  
সঙ্গে খলিটা টানতে টানতে গ্রিগোরি দরজার দিকে এগিয়ে গেল

‘কী হল? কোথায় যাচ্ছ?’

‘বাইরে গিয়ে একটু তামাক টেনে আসি।’

‘ডিম ভাজা হয়ে গেল, একটু দাঁড়াও না।’

একুনি আসছি।’

দেউড়ির ধাপের ওপর এসে গ্রিগোরি তার ফৌজী থলেটা খুলল খালেক  
নীচ থেকে আর্মির পবিত্র একটা জামার মধ্যে সমস্তে জড়ানো একখানা কাস্ককরা  
শাল বার করল জিনিসটা সে জিতোমিরের এক ইহুদী ফিরিওয়ালার কাছ থেকে  
দু’বাবলে কিনেছিল। এতদিন চোখের মণির মতো সমস্তে রক্ষা করে আসছিল,  
যখন মাঠে যেত তখন মাঝে মাঝে বাব করে দেখত, মুগ্ধ হয়ে দেখত তার  
বিচিত্র রামধনু বস্তুর বাহ্যিক আগে থাকতে অনুভব করার চেষ্টা করত, বাড়ি  
ফিরে নক্সাদার কাপড়টা যখন আগ্নিনিয়ার সামনে খুলে মেললে ধরবে তখন কী  
খুশিই না সে হবে। এখন এটা একটা অকিঞ্চিৎকর উপহার দনের ভাটি এলাকার  
সবচেয়ে ধনী জমিদারের ছেলের উপহারের সঙ্গে কি আর গ্রিগোরির পাল্লা দেওয়া  
শোভা পায়? একটা শুকনো কান্না ঠেলে বেরিয়ে আসছিল। কোনমতো সেটাকে  
চেপে রাখল গ্রিগোরি। শালটাকে টুকবো টুকরো করে ছিড়ে ফেলে দেউড়ির  
ধাপের নীচে গুঁজে দিল থলেটা বেষ্টের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর ঘরে  
গিয়ে ঢুকল।

‘বোসো, তোমাব পায়ের জুতো খুলে দিচ্ছি গ্রিশা

কঠিন কাজে অনভ্যস্ত ফরসা ধবধবে হাতে আগ্নিনিয়া টেনে খুলল গ্রিগোরির  
পায়ের ভারী মিলিটারী বুট। তার হাঁটুতে মুখ গুঁজে অনেকক্ষণ ধরে নীরবে  
কৌদল গ্রিগোরি তাকে কৈদে হালকা হতে দিল। শেষে জিজ্ঞেস করল, ‘অমন  
কৌদছ কেন? আমি আসায় খুশি হও নি নাকি?’

শিশুগিরই বিছানায় শুয়ে গ্রিগোরি ঘুমিয়ে পড়ল

আগ্নিনিয়া ওপরের কোন মেটা জামাকাপড় গায় না দিয়েই ঘর ছেড়ে  
দেউড়ির ধাপের ওপর গিয়ে দাঁড়াল ঠান্ডা হাড কাঁপানো বাতাস বইছে, উত্তরে  
হাওয়া হুহু আর্দ্রনাদে শোকার্ত বিনাপ গেয়ে চলেছে, তারই মধ্যে ভেজা থাম  
জড়িয়ে ধরে আগ্নিনিয়া দাঁড়িয়ে বইল ভাব না হওয়া পর্যন্ত ওই একই ভাবে  
এক ঠায় সে দাঁড়িয়ে রইল।

সকালবেল্যায় খেটকোটটা গায়ে চাপিয়ে খিগোরি বাবুদের মহলে গেল।  
পশুলোমের কোর্তা গায়ে, হলদে হয়ে আসা আত্মাখান চুপি মাথায় নিয়ে বুড়ো  
কর্তা দেউড়ির ধাপের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল।

এই যে সেন্ট জর্জ ক্রস পাওয়া বীরপুরুষ! তুমি যে এর মধ্যে সত্যিকারের  
পুরুষমানুষ হয়ে উঠেছ ভাই।'

চুপিতে হাত ঠেকিয়ে খিগোরিকে স্যালুট করল সে, হাতটা বাড়িয়ে দিল।

'তারপর কত দিনের মতো?'

'দু'সপ্তাহ থাকব হুজুর।'

'তোমার মেয়েটাকে কবর দিলাম আমরা বড় দুঃখের কথা।'

খিগোরি চুপ করে বইল হাতে দস্তানা গলাতে গলাতে দেউড়ির ধাপের  
ওপর ইয়েভগেনির আবির্ভাব ঘটল।

'আরে খিগোরি যে? কোথেকে?'

খিগোরির চোখের সামনে অন্ধকার ঘনিয়ে এলো, তবু সে হাসল।

'মস্কো থেকে ছুটিতে এলাম।'

'বেশ, বেশ। তোমার চোখে চোট লেগেছিল। তাই না?'

'হ্যাঁ, হুজুর।'

'সে খবর আমি শুনছি কী বীরপুরুষ হয়ে উঠেছে, তাই না বাবা?' খিগোরির  
দিকে মাথা নাড়িয়ে লেফটেন্যান্ট আস্তাবলের দিকে ঘুরে নিকিতিচকে ডেকে বলল।  
'ঘোড়া জেগে উঠেছে।'

ধীরস্থির প্রকৃতির নিকিতিচ ঘোড়ার সাজ পরানোর কাজ শেষ করল, অগ্রসর  
ভাবে আড়চোখে খিগোরির দিকে তাকাল। ধূসর রঙের টগবগে ঘোড়াটাকে দেউড়ির  
কাছে নিয়ে এলো। হালকা একাগ্যাডির চাকার নীচে তুবাকজমট মাটি মচমচ  
করতে লাগল।

'হুজুর, অনুমতি করেন ত পুনরো দিনের মতো আপনার গ্যাডি আজকে  
আমিই চলাই?' ইয়েভগেনির দিকে ফিরে মুখে একটা অমায়িক হাসি টেনে  
খিগোরি বলল।

'বেচারি ধরতে পারে নি তাহলে।' তৃপ্তির হাসি হেসে ইয়েভগেনি মনে মনে  
ডাবল। পীশনের আডালে চকচক করে উঠল তার চোখদুটো।

'বেশ ত. এতই যখন তোমার ইচ্ছে, চল।'

'এ তোমার কেমন বাপার? সব এলে. এর মধ্যেই কাঁচা বয়সের বোঁটাকে  
ঘরে ফেলে চললে?' বুড়ো কর্তা নরদণ্ডের যদু হাসল।

খিগোরি হেসে উঠল। উদ্ভব দিল

‘বৌ ত আর ডালুক নয় যে জঙ্গলে পালিয়ে যাবে।’

সে কোচবক্সে গিয়ে উঠে বসল। আসনের নীচে চাবুকটা গুঁজে লাগাম গুছিয়ে নিল হাতে

ওঃ যা চালানটা চালাব না আন্ধকে ইয়েভ্‌গেনি নিকলায়েভিচ।’

‘চালাও চালাও, বখশিস মিলবে।’

‘আপনাদের কাছে অমনিতেই আমাদের স্বপ্নের শেষ নেই। আমার আত্ম-নিয়াকে এই ভাবে খাইয়ে পরিয়ে রেখেছেন তার জন্যে ধন্যবাদ।’

বলতে বলতে গ্রিগোরির গলা ভেঙে গেল। একটা অস্বস্তিকর সন্দেহ লেফটেন্যান্টের মনের মধ্যে নাড়াচাড়া দিয়ে উঠল। মনে মনে ভাবল, ‘তাহলে কি ও জানে? ধূং কী সব আক্ষেপাজ্জে ভাবছি। কী করে জানবে? না, না, তা হতে পারে না।’ আসনে হেলান দিয়ে সে একটা সিগারেট ধরাল

‘শিগুগির শিগুগির ফিরে এসো কিছু।’ গাড়ি চলতে থাকলে বুড়ো লিস্তনিথ্‌স্কি পেছন থেকে চোঁচিয়ে বলল।

গাড়ির চাকার নীচ থেকে বরফজমা মাটি ভেঙে ছুঁচের মতো তীক্ষ্ণ ধুলোর কণা ছিটকে বেরোতে লাগল।

গ্রিগোরি ঘোড়ার মুখের লাগাম কষে ধরে টান মারল ঘোড়া প্রচণ্ড বেগে ছুটতে লাগল। পনেরো মিনিটের মধ্যে তারা টিলার ওপারে চলে এলো। প্রথম যে নাবাল জায়গাটা পড়ল সেখানেই গ্রিগোরি কোচবক্স থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল, ঝটকা টানে আসনের নীচ থেকে চাবুকটা বার করে আনল।

‘কী ব্যাপার?’ লেফটেন্যান্ট ভুরু কৌচকাল

‘কী ব্যাপার, তা টের পাইয়ে দিচ্ছি।’

গ্রিগোরি চাবুকটা সামান্য শূন্যে দোলাল। প্রচণ্ড জোরে লেফটেন্যান্টের মুখের ওপর আঘাত করল। তারপর চাবুকের ডগাটা হাতে চেপে ধরে বাঁট দিয়ে মুখে, হাতে সমানে পিটিয়ে চলল, তাকে ধাতস্থ হওয়ার এতটুকু অবকাশ মিল না। পাঁশনে ভেঙে চুরে গিয়ে কাচের একটা টুকরো তার ভুবুর খানিকটা ওপরে কেটে বসে গেল

লেফটেন্যান্ট গোড়ার দিকে দু’হাতে মুখ ঢাকতে লাগল, কিন্তু আঘাত বড় ঘন ঘন পড়তে লাগল। চাপ চাপ রকমে আর প্রচণ্ড ক্রোধে তার মুখটা বিকৃত হয়ে উঠল এই অবস্থায় সে লাফিয়ে উঠে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করল, কিন্তু গ্রিগোরি পিছিয়ে গিয়ে কবজির ওপর এক ঘা মেরে তার ডান হাতটা অবশ করে দিল

‘আত্মনিয়ার বদলা। আমার বদলা আরও একটা আত্মনিয়ার বদলা। আমার।’

চাবুক শিস দিয়ে চলেছে, সপাং সপাং ঘা পড়ছে তারপর ঝিগোরি ঘুসি মেরে তাকে শক্ত এবড়োষেবড়ো রাস্তার ওপর দিয়ে গড়িয়ে ফেলে দিল, মিলিটারী-বুটের লোহার নাল লাগানো গোড়ালি দিয়ে নির্মম ভাবে লাগি মারতে লাগল তাকে। শক্তি ফুরিয়ে আসতে একাগাড়িতে চড়ে বসল, একটা হাঁক দিয়ে লাগামে প্রচণ্ড টান মেরে উর্ধ্বাশ্বাসে ছুটিয়ে দিল ঘোড়াটাকে। বাড়ির গেটের কাছে গাড়িটাকে থামিয়ে রেখে চাবুকটা হাতে জড়িয়ে খোলা গ্রেটকোটের কুল পায়ে বেধে হেঁচট খেতে খেতে চাকরদের মহলের দিকে ছুটল।

দড়াম করে দরজাটা খুলে যেতে সেই শব্দে ঘুরে তাকাল আঞ্জিনিয়া  
'হারামজাদী! খানকি মাসী।'

সপাং করে আওরাজ তুলে আঞ্জিনিয়ার মুখে এসে পড়ল চাবুক

ঝিগোরি হাঁপাতে হাঁপাতে আসিনা থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো সাদ্কা বুড়োর প্রপ্নের কোন উত্তর না দিয়ে জমিদারবাড়ি ছেড়ে চলে গেল। মাইলখানেক চলে আসার পর আঞ্জিনিয়া তার নাগাল ধরল।

আঞ্জিনিয়া তখন ভয়ঙ্কর হাঁপাচ্ছে, ঝিগোরির পাশাপাশি নীরবে চলতে চলতে মাঝে মাঝে হাত দিয়ে তাকে ছোঁওয়ার চেষ্টা করতে লাগল।

একটা জায়গায় রাস্তা বৈখানে দু'ভাগ হয়ে গেছে সেখানে রাস্তার ধারে ধু ধু স্তম্ভভূমির মাঝে রোদে জ্বলে বাদামী ছোপ ধরা এক মন্দিরের কাছে আসার পর আঞ্জিনিয়া যেন যত দূর থেকে অচেনা গলার বলল, 'খিশা, ক্ষমা কর আমাকে।'

ঝিগোরি দাঁত খিচিয়ে উঠল, ঘাড় গৌল কবে গ্রেটকোটের কলার তুলে দিল।

মন্দিরের পাশে পিছে কোথায় যেন পড়ে রইল আঞ্জিনিয়া। ঝিগোরি একবারও পিছন ফিরে তাকাল না, দেখতে পেল না আঞ্জিনিয়া তার দিকে হাত বাড়িয়ে আছে।

পাহাড়ের চড়াই বেয়ে তাতারস্কি গ্রামে যখন নেমে এসেছে তখনও তার হাতে চাবুকটা ধরা আছে দেখে ঝিগোরি অবাক হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সেটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে সে গলির ভেতর দিয়ে চলতে লাগল। লোকজন অবাক হয়ে জানলার শারিঙে মুখ লাগিয়ে বাড়িঘর থেকে তাকে দেখতে লাগল, রাস্তায় চলতে চলতে সামনাসামনি যে সব মেয়ের সঙ্গে দেখা হল তারা তাকে চিনতে পেয়ে মাথা নুইয়ে নমস্কার করল।

নিজস্বের বাড়ির গেটের কাছে কালো চোখ একহারা সুন্দর চেহারার এক কিশোরী চোঁচামেচি করতে করতে ছুটে এসে তার গলা জড়িয়ে ধরে বুকের মধ্যে মুখ গুঁজল। দু'হাতে গালদুটো চেপে মাথাটা তুলে ধরতেই ঝিগোরি চিনতে পারল দুনিয়াশকাকে।

দেউড়ির ধাপ থেকে খোঁড়াতে খোঁড়াতে নেমে এলো পাণ্ডুলেই প্রকোফিয়েভিচ।

ঘরের মধ্যে ডাক ছেড়ে কৈদে উঠল মা গ্রিগোরি বাঁ হাতে বাবাকে জড়িয়ে ধরল দুনিয়াশকা তার ডান হাতে চুমো খেল।

ধাপগুলো সেই পরিচিত সুরে বেদনাদায়ক আর্তনাদ করে উঠল। গ্রিগোরি ওপরে উঠে এলো মা বুড়ো হয়ে গেলে কি হয় ছুটে এলো একটা বাচ্চা মেয়ের মতো চঞ্চল পায়ে, চোখের জলে ছেলের গ্রেটকোটের বোতামের ঘরাগুলো ভিজিয়ে মিল ছেলেকে নিবিড় ভাবে জড়িয়ে ধরে আপন মনে বিড়বিড় করে কী যেন সব বলে যেতে লাগল অসংলগ্ন কতকগুলো শব্দ, ভাষায় যার কোন প্রকাশ নেই। এদিকে ভেতরের বারান্দায় পাছে পড়ে যায় তাই দরজা ধরে পাথুর মুখে বেদনাক্রান্ত হাসি নিয়ে নাতালিয়া দাঁড়িয়ে রইল, গ্রিগোরির বিভ্রান্ত চোখের দ্রুত দৃষ্টি তার ওপর পড়তেই কাটা গাছের মতো সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

\* \* \*

রাত্রে পাশ্চাত্যেই প্রকোফিয়েভিচ বিছানায় শুয়ে ইলিনিচনার পাজরে খোঁচা মেবে ফিসফিস করে বলল, 'চুপি চুপি গিয়ে দেখে এসো না একসঙ্গে শুষেছে কিনা '

'আমি খাটে দু'জনের বিছানা করে দিয়েছি।'

'আহা গিয়ে একবার উঁকি মেরে দেখেই এসো না।'

ইলিনিচনা দরজার ফাঁক দিয়ে ভেতরের ঘরে উঁকি মেরে দেখল ফিরে এসে বলল, 'একসঙ্গে শুষেছে।'

'ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন।' বুড়ো কনুইয়ে ভর দিয়ে শরীরটা উঁচু কবে তুলে কান্নাভরা গলায় কথাগুলো বলে ক্রুশ-প্রণাম করতে লাগল

## পাঠকদের প্রতি

বইটির অনুবাদ ও অঙ্গসম্বন্ধ বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে আমরা বাধিত হব।

অশা করি আপনাদের মাতৃভাষায় অনূদিত কৃশ ও সোভিয়েত সাহিত্য আমাদের দেশের জনগণের সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রা সম্পর্কে আপনাদের জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়ক হবে।

আমাদের ঠিকানা:

‘রাডুগা’ প্রকাশন

১৭, ছুবোভস্কি বুলভার

মস্কো ১১৯৮৫৯, সোভিয়েত ইউনিয়ন

‘Raduga’ Publishers  
17, Zubovsky Boulevard  
Moscow 119859, Soviet Union

## ১৯৯১ সালে 'রাদুগা' প্রকাশন থেকে প্রকাশিত হবে

### ডাসিলি ইয়ান। চেস্কি়া খানের উত্তরসাধক উপন্যাস

ডাসিলি ইয়ান (১৮৭৪-১৯৫৪) বিখ্যাত রুশ লেখক, ইতিহাসবিদ ও পর্যটক।  
বহুমুখী জ্ঞানের অধিকারী এই মানুষটি বহু বছর ধরে এশিয়ায় ইতিহাস চর্চা করেন।  
প্রাচীন মোঙ্গল, চৈনিক, পারসিক, আরবী ও রুশ ঘটনাপঞ্জী এবং কুশী ও বিদেশী  
দবেষকদের রচনার সঙ্গে তাঁর চমৎকার পরিচয় ছিল।

তাঁর সাহিত্যকীর্তির শীর্ষ চূড়ায় আছে 'মোঙ্গল আক্রমণ' বিষয়ক রচনা-ত্রয়ী-  
ঐতিহাসিক উপন্যাস 'চেস্কি়া খান' (বাংলা ভাষায় ইতিপূর্বে প্রকাশিত), 'চেস্কি়া খানের  
উত্তরসাধক' আর 'শেষ সাগরের সঙ্গমে'। উপাখ্যান তিনটি সোভিয়েত সাহিত্যের ক্লাসিক।  
এগুলিতে আখ্যান ভাগ এমন ভাবে বিন্যস্ত যে তিনটি গ্রন্থই সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক ভাবে  
পঠিত হতে পারে।

## ১৯৯২ সালে 'রাদুগা' প্রকাশন থেকে প্রকাশিত হবে

### ফিওদর দস্তয়েভস্কি। অপরাধ ও শাস্তি

ফিওদর দস্তয়েভস্কি (১৮২১ - ১৮৮১) 'অপরাধ ও শাস্তি' উপন্যাসটি লেখেন ১৮৬৬ সালে, এতে তাঁর 'বন্দি লাঙ্কিত', 'ইডিঅট', 'কারামাজোভ ভাইয়েরা' উপন্যাসের মতোই একটা বড়ো রকমের দার্শনিক-মনস্তাত্ত্বিক চিত্রণ পূর্বাভাসিত হয়েছে। রুশ সমাজ ও রুশ প্রগতিশীল সাহিত্যের ওপর তার প্রভাব প্রতুত।

উপন্যাসের প্রধান চরিত্র, নায়ক রাষ্ট্রনৈতিক অপরাধ করে।

'এধরনের অপরাধ সংঘটিত হওয়া জীবন কঠিন-অর্থাৎ এক্ষেত্রে প্রায় সর্বদাই অপরাধের প্রমাণ, উপসংহার ইত্যাদি চরম স্থলতার পর্যায়ে প্রকটিত হয়ে ওঠে এবং ঘটনার অংশে এত সাম্প্রতিক বহু জিনিস রয়ে যায় যা সব সময়ে অপরাধীকে প্রায় ধরিয়ে দেয় কিন্তু তা সত্ত্বেও নেহাৎই দৈবক্রমে তার পক্ষে নিজের কার্য সাধন সম্ভব হল - দ্রুত ত বটেই, সাফল্যজনক তাবেও।

এর পর চূড়ান্ত বিপর্যয় ঘটর আগে পর্যন্ত প্রায় মাসখানেক সে কাটিয়ে দেয়। তার ওপর কারও কোন সন্দেহের উদ্রেক হয় না, হতে পারেও না। ঠিক তখনই অপরাধের সামগ্রিক মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া খুলতে থাকে। খুনির সামনে দেখা দেয় অমীমাংসিত প্রশ্ন, যে সমস্ত উপলব্ধি সম্বন্ধে তার মনে কোন সন্দেহ ছিল না সেগুলি অকস্মাৎ তাকে দীড়িত করে।' ফিওদর দস্তয়েভস্কি একটি পাত্রে লেখেন।





# মিখাইল শোলখভ

সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত ও নোবেল পুরস্কারবিজয়ী লেখক মিখাইল শোলখভের (১৯০৫-১৯৮৪) 'প্রশান্ত মন' উপন্যাসটি সোভিয়েত সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্লাসিক রচনা। মন-কলকসম্প্রদায়ের বিভিন্ন সামাজিক স্তরের জীবনযাত্রার চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে লেখক এমন সমস্ত চরিত্রের ভাণ্ডার ও জীবনের গতিবিধি অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছেন, যারা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, অক্টোবর বিপ্লব ও গৃহযুদ্ধকালীন ঘটনাবলীর প্রবল প্রভাবভেদে আকর্ষিত হয়েছে। তিনি দেখিয়েছেন সমাজ-জীবনে, মানুষের চৈতন্যে প্রাচীরের সঙ্গে নদীরের এক জটিল সংগ্রাম। শোলখভ তাঁর নিজের উপন্যাসের পাত্র-পাত্রী প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'আমার আগ্রহ মানুষে - যে মানুষ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় মহাপ্রাবনের মধ্যে পড়েছে, তাতে। . . . আমার মনে হয় এই সব মুহূর্তে মানুষের চরিত্র কেন্দ্রীভূত হতে থাকে। . . .'

'আমি চাই, আমার বইগুলি যেন মানুষকে ভালো হতে, তার চিত্ত আরও নির্মল ও বিশুদ্ধ করে তুলতে, মানবতাবাদ ও মানবপ্রগতির আদর্শের দ্বারা সক্রিয় সংগ্রামের প্রয়াস এবং মানুষের প্রতি ভালোবাসা জ্ঞাপিয়ে তুলতে সাহায্য করে।' (মিখাইল শোলখভ। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণ থেকে।)



'বাবুলা' প্রকাশন  
মস্কো